বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা

১৪০৯

বাঁকুড়া জেলা

বর্ধমান জেলা
পুরুলিয়া জেলা
হুগলি জেলা
মেদিনীপুর জেলা
শালতোড়া
মেঝিয়া
গঙ্গাজলঘাটি
ছাতনা
বড়জোড়া
সোনামুখী
বাঁকুড়া
পাত্রসায়ের
ইন্দাস
ওন্দা
ইন্দপুর
হীরবাঁধ
জয়পুর
তালডাংরা
বিষ্ণুপুর
কোতুলপুর
খাতড়া
সিমলাপাল
রানীবাঁধ
সারেঙ্গা
রাইপুর

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ

বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা

১৪০৯

প্রধান সম্পাদক : তারাপদ ঘোষ

সম্পাদক : অজিত মণ্ডল

সহ-সম্পাদক : অনুশীলা দাশগুপ্ত

সম্পাদনা সহযোগী : সাগর চট্টোপাধ্যায় ● মৌসুমী সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : অজিত মণ্ডল ● দীনবন্ধু বিশ্বাস

প্রথম ও দ্বিতীয় পটচিত্র :
বালুচরী শাড়িতে তাঁতের কাজ
চতুর্থ প্রচ্ছদ : টেরাকোটা শিল্প

অঙ্গসজ্জা
প্রতাপ সিংহ তুলসীদাস বসাক রামচন্দ্র পণ্ডিত
শ্যাম রুদ্র নিতাই গোড়ে ও জয়দেব পাল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
রামজয় চক্রবর্তী, বাঁকুড়া জেলাপরিষদ, দেবীপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায়, পাপান ঘোষ

প্রকাশক
তথ্যঅধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২

দাম : ষাট টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা
বিতরণ শাখা
সফদর আলী, বিজনেস ম্যানেজার
৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২৪৩-৬২৯৫

শিল্পী—রামকিংকর বেজ

সম্পাদকীয়

প্রয়োজন সংস্কৃতির মেলবন্ধন

অপরিচয়ের অজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব। প্রতিবাসী মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়াভাবের ফলে পারস্পরিক অনাত্মীয় ও অনৈক্যের মনোভাব গড়ে ওঠে, ভুল বোঝাবুঝির অবসর তৈরি হয়, উপরন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাকে সমৃদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের কথায় '...আমাদের খুব একটা বড়ো সম্পদ ছিল, সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড় সম্পদ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখশান্তি থাকতে পারেনা।' অন্যত্র বলেছেন '...ঐক্য যাতে স্থাপিত হয় তারই জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চাই। ঘরে ঘরে কত বিরোধ। বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের ঐশ্বর্যকে আমরা ধূলিস্খলিত করে দিয়েছি। সর্বনেশে ছিদ্রগুলোকে রোধ করতে হবে আপনার সবকিছু দিয়ে।'

বর্তমান ভারতবর্ষে সর্বত্র পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের গাঢ় অন্ধকার। বিভেদের বিষ দেশের ধমণীতে ছড়িয়ে দিতে অশুভ শক্তি সর্বদা সক্রিয়। প্রতিবেশী বন্ধু-স্বজন কেউ কাউকে আপনার মনে করে না। বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতা ক্রমশ গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠছে। একই প্রদেশে বিভিন্ন জেলার মানুষের মধ্যে অন্তরের যোগ নেই, সকলেই নিজেদের বঞ্চিত ভাবছে অথবা শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে অপরকে হেয় করছে। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে জন্ম নেয় হিংসা ও প্রতিহিংসা। একমাত্র সংস্কৃতির মেলবন্ধনই পারে নির্মল মৈত্রীর সার্থক ছবি উপহার দিতে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলাগুলিতে শিল্প-সংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্যের ধারণা আদান-প্রদানের নানান কর্মসূচি নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার বিশেষ জেলা সংখ্যা প্রকাশের উদ্দেশ্যও অনুরূপ। প্রতিটি জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি—প্রত্নতাত্ত্বিক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপরেখা ছাড়াও এর সাহিত্য-শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়। বর্তমান বাঁকুড়া জেলা সংখ্যাতেও এর অনুক্রম রয়েছে।

রাঢ় বাংলার অন্যতম জেলা বাঁকুড়ার রুক্ষ কাঁকুরে রাঙা মাটির পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন মন্দির-টেরাকোটা ভাস্কর্য, মল্লরাজাদের কীর্তি আর বাতাসে ধ্রুপদী সংগীতের মূর্চ্ছনা। পাশাপাশি ইতস্তত সবুজ বনভূমি-আবৃত বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর লোকসংগীত লোকনৃত্য লোক (পট) চিত্র যেমন জেলাকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনই এর সংগ্রামী গণ-আন্দোলনের ঐতিহ্য, সুপ্রসিদ্ধ চোয়াড় বিদ্রোহ বাঁকুড়ার বর্ণময় ইতিহাসকে উজ্জ্বলতর করেছে। বর্তমান সংখ্যার লেখকসূচিতে আছেন জেলার প্রবীণ বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ। প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য ও অভিমত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব, সম্পাদকের কোনও দায়িত্ব নেই। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে সংখ্যাটি সমাদৃত হবে।

বিষয়সূচি ।।

শিল্পী—যামিনী রায়

এক নজরে

জেলার নাম বাঁকুড়া

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আকৃতি সমবাহু ত্রিভুজ অথবা প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর আয়ুধের মতো। উত্তর গোলার্ধের ২২" ৩৮' থেকে ২৩" ৩৮' উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৬" ৩৬' থেকে ৮৭" ৪৫' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

উত্তরে বর্ধমান, দক্ষিণে মেদিনীপুর, পূর্বে হুগলি, পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা।

বাঁকুড়া ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জঙ্গল মহল নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬-এ নাম হয় পশ্চিম বর্ধমান। ১৮৮১ থেকে অঞ্চলটি বাঁকুড়া হিসাবে চিহ্নিত হয়।

বাঁকুড়ার ভূগোল উচ্চাবচ মালভূমি, অরণ্য, পাহাড়, সমতল ভূমি ও নদনদীতে বিচিত্ররূপী। আবহাওয়া উষ্ণতা প্রধান।

পাহাড় : বিহারীনাথ, শুশুনিয়া, কোড়ো ও মশক পাহাড়।

নদনদী : দামোদর, দ্বারকেশ্বর নদ, কংসাবতী, শিলাবতী, গন্ধেশ্বরী, কাঁসাচর, জয়পান্ডা, শালি, বিড়াই, অরকশা, ভৈরব, বাঁকী ও কুমারী নদী।

প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া, মধ্যযুগের পোখন্না, বিষ্ণুপুর, অম্বিকানগর এবং অসংখ্য দেবদেউল এই জেলার নানান প্রান্তে ছড়িয়ে আছে।

আয়তন : ৬৮৮২ বর্গ কিঃ মিঃ

জলবায়ু : বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ—১৪৩০ মিঃ মিঃ
গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা—৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস
গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা—০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস

জনসংখ্যা : ৩১,৯১,৮৩০ জন
(১৯৯১-এর জনগণনা অনুসারে)
তফসিলি সম্প্রদায়—৮,৩২,৪৬৮ জন
আদিবাসী—২,৮৮,৬০৩ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব—৪০৮ জন প্রতি বর্গ কিমিতে
স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত—পুরুষ : ৫১.২৫ শতাংশ
স্ত্রী : ৪৮.৭৫ শতাংশ

শহর ও গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত :
গ্রামে : ৯১.৭১
শহরে : ৮.২৯

জন্মহার (প্রতি হাজারে)	—	২৮ জন
মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	—	৮.৯ জন
শ্রমিক সংখ্যা	—	৩৫.৯১ শতাংশ
অশ্রমিক	—	৬৪.০৯ শতাংশ
সাক্ষরতার হার	—	৭২.৯৫ শতাংশ

প্রশাসনিক কাঠামো : বাঁকুড়া জেলায় মোট ৩টি মহকুমা ও ২২টি পঞ্চায়েত সমিতি।

পঞ্চায়েত সমিতি

বাঁকুড়া সদর মহকুমা —
১। বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি
২। বাঁকুড়া ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
৩। ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতি
৪। শালতোড়া পঞ্চায়েত সমিতি
৫। মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতি
৬। গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতি
৭। বড়জোড়া পঞ্চায়েত সমিতি
৮। ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতি

খাতড়া মহকুমা —
১। ইন্দপুর পঞ্চায়েত সমিতি
২। খাতড়া পঞ্চায়েত সমিতি
৩। হীরবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতি
৪। রানীবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতি
৫। তালডাংড়া পঞ্চায়েত সমিতি
৬। সিমলাপাল পঞ্চায়েত সমিতি
৭। রাইপুর পঞ্চায়েত সমিতি
৮। সারেঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতি

বিষ্ণুপুর মহকুমা —
১। বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েত সমিতি
২। জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতি
৩। কোতলপুর পঞ্চায়েত সমিতি
৪। সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতি
৫। পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতি
৬। ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতি

পৌর প্রতিষ্ঠান ৩টি —
১। বিষ্ণুপুর পৌরসভা
২। সোনামুখী পৌরসভা
৩। বাঁকুড়া পৌরসভা

জন অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যা	—	৩৫৬৫টি
গ্রাম পঞ্চায়েত	—	১৯০টি
মৌজা	—	৩৮২৬টি
আই টি ডি পি মৌজা	—	৭৪৭টি

কৃষি ও সেচ :

মোট চাষাবাদযোগ্য জমি	—	১২৫৯ বর্গ কিঃমিঃ
প্রধান কৃষিজ ফসল	—	আউস, আমন, বোরো, গম, আলু, সরিষা
মোট সেচসেবিত এলাকা	—	৩,২৬,৫০৫ হেক্টর
মোট নলকূপের সংখ্যা	—	১০,৩১৮টি
মোট পানীয় জলের কূপের সংখ্যা	—	৯৪৯৬টি

বন : মোট বনভূমির পরিমাণ — ১০৫৫ বর্গ কিঃমিঃ

ভূমি এবং ভূমি সংস্কার

(ক) মোট ন্যস্ত জমির পরিমাণ — ৬৯,৪৫৬.৯৩ একর
(খ) মোট বর্গাদারের সংখ্যা — ১,০৯,৭৪৩ জন

কৃষি সংক্রান্ত পরিকাঠামো :
১। রাজ্য বীজ ফার্ম—১
২। জেলা বীজ ফার্ম—১
৩। ব্লক বীজ ফার্ম—৫
৪। আদর্শ ফার্ম—১ (জয়রামবাটি)
৫। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র—২টি (শালতোড়া, রানীবাঁধ)
৬। মোট বীজ ফার্ম—৭১টি
৭। মোট হিমঘরের সংখ্যা—২৩টি

বাজার :
১। নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা—৫
২। সাপ্তাহিক বাজার—৩৫
৩। প্রাত্যহিক বাজার—৩৭
৪। খাদ্য সংরক্ষণ ইউনিট—২
৫। লাইফস্টক মার্কেট—৪

মৎস্য চাষ :
(ক) মোট জলাভূমি—২২,৪২৫ হেক্টর
(খ) মোট মৎস্যজীবী পরিবারের সংখ্যা—৭৭৬৬
(গ) মৎস্যজীবীদের সমবায় সংখ্যা—৩৫

প্রাণীসম্পদ :
(ক) রাজ্য প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র—৫ টি
(খ) ব্লক প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র—২২ টি
(গ) অতিরিক্ত ব্লক প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র—১৬ টি
(ঘ) গো-খাদ্য ফার্ম—১ টি
(ঙ) দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্র—২ টি
(চ) চিলিং প্ল্যান্ট—৩টি
(ছ) কেন্দ্রীয় গো-বীজ সংগ্রহ কেন্দ্র—৩টি

সমবায় :
(১) কেন্দ্রীয় সমবায়—৭টি
(২) মার্কেটিং সমবায়—১৪টি
(৩) পি এ সি এস—২৯০টি
(৪) ল্যাম্প—১৮টি
(৫) পরিবহণ সমবায়—১২৫৯টি
(৬) আবাসন সমবায়—২৯টি
(৭) শিল্প সমবায়—১৪৯টি
(৮) দুগ্ধ এবং মুরগী পালন সমবায়—৪০টি
(৯) শ্রমিক সমবায়—৯৩টি
(১০) মহিলা সমবায়—২টি
(১১) সমবায়গুলির মোট কার্যকরী মূলধন—১৫,৭৯,৬৮০ টাকা

বিদ্যুৎ :
বিদ্যুৎতাড়িত মৌজা—২৪০৭টি

শিক্ষা :
(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়—৩৪৬২টি
(২) জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়—১১৩টি
(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়—২১৯টি
(৪) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়—১০২টি
(৫) উচ্চ মাদ্রাসা—৩টি
(৬) মহাবিদ্যালয়—১২টি
(৭) কারিগরি মহাবিদ্যালয়—২টি
(৮) ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কলেজ—১টি
(৯) কমিউনিটি পলিটেকনিক—৪টি
(১০) পলিটেকনিক—১টি
(১১) গ্রামীণ গ্রন্থাগার—১৩০টি
(১২) শিশু শিক্ষা কেন্দ্র—২২১টি

স্বাস্থ্য :
(ক) হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ক্লিনিক —মোট ৬৯৬টি
(খ) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র—৫১৩টি
(গ) হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা—২৫২৫ টি
(ঘ) কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র—৭ টি

পরিবহণ এবং যোগাযোগ :
(১) রাস্তার দৈর্ঘ্য—৬৯১৮ কিঃমিঃ
(২) বাসরুটের সংখ্যা—১৫১টি
(৩) ফেরি সার্ভিস—৩৭টি
(৪) রেলপথের দৈর্ঘ্য—৭০ কিঃমিঃ
(৫) মোট পোস্ট অফিস—৪৭৭টি
(৬) রেজিস্ট্রিকৃত মোটর পরিবহণের সংখ্যা—২৩,৫২৪টি
(৭) মোট পি সি ও—১৩৫

শিল্প :
(ক) বৃহৎ শিল্প—৫টি
(খ) মাঝারি শিল্প—৪টি
(গ) ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প—৪৭১১টি

তাঁত শিল্প :
(ক) মোট তাঁতের পরিমাণ—১৩,৫৫০
(খ) মোট তাঁতশিল্পী—৩৩,৮৭৫ জন
(গ) তাঁতশিল্পীদের সমবায়ের সংখ্যা—১৩০টি

আর্থিক প্রতিষ্ঠান :
(ক) কমার্শিয়াল ব্যাংক—৯৬টি
(খ) স্থানীয় গ্রামীণ ব্যাংক—৬৯টি
(গ) সমবায় ব্যাংক—১৫টি
(ঘ) ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক—১ টি
(ঙ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অর্থ নিগমের কার্যালয়—১টি

সমাজ কল্যাণ :
(১) অনাথ আশ্রম—১টি
(২) আই সি ডি এস প্রোজেক্ট—২২টি
(৩) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র—১৩৬৮টি
(৪) কুষ্ঠ রোগী পুনর্বাসন কেন্দ্র—১টি
(৫) মূক ও বধির বিদ্যালয়—১টি
(৬) অন্ধ বিদ্যালয়—১টি

মেলা :

খাতড়া ব্লকে পরকুলের তুসু মেলা পৌষ সংক্রান্তিতে হয়। রাইপুর ব্লকে মটগোদা গ্রামের সুপ্রাচীন মণিমেলা মাঘ মাসের শেষ শনিবার আরম্ভ হয়ে সপ্তাহব্যাপী চলে। ফুলকুশমার মেলা ১ মাঘ অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুর মেলা প্রতি বছর ২৩-২৭ ডিসেম্বর এবং মুকুটমণিপুর মেলা ১ জানুয়ারি মূলত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত হয়। এ ছাড়াও বোগাই চণ্ডীর শিবরাত্রির মেলা, পাঁচাল-পিড়াবনি, বেলিয়াতোড়ের গাজন মেলা, অযোধ্যার মনসার মেলা, বিহারীনাথেরর মেলা উল্লেখযোগ্য।

বাঁকুড়ার গৌরব :

মা সারদামণি, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী যামিনী রায়, ভাস্কর রামকিংকর বেইজ, শিল্পী সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য যোগেশচন্দ্র, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, সর্বোপরি বড়ু চণ্ডীদাস।

কুটির শিল্প :

শুশুনিয়ায় পাথরের কাজ, বিকনার ডোকরা কাজ, বিষ্ণুপুরের দশ অবতার তাস, শঙ্খ, নারকেলমালা, লণ্ঠন ও বালুচরী শাড়ি। পাঁচমুড়া ও স্যাঁদড়ার পোড়া মাটির কাজ। হাট গ্রামের শঙ্খ শিল্প, রামপুরের কাঠের কাজ, কেঞ্জাকুড়ার বাঁশের কাজ, অভিব্যক্তির শিল্প এবং বেলিয়াতোড়ের পটচিত্র বিশ্ববন্দিত।

লোক সংস্কৃতি :

মাদলের ধ্বনির সঙ্গে আদিবাসী নাচ, তুসু, ভাদু, মনসামঙ্গল, বাউল, কাঠিনাচ, ঝুমুর, রাবণকাঁটা নাচ, ছৌ, রণপা নৃত্য, বিয়ের গান, পাতা নাচের গান, হাপু এবং গোয়ালিদের গানে জেলার আকাশ বাতাস আলোড়িত।

দ্রষ্টব্য স্থান

১। বিহারীনাথ পাহাড়	১৮। ইকো পার্ক
২। ঝিলিমিলি অরণ্য	১৯। বীরকাঁড় বাঁধ
৩। শুশুনিয়া পাহাড়	২০। ছেঁদাপাথর অরণ্য
৪। মুকুটমণিপুর জলাধার	২১। দেউলভিড়া মন্দির
৫। এক্তেশ্বর মন্দির	২২। কোড়ো পাহাড়
৬। রানীবাঁধ অরণ্য	২৩। কালামহাদন জীউ
৭। ভৈরববাঁকী নদী	২৪। গড় দরজা
৮। সোনামণি পাহাড়	২৫। মদনমোহন মন্দির
৯। রামকিংকরের ভাস্কর্য	২৬। শ্যাম মন্দির
১০। তালবেড়িয়া জলাধার	২৭। দলমাদল কামান
১১। অভিব্যক্তি ছান্দার	২৮। রাসমঞ্চ
১২। বহুলাড়ার মন্দির	২৯। জোড়বাংলো
১৩। সুতান	৩০। বালুচরী শাড়ি
১৪। জয়রামবাটির মন্দির	৩১। নারকেল মালার কাজ
১৫। বরদি কালাপাথর	৩২। ফুলকুশমার কাঠের কাজ
১৬। লুপ্তপ্রায় কাঠের কাজ	৩৩। খেড়িয়াদের কাজ
১৭। গাংদুয়া জলাধার	

সূত্র : বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত 'বাঁকুড়া দেখুন' এন. আর. ডি. এম. এস.-এর পরিসংখ্যান তালিকা ইত্যাদি।

সংকলন : **রামজয় চক্রবর্তী, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, বাঁকুড়া।**
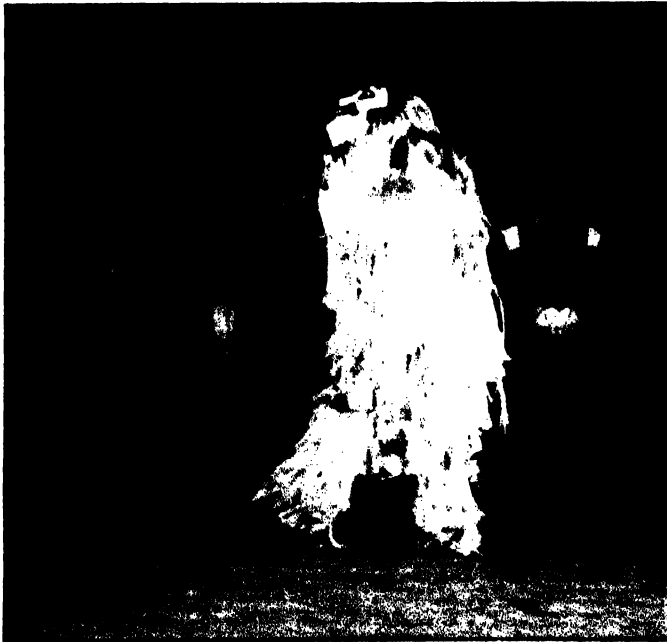
বাঁকুড়ার রাবণকাট নৃত্য,

বাঁকুড়ার রণপা, ছবি : এন সি ঘোষ

অভিভাষণ

বাঁকুড়া শহরে রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় কবি প্রদত্ত এই অভিভাষণে তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বলিষ্ঠ আত্মভাবনা তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফলত কবির বাঁকুড়া পরিভ্রমণ মুখ্য বিষয় হয়ে না উঠলেও তাতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ হয়েছে।

—সম্পাদক

পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে বাংলার অখ্যাত এক প্রান্তে দিন কেটেছে। স্বদেশের কাছে কি বিদেশের কাছে অজ্ঞাত ছিলুম। তখন মনের যে স্বাধীনতা ভোগ করেছি সে যেন আকাশের মতন। এই আকাশ বাহবা দেয় না, তেমনি বাধাও দেয় না। বকশিশ যখন জোটেনি বকশিশের দিকে তখন মন যায় নি। এই স্বাধীনতায় গান গেয়েছি আপন-মনে। সে যুগে যশের হাটে দেনাপাওনার দর ছিল কম, কাজেই লোভ ছিল স্বল্প। আজকের দিনের মতো ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল না। সেটা আমার পক্ষে ছিল ভালো, কলমের উপর ফরমাশের জোর ছিল ক্ষীণ। পালে যে হাওয়া লাগত সে হাওয়া নিজের ভিতরকার খেয়ালের হাওয়া। প্রশংসার মশাল কালের পথে বেশি দূর পথ দেখাতে পারে না—অনেক সময়ে তার আলো কমে, তেল ফুরিয়ে আসে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কালে বিশেষ সাময়িক আবেগ জাগে—সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা ধর্মসম্প্রদায়গত। সেই জনসাধারণের তাগিদ যদি অত্যন্ত বেশি করে কানে পৌঁছয় তা হলে সেটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো ভাবীকালের যাত্রাপথের দিক ফিরিয়ে দেয়। কবিরা অনেক সময়ে বর্তমানের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ভাবীকালকে বঞ্চনা করে। এক-একটা সময় আসে যখন ঘুষের বাজার খুব লোভনীয় হয়ে ওঠে, দেশাত্মবোধ, সম্প্রদায়ী বুদ্ধি তাদের তহবিল খুলে বসে। তখন নগদ-বিদায়ের লোভ সামলানো শক্ত হয়। অন্য দেশের সাহিত্যে এর সংক্রামকতা দেখেছি, জনসাধারণের ফরমাশ বাহবা দিয়ে জনপ্রিয়কে যে উঁচু ডাঙায় চড়িয়ে দিয়েছে, স্রোতের বদল হয়ে সে ডাঙায় ভাঙন ধরতে দেরি হয় না।

আমার জীবনের আরম্ভকালে এই দেশের হাওয়ায় জনসাধারণের ফরমাশ বেগ পায় নি, অন্তত আমাদের ঘরে পৌঁছয় নি। অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা শুনে হাসবে, সত্যই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম আমরা। আমার পিতার খুব নাম শুনেছ, কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে। আমরা যে অল্প লোককে জানতুম সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না। আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে তখন আমাদের অর্থসম্বল হয়ে এসেছে রিক্তজলা সৈকতিনী। থাকতুম গরিবের মতো, কিন্তু নিজেকে জানি নি গরিব বলে। আমার মরাইয়ে আজ যা-কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে। প্রথম ফসল অঙ্কুরিত হয় মাটির মধ্যে ভূগর্ভে। ভোরের বেলায় চাষী তার বীজ ছড়ায় আপন-মনে। অঙ্কুরিত না হলে সে বীজ-ছড়ানোর বিচার হয় না। ফসল কী পরিমাণ হয়েছে প্রত্যক্ষ জেনে মহাজন তবে দাদন দিতে আসে। যে মহাজনের খেতের উপর নজর পড়ে নি তাদের ঋণের আশ্বাস আমি পাই নি। একান্তে নিভৃতে যা ছড়িয়েছি, ভাবিও নি ধরণী তা গ্রহণ করেছিলেন।

অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা শুনে হাসবে, সত্যই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম আমরা। আমার পিতার খুব নাম শুনেছ, কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে। আমরা যে অল্প লোককে জানতুম সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না।

একসময়ে অঙ্কুর দেখা দিল। মহাজন তার মূল্য ধরে দিলে আপন-আপন বিচার অনুসারে। সেই সময়কার কথা বলি। বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও

ঘুরে-ফিরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোণের এক ঘরে ছিলেম বন্দী। সেই ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখেছি বাগান, সামনে পুকুর। লোকেরা স্নান করতে আসছে, স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছে। পূব দিকে বটগাছ, ছায়া পড়েছে তার পশ্চিমে সূর্যোদয়ের সময়। সূর্যাস্তের সময় সে ছায়া অপহরণ করে নিয়েছে। বহির্জগতের এই স্বল্প পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের আবেশ সৃষ্টি করত। জানালার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতুম তার চেয়ে যা পাই নি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পল্লীগ্রামের দিগন্তের দিকে চেয়ে।

সেই সময় অকস্মাৎ পেনেটির বাগানে আসতে পেরেছিলুম ডেঙ্গুজ্বরের প্রভাবে বাড়ির লোক অসুস্থ হওয়ায়। সেই গঙ্গার ধারের স্নিগ্ধ শ্যামল আতিথ্য আমায় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করল। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যেত মেঘের ছায়া ; ভাঁটার স্রোতে জোয়ারের স্রোতে চলত নৌকো পণ্য নিয়ে, যাত্রী নিয়ে। বাগানের খিড়কির পুকুরপাড়ে কত গাছ, যেসব গাছে ছিল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের বিশেষ পরিচয়। পুকুরে আসত-যেত যারা সেই-সব পল্লীবাসী পল্লীবাসিনীদের সঙ্গে এক রকমের চেনাশোনা হল—নিকট থেকে নাই হোক, অসংসক্ত অন্তরাল থেকে।

তার পর পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে—ঠিক পূর্ববঙ্গে নয়, নদীয়া এবং রাজসাহী জেলার সন্নিকটে। সেখানে, পল্লীগ্রামের নদীপথ বেয়ে নানান জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে আমাকে। পল্লীগ্রামকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার, তার আনন্দ ও দুঃখকে সন্নিকটভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেলেম এই প্রথম।

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন।

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায় ? যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।

কলকাতা থেকে নির্বাসন নিয়েছি শান্তিনিকেতনে। চারিদিকে তার পল্লীর আবেষ্টনী। কিন্তু সে তার একটা বিশেষ দৃশ্য। পুকুর-নদী বিল-খালের যে বাংলাদেশ এ সে নয়। এর একটা রুক্ষ শুষ্কতা আছে, সেই শুষ্ক আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্যরস ; সেখানকার মানুষ যারা—সাঁওতাল—সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি। আমার বিপদ হয়েছে এখন—অখ্যাত ছিলেম যখন, অনায়াসে পল্লীর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো বেষ্টন ছিল না—'ওই কবি আসছেন' 'ওই রবিঠাকুর আসছেন' ধ্বনি উঠত না। তখন কত লোক এসেছে, সরল মনে কথা বলেছে। কত বাউল, কত মুসলমান প্রজা তাদের সঙ্গে একান্ত হৃদ্যতায় আলাপ-পরিচয় হয়েছে—সম্ভব ছিল তখন। ভয় করেনি তারা। তখন এত খ্যাতিলাভ করি নি, বড়ো দাড়িতে এত রজতচ্ছটা বিস্তার হয় নি। এত সহজে চেনা যেত না আমাকে, ছিল অনতিপরিচয়ের সহজ স্বাধীনতা।

এই তো একটা জায়গায় এলুম, বাঁকুড়ায়। প্রাদেশিক শহর বটে কিন্তু পল্লীগ্রামের চেহারা এর। পল্লীগ্রামের আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। সাবেক দিন যদি থাকত তো এরই আঙিনায় আঙিনায় ঘুরে বেড়াতে পারতুম। এ দেশের এক নূতন দৃশ্য—শুষ্ক নদী বর্ষায় ভরে ওঠে, অন্যসময় থাকে শুধু বালিতে ভরা। রাস্তার দুই ধারে শালের ছায়াময় বন। পেরিয়ে এলুম মোটরে পল্লীশ্রীর ভিতর দিয়ে, দেখতে পাই নি বিশেষ কিছুই। এমনতরো দেখা এড়িয়ে যাবার উপায় তো আর নেই। কেবলই চেষ্টা, কী করে দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিতে পারে উপলক্ষ থেকে। যেন উপলক্ষটা কিছুই নয়, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার উপায়। কিন্তু এই উপলক্ষই তো হল আসল জিনিস। এরই জন্যে তো লক্ষ্য আনন্দে পূর্ণ হয়। আগে তীর্থ ছিল লক্ষ্য, আর সারা পথ ছিল তার উপলক্ষ। তীর্থের যাত্রীরা কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়ে তীর্থের মহিমাকে পেতেন ; তীর্থ সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করত তাঁদের। টাইম্-টেব্‌ল্ নিয়ে যারা চলাফেরা করে দুর্ভাগ্য তারা, চোখ রইল তাদের উপবাসী। পূর্বকালে ভারতের ভূগোলবিবরণের পাঠ ছিল তীর্থে তীর্থে। শীর্ষদেশে হিমালয়, পূর্বপার্শ্বে বঙ্গোপসাগর, অপর পার্শ্বে আরব সাগর—এ-সমস্তই তীর্থে তীর্থে চিহ্নিত। এই পাঠ নিতে হয়েছে পদব্রজে। সে শিক্ষা নেমে এসেছে ব্ল্যাক্‌বোর্ডে। আমার পক্ষেও। আমি পল্লীর পরিচয় হারিয়েছি নিজে পরিচিত হয়ে। বাইরে বেরোনো আমার পক্ষে দায়, শরীরেও কুলোয় না। আমার পল্লীর ভালোবাসা বিস্তৃত করতে পারতুম, আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম, কিন্তু সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না। আমার সেই শিলাইদহের জীবন হারিয়ে গেছে।

১৮ ফাল্গুন ১৩৪৬

অভিভাষণ, বাঁকুড়ার জনসভায় কথিত, রবীন্দ্র রচনাবলী,
জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পল্লীপ্রকৃতি, পৃঃ ৫৭০

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নালোকে বাঁকুড়া

প্রকাশচন্দ্র মাইতি

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চা করতে গেলে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের (৩২৭ খ্রিঃ পূঃ) পূর্ববর্তী অধ্যায়ের এক অস্পষ্ট চিত্র আমরা দেখতে পাই। প্রাগৈতিহাসিক পর্বের ইতিহাসচর্চা খুবই কঠিন, লিখিত কোনও তথ্য না থাকায় মূল আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলিই ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চার একমাত্র তথ্য।

রাঢ় বঙ্গের বর্ধমান বিভাগের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জেলাটির নাম 'বাঁকুড়া'। এই জেলা ২২°-৩৮' এবং ২৩°-৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°-৩৬' এবং ৮৭°-৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। জেলার আয়তন ৬৭০৯.৭৬ বর্গকিলোমিটার। মোট ১৬টি থানা, শালতোড়া, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া, বড়জোড়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ইন্দপুর, খাতরা, ওন্দা, জয়পুর, রানীবাঁধ, তালডাংরা, সোনামুখী, পাত্রসায়র, কতুলপুর, ইন্দাস, সিমলিপাল এবং রায়পুর।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বা প্রস্তর যুগের নিদর্শন সারা বাঁকুড়া জেলার সব প্রান্তে বা থানায় পাওয়া যায়নি। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রত্নবস্তু ও তথ্য অনুযায়ী শালতোড়া, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটি, বরজোড়া, বাঁকুড়া, তালডাংরা, খাতরা থানাগুলি থেকে প্রস্তর যুগের নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ের ভূতপূর্ব অধিকর্তা প্রয়াত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ৬ ও ৭-এর দশকে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া অঞ্চল ছাড়াও বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া জেলায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালান। ফলে বাংলার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির এক সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

অবস্থান : জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে দামোদর নদ ও বর্ধমান জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে যথাক্রমে হুগলী, মেদিনীপুর, ও পুরুলিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরায়ুধের প্রাধান্য দেখা যায়।

ভূতত্ত্ব : এই জেলার পূর্ব প্রান্ত সমতল অঞ্চল এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমির বর্ধিত অংশ। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বের ভূমি নিচু ও পলিমাটিসমৃদ্ধ যেখানে চাষ-আবাদ খুব ভাল হয়। জেলার পশ্চিমাঞ্চল উঁচু আবার কোনও কোনও অঞ্চল নিচু, এই পশ্চিমাঞ্চলে ছোট বড় পাহাড়, টিলা বা পাথুরে মাটির প্রাধান্য দেখা যায়। এই ছোট ছোট পাহাড় বা টিলা উপত্যকায় ঘন বা অল্পবিস্তর বিভিন্ন গাছপালার জঙ্গল চোখে পড়ে। এই টিলা বা সমতল পাহাড়ে প্যারাসিস্ট (Paraschist), ফিলাইট (Phylite), কোয়ার্জাইট (Quartzite), গ্রানাইট (Granite), নিস (Gneiss), এম্‌ফিবোলাইট (Am-Phibolite) ইত্যাদি পাথরের প্রাচুর্য চোখে পড়ে।

এই জেলার শুশুনিয়া ও বিহারিনাথ পাহাড় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুশুনিয়া পাহাড় বাঁকুড়া শহরের ২২.৫২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩.২১ কিলোমিটার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৩৯.৫২ মিটার উঁচু। এই পাহাড়ের পৃষ্ঠভূমি ঘন জঙ্গলে ঘেরা।

বিহারিনাথ পাহাড় বাঁকুড়া শহরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং উচ্চতায় ৪৪৭.৭৫ মিটার। অন্যান্য পাহাড়ের মধ্যে মেজিয়া এবং কোরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নদ-নদী, মাটি ও চাষাবাদ : জেলার প্রধান প্রধান নদ-নদীগুলি হল—দামোদর, দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শালী, কাঁসাই বা কংসাবতী, শিলাই বা শীলাবতী, ডাঙ্গরা, আমজোড়, ভৈরব-বাঁকি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জেলার উত্তরে দামোদর যা বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলার সীমারেখা নির্ধারণ করছে। নদীগুলি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত এবং উৎপত্তিস্থল ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল। নদীগুলির খাদ বালুকাময় এবং গ্রীষ্মকালে বেশির ভাগ নদী

পুরাপ্রস্তর যুগের হস্তকুঠার, শুশুনিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত

শুকনো থাকে। নদী-উপত্যকাগুলি মাটির সঙ্গে বালি, কাঁকর, মাকড়া পাথর বা ল্যাটেরাইট পাথরের নুড়ির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

এই জেলার মাটি লাল কাঁকরযুক্ত বেলেমাটি, বাদামি রঙের মাটি, চুনাপাথর মিশ্রিত মাটি দেখা যায়। মাটিতে শাল, শিমুল প্রভৃতি গাছপালা দেখা যায়। জেলার পশ্চিম এবং দক্ষিণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের প্রাধান্য আছে, কিন্তু মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই জাতীয় গাছের প্রাধান্য খুবই কম। জেলার সব জায়গায় কম বেশি ধান, গম, সরষে, পাট ও বিভিন্ন রকমের শাক-সব্জীর ফলন মোটামুটি ভালই হয়।

জলবায়ু : এই জেলার তাপমাত্রা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটামুটি ৪৪° সেন্টিগ্রেড ও ১০° সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৪০ সেমি।

ভূতাত্ত্বিক স্তর বিন্যাস :

স্তর নং (১) ভূপৃষ্ঠের তৃণমূলের সঙ্গে মাটি যা ০.৪ মিটার।
,, (২) শক্ত ধূসর মাটির সঙ্গে চুন ও বালির মিশ্রণ যা ১.৪০ মি মোটা।
,, (৩) ফেরাগেনাস কনেরেশান (Ferrugenous Coneretion যা ০.১ মিটার।
,, (৪) সিমেন্টেড গ্রাভেল (Cemented Gravel)
,, (৫) শক্ত মাটির সঙ্গে গ্রাভেল এবং বোল্ডার যা ০.৪২ মিটার মোটা।
,, (৬) মোটা লোহিত মৃত্তিকা (Lateritic soil) স্তর
,, (৭) বেড রক (Bed Rock)

বাঁকুড়া জেলায় যে সমস্ত প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি তিনটি সাংস্কৃতিক বিভাজন রেখা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে এই সাংস্কৃতিক বিভাজনের ৩টি পর্যায় উল্লেখ করা আবশ্যিক বলে মনে হয়। প্রথম পর্যায় হল প্রাগৈতিহাসিক, এই পর্বে প্রথমদিকে মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনীতি মূলত শিকার এবং খাদ্য আহরণ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এই সময়ে মানুষ সমাজবদ্ধতা বা উন্নত কারিগরি কৌশলও জানত না। শুধুমাত্র তারা হাতের কাছে পাওয়া পাথরের ব্যবহার জানত, অন্য কোনও

ধাতুর ব্যবহার জানত না। পাথর দিয়ে হাতিয়ার বানাত এবং এই পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার, গাছপালার মূল, কাণ্ড থেকে খাদ্য আহরণ করত। এই পর্যায়ের শেষের দিকে এই পাথরের সাহায্যেই আরও উন্নত প্রযুক্তির শিক্ষা নেয় এবং তাদের জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এই যুগ হল নব্য প্রস্তর যুগ যা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়ার এই অঞ্চলও সমান তালে তাল মিলিয়েছিল। কোনওরকম লিখিত তথ্য এই যুগ থেকে পাই না, তাই এই যুগ হল প্রাগৈতিহাসিক (Pre-Historic)।

দ্বিতীয় পর্ব হল প্রায়-ঐতিহাসিক (Proto-Historic) এই পর্বে মানুষ অনেক বেশি সমাজবদ্ধ, কৃষিতে, কারিগরিবিদ্যাতে, শিকারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ধাতু ব্যবহারে প্রথম যুগ থেকে অনেক অনেক এগিয়ে গিয়েছিল, এমন কি তারা শিক্ষার আলোতে আসতে পেরেছিল এবং লেখার জন্য অক্ষর আবিষ্কার করেছিল। যা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো, কালিবন গান, লোথাল, ধলাবিরা, চানহুদারো প্রভৃতি জায়গায় আবিষ্কৃত শীলমোহরে দেখতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এখনও পর্যন্ত এই অক্ষর বা লিপি পড়া সম্ভব হয়নি। তাই এই যুগকে ইতিহাসবিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা প্রায়-ঐতিহাসিক যুগ বলে (Proto-historic age) অভিহিত করেন।

তৃতীয় পর্যায় হল ঐতিহাসিক যুগ—(Historic age) এই যুগে মানুষের অক্ষরের আবিষ্কার, কথ্য ভাষাকে লিখতে ও পড়তে শেখা, বর্তমানে আমরা এই যুগের মধ্যেই আছি। এই যুগের বিভিন্ন লিখিত তথ্য দিয়ে আমরা ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে, গবেষণা করতে পারি। তাই লেখা বা অক্ষর আবিষ্কার নয়, তা পড়তে পারি বলে এটা ঐতিহাসিক যুগ বলে বিবেচিত হয়। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাগৈতিহাসিক, প্রায়-ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক তিনটি যুগেরই প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চা করতে গেলে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ) পূর্ববর্তী অধ্যায়ের এক অস্পষ্ট চিত্র আমরা দেখতে পাই। প্রাগৈতিহাসিক

মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ, শুশুনিয়া অঞ্চল বাঁকুড়া
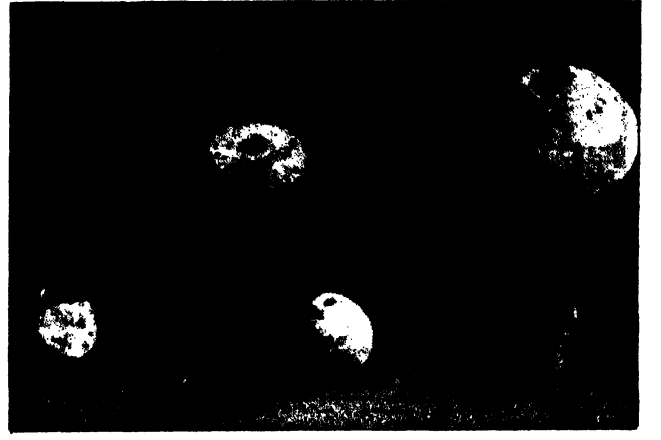
তাম্রাশ্মীয় যুগের পোড়ামাটির পুঁতি

পর্বের ইতিহাস চর্চা খুবই কঠিন, লিখিত কোন তথ্য না থাকায় মূল আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলিই ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চার একমাত্র তথ্য। ১৮৬৫ সালে ভ্যালেনটাইন বল (V. Ball) প্রথম প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর হাতিয়ার আবিষ্কার করেন এবং পরিবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে ভি ডি কৃষ্ণস্বামী, দেবলা মিত্র প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিক বাঁকুড়া জেলার বেশ কয়েকটি অঞ্চল থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন (প্রস্তরায়ুধ) আবিষ্কার করেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলায় প্রাগৈতিহাসিক চর্চার নতুন দিগন্ত শুরু হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধ্যাপক অশোককুমার ঘোষ, দিলীপকুমার চক্রবর্তী, অশোককুমার দত্ত, রূপেন চট্টোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র পাল প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির নতুন নতুন তথ্য উদ্ধারে ব্রতী হন। বর্তমানে এই প্রজন্মের বহু ক্ষেত্রানুসন্ধানী গবেষক, ছাত্র, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ বাঁকুড়ার, প্রাচীন সংস্কৃতি তুলে ধরতে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

এই রচনার মূল বিষয়বস্তু হল বাঁকুড়ার প্রাগৈতিহাসিক আলোকে অতীত কতটা উজ্জ্বল ছিল তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা, তাই প্রথমে প্রস্তর যুগের আবিষ্কৃত তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা মনে হয় প্রাসঙ্গিক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তর যুগ এক বিশাল সময়কাল ধরে চলেছিল, তবুও পুরাপ্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর এই তিন প্রস্তর যুগের ছোট্ট বিভাজন জানা দরকার।

প্রস্তরযুগ

পুরাপ্রস্তর	মধ্যপ্রস্তর	নব্যপ্রস্তর
নিম্ন পুরাপ্রস্তর মধ্যপুরাপ্রস্তর উচ্চপুরাপ্রস্তর		

লৌহযুগ ও বর্তমান

প্রস্তর যুগের প্রতিটি বিভাগের নিদর্শন বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া গেছে। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত বাঁকুড়া জেলার প্রস্তর যুগের নিদর্শনগুলি সামগ্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই রচনায় একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের চোখের সামনে আসে। প্রথমে আবিষ্কৃত প্রস্তর নিদর্শন যে সমস্ত প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।
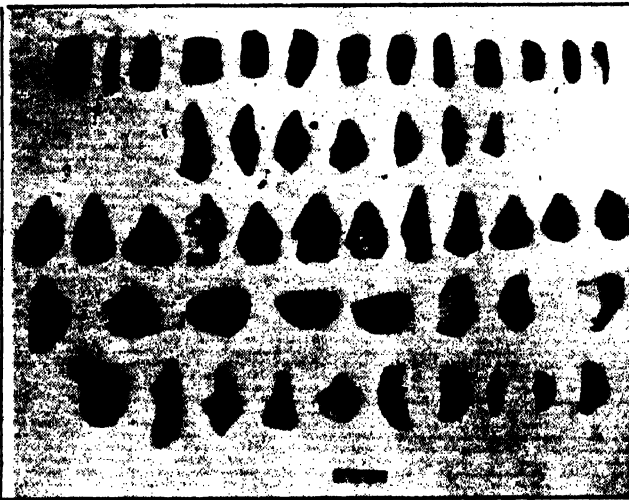
তাম্রাশ্মীয় যুগের লাল কালো মৃৎপাত্র, ডিহর, বাঁকুড়া

প্রত্নস্থল : (১) **আদুরি**— এই প্রত্নস্থলের অবস্থান হল ২৩°-২৭' উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৬°-৫৭' উত্তর দ্রাঘিমাংশ। প্রত্নস্থলটি শালতোড়া থানায় অবস্থিত। এখান থেকে মোট ১৫টি প্রস্তর আয়ুধ পাওয়া গেছে। এগুলির সবকটাই নিম্নপুরাপ্রস্তর যুগের। প্রস্তরায়ুধগুলি কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি। এখানে মধ্যাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের কোনও প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়নি।

(২) **শুশুনিয়া** : প্রত্নস্থলটি ছাতনা থানার অন্তর্গত। তবে শুশুনিয়া বলতে শুশুনিয়া পাহাড় ও সন্নিহিত অঞ্চল বলাই ভাল। এটির অবস্থান হল ২৩°-২৪' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬°-৫৯' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এই পার্বত্য পাদদেশে মোট ৫৪৫টি প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এখান থেকে নিম্ন, মধ্য, উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগের হাতকুঠার, গোলাকৃতি হাতিয়ার, তীরের ফলা প্রভৃতি কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি হাতিয়ার, মধ্যাশ্মীয় লুনেট, ব্লেড প্রভৃতি—চার্ট, অ্যাগেট প্রভৃতি পাথরের তৈরি, নবাশ্মীয় সেল্ট বেলেপাথর ডলোরাইট প্রভৃতি পাথরের তৈরি নিদর্শন পাওয়া গেছে।

(৩) **শিউলিবোনা** : এটি ২৩°-২৪' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬°-৫৯' পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এখানে মোট ৫৭টি প্রস্তর আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যপ্রস্তর যুগ, মধ্যাশ্মীয় (Microlithic) যুগের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন হাতিয়ারগুলি হল—হাতকুঠার, ছেদক, চাঁচনি, তীরের ফলা, ব্লেড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন রকমের পাথর যেমন—কোয়ার্জ, কোয়ার্জাইট, চার্ট, অ্যাগেট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শুশুনিয়া অঞ্চলের প্রায় সব জায়গাতেই এই ধরনের পাথরের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

অন্যান্য প্রত্নস্থল : (৪) শিমুলবেড়িয়া (৫) শালুনি (৬) শালবনি (৭) রতনপুর (৮) রানাগোরা (৯) রামনাথপুর (১০) বন শিমুলিয়া (১১) ফেপসা (১২) রামনগর (১৩) পারুলিয়া (১৪) পারকুল (১৫) পরসীবোনা (১৬) পাহাড়ঘাটা (১৭) পাহাড়বেড়িয়া (১৮) মনোহরা (১৯) জয়পুর (২০) জিরা (২১) করকটা (২২) কেচিন্দা (২৩) খাজুরি, (২৪) খাটমারা (২৫) কুলিয়ারা (২৬) নাটকমলা (২৭) নাঙ্গলা (২৮) নাদিহা (২৯) মুরগাথল (৩০) মাধবপুর (৩১) মেটেলা (৩২) কুলটাকি (৩৩) কুশবোনা (৩৪) মহেশখাপুরী (৩৫) হারোকা (৩৬) যাদবপুর (৩৭) জলজলিয়া (৩৮) জামথল (৩৯) ধাপিল (৪০) গিধুরিয়া (৪১) হাড়িভাঙা (৪২) হাপানিয়া (৪৩) চন্দ্রা (৪৪) ছাতাতলা (৪৫) ধনকোরা (৪৬) বিরিবাড়ি (৪৭) ভরতপুর (৪৮) বেলাকুরি (৪৯) বনশোল (৫০) বাঁশকেটিয়া (৫১) বালিখুন (৫২) বামনডিহা (৫৩) বাঁকাজোড় (৫৪) আদুরি (৫৫) আগায়া (৫৬) আমজোড় (৫৭) বাগডিহা প্রভৃতি।

রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রস্তর যুগের নিদর্শনের ভিত্তিতে ওই যুগের একটি সুন্দর চিত্র আমাদের সামনে আসে। তার মধ্যে পুরাপ্রস্তর (নিম্ন, মধ্য, উচ্চ), মধ্যাশ্মীয়, এবং নবাশ্মীয় যুগের যে যে ধরনের প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তার চিত্রও পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত প্রস্তর নিদর্শন সংখ্যা—৪৯৬৩টি

পুরাপ্রস্তর : (১) নিম্ন পুরাপ্রস্তর—১৬৬৮টি
(২) মধ্য পুরাপ্রস্তর—২১৪টি
(৩) উচ্চ পুরাপ্রস্তর—১৫টি

মধ্যাশ্মীয় : মোট নিদর্শন—৫৮২টি

নবাশ্মীয় : মোট নিদর্শন—৪০টি

পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি হল—হাতকুঠার, চাঁচনি, কাটারি (Cleaver), বোলাস্টোন, তীরের ফলা, ফলা (Blade), ক্ষুদ্র বাটালি (Burin) প্রভৃতি। মধ্যাশ্মীয় হাতিয়ারগুলি—ফলা, তীরের ফলা, বিউরিন, চাঁচনি, ছেদক, ট্রপেজ, অর্ধ চন্দ্রাকার অস্ত্র (Lunate) প্রভৃতি। নবাশ্মীয় হাতিয়ারগুলি হল ছিদ্রযুক্ত গোলাকৃতি আয়ুধ (Ring stone), কুঠার (Celt), ধারালো বাটালি (Adze), মুলার (Muller), শীলনোড়া প্রভৃতি।
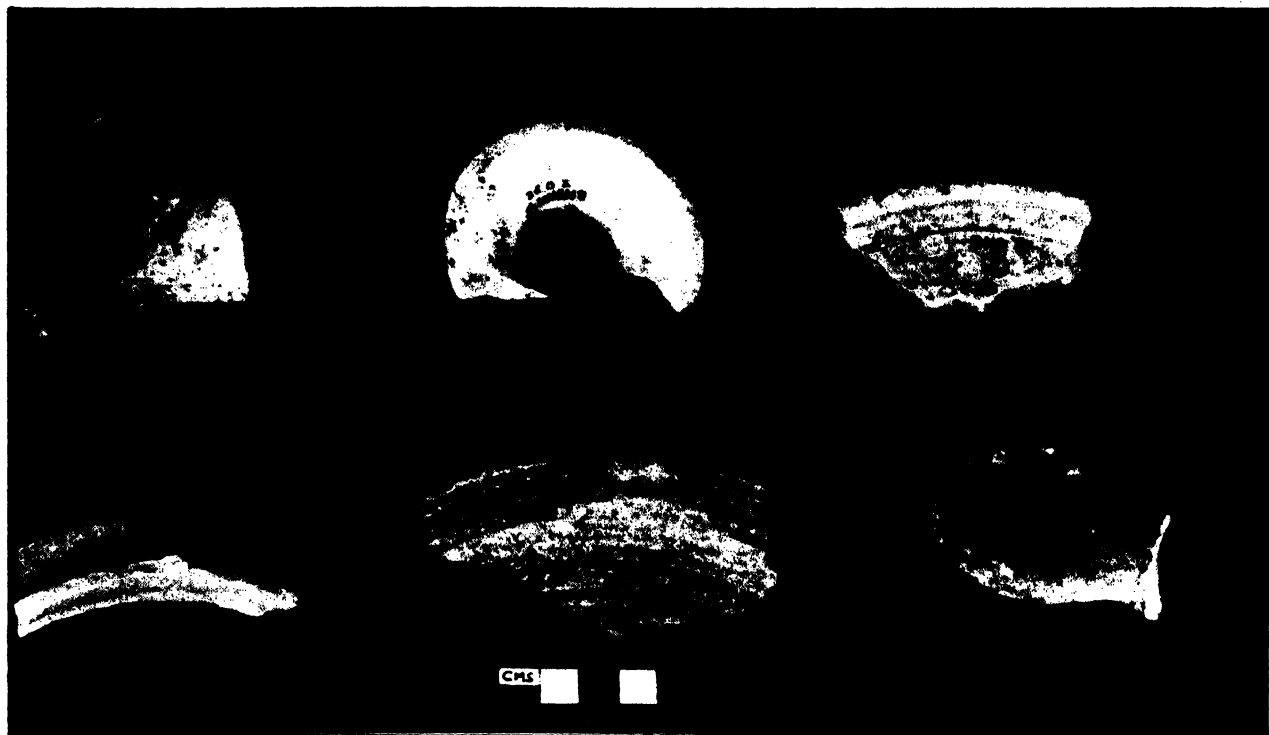
মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ

শতকরা হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধাপ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন বা প্রস্তর হাতিয়ারের নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

পুরাপ্রস্তর যুগ		
	সারণি-১	
নিম্ন পুরাপ্রস্তর	মধ্য পুরাপ্রস্তর	উচ্চ পুরা প্রস্তর
হাতকুঠার-৩৩.১৬%	হাতকুঠার—৩.৬২%	চাঁচনি-০.১০%
চাঁচনি-০.১৪%	চাঁচনি-০.১০%	ফলা / ক্ষুদ্র বাটালি-০.১২%
কাটারি-০.০৪%	তীরের ফলা-০.৪৮%	হাতকুঠার-০.০৮%

সারণি-২		
মধ্যাশ্মীয়	নবাশ্মীয়	অন্যান্য প্রস্তরায়ুধ
ফলক-৪.৩৫%	রিং স্টোন-০.৯৮%	ফলক/ পাত-২৭.২২%
তীরের ফলা-২.৩৫%	কুঠার-০.০৬%	কোর-৭.৯৭%
ক্ষুদ্র বাটালি-০.১৪%	বাটালি-০.০৬%	অন্যান্য-১৩.৯৬%
চাঁচনি-৩.৯২%		
ছেদনি-০.২৬%		
ট্রপেডা-০.১২%		
অর্ধ চন্দ্রাকার অস্ত্র-০.১২%		

রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় বাঁকুড়া থেকে আবিষ্কৃত মোট প্রত্নবস্তুর সংখ্যা এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ অনুযায়ী নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হল :

সারণি-১		
	পুরাপ্রস্তর	
নিম্ন পুরাপ্রস্তর	মধ্য পুরাপ্রস্তর	উচ্চ পুরাপ্রস্তর
হাতকুঠার-১৬৪৬টি চাঁচনি-৭টি কাটারি-২টি গোলাকৃতি, প্রত্নবস্তু-১৩টি	হাতকুঠার-১৮০টি তীরের ফলা-২৪টি চাঁচনি-১০টি	তীরের ফলা-৪টি চাঁচনি-৫টি ফলা/ ক্ষুদ্র বাটালি-৬টি
মোট-১৬৬৮টি	মোট-২১৪টি	মোট-১৫টি

মধ্যাশ্মীয়	নবাশ্মীয়
ফলা-২১৬টি তীরের ফলা-১৪৫টি ক্ষুদ্র বাটালি-৭টি চাঁচনি-১৯৫টি ছেদনি-১৩টি ট্রপেজ/অর্ধ চন্দ্রাকার অস্ত্র-৬টি	গোলাকার ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর নিদর্শন-৩৭টি (Ring Stone) কুঠার/বাটালি-৩টি
মোট-৫৮২টি	মোট-৪০টি

প্রথমদিকে মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনীতি মূলত শিকার এবং খাদ্য আহরণ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এই সময়ে মানুষ সমাজবদ্ধতা বা উন্নত কারিগরি কৌশলও জানত না। শুধুমাত্র তারা হাতের কাছে পাওয়া পাথরের ব্যবহার জানত, অন্য কোনও ধাতুর ব্যবহার জানত না। পাথর দিয়ে হাতিয়ার বানাত এবং এই পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার, গাছপালার মূল, কাণ্ড থেকে খাদ্য আহরণ করত। এই পর্যায়ের শেষের দিকে এই পাথরের সাহায্যেই আরও উন্নত প্রযুক্তির শিক্ষা নেয় এবং তাদের জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এই যুগ হল নব্য প্রস্তর যুগ

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি দেখলে বোঝা যায় যে অ্যাবিভেলীয় এবং এ্যাসুলীয় দুই প্রকার প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রস্তর যুগের পরবর্তী যুগ হল তাম্রাশ্মীয় (Chalcolithic) যুগ এই যুগেও বাঁকুড়ায় গ্রামভিত্তিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থলগুলি হল, ডিহর, তুলসীপুর, পোখরনা, চিয়াদা, দেউলডাঙ্গা, কুমারডাঙ্গা, সড়ক ডিহি প্রভৃতি।

ডিহর (DIHAR) :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ অনিলচন্দ্র পালের নেতৃত্বে বাঁকুড়ার এই গ্রামে প্রায় ৮ বছর যাবৎ উৎখনন ও অনুসন্ধান কার্য চলে। এই উৎখনন ও অনুসন্ধানের ফলে বাঁকুড়ার এই গ্রামে আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে একটি গ্রামকেন্দ্রিক তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। শুধুমাত্র তাম্রাশ্মীয় সভ্যতাই নয় তার পরবর্তী লৌহ যুগের সূচনাকালও এখানে ধারাবাহিকভাবে হয়েছিল, আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু থেকে প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক পাল তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় বাঁকুড়ার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বকে বিকশিত করেছিলেন।

বিষ্ণুপুর সোনামুখী রাস্তায় বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় সাড়ে ছ কিলোমিটার দূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর পাড়ে জয়কৃষ্ণপুর, সেখান থেকে প্রায় ৫ কিমি গেলে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ডিহর গ্রাম (জে এল নং-১৩৬)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখানে ব্যাপকভাবে প্রায় ৮ বছর খনন চালায় যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ পাল ডিহরে তিনটি সাংস্কৃতিক পর্যায়ের বিভাজন প্রমাণ করেছেন। প্রথম পর্যায় (Phase-I) হল তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির, এই স্তরে কালো ও লাল চিত্রিত ও চিত্র ছাড়া (BRW) সঙ্গে মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ, তামা ও হাড়ের তৈরি বিভিন্ন ধরনের জিনিস ও আয়ুধ পেয়েছেন। এই স্তরে তিনি লোহার ব্যবহারের কোনও হদিস পাননি। কোনও রকম সংস্কৃতি বিরতি ছাড়া
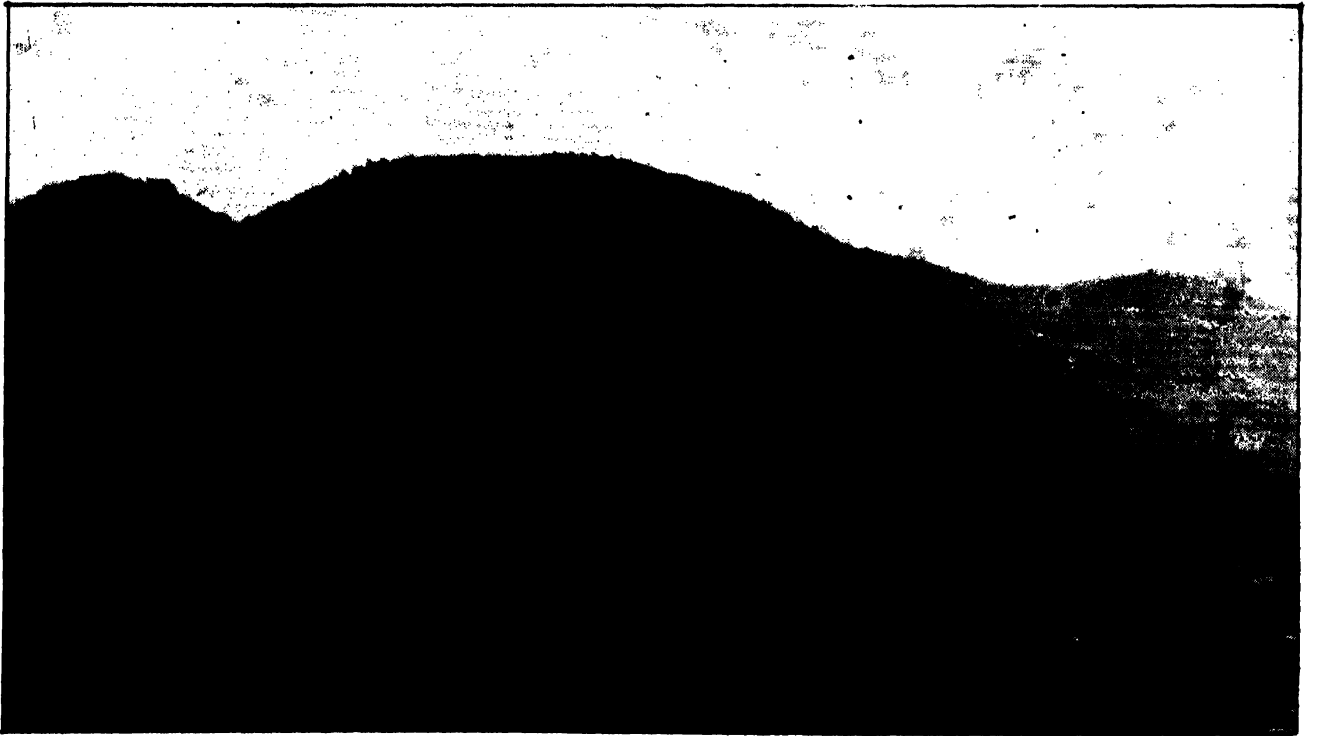
শুশুনিয়া পাহাড়
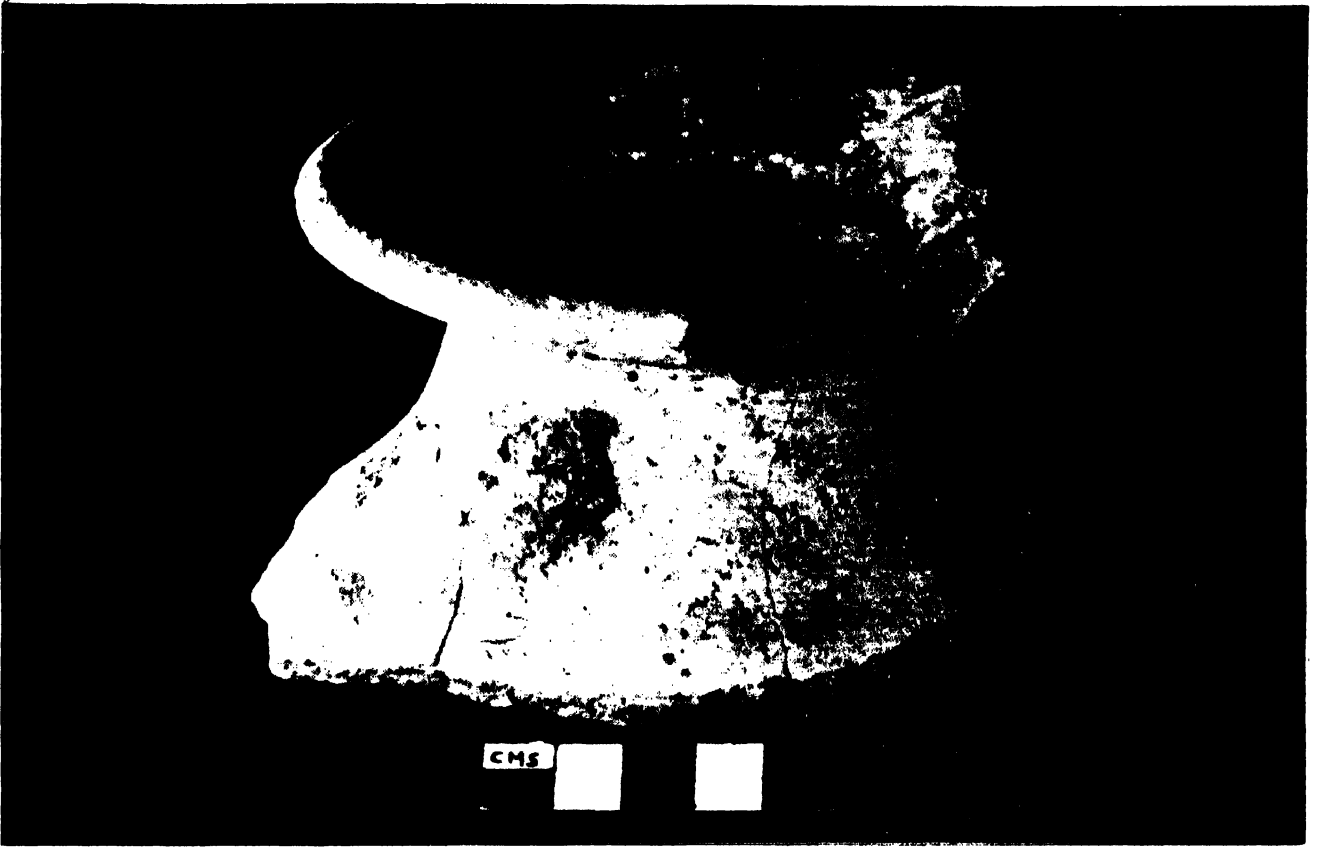
মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, ডিহর, বাঁকুড়া

তিনি ২য় পর্যায়ে Phase-II-তে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভকালের (শুঙ্গ-কুষাণ) হদিস পেয়েছেন। এই স্তরে তিনি লৌহ ব্যবহারের প্রারম্ভিক পর্যায়ের কথা বলেছেন। লোহার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের শুঙ্গ-কুষাণ মৃৎপাত্র, তাম্রমুদ্রা, বিভিন্ন রকমের পাথরের তৈরি পুঁথির উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে বা Phase-I-এ তিনি লোহা বা উত্তর ভারতীয় কালো পালিশ করা (NBPW) মৃৎপাত্রের হদিস পাননি। তিনি চিরান্দ, সোনপুর, মহিষদল, তুলসীপুরে যেভাবে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির পর লৌহ যুগের সূচনা হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই ডিহরেও তার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল বলে জোরালো দাবি পেশ করেন। দুর্ভাগ্যবশত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ৮ বছরের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল তিনি তুলে দিয়ে গেলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ডিহরে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু ও তাঁর গবেষণার কাগজপত্র এখনও প্রকাশনা বা প্রত্নবস্তু নথিভুক্তকরণ হয়নি, তার একমাত্র কারণ তিনি ১৯৯৯ সালের ২৯ মে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীরাও এ বিষয়ে নীরব রয়েছেন ! প্রায় ৩০০০ বছর আগেকার যে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা দ্বারকেশ্বর নদের তীরে গড়ে উঠেছিল—এই উৎখননের ফলে আমরা জানতে পারি। ডিহর সংক্রান্ত তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান উপাদান।

ডিহরে অন্য দুই প্রত্ন নিদর্শন হল ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবমন্দির। দুটি মন্দিরই বাঁকুড়া জেলার অন্যতম সেরা পুরাকীর্তি। ষাঁড়েশ্বর মন্দির আয়তনে বড় উদ্গত অংশ বাদ দিয়ে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯ ফুট (৫.৮ মিটার) আর দক্ষিণদিকের শৈলেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ মাপ (৪.৫ মিটার)। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এই দুটি মন্দির চতুর্দশ শতাব্দীর মল্লনৃপতি পৃথ্বী মল্লর সময়কালের বলে এক জোরালো সমর্থন মেলে। এই রচনাটি মূলত প্রাগৈতিহাসিক হওয়ায় মন্দির নিয়ে বেশি আলোচনা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে।

তুলসীপুর

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের ভূতপূর্ব পূর্ব চক্রের সহকারী অধীক্ষক এম ডি খারে ও অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মিসেস জুডি বার্ণিংহামের পরিচালনায় ১৯৬৮ সালে উৎখনন করা হয়। এই প্রত্নস্থলের তিনটি পর্ব লক্ষ করা গেছে। প্রথম দুটি লৌহযুগের ও ২য় পর্ব থেকে অল্প কিছু লাল-কালো ও লাল রঙের মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলি তাম্রপ্রস্তর যুগের (Chalcolit hic) বলে মনে হয়। তৃতীয় পর্ব হল কুষাণ ও তার পরবর্তী যুগের।

উপসংহার : পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব ও মানব সভ্যতার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আলোচনায় যে কয়েকটি তথ্য বেরিয়ে আসে, তারমধ্যে প্রথমত দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলা বিশেষত মেদিনীপুর, বীরভূম,
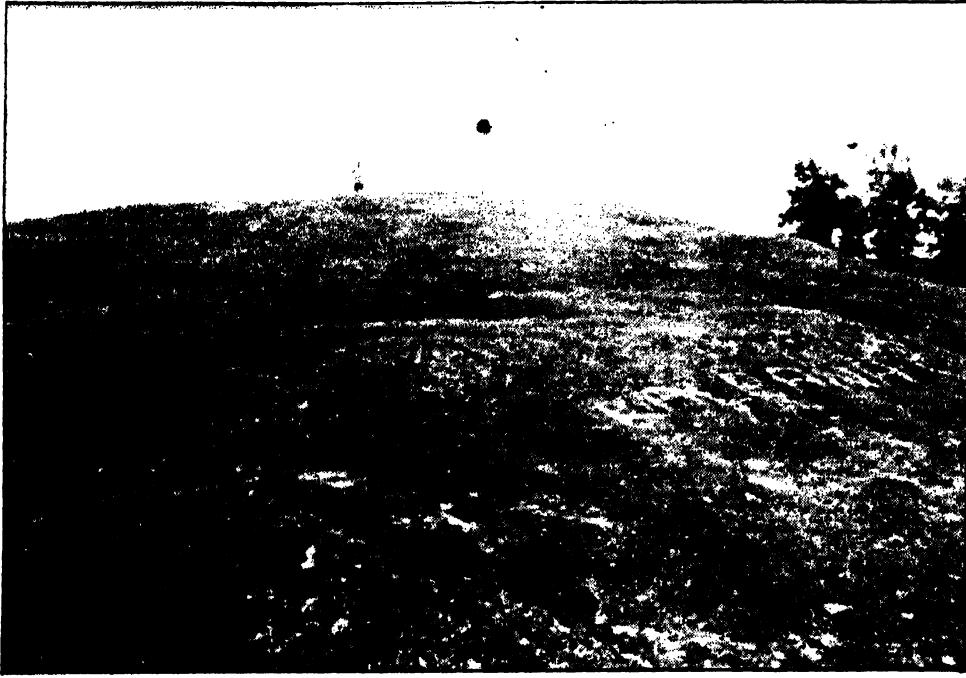
সোনামণি পাহাড়, খাতড়া

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার পীঠস্থান (প্রস্তর যুগ থেকে—তাম্রাশ্মীয় ও তার পরবর্তী)। দ্বিতীয়ত দার্জিলিং জেলা, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় নবাশ্মীয় সংস্কৃতি বিকাশ ঘটেছিল তার পক্ষেও পণ্ডিতবর্গের মতামত প্রায় এক।

তৃতীয়ত উত্তরবঙ্গের মালদা, দিনাজপুর (পূর্ব এবং পশ্চিম), খ্রিস্টিয় নবম ও তার পরবর্তী (পাল, সেন, মুসলমান) সভ্যতার বিকাশ ঘটার এক পরিষ্কার চিত্র মেলে। তেমনি মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা, (উত্তর ও দক্ষিণ) বিভিন্ন জেলায় খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী থেকে তার পরবর্তী সাংস্কৃতিক পর্যায়ের এক পরিষ্কার চিত্র আমাদের সামনে আসে। বাঁকুড়া জেলা রাঢ় বাংলার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। এই জেলায় মানুষের বসবাস আজ থেকে প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে ঘটেছিল। তাই আমাদের কাছে এই জেলার প্রকৃত ইতিহাস জানার জন্য আরও অনেক কাজ করতে হবে। এ পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ও বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছে এবং আগামীদিনে আরও উদ্যোগ নেবে যা থেকে ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব অনুরাগী গবেষক ছাত্র এবং পণ্ডিতবর্গের কাছে নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হবে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা চিত্ররেখা গুপ্ত, মল্লার মিত্র, রূপেন চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ পণ্ডিত বাঁকুড়া জেলার পোখরনা প্রত্নস্থলে উৎখনন চালিয়ে যাচ্ছেন, এর থেকেও নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হবে এবং বাঁকুড়া জেলার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চায় এবং বাংলার ইতিহাসে বাঁকুড়া নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হবে। এটাও আশা রাখি।।

তথ্যসূত্র ::

১। **পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত**—1963 Archaeological Discovery in W.B.

২। **দিলীপকুমার চক্রবর্তী**—Litthic Industry of Bankura, **Pratnasamiksha 2 & 3.**

৩। **অনিলচন্দ্র পাল, প্রকাশ মাইতি প্রমুখ**—Pre-history of Susunia Hill **complex & Suvarnarekha Valley**

৪। **রূপেন চট্টোপাধ্যায়**—Palaeolithic West Bengal, Pratnasamiksha **Vol-I**

৫। **প্রত্নতত্ত্ব অধিকার—প্রত্নসমীক্ষা**—I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

৬। **সঙ্কর্ষণ রায়-ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিম বাংলা-পঃ রাঃ পুঃ পঃ**

৭। **পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত—প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া**

৮। A. Ghosh An Encyclopedia of Indian Archaeology.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সাগর চট্টোপাধ্যায়, অমল রায়, অঞ্জন দাস, সুব্রত নন্দী, শিহরণ নন্দী, প্রতীপকুমার মিত্র, বাদলচন্দ্র দাস, দিলীপ দত্তগুপ্ত, সুমিতা গুহসরকার, মিন্টু চক্রবর্তী প্রমুখ।

অঙ্কন : লেখক

ছবি : লেখক ও রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ের সৌজন্যে।

লেখক পরিচিতি

প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকারের অনুসন্ধান সহায়ক (Exploration Asstt.) পদে কর্মরত।

বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি : নানা প্রসঙ্গ

কান্তি হাজরা

মল্লরাজাদের কীর্তিভূমি মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত মন্দিরগুলির সমগোত্র কয়েকটি পুরাকীর্তি স্বাতন্ত্র্যে বিদ্যমান। রাজধানী বিষ্ণুপুর যে গড় ও পরিখাবেষ্টনে সুরক্ষিত ছিল তার চিহ্ন এখনও দুর্লক্ষ্য নয়। রাজবাড়ির উত্তরে এমন দুটি প্রবেশদ্বার—পাথর দরজা ও গড় দরজা।

বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি প্রধানত মন্দিরকেন্দ্রিক। মল্লরাজবংশের আনুকূল্যে বাংলার মধ্যযুগে নির্মিত বিষ্ণুপুরের কয়েকটি টেরাকোটা খচিত মন্দির এবং জেলারঅন্যত্র ইতস্ততবিকীর্ণ পাথর, ইট বা ল্যাটেরাইটের দেউল মন্দিরগুলিকেই সাধারণত পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ জোড়বাংলো শ্যামরাই (পঞ্চরত্ন বা পাঁচকুড়া) কালাচাঁদ মদনমোহন ইত্যাদি মন্দিরগুলি বাদ দিলে জেলার অন্যত্র সোনামুখী ডিহর ধরাপাট এক্তেশ্বর বহুলাড়া সোনাতপন ঘুটগেড়িয়া অম্বিকানগর দেউলভিড্যা ইত্যাদি স্থানে অনেকগুলি মন্দির দেউল দেবালয় এ জেলার মূল্যবান প্রত্নসম্পদ। কিন্তু ডব্লু ডব্লু হান্টার, এল এস এস ও ম্যালি, জে ডি বেগলার প্রমুখ বিদেশি পণ্ডিতদের সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার ও অন্যান্য গ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র মজুমদার, নির্মলকুমার বসু, সরসীকুমার সরস্বতী, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাককাঞ্চন, তারাপদ সাঁতরা, মানিকলাল সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক, অন্বেষক এবং গবেষকদের নিরলস সারস্বত চিন্তাচর্চায় বাঁকুড়ার পুরাকীর্তির আয়তন আলোকিত হলেও অনালোকিত অঞ্চলের পরিমাণও কম নয়। এ জেলার মন্দির ব্যতিরেক পুরাকীর্তিগুলিরও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এবং ইতিহাস রচনাও প্রত্যাশিত। বিচ্ছিন্ন বা স্বউদ্যোগে অন্বেষায় নিরতজনের সমস্যাও সহজেই অনুমেয়।

বাঁকুড়ার মন্দিরের পুরাকীর্তির তালিকায় নিঃসন্দেহে শীর্ষনাম শুশুনিয়ার শিলালেখ। শিলালিপিটি বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক যুগের সর্বাধিক প্রাচীন প্রত্ননিদর্শন।

শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথরে জীবাশ্মে বাঁকুড়া তথা রাঢ়ের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের বর্ণমালা স্পষ্ট অথবা প্রচ্ছন্ন। বিন্ধ্য পর্বতমালা ভারতের সর্বোচ্চ ভূভাগ। এর উত্তরে আর্যাবর্তের শেষে হিমালয় পর্বতমালা। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি কঠিন আগ্নেয় শিলায় রচিত সুপ্রাচীন গাণ্ডোয়ানাভূমির অংশ। ভূবিজ্ঞানীরা বিন্ধ্যসহ দাক্ষিণাত্যকে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে এক মহাদেশীয় বন্ধনে আবদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এই গাণ্ডোয়ানাভূমির নিরিখেই। এই গাণ্ডোয়ানাভূমির মৃৎ পর্যায় অর্থাৎ পাললিক শিলার স্তর বাঁকুড়ার উত্তরে মেজিয়া ও বিহারীনাথ পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলাস্তর কোয়ার্টসাইট বা সাদা স্টফিক পাথরে গড়া যা গাণ্ডোয়ানা পর্যায়ের এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। বাঁকুড়া ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্বাংশ। বাঁকুড়ার রূপান্তরিত শিলাস্তর গ্রানিট গ্রাফাইট কোয়ার্জ দ্বারা খণ্ডিত। কোথাও শ্লেট পাথর বা মৃৎ লোহাপাথরেরও সন্ধান মেলে। আগ্নেয় যুগের পাথর সুদূর মানব ইতিহাসের সন্ধান করা যায়। শুশুনিয়া আদি নিয়ানডারথাল মানবগোষ্ঠীর বিচরণভূমি ছিল বলে আজকের প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা। এই আদি নিয়ানডারথাল মানবের সন্ধান ফ্রান্স জার্মানি যুগোশ্লাভিয়া বেলজিয়াম ইরাকের সঙ্গে শুশুনিয়ায় মিলেছে। এদের উত্তরপুরুষ চতুর্থ হিম যুগের (এক লক্ষ বছর আগে) প্রথম পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়েছিল। এ সময় লোমশ মহাগজ, গণ্ডার, বাইসন, হায়না ও বুনো ঘোড়ার রাজত্ব ছিল শুশুনিয়ার বিশাল প্রান্তর। সেখানে নিয়ানডারথাল মানুষেরা এইসব অতিকায় জন্তু শিকারের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। শুশুনিয়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি প্রস্তর আয়ুধের নির্মাণ কৌশল, মহাগজের শিলীভূত কঙ্কাল ইত্যাদি থেকে অনুমান করা যায় এখানে যে জনগোষ্ঠীর ইঙ্গিত তারা সম্ভবত তৃতীয় হিম যুগে অর্থাৎ দু' লক্ষ পঁচিশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর আগে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। কারণ মহাগজ চতুর্থ হিমযুগের প্রথম পর্যায়ে লুপ্ত হয়। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া দ্বারকেশ্বর কাঁসাই ও কুমারী নদীর উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনযাপনের নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাঁকুড়া শহর থেকে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রাস্তায় প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ছাতনা, সেখান থেকে উত্তরে মোটামুটি ১০ কিলোমিটার দূরত্বে শুশুনিয়া পাহাড়। ১৪৪২ ফুট (৪৪০ মিটার) উঁচু ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় দু মাইল (৩.২ কিলোমিটার) বিস্তৃত এ পাহাড়ের উত্তরাংশে সমতল উপত্যকা থেকে কিছু উঁচুতে পাথরের ওপারে উৎকীর্ণ শিলালেখটি এ রাজ্যের অনুরূপ প্রত্ন নির্দশনের ক্ষেত্রে অসামান্য গুরুত্বসম্পন্ন।

লিখন দুটি নিম্নরূপ :

প্রথম লিপি : চক্রস্বামিন দাসাগ্রেনাতি সৃষ্ট পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিংহবর্মনস্য পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণ দৃতি।

দ্বিতীয় লিপি : চক্রস্বামিনো ধে
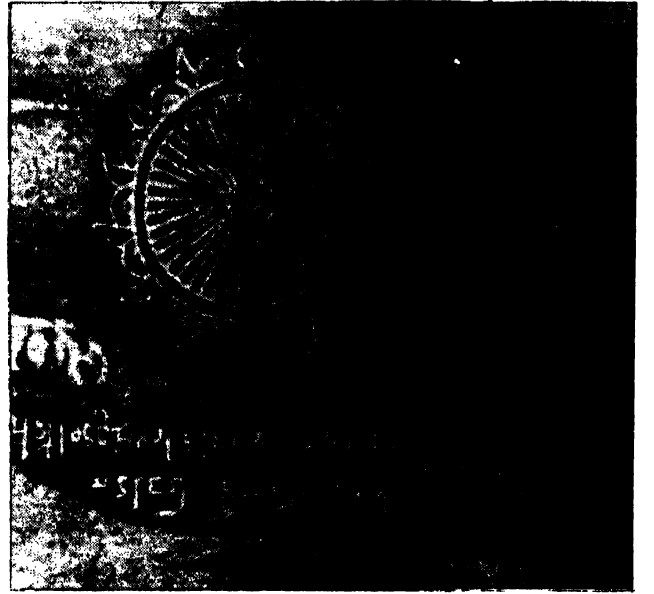
ছবি : নিত্যগোপাল ঘোষ

সংস্কৃত ভাষায় ও গুপ্তলিপিতে উৎকীর্ণ এই লিপি দুটি বঙ্গার্থ মোটামুটি—চক্রধারী দেবতার মুখ্য সেবক পুষ্করণার অধিপতি শ্রীসিংহ বর্মনের পুত্র শ্রীচন্দ্রবর্মন কোনও কীর্তি উৎসর্গ করলেন। পরের লিপিটির অর্থ ধোসো গ্রাম চক্রস্বামীকে উৎসর্গ করা হল। বিষ্ণুই চক্রস্বামী। লিপিসংলগ্ন উৎকীর্ণ একটি চক্র উৎকীর্ণ। সুচারু বৃত্তের মধ্যে অগ্নিশিখা। লিপি সংলগ্ন উৎকীর্ণ একটি চক্র উৎকীর্ণ। সুচারু বৃত্তের মধ্যে অগ্নিশিলা। শিলালিপিবর্ণিত পুষ্করণা, চন্দ্রবর্মা ইত্যাদি

অপরূপ শুশুনিয়া

নিয়ে গবেষণা বিতর্ক এখনও সমাপ্ত হয়নি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত এক লিপিতে (মান্দাসোর) উল্লিখিত সিংহবর্মার পুত্রই শুশুনিয়া লিপির চন্দ্রবর্মা এবং শুশুনিয়া লিপির পুষ্করণা রাজপুতানার পোখরণ অভিন্ন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুসারী ঐতিহাসিকদের ধারণা শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পূর্বে প্রাচীন জনপদ দামোদর তীরস্থ পখন্না গ্রামই শুশুনিয়া শিলালিপির পুষ্করণা। রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুমান শুশুনিয়া লিপির চন্দ্রবর্মা পূর্ববঙ্গে কোটালিপাড়া দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুশুনিয়া প্রত্নলেখের মহারাজা চন্দ্রবর্মাই দিল্লির মেহরৌলি লৌহস্তম্ভের চন্দ্র যিনি বাংলার সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে শুশুনিয়া পর্বত গাত্রে তাঁর লিপি উৎকীর্ণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের নরপতিদের একটি প্রচলিত রীতি অভিন্ন পুরপতি কর্তৃক অভিন্ন নামের একাধিক রাজধানী বা দুর্গ প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে রাজপুতানার পোখরণ চন্দ্রবর্মার মূল রাজধানী, অভিন্ন নামের দ্বিতীয় রাজধানী বাঁকুড়ার দামোদর তীরবর্তী পুষ্করণা বা পখন্না।

বাঁকুড়া পুরুলিয়ার অনতিলক্ষ্য স্বল্পালোচিত মূল্যবান পুরাকীর্তি বীরস্তম্ভ—Megalith. এগুলি প্রকৃতপক্ষে সমাধিপ্রস্তর। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা, দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী দেউলভিড়া, ইন্দপুর থানার বাজোড়ো, মগুলকুলি, কাপিষ্ঠা ইত্যাদি স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক বীরস্তম্ভ দেখা যায়। সাধারণত একটি প্রস্তর ফলক খাড়াখাড়ি মাটিতে পুতে দেওয়া হত মৃতের সমাধিস্থলে। কখনও একাধিক প্রস্তরফলক দিয়ে খিলানের আঙ্গিকেও এইসব সেগুলিও দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে বীরস্তম্ভগুলি নির্মাণে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। লম্বা পাথরের ফলকের ওপরের দিকে রিলিফ পদ্ধতিতে খোদাই করা মানুষের মূর্তি উৎকীর্ণ—মূর্তির হাতে ঢাল, তরবারি, ধনুক, তীর। এইসব মেগালিথের অনেকটা অংশ মাটির নিচে থাকে। ছাতনার কামারকুলির বটতলায় যে তিনটি বীরস্তম্ভ রয়েছে তার উল্লেখ বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দুটি মূর্তির বাঁ হাতে ঢাল এবং ডান হাতে দীর্ঘ তরোয়াল। মধ্যবর্তী মূর্তিটির বাঁ হাতে ধনুক এবং ডান হাতে উত্তোলিত তীর। ইন্দপুর থানার বাজোড়া গ্রামের মেগালিথে লাগাম হাতে ধাবমান অশ্বারোহীর মূর্তি উৎকীর্ণ। এর মাথায় ভগ্ন সিংহমূর্তি থেকে এর সিংহচূড় অনুমান করা যায়। গঙ্গাজলঘাটি থানার থুমকোড়া গ্রামে একটি পুকুর প্যাড়ে গোল থামের আকারের অনেকগুলি পাথর প্রোথিত দেখা যায়। গাত্রে নানা ভঙ্গির যোদ্ধার মূর্তি খোদিত। এগুলির মাথায় সিংহমূর্তি ছিল অনুমান করা যায়। ইন্দপুর থানার বাঁশি গ্রামের বীরস্তম্ভ জাতীয় পাথর বরকনে পাথর হিসেবে খ্যাত। এদের একটি পাথর নিঃসঙ্গ বাকি তিনটি জোড়া। বরকনে পাথর নিয়ে কিংবদন্তীও প্রচলিত। পাথরগুলির আকৃতি দেখে গবেষকেরা লিঙ্গ পূজার সন্ধান করেছেন। বাঁকুড়া শহরসহ জেলার অন্যত্র অনুরূপ পুরাকীর্তির সন্ধান করা যেতে পারে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে এই বীরস্তম্ভ Megalith বা Menhir প্রকৃতপক্ষে সমাধিক্ষেত্র। এগুলি 'প্রস্তর-স্মৃতিস্তম্ভ যুগের নিদর্শন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।' নব্যপ্রস্তর যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে সভ্যতার বিকাশ তার একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল মৃতদেহের ওপর ভারী এবং বিশালকায় পাথর সাজিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। সম্ভবত

জয়পুরের অদূরে সিমাফোর স্তম্ভ

শুশুনিয়া আদি নিয়ানডারথাল মানবগোষ্ঠীর বিচরণভূমি ছিল বলে আজকের প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা। এই আদি নিয়ানডারথাল মানবের সন্ধান ফ্রান্স জার্মানি যুগোশ্লাভিয়া বেলজিয়াম ইরাকের সঙ্গে শুশুনিয়ায় মিলেছে। এদের উত্তরপুরুষ চতুর্থ হিম যুগের (এক লক্ষ বছর আগে) প্রথম পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়েছিল। এ সময় লোমশ মহাগজ, গণ্ডার, বাইসন, হায়না ও বুনো ঘোড়ার রাজত্ব ছিল শুশুনিয়ার বিশাল প্রান্তর। সেখানে নিয়ানডারথাল মানুষেরা এইসব অতিকায় জন্তু শিকারের কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

মৃতজনকে সমাধিস্থ করার স্থান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে এই রীতি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স স্কান্ডিনেভিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং নির্মাণের রীতি ও আঙ্গিকের কাঙ্খিত পরিবর্তন সূচিত হয়। এই জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভগুলি বিভিন্ন দেশে নানা নামে পরিচিত যেমন Giants tomb, Dolmen, Menhir ইত্যাদি। ইস্টার দ্বীপে অনুরূপ স্মৃতিস্তম্ভের অস্তিত্ব ও সেখানকার নৃতাত্ত্বিক নানা উপাদানের সঙ্গে মানভূম বাঁকুড়ার সমাধিক্ষেত্র ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাদৃশ্য থেকে মানভূম জেলার গেজেটিয়ার (১৯০৮) সম্পাদনার সময় এই দুই অঞ্চলের সম্পর্কের কথা বলেছিলেন। হো মুণ্ডা এবং ভূমিজদের মধ্যেও সমাধির ওপর খাড়াখাড়ি পাথর পুঁতে রাখার রীতি প্রচলিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে রাজা দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থলের বর্ণনা স্মরণ্য। গবেষকদের অনুমান নিষাদজাতির স্তম্ভাগারের ক্রমবিবর্তিত রূপ এই বীরস্তম্ভ বা মেগালিথ।

বাঁকুড়া জেলার জয়পুর, রামসাগর, ওন্দা ছাতনা ও আরড়ায় ইটের তৈরি গোলাকার চারতল বিশিষ্ট কয়েকটি স্তম্ভ জীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি মাচান বলে পরিচিত এবং এক সময় ধারণা ছিল, স্তম্ভগুলি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের তৈরি পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ বা observation tower. কিন্তু ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ও' ম্যালির বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত পথের প্রতি ৮ মাইল ব্যবধানে ১০০ ফুট উঁচু স্তম্ভ নির্মাণ করে তাদের শীর্ষ থেকে সিমাফোর (semaphore) সংকেতের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণের যে প্রকল্প তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেছিল, এগুলি তারই স্মৃতিবাহী। বাঁকুড়া শহরের কেন্দ্রস্থল মাচানতলায় অনুরূপ একটি স্তম্ভ অনতি অতীতেও দৃশ্যমান ছিল। ১৮৫১ সালে আমাদের দেশে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ কলকাতা ও ডায়মন্ডহারবারের মধ্যে বসানো হয়েছিল। তার আগে দূর সংযোগের ক্ষেত্রে যে সংকেত পদ্ধতি ব্যবহৃত হত তাকে Semaphore বলা হয়। ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির সূচনা হয় ১৮১৩ কলকাতা থেকে চুনার এবং কলকাতা থেকে সাগরের মধ্যে। ভারতীয় টেলিগ্রাফের শতবর্ষ পূর্তির স্মারক গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ—Pillars 18 ft. square and 30 ft. high were

constructed at 20 miles intervals and the signals by means of a rotating triangle were read by telescopes. The 'telegraph' was working between Calcutta and Chunar on the side and Calcutta and Sanger on the other. No public message were Carried over this 'telegraph' which was started in 1813 and Continued off and on till the Electric Telegraphs were introduced. জানা গিয়েছে, টাওয়ার পিছু একজন 'টিন্ডাল' ও পাঁচজন 'লসকর' বার্তা প্রেরণের কাজে নিযুক্ত থাকত। একজন 'অপারেটর'ও থাকতেন। দূরবীণের সাহায্যে পূর্ববর্তী টাওয়ার প্রেরিত অক্ষর দেখে তা পরবর্তী টাওয়ারকে একই পদ্ধতিতে প্রেরণ করা হত। এইভাবে রিলে পদ্ধতিতে প্রেরক স্টেশনের বার্তা গন্তব্যে পৌঁছে যেত। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ৩৫০ মাইল দূরবর্তী চুনারে বার্তা প্রেরণে ৫০ মিনিট সময় লাগত। তবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এই সংকেত প্রেরণের কাজ যে বিঘ্নিত হত তা অনুমান করা যায়। টেলিগ্রাফ শব্দটি সে সময় সিমাফোর পদ্ধতিতে সংবাদ প্রেরণকে বোঝাতে বলে পুরনো মানচিত্রে এই স্তম্ভগুলিকে Telegraph Station হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। হুগলি হাওড়া বাঁকুড়া ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে এইসব স্তম্ভ নির্মিত হবার পর তারবার্তা প্রেরণের আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও গৃহীত হলে পুরনো প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়।...The system of communication proved failore and was abandoned before 1830.... অধুনা বাঁকুড়ার নানাস্থানে উন্নতশীর্ষ মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ইন্টারনেটসহ দূর সঞ্চারের আধুনিক নেটওয়ার্ক নিয়ে এ জেলার মানুষ যখন সারা পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী তারই পাশে দূর সংযোগের পুরনো ও পরিত্যক্ত পদ্ধতির স্মৃতিচিহ্ন উল্লেখ প্রত্নসম্পদরূপে বিরাজিত।

গঙ্গাজলঘাটি থানার থুমকোড়া গ্রামে একটি পুকুর পাড়ে গোল থামের আকারের অনেকগুলি পাথর প্রোথিত দেখা যায়। গাত্রে নানা ভঙ্গির যোদ্ধার মূর্তি খোদিত। এগুলির মাথায় সিংহমূর্তি ছিল অনুমান করা যায়। ইন্দপুর থানার বাঁশি গ্রামের বীরস্তম্ভ জাতীয় পাথর বরকনে পাথর হিসেবে খ্যাত। এদের একটি পাথর নিঃসঙ্গ বাকি তিনটি জোড়া। বরকনে পাথর নিয়ে কিংবদন্তীও প্রচলিত। পাথরগুলির আকৃতি দেখে গবেষকেরা লিঙ্গ পূজার সন্ধান করেছেন।

বাঁকুড়া শহরের বীরস্তম্ভ। ছবি সত্যগোপাল ঘোষ

মল্লরাজাদের কীর্তিভূমি মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত মন্দিরগুলির সমগোত্র কয়েকটি পুরাকীর্তি স্বাতন্ত্র্যে বিদ্যমান। রাজধানী বিষ্ণুপুর যে গড় ও পরিখা বেষ্টনে সুরক্ষিত ছিল তার চিহ্ন এখনও দুর্লক্ষ্য নয়। রাজবাড়ির উত্তরে এমন দুটি প্রবেশদ্বার—পাথর দরজা ও গড় দরজা। শত্রুর পক্ষে দুটি দুর্ভেদ্য দরজা অতিক্রম করে তবেই রাজপুরীতে প্রবেশ সম্ভব ছিল। দুটি নির্মাণেই মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ। এ দুটি মল্লরাজাদের চরমোন্নতির যুগে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান। রাজবাড়ির দক্ষিণে ইঁটের তৈরি সুউচ্চ চৌবাচ্চার আকৃতির একটি নির্মাণ কৌতূহলোদ্দীপক। গুমঘর (গুমগড়) নামে খ্যাত এই চৌব্বাচায় নাকি দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের নিক্ষেপ করা হত।

প্রসঙ্গত বিষ্ণুপুরের পাথরের রথের উল্লেখ অনিবার্য। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা পাথরের রথ তৈরি করিয়েছিলেন। ইতিহাসবিশ্রুত ও কিংবদন্তীখ্যাত জলাশয় লালবাঁধের দক্ষিণে কালাচাঁদ মন্দিরের কাছাকাছি পাথরের একটি সুন্দর রথ রয়েছে। উচ্চতা আট ফুট। চাকার অংশবিশেষ মাটিতে প্রোথিত। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ির উত্তরে মোর্চার পাহাড় ও দুর্গদ্বারের অদূরে অনুরূপ একটি রথ দর্শনীয়। রথগুলি অলংকৃত। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে
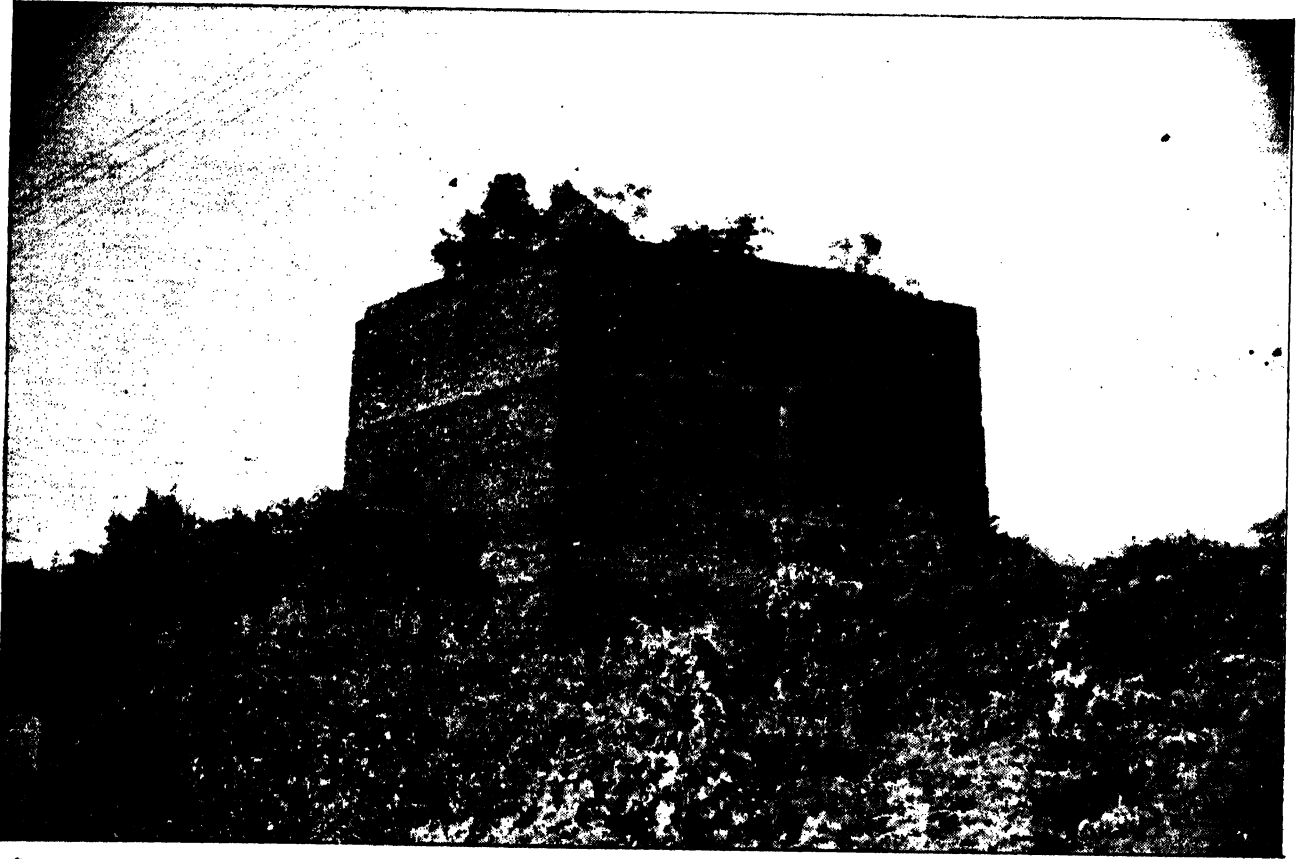
বিষ্ণুপুরের গুমঘর

ছবি : নিতাই কর্মকার

পাথরের রথ নির্মিত হয়েছিল বলে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন। এগুলি টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এ রথ নিয়ে নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত। ভক্তিপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস, রাজপথ চক্রধ্বনিতে মুখরিত করে এ রথ চলত। এক লোককবির রচনায় "....রাজার আদেশ পেয়ে কারীকরগণ / করিল পাথরে এক রথের গঠন / রথযাত্রা কালে রাজা হরষিত মনে / রথেতে বাসর দিয়া মদনমোহনে / আদেশ দিলেন রাজা রথে দিতে টান / নড়ে না সে রথ রাজা করে আনচান।। / .... রথেতে প্রভুরে বৃদ্ধা কৈল দরশন / সামান্য টানেতে রথ চলিল তখন।।

এ জেলার নানাস্থানে এমন কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় যেগুলির পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা বা পঞ্জিকরণ এখনও সম্ভব হয়নি। বাঁকুড়া শহরে প্রশাসনিক মূল কেন্দ্র হওয়ার কারণে অনেক পুরনো সরকারি ভবন আবাস ইত্যাদি রয়েছে। বাঁকুড়া শহরে বর্তমানে জেলাশাসকের আবাস হিল হাউস, সার্কিট হাউস ইত্যাদি উল্লেখের দাবিদার। শহরে গ্রামে-গঞ্জে অনুরূপ ইমারত নানা নির্মাণশৈলী পংখের কাজ ইত্যাদি নিয়ে জীর্ণ অথবা বিধ্বস্ত। মুসলিম সংস্কৃতির পরিচয়বাহী কিছু মসজিদ মাজার ইত্যাদিও প্রত্নবস্তুর মূল্যবান নিদর্শন। সোনামুখীর নীলবাড়ি নীলকরদের স্মৃতিবাহী। বিষ্ণুপুর থানার অযোধ্যা গ্রামেও নীলকুঠি ছিল। বাঁকুড়া শহরের কয়েকটি মৌজায় নীলকুঠির সন্ধান মিলেছে। গোবিন্দনগরে এখনও ক্ষয়িষ্ণু চিহ্ন অন্বেষককে অতীতের দরজা খুলে দেয়।

সহায়ক গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

১। *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, বাঁকুড়া (১৯০৮)-এস এস এস ও ম্যালি*

২। *বাঁকুড়ার মন্দির : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

৩। *বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

৪। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ*

৫। *History of Bishnupur Raj: Abhaya Pada Mallick*

৬। *পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি : মানিকলাল সিংহ*

৭। *Encyclopedia Britanica: Vol. 20.*

৮। *The Beginings of Art in Eastern India (ASI Memoir) I R P Chanda.*

৯। *Story of Indian Telegraphs (1953)*

১০। *পত্র-পত্রিকা : বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি, শীর্ষক, সুচেতনা।*

সংযুক্তি : চিত্রসূচি :

১। *বিষ্ণুপুরের পাথর দরজা—আলোকচিত্র*

২। *বিষ্ণুপুরের গড়দরজা—আলোকচিত্র*

৩। *বিষ্ণুপুরের পাথরের রথ—স্কেচ*

৪। *বিষ্ণুপুরের গুমঘর—আলোকচিত্র*

৫। *ছাতনার সিমাকোর স্তম্ভ—ঐ*

৬। *বাঁকুড়া শহরের বীরস্তম্ভ—ঐ*

৭। *শুশুনিয়ার শিলালিপি—ঐ*

লেখক : বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। বাঁকুড়ার প্রাচীন সাপ্তাহিক 'অভিযান'-এর সম্পাদক।

বাঁকুড়ার জনজীবনের কয়েকটি দিক
ভিত্তি প্রত্ন-নিদর্শন

গৌরপদ সেন

মনে হয়, মল্লরাজারা বিষ্ণুপুরকে রাজধানী শহর হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অনেকগুলি অঙ্ক কষে। এখনও পর্যন্ত বিষ্ণুপুর শহরের চারপাশের গ্রামগুলি থেকে যে সমস্ত প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে এই চিত্রটি সুস্পষ্ট যে পখন্না, ডিহর, ঠাকুরপুর, সলদা, রাজহাটি-বীরসিংপুর, অবন্তিকা, ধরাপাট সহ বহু স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পাল-সেনযুগ পর্যন্ত জনবসতি ছিল, ছিল বহু বৃত্তিজীবী মানুষ, ছিল বহু ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের সমাবেশ।

প্রত্ন নিদর্শনের আলোয় কোনও স্থানের লোকজীবনের অনুসন্ধান নতুন কিছু নয়, তবে অবশ্যই তা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কারণ, ইতিহাসের সমস্ত উপাদানের সাহায্য এতে থাকে না। তাছাড়া প্রত্ন নিদর্শনের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি দুটিই খুব সাবলীল নয়, বিশেষত সেগুলি যখন ব্যক্তিগত সংগ্রহে গোপনেই থেকে যায় বা বিকৃত আকারে পরিবেষিত হয়। এ-সমস্ত অসুবিধাগুলি সত্ত্বেও আকর অনুসন্ধান ও অনুশীলন-বিশ্লেষণের উৎসাহ এখনও আশাব্যঞ্জক।

বাঁকুড়া জেলার লোকজীবনের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা বা পুনরালোচনায় যাবার আগে একটি কথা উল্লেখ্য। এখন 'জেলা' হিসেবে বাঁকুড়া যে অঞ্চল বা ভূখণ্ডে চিহ্নিত তা প্রশাসনিক প্রয়োজনের বিভাজনমাত্র এবং এই জেলার চারপাশে যে জেলাগুলি ওই একই কারণে বিভাজিত ও চিহ্নিত তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে এই জেলার লোকজীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও সম্পৃক্ত। সুতরাং এখানের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মভাবনা বা সংস্কৃতির চালচিত্র সম্পূর্ণ আলাদা তো হতেই পারে না, বরং এগুলি ভৌগোলিক নৈকট্যের মতো নিকটতর। এখন জেলা বাঁকুড়ার বৃহত্তর পরিচিতি পাঁচমুড়ার টেরাকোটায়, নেতকামলা ও বিক্ষ্যাজামের ডোকরা শিল্পে ও বিষ্ণুপুরের বালুচরী নকশায়, শঙ্খশিল্পে, সংগীতের নতুন ঘরানায় ও স্থাপত্যে। যে শুশুনিয়ার পরিচয় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে তার প্রস্তর আয়ুধকে কেন্দ্র করে, সেখানে আজও পাথরের নানা মূর্তি ও দ্রব্যসম্ভার তৈরির ঐতিহ্য প্রবহমান। জেলার এবং জেলার বাইরে বিভিন্ন মেলায় তার প্রমাণ মেলে। যে বিশেষ ধরনের মাটি টেরাকোটার প্রধান উপকরণ তা আজও পাঁচমুড়ায় সহজলভ্য এবং যে পরম্পরাগত কুশলীজ্ঞান তার উৎকর্ষের অন্যতম কারণ, তা এখনও প্রবহমান।

গোকুলনগর মন্দিরের অদূরে ক্লোরাইট পাথরের বিশাল বরাহ মূর্তি

আর একটি কথা, এই জেলায় প্রত্ন-অনুসন্ধানের কাজে সরকারি উদ্যোগের থেকে ব্যক্তিগত উৎসাহ-উদ্যোগের ফসল বেশি। সরকারি পর্যায়ে যে কটি প্রচেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য শুশুনিয়ায়, পখন্নায়, ডিহরে এবং কংসাবতীর তীরে কয়েকটি জায়গায়। শুশুনিয়াকে কেন্দ্র করে প্রায় ৬০ বর্গমাইলের মধ্যে বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রাগৈতিহাসিক স্তরের নানান উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বে 'প্রাগৈতিহাসিক' শব্দটি প্রাক্‌লিপি সংস্কৃতিসমূহের পরিচয় বহন করে। যে যুগে মানুষ লিপি বা অক্ষরের ব্যবহার জানতো না, তাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়ে থাকে। এ যুগের সংস্কৃতি বলতে বোঝায় বিভিন্ন হাতিয়ার, আবাস, মৃৎশিল্প, সমাধি ইত্যাদির মতো মানবজীবনের একান্ত বাস্তব উপকরণসমূহ। প্রাগৈতিহাসিক স্তরের আবার কয়েকটি ভাগ আছে, যেমন পুরনো প্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর, নতুন প্রস্তর যুগ ইত্যাদি। নতুন প্রস্তর যুগের উত্তরণ হয়েছে তাম্র-প্রস্তর ও তাম্রপ্রধান সংস্কৃতির যুগে।

শুশুনিয়া, বাঁকাজোড়, ভরতপুর, বাঘডিহা, রামনাথপুর, ধনকোড়া, কুশবনা, শিউলিবনা, গিধুরিয়া, পারুলিয়া, পাহাড়ঘাটা, বাবলাডাঙা, মেটেলা, জলজলিয়া, বিরিবাড়ি, শিমুলবেড়া, হাপানিয়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম থেকে পুরনো, মধ্য ও নব্যপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি নানা ধরনের, কয়েকটি বর্শাফলকের আকৃতি ও ডিম্বাকৃতি ধরনের হাতিয়ার, কয়েকটি হাতকুঠারের দুদিকে ধার, হাতকুঠারগুলির কয়েকটি তিনকোনা, কয়েকটি চারকোনা, কয়েকটি খুবই ছোট এবং মসৃণ, অনেকগুলি সছিদ্র পাষাণ বলয়, ধারালো সীমাযুক্ত অস্ত্র যা কোনো জিনিস চেঁছে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা চলে, ডিমের আকৃতিবিশিষ্ট ছেদক, খুব সরু মুখবিশিষ্ট কর্তরী ইত্যাদি। এইসব হাতিয়ার ছিল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিম মানুষের তৈরি মূলত খাদ্য অন্বেষণ ও আত্মরক্ষার তাগিদে যেগুলির সৃষ্টি। এগুলি থেকে অনুমান করা যায় কিভাবে আদিম মানুষ তাদের প্রয়োজনের নিরিখে হাতিয়ারগুলি ক্রমশ বেশি উপযোগী বা উন্নত করতে শিখছিল এবং শিকারে দক্ষ হয়ে উঠছিল।

কংসাবতী, কুমারী এবং দ্বারকেশ্বরের উপত্যকা থেকে যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক স্তরের নিদর্শনগুলির সংখ্যা কম নয়। এ প্রসঙ্গে বিহারীনাথ পাহাড় থেকে অল্প দূরে তিলুড়ি ও গোপীনাথপুর গ্রামে যে কয়েকটি হাতিহায় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যেগুলির অধিকাংশই পুরনো প্রস্তরযুগের, উল্লেখ করা চলে। এছাড়া কংসাবতী ও কুমারী উপত্যকার অম্বিকানগর, হাতিখেদা, চিয়াদা, পরেশনাথ, সারেংগড়, মুকুটমণিপুর, ভূতশহর, দামুদরপুর, মাঞ্জুরা, নইনাবাদ, চিকচিকা, উপরশোল প্রভৃতি গ্রাম থেকে পুরনো ও নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। হাতিয়ারগুলির অধিকাংশই কোয়ার্টজ পাথরের, কোনোটি অমসৃণ, কোনোটি খুবই ধারালো ও মসৃণ,

কোনোটির শুধু একদিকে আবার কোনোটির দুদিকেই সমান ধার।

মধ্যপ্রস্তর এবং নব্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধ একত্রে পাওয়া গেছে খাতড়া থানার কুরকুট্যা গ্রাম থেকে। কাঁটাকুমারী, বলরামপুর, কুটুসবাড়ি, কামারকুলি, গোড়াবাড়ি, সাতশোল, ঝাঁটিপাহাড়ি, মৈসামুড়া সহ কয়েকটি গ্রামে পাওয়া গেছে শুধুই ক্ষুদ্রাশ্ম যুগের আয়ুধ। কুমারী নদীর তীরে পরেশনাথ থেকে এবং এখন যেখানে কংসাবতী জলাধার সেখান থেকে ক্ষুদ্রাশ্ম যুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলির দুদিকই উজ্জ্বল ও যথেষ্ট মসৃণ। কুমারী-কংসাবতী থেকে অনেক দূরে বন-আশুড়িয়া নামে একটি গ্রাম থেকে অন্তত ছটি নবাশ্মর কুঠার ও বড়জোড়া থানার দেজুড়ি ও মনোহর গ্রামের নিকটে জঙ্গল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ক্ষুদ্রাশ্মর হাতিয়ার। দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে জয়কৃষ্ণপুর থেকে কিছু দূরে ডিহর গ্রামটিও (বিষ্ণুপুর থানায়) প্রত্ন নিদর্শনের সুবাদে বিশেষ পরিচিত। এখন ডিহর গ্রামের পাশেই দ্বারকেশ্বরের মজা খাত যার তীরে অনেকগুলি মাটির ঢিবি। এখান থেকে আবিষ্কৃত নানান প্রত্ন-নিদর্শনগুলি সম্পর্কে বলার আগে তাম্র-প্রস্তর ও তাম্রযুগের কয়েকটি আবিষ্কারের বিষয়ে বলা চলে। গঙ্গাজলঘাটি থানার জামবেদিয়া গ্রামে ভক্তাবাঁধ খোঁড়ার সময়ে সস্কন্ধ কুঠার (তামার তৈরি) ও একটি সুচালো তামার ফলক, সিমলাপাল থানার অড়রা গ্রামে প্রচুর তামার হাতিয়ার, বড়জোড়া থানার দেজুড়ি ও সাহারজোড়ার জঙ্গলে তামার কুঠার, তামার বাসনপত্র, বালা ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর জেলার আগুইবনীর মতো মাটির তলা থেকে এগুলি আবিষ্কৃত না হলেও বাঁকুড়ার এই সমস্ত অঞ্চল থেকে এই আবিষ্কারগুলি তাম্রপ্রস্তর ও তাম্রযুগের মানুষের পরিচয় বহন করে। আরও উল্লেখ্য, এই সমস্ত নিদর্শনগুলির সঙ্গে কোনো মৃৎপাত্র বা শস্যকণার ফসিল পাওয়া যায়নি। ডিহরের ঢিবি বা স্তূপগুলি প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের অপেক্ষায় রয়েছে। এখানের কয়েকটি স্তূপ স্থানীয়ভাবে খনিত হয়েছে এবং সেগুলি থেকে প্রাগৈতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন সংগৃহীত হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার পুরাকীর্তি ভবনে সংরক্ষিত হয়েছে। আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল দুদিকেই ধার আছে এমন নবাশ্মর কুঠার (ঈষৎ ধূসর কৃষ্ণবর্ণের), ক্ষুদ্রাকৃতি অনেকগুলি আয়ুধ, তীরের ফলা, শ্লেট পাথরের বাটালি, ঈষৎ রক্তাভ এবং ধূসর রঙের উপবৃত্তাকার পাষাণচক্র, ত্রিভুজাকৃতি ক্ষুদ্র আয়ুধ (যার একদিকে ধার), কালো পাথরের ক্ষুদ্রাকৃতি কয়েকটি আয়ুধ ও পাষাণচক্র। এখানেই মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে হারপুন ও কয়েকটি জীবজন্তুর শিলীভূত কঙ্কাল। উল্লেখ্য, ডিহর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো তাম্রযুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়নি, অবশ্য শতাধিক তাম্র মাল্যদানা, কয়েকটি বালা ও অন্যান্য তাম্রালঙ্কার পাওয়া গেছে। এছাড়া আবিষ্কৃত হয়েছে কালো ও লাল রঙের বিচিত্র এবং অসংখ্য চিত্রিত কৌলাল, জালকাঠি, সছিদ্র টাকু, যেগুলি ভূপৃষ্ঠের পাঁচ ফুট থেকে আট ফুট নিচে পাওয়া গেছে। এগুলির আবিষ্কার প্রমাণ করে দ্বারকেশ্বরের তীরের এই অংশে যে সমস্ত মানুষের বসতি ছিল (সেই প্রাগৈতিহাসিক স্তর থেকে) তাদের জীবিকা নির্বাহের বড় অংশ জুড়ে ছিল পশু ও মৎস্য শিকার। ডিহর থেকে প্রচুর তাম্রমুদ্রার আবিষ্কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টেরাকোটার একটি প্রদীপ ও কালো এবং লাল রঙের কৌলালের সঙ্গে অনেকগুলি cast copper এবং Punch-marked coins এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখায় যে মিউজিয়ামটি গড়ে উঠেছে, সেখানে এই আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলির বিশদ বিবরণ সহ এভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা আছে। চৌকাপন মুদ্রা, চৌকা অর্ধপণ মুদ্রা, কাকিনী মুদ্রা, গোলাকার অর্ধ-কাকিনী মুদ্রা। এছাড়া আছে গোলাকার, উপবৃত্তাকার, ছাপকাটা রূপার কার্যাপণ্ মুদ্রা যেগুলিতে চৈত্য, যুক্ত (+) চক্র, সূর্য চিহ্ন অঙ্কিত আছে। ডিহরে মুদ্রাগুলি যে স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই একই স্তরে পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তি। এসব থেকে এমন অনুমান করা চলে যে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাগৈতিহাসিক জীবনপ্রণালীর ঘটেছে উত্তরণ, মুদ্রার ব্যবহার বৈপ্লবিক, কৃষি, শিল্প এবং স্বল্প পরিসরে হলেও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংসাবতী বাঁধ খননের সময়ে মুকুটমণিপুরে বেশকিছু Punch marked ও cast copper coins পাওয়া গিয়েছিল এবং অনেকগুলি রূপোর মুদ্রা রাতারাতি স্থানান্তরিত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি ইতিহাসের অভাবনীয় ও অপূরণীয় ক্ষতি। তবুও চাক্ষুষ দেখা প্রত্নবস্তুর (যেমন কালো ও লাল রঙের কৌলাল, বিভিন্ন টেরাকোটা মূর্তি ও তাম্রমুদ্রা (যেগুলির অধিকাংশ মৌর্য-শুঙ্গ আমলের বলে পরিচিত) আলোকে এই ধারণা স্পষ্টতর হয় যে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের বাস্তব জীবনে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে। যাযাবরীয় জীবনযাত্রা থেকে স্থায়ী বসতি, ফলে কৃষি ও পশুপালন বৃদ্ধি এবং সেই বৃত্তির প্রয়োজনে কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের উন্মেষ ও বিকাশ এবং তারই প্রসারণে উদ্বৃত্ত কৃষি ও শিল্পপণ্যের বিনিময়ের তাগিদে এবং সুবিধার্থে মুদ্রার ব্যবহার অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনের দিকগুলি সূচিত করে। সম্ভবত মৌর্য-শুঙ্গ যুগের মধ্যেই ডিহর একটি সমৃদ্ধ কৃষি ও বাণিজ্যভিত্তিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছিল, যাকে ঘিরে পরিণত হয়ে উঠেছিল তার চারপাশের দূর ও অদূরের অনেকগুলি গ্রাম। অবন্তিকা, পলাসি, ধরমপুর, পাঁচাল, জয়কৃষ্ণপুর, ছিলিমপুর, লয়ের, গহীরহাটি, রাজহাটি-বীরসিংপুর, ধরাপাট, হরিহরপুর, বালিগুমা ইত্যাদি। ধূসর, কালো এবং লাল বর্ণের কৌলাল, আগুনে পোড়া প্রাচীন আকৃতির ইট, টেরাকোটা মূর্তি (যেগুলির অধিকাংশই মৌর্য-শুঙ্গ আমল থেকে শুরু করে পাল, সেন আমল পর্যন্ত ব্যাপ্ত) স্থানগুলির প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে। রাজহাটি বীরসিংহপুরে এবং বালিগুমায় সামাজিক বিন্যাস ছিল গভীর অর্থবহ। প্রথম দুটিতে তাম্বুলি ও তন্তুবায় শ্রেণী এবং শেষেরটিতে শঙ্খবণিকদের ঘন বসতি ছিল। শতাধিক বছর আগে এই তাম্বুলি ও তন্তুবায়দের অনেক পরিবার অন্যত্র বসতি স্থাপন করেন। কলকাতার ভবানীপুরে, বাঁকুড়া শহর সহ এই জেলারই কয়েকটি গ্রামে ও পুরুলিয়ায় তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়। স্থানান্তরিত হলেও তাঁদের কুলদেবতা হলেন শিব এবং এই শিবের আদি অধিষ্ঠান বীরসিংহপুরের পাশের গ্রাম হরিহরপুরে। বিষ্ণুপুরের শাঁখারিবাজারের বেশ কয়েকটি শঙ্খজীবী পরিবার তাঁদের আদি বাসস্থান হিসেবে বালিগুমা গ্রামটিকে চিহ্নিত করেন। সম্ভবত আদি মধ্যযুগে বিষ্ণুপুর একটি সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে গড়ে উঠলে শঙ্খজীবীদেরও অপরাপর বৃত্তিজীবীদের মতো বিষ্ণুপুরে বসতি ও কর্মস্থল হিসেবে আগমন ঘটে। প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে শলদা পরিমণ্ডল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে আমোদর নামক

নদটির উভয় তীরে বেশ কয়েকটি গ্রামে যেমন শলদা, ময়নাপুর, গোকুলনগর, ফুলনগর, রাহাগ্রাম, জয়পুর ইত্যাদি স্থানে বহু প্রত্নবস্তু তার সাক্ষ্য বহন করে। লোকজীবনে ধর্মভাবনার স্বরূপ, তার বিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্নবস্তুগুলি দিক নির্দেশ করে।

মাত্র কয়েক বছর আগে গ্রাম সলদায় দুটি মূর্তির আবিষ্কার বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল নানা মুনির নানা মত। একটি মূর্তি চতুর্ভূজা, পদতলে মহাকাল, অপরটি মহিষোপরি উপবিষ্টা, মুখ কোনো দেবীর নয়, সম্ভবত বরাহমুখা। বরাহী শক্তির দেবী। মূর্তি দুটি যেখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল সেখানে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, রয়েছেন ভুবনেশ্বর নামে শিবও। শিবলিঙ্গটি কোনো আক্রমণকারীর হাতে পড়েছিল তার নজির রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেটি হল ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত একটি বরাহমূর্তি যা একটি ছোট পুকুরের পাড়ে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় দেখা যাবে। এই বরাহমূর্তিটি অনেক আগে থেকেই এখানে ছিল, যাঁকে এখনও 'ক্ষেত্রপাল' জ্ঞানে কৃষকরা পূজা নিবেদন করে থাকেন, কিন্তু এর পাশাপাশি বরাহী মূর্তির আবিষ্কার অভিনব, বলা যায়, কারণ বরাহ ও বরাহী পরস্পর পরস্পরের যেন পরিপূরক। এছাড়া সলদা থেকে পাওয়া গেছে পাথরের নরসিংহ মূর্তি, মহাকাল, একটি আবক্ষ শিবমূর্তি, কতকগুলি জৈন মূর্তি, ডোমপাড়ায় শঙ্খাসুর নামে একটি ধর্মঠাকুর সহ অন্যান্য বহু মূর্তির ভগ্নাংশ। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রাজগ্রাম (রাহাগ্রাম) থেকে একটি আকর্ষণীয় শিবমূর্তি আবিষ্কার করেন, যেটি এখন বিষ্ণুপুরে যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনের কক্ষে বিরাজমান।

সলদার পাশেই গোকুলনগর। সলদায় যেমন ভুবনেশ্বর এখানে গোকুলনগরে তেমনি গন্ধেশ্বর। যিনি অবশ্য সপ্তরথ পাথরের দেউলে অবস্থান করছেন। গন্ধেশ্বরের আকৃতিও বেশ বড় এবং এখনও অক্ষত বা অটুট। গন্ধেশ্বর মন্দিরে একটি মহিষমর্দিনী মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। এরপরই রয়েছে গোকুলচাঁদের মন্দির, তিনি অবশ্য এখন মন্দিরে নেই, কিন্তু তাঁর নামেই গ্রামটির নাম গোকুলনগর। মন্দিরটি বাঁকুড়া জেলার বৃহত্তম ল্যাটেরাইট মন্দির[১], প্রতিষ্ঠাফলকের বিবরণ অনুযায়ী এটি মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে ৯৪৯ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। মন্দিরটির পূর্ব ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ দশাবতার মূর্তির ভাস্কর্য অনুপম। মন্দির অঙ্গনের দক্ষিণ দিকে রয়েছে ভোগ-ঘর ও অতিথি নিবাসের চিহ্ন, এখন সেখানে A.S.I.[২]-এর পক্ষ থেকে সংস্কারের কাজ চলছে। এক সময়ে এই অতিথিশালাটি বহু মানুষের সমাগমে মুখরিত হোত। গোকুলনগর থেকে পাওয়া আর একটি বিরল ভাস্কর্যের নিদর্শন হল অনন্তবিষ্ণুর শয়ান মূর্তি, যেটি এখন বিষ্ণুপুরে দেখা যাবে। মূল মন্দিরের পশ্চিমদিকে তিনটি ক্ষয়িত দিগম্বর জৈনমূর্তি রয়েছে যেগুলি যথেষ্ট প্রাচীন।

এরপর উল্লেখ্য জয়পুর থানার অন্তর্গত ময়নাপুরের দুটি ধর্মঠাকুর, যাত্রাসিদ্ধি রায় (ছোট কূর্মমূর্তি) ও বাঁকুড়া রায়। এখানে ধর্মপূজার আদিগ্রন্থ বলে কথিত শূন্যপুরাণের লেখক রামাই পণ্ডিতের জন্ম ও সমাধিস্থল, স্থানীয় 'হাকন্দ' দীঘি (যার বারি এখনও পবিত্রজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়), একটি ভগ্ন সূর্যমূর্তি, একটি অপ্রাচীন শিব ও রাধাদামোদর জিউয়ের মন্দির লোকজীবনে ধর্মভাবনার বিচিত্র গতি-প্রকৃতিকে স্পষ্টতর করে। এখানের অথবা ভগলপুরের অথবা ইন্দাসের বা শ্রীধরপুরের কোথাকার বাঁকুড়া রায় জেলা শহর বাঁকুড়ার নামকরণে বলে মুখ্য ভূমিকা নেন[৩], তা এখন বলা দুষ্কর। জয়পুর থানার মোলকারির জঙ্গলে কয়েকটি প্রাচীন ঢিবি থেকে লাল পাথরে নির্মিত একটি ভৈরবী মূর্তি, একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা, কয়েকটি প্রাচীন টেরাকোটা মূর্তি ও তামার ছোট ছোট পাত্রের আবিষ্কার এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বোধ হয়, মোলকারীর জঙ্গলে কোনো গড় ছিল। এখনও এই জঙ্গলটি মোল বা মহুয়া উৎপাদনের জন্য পরিচিত।

এরপর উল্লেখযোগ্য হল খটনগর (কোতুলপুর থানা) থেকে পাওয়া একটি সুদৃশ্য বুদ্ধমূর্তি (শ্বেতপাথরের), দুটি গণেশ মূর্তি, একটি বড়, অপরটি ছোট ও ভগলপুর থেকে একটি জৈন দিগম্বর মূর্তি। খটনগর থেকে, এক কিলোমিটার পূর্বে রয়েছে যোতবিহার (জোতবিহার) গ্রামটি। এখান থেকে জৈন দিগম্বর মূর্তি ও বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। যোতবিহার নামটি সোনাতপল বা তপোবন নামে গ্রামগুলির মতো, এখানে কি কোনো বিহার বা মঠ ছিল ? আবিষ্কৃত তথ্যের বর্তমান অবস্থায় এ সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

খটনগর ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে নীলচাষ হত, এখানে নীলকুঠি ও নীল তৈরির কারখানার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

জয়পুর থানার বৈতলের দুটি ভাগ, একটি উত্তরবাড়, অপরটি দক্ষিণবাড়। এখানে গড়ধারপল্লীতে গড়ের ধ্বংসাবশেষ, শ্যামচাঁদের মন্দির (গোকুলচাঁদের মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়), যেটি প্রতিষ্ঠাফলকের বিবরণ অনুযায়ী মল্লরাজ বীর হাম্বিরের পুত্র প্রথম রঘুনাথ সিংহের (৯৬৬ মল্লাব্দ=১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত এবং বাঁকুড়া রায় নামে পাথরের স্বাভাবিক আকৃতির দুটি কূর্মমূর্তির সঙ্গে পাথরের একটি চতুর্ভূজা মনসামূর্তি উল্লেখযোগ্য। মনসামূর্তিটির দুটি বিশেষ দিক রয়েছে। প্রথমত ইনি শুধু সাপ ও শঙ্খ ধরে আছেন তাই নয়, এঁর উপরের ডান হাতে পুঁথির পাটা ও নিচের বাঁ হাতে কমণ্ডলু। মনসার ছত্র ধারণ করে আছে সাতটি সাপ। দ্বিতীয়ত এই দেবীর পুজোয় অধিকার রয়েছে 'পণ্ডিত' উপাধিধারি তেঁতুলে বাগদি নামে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের। যেমন ভগলপুরের বাঁকুড়া রায় 'কাঁসাই কুলিয়া' শ্রেণীর বাগদি পরিবারের দ্বারা পূজিত। ধর্মভাবনার রূপান্তর প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলার চেষ্টা করা যায়। বাংলার অন্যান্য জায়গার মত বাঁকুড়া জেলাতেও আঁধারকুলি বা ঝগড়াই চণ্ডীর মতো লৌকিক দেবদেবী আছেন তাই নয়, এখানে এক দেবতাকে আর এক দেবতা বা দেবী হিসেবে পূজা আরাধনা করা হয়। যেমন কোতুলপুর থানার ভগলপুরে একটি দিগম্বর মহাবীর মূর্তি আছে, এই জৈন সাধু এখন শীতলা ষষ্ঠী হিসেবে পূজা আদায় করে বেশ 'রসে বসে' আছেন। তেমনি সোনামুখী থানার রাধামোহনপুর গ্রামে প্রাচীন ইটের স্তূপে দিগম্বর মহাবীর সমাদৃত হচ্ছেন 'কালভৈরব' জ্ঞানে। বড়জোড়া থানার মালিয়াড়ায় একটি প্রাচীন 'সায়র' (বুড়ির সায়র) থেকে আবিষ্কৃত একটি বড় গোলাকৃতি শিলা 'মাতা বসুধা' হিসেবে এখন এক গৃহদেবী। পাত্রসায়ের থানার নাড়িচায় সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরে একটি মনসামূর্তি কার্তিক ঠাকুর হিসেবে পুজো নিচ্ছেন। এখানের মন্দিরে অনেকগুলি কষ্টিপাথরের মূর্তি রয়েছে, অনেক দেবদেবীর এখানে সহাবস্থান, গণেশ, কার্তিক, মহিষমর্দিনী—সর্বমঙ্গলা, মনসা, বিষ্ণু, আবার একটু দূরে রয়েছেন 'খাঁদা সর্বমঙ্গলা', অর্থাৎ তাঁর নাকটি ক্ষয়ে যাওয়ায় এরূপ নাম। দেব-দেবীকে ঘরোয়া নামে ভাবা ও পুজো করার ভাবনাটি এখানে ব্যঞ্জনাময়। আবার

মল্ল আমলে পাথরের পঞ্চরত্ন মন্দির। গোকুলনগরে ওই মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সংগৃহীত অনন্ত শয্যায় বিষ্ণুমূর্তি

ধরাপাটে (বিষ্ণুপুর থানা) দিগম্বর পার্শ্বনাথ নাগছত্রধারী হওয়ার কারণে মনসাজ্ঞানে পূজা পাচ্ছেন। আর একটি জৈনমূর্তি হয়ে গেছেন বাসুদেব, মূর্তিটির পিছনের প্রস্তরপট খোদাই করে একটি হাতে গদা ও অন্য হাতে পদ্ম উৎকীর্ণ করা হয়েছে, আর লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তি দুটিও খোদাই করে দেওয়া হয়েছে। যে কৌশলে এই রূপান্তর তা বর্তমানের প্লাসটিক সারজারির (Plastic surgery) যুগেও যেন বিস্ময়কর। এই অঙ্গ সংযোজন ও অস্ত্র-পুষ্প সরবরাহ অন্য সম্প্রদায়ের অবতারকে অঙ্গহানি করে অবহেলার দৃষ্টান্ত নয়, নিজের ঘরের দেবতা করে মেনে নেওয়ার যেন অকৃত্রিম চেষ্টা, আত্মীকরণের নমুনা। লায়েকবাঁধ নামে গ্রামটিতে একই জায়গার মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর সহাবস্থানটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামের বাউরি পাড়ায় চণ্ডী ও দুর্গার পূজক হলেন বাউরী সম্প্রদায়ের। এখানের দশভুজা মৃন্ময় প্রতিমা বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবী মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। যে ঘরে চণ্ডী ও দুর্গা রয়েছেন সেখানেই মনসা, যাঁকে বলা হয় কালীবুড়ি এবং বড়াম ঠাকুরেরও অধিষ্ঠান। তেমনি অষ্টভুজ নটরাজ মূর্তিকে দুর্গা হিসেবে পুজো করার নমুনাও আছে। পাত্রসায়ের থানার কান্তোর গ্রামের গোপপল্লীতে শুরু পাথরের এক চক্রের দু-পিঠে 'রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত, নৃত্যরত, অষ্টভুজ দুটি মূর্তি এখন দেবীজ্ঞানে ও দুর্গাপূজার মন্ত্রে পূজিত। এঁকে ষড়চক্রবাহিনী বলা হয়। ইন্দপুর থানার দেউলভিড্যায় এবং বিষ্ণুপুর থানার ডিহরের কাছে ঠাকুরপুরেও এই ধরনের মূর্তি দেখা যাবে। শুধু ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবী নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ দেবদেবীদের সন্ধানও পাওয়া যাবে চুয়ামসিনা গ্রামে, রাধানগরে, মায়াপুর ও ভড়ায় ; এগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে দিগম্বর জৈন ও মহাযানী সম্প্রদায়ের প্রভাব এখানের লোকজীবনে প্রবিষ্ট ও স্থায়ী হয়েছিল। কোনো কোনো গ্রামদেবীর আবার একচেটিয়া অধিকার, যেমন লোখেশোল গ্রামে কামাখ্যাদেবী রয়েছেন, সেখানে মূর্তি তৈরি করে দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ, অনুরূপ, মালিয়াড়ায় (বড়জোড়া থানায়) পুরনো রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত মহাকালী রয়েছেন, শিলা মূর্তি। সেখানেও কালীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ বা পূজা একেবারেই নিষিদ্ধ। ইন্দাস থানার সোমসারে দামোদরের তীরে একটি বাসুদেব মূর্তি এখন চণ্ডীজ্ঞানে পূজা পেয়ে থাকেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের নিরিখে পখন্না এখন একটি উজ্জ্বল নাম। সরকারি পর্যায়ে বেশ কয়েকবার এই গ্রামে 'রাজগড়' নামে জায়গায় খননকার্য হয়েছে, যদিও সর্বশেষ খননের রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি।

দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে এই গ্রামটি বড়জোড়া থানার অন্তর্গত। শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পূর্বে প্রায় ২৫ মাইল দূরত্বে এই গ্রামটি প্রাচীন 'পুষ্করণ' বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দের (Archaeological Survey of India) বার্ষিক রিপোর্টে K. N. Dixit মহাশয় একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন এই গ্রামটির প্রাচীনত্ব ও গুরুত্বের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় পখন্না থেকে আবিষ্কৃত নানা প্রত্নবস্তুর সন্ধান মিলবে। এখানের লোকবসতি, অন্তত আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর নিরিখে বলা চলে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে নবম শতক অবধি ধারাবাহিকভাবে ছিল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পখন্না থেকে পাওয়া একটি টেরাকোটা যক্ষিণী মূর্তি মৌর্য বা শুঙ্গ যুগের বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বিভিন্ন ছাপ মারা (punch marked) মুদ্রা, ছাঁচে ফেলা তামার (cast copper) মুদ্রা, ধূসর, লাল এবং কালো রঙের বিভিন্ন চিত্রিত কৌলাল, নানারকম পুঁতি ও অনেক টেরাকোটা মূর্তি এখানের প্রত্নক্ষেত্রগুলি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। কষ্টিপাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি এখান থেকে পাওয়া গেছে, যেটিকে শিল্পরীতির বিচারে পালযুগের বলে অনুমান করা হয়। এই অঞ্চলে বিষ্ণু আরাধনার ঐতিহ্য অনেকদিনের, বিশেষত শুশুনিয়া পাহাড়লিপি কথিত মহারাজ চন্দ্রবর্মণের, যিনি বিষ্ণুভক্তদের অগ্রগণ্য ছিলেন, 'পুষ্করণের' সঙ্গে বর্তমান পখন্নার চিহ্নিতকরণ মেনে নেওয়া হয়। পখন্না গ্রামের পশ্চিমদিকে একটি বড় 'ঢিবি' আছে, তার সর্বত্র প্রাচীনকালের ইঁট ও পাথর ইতস্তত ছড়ানো, 'রাজগড়' নামটি স্পষ্টতই রাজার গড়, যেটি পুষ্করণাধীপ চন্দ্রবর্মার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হতে পারে। রাজগড়ের একদিকে দামোদরের মজা খাত অন্য তিনদিকে ছোটবড় পুষ্করিণী, সবগুলিকে এক করলে মনে হবে রাজগড়ের চারপাশে জলের পরিখা করা হয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল রাজপ্রাসাদের সুরক্ষা। মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা বা চন্দ্রবর্মণ চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের শাসক বলে চিহ্নিত হয়েছেন শুশুনিয়া লিপির ভিত্তিতে, সম্ভবত এঁর নাম সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে

স্থান পেয়েছে। ফরিদপুর তাম্রপট্ট কথিত চন্দ্রবর্মণকোটা বা দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা এই চন্দ্রবর্মণ বলেও অনুমান করা হয়েছে।

শুশুনিয়া লিপিটি ব্রাহ্মী হরফে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লেখা। মহাস্থানগড় লিপির পরই এর স্থান, সময়ের বিচারেও তাই এর গুরুত্ব স্বীকার্য। লিপিটি এই অঞ্চলে জনসমাজের এক অংশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা, চর্চা বা ব্যবহারের যেমন সাক্ষ্য বহন করে, তেমনি বিষ্ণু আরাধনার ঐতিহ্যকে হাজির করে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের এই লিপি বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী রাজার বিষ্ণুভক্তির এক নমুনা তাহলে এরূপ ভাবাও অযৌক্তিক নয় যে, এই ধর্মচেতনা বেশ কিছুকাল ধরেই এই অঞ্চলের সমাজজীবনে প্রচলিত ছিল। এখান থেকে আবিষ্কৃত কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তিটি এ প্রসঙ্গে নতুন ব্যঞ্জনা বহন করে।

Ancient History of Bengal, volume I-এ এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : The Susunia Rock inscription is a short Sanskrit inscription in three lines engraved on Susunia hill, recording the installation of an image of Vishnu during the reign of Chandravarman... while this certainly indicate a knowledge of sanskrit on the part of at least a small section of the people in the area, they do not convey any definite idea of the growth and evolution of sanskrit literature in Bengal.....

The earliest reference to the cult of Vaishnavism is found here in this rock inscription of three lines engraved on the back wall of a cave. The first two lines of it incised below a big wheel (chakra) with flaming rib and hub, refer to it as the work of the illustrious Maharaja Chandravarman, the lord of Pushkarana. ....The third line is incised to the right of the wheel, but its reading and consequently its meaning is not very clear. It certainly refers to the dedication (of the cave) to Chakrasvamin, which literally means the 'wielder of the discus, i.e, Vishnu... It may be reasonably inferred that the excavated cave, on the wall of which the inscription was incised, was intended to be a temple of Visnu. জেলা গেজেটিয়ারে[৪] পখন্না সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে মূলত A.S.I-এর রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যাতে ভূমিদান সংক্রান্ত একটি বিষয়ও উল্লিখিত।

".....several architectural stones are to be seen in the village, a stone kept in the open yard of a house shows the 'sow and ass figure' familiar from its occurrence on land grants. উল্লেখ্য, A.S.I.-এর রিপোর্টে শুশুনিয়া লিপির ভিন্নতর পাঠে রাজা চন্দ্রবর্মণ কর্তৃক 'দোসাগ্রাম' দানের কথাও বলা হয়েছে।[৫] এই দান দেবতা চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উদ্দেশে।

পুষ্করণ দামোদরের তীরে, এখানের মুদ্রা, টেরাকোটার বিভিন্ন মূর্তি এবং মহারাজ চন্দ্রবর্মণের রাজ্য এই ইঙ্গিত দেয় যে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এই অংশে অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের এই ভূখণ্ডে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখানে সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মীলিপ্তের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, রাজা নিজে বিষ্ণুভক্ত থাকায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারে কোনো বাধা ছিল না এবং ভূমিদানের ব্যবস্থা চালু ছিল। দামোদর নদের মাধ্যমে রূপনারায়ণের তীরে বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপির সঙ্গে রাজধানী শহর পুষ্করণের যোগাযোগ থাকাও ছিল স্বাভাবিক। পুষ্করণ রাজ্য তার বনজ, খনিজ, কৃষিজ ও শিল্প দ্রব্যসম্ভার নিয়ে আন্তর্বাণিজ্যে নিয়মিত যোগ দিত, এরূপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কয়েকটি এমন ধরনের টেরাকোটা মূর্তি পুষ্করণ থেকে পাওয়া গেছে, যেগুলির সঙ্গে তাম্রলিপ্তিতে পাওয়া টেরাকোটা মূর্তির মিল রয়েছে। এই সাদৃশ্য পারস্পরিক যোগাযোগের প্রমাণ, যা শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল, এরূপ বলা অযৌক্তিক নয়। এ বিষয়ে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)[৬] থেকে প্রাসঙ্গিক একটি নমুনা উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

"The oldest specimen[১], yet known, of Bengal sculptures is a couple of stray terracotta picked up from Pokharna (Bankura), the ancient Pushkarana and Tamluk, the ancinet Tamralipti. The Pokharna find, now housed in the Asutosh Museum of Indian art, Calcutta university (Pl xLv, 109) exhibits definite Sunga Characteristics so familiar to us from the Bharhut railings. With its lower part broken, it represents a standing female figure (6") perhapes a yakshini, with a head-dress fashioned exactly on the Bharhut model. Her right hand lifts a portion of the skirt in an angle, and the left, resting in akimbo, holds a suka bird. Her heavy neck ornament, arranged in two stages and composed in heavy square units modelled as if in separate plastic volumes, her round and stiff pair of breasts similarly modelled, and arrangement of the folds and hangings of the upper and lower garments, all unmistakably reveal her intimate relationship with the sunga idiom of art. The Tamluk piece conforms almost to the same description and exhibits the same characteristics, but it seems to belong to a later date, and is perhaps more closely related with the slightly later Mathura sculptures.

মৌর্য আমল থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি সুবিদিত, গুপ্ত আমলে ফা-হিয়েনও এর সুখ্যাতি করেছেন। গুপ্ত আমলে বিশেষত সর্বরাজচ্ছেত্তা সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে যদি পুষ্করণা এসে থাকে, তাহলে রাঢ়ের এই অঞ্চলে গুপ্তশাসনের মডেল প্রচলিত হওয়ারই কথা এবং তা হয়ে থাকলে শুশুনিয়া পুষ্করণা—তাম্রলিপ্ত (তমলুক) যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অনুরূপভাবে বর্ধমানের উজানি মঙ্গলকোট আবিষ্কৃত[৭] একটি টেরাকোটা সীলে বর্ণিত নাগদত্তের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। সীলটিতে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম অঙ্কিত এবং তার নিচে ব্রাহ্মী হরফে লেখা 'নাগদত্ত', একপাশে অঙ্কিত ছুটন্ত মানুষ, অন্যদিকে মুকুট। সীলটি চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের বলে চিহ্নিত করে অনেকে নাগদত্ত সম্পর্কে এরূপ অভিমত

দিয়েছেন যে এই নাগদত্ত ছিলেন বণিককুলের প্রতিনিধি এবং তিনি পুষ্করণের চন্দ্রবর্মণের মতো উজানিতেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, গুপ্তযুগে আমরা একাধিক তাম্রপট্ট পেয়েছি যেগুলিতে সার্থবাহ, নগরশ্রেষ্ঠী প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মহকুমা ও জেলা প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। উজানি-মঙ্গলকোটে 'দত্ত' উপাধিধারি শ্রেষ্ঠী সার্থবাহদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবেই বেশি, অতীতের মতো এখনও। কৃষি ও বাণিজ্য এঁদের আর্থিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারে বিশেষ সহায়ক। উজানি মঙ্গলকোটে একটি প্রাচীন ছড়ায়[৯] বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার শেষে গৃহে শুভাগমন কামনা করে পোখরনার সঙ্গে উজানির বাণিজ্যিক যোগাযোগের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাঢ়ে কৌমতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে রাজতন্ত্র, রাজা আছে, রাজকীয় ধর্ম আছে, রাজধানী ও রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামো আছে। সমতট, দাবক—এদের পাশাপাশি পুষ্করণের নামও পাওয়া যাচ্ছে, যদিও বঙ্গ এবং অন্যান্য নামগুলিও মর্যাদার সঙ্গেই উপস্থিত। পুষ্করণ একটি বাণিজ্যপ্রধান নগরী, প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং বিষ্ণু আরাধনারও পীঠস্থান—তবে কোনটি এর নগরায়ণে বেশি ভূমিকা নিয়েছিল তা এখনও অজানা।

আগে আমরা দ্বারকেশ্বরের তীরে ডিহর নামে স্থানটি সম্পর্কে দু-চার কথা বলেছি। এই জায়গাটি বর্তমানে দ্বিহর (ডিহর) অর্থাৎ শৈলেশ্বর ও ষাঁড়েশ্বরের সুবাদে বিখ্যাত শৈবতীর্থ। শিব আবার বণিকদের বিশেষ আরাধ্য দেবতা (তুলনীয় চাঁদ সদাগর) বিভিন্ন কৌলাল ও মুদ্রার আবিষ্কার থেকে ডিহরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব ও নগরায়ণের আভাস পাওয়া যেতে পারে। ডিহর সম্পর্কে বিস্তারিত Report এরূপ : Indian Archaeology : A review : 1983-84.

The Department of Archaeology, the university of Calcutta, conducted an archaeological excavation at Dihar, in the Bankura district. Dihar is now situated on the eastern side of the 'Kana Nadi', the dried bed of the river Dwarakeswar,..... The excavation revealed for the first time in this district the nature and character of the chalcolithic culture. The excavation revealed two district cultural periods without any break, viz., the chalcolithic period (period I) and early Historical period (period II).

The evidence of structural remains was obtained in both the periods. The floors of Period I were of beaten earth with soiling of rammed terracotta nodules and lime. The presence of re-impressed clay daubs, burnt read impressed clay plasters and large quantities of charcoal indicated that the houses of the chalcolitihic people were of simple construction.

The ceramics of Period I included black and red ware, grey ware, black slipped ware and buff ware Block painted ware appeared to be very rare at this level.... An interesting discovery was the large quantity of another

কাদাসোল মন্দিরের পোড়ামাটির অলংকরণ ('বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

tools and bone implements, occasionally found scattered all over the floor level of this period. The tools included picks, chisels with broad and narrow end, scrapers, needle and drill. This period further yielded microliths comprising blades, scrapers of different forms and paints together with microcores. Knowledge of cultivation was evidenced by the finds of neolithic tools found from the surface level. Fragments of copper and copper antimony rods were also found.

The succeeding period II, early historical in character witnessed the intorduction of iron and was marked by usual ceramics of the early christian era i.e., Sunga and Kustsana boul, a large number of cast copper coins, stone beads, terractotta objects, etc.

No evidence of NBP was found in this period occupational deposits of this period extend from layers 1 to 4.

ডিহর থেকে কুষাণ যুগের টেরাকোটা মূর্তি, ধূসর রঙের গোলাকার মৃৎপাত্র, অসংখ্য মাল্যদানা, অসংখ্য তাম্রমুদ্রা, কয়েকটি গোলাকার রূপার মুদ্রা সহ বহু কৌলাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার অধীন যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি পুরাকীর্তি ভবনে রক্ষিত আছে।[১০] যে দ্বারকেশ্বরের তীরে ডিহর অবস্থিত, তারই কাছে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর, এই দ্বারকেশ্বর মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালের কাছে বন্দর নামে জায়গায় স্বরূপনারায়ণের নামানুসারে রূপনারায়ণ নদ নামে পরিচিত। এই রূপনারায়ণের কূলেই বর্তমান তমলুক শহর, যা অতীতের তাম্রলিপ্ত বন্দরের একাংশে হিসেবে যথার্থভাবেই চিহ্নিত[১১]। তাম্রলিপ্ত বন্দর অষ্টম শতকেই মৃত নয়, যদিও ওই সময়ের মধ্যে তার পূর্ব গরিমা ও মহিমা ক্ষীয়মান। মনে হয় ডিহর, পুষ্করণ, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চল এই তাম্রলিপ্ত বন্দরের অন্যতম পশ্চাৎভূমি (Hinterland) হিসেবে কাজ করেছিল। শুধু নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় নয়, সারা উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে তাম্রলিপ্তের যে সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রবহমান ছিল, সেই তাম্রলিপ্তের সঙ্গে প্রাচীন রাঢ়ের বিশিষ্ট এই ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিল স্থল ও জলপথের সাহায্যে এবং তা ছিল নিয়মিত। যে ধরনের প্রত্নবস্তু নিম্নবঙ্গের হরিনারায়ণপুর, হরিহরপুর, দেগঙ্গা, বেড়াচাঁপা-চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থানে প্রচুর আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে তমলুক, বাহিরী, পান্না ইত্যাদি স্থান থেকে পাওয়া প্রত্নসামগ্রীর মিল আছে, আবার তমলুকের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া প্রত্নবস্তুগুলির সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার পখন্না, ডিহর এবং মুকুটমণিপুরে পাওয়া প্রত্নসামগ্রীর অল্পবিস্তর সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া ডিহর, বিষ্ণুপুর ও তমলুক একই নদের তীরে অবস্থিত, আর সুদূর অতীতে দামোদর নদের সঙ্গে রূপনারায়ণের যোগাযোগ ছিল বেশি, নদগুলির নাব্যতা আন্তর্বাণিজ্যে এই স্থানগুলিকে নিকটতর করেছিল। ভৌগোলিক নৈকট্য, স্থলপথ ও নদ-নদীর মাধ্যমে যোগাযোগ যা এই অঞ্চলের সঙ্গে নিম্নবঙ্গের অর্থনৈতিক যোগসূত্র সহজতর করেছিল তা পরবর্তীকালেও শুধু বজায় থাকা নয়, বিস্তৃতও হয়েছিল। একই ধরনের বিভিন্ন প্রত্নসম্ভার এই আভাস দেয় যে, রাঢ়ের যে ভূখণ্ড বর্তমান বাঁকুড়ার অংশীভূত তার সঙ্গে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের যোগাযোগ ছিলই, উত্তরকালে ৯৯৯ বঙ্গাব্দে ইংরোজি ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে বিসন্তপুরের (গড় বিষ্ণুপুরের) জমিদার হামির মল্ল মানসিংহের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত বারটি জমিদারি ও উনত্রিশটি কিল্লা পান তার মধ্যে তমলুক, মহিষাদল ইত্যাদি জমিদারি অঞ্চল ছিল অন্তর্ভুক্ত[১২]। এভাবে অর্থনৈতিক যোগসূত্রের ঐতিহ্য রাজনৈতিক বন্ধনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

একথা সুবিদিত যে মল্লভূম-রাজধানী বিসন্তপুর বা বিষেণপুর বা বিষ্ণুপুর প্রথম পরিচিত ছিল গড় বিষ্ণপুর বা বন-বিষ্ণুপুর[১৩] নামে, কারণ অবশ্যই এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং মল্লরাজবংশের সামরিক প্রয়োজনীয়তা, কিন্তু সামরিক দুর্গ বা গড় হিসেবে এটি বেছে নেওয়া হলেও অতি দ্রুত এই প্রশাসনিক-সামরিক কেন্দ্রের চেহারা পরিবর্তিত হতে লাগল। বিষ্ণুপুর শহরটিকে ঘিরে অনেকগুলি বাঁধ তৈরি করা হল, রাজকীয় উদ্দেশ্য, রাজধানী শহরটিকে জলের পরিখা দিয়েও সুরক্ষিত করা, সামরিক লক্ষ্যপূরণের পরিকল্পনা সমাজ ও অর্থনীতিতে আনল স্থায়ী রূপান্তর, বাঁধগুলি জলসেচ প্রকল্পের সহায়কও হল, বহু মানুষের কর্মসংস্থান হল, শুরু হল নিবিড় মৎস্য চাষ। পাশাপাশি জায়গা থেকে বহু বৃত্তিজীবী মানুষ একে একে এই রাজধানী শহরে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমবেত হল। আভ্যন্তরীণ বাজারে এর মর্যাদা গেল বেড়ে। বিষ্ণুপুরের রেশম ও বয়ন শিল্প, শঙ্খশিল্প, কাংসশিল্প, মৃৎশিল্প, তক্ষণশিল্প, বাস্তুশিল্প, অন্যান্য ধাতবশিল্প উন্নতির উৎসমুখ খুঁজে পেল। মণিকার, মালাকার নামকরা হালুইকরদেরও ভিড় জমল। এল বাদনশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী সহ অনেকেই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দৃঢ় ভিত্তির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ঘটে চারু ও কারুশিল্পের উন্নতিতে, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিকাশে এবং সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সমৃদ্ধিতে। মল্লরাজধানী গড় বিষ্ণুপুর আর শুধু গড় বা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেই আবদ্ধ থাকল না, মন্দিরনগরী হিসেবে এবং সংগীত সাধনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটল।

মনে হয়, মল্লরাজারা বিষ্ণুপুরকে রাজধানী শহর হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অনেকগুলি অঙ্ক কষে। এখনও পর্যন্ত বিষ্ণুপুর শহরের চারপাশের গ্রামগুলি থেকে যে সমস্ত প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে এই চিত্রটি সুস্পষ্ট যে পখন্না, ডিহর, ঠাকুরপুর, সলদা, রাজহাটি-বীরসিংপুর, অবন্তিকা, ধরাপাট সহ বহু স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পাল-সেনযুগ পর্যন্ত জনবসতি ছিল, ছিল বহু বৃত্তিজীবী মানুষ, ছিল বহু ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের সমাবেশ। মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে শুধু নয়, সারা জেলায় যে অসংখ্য দেবালয় ছড়িয়ে আছে, প্রাচীনতর দেবালয়ে যে ধ্বংসাবশেষ আজও বজায় আছে, তাদের স্থপতি, কারিগর বা বাস্তুবিদ্যা বিশারদ যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই প্রতিভা ও নিষ্ঠার জয়গান ধ্বনিত হয়ে আসছে এই সমস্ত স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলির মধ্য দিয়েই। মন্দিরগুলি তৈরির ক্ষেত্রে যে উপকরণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি প্রমাণ করে পাথর কেটে সেগুলিকে যথাযথ আকৃতি দেওয়া, পাথরের উপর মূর্তি, নক্‌শা ইত্যাদি খোদাই করা, টেরাকোটা দৃঢ়ভাবে জোড়া লাগানো এ সমস্ত কারিগরি দক্ষতা কিরূপ উন্নতির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বাস্তু বা দেবালয় নির্মাণে ইট ও চুন-সুরকির ব্যবহার চুনারি ও ইট তৈরির জন্য দক্ষ শ্রমিক, কারিগর, ও মিস্ত্রি শ্রেণীর বৃত্তিজীবীদের চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। এ বিষয়ে আমরা ধরাপাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক, দ্বারকেশ্বরের উত্তর তীরে ছিলিমপুর গ্রাম, ডিহর, গহীরহাটি, ঠাকুরপুর, পখন্না (পুষ্করণা), ছাতনা, সলদা, গোকুলনগর, বৈতল অম্বিকানগর, পরেশনাথ, গোপীনাথপুর, এক্তেশ্বর সহ বহু স্থানের বাস্তু নির্মাণের প্রাচীন উপকরণগুলির সাক্ষ্য বিশ্বাস করতে পারি। প্রাচীন মুদ্রাগুলি মুদ্রা-নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের কুশলী জ্ঞান আভাসিত করে, মল্লরাজাদের দলমাদল কামান সহ কয়েকটি ছোট-বড় আগ্নেয়াস্ত্র লৌহশিল্পের উন্নতির সূচক। কাঠের তৈরি দরজা, জানালা ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্ষণস্থায়ী, প্রাচীন বাংলায় সেগুলির অস্তিত্ব ক্ষীণ, এই জেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে পাথরের বুকে এবং সহজলভ্য মাটির ছাঁচে যে গভীর শিল্পবোধ ও সুষমা ধরা আছে, যে অলঙ্করণ বিভিন্ন মূর্তি ও ফলকে রূপায়িত হয়ে আছে সেগুলি থেকে সমসাময়িক মণিকারদের সূক্ষ্ম কারুকার্যের অনুমান করা চলে। অলঙ্কার শিল্পে এই জেলার গৌরবময় ঐতিহ্য এভাবেই বিধৃত। এই জেলার বিভিন্ন দেবালয়ে বহু বিচিত্র ভঙ্গিমায় নৃত্যরত মূর্তি দৃশ্যমান, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সেই নৃত্যগীতের অনুষঙ্গ, কোথাও পাথরের, কোথাও টেরাকোটার এই সমস্ত নিদর্শন

শ্যামরায় মন্দিরের খিলানের নিচে টেরাকোটার সজ্জা ('বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

প্রাচীনকালের সঙ্গীত সাধনার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন নরনারীর ও বহুমখী বৃত্তির সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। শুধু দশাবতার তাসে নয়, গোকুলচাঁদের মন্দিরে (গোকুলনগর জয়পুর থানা) দশাবতার মূর্তি খোদিত। দশাবতারে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মেও অবতার হিসেবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি বলপ্রয়োগের নয়, সামাজিক প্রয়োজনের, তাই শুধু পটচিত্রে নয়, (যেগুলি অঙ্কনশিল্পেরও উৎকর্ষের প্রতীক), শুধু মন্দিরগাত্রের ফলকে নয়, দেবদেবীর মূর্তিতে এই আত্মীকরণের প্রক্রিয়া অতীতেও ক্রিয়াশীল, তাই অম্বিকানগরের অম্বিকা শুধু জৈন দেবী নন, তিনি ব্রহ্মাণ্যদেবী দুর্গাও, ধরাপাটের তীর্থঙ্কর, বিষ্ণু, নাগছত্রধারী হওয়ায় আদিনাথ, মনসা, মদনপুরের মহাবীর, কালভৈরব, ভগলপুরের জৈনপূর্তি, শীতলাক্ষীর, বৈতলের মনসার হাতে পুঁথি, শলদায় বরাহ-অবতার, ক্ষেত্রপাল, বরাহী, চণ্ডী বা গুপ্তকালী, সোমসারে বাসুদেব, চণ্ডী, হদলনারায়ণপুরে ব্রহ্মাণী, পার্বতীজ্ঞানে সমাদৃতা ও পূজিতা। বহুলাড়ার (ওন্দা থানা) যে মন্দিরটিতে এখন সিদ্ধেশ্বর শিব বিরাজ করছেন সেটির বিশেষত্ব শুধু এই নয় যে এটি সুন্দর ইঁটের তৈরি মন্দির—যার সর্বভারতীয় খ্যাতি স্বীকৃত, এর আরও বিশেষত্ব হল যে, এই মন্দিরের গর্ভগৃহে ৫ ফুট উঁচু পাথরের পার্শ্বনাথ মূর্তিটি এখান থেকেই খনন করে পাওয়া গিয়েছিল, মন্দিরের পাশে অনেকগুলি স্তূপ, যেগুলি প্রাচীন ইটের অবশেষ অংশ। এটিকে বলা চলে যে জৈনধর্ম যখন বিলীনপ্রায় এবং প্রাচীন জৈন মন্দির যখন ধ্বংসোন্মুখ, তখন এখানে শৈবধর্মের উত্থান, কিন্তু তার ফলে জৈন অবতারকে অবজ্ঞা করা হয়নি, বরং সিদ্ধেশ্বর শিব এবং পার্শ্বনাথ পাশাপাশি একই মন্দিরে মিলে-মিশে আছেন। ধর্মভাবনার এই সাঙ্গীকরণ ও দেব-দেবীর সহাবস্থান বাঁকুড়ার চালচিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

অনেক পরে যখন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্দির গড়ে তুলেছিলেন সেগুলির মধ্যেও বাসুদেব, কৃষ্ণ, গোপাল, মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি মূর্তির প্রাধান্য ছিল ঠিকই, কিন্তু শক্তি এবং শিবের জন্যও দেবালয় সুনির্দিষ্ট ছিল। মল্লভূমের প্রধান দেবতা মল্লেশ্বর, বাঁকুড়ায় এক্তেশ্বর, বহুলাড়ায় সিদ্ধেশ্বর, ডিহরে (দ্বিহর) দ্বিহর, শৈলেশ্বর ও ষাঁড়েশ্বর, সিহরে আদিনাথ, বিহারীনাথে বিহারীনাথ—এগুলি বাঁকুড়ায় শৈবধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তিরই দ্যোতক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরেশনাথে (রানীবাঁধ থানা) কালো পাথরের সূর্যমূর্তি, সোনাতপলে (এক্তেশ্বর থেকে দু-মাইল উত্তর-পূর্বে) একটি সূর্যমূর্তি এবং পূর্বমুখী একটি জীর্ণ মন্দির (যেটি সূর্যমন্দির হওয়াও বিচিত্র নয়) এই জেলায় সূর্য উপাসনার ধারাটিকে স্পষ্ট করে। সোনাতপলের কাছেই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণরা বাস করেন। যেটি সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাঁকুড়ার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় উদারতা, এখানে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলিম, খ্রিস্টান—সব ধর্মের সহাবস্থান। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও। বিষ্ণুপুরে কুরবানতলায় কুরবান সাহেবের মাজার, চটশাহদাতার সমাধি এবং বালিধাবড়া মহল্লায় ঘোড়া আলি সাহেবের আস্তানায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের সমাগম হয়। মল্লরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের কুরবান সাহেবের আস্তানায় ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে যে জমি প্রদানের দলিলটি আছে সেটির তারিখ, সন ১০৬৯ সাল, ১৫ মাঘ[১৪]। এ জেলায় খ্রিস্টান মিশনারিদের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে পি পার্সিভাল ও টি হডসন্ নামে দুজন ইংরেজ বাঁকুড়ায় মিশনারি কাজকর্ম শুরু করার পরিকল্পনা করলেও তা ফলপ্রসূ হতে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। রেভারেন্ড্ উইটব্রেক্ট তার সূত্রপাত ঘটান শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে। Weslian Methodist Mission এখন Church of North Indian অধীন, বাঁকুড়ায়, সারেঙ্গায় ও বিষ্ণুপুরে এঁদের উপাসনাস্থল বা গির্জাগুলি উদার মতেরই ধারক ও বাহক।

আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম বাঁকুড়া জেলায় প্রাগৈতিহাসিক স্তরের প্রত্ন নিদর্শনগুলিকে নিয়ে। এখানে পুরাতন, মধ্য, ও নব্যপ্রস্তর যুগের এবং তাম্র-প্রস্তর ও তাম্রযুগের সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ যে ঘটেছিল তা আর অনুমাননির্ভর নয়, প্রমাণিত। বিভিন্ন কৌলাল, প্রস্তর নির্মিত ও টেরাকোটা মূর্তি, দেবস্থান, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, মাল্যদানা, অন্যান্য বহু বিচিত্র প্রত্নবস্তু এই অঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাসের যে দিকগুলি উন্মোচিত করে তা প্রাচীন রাঢ়বঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মগত ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাঢ়ের এই অংশের আদি জনসমষ্টি, আর্যপূর্ব জাতি ও কোমদের পক্ষ থেকে তাদের ইতিহাস জানানোর মতো কোনো অকাট্য প্রমাণ সর্বদা উপস্থিত নেই, তথাপি

একথা স্বীকার্য যে প্রথমে সংঘাত ও পরে মিলন এবং সমন্বয়—এই পথেই রাঢ় জনজীবনের এই অংশের জীবনপ্রবাহ বহমান ছিল। কোমগুলির পরস্পরের ভিতরেও যৌন ও আহার-বিহার সংক্রান্ত বিভেদ এবং বিরোধও কম ছিল না, যেগুলির অনেকাংশ পরবর্তী আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাস ও সংস্কারে আশ্রয় নিয়েছিল।

বিহারীনাথ, পরেশনাথ, ধরাপাট, ঠাকুরপুর, ডিহর, বহুলাড়া, ময়নাপুর, বৈতল সহ এই জেলার নানা স্থানে যে সমস্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অবতার মূর্তি, স্তূপ বা মঠ-মন্দিরের অবশেষ এখনও দেখা যায় সেগুলি থেকে অন্তত এই সত্য উচ্চারিত হতে পারে যে এই সমস্ত ধর্ম-ভাবনা এই অঞ্চলের আর্যীকরণের ধারাকে বেগবান করলেও আর্যপূর্ব সমাজকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেনি[১৫]। পরবর্তীকালে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের প্রসারণে উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রীর বেচাকেনাকে আশ্রয় করে জল ও স্থলপথের ব্যবহার এবং বৃহত্তর বঙ্গের সঙ্গে রাঢ়ের এই অংশের যোগাযোগ প্রসারিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়, শুশুনিয়া থেকে পুষ্করণ, পুষ্করণ থেকে ডিহর, ডিহর-বিষ্ণুপুর থেকে তাম্রলিপ্ত ধীরে ধীরে যোগসূত্র গড়ে ওঠে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের পরেও তাম্রলিপ্তের যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ তার প্রভাব কি রাঢ়ের এই অংশে অনুপস্থিত ছিল ? বহু বিচিত্র কৌলাল, টেরাকোটা মূর্তি, তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা যা এই অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তা গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির আভাস সূচিত করে। সমাজে নানা বৃত্তির জন্ম হয়, বৃত্তি অনুযায়ী বর্ণ, উপবর্ণের সৃষ্টি হয়। বিষ্ণুপুরে এখনও যে জনসমষ্টির চিত্র পাওয়া যায় তা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণোক্ত বর্ণ-উপবর্ণের বিভাজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্মা যদি সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পরাজিত হন এবং পুষ্করণা যদি গুপ্ত প্রশাসনিক বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের মতো একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে একই নদীপথে সংযুক্ত (ধলকিশোর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ) হওয়া রাঢ়ের এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠী সার্থবাহদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়।

শশাঙ্কের যে মেদিনীপুর ও গঞ্জাম তাম্রশাসনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, শশাঙ্ক গৌড়কর্ণসুবর্ণ থেকে ওড়িশার গঞ্জাম পর্যন্ত দণ্ডভুক্তি মণ্ডল দিয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন তাতে তাঁকে রাঢ়ের এই ভূখণ্ড যে অতিক্রম করতে হয়েছিল এরূপ ভাবনা অস্বাভাবিক নয়। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় শৈবধর্মের যে বিশেষ প্রভাব তাতে কি মহারাজ শশাঙ্কের কোনো ভূমিকা ছিল না ? কোন ভূমিকা কি থাকা অসম্ভব ? সোনাতপলের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের এখানে আসার কি বিশেষ কারণ আছে ?—সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের অপেক্ষায় আজও এ প্রশ্নটির উত্তর অজানা।

পাল ও সেনযুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের প্রাধান্য সারা বাংলায়, রাঢ়ের এই অংশেও তার ব্যতিক্রম নেই, তবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে এখানের সমাজ ও ধর্মজীবনের ছবি অপেক্ষাকৃত বেশি। সেখানে বণিক সদাগরদের ভিড়, যাঁরা গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠী সার্থবাহদেরই প্রতিনিধি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে এমন এক সদাগরকে প্রত্যক্ষ করি যিনি বিষ্ণুপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয়, বলা বাহুল্য, তিনি যে সমসাময়িক কাব্যে উল্লিখিত হওয়ার মতো মর্যাদায় উন্নীত তা তাঁর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠার কারণেই। তিনি বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবন্ত খাঁ। এই অঞ্চলের বণিককুলের প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক ক্ষমতার সামাজিক স্বীকৃতি তাই কাব্যে স্থান পেল। সুতরাং আদি মধ্যযুগেও রাঢ় বাংলার এই ভূখণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মল্লভূমের রাজধানী হিসেবে মল্লরাজাদের বিষ্ণুপুরকে পছন্দ করার কারণ শুধু সামরিক নয়, অর্থনৈতিক বিষয়টিও কাজ করেছিল বলে মনে হয়। তবে বাণিজ্য রাজতন্ত্রকে আবাহন করেছিল, না রাজতন্ত্র বণিককুলকে উৎসাহিত করেছিল তা বিচারের বিষয় রয়েই গেল। প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া বিষ্ণুপুরে রাজধানীর নগরায়ন দেখে, তার সমাজ-বিন্যাস, সঙ্গীতচর্চা, শিল্পস্থাপত্য, শিল্প কারিগরি দক্ষতা, চারু ও কারুশিল্প দেখে মুগ্ধ হল। জেলা শহর হিসেবে বাঁকুড়া তখনও দূরস্ত।

সাহায্যকারী গ্রন্থসূচি

১। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পূর্তবিভাগ (পুরাতত্ত্ব) পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৭৫ পৃ:-৪৫

২। Archaeological Survey of India

৩। বাঁকুড়া শহরটি জেলা শহর হিসেবে গড়ে উঠেছে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের অনেক পরে। শহরের নামকরণের কারণ নিয়ে মতপার্থক্যের কমতি নেই। বাঁকুড়ার কাছেই উপরশোলে প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কার প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের বসতির নিদর্শন বলা যায়। একটি ছড়ার মধ্যে এখানের আদিম খাদ্যাভ্যাসের পরিচিতি রয়েছে যেমন : কাড়া কেটে কলে ঝোল, (বাঁকুড়ায় বড়াম পুজায় শূকর বলিও তুলনীয়) তবে জানবি উপরশোল।

৪। Dist. Gazet. pp-61-63.

৫। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, পৃ : ৪০৯, কলকাতা, ১৯৯৫।

৬। (D U) History of Bengal, 1943, pp-520-521.

৭। History of Bengal, D.U. p-520.

৮। মুহম্মদ আয়ুব হসেন, 'উজানিরাজ নাগদত্ত', পশ্চিমবঙ্গ, ৮ম বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর, ১৯৭৩।

৯। চার মাস বর্ষা, পোখরনা যায়
পোখরনা গিয়ে দেখি দুয়ারে মরাই
ছোট মরাইয়ে পা দিয়ে
বড় মরাইয়ে পা দিয়ে
রাই এসোগো ঝলমলিয়ে।
বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯৫, প্রথম খণ্ড, পৃ:-৪১০।

১০। মানিকলাল সিংহ, সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী, বিষ্ণুপুর, ১৯৯০, পৃ:-৮৬।

১১। Culture of Bengal through the Ages : Some Aspects, Ed. Dr Bhaskar Chattopadhyay, (The University of Burdwan, 1988) "Essay= Tamralipta, commerce and culture", Dr Gour Pada Sen, pp.-1466.

১২। আকবর নামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ:-৫৮২, তুলনীয়, পূর্ব উল্লিখিত, সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী, পৃ : ১৪১।

১৩। গান বাজনা মতিচুর,
তবে জানবি বিষ্ণুপুর।

১৪। সঙ্কলক, দিল মহম্মদ, 'বিষ্ণুপুরের কুরবানবাবা,' বিষ্ণুপুর, ১৯৯৮।

১৫। বিষ্ণুপুর, লায়েকবাঁধ সহ বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে বড়ম/বড়াম্ পুজায় তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত, শূকর বলি মকর সংক্রান্তিতে আবশ্যিক, তুলনীয়, বৈতলে চতুর্ভুজা মনসার পূজারি ঢেঁতুলে বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ।

লেখক : অধ্যাপক গৌরপদ সেন, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর

বাঁকুড়ায় বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব

নীলাঞ্জনা সিকদার দত্ত

দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিম ভাগের গ্রামগুলিতে কিছু কিছু প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কার এখনও রয়েছে। যেমন এই অঞ্চলে ১৩ বৈশাখ 'হালসাল' অর্থাৎ নতুন খাতার অনুষ্ঠান হয়। সেদিন অপরাহ্ণে গৃহস্থরা গৃহের ঈশান কোণে শেওড়া গাছের ডাল গুঁজে দেন। তাঁদের মতে, এতে বজ্রপাতের ভয় থাকে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে এটি বৌদ্ধ সংস্কার।

ইতিহাস রাজবৃত্তের আবর্তনেই ভারাক্রান্ত। বড় বড় শহর রাজধানী রাজ্যের বিবরণ দিতেই তার সময় ফুরিয়ে যায়। যেসব জনপদের ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক গুরুত্ব কম, সেগুলি থেকে যায় উপেক্ষিত। তবু যদি উৎসাহ নিয়ে খুঁজে দেখা যায়, তবে এই সব আঞ্চলিক ইতিবৃত্তের বিবর্তন থেকে উদ্‌ঘাটিত হয় বহু অজানা তথ্য।

ছোটনাগপুরের রুক্ষ পার্বত্য উপত্যকার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত যেখানে ক্রমে ঢালু হয়ে এসে মিলিত হচ্ছে সমতলভূমির সঙ্গে। সেই সব অঞ্চল উনবিংশ শতকে, এমন কি বিংশ শতকের প্রথম ভাগেও ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। বৃটিশ যুগে তাই এই অঞ্চলের নাম ছিল 'জঙ্গল-মহাল'। তিনটি ভারতীয় অঙ্গ রাজ্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটেছে এখানে—পশ্চিমবঙ্গ বিহার আর ওড়িশা। কৃষি বা শিল্পের দাক্ষিণ্য নেই এই অঞ্চলে। বাসিন্দাদের মধ্যে স্থানীয় আদিবাসী বাগদি ডোম মাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য। স্থানীয় জনজীবনে তাই ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কার ও প্রথা।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এখানে মধ্যে মধ্যে জৈন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু জৈনমূর্তি এই অঞ্চলে রয়েছে যার কতকগুলি আকৃতিতে বৃহৎ, মানুষপ্রমাণ বা তার চেয়েও বড়। আবার ছোট ছোট মূর্তিও অনেক আছে যেগুলি কোনও মন্দির বা গাছতলায় কখনও বা গৃহস্থের বাড়িতে লক্ষ্মী, নারায়ণ বা শিবের সঙ্গে একই আসনে পূজা পাচ্ছেন। সামাজিক জীবনে কিছু বৌদ্ধ রীতিনীতিরও অনুপ্রবেশ লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলের রুক্ষ ও বন্ধুর পরিবেশের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি ক্ষীণ। আধুনিককালে এই অঞ্চলে জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রের অস্তিত্ব নেই। তবে রাঢ় বাংলার এই জঙ্গলময় পরিবেশে জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর অনুপ্রবেশের কারণ কি ? এক সময়ে কি এখানে এক বা একাধিক জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল ? ভেঙে পড়া মন্দিরের প্রস্তরখণ্ডগুলি কি তারই সাক্ষ্য দেয় ? কি কারণে সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেল ? ভাগীরথী অববাহিকার সমৃদ্ধ জনপদ ছেড়ে এই প্রতিকূল জঙ্গলময় পরিবেশেই বা কেন এই সব ধর্মকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল ? এই প্রশ্নগুলি উঠতে পারে স্বাভাবিকভাবেই।

বঙ্গভূমির ইতিহাস, প্রাচীন গ্রন্থে যত দূর উল্লেখ পাওয়া যায়, খুব সুস্পষ্ট নয়। ঐতরেয় আরণ্যক (আ. খৃঃ পূঃ ৭০০) 'বঙ্গ' ও 'বগধ' (মগধ)বাসীদের উল্লেখ করেছে 'অসুর' নামে। বৌধায়ন ধর্মসূত্র (আ. ৫০০/৬০০ খৃঃ পূঃ) ১।১।২-তে দেখা যায় বঙ্গ কলিঙ্গ সৌবীর প্রভৃতি দেশে আর্যরা যদি তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্যান্য কারণে গিয়ে থাকেন তবে তাঁদের যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে শুদ্ধিলাভ করতে হবে। অতএব এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, আর্যরা বঙ্গ প্রভৃতি দেশকে সযত্নে পরিহার করতেন।

প্রাচীন ইতিহাস বলে আমাদের আলোচ্য ভৌগোলিক পরিধির সেকালের নাম ছিল রাঢ় অথবা রাঢ়া। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, রাঢ়াদেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলের অপর নাম সুহ্ম। মহাভারতের ভাষ্যকার নীলকণ্ঠও সুহ্ম এবং রাঢ় দুটি জনপদকে এক এবং সমার্থক বলেছেন। দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণ সেনের শক্তিগড় তাম্রলিপিতে বলা হয়েছে উত্তর রাঢ় ছিল কঙ্কাগ্রাম ভুক্তির অন্তর্গত। জৈন গ্রন্থমতে এই-ই হল বজ্রভূমি। রাঢ়ের এই অঞ্চলকে বলা হয়েছে অজলা ও উষর, স্থানে স্থানে জঙ্গলময়। (ভবিষ্য পুরাণ : ব্রহ্মখণ্ড, ১৫-১৬ শতক)।

সুহ্ম—সুম্ভভূমি। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে (xvi) বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে সুহ্মের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। এটিই পরবর্তী কালের দক্ষিণ রাঢ়। চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোলের সৈন্য দণ্ডভুক্তি অধিকার করেছিল। তার পরবর্তী অঞ্চলই দক্ষিণ রাঢ় বা 'তক্কন লাঢ়ম'। (তিরুমলাই লিপি)

বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৮) থেকে দেখা যায় পূর্ব বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমি ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি এই দুইয়ের মধ্যে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলকে O' Mally বলেছেন connecting link বা যোগসূত্র। ভোগোলিক বিচারে দেখা যায় পশ্চিমের উচ্চ মালভূমি থেকে বাঁকুড়ার জমি ক্রমে পূর্বে ঢালু হয়ে গেছে এবং পশ্চিমের উচ্চ ভূভাগে বেশ কিছু ছোটখাট পাহাড় রয়েছে যেমন শুশুনিয়া, বিহারীনাথ। এই উচ্চাবচ ভূপ্রকৃতির জন্য এখানে নদীগুলির প্রবাহ পশ্চিম থেকে পূর্বমুখে। নদীগুলির মধ্যে

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি

প্রধান দ্বারকেশ্বর, দামোদর ও কংসাবতী। এগুলি কিছুটা পরস্পর সমান্তরালভাবে জেলার পশ্চিম থেকে পূর্বে যেন আড়াআড়ি বয়ে গেছে।

Sir William Hunter বলেছেন—'সম্পন্ন এবং সুশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলিম জনগণের পরিবর্তে পশ্চিমের অঞ্চলগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যায় অনগ্রসর উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ করা যায় এবং এদের সংগঠনে আদিবাসী বা অর্ধ-হিন্দু উপাদানের প্রবল প্রভাব রয়েছে। (Preface to Vol.-IV, Statistical Account of Bengal)। অশোক মিত্র কৃত ১৯৫১ সালের বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই জেলার আদিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৪২ ভাগ আবার অন্যদিকে খৃস্টপূর্ব যুগ থেকেই বহিরাগত বর্ণহিন্দুরা ধীরে ধীরে গাঙ্গেয় উপত্যকাতে যেমন রাঢ়ভূমিতেও তেমনই অনুপ্রবেশ করেছিলেন। নতুন বাসযোগ্য স্থানের সন্ধান এবং জীবিকা অর্জন—অস্তিত্ব রক্ষার এই অন্যতম দুটি শর্ত অনুসারে আর্য হিন্দু সংস্কৃতি আর আদিবাসী সংস্কৃতি উভয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

এই সংমিশ্রণের ফলে রাঢ় অঞ্চলে যে বিশিষ্ট সংস্কৃতির ধারা গড়ে উঠেছিল, ভাগীরথীতীরবাহী জনপদের সভ্যতা থেকে তা অনেকাংশে স্বতন্ত্র। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি স্মরণ করেছেন—'দুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষের ক্ষেত্র, সমন্বয়ের ক্ষেত্র হল মধ্যবর্তী রাঢ় অঞ্চল'। (অর্থাৎ বর্তমান বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলা)।

জৈন আচারাঙ্গ সূত্রের (খৃঃ পূঃ ৩০০) রাঢ় বিষয়ক কাহিনীটি বহু পরিচিত। তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ় দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তখন এই প্রদেশ ছিল পথঘাটবিহীন জঙ্গলাকীর্ণ। জৈন সন্ন্যাসীদের বহু ক্লেশে কুখাদ্য খেয়ে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। এমন কি অনুন্নত রাঢ় দেশের অধিবাসীরা তাঁর প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল, ঢিল ছুঁড়েছিল। অর্থাৎ আর্যসভ্যতা এদেশে তখনো ছাড়পত্র পায়নি। নীহাররঞ্জন রায় সঙ্গতভাবেই অনুমান করেছেন যে, তাঁরা আদিবাসীদের আমিষবহুল খাদ্যই পেয়েছিলেন। সেটিই 'অ-খাদ্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মতে, খৃস্টিয় যুগ শুরু হবার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার ইত্যাদি প্রয়োজনে বহু আর্য বাংলায় আসেন এবং বসবাস করতে থাকেন। বিশেষ করে গুপ্তযুগের তাম্রশাসন ও শিলালিপিগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, খৃঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের যথেষ্ট পূর্বেই আর্যদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রভাব রাঢ় অঞ্চলে ছিল মন্থর-বিস্তারী, কারণ এই অরণ্যভূমির জনগণ তাদের প্রাচীনতর অনার্য-ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেনি। এমন কি বর্তমানকালেও এই আর্যেতর সমাজ ও ধর্মের অস্তিত্ব জীবন্ত রয়েছে। এখানেই রাঢ় সংস্কৃতির বিশেষত্ব। আবার জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্মমতও বিভিন্ন যুগে আলোচ্য অঞ্চলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অপর দিকে বুদ্ধ স্বয়ং সুহ্মরাষ্ট্রের 'সেদক' নামক নগরে এসে ধর্ম প্রচার করেন। (I.H.J. 1950 Vol XXXII, No. 1-4, P 193)

বৃহত্তর রাঢ় বংশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে জৈন তীর্থঙ্করের ভগ্নমূর্তি

তেলপত্ত জাতকে বুদ্ধদেবের সুহ্মের অন্তর্গত 'দেশক' নগরে আগমন ও 'জনপদকল্যাণী সূত্র' দেশনারে উল্লেখ আছে।

সিংহলি বৌদ্ধ গ্রন্থ দীপবংশ (IX. 1) ও মহাবংশে (VI. 35) উল্লেখ আছে বঙ্গরাজ সিংহবাহু লাল বা রাঢ় জনপদে সীহপুর নামে নগর পত্তন করেন। অবশ্য উল্লিখিত লাট দেশ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন রাঢ় জনপদ, না কি কাথিয়াবাড় অঞ্চলের লাটদেশ সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

'বঙ্গীশ' নামে একজন বঙ্গদেশজাত ভিক্ষুর নাম পাওয়া যায় (অপদান পালি, ১৪৫ (নালন্দা); বঙ্গে জাতোতি বঙ্গীসো বচনো 'হস্সরোতি'। কালিক নামে তাম্রলিপ্তের একজন ভিক্ষু ছিলেন ষোড়শ মহাস্থবিরের অন্যতম (বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৪০)। এইসব উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধের সমকালেই পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। তবে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক প্রভাবের নিশ্চিত প্রমাণ উত্তরবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে যতটা পাওয়া যায় রাঢ়ভূমি বিশেষত দক্ষিণ রাঢ়ে বর্তমান বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের সেরূপ ব্যাপকতা চোখে পড়ে না। দামোদর নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বর্ধমানের পানাগড় অঞ্চলে অবশ্য একটি বৌদ্ধস্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। (সময়কাল আ. ৮ম

শতক—Mahabodhi 1974. Vol-42 April-May, No. 4-5, P. 214)। তাম্রলিপ্ত শহরেও ফা-হিয়েন বৌদ্ধধর্মের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র দেখেছিলেন। সেখানে বাইশটি সংঘারামে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। কিন্তু বাঁকুড়া অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর বাঁকুড়ায় কিছু বিক্ষিপ্ত প্রত্ননিদর্শন ব্যতীত, বৌদ্ধস্তূপ বা বিহারের সন্ধান দেখা যায় না। সমাজজীবনে অবশ্য বৌদ্ধ প্রভাব পড়েছিল। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

জৈনধর্মের প্রভাব ও প্রসার বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে এর তুলনায় ব্যাপক। জৈনধর্মে উল্লেখিত 'সমেত-শিখর' অর্থাৎ তীর্থঙ্করদের সাধনস্থল হল বিহারের পরেশনাথ পাহাড়। এটি রাঢ়ভূমির অনতিদূরে অবস্থিত। সুতরাং নিকটবর্তী অঞ্চলে জৈনধর্মের বিস্তার ঘটা স্বাভাবিক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ধানবাদ-বরাকর এলাকা থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রেওয়া এবং ওড়িশার অরণ্যময় অঞ্চল পর্যন্ত জৈনধর্ম একদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সব স্থানে বহু জৈনমন্দির ও জৈনমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পুরুলিয়া সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু জৈনমূর্তি ও দেবালয়ের ভগ্নাংশের নিদর্শন সযত্নে রাখা আছে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশনের একটি ক্ষুদ্র মিউজিয়ামে। মগধ মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং সহজেই বোঝা যায় প্রান্তিক বন্দরনগরী তথা বৌদ্ধধর্মকেন্দ্র তাম্রলিপ্তের সঙ্গে মগধের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ধরাপাটে মন্দিরের গায়ে তীর্থঙ্কর মূর্তি

সিংহলি গ্রন্থ মহাবংশে বলা হয়েছে মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠাবার সময়ে 'বিন্ধন পথ' দিয়ে মাত্র সাতদিনে পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। সুতরাং মগধ ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে কোনও সংক্ষিপ্ত পথ ছিল। সে পথ অবশ্যই বিহারের জঙ্গলময় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাঢ়ভূমি পার হয়ে। আবার সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং প্রায় ৬০০ বণিকের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে বোধগয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৭২-৭৩ খৃঃ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের মিঃ বেগ্‌লার রাঢ়ভূমিসন্নিহিত পশ্চিমাংশের অরণ্যে বেশ কিছু জৈন পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন এবং কিছু কিছু প্রাচীন পথঘাটের সন্ধান পান। সুতরাং এই প্রাচীন পথ, যা তাম্রলিপ্ত থেকে রাঢ়ভূমির বুক চিরে বর্তমান বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিহারের মালভূমি অঞ্চল পার হয়ে পাটনা-বোধগয়ার দিকে চলে গেছে তার বহুল ব্যবহার ছিল। বর্তমান বিহারের গিরিডি-নওয়াদা অঞ্চলে 'রানী-গদার' নামক স্থানে কয়েকটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলির অবস্থান ও আকৃতি দেখে ঐতিহাসিকরা মনে করছেন এগুলি পথের ধারে সরাইখানারূপে ব্যবহৃত হত (তথ্য : অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই সব পথ, বাণিজ্য পথরূপে ব্যবহৃত হত।

বাঁকুড়া সদর শহরে একটি অতি প্রাচীন চৌমাথা দেখা যায়। (এটির বর্তমান নাম রানীগঞ্জের মোড়।) এখান থেকে একটি প্রাচীন পথ পশ্চিমদিকে পাটপুর-কেঞ্জাকুড়া-ছাতনা থেকে পুরুলিয়ার পথে রঘুনাথপুর-তেলকুপি-ঝরিয়া-রাজৌলী-রাজগীর হয়ে পাটনা পৌঁছেছে। অপর একটি প্রাচীন পথ দঃপঃ মুখে দেউলভিড়া হয়ে পুরুলিয়া জেলার পাকভিড়া, মানবাজার-বরাবাজারের মধ্য দিয়ে দুলমির কাছে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বুদ্ধগয়ার দিকে প্রসারিত। তৃতীয় পথ উত্তরদিকে গঙ্গাজলঘাটি-মেঝিয়া হয়ে দামোদর পার হয়ে রানীগঞ্জের পথে ভীমগড়-নাগোর-বক্রেশ্বর-মুঙ্গের গিয়েছে। মানিকলাল সিংহ মনে করেন এই সব পথেই উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন নগরগুলির সঙ্গে মধ্য রাঢ় অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে উত্তর রাঢ় থেকে কলিঙ্গ যাবার একটি বহু প্রাচীন পথ ছিল বর্তমানের কাঁকসা-সোনামুখী-অবন্তিকা-বিষ্ণুপুর-দণ্ডভুক্তিগামী। এবং দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ নদের তীর বরাবর ছিল তাম্রলিপ্তগামী প্রাচীন পথ। কারণ, তাম্রলিপ্ত তখন প্রান্তিক বন্দররূপে দেশবিদেশে খ্যাত। বহু দূর দূর থেকে এই সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে ভিড় করত বণিকেরা। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সব ভাগ্যান্বেষী বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন বৌদ্ধ এবং জৈন ভিক্ষুরা, নতুন নতুন দেশে নিজ ধর্মের পতাকা তুলে ধরার জন্য। বিশেষ করে জনাকীর্ণ বন্দরনগরীতে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসার, ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্র লাভের সুযোগ থাকত। এইভাবে বাণিজ্য পথের পাশে পাশেই বণিকদের যে সব বিশ্রামকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, নিয়মিত বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সেখানেই ধর্মকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, [illegible] রাঢ়ের যে সব স্থানে জৈন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তার

জৈন মূর্তি—বর্তমানে হিন্দু বিষ্ণুমূর্তি, আবার মনসারূপেও পূজিত—ধরাপাট

সবগুলিই উল্লেখিত পথগুলির উপর অবস্থিত। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই বাণিজ্য পথ ধরেই উত্তর ভারত থেকে এবং কলিঙ্গ থেকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল রাঢ় অঞ্চলে। কারণ, কলিঙ্গে এর বহু পূর্বেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (খারবেল শিলালিপি)।

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করেছেন যে, জঙ্গলাচ্ছন্ন মধ্য রাঢ় অঞ্চলে নদীপথই ছিল লোক চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এখানেও সভ্যতা কেন্দ্রগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই দ্বারকেশ্বর ও কংসাবতীর গতিপথ ধরেই কিছু দূরে দূরে বর্ধিষ্ণু প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র ধরাপাট, ডিহর, অম্বিকানগর প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল।

পুরুলিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে দুলমি, দেউলি, সুইসা প্রভৃতি গ্রামে কয়েকটি জৈনমন্দির এবং পার্শ্বনাথ ও শান্তিনাথের জৈনমূর্তি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আছে পুরুলিয়ার পাকভিড়া গ্রামের পদ্মপ্রভ, ঋষভনাথ ও প্রতিমা—সর্বতো ভদ্রিকার মূর্তি। নির্মলকুমার বসু মনে করেন, 'মানভূম একসময় জৈনধর্মের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। প্রসঙ্গত তিনি তেলকুপি, ছড়রা, লৌলাড়া, পুঞ্চা প্রভৃতি গ্রামের জৈনমূর্তির উল্লেখ করেছেন। তেলকুপি গ্রামটি ডি ভি সি-র পাঞ্চেৎ জলাধার নির্মাণের সময় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে (১৯৫৭ খৃঃ)। জে ডি বেগলার তাঁর 'রিপোর্ট অফ এ ট্যুর থ্রু বেঙ্গল প্রভিন্সেস' (১৮৭৮) রচনায় উল্লেখ করেছেন এখানে ২০টি মন্দির ছিল। বর্তমানে মাত্র ৩টি মন্দির টিকে আছে। এই অঞ্চলে তৈলকম্প নামে একটি রাজ্য ছিল মনে করা হয় (আ: একাদশ শতক, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত থেকে তৈলকম্প রাজ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়)। এই তৈলকম্প বা তেলকুপি ছিল বন্দরনগরী। জৈন ব্যবসায়ী বিশেষত তামার ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চলে যাতায়াত করতেন, কারণ তামাজুড়ি ও তামাখুন এই দুটি প্রাচীন তাম্রখনি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। যাই হোক এখানে বিক্ষিপ্ত কিছু ঋষভনাথের মূর্তি, ভগ্ন তীর্থঙ্কর মূর্তি, জৈন শাসন যক্ষিণী ও বাহুবলির মূর্তি, জৈন দেবী চক্রেশ্বরী (স্থানীয়ভাবে নীলকণ্ঠবাসিনী বলে পরিচিত) প্রভৃতি এখনো চোখে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাম্রলিপ্তে জৈনধর্মেরও একটি ক্ষমতাশালী কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কারণ, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস যে গোদাস-গণ প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীকালে তা চারটি শাখায় বিভক্ত হয়। তাই অন্যতম গণই হল 'তাম্রলিপ্তিকা'।

পাল ও সেন-যুগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম, কারণ পাল রাজারা উদার মতাবলম্বী হলেও বৌদ্ধ-ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু জৈনধর্মের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। পাল বা সেন রাজাদের তাম্রশাসনে জৈনধর্মের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার রাঢ় অঞ্চল যেহেতু পাল রাজবংশের সুদৃঢ় কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্গত হয়নি, যেহেতু সেখানে বেশির ভাগ স্থানে স্থানীয় দেশজ রাজাদের শাসনই প্রচলিত ছিল, সম্ভবত সে কারণেই খৃস্টিয় অষ্টম-নবম শতকেও এই অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত পোষণ করেন।

বাঁকুড়ার স্থানে স্থানে জৈনমন্দির ও জৈনমূর্তির বহু নিদর্শন চোখে পড়ে। তবে এগুলি প্রায় সবই অন্তত খৃস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে নির্মিত। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই জৈন নিদর্শনগুলি যে কিভাবে মিশে গেছে সে বিষয়টি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক।

বাঁকুড়ার একেবারে উত্তর-পশ্চিমে বিহারীলাল পাহাড়। এর উত্তর সানুদেশে একটি আধুনিক ছোট হিন্দু মন্দিরের পাশে একটি বহু প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি আছে। এর মাথায় নাগছত্র। অন্যদিকে একটি দ্বাদশভুজ মূর্তি আছে যার নির্মাণে জৈন তীর্থঙ্কর ও ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণুমূর্তির এক অভিনব সংমিশ্রণ দেখা যায়। দামোদর নদ এখান থেকে মাত্র দু-তিন মাইল দূরে। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন এখানে একটি জৈন ধর্মকেন্দ্র হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বেশ কয়েকটি জৈন ধর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বাঁকুড়া শহরের অনতিদূরে সোনাতোপলের মন্দির একটি বৃহৎ ভগ্নস্তূপ। এটি দেউলরীতির স্থাপত্যের নিদর্শন এবং বহুলাড়ার বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে এর গঠনরীতির বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সংলগ্ন মাটির ঢিপিগুলিতে যথাযথভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক

অনুসন্ধান করা হয়নি। হয়তো সেখান থেকে জৈনধর্মের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।

বহুলাড়া গ্রামের বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির। সরসীকুমার সরস্বতীর মতে এই ইটের মন্দিরটি সামগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। (প্রতিষ্ঠাকাল আ: দশক/একাদশ শতক।) তবে আদিতে এটি কোন ধর্মের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সঠিক নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। বর্তমানে এটি শিবমন্দির। আবার গর্ভগৃহের দেওয়ালে গণেশ ও দুর্গামূর্তির মধ্যে একটি প্রায় চারফুট উচ্চতার পার্শ্বনাথ মূর্তি গাঁথা রয়েছে। এখন অবশ্য এটিকে জৈনরীতিতে উপাসনা করা হয় না। নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের জনপ্রিয়তার ফলে জৈনমন্দিরে শিবকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, না কি কোনও নিকটবর্তী স্থান থেকে পার্শ্বনাথকে এনে শিব মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে, ইতিহাস সে বিষয়ে নীরব। তবে সংলগ্ন ধ্বংসাবশেষ খনন করে ছোট ছোট গোলাকৃতি ও চতুষ্কোণ স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন এর উপরাংশে যেসব স্তূপ ছিল সেগুলি 'দেখিতে বিহারের স্তূপ অথবা বর্ধমান স্তূপের ন্যায় ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।' মথুরার কাছে কঙ্কালীটিলায় অনুরূপ জৈনস্তূপ দেখা যায়। মন্দিরের বহিরঙ্গে যে ব্যাপক অলঙ্করণ রয়েছে তার মধ্যে কুলঙ্গির উপরে উপরে দেউলের ছোট ছোট প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা আছে। ফলে মন্দিরের মূল চূড়াটি ভেঙে গেলেও মূল মন্দিরের নক্‌শাটি অনুমান করা যায়। এক্তেশ্বর এবং ডিহরের মন্দিরগাত্রেও একই পদ্ধতির অলঙ্করণ আছে। এটি ওড়িশা শৈলীর প্রভাব।

ধরাপাট—দ্বারকেশ্বরের উত্তরতীরের এই গ্রামটিতেও একটি রেখ-দেউল দেখা যায়। এর দুদিকের দেওয়ালে দুটি কালো পাথরের যথাক্রমে ছফুট ও তিন ফুট উচ্চতার দুটি দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি আর একদিকে একটি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি দেখা যায়। অদূরে প্রাচীন মন্দিরের বিলুপ্তপ্রায় ভগ্নাবশেষ রয়েছে। নিকট অতীতে বর্ধমানরাজ এখানে কৃষ্ণরাধার বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে সেটিও অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও এই মন্দিরে হিন্দু রীতিতেই সন্তানহীনা নারীরা এখানে পূজা ও মানত করে থাকেন। মন্দিরগাত্রে দিগম্বর মূর্তি থাকার জন্যই সম্ভবত এর নাম 'নেংটা ঠাকুরের মন্দির'।

এই রেখদেউলের অদূরে একটি আধুনিক পাকা ঘরে একটি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ মূর্তিকে মনসা জ্ঞানে পূজা করা হয়। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে জৈনমূর্তি থেকে ব্রাহ্মণ্য দেবতাবিগ্রহে রূপান্তরের এটি একটি বিশেষ কৌতূহলজনক দৃষ্টান্ত। সপ্তমুখী নাগছত্রধারী এক পুরুষ মূর্তি এখানে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দুটি আজানুলম্বিত হাতের পাশে পাশে শঙ্খ ও পদ্ম উৎকীর্ণ করা হয়েছে এবং পিছনের পাথরে অতিরিক্ত দুটি শঙ্খ ও চক্রধারী হাত খোদাই করা হয়েছে। জৈনমূর্তি থেকে হিন্দু মূর্তিতে রূপান্তরের এইরূপ নিদর্শন আরও থাকতে পারে। এটি গবেষণাসাপেক্ষ। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশের প্রভাবে অথবা পালযুগের সার্বিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্লাবনে এটিকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে। তবে বর্তমানে এই পুরুষ মূর্তিটি নাগদেবী মনসারূপে সাড়ম্বরে পূজা পান। অর্থাৎ দেবত্বের বিবর্তন আবার ঘটেছে।

বিষ্ণুপুর-সোনামুখীর পথে দ্বারকেশ্বরের উত্তর [illegible] গ্রাম। বাঁকুড়া জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এখানে দুটি ভগ্ন ল্যাটেরাইট পাথরের শিবমন্দির আছে। (আ: একাদশ শতক—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। একদা দ্বারকেশ্বর বয়ে যেত ডিহরের উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে। বর্তমানে সেই মজে যাওয়া পুরনো নদীখাতের তীরে ডিহরের প্রাচীন ঢিবিগুলি দেখা যায়। এই গ্রাম থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং তার পরবর্তীকালের যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি ভবনে সেগুলি সংরক্ষিত আছে। ডিহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে কিন্তু বেশ কিছু বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন ডিহরে বুদ্ধদেবের মুখ আঁকা একটি ক্ষুদ্র শ্বেতপাথরের লকেট পাওয়া গেছে। নিকটবর্তী পলাশী গ্রাম থেকে বৌদ্ধ দেবীমূর্তি ধরমপুর, মায়াপুর, পাঁচাল, ময়নামুনি, তালাজুড়ি প্রভৃতি গ্রাম থেকে পাথরের বিভিন্ন আকৃতির বুদ্ধমূর্তি এবং ডিহর ধাতুনির্মিত নিবেদনস্তূপের উপরাংশ ও পোড়ামাটির গোঁজ আকারের নিবেদনস্তূপ পাওয়া গেছে। ডিহরের নিকটবর্তী ছিলিমপুর, বনকাটি, ঠাকুরপুর, গহীরহাটি (বর্তমান জয়কৃষ্ণপুর) ইত্যাদি গ্রামে সারিবদ্ধ ইঁটের তৈরি অনেকগুলি প্রকোষ্ঠের গাঁথনি ও ধ্বংসাবশেষের ঢিপি দেখা যায়। মানিকলাল সিংহের মতে, এখানে সঠিক প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করলে হয়তো কোনও প্রাচীন নির্মাণের সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ, তিনি বেগলারের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, ওই সব ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ইঁটের আকার উত্তর ভারতীয় প্রসিদ্ধ বিহার বা স্তূপের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ইঁটের অনুরূপ (পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি : পৃঃ ৫৩)।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিম ভাগের গ্রামগুলিতে কিছু কিছু প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কার এখনও রয়েছে। যেমন [illegible] অর্থাৎ নতুন খাতার অনুষ্ঠান হয়।

বাঁকুড়ার একেবারে উত্তর-পশ্চিমে বিহারীলাল পাহাড়। এর উত্তর সানুদেশে একটি আধুনিক ছোট হিন্দু মন্দিরের পাশে একটি বহু প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি আছে। এর মাথায় নাগছত্র। অন্যদিকে একটি দ্বাদশভুজ মূর্তি আছে যার নির্মাণে জৈন তীর্থঙ্কর ও ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণুমূর্তির এক অভিনব সংমিশ্রণ দেখা যায়। দামোদর নদ এখান থেকে মাত্র দু-তিন মাইল দূরে। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন এখানে একটি জৈন ধর্মকেন্দ্র হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

সেদিন অপরাহ্ণে গৃহস্থরা গৃহের ঈশান কোণে শেওড়া গাছের ডাল গুঁজে দেন। তাদের মতে, এতে বজ্রপাতের ভয় থাকে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে এটি বৌদ্ধ সংস্কার।

ডিহর ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের যতগুলি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, বাঁকুড়ার অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাচীন ভারতীয় জমির 'মানক'রূপে ব্যবহৃত 'আঢ়ক', 'দ্রোণ' প্রভৃতি পরিমাপ মৌর্যশুঙ্গ যুগ থেকে অদ্যাবধি আলোচ্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। মানিকলাল সিংহ আরও মনে করেন যে, বাঁকুড়া অঞ্চলে ব্যবহৃত দত্ত, রক্ষিত, পাল, দে প্রভৃতি পদবিগুলিও বৌদ্ধ সংস্কার থেকেই অনুসৃত হয়েছে। কারণ, সাঁচিস্তূপের ও অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধভক্ত এবং দাতাগণের নামে রক্ষিত, পাল, দত্ত প্রভৃতি বিশেষণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য সমস্ত ভূভাগেই বিভিন্ন গ্রামের খোলা গাছতলায় বা ছোট কুটিরে, ছোট ছোট বেদীর ওপর বহু দেবপূজার 'থান' (স্থান) দেখা যায়, যেখানে হিন্দু/বৌদ্ধ/জৈন/আদিবাসী যে কোনও প্রকার মূর্তিই ফুল-বেলপাতা-সিঁদুরযোগে পূজিত হয়ে থাকেন। স্থানীয় জনসাধারণের মিশ্র ধর্মবিশ্বাস এগুলিকে একই পর্যায়ভুক্ত করেছে। ধরাপাটের নিকটবর্তী বিষ্ণু/জৈনমূর্তির মনসা মূর্তিতে পরিণতির কথা আমরা এর পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এইভাবে স্থানীয় জীবনযাত্রার সংমিশ্রণে বেশ কয়েকটি জৈনমূর্তির রূপান্তরের কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

'ছান্দার'-এর কাছে 'পাঁচাল' গ্রামের একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পুকুরের নাম 'পরশা'। এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'পরশাসিনী'। পরশা—নামটি তীর্থঙ্কর পরেশনাথের নামের অপভ্রংশ হতে পারে। এই পুকুর থেকেও বেশ কয়েকটি প্রাচীন দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। স্থানীয় শিবপূজার সমস্ত উৎসব এই পুকুরটিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। আবার চুয়ামসনা গ্রামের কপিলেশ্বর শিবের গাজনে এবং স্থানীয় মনসাপূজার সময় একটি পাথরের তৈরি জৈন দেউলের প্রতিকৃতিকে পূজা করা হয়। এই প্রতিকৃতিতে আদিনাথ, শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের মূর্তি রয়েছে।

দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলে জৈনধর্মীয় নিদর্শনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। সম্ভবত পাল-সেন যুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান দেখা দেয়, তখনও ওইসব অঞ্চলে দুর্গমতার কারণে পূর্বতন জৈন প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই এখনও বেশ কিছু জৈনমূর্তি এই সব অঞ্চলে দেখা যায়। অবশ্য আধুনিককালে এগুলি সবই লৌকিক প্রথানুযায়ী পূজিত হয়। যেমন জৈন শাসন যক্ষিণীর মূর্তি। রানীবাঁধ থানার অম্বিকানগরের অম্বিকা দেবী, রাইপুর থানার রাইপুরের মহামায়া, রাইপুর থানার সাতপটোমগুলকুলীর অম্বিকা, সিমলাপাল থানার জোড়সা ও গোতড়া গ্রামের অম্বিকা দেবী—এঁরা সকলেই জৈনশাসন যক্ষিণী। ইনি তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শাসনযক্ষিণী। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় উল্লিখিত যে সব গ্রামে এই অম্বিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন সেই সব গ্রামে দুর্গা প্রতিমার পূজা নিষিদ্ধ। অম্বিকাই সেখানে দুর্গারূপে পূজিত হন। বাঁকুড়া জেলার এই সব অম্বিকা মূর্তির অধিকাংশের রূপই হল একটি ফলন্ত আমগাছের তলায় শিশু সঙ্গে এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন। পায়ের কাছে একটি সিংহ।

অনুরূপভাবে উত্তর বাঁকুড়ায় দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদের

প্রাক মুসলিম যুগের পাথরের দেউল—অম্বিকানগর

মধ্যবর্তী প্রাচীন গ্রামগুলিতে 'আসিনী' নামযুক্ত দেবীদের পূজার প্রচলন দেখা যায়। যেমন ছান্দাও গ্রামের জঙ্গলাসিনী, পাঁচাল গ্রামের পরশাসিনী, বাঁকুড়া শহরের জিনাসিনী, রাঢ়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে এরূপ আরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী গ্রাম-দেবতারূপে পূজা পেয়ে থাকেন এবং এই সব গ্রামগুলিতে পৃথকভাবে শারদীয়া দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ। যেমন লোখেশোলের দেবী কামাখ্যা, নাড়িচা গ্রামের সর্বমঙ্গলা দেবী, আবার বর্তমান মেদিনীপুর জেলার খড়বেতার সর্বমঙ্গলা, গোয়ালতোড় গ্রামের সনকা প্রভৃতি। মানিকলাল সিংহ মনে করেন, এঁরা 'আসিনী' শব্দযুক্ত বৌদ্ধ দেবী। পালযুগে যখন বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন এই সব দেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ার রানীবাঁধের ছমাইল উত্তর-পশ্চিমে কুমারী ও কংসাবতী নদীর সঙ্গমস্থল। এখানে অম্বিকানগর গ্রামে একটি প্রাচীন পাথরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে আধুনিককালে শিবের পূজা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি জৈন মন্দির ছিল (আঃ একাদশ শতক—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। এখানে শিবলিঙ্গের পাশে একটি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান সুন্দর ঋষভনাথের মূর্তি দেখা যায়। এর পশ্চাৎপটে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্তি, বারটি

তিনটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি দেখা যায়। শ্রীমতী মিত্র কংসাবতীর তীরে কেন্দুআ গ্রামের কাছেও অপর একটি জৈন কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। এখনও বহু প্রস্তরখণ্ড রয়েছে যেগুলিকে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ 'আমলক', 'খুরা', 'মণ্ডপ', 'খপুরি' ইত্যাদির অংশ পার্শ্বনাথ মূর্তির ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি বলে বোঝা যায়।

জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বয়ে গেছে 'শিলাবতী' বা শিলাই নদী। এর তীরে প্রাচীন গ্রাম 'হাড়মাসড়া' থেকে কে এন দীক্ষিত একটি বৃহৎ তীর্থঙ্কর মূর্তি আবিষ্কার করেন। নাগছত্রযুক্ত দিগম্বর পার্শ্বনাথের মূর্তিটি প্রায় পাঁচফুট উঁচু। তালডাংরা থানার দেউলভিড়া গ্রামে যোগাসনে উপবিষ্ট একটি নাগছত্রধারী পার্শ্বনাথ মূর্তি দেখা যায়।

বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি ভবনে সলদা গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংগৃহীত কয়েকটি মূর্তি দেখা যায়। এগুলিকে জৈন তীর্থঙ্করদের পিতামাতারূপে ঐতিহাসিকরা নির্দেশ করেন। ফলন্ত আম্রবৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট নারী ও পুরুষ। উভয়েরই কোলে শিশুমূর্তি। নিচে পাঁচজন তীর্থঙ্করের মূর্তি।

অতি সম্প্রতিকালে জয়কৃষ্ণপুর থেকেই আবিষ্কৃত দুটি টেরাকোটার টালি বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি ভবনে সংগৃহীত হয়েছে। এই ফলকচিত্রে দেখা যায় নগ্ন পুরুষমূর্তি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

তীর্থঙ্কর ও তীর্থঙ্করের পিতামাতা—পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে সংরক্ষিত

সারিতে দুই দুই করে খোদাই করা। অম্বিকা এখানে প্রধানা দেবী। তাঁর পূজা হয় আধুনিক একটি মন্দিরে। তাঁর মূর্তি কাপড়ে ঢাকা, মুখমণ্ডল সিঁদুরে লিপ্ত। তার দুটি হাতের আভাস পাওয়া যায়, যার একটি ছোট মূর্তির মাথায় রাখা, পদতলে সম্ভবত বাহন সিংহ। দেবলা মিত্র এখানে আরও কিছু তীর্থঙ্করের মূর্তির খণ্ডাংশ দেখেছিলেন (এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল—১৯৫৮)। অনুমান করা যেতে পারে যে নদীপথের যোগসূত্রে এখানেও একটি জৈন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, যেটি কালক্রমে তার নিজস্বতাকে পরিবর্তিত করেছে।

কিছুদূরে 'চিৎগিরি'তে শ্রীমতী মিত্র দেখেছিলেন প্রাচীন লাল বালিপাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও একটি বহু প্রাচীন শান্তিনাথ মূর্তি। 'বরকোলা'র প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকেও অম্বিকা মূর্তি, তীর্থঙ্কর মূর্তি, পার্শ্বনাথের পাদপীঠ, তীর্থঙ্কর খোদিত ক্ষুদ্র নিবেদনস্তূপ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এই স্তূপটি থেকে লুপ্ত মন্দিরটির স্থাপত্যভঙ্গিমা বোঝা যায়। এটি উত্তর ভারতীয় রেখ-দেউলের অনুকৃতি ছিল।

অম্বিকানগরের উত্তর-পশ্চিমে 'পরেশনাথ' নামক স্থানে নিপুণ ভঙ্গিমার একটি ছফুট উচ্চ পার্শ্বনাথ মূর্তি পাওয়া গেছে। এই পরেশনাথেরই বিপরীত দিকে কুমারীর দক্ষিণ তীরে 'চিআদা'তে

তীর্থঙ্কর, সাতপাটো—মণ্ডলকুলি (দক্ষিণ বাঁকুড়া)

> **জৈনধর্মের প্রভাব ও প্রসার বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে এর তুলনায় ব্যাপক। জৈনধর্মে উল্লেখিত 'সমেত-শিখর' অর্থাৎ তীর্থঙ্করদের সাধনস্থল হল বিহারের পরেশনাথ পাহাড়। এটি রাঢ়ভূমির অনতিদূরে অবস্থিত। সুতরাং নিকটবর্তী অঞ্চলে জৈনধর্মের বিস্তার ঘটা স্বাভাবিক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ধানবাদ-বরাকর এলাকা থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রেওয়া এবং ওড়িশার অরণ্যময় অঞ্চল পর্যন্ত জৈনধর্ম একদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।**

মাথায় নাগছত্রের বদলে সাপ ফণা তুলেছে পায়ের কাছে। চোখমুখ অনেকটা আদিবাসী মূর্তির গঠনের অনুরূপ। পুরাকীর্তি ভবনের অধ্যক্ষ চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত অনুমান করেন এগুলি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিরই আদিবাসী অনুকরণ।

রাইপুর থানার সাতপাটা-মণ্ডলকুলী গ্রামে অনেকগুলি জৈনমূর্তি খোলা আকাশের নিচেই পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা মূর্তিচোরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টায় একটি মণ্ডপ তৈরি করে এগুলিকে দেয়ালে পরপর গেঁথে রেখেছেন। এখানেও নদীর ধারে বা জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছু অনাদৃত ভগ্নমূর্তি দেখা যায়। অর্থাৎ একসময় এই আপাতদুর্গম অঞ্চলেও বহু তীর্থঙ্কর মূর্তি গঠিত হয়েছিল। ধর্ম যদি এখানে বিশেষ সমাদৃত না হত, তবে এই অঞ্চলে এতগুলি মূর্তির সমাবেশ হত না।

সোনামুখী থানার নায়েববাঁধ গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে একটি সাড়ে পাঁচফুট দীর্ঘ জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় মানুষ বলেন, দামোদরের বুক থেকে এটিকে একবার বন্যার সময় পাওয়া গেছে। একে তারা 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু প্রতি শ্রাবণ মাসের প্রথম শনিবারে তাঁরা এঁকে অন্নভোগ দিয়ে থাকেন সুবৃষ্টি এবং ভাল ফসলের জন্য এবং প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, অব্যর্থ ফললাভ হয়। অতএব তীর্থঙ্কর এখন গ্রাম-দেবতা।

একইভাবে কেচন্দাঘাটের কাঁসাই নদীতীরে একটি অপরূপ অম্বিকা মূর্তি এখন গ্রামদেবতারূপে পূজা পাচ্ছেন। তাঁর মাথার উপর আম্রশাখা, পিছনের টালিতে তীর্থঙ্কর মূর্তি খোদিত, পায়ের নিচে পদ্ম, তার নিচে সিংহ মূর্তি।

আদিবাসীবহুল রাঢ় অঞ্চলে এক সময় যে জৈনধর্মের কেন্দ্রগুলি দৃঢ়মূল হয়েছিল, আলোচ্য বিবরণ থেকে এ কথা বোঝা যায়। এবং ধীরে ধীরে জৈনধর্মের ধারণা এই দেবদেবীর রূপকল্প স্থানীয় অধিবাসীদের নিজস্ব ধর্মচিন্তায় সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। যেমন পুরুলিয়া জেলার আদ্রা স্টেশনের নিকটবর্তী অঞ্চলে শরাক নামে এক উপজাতি বসবাস করেন। নিরামিষ আহার গ্রহণ, অহিংসা নীতির পালন এবং রাত্রিকালে উপবাস প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতির পালন দেখলে এদের জৈনধর্মের অনুসরণকারী বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করে জৈন 'শ্রাবক' শব্দটির অপভ্রংশ হল 'শরাক'।

আবার রাঢ়ের নিজস্ব দেবতা ধর্মঠাকুরের পূজা এই অঞ্চলে মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই ধর্মঠাকুরের রূপকল্প গড়ে উঠেছে প্রধানত শিব ও বুদ্ধের সংমিশ্রণে। কারণ, গুপ্তযুগ ও তার পরবর্তী সময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ব্যাহত হয়েছিল। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং গৌড়রাজ শশাঙ্ককে 'বৌদ্ধনির্যাতক' বলে অভিযুক্ত করেছেন। (T. Watters. On Yuan Chwang's Travels in India. Vol.-II. P-180-99) আর্যা-মঞ্জুশ্রী মূল কল্পেও বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের বিবরণ আছে। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ক্রমেই নিপীড়িত ও নবজাগ্রত হিন্দুধর্মের কাছে পরাজিত হতে থাকে। (রাধাগোবিন্দ বসাক—History of Northern Eastern India P 55)। বাংলায় পালবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম শৈবধর্মের অনুবর্তী তান্ত্রিক ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। (ভদন্ত প্রজ্ঞানানন্দশ্রী স্থবির ; পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি পৃঃ ২১)।

পালযুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকালের
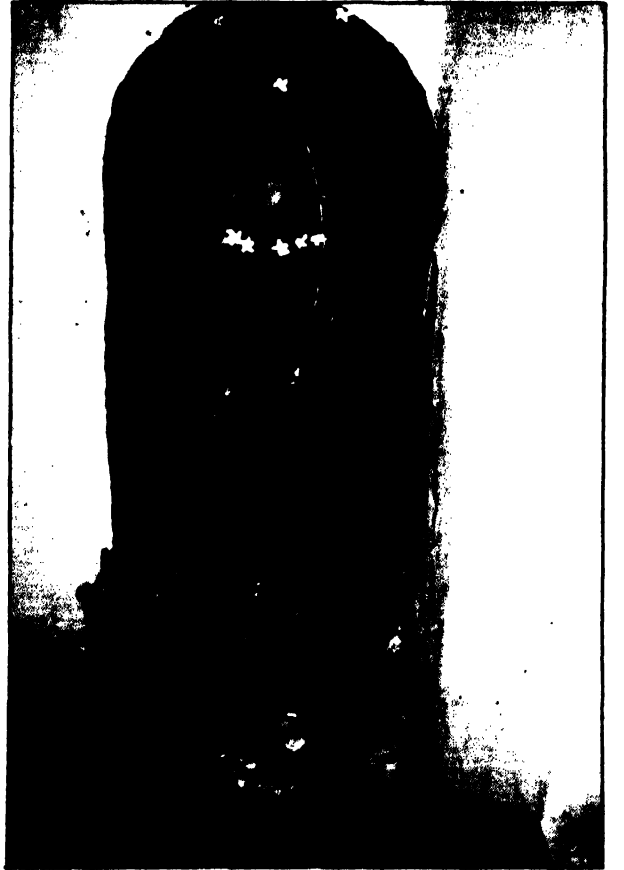
দামোদরে প্রাপ্ত নায়েরবাঁধ গ্রামে সংরক্ষিত তীর্থঙ্কর মূর্তি

মানুষপ্রমাণ অম্বিকা মূর্তি, কেচন্দাঘাট, দক্ষিণ বাঁকুড়া

পূজা করতেন (বি সরকার The Folk-elements in Hindu Culture, P 193)। পঞ্চদশ শতকে রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণে' দেখা যায় 'শূন্য' হতে ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি হয়েছে। এবং ধর্মঠাকুরই অন্যান্য দেবতার উৎপত্তিস্থল। ওই শূন্যপুরাণে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের উৎসব ও গাজনে ব্রতধারী ভক্তগণ নানাবিধ দৈহিক নির্যাতন স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন। অনেকে এর মধ্যে নির্গ্রন্থ জৈন যতিদের দৈহিক কষ্ট স্বীকারের অনুকরণ দেখেন। অনেকে আবার মনে করেন, ধর্মঠাকুর, শিব, জগন্নাথ প্রভৃতি দেবতা কল্পনায় বুদ্ধদেবের প্রচ্ছন্ন রূপ রয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন 'বুদ্ধ'কে বুদ্ধু এবং বুদ্ধমূর্তিকে জটাশংকর নাম প্রদান করা হয়েছিল। ধর্ম শব্দের বহু রূপান্তর হয়। (Discovery of Living Buddhism in Bengal P. I)। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাইপণ্ডিত বাঁকুড়া জিলারই ময়নাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে দাবি করা হয়। এবং ময়নাপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মপূজার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। অবশ্য মেদিনীপুর জিলার ময়নাগড়ও একই গৌরবের দাবিদার। যাই হোক ধর্মঠাকুর একান্তভাবে রাঢ়ভূমিরই দেবতা। বাঁকুড়া-বীরভূম-পুরুলিয়া অঞ্চলেই তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তৃত। নবজাগ্রত হিন্দুধর্মের প্লাবনে বৌদ্ধরা যখন তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা হারাচ্ছিলেন তখনই তাঁরা ধর্মঠাকুরের রূপকল্পকে গ্রহণ করেন এবং আদিবাসীবহুল রাঢ় অঞ্চলে বর্ণহিন্দু সমাজের দেবতার পরিবর্তে এই ধর্মঠাকুরই প্রভৃত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অদ্যাবধি বাঁকুড়ার স্থানীয় উৎসবে ও গাজনে সেই জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতক্ষণ আলোচিত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের জৈন স্থাপত্য নিদর্শন বা বৌদ্ধ প্রভাবের সময় নির্ধারণ করা যায় খৃস্টিয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে। বাংলার প্রখ্যাত প্রান্তিক বন্দর তাম্রলিপ্তের সুবর্ণযুগ ছিল তারও আগে, অষ্টম শতকের পূর্বে। তারপরে তার গৌরব ধীরে ধীরে অস্ত যেতে থাকে। যমুনা-সরস্বতীর তীরে বর্তমান হুগলিতে 'সপ্তগ্রাম' বন্দর ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে।, ত্রয়োদশ শতকে সোনারগাঁ প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়। স্বভাবত বণিকদের গতিবিধিও তখন শুরু হয় অন্য পথে। বিহার থেকে এবং কলিঙ্গ থেকে রাঢ়ের মধ্য দিয়ে যে বাণিজ্য পথগুলি ব্যবহৃত হত তাদের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাম্রলিপ্তের গৌরব সম্পূর্ণই লোপ পেল। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল গৌড়-মুর্শিদাবাদে। নিয়মিত দূরগামী বণিকদের গতিবিধি কমে যাবার ফলে রাঢ়, ওড়িশা ও বিহারের মালভূমি অঞ্চলে যেসব জৈন ধর্মকেন্দ্র, বৌদ্ধ সংঘ গড়ে উঠেছিল, যে সব চলাচলের পথ নিয়মিত সার্থবাহের যাতায়াত মুখর থাকত, সেগুলির প্রাণপ্রবাহ শুকিয়ে গেল। চতুর্দশ শতকের মধ্যে ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বিস্মৃত হয়ে জঙ্গলে মুখ ঢাকল। পিছনে রয়ে গেল কিছু পাষাণময় সাক্ষ্যপ্রমাণ। রাঢ়ের জনজীবনে যুক্ত হয়ে রইল কিছু কিছু বহিরাগত বৌদ্ধ ও জৈন রীতির প্রভাব।

সহায়কসূচী:

(১) **বাংলাদেশের ইতিহাস**—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা, ১৯৫৫।

(২) **বাঙালীর ইতিহাস**—নীহাররঞ্জন রায়, বুক এম্পো। কলিকাতা, ১৯৪৯।

(৩) **বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার**—এল এস এস ওম্যালী, কলিকাতা, ১৯০৮।

(৪) **বাঁকুড়ার মন্দির**—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৭১।

(৫) **বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি**—ঐ, প্রত্ন ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ, পঃ বঙ্গ সরকার, ১৯৭১।

(৬) **পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা**—সম্পাদনা, অশোক মিত্র, পঃ বঙ্গ সরকার, ১৯৭১।

(৭) **হিস্ট্রি অফ নর্থ-ইস্টার্ন ইন্ডিয়া** (দ্বিতীয় খণ্ড), রাধাগোবিন্দ বসাক, কলিকাতা, ১৯৬৭।

(৮) **পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি**—ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দশ্রী স্থবির, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৭।

(৯) **পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি**—মানিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর, ১৩৮৪।

(১০) **'সাম জৈন এন্টিকুইটিজ ফ্রম ব্যাঙ্কুরা ওয়েস্ট বেঙ্গল'**—দেবলা মিত্র, এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, খণ্ড ২৪, সংখ্যা-২, ১৯৫৮।

(১১) **'তৈলকম্প'**—সুভাষ রায়, লোকায়ত পত্রিকা, বাঁকুড়া, ২০০০।

এই প্রবন্ধ রচনার জন্য তথ্য দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন শিক্ষক, কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর) এবং চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, অধ্যক্ষ, যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। রঙিন আলোকচিত্র গ্রহণ—পার্থসারথি কুণ্ডু, বাঁকুড়া।

লেখক : অধ্যাপক, দমদম মতিঝিল কলেজ

বাঁকুড়া জেলার নামকরণ, ভাঙা-গড়ার ইতিহাস

শৈলেন দাস

বাঁকুড়া নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিভিন্ন বিতর্ক ও মতবাদ প্রচলিত আছে। ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের লেখায়, প্রাচীন চিঠিপত্রে, ম্যাপে বাঁকুড়ার কথা উল্লেখ আছে। শহরের বুকে প্রায় দুশো বছর আগে নির্মিত প্রাচীন মন্দির গাত্রে একটি তাম্রলিপিতে বাঁকুড়া নামে উৎকীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বানান লক্ষ করা যায়।

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রসঙ্গে ব্রিটিশদের অবদানকে অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দশক হতে জেলা গেজিটিয়ারগুলির সম্পাদনা ও প্রকাশনায় এক প্রশংসনীয় উদ্যম লক্ষ করা যায়। ১৯০৮ সালে ও ম্যালির গেজেটিয়ার ও রামানুজ কর রচিত 'বাঁকুড়া জেলার বিবরণ' আঞ্চলিক ভৌগোলিক ও ইতিহাসের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। বাঁকুড়া জেলার বিবরণ বইটির লেখক শুধু জেলার ইতিহাস-নৃতত্ত্বের স্বাক্ষর রাখেননি, এটি মৌলিকত্বের দাবি রাখে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি 'বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে একটি আকর প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন। বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে লাল-কাঁকুরে মাটির বুকে যদিও প্রত্নক্ষেত্রগুলির অসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিভিন্ন প্রত্নস্থান গুলির বিবরণ সহ আশু প্রকাশ হলে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটিমুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে এবং প্রাচীন জনপদ ও সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মিলবে। বঙ্গসংস্কৃতি ও ইতিহাসে বাঁকুড়া জেলার অবদানের কথা জানা যাবে। আমি সবিনয়ে নিবেদন করি দীর্ঘ তিন দশক ধরে জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জনজাতি ও গোষ্ঠী এবং তাদের জনজীবন সম্পর্কে ক্ষেত্রানুসন্ধান মাধ্যমে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভে সমর্থ হয়েছি। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান লাভে নিজেকে তৈরি করেছি। প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি। এটা কম প্রাপ্তি ও গৌরবের কথা নয়। দীর্ঘদিনের শ্রমসাধ্য ক্ষেত্রানুসন্ধানে আছে কষ্ট-সমস্যা-বেদনা-হতাশা পাশাপাশি সংগ্রহের ভাণ্ডার যদি হয় সমৃদ্ধ, থাকে নির্মল আনন্দ। এ অঞ্চলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবদান ও জেলার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্ত প্রান্তে ১৪ এপ্রিল ১৮৮১ সালে বাঁকুড়া পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা লাভ ঘটনায় দেখা যায় তখন জেলার আয়তন রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় ২৬৪৬ বর্গমাইল বা ৬৯৩৫.১৭ বর্গকিলোমিটার। বাঁকুড়া আয়তনগতভাবে বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা অতীতে বিভিন্ন সময় ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে রাজস্ব আদায়, বিদ্রোহ দমনে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে কখনও যোগ-বিয়োগের খেলায় জেলাকে ভেঙেছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে। আজ থেকে প্রায় ৩ শত বছর আগে এ জেলার নাম ছিল বকুণ্ডা বা বাকুণ্ডা বা বাঙ্গুণ্ডা। তখন বাঁকুড়া শহর ছিল না। বাঁকুড়া ছিল এক গণ্ড গ্রাম। ছোট আকারের। এই এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আদি অধিবাসীরা হল বাগ্‌দী, বাউরি, খয়রা, লোহার, হাঁড়ি, ডোম, মল্ল (মাল) প্রভৃতি জনগোষ্ঠী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর কোমভিত্তিক বসতি ছিল এবং সমাজজীবন যৌথসমাজব্যবস্থার পরিমণ্ডলে আবর্তিত ছিল। এই সব তফসিলি জাতির বসবাসে একটি চিত্র লক্ষ করা যায়—বর্ণহিন্দুরা এই সব জাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সরকারি সি এস রেকর্ডে দেখা যায় বাউরি-বাগ্‌দীরা শহরের প্রায় অনেকাংশ জমির মালিক ছিলেন এবং একদা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের আগে এই তফসিলি জাতের মানুষ তাঁদের পরিমণ্ডলে মোড়ল বা সর্দার নামে অভিহিত হতেন। সে কারণে এ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। প্রাচীন বাঁকুড়ার ইতিহাস পেতে হলে প্রাচীন পর্বের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে অনুসন্ধান করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। প্রাচীনতর সমীক্ষা তথা অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

প্রায় ৩ শত বছর আগে এ জেলার নাম ছিল বকুণ্ডা বা বাকুণ্ডা বা বাঙ্গুণ্ডা। তখন বাঁকুড়া শহর ছিল না। বাঁকুড়া ছিল এক গণ্ড গ্রাম। ছোট আকারের। এই এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আদি অধিবাসীরা হল বাগ্‌দী, বাউরি, খয়রা, লোহার, হাঁড়ি, ডোম, মল্ল (মাল) প্রভৃতি জনগোষ্ঠী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর কোমভিত্তিক বসতি ছিল এবং সমাজজীবন যৌথসমাজব্যবস্থার পরিমণ্ডলে আবর্তিত ছিল। এই সব তফসিলি জাতির বসবাসে একটি চিত্র লক্ষ করা যায়— বর্ণহিন্দুরা এই সব জাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

বীরভূম জেলা শহরের নাম সিউড়ি, মুর্শিদাবাদ জেলার শহরের নামকরণ বহরমপুর, এবং নদিয়া জেলা শহরের নাম কৃষ্ণনগর। বাঁকুড়া জেলার শহরের নাম বাঁকুড়া। জেলা শহরের নামে নামাঙ্কিত হবার রেওয়াজ আছে। সুতরাং জেলার প্রধান শহর হতে এ জেলার নামে ব্যাপকতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। মল্লভূম ভূমের রাজত্বে, এও জানা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজত্বের অধীন জেলা সদর দপ্তর ছিল বাঁকুড়া। আবার জঙ্গলমহল জেলার প্রশাসনিক কাজকর্ম চলত বাঁকুড়া সদর দপ্তরের অধীন। এই বাঁকুড়া জেলার নামের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী-ভাষাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বহু মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। জেলার অবস্থান রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিমস্থিত ভূখণ্ডে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বাঁকুড়া রাঢ়ের মধ্যমণি। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে সাঁওতালি ভাষায় 'রাঢ়' নামে একটি শব্দ আছে যার অর্থ পাথুরে জমি। রাঢ়া শব্দটির পরিবর্তিত রূপ রাঢ়। অনুরূপভাবে রাঢ় বা রূঢ় শব্দ হতে প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ ছিল 'লাঢ়'। রাঢ় বা রূঢ় শব্দ গ্রিকদের দ্বারা রিঢ়া—রিড উচ্চারিত হয়েছিল। গ্রিকেরা এই নাম সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করে থাকবে। আসলে রাঢ় রূঢ় বা লাঢ়া দেশ। 'রিড' শব্দটি মূলত অস্ট্রো-এশিয়াটিক কোনও ভাষার শব্দ একথা বলেন ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক। W. B. Oldham-এর মতে রাঢ় অঞ্চলের মুখ্য অধিবাসী বাগ্‌দিজাতি। রাঢ়ের ইতিহাসের পরিধিতে এক মুখ্য স্থান জুড়ে আছে বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ভূমিকা গঠন-বিন্যাস ও আদিম জনগোষ্ঠীর বসতির ক্ষেত্রে রাঢ় অঞ্চল সর্বাপেক্ষা অতি প্রাচীন। গ্রিকেরা রাঢ় শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ভার্জিলের জর্জিকাশ কাব্যে 'গঙ্গারিঢ়ি বা গঙ্গারিডি' নাম পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে রাঢ় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—'কেহ না পরশ করে,

লোকে বলে রাঢ়।' এখানে শব্দটির অর্থ অসভ্য বা নীচ। এ অঞ্চলে লাঢ় বা লাড়া অর্থে খড়ের আঁটি।

সাংস্কৃতিক শৈলিক, অবস্থান, সময়, প্রয়োগ ও মিশনের আদি সূচনা আর্য-ভাষা, আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি পশ্চিম রাঢ় তথা জঙ্গলমহাল অধিবাসীদের কাছে এবং সমগ্র বাঁকুড়ার পূর্বাঞ্চলে পৌঁছে দিয়েছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণ। বাঁকুড়ার সন্নিহিত পশ্চিমে মানভূম, সিংভূম ও পরেশনাথ অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রতিপত্তির নানাবিধ নিদর্শন আছে। এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের পরিণাম হীনযান ও মহাযান হিন্দুধর্মমতের ভাবপ্রবাহ জেলার সংস্কৃতি জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব আনে। আদি ঐতিহাসিক বা প্রস্তরযুগের কিছু কিছু নিদর্শন সভ্যতার এক উন্মেষ রচনায় সহায়ক হয়ে উঠছে। পুরাপ্রস্তর যুগ ও মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতকুঠার, ছাঁচিবার অস্ত্র আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে। যার ফলে নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অভিন্ন মত পোষণ করেন। পুরাকীর্তির পদচিহ্ন ধরে সভ্যতার উৎস সন্ধান করা যায়। কারণ সভ্যতার মূল পদচিহ্ন হল তার পুরাকীর্তির সম্ভার। তথ্য ও উপকরণের সাহায্যে আরোহ পদ্ধতিতে ইতিহাস রচিত হয়। পশ্চিমবাংলায় প্রস্তর যুগের নিদর্শন মূলত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম জেলা থেকে পাওয়া গেছে। এই ভূখণ্ডে প্রথম আয়ুধটি ভ্যালেন্টাইন বল কর্তৃক ১৮৬৫ খ্রিঃ বাঁকুড়া জেলার গোপীনাথপুরের কাছে কুমকুম থেকে সংগৃহীত হয়। অবিভক্ত বাংলার আদি প্রস্তর যুগের সর্বপ্রথম নিদর্শন। প্রাচীন প্রস্তর আয়ুধ যুগ থেকে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর ক্রম বিবর্তন ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাংলার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের নিবিড়তম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এই অঞ্চলে। বাঁকুড়া পরিমণ্ডলে বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীর সম্বন্ধে বিশদ জানা যায় এবং তাদের আচার-আচরণে অহিংসা-বৈরাগ্যের ধর্ম প্রভাব ছিল। বৌদ্ধ মহাযান তাঁদের ধর্মের আলোকে রাঢ়ভূমিতে কর্মকুশলতার পরিচয় রেখে গেছেন। বৌদ্ধধর্মের আচরণে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা মূলত প্রলোভন থেকে বিরত থাকার অভ্যাস। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের বিবরণও পরবর্তীকালে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ। বৌদ্ধধর্ম পরে শিব অথবা ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ক্রমে বৌদ্ধপ্রভাব বাঙালির জনজীবনে নিয়ে এল এক অভূতপূর্ব রূপান্তর। রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বরণ করে নেয় বৌদ্ধধর্মকে।

দু'হাজার বছর আগেকার কথা। জৈনযুগে এই অঞ্চলটির নাম ছিল সুহ্মভূমি। রাঢ় ও সুহ্ম এই শব্দযুগল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে মনে করিয়ে দেয়। 'রাঢ় ও সুহ্ম' বৌদ্ধ, জৈন সাহিত্যে রচনাকাল থেকে শুরু। ইতিহাস থেকে জানা যায় জৈন সম্প্রদায়ই এই দেশের আবিষ্কারক। বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চল পরিমণ্ডল জৈন সংস্কৃতির একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন অঞ্চল। বহু গ্রাম, পাহাড়, রেখদেউল প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী জৈনচিহ্ন বিদ্যমান। যদিও বহু বিলুপ্তি ঘটেছে কালের গর্ভে। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির দান অপরিসীম। সর্বপ্রথম জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্রে' জানা যায়, ২৪তম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর দুর্গম লাঢ় বা রাঢ় দেশে বজ্জ্যভূমিতে
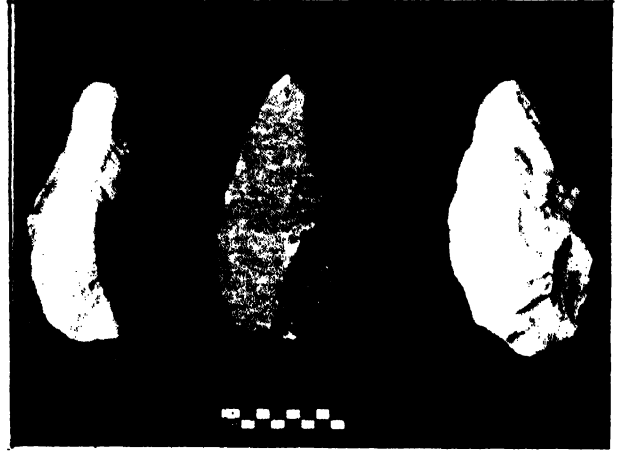
প্রস্তরায়ুধ, শুশুনিয়া

ভ্রমণ করেছিলেন। কথিত আছে, এই জনপদে নিষ্ঠুর অধিবাসীরা তাঁকে দংশনের জন্য ছু-ছু শব্দে কুকুর লেলিয়ে দিত। অস্ট্রিক ভাষায় ছু-ছু শব্দের অর্থ কুকুর। বাউরি গোষ্ঠীর এক শাখার 'টোটেম' কুকুর।

চৈতন্য চরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডে রাঢ়ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্থ শতকে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী ভাষার লিপি শুশুনিয়া পাহাড় গাত্রে উৎকীর্ণ। এটি একদা জৈন সন্ন্যাসীদের একটি গৃহ ছিল বলে মনে হয়। খ্রিস্টিয় চতুর্থ দশকে বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে পুষ্করণাধিপতি সিংহবর্মার পুত্র মহারাজা চন্দ্রবর্মার ঐতিহাসিক সত্তার নিদর্শন একটি ইতিহাসের পাতায় ও সভ্যতার স্মারকচিহ্ন নিঃসন্দেহে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলে আমাদের মনে হয়। এখানকার বসবাসকারী অধিবাসীদের সামাজিক পরিবেশ, পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাববিনিময় প্রথা সেই যুগের সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মাপকাঠিতে বলা যায় এই অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি উচ্চমানের ছিল। শুশুনিয়া পাহাড় ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি থেকে যে সব পুরাবস্তু আবিষ্কার হয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতবর্ষের প্রাচীনতম স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। লুপ্ত ইতিহাস কিছু কিছু উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। গুহা মানবেরা শিকার ও কৃষিভিত্তিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ভাষাতত্ত্বের নিরিখে আর্যজাতি সব চাইতে সংগঠিত, উদ্যমী ও সৃজনশীল জাতি বলে বিবেচিত। ১৮৫৮ সালে উইলসন অভিমত প্রকাশ করলেন বহু পূর্বে আর্যদের এক শাখা ভারতে এসে দস্যু দমন করেছিল। ঐতিহাসিকরা অনেকে বলেন আর্যরা বহিরাগত। আবার অনেক পণ্ডিতদের অভিমত ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল আর্যদের আদিবাসভূমি। উত্তর ভারতে সভ্যতার গর্বে গর্বিত আর্যরা যখন তাদের সভ্যতা বিস্তার করে চলেছেন তখন এই অঞ্চল সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। আর্যরা যেমন এদেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে নিজস্ব মৌলিক ধারা প্রবর্তন করতে পারেনি তেমনই অনার্য জাতির উপর তাদের রীতি-নীতি ক্রমবিবর্তন ধারায় প্রোথিত করার চেষ্টায় যে মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে, তাকে রাঢ় অঞ্চলের

তীর্থঙ্কর মূর্তি, সাতপাটা মণ্ডলকুলি। গ্রামবাসীদের চেষ্টায় সংরক্ষিত

বিকাশধারা, স্রোত-প্রবাহিনী নদীমাতৃক পলি দ্বারা গঠিত সমাজব্যবস্থার রূপ হিসাবে ধরে নিয়ে বাগ্‌দি, বাউরি, মাল, ডোম, খয়রা, চাঁড়াল প্রভৃতি আদি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ বলা যায়। এই অঞ্চলের সংস্কৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়, তার যেমন কতকগুলি সর্বভারতীয় চরিত্র আছে তেমন অনেকগুলি স্থানীয় এবং পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যও আছে। এই অঞ্চলে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং দ্রাবিড় সংস্কৃতির মধ্যে কোনও বিচ্ছিন্নতা চোখে পড়ে না। দুই সংস্কৃতির মধ্যে অতীতে কোনও সংঘাত ছিল এমন নজির পাওয়া যায় না। এই সব অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর জনজীবনে সভ্যতার প্রভাব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে গ্রামীণ সমাজজীবনে উন্নতমানের বিকাশ ঘটায়।

বাঁকুড়া জেলা বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বে কয়েকটি 'ভূমে' বিভক্ত ছিল। ভূম, ভূমি, দেশ। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর বাঁকুড়ার পুরাকৃতি রক্ষা নিবন্ধে বলেছেন, 'উত্তরে সামন্তভূম, দক্ষিণে মল্লভূম, পূর্বে শূরভূম, পশ্চিমে বরাহভূম, ধবলভূম, তুঙ্গভূম এক এক ভূমের এক এক রাজা ছিলেন। সে সে রাজার বংশের নামে ভূমের নাম।' এ সকল ভূমের মধ্যে মল্লভূম বিস্তীর্ণ। এককালে শূর বংশ হীনবল হইলে শূরভূম মল্লরাজার শাসনে আসিয়াছিল। মল্লভূম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত আট-নয় শত বৎসর প্রায় স্বাধীন ছিল।'

বাঁকুড়া নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিভিন্ন বিতর্ক ও মতবাদ প্রচলিত আছে। ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের লেখায়, প্রাচীন চিঠিপত্র এবং ম্যাপে বাঁকুড়ার কথা উল্লেখ আছে। শহরের বুকে প্রায় দুশো বছর আগে নির্মিত প্রাচীন মন্দির গাত্রে একটি তাম্রলিপিতে বাঁকুড়া নামে উৎকীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বানান লক্ষ করা যায়। মূলত বাঁকুড়া আর্য ভাষার শব্দ নয়, তদ্ভব শব্দ। ডঃ অতুল সুরের মতে আর্য। শব্দটি মোটেই জাতিবাচক নয়। এটা ভাষাবাচক শব্দ। যে যে সূত্র ধরে বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি, প্রাচীন নিদর্শন, অভিমত, ধর্মমঙ্গল কাব্যে এবং সরকারি চিঠিপত্র ও ম্যাপে বাঁকুড়ার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, তা ধারাবাহিকভাবে নিম্নবর্ণিত করা হল।

১। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া নামকরণ নিয়ে যে মতবাদ পোষণ করেন তা হল, সংস্কৃত শব্দ বক্র থেকে বাঁকু কথাটির উৎপত্তি। বক্র শব্দের অর্থ আঁকাবাঁকা সর্পিল। আদর অর্থে সুন্দর। আশ্চর্য সুন্দর তিনি, যাঁকে পুজো দিতে হয়। ধর্মঠাকুর পুজোয় এ ধরনের প্রশস্তি উচ্চারণ করা হয়। রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের প্রভাব অসীম। তাঁর নাম বাঁকুড়া রায়। জেলাটির নাম এদিক দিয়ে আসতে পারে বলে মনে করি।

২। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে বাঁকুড়া নামটি এক্তেশ্বর মন্দিরের বাঁকা লিঙ্গ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। তাঁরই অন্য মতে বাম (বাঁদিক) ও কুণ্ড (জলাধার) এই দুটি শব্দের সংযোগেও নামটি আসতে পারে।

৩। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক রামতনু লাহিড়ী ও বাঙলা ভাষা বিভাগের প্রধান (প্রাক্তন) ডঃ ক্ষুদিরাম দাস যে মত উল্লেখ করেছেন 'বাঁকুড়া' নাম, পদবি, বাঁকুড়া গ্রাম, পরে দেবতার নাম নিঃসন্দেহে মূল শব্দ 'বক্র'ই বটে। তবে 'ড়া' 'ড়ি' প্রত্যয় 'বৃৎ' মূল হওয়াই সম্ভবপর। তুলনীয় কবিকঙ্কণ 'ধরিতে ধরিতে যায় 'বাঁকুড়ি', 'বাকুড়ি'। অর্থাৎ বক্র হইয়া। বাঁঘুড় শব্দ তুলনীয়। খর্বাকৃতি/বক্রাকৃতি সন্তান বাঁঘুর/ বাঁকুড়/বাঁকুড়া। ডঃ

দাসের মতে মল্লরাজ কুমারের নাম থেকেই•কিন্তু 'বাঁকুড়া' জেলা নামের উৎপত্তি।

৪। ডঃ অতুল সুর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে জাতক কাহিনীসমূহ অনুসারে বুদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মে বঙ্কগিরিতে (বর্তমান শুশুনিয়া পাহাড়) এবং মনে হয় 'বঙ্কগিরি' থেকেই বাঁকুড়া নাম হয়েছে। বঙ্কগিরি বলিতে বাঁকুড়া শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণের কোনও অঞ্চলকে ধরা হয়। এ সম্পর্কে উল্লেখ্য 'শিবিগণ ইহাই আপনাকে জানাইতেছে যে কন্টিমার নদ যেখানে গিরির নিকট দিয়া বহিয়া যাইতেছে রাত্রি অবসানে সেই পথ দিয়া আপনার নির্বাসন স্থান বংকগিরি চলিয়া যাইবেন।'

৫। রেনালের ম্যাপে ১৭৭৯ খ্রিঃ 'BANCOORAH' শব্দটির উল্লেখ আছে। একটি গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত হয়ে বাঁকুড়া কথাটির প্রথম আক্ষরিক প্রয়োগ দেখা যায়। বিষ্ণুপুর শব্দটির বানান "BISSUNPOUR."

৬। ১৭৯৪ খ্রিঃ S. DAVIS একটি পত্রে "BHAKOORAH" in BISHENPORE কথার উল্লেখ আছে। ১৮৬৩ খ্রিঃ গ্যাসট্রেল সাহেবের একটি রিপোর্টে বানকুণ্ডা শব্দটির উল্লেখ করেছেন। ইংরেজরা তাদের উচ্চারণভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে স্থান-নামের বানান সেইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৭। বাঁকুড়া Record Room-এ (জেলাশাসকের অধীন দপ্তর) অনেক প্রাচীন পুঁথিপত্রে Dist-BANCOORAH লেখা পাওয়া যায়। (চাক্ষুষ দেখেছি—চাকুরিকালীন)। ১৮৫৪-৫৫ খ্রিঃ বাঁকুড়া Surveyed সেশন বছর বলে ম্যাপে উল্লিখিত রয়েছে। হাতে তৈরি ম্যাপ। লেখা আছে Sheet No. 23. Main Circuit No. 2, Dist. BANCOORAH, or BANKOONDAH.

৮। 'ড়া' প্রত্যয় দিয়ে বাঙলার গ্রামনামগুলি Austro-Asiatic Language থেকে এসেছে—এটাই বাঙলার প্রাচীন ভাষা। অড়াংক অর্থাৎ ঘর। ইঞাকি অড়াঃঞ আমার ঘর। পরবর্তীকালে 'ড়াক' Suffix হয়ে স্থান নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খাতড়া, মহড়া, রিষড়া, মোহড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাঁকুড়া নয়। বাঁকুড়া নিঃসন্দেহে দুটি শব্দের মিশ্রণে, বাঁং + কুড়া (Austro-Asiatic অর্থ বিরাট, বড়, যা ছোট নয়। বাং-না, কুড়া-ছোট) এই অর্থেই বাঁকুড়া রায়। দেবতা বা মানুষের নামবিশেষ।

৯। J. E. Gastrell Geographical Report 1863 খ্রিঃ উল্লেখ করেন বাণকুণ্ডা Civil Station থেকে বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি।

১০। O'Malley তাঁর রচিত জেলা গেজেটিয়ার পুস্তকে বলেছেন :

(১) বদড়ার রায় পরিবারের মুখ্য সামন্ত বা সর্দার 'বাঁকুড়া রায়' নামানুসারে 'বাঁকুড়া' নামকরণ হতে পারে।

(২) লোককাহিনীতে জানা যায় বীর হাম্বীরের ২২ জন পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বীর বাঁকুড়ার এই অঞ্চলে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এইভাবে নামকরণ হতে পারে। সেই সময় অঞ্চলটি অরণ্যভূমি ছিল। তিনি সেখানে জনবসতি পত্তন করে রাজ্য পরিচালনা করেন।

আর্যরা যেমন এদেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে নিজস্ব মৌলিক ধারা প্রবর্তন করতে পারেনি তেমনই অনার্য জাতির উপর তাদের রীতি-নীতি ক্রমবিবর্তন ধারায় গ্রোথিত করার চেষ্টায় যে মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে, তাকে রাঢ় অঞ্চলের বিকাশধারা, স্রোত-প্রবাহিনী নদীমাতৃক পলি দ্বারা গঠিত সমাজব্যবস্থার রূপ হিসাবে ধরে নিয়ে বাগ্‌দি, বাউরি, মাল, ডোম, খয়রা, চাঁড়াল প্রভৃতি আদি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ বলা যায়।

১১। এডু মিশ্র রচিত সংস্কৃত কাব্যে উল্লেখ করেছেন ৫টি কুণ্ড অর্থাৎ জলাশয় থেকে এই অঞ্চলের নামকরণ বানকুণ্ডা। 'বান' শব্দটি গতিবানের নির্দেশক বলে অনুমিত হয়। বানকুণ্ডা, বাঁকুড়া, বাঙ্গুণ্ডাতে রূপান্তরিত হয়ে বানকুণ্ডা এবং অপভ্রংশ হয়ে বাঁকুড়া নামে রূপ নেয়। একটি শ্লোকে 'বানকুণ্ডা' শব্দটি পাওয়া যায়।

১২। রূপরাম চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন—'আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।'

১৩। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে বলেছেন—
'সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।'

১৪। সীতারাম দাস ১৭ শতকে 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' ইন্দাসের বাঁকুড়া রায় কথা উল্লেখ করেছেন।

১৫। প্রভু রামের ১৮ শতকে ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় জয়পুরের বাঁকুড়া রায়ের কথা উল্লেখ আছে।

১৬। মানিকরাম গাঙ্গুলি তিনিও একই সুরে লিখেছেন—আমি বেলডিহার বাঁকুড়া রায়কে প্রণাম জানাই।

১৭। Mirza Nathan—তাঁর Baharistan-i-Ghaibi গ্রন্থে যশোরে 'বাঁকুড়া রায়' মন্দিরের নাম পাওয়া যায়।

১৮। ভাণ্ডার করের মত অনুসারে বাঁকুড়া নামটি পুষ্করণা নামেরই অপভ্রংশ।

'ড়া' প্রত্যয় দিয়ে বাঙলার গ্রামনামগুলি Austro-Asiatic Language থেকে এসেছে—এটাই বাঙলার প্রাচীন ভাষা। অড়াংক অর্থাৎ ঘর। ইঞাকি অড়াঃঞ আমার ঘর। পরবর্তীকালে 'ড়াক' Suffix হয়ে স্থান নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খাতড়া, মহড়া, রিষড়া, মোহড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাঁকুড়া নয়। বাঁকুড়া নিঃসন্দেহে দুটি শব্দের মিশ্রণে, বাঁং + কুড়া (Austro-Asiatic অর্থ বিরাট, বড়, যা ছোট নয়। বাং-না, কুড়া-ছোট) এই অর্থেই বাঁকুড়া রায়। দেবতা বা মানুষের নামবিশেষ।

১৯। মাঝে মাঝে 'বাঁকুড়া' পদবি শব্দ খবরের কাগজে পেয়েছি। আদিত্যকুমার বাঁকুড়া।

২০। বাঁকুড়া অপভ্রংশ বাঁকড়া, বাঁকুড়া ও হাওড়া অঞ্চলের অনেক স্থাননামগুলি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয়। বাঁকড়া অর্থে গোচারণভূমি।

বাঁকুড়া শহর গড়ে ওঠার সাক্ষী ইতিহাস হিসাবে পাঠকপাড়ায় অবস্থিত রঘুনাথ জিউ মন্দির নির্মিতকাল ১৬৩৯ খ্রিঃ পাওয়া যায়। তাছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মিলিটারি ব্যারাক বাঁকুড়ায় ছিল এবং দ্বিতীয় মারাঠা আক্রমণের ঘটনার ইতিহাসও পাওয়া যায় বাঁকুড়ার বুকে। বাঁকুড়ায় প্রাচীন গ্রাম বা বাজার যা হোক একটা অবস্থান ছিল এবং চারশো বছরের পুরনো স্থান হিসাবে চিহ্নিত। প্রাচীনতম দিক থেকে যেমন পুরনো পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির আয়তনে বাঁকুড়া চতুর্থ বৃহত্তম জেলা।

১৭৬৫ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ২য় শাহ আলমের সঙ্গে সন্ধি করে ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বাংলা, বিহার, ওড়িশার সনদ পাবার আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার আসার কিছু পূর্বে বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চল দুটি অংশে বিভক্ত ছিল—(১) জঙ্গলমহল ও (২) বিষ্ণুপুর। জঙ্গলমহল অঞ্চলের অধীন ৮টি পরগনা অবস্থিত ছিল। পঞ্চকোট রাজ্যের অধিকারভুক্ত মহিষারা পরগনা বর্তমানে মেজিয়া ও শালতোড়া থানাও জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বা জাফর খাঁয়ের সময় চাকলা মেদিনীপুরের সামিল হয়ে বিষ্ণুপুর হয় চাকলা বর্ধমানভুক্ত। কিন্তু ১৭৬০ খ্রিঃ মেদিনীপুরস্থ কোম্পানির রেসিডেন্টের নির্দেশে লেঃ ফার্গুশন যে অভিযান চালিয়েছিলেন তার ফলে সুপুর, অম্বিকানগর ও ছাতনা সামন্তভূম বশ্যতা স্বীকার করে চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাইপুর, ফুলকুমা ও সিমলাপাল প্রভৃতি সামন্তগণ কোম্পানির প্রভুত্ব স্বীকার করে বর্ধমানের সামিল হয়। প্রথম ভাগে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও ১৮৮৭ খ্রিঃ লর্ড কর্নওয়ালিস বীরভূম ও বিষ্ণুপুরকে একই জেলাভুক্ত করে একজন কালেকটারের তত্ত্বাবধানে রাখেন এবং পরে ১৮৯৩ খ্রিঃ বিষ্ণুপুর বর্ধমানের এলাকাভুক্ত হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের স্বাধীন রাজ্যগুলি জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল। ১৭৮৮ খ্রিঃ কিটিং সাহেব জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটারের কাজ করতেন। তাঁর শাসনাধীন স্থানের পরিমাণ সাড়ে সাত হাজার বর্গমাইল ছিল।

১৮১৩ খ্রিঃ আলেকজান্ডার টড সাহেব জঙ্গলমহলের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল ২৩৩৩ টাকা। বাঁকুড়া শহরে জঙ্গলমহলের সদর কার্যালয় ছিল।

বর্গী হাঙ্গামার কারণ ছিল ধনরত্ন লোভ। অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে মারাত্মক ঘটনা হল মারাঠা আক্রমণ। সলদা অঞ্চলের নিকটবর্তী ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গের দেহ হতে কয়েকটি মূল্যবান ধাতব পদার্থ বর্গী হামলার সময় খোয়া যায় এরূপ কাহিনী শোনা গেছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বর্গী হামলায় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিছু কিছু গ্রাম-নামে মারাঠা প্রভাব দেখা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার আসার আগে ১৭৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত জনসাধারণ (Civil Justice) বিচারব্যবস্থার সুযোগ পায়নি। পুরনো রেকর্ডপত্রে দেখা যায় ১৭৯২ খ্রিঃ মফস্বল দেওয়ানি আদালত সকল জেলায় গঠন করা হয়। ১৭৯৮-৯৯ খ্রিঃ রাইপুর থানা এবং অম্বিকানগর ও সুপুর পরগনা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জেলা উপদ্রব অঞ্চল ছিল। শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা দেখা যায়। সংরাজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধের প্রথম প্রয়াস বলা যেতে পারে। ইংরাজ কর্তৃক মল্লভূম অধিকারের পূর্বে এদেশ চুয়াড়ের দেশ ছিল না। যখন এদেশের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, তখন কি এদেশের জনগোষ্ঠী বর্বর ছিল ? মুচি, হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দি, বাউরি, খয়রা প্রভৃতির ঘরে ধর্মালোচনা হত। ধর্মসংগীত ও গীত হত। তাহলে এই চুয়াড় বা বর্বর আখ্যা দেওয়ার পেছনে কি ইংরেজদের কূট মতলব ছিল না ? ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে বাঁকুড়া জেলায় চুরি-ডাকাতি ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। মল্লরাজাদের সঙ্গে অন্য রাজাদের ব্যবহারিক জীবনে আদান-প্রদান কম ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা বৈদেশিক শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় রাজশক্তি বা বৈদেশিক শক্তির অত্যাচার ছিল না বললেই হয়।

টোডরমলের রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না যা থেকে বলা চলে বিষ্ণুপুর রাজাদের আমলে কোনও রাজস্ব আদায় ছিল।

প্রথমদিকে অর্থাৎ দেওয়ানি লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের রাজা ও জমিদারদের সঙ্গে সহযোগিতার সূত্র এবং খাজনা আদায় ও সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী চেহারা ও অত্যাচার এবং ঔদ্ধত্য যখন চরম সীমায় পৌছায় তখনই দেখা দিল চরম অশান্তি। জঙ্গলমহল অঞ্চলের ধলভূম এলাকার রাজা ছিলেন শক্তিশালী ও

অনমনীয়। কোনও অবস্থাতেই তিনি নিজের রাজ্যে ব্রিটিশদের ঢোকার প্রচণ্ড বিরোধী। স্বাধীনচেতা শিকারজীবী ও অরণ্যজীবী অরণ্যসন্তানরা অরণ্যভূমির ভেতর প্রবেশ করতে দিত না।

W. W. Hunter বিদ্রোহিদের সাহসিকতা বর্ণনা করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের বীরোজ্জ্বল বর্ণনা আছে। পাইক, বর-কন্দাজ, সর্দার-ঘাটোয়াল এদের মধ্যে দেখা দিল বিদ্রোহের পটভূমি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। ফলে ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহ, গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা ও সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দিল। বন্দুক, কামানের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প নিয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এল, লাঠি, তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বল্লম, ট্যাবলা, সড়কি, ট্যাবা প্রভৃতি আদিম অস্ত্র নিয়ে। চতুর্দিকে জেগে উঠল মুক্তির আন্দোলন। বাঁকুড়া জেলার সীমানা দ্রুত পরিবর্তনের কারণগুলি এর মধ্যে নিহিত।

অপর দিকে ছোট ছোট পরগনার ভূস্বামীগণ যুক্তিসঙ্গত শর্তে আসতে বাধ্য হন। ১৬-২-১৭৬৭ খ্রিঃ ফার্গুসন সাহেবের লেখা চিঠিতে জানা যায় মনভূম, সুপুর, ছাতনা ও বরাভূম প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলে। এই অভিযানের পশ্চাদভূমি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির ব্যবসায়ীদের রাজি করানো যাতে অঞ্চলগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করা যায়। ১৭৬৭ খ্রিঃ মার্চ মাসের গোড়ার দিকে সুপুর জমিদার বশ্যতা স্বীকার করলেও ফার্গুসন সাহেব মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট গ্রহামকে যে পত্র লিখলেন তাতে জানা যায়—'If you consider the circumstances of my finding every individual of them with all their people and efforts in the jungle I am hopeful it will reconcile any conduct to you, whether you regard the time and manner and settlement itself, for had I pursued them, it would probably have answered the end. To have pursued each seperately would have been a work of time and to have divided my force would have rendered my success doubtful, as none of these Zamindars by our intelligence have 2000 people in their parganas whose trade is war'.

বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত হলেও অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষের বসবাস রয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এই অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার চেষ্টা চালিয়ে যায় তখনই ইতিহাসে দেখা যায় বিদ্রোহের সূচনা। এ সম্পর্কে আমরা ২৬-১০-৮১ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়টির উল্লেখ করতে পারি—'সাধারণ মানুষ বিদেশি শাসন সম্পর্কে ছিল উদাসীন, নির্বিকার। ইংরেজদের রীতিনীতি সম্পর্কে এ অঞ্চলের লোকেরা রীতিমত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন'। একমাত্র জঙ্গলমহল এলাকায় ইংরেজ নীতির বিরুদ্ধে জনমতের একাংশের মধ্যে দেখা গিয়েছিল গভীর অসন্তোষ। এই অসন্তোষের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের কথাও তাঁরা ভেবেছিলেন। শাসনের নাগপাশ যত দৃঢ় হতে থাকে ততই দেখা যায় জঙ্গলমহল অঞ্চলের মানুষদের বিদ্রোহি হবার বাসনা। মুক্তি পাবার নেশা, উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ পাদে তাঁরা স্বাধীন মাতৃভূমির স্বপ্ন দেখতেন জাতীয় চেতনার পক্ষে এই পদক্ষেপগুলি যে শিক্ষা দেয় তার মধ্যে নিহিত রয়েছে যথেষ্ট কারণ। স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প যদিও বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের ছিল না। এমন কোন তথ্য বা উপাদান পাওয়া যায় না—তথাপি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনা তুঙ্গে উঠবার পক্ষে যথেষ্ট। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেও ভূমিজ, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যে মুক্তির নেশা জেগেছিল আগামীদিনে তারই পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের নেশা।

ইংরাজ কর্তৃক মল্লভূম অধিকারের পূর্বে এদেশ চুয়াড়ের দেশ ছিল না। যখন এদেশের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, তখন কি এদেশের জনগোষ্ঠী বর্বর ছিল ? মুচি, হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দি, বাউরি, খয়রা প্রভৃতির ঘরে ধর্মালোচনা হত। ধর্মসংগীত ও গীত হত। তাহলে এই চুয়াড় বা বর্বর আখ্যা দেওয়ার পেছনে কি ইংরেজদের কূট মতলব ছিল না ? ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে বাঁকুড়া জেলায় চুরি-ডাকাতি ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না।

বণিক সংস্কৃতির ধারক ব্রিটিশ প্রশাসকগণ এবং তাঁর তাঁবেদার পরিচালকগণ 'চুয়াড়' কথা ব্যবহার করে ইতিহাসের বিকৃতি ব্যাখ্যা করে গেছেন। 'চুয়াড়' বলা হত ভীমপ্রায়, সর্দার, ডাকাত, নিচু সম্প্রদায়ের মানুষ ও দস্যুদের, তাহলে জিজ্ঞাস্য সভ্য, সুসভ্য বা অসভ্য—এই শব্দগুলির মাপকাঠি কি ? এরা স্বভাবগত দিক দিয়ে অরণ্যজীবী। এ সম্পর্কে এ বি বর্ধন তাঁর—"The Insolved problem গ্রন্থে বলেছেন—'No Justice can be done to the tribal people, no proper appreciation can be made to their role in shaping Indian destiny. Without recalling the fact that the tribals were amongst the earliest contigents the common struggle against the alieve rulers and had made some of the greatest sacrifice.'

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম, অষ্টম, দশমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা যখন বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার নামে রাজস্ব আদায়ে অত্যধিক তৎপর হয়ে উঠে, তখনই ভূমিকেন্দ্রিক মানুষেরা চরম দুর্দশায় পড়ে। শুধু যে কৃষক ও ভূমিকেন্দ্রিক শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল তাই নয়, অনাদায়ী রাজস্ব আদায় এই অজুহাতে একের পর এক জমিদারদের উচ্ছেদ করতে লাগল। রাজস্ব আদায়ে
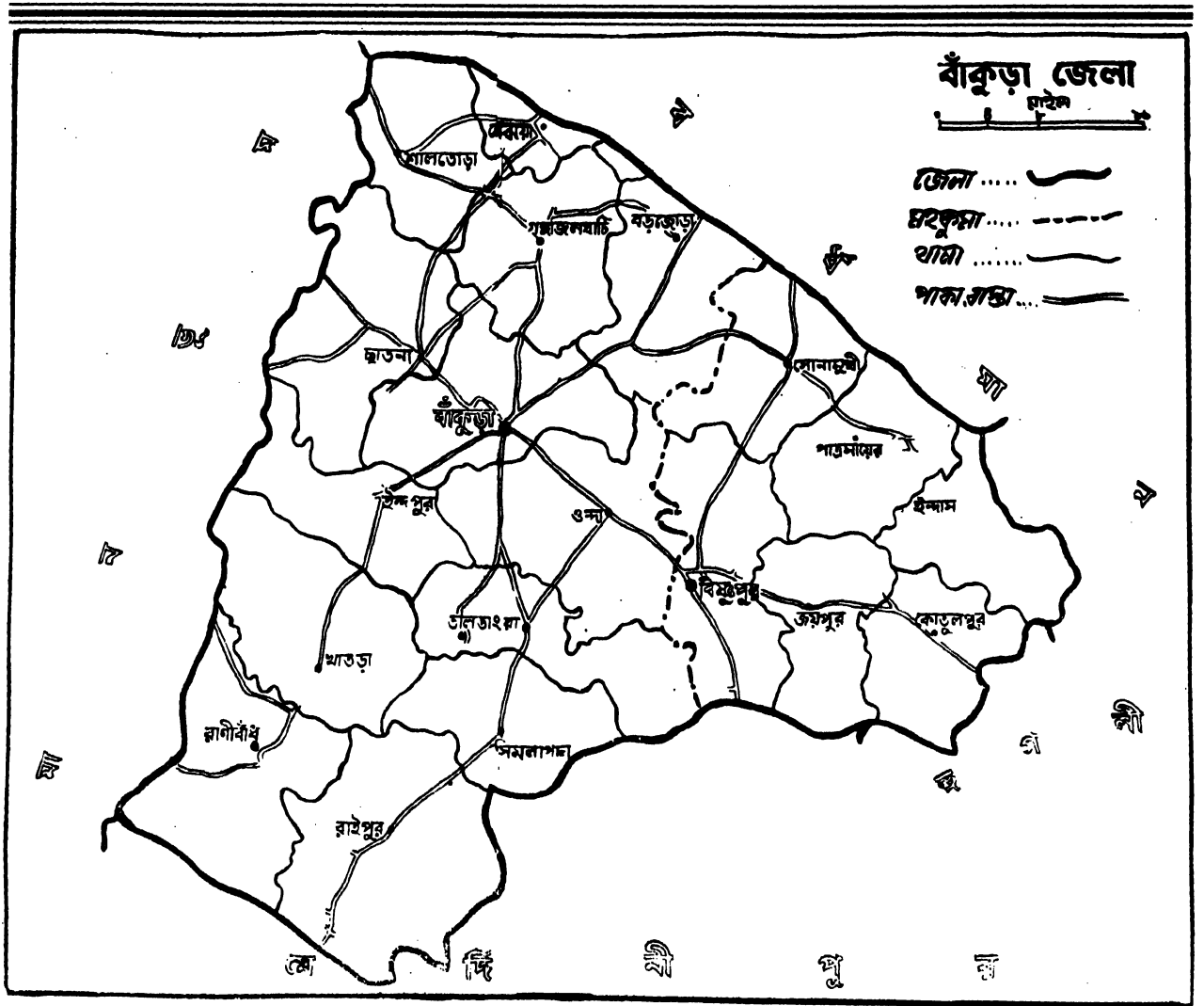
৫০-এর দশকে প্রকাশিত বাঁকুড়ার মানচিত্র

কোম্পানির আয় বেড়ে গেল। যদি কোনও জমিদার ঠিকমত রাজস্ব দিতে অক্ষম হতেন কোম্পানি তাঁকে জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করে নিলামে তাঁর জমিদারি বিক্রি করে অন্য জমিদার সৃষ্টি করত অথবা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জমিদারি পরিচালনার জন্য তাঁবেদার জমিদারকে বসিয়ে দিত। দ্বিতীয় কারণ, ১৭৯৩ খ্রিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর অনেক কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়। তৃতীয় কারণ, উৎখাত হবার ভয়। তাহলে কি বলা যায় না যে, অনেক সময় জমিদার ও কৃষকগণ একত্রিতভাবে কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের মূল কারণ হচ্ছে 'ভূমি হারাবার ভয়'। ভয় থেকে সঞ্চিত ক্ষোভ, এবং ক্ষোভ থেকেই বিক্ষোভ আর এই বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বিদ্রোহ। জঙ্গলমহল এলাকার আদিম মানবগোষ্ঠীর মনে দুর্জয় সাহস, তাঁদের জমি হস্তান্তরিত হবার যে কারণগুলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রচনা করে তাতে দেখা যায় বাঁচার জন্য মূল ভূমি থেকে উৎখাত না হবার দৃঢ়তা এঁদের মধ্যে জাগ্রত হয়।

বাঁকুড়ার রায়পুর অঞ্চলে দুর্জন সিং ১৭৮৮ খ্রিঃ রাজস্ব আদায় দিতে না পারায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে জমিদার থেকে উৎখাত করে। দুর্জন সিং নতুন জমিদারকে রায়পুর পরগনার অধিকার দিতে মোটেই ইচ্ছুক নন। দুর্জন সিং প্রজাদের জানালেন যে তাঁকে সোজাসুজি রাজস্ব আদায় দিতে হবে। যে সময়কার ঘটনা রায়পুর তখন বর্ধমান জেলার অধীন ছিল। ১৭৯৩ খ্রিঃ ১৯ জুলাই রাজস্ব দিতে না পারায় এবং নিজেকে 'তালুকদার' ঘোষণা করার জন্য দুর্জন সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুর্জন সিং জমিদারের ভোগ 'দখলিস্বত্ব ছাড়তে নারাজ ছিলেন।

১৮৪৪ খ্রিঃ ম্যাপে দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি (South-West Frontier Agency) পূর্ব সীমা বাঁকুড়া শহরের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঁকুড়ার অবশিষ্ট অংশ পশ্চিম বর্ধমান নামে একটি জেলায় পরিণত হয়। কোতুলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঁকুড়া শহরে এর হেড কোয়ার্টার ছিল। ছাতনা, অম্বিকানগর ও সুপুর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছাতনা বরাভূম,

মানভূম, ধলভূম মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম (একদা পাঞ্চেত বীরভূমের অন্তর্গত ছিল) মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে পরস্পর যোগ-বিয়োগ হয়েছিল, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যে যোগসূত্র প্রমাণ করে এ অঞ্চলগুলির ভাষা, কৃষ্টি ও প্রকৃতি এক প্রকারের ছিল।

W. W. Hunter-এর 'A statistical Account of Bengal' গ্রন্থে জানা যায় ১৮৭০ খ্রিঃ বাঁকুড়া জেলার ফৌজদারি আদালত ফৌজদারি এলাকা পাঁচেট পরগনা সহ ছাতনা, গৌরাঙ্গডিহি এবং রঘুনাথপুর থানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উত্তর সাঁওতাল পরগনারও কতক অংশে এই ফৌজদারি শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঁচেট বা পঞ্চকোট পূর্বে শিখরভূম বলে পরিচিত ছিল। ইংরেজ আমলে পুরুলিয়ার আদালতে এই এলাকার মামলা-মোকদ্দমা হত এবং পুরুলিয়ার আদালত কলকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের অধীন ছিল। (দিল্লিতে ১৯১১ খ্রিঃ রাজধানী স্থানান্তরিত হয়)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাঁকুড়ার ভাঙাগড়ার ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ক্রমিক সালতামামি

সময়	অঞ্চলের অবস্থান
১৭৫৭ খ্রিঃ	ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে বাঁকুড়া জেলার নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। পলাশী যুদ্ধের আগে মোঘল সাম্রাজ্যের অধীন মল্লভূম।
১৭৬০ খ্রিঃ	মেদিনীপুরে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্থাপন। এই অঞ্চল রেসিডেন্ট অধীন। সুপুর ও ছাতনা মেদিনীপুর চাকলার অধীন ছিল। রায়পুর ছিল বর্ধমানের সীমানাধীন। ব্রিটিশদের সঙ্গে মল্লভূম রাজাদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপন। মীরজাফর অপসারিত এবং মীরকাশিম নবাব। বিষ্ণুপুরে মারাঠিদের ছাউনি।
১৭৬৪ খ্রিঃ	২২ অক্টোবর ইংরেজদের দেওয়ানি সনদ হস্তগত। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৪ চিঠির মর্মানুসারে।
১৭৬৫ খ্রিঃ	এই অঞ্চলে খাজনা আদায়ের অধিকার স্থাপন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। বিষ্ণুপুর অঞ্চল এই আওতার মধ্যে আসে। বাংলা-বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ।
১৭৬৭ খ্রিঃ	জন গ্রাহাম লেঃ ফার্গুসনকে পশ্চিমতটের জমিদারের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য যে অভিযান পরিচালনা করেন বাঁকুড়া অন্তর্ভুক্ত ছাতনা, অম্বিকানগর এবং সুপুর চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফুলকুসমা জমিদারের বশ্যতা স্বীকার এবং বেশি খাজনা দেবার অঙ্গীকার। আবার রাইপুর, ফুলকুসমা চাকলা বর্ধমানে সামিল হয়। ক্লাইভের ভারত ত্যাগ।
১৭৬৮ খ্রিঃ	বাংলাদেশে মন্বন্তর।
১৭৭০ খ্রিঃ	বীরভূম ও বিষ্ণুপুর (বর্তমান আয়তন নহে) একজন সুপারভাইজার নিয়োগ।
১৭৭২ খ্রিঃ	বীরভূম সহ পাঞ্চেত এবং বিষ্ণুপুর এই তিনটি অঞ্চল একজন কালেক্টারের অধীন ছিল।
১৭৭৩ খ্রিঃ	১৯ জানুয়ারি এক আদেশানুসারে পাঞ্চেৎত এবং বিষ্ণুপুরের পৃথক কালেক্টার নিয়োগ এবং রেগুলেটিং অ্যাক্টপাস।
ঐ	২৮ মে একটি ঘোষণায় রেভিনিউ জমা দেবার আদেশ দেওয়া হয়। ১৯ জানুয়ারি আদেশ রদ।
১৭৭৯ খ্রিঃ	রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিংহের বিদ্রোহ।
১৭৮১ খ্রিঃ	২০ ফেব্রুয়ারি একটি হুকুমনামায় প্রতি জেলায় একজন ইউরোপিয়ান কালেক্টার নিযুক্ত হয়।
১৭৮৫ খ্রিঃ	১৭৮৫ খ্রিঃ আগে বিষ্ণুপুর ও বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ছিল। পাহাড়িয়াদের প্রথম আক্রমণ। মুর্শিদাবাদে সৈন্য প্রার্থনা।

১০ ফেব্রুয়ারির এক আদেশনামায় দশসালা বন্দোবস্ত

সময়	অঞ্চলের অবস্থান
১৭৮৬ খ্রিঃ	২০ এপ্রিলের আদেশনামায় পাই সাহেব বিষ্ণুপুরের কালেক্টার নিযুক্ত হন।
১৭৮৭ খ্রিঃ	এই খ্রিঃ ১৪টি কালেক্টারি তৈরি হয়।
১৭৮৯-৯০ খ্রিঃ	২৭ জুন Regulation Act অনুসারে একজন কালেক্টারের অধীনে বিচারভার অর্পণ। পাহাড়িয়াদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ। বিষ্ণুপুর থেকে কোম্পানির শাসন অবলুপ্তি।
১৭৯৩ খ্রিঃ	প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে এই অঞ্চল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এলাকাভুক্ত। বিষ্ণুপুর পরগনা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত।
১৭৯৭ খ্রিঃ	জন চিপ সোনামুখীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবার কর কুটিরশিল্পগুলির গুরুত্ব বাড়ে।
১৭৯৯ খ্রিঃ	চুয়াড় বা পাইক বিদ্রোহ। এক সরকারি আদেশে নিষ্কর জমি থেকে পাইক-চুয়াড়দের প্রত্যাবর্তন।
১৮০১-০২ খ্রিঃ	স্যার চার্লস ব্লান্ট বিষ্ণুপুরের কমিশনার নিযুক্ত।

ম ন্দির শোভিত বাঁকুড়া জেলার অতীত, চন্দ্রবর্মার শিলালিপি পিছনে রেখে, আরও আরও পিছনে যেতে হবে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে, তখনও পৃথিবীর দীর্ঘ যোজন সাগরের নোনাজলে মুক্তির ধ্যানে নিমগ্ন, আলোছায়া মাখা মানবজীবনের প্রভাত, ভাষাহীন উচ্চারিত সংলাপ, প্রস্তর আয়ুধ হাতে অরণ্য থেকে অরণ্যে ছোটাছুটি, কখনও শিকারের উদ্দেশ্যে, কখনও বা আত্মরক্ষার শাশ্বত প্রয়োজনে, এবং সেদিনের সেই অশান্ত পদচিহ্ন আজও রয়েছে কাঁসাই, শিলাই, গন্ধেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বরের নরম পলিতে, শুশুনিয়ার বক্ষপঞ্জরে, শাল-মহুয়ার গন্ধ বিমুগ্ধ গহন অরণ্যের মর্মরে।

সুদূর অতীতের এশিয়া, আফ্রিকার হিন্দুকুশ পর্বতমালা, আনতোলিয়া মালভূমি এবং আটলাস পাহাড়ের মতোই মানবসভ্যতার প্রথম প্রভাত আসে এই শুশুনিয়া পর্বতের বিস্তৃত সানুদেশে। বিন্ধ্যপর্বতমালার বুক থেকে নেমে এসে ছোটনাগপুরের মালভূমি ঢেউ খেলানো কাঁকুড়ে মাটির মধ্যাংশে ১৪৪২ ফুট উচ্চ শুশুনিয়া পর্বত কর্কটক্রান্তির নিচেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই জন্য মধ্য রাঢ় তথা বাঁকুড়া জেলা কর্কটক্রান্তি প্রভাবিত উষ্ণ প্রকৃতির অঞ্চল এক সময় উচ্চ পর্বতগুলির অন্যতম ছিল। তুলনায় হিমালয় তখন ছোট। শুশুনিয়ার বিস্তৃত পাদদেশে বাঁকুড়া পরিমণ্ডল এক সময় প্রাচ্য ভারতের সুপ্রাচীন মহাদেশ গন্ডোয়ানা সংগঠনের সাক্ষী। যার অস্তিত্ব ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ বৎসর পূর্বে।

ভারতের তথা বাংলার বিস্তৃত ভূভাগ যখন জলাভূমিতে পরিণত, তখন তো এই ভূখণ্ড বা মধ্য রাঢ় অর্থাৎ বাঁকুড়া পরিমণ্ডল মানব বিবর্তনের আদর্শ লীলাভূমি। বাঁকুড়া জেলা তাই প্রকৃতিগতভাবেই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম মধ্যযুগের প্রবল পরাক্রান্তশালী রাজন্যগোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের রাস্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাঁকুড়া। সেই জন্য বাঁকুড়ায় কুষাণ, সুঙ্গ, মৌর্য, গুপ্ত, পহ্লব, চোল ইত্যাদি রাজবংশের বা যুগের মুদ্রা, শিলামূর্তি, তৈজসপত্র ইত্যাদি আরও নানান সামগ্রী এই পরিমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলতে পারি বাঁকুড়া জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বহুমুখী।

বাঁকুড়া পরিমণ্ডলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অন্যতম উৎস হল মন্দির-মসজিদ-গির্জা। এই আলোচনা প্রসঙ্গে বিহারীনাথ পাহাড়ের পার্শ্বনাথ নামে পরিচিত জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তির কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। কারণ, বাঁকুড়া পরিমণ্ডলে আর্য সভ্যতা সংস্কৃতি বহন করে আনেন জৈন ধর্মাবলম্বীরা। তাঁরা এই জেলার কাঁসাই, শিলাই ও দামোদর যে তিনটি প্রধান নদীপথ বেয়ে বাঁকুড়া প্রবেশ করেন তার মধ্যে প্রধান নদীপথ দামোদর সেই সময় অর্থাৎ খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকের পূর্বে এই বিহারীনাথ পাহাড়ের পাদদেশ হয়ে প্রবাহিত ছিল। অবশ্য বর্তমান বিহারীনাথ পাহাড় থেকে দামোদরের দূরত্ব প্রায় দু'মাইল।

ঐতিহাসিকগণের মতে, হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়ে কৈবল্য লাভ করার পর, সেই সত্যধর্মকে চারিদিকে প্রচারের উদ্দেশ্যে তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর দামোদর নদীপথ ধরে বিহারীনাথ পাহাড়ে পদার্পণ করেন। পরবর্তী শতাব্দী কালের মধ্যে আসেন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। ক্রমশ বিহারীনাথ জৈনদের প্রধান শক্তিশালী প্রচার-

গবেষকের দৃষ্টিতে প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধ হিসাবে বাঁকুড়া জেলার মন্দিরসমূহ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিছু মন্দিরে রয়েছে বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব, আবার কিছু মন্দিরে স্থাপত্যশৈলী ও শিল্প অলঙ্করণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন হল গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া মেজিয়া অহল্যাবাঈ সড়কের ধারে অমর কাননের থেকে ছয় কিমি পশ্চিমে মেটালা গ্রামের মধ্যস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্বামুখী পঞ্চরত্ন মন্দির।

কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিহারীনাথ পাহাড়ের চারিদিকে বিভিন্ন গ্রামে জৈন ধর্মাবলম্বী সরাক গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য থেকে। জৈন ধর্মাবলম্বী শ্রাবক গোষ্ঠী, অপভ্রংশ হয়ে সরাক শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

শালতোড়া থানার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ১৪৬৯ ফুট উঁচু বিহারীনাথ পাহাড়ের উত্তর পাদদেশে প্রায় একশ' বছরের প্রাচীন সমতল ছাদের দালান মন্দির রয়েছে। এই মন্দির প্রাঙ্গণে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শিলামূর্তি রক্ষিত রয়েছে। শিলাপৃষ্ঠে রিলিফ পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ মূর্তিটির অনেকাংশ ক্ষয়িত হয়েছে। যে শিলার ওপর মূর্তিটি উৎকীর্ণ হয়েছে তা খুব কঠিন প্রকৃতির। মূর্তির এই ক্ষয়িত অবস্থা দেখে প্রমাণিত হয় মূর্তিটি সুপ্রাচীনকালের। অপরদিকে প্রায় চারফুট উঁচু শিলাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ রয়েছে নাগছত্রধারী অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। মন্দির গর্ভে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লিঙ্গরূপ শিব এবং একটি বিষ্ণুমূর্তি।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যস্থলে শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিটির প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্য অসীম। কারণ এই ছোট শিলালিপিটির মধ্য দিয়ে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর বাঁকুড়া জেলার তথা মধ্য রাঢ় পরিমণ্ডলের লিপি, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত বহন করে, তা থেকে লিপি, ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার গবেষকগণ একমত যে শুশুনিয়া পরিমণ্ডলের জনগণ এক উন্নত চিন্তাধারার ধারক ছিল।

"চক্র স্বামিনঃ দাসাগ্রণাতি সৃষ্টঃ পুষ্করানাধিপতি
মহারাজ শ্রীসিংহবর্মন পুত্রস্য মহারাজ
শ্রীচন্দ্রবর্মন কৃতিঃ।"

শিলালিপিতে উৎকীর্ণ পুষ্করনা বর্তমান অপভ্রংশ হয়ে পোখন্না নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। শুশুনিয়া পর্বত থেকে তেইশ মাইল উত্তর-পূর্ব দামোদর নদের তীরে অবস্থিত বর্তমানের গ্রাম পোখন্না ৪র্থ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রবর্মার যে রাজধানী ছিল, সে বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সহ আরও অনেক পণ্ডিত একমত। এখানে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তিটি গবেষকগণের মতে সুঙ্গ যুগের। যার থেকে বোঝা যায় খ্রিস্টপূর্বাব্দ কাল থেকে এই স্থানটি একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। এখান

থেকে আরও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই পরিমণ্ডল গবেষণার অর্থাৎ খননকার্যের অপেক্ষায় রয়েছে। শুশুনিয়া মহারাজ চন্দ্রবর্মার একটি দুর্ভেদ্য পার্বত্য দুর্গ ছিল।

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম-উত্তর ও পূর্বদিকের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে থাকা মন্দিরসমূহ মধ্য রাঢ়ের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি ক্রমবিকাশের জীবন্ত সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলে শুশুনিয়া পর্বতের অনতিদূরে ছাতনার বাসলী মন্দির। ছাতনা হচ্ছে ছত্রিনা শব্দের অপভ্রংশ। ছত্রিনা ছিল সামন্তভূমের রাজধানী। একাদশ খ্রিঃ শেষ ভাগ থেকে এখানে ঐতিহাসিক কালের সূচনা হয়। গবেষণার মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হয় যে প্রায় ছ'শ বছর ধরে এই পশ্চিম রাঢ়ে এক বর্ণময় অধ্যায় আবর্তিত হয়েছিল ছত্রিনা তথা সামন্তভূমকে কেন্দ্র করে।

বাঁকুড়া শহর থেকে পনেরো কিমি পশ্চিমে বাঁকুড়া পুরুলিয়াগামী অহল্যাবাঈ সড়কের ধারে একশ পঞ্চাশ ফুট দৈর্ঘ্য ও একশ পঁয়ত্রিশ ফুট প্রস্থের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অঙ্গনের মাঝখানে কবি চণ্ডীদাস পূজিত বাসলী দেবীর মন্দিরের ভিত্তিবেদীও বিভিন্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। ভিত্তিবেদীর পশ্চিমংশে কয়েকটি পাথরের সিঁড়ি আছে। বাকি অংশ শুধু ইটের ঘেরা। দু'ইঞ্চি মোটা ও সাত বর্গ ইঞ্চির এই ইটের গায়ে উৎকীর্ণ আছে ১৪৭৫ শক ও উত্তর হামীর। এর থেকে বোঝা যায় ১৪৭৫ শকে সামন্তরাজ উত্তর হামীর কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সেই প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর সংস্কার করে আধুনিক স্থাপত্যকৃতি দিয়ে চণ্ডীদাস মেলারও একটি সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র প্রবর্তন করা হয়েছে।

ছাতনা গ্রামের শেষে দক্ষিণ প্রান্তে রাজগড় সীমানায় বাসুলী মন্দির রয়েছে। চার ফুট উঁচু কুড়ি বর্গফুট পাভাগের ওপর কক্ষাকৃতি দক্ষিণমুখী মূল মন্দিরের উচ্চতা পঁচিশ ফুট। অর্ধবৃত্তাকার ছাদের ওপর চারকোণে চারটি ও মধ্যখানে প্রধান চূড়া স্থাপিত। এটি একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দির গাত্রে সামান্য টেরাকোটা ভাস্কর্য চিত্র থাকলেও বর্তমানে তাব অনেকাংশ ক্ষয়িত হয়ে গেছে। পুরুলিয়াগামী অহল্যাবাঈ সড়কের পাশেই যে বাসলী মন্দির ছিল তা কালক্রমে ধ্বংস হয়ে গেলে রানী আনন্দময়ী রাজগড় সীমানায় এই মন্দির নির্মাণপূর্বক বাসলী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সামন্তরাজ বিবেকরঞ্জন রায় এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করলেও ১৮৭৩ খ্রিঃ রানী আনন্দময়ী নির্মাণ কাজ শেষ করে দেব প্রতিষ্ঠা করেন। কালোরঙের শিলাপৃষ্ঠে রিলিফ পদ্ধতিতে বাসুলী মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই মূর্তি বা বাসলী দেবীকে বৌদ্ধতন্ত্রের সহযান শাখার বজ্রেশ্বরী বলেছেন।

ছাতনার বাসলী দেবীর মধ্যে যেমন বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনই অদূরে দশ কিমি দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে মোলবনা গ্রামে মৌলেশ্বর মন্দিরে শৈব প্রভাব লক্ষণীয়। মৌলেশ্বর মন্দিরে চার ফুট উঁচু আসনের ওপর পঞ্চাশ ফুট উঁচু মূল মন্দির। বারো ফুট লম্বা ও এগারো ফুট প্রস্থের জগমোহন। প্রতি কোণে পাঁচটি করে রথ-পগ বিমানের নিম্নে কার্নিশে শেষ হয়েছে। চূড়ায় ত্রিশূল প্রোথিত। তিনশত বছরের প্রাচীন ছোট আকৃতির যে আদি মন্দির ছিল, তা সংস্কার করে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়েছে। মৌলেশ্বর শিব বা মন্দির প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে এখানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল মন্দিরে সংরক্ষিত 'দেবডাক ও
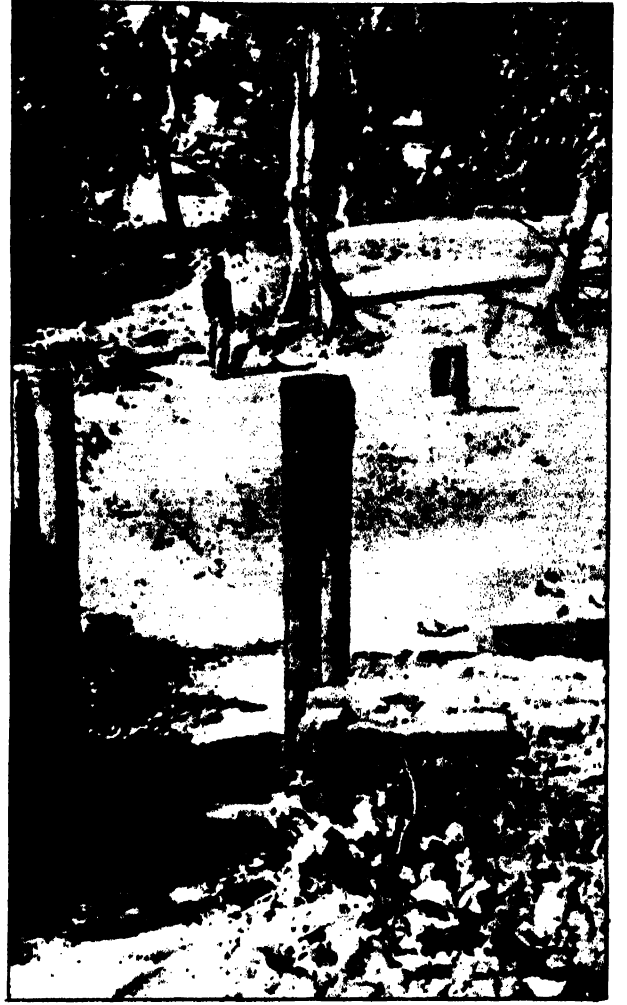
ছাতনার পুরাক্ষেত্রের সাধারণ দৃশ্য ('বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

দিকডাক' নামক ওড়িয়া ভাষায় রচিত একটি পুঁথি। যার মধ্যে ছত্রিনার সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস উল্লিখিত হয়েছে। মৌলেশ্বরের বাৎসরিক গাজনের সময় এই পুঁথি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। মৌলেশ্বর শিবের গাজনমেলা বাঁকুড়া জেলার গাজনমেলার অন্যতম।

গবেষকের দৃষ্টিতে প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধ হিসাবে বাঁকুড়া জেলার মন্দিরসমূহ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিছু মন্দিরে রয়েছে বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব, আবার কিছু মন্দিরে স্থাপত্যশৈলী ও শিল্প অলঙ্করণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন হল গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া মেজিয়া অহল্যাবাঈ সড়কের ধারে অমর কাননের থেকে ছয় কিমি পশ্চিমে মেটালা গ্রামের মধ্যস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্বামুখী পঞ্চরত্ন মন্দির। ক্ষীণকোটির কার্নিশ সজ্জিত চার ফুট উঁচু আসনের ওপর কক্ষাকৃতি পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু এই মন্দিরের তিনদিকে মেঝে চত্বরের খিলান ছাদকে ধরে আছে দুটি করে মোট ছ'টি ক্ষীণকোটির টেরাকোটার অলঙ্করণ সজ্জিত স্তম্ভ। সংলগ্ন দেওয়ালকে অনুরূপ স্তম্ভাকৃতি রূপ দেওয়া হয়েছে, একে বলা হয় অর্ধস্তম্ভ। মন্দিরে সম্মুখ গাত্রে অর্ধবৃত্তাকার এবং নিচে দুটি কার্নিশ সজ্জিত। আয়তকারে স্থাপিত হয়েছে দশ বর্গ ইঞ্চির মধ্যে টেরাকোটা

চিত্রসম্বলিত মোট পঁয়ত্রিশটি টালি। চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, দশভুজা দুর্গা এবং আরও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত। এর নিচে ঠিক প্রবেশদ্বারের ওপর কল্পলতা ও চতুষ্কোণ জ্যামিতিক নকশা সজ্জিত তিনটি দ্বারে তিনটি যুদ্ধরত বৃহৎচিত্র। হাতে শরধনু গদা, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্র। হনুমানের চিত্র থাকায় বোঝা যায় চিত্রটি রাম-রাবণের যুদ্ধচিত্র। প্রতিটি স্তম্ভের ওপর ও নিম্নাংশে তিন বর্গ ইঞ্চি টালিগুলিতে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ও অস্ত্রধারণ করে নানা দেবদেবীর চিত্র। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য বৃত্তাকার ফুল ও নকশা। সম্মুখ গাত্রে দুটি করে দুদিকে মোট চারটি সৌন্দর্য স্তম্ভ। স্থাপত্য অলঙ্করণ সমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে এই স্তম্ভ নির্মিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেওয়ালেও অনুরূপ অলঙ্করণ লক্ষিত হয়।

রাজস্থানের মৈয়ানপুর চোহান বংশীয় ক্ষত্রিয়রা এক সময় মল্ল রাজাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসাবে এই অঞ্চলে আসে এবং বসতি স্থাপন করে। এই বংশের দেবচাঁদ সিংহ মতান্তরে তিলকচাঁদ সিংহ ষোড়শ শতাব্দীর কোন এক সময় মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

টেরাকোটা অলঙ্করণে অলঙ্কৃত অনুরূপ একটি মন্দির রয়েছে বড়জোড়া থানার অন্তর্গত বড়জোড়া থেকে দু' কিমি পশ্চিমে মালিয়াড়া বড়জোড়া সড়ক থেকে দেড় কিমি উত্তরে কাদাশোল গ্রামের ঘড়ুই পল্লীর মধ্যস্থলে তিন ফুট উঁচু পাভাগের ওপর দণ্ডায়মান কক্ষাকৃতি দক্ষিণমুখী শ্রীবিষ্ণু মন্দির। কুড়ি ফুট দৈর্ঘ্য ও পনেরো ফুট প্রস্থের মূল মন্দিরের উচ্চতা তিরিশ ফুট। বহি চত্বর, মেঝে চত্বর ও বিগ্রহ মন্দির এই তিন ভাগে বিভক্ত। মন্দিরের সম্মুখাংশ স্থাপিত হয়েছে অপূর্ব শিল্পচাতুর্যে টেরাকোটা শিল্পসম্ভারে। আয়তকারে মন্দির গাত্রে সংস্থাপিত চিত্রগুলি ছয় বর্গ ইঞ্চির মধ্যে নির্মিত। পশ্চিমাংশের মূর্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণের দশাবতারের। পূর্বাংশে ইন্দ্র, মহিষবাহনে যম ইত্যাদি নানান দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ওপরের অংশে অনন্ত শয্যায় নারায়ণ, কালিয় দমন, গণেশ, ঢেঁকিবাহনে নারদ ইত্যাদি বিচিত্র মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। কর্মরত নরনারী, শিশুকোলে স্তনদানরত মা ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনচর্যার চিত্রগুলি রেখায় রেখায় অদ্ভুত সুন্দর। প্রধান দ্বারের ওপর পল্লবিত বৃক্ষ, নিচে রাধাকৃষ্ণের মিলন মূর্তি ঘিরে চক্রাকারে গোপিনীগণসহ রাসমণ্ডলীর চিত্রটি বিষ্ণুপুরের শ্যাম রায় মন্দিরের রাসচক্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর নিচে অন্নপূর্ণার কাছে ভিখারি মহাদেবের ভিক্ষা গ্রহণের চিত্রটি মনন বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এই সব মূর্তিগুলির মধ্য দিয়ে টেরাকোটা ভাস্কর্যের উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলার মন্দির স্থাপত্যরীতিতে কলিঙ্গ স্থাপত্য রীতির যে ধারা মিলিত হয়, তার'ই প্রকৃষ্ট নিদর্শন হল ঘুটগড়িয়ার মন্দির। বড়জোড়া থানার অন্তর্গত বড়জোড়া মালিয়াড়া সড়কের ঘুটগড়িয়া মোড় থেকে দু' কিমি দক্ষিণে ধানজমির মধ্যখানে এই রেখ দেউল মন্দির দণ্ডায়মান। দু' ফুট উঁচু এবং দশ ফুট আয়তকার আসনের ওপর তিরিশ ফুট উঁচু মূল মন্দির। মন্দিরের জঙ্ঘাদেশে চারটি করে ষোলোটি রথপগ ও চারটি রাহাপগে বিভক্ত হয়ে বিমান অংশে মিলিত হয়েছে। যার ওপর পদ্মাকৃতি বৃহৎ আমলক রয়েছে। শিখর বিন্যাস রয়েছে পঞ্চরথ রীতিতে। বিমান গাত্রে রাহাপগ অংশে রয়েছে চারটি লম্ফমান সিংহ। যা হল ওড়িশার ভুবনেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ।

এই জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয়, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত শিব মন্দির হল এক্তেশ্বর শিব মন্দির। বাঁকুড়া শহর থেকে চার কিমি দক্ষিণে বাঁকুড়া দ্বারকেশ্বর সড়কের অনতিদূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে পশ্চিমমুখী মাকড়া পাথরে নির্মিত পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু এক্তেশ্বর মন্দির দণ্ডায়মান। আনুমানিক সহস্র বৎসরের প্রাচীন এই মন্দির বহুবার সংস্কারের ফলে আদি স্থাপত্যশৈলী হারিয়ে বর্তমান রূপপরিগ্রহ করেছে।

মন্দিরটি নির্মাণে মাকড়া পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে আসন, জঙ্ঘা অংশে রয়েছে বেলেপাথর, ভাস্কর্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ল্যাটারাইট পাথর। গর্ভগৃহ চতুষ্কোণভাবে ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। মন্দিরের সম্মুখাংশে দ্বার ঘিরে যে ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছে তা অধিকাংশ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। প্রতিষ্ঠা লিপিবিহীন এই মন্দিরের নির্মাণ কৌশল দেখে অনুমিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

বড়জোড়া অঞ্চলে যেমন অনেকগুলি বিষ্ণুমন্দির দেখে এই অঞ্চলে বৈষ্ণবীয় প্রভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়, তেমনই এই থানার অন্তর্গত জগন্নাথপুরে রত্নেশ্বর শিবমন্দির থেকে শৈব প্রভাবের কথাও স্বীকার করে নিতে হয়। বাঁকুড়া দুর্গাপুর ভায়া বেলিয়াতোড় সড়কের বাঁদকানা মোড় থেকে পূর্বদিকে আট কিমি মোরাম রাস্তা ভেঙে গেলেই জগন্নাথপুর গ্রাম। তিন ফুট উঁচু সতেরো বর্গফুট আসনের ওপর দক্ষিণমুখী তিরিশ ফুট উঁচু মাকড়া পাথরের নির্মিত এটি একটি রেখ দেউল রীতির মন্দির। সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়। এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনমেলায় ভক্ত্যাদের নারীবেশে ধারণ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বাঁকুড়া দুর্গাপুর সড়কের ভায়া বেলিয়াতোড়, দেজুড়ি মোড় থেকে পশ্চিমে চার কিমি মোরাম রাস্তার ওপর গেলেই বড়জোড়া থানার অন্তর্গত সাহারজোড়া গ্রাম। বিশেষ স্থাপত্য কৃৎকৌশল যুক্ত না হলেও, আধুনিক রীতির ছোট চার চাল মন্দিরে অম্বিকা দেবীর জন্য সাহারজোড়া বিশেষভাবে পরিচিত। এখানের অপর দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি হল নন্দলালের এক রত্নমন্দির, মদনমোহনের পাথরের মন্দির, পাশেই কালাচাঁদ মন্দির। মন্দিরগুলি অবশ্য জীর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছে। শূরভূম রাজ্যের আদিশূরের রাজধানী ছিল এই সাহারজোড়া।

বাঁকুড়া সদর থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া বেলিয়াতোড় সড়কের মাকুড়াগ্রাম মোড় থেকে দু' কিমি পূর্বে নড়রা গ্রামের দে পরিবারের

মধ্যস্থলে টেরাকোটা অলঙ্করণে সুসজ্জিত রাধাবল্লভ জিউয়ের নবরত্ন মন্দির অবস্থিত। অনন্তলাল দে, নিত্যগোপাল দে, শ্রীবাসদেও ফকিরচন্দ্র দে এই চার ভাইয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। পঁচিশ ফুট উঁচু এই মন্দিরের সম্মুখ গাত্রে বিচিত্র টেরাকোটা শিল্পসম্ভার পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকীর্ণ হয়েছে। নড়রার অনতিদূরে কষ্টিয়া গ্রামে একটি বৃহৎ ও কারুকার্য অলঙ্কৃত দুর্গামণ্ডপ রয়েছে, যা বাঁকুড়া জেলার কারুশিল্পকলার উৎকর্ষতার সাক্ষ্যবহন করছে।

বাঁকুড়ার পূর্ব প্রান্তে সোনামুখীর মন্দির স্থাপত্য ও অলঙ্করণ বিশেষ আকর্ষণীয়। সোনামুখীর মধ্যস্থলে রয়েছে স্বর্ণময়ী মন্দির। এই মন্দির স্থাপত্য ও অলঙ্করণে সাধারণ হলেও শিলাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ স্বর্ণময়ী দেবীর মূর্তি বিশেষ আকর্ষণীয়। পার্শ্বে রয়েছে শ্বেতপাথরের মূর্তি। সোনামুখী শহরের মহাদানী গলির মধ্যস্থলে রয়েছে শ্রীধর মন্দির। এই মন্দিরের স্থাপত্য কৌশল এবং টেরাকোটা শিল্পশৈলীতে এটি একটি বাঁকুড়া জেলার শ্রেষ্ঠ মন্দির। শ্রীধর মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল স্বল্প আয়তনে পঁচিশটি চূড়ার সংস্থাপন। যা রত্নমন্দির স্থাপত্য শৈলীর চরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করছে। ভৈরব রুদ্র কর্তৃক ১৭৮৭ শকাব্দে (১২৫২ বঙ্গঃ) এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত বি ডি আর রেল লাইনের ধগড়িয়া স্টেশন থেকে উত্তরদিকে চার কিমি দূরে হদলনারায়ণপুর গ্রাম। এই গ্রামে প্রবেশের মুখে রয়েছে একটি জীর্ণ পঞ্চরত্ন মন্দির। এরপর আছে ব্রাহ্মণ্য দেবীর মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে রয়েছে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ও দু ফুট এগারো ইঞ্চি প্রস্থের কষ্টি পাথরের ওপর উৎকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য দেবীর মূর্তি। মূর্তির পাদদেশে দু' পাশেও পিছনের ত্রিপত্রাকৃতি খিলনের গায়ে পাঁচটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত। এই পঞ্চ অগ্নির মধ্যস্থলে অগ্নিভয়হারিণী দেবী দুর্গা। গবেষকদের মতে মূর্তি দুটি পাল আমলের। পাশেই রয়েছে যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি। মূর্তিটি দামোদর নদীগর্ভ থেকে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলার সীমান্ত থানা ইন্দাসের হরিপুর পণ্ডিত পাড়ায় রয়েছে জনপ্রিয় লোকদেবতা ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের দালান মন্দির। সাত বর্গ ইঞ্চি ও দু ইঞ্চি মোটা কালো পাথরের ওপর কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুরের মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। নিম্নাংশে প্রস্ফুটিত পদ্ম। ধর্মমঙ্গলের প্রখ্যাত কবি মানিকরাম দাস ও সীতারাম দাস এই বাঁকুড়া রায়কে কেন্দ্র করে রচনা করেন ধর্মমঙ্গল কাব্যসম্ভার। ইন্দাসে আরও চারটি উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে। তাদের নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে।

এই জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয়, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত শিব মন্দির হল এক্তেশ্বর শিব মন্দির। বাঁকুড়া শহর থেকে চার কিমি দক্ষিণে বাঁকুড়া দ্বারকেশ্বর সড়কের অনতিদূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে পশ্চিমমুখী মাকড়া পাথরে নির্মিত পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু এক্তেশ্বর মন্দির দণ্ডায়মান। আনুমানিক সহস্র বৎসরের প্রাচীন এই মন্দির বহুবার সংস্কারের ফলে আদি স্থাপত্যশৈলী হারিয়ে বর্তমান রূপপরিগ্রহ করেছে। যুদ্ধরত মল্লভূম ও সামন্তভূম রাজাদের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে উভয় সীমার মধ্যস্থলে পদাকৃতি এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দির অঙ্গনে যে সমস্ত মূর্তি রক্ষিত আছে সেগুলি জৈন
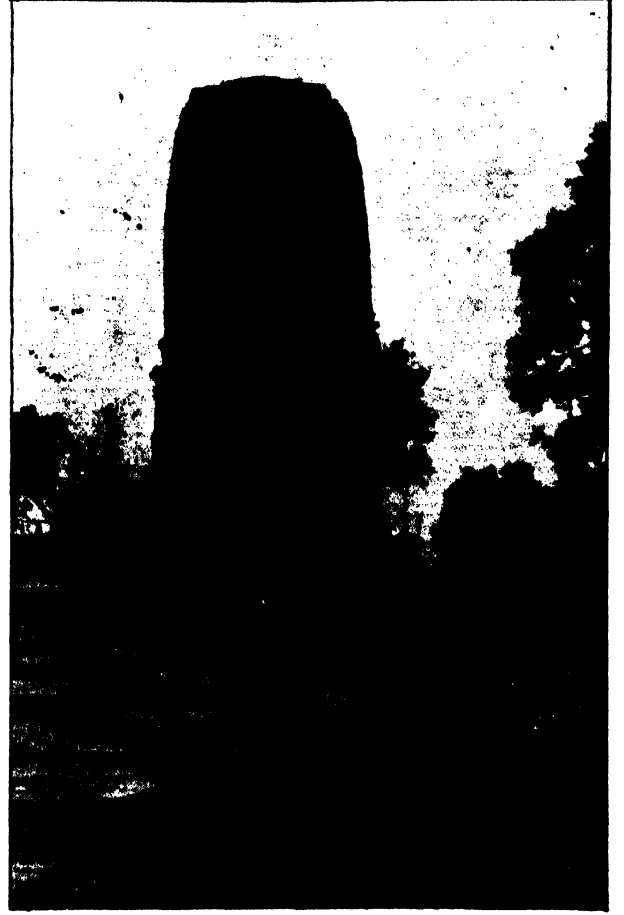
বহুলাড়া মন্দির ছবি · সুসময় দাশ

তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধমূর্তি। যা দেখে গবেষকদের ধারণা এই মন্দিরে কোনও এক সময় জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব ছিল।

ওন্দা থানার অন্তর্গত বহুলাড়া সিদ্ধেশ্বর মন্দির একটি তাৎপর্যপূর্ণ শিবমন্দির। বাঁকুড়া শহর থেকে বিষ্ণুপুরগামী সড়কের ওন্দা বাস স্টপেজের থেকে চার কিমি দূরে বহুলাড়া গ্রামে এই মন্দির অবস্থিত। চৌষট্টি ফুট উঁচু ইটের তৈরি পশ্চিমমুখী এই মন্দির গবেষকদের মতে একাদশ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে কলিঙ্গ স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। মন্দিরের ভিতর যে সব মূর্তি রয়েছে তার মধ্যে দু ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া কালো মসৃণ শিলাপৃষ্ঠে সর্পছত্রের মধ্যস্থলে একটি দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি, তার দুপাশে চোদ্দটি ছোট মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। পণ্ডিতগণের মতে প্রাচীনকালে এই মন্দির জৈনদের ছিল এবং ওই মূর্তি হল তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে ইটের তৈরি সাতাশটি সমাধি রয়েছে। কয়েকটিতে খননকার্য চালিয়ে বালি ও অঙ্গার পাওয়া যায়। অনেকের মতে মন্দিরটি একদা বৌদ্ধদের ছিল এবং মন্দির সংলগ্ন চৈত্যগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের।

ওন্দা থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সড়কের কালিসেন মোড় থেকে দক্ষিণে তিন কিমি দূরে বিক্রমপুর গ্রামে রয়েছে গোপালচাঁদজীর মন্দির। তিন ফুট উঁচু আসনের ওপর চল্লিশ ফুট উঁচু মাকড়া পাথরের

বাঁকুড়া তথা মধ্য রাঢ়ের ইতিহাস মল্লরাজ বংশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর আঠারো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় প্রায় স্বাধীন মল্লরাজ শাসিত বাঁকুড়া তথা মল্লভূমে কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে চরম বিকাশ বা রেনেসাঁস সূচিত হয়। যা বাংলার অন্য কোনও প্রান্তে তখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। সেই মল্লরাজ বংশের রাজধানী 'বিষ্ণুপুর'। যাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভালবেসে বলেছেন 'গুপ্ত বৃন্দাবন'। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে উৎকর্ষমুখী যে জোয়ার শুরু হয় তা সমগ্র মধ্য রাঢ়কে প্লাবিত করে।

দক্ষিণমুখী মন্দির। দ্বার অংশ ও বিগ্রহ মন্দির। প্রথমটি ছোট ও দ্বিতীয় অংশটি হল মূল মন্দির। মন্দির স্থাপত্যের রীতিতে প্রথম অংশটিকে বলে জগমোহন। অর্থাৎ যেখানে দাঁড়িয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন করা হয়। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে জগমোহন অংশ এই উদ্দেশ্যে নির্মিত। জগমোহন যুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ মন্দির স্থাপত্য বাঁকুড়া জেলায় কিছু অনুসৃত হলেও, সেই সব মন্দির বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এই বিক্রমপুরে এবং সিবর গ্রামে জগমোহন যুক্ত মন্দির রয়েছে, যা বাঁকুড়া জেলার গৌরব। এই সব মন্দির জাতীয়করণ, আশু সংস্কার ও সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সড়কে ভেদোয়শোল মোড় হয়ে লেভেল ক্রশিংয়ের পূর্বদিকে বেলিয়াড়া গ্রাম পার হয়ে চার কিমি দূরে সোনাতপন গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু জীর্ণ মন্দিরটি লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে এটি একটি শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি নিদর্শন ছিল। জীর্ণ হলেও এই মন্দির গাত্রে বহুলাড়া মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী পরিলক্ষিত হয়। আনুমানিক খ্রিস্টিয় এগারো শতকে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। পূর্বমুখী হওয়ার মন্দিরটিকে সূর্য মন্দির বলা হয়। মন্দিরের অদূরে সূর্যমূর্তি পাওয়া যায় এবং বীরসিংহ পুররাজহাট গ্রামাঞ্চলে সূর্য উপাসক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের বসবাস দেখে মন্দিরটিকে বিশেষভাবে সূর্য মন্দির বলা হয়।

বাঁকুড়া সদর থানা এবং পৌর সীমানার অন্তর্ভুক্ত দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত রাজগ্রামে হাটতলায় দত্তপাড়ার মধ্যস্থলে পূর্বমুখী ইটের তৈরি পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু সতেরো বর্গফুট এই মন্দির টেরাকোটা অলঙ্করণে সুসজ্জিত হলেও সংস্কারের ফলে অলঙ্করণগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। খ্রিস্টিয় উনিশ শতকে মাঝামাঝি স্থানীয় চিন্তামণি দত্ত কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অদূরে শ্রীরামপুর পাড়ায় পঞ্চরত্ন দক্ষিণমুখী শালগ্রাম মন্দির। এগারো বর্গফুট আসনের ওপর পঁচিশ ফুট উঁচু এই মন্দির গাত্র টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত। এই মন্দিরটি খ্রিস্টিয় উনিশ শতকের নির্মিত।

বাঁকুড়া তথা মধ্য রাঢ়ের ইতিহাস মল্লরাজ বংশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর আঠারো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় প্রায় স্বাধীন মল্লরাজ শাসিত বাঁকুড়া তথা মল্লভূমে কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে চরম বিকাশ বা রেনেসাঁস সূচিত হয়। যা বাংলার অন্য কোনও প্রান্তে তখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। সেই মল্লরাজ বংশের রাজধানী 'বিষ্ণুপুর'। যাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভালবেসে বলেছেন 'গুপ্ত বৃন্দাবন'। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে উৎকর্ষমুখী যে জোয়ার শুরু হয় তা সমগ্র মধ্য রাঢ়কে প্লাবিত করে।

বাঁকুড়ার মন্দির স্থাপত্য বহিরাগত কৃৎকৌশলে যে পরিপুষ্টি লাভ করে তা বিষ্ণুপুরের কোনও না কোনও মন্দিরে পরিলক্ষিত হবে। কারণ এখানের শিল্পীরা যখনি কোনও স্থাপত্যরীতি শিখেছে তখনই তারা মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুরে সেই পদ্ধতির মন্দির নির্মাণ করার বা বলা যেতে পারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। তাই এখানের মন্দির সমূহকে দেউল, চাল ও রত্ন স্থাপত্যগত দিক দিয়ে এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

এই তিন স্থাপত্য কৌশলের বাইরেও কিছু মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে ষোলোশ' খ্রিস্টাব্দ বীরহাম্বির নির্মিত রাসমঞ্চটি অন্যতম। পাঁচ ফুট উঁচু আশি বর্গফুট আয়তনের দেশিয় ঝামা পাথরের আসনের উপর ইটের তৈরি পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু প্রধান মন্দির। গর্ভগৃহ ও তার দক্ষিণে ছোটকক্ষটিকে ঘিরে তিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল চারদিকে বেষ্টন করে আছে। একেবারে ভিতরের দেওয়ালের প্রতি দিকে পাঁচটি, দ্বিতীয় দেওয়ালের প্রতিদিকে আটটি এবং বাইরের দেওয়ালের ফুলকাটা প্রশস্ত খিলান বড় আটকোণা স্তম্ভের ওপর সংস্থাপিত। চারদিক থেকে ধাপে ধাপে চাল ছাদ ওপরে ওঠে পঁয়ত্রিশ ফুট উচ্চে সমতল ছাদে গিয়ে মিলিত হয়েছে। পিরামিডের মতো করে প্রধান চূড়া লক্ষ্য করে প্রতিদিকে চারটি করে এবং প্রতি কোণে একটি করে চারচালা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য এসব ধ্বংস হয়ে পড়েছে। মল্লরাজাদের রাজত্বকালে রাসের সময় বিষ্ণুপুরের সব দেব বিগ্রহ এখানে রাখা হত জনসাধারণের দর্শনের জন্য। এই রাসমঞ্চের খ্যাতির মূলে রয়েছে প্রাচীনত্ব এবং স্থাপত্য কৌশলের অভিনবত্ব।

মল্লরাজাদের কর্তৃক স্থাপিত বলেই এই শিবলিঙ্গের নাম মল্লেশ্বর। রেখ দেউল রীতির মন্দিরগুলির মধ্যে ভট্টাচার্য পাড়ায় মল্লেশ্বর মন্দিরের নাম বিশেষভাবে উল্লিখযোগ্য। এক্তেশ্বরের মন্দিরের মতো বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের ফলে এর প্রাচীন মূল আকৃতি অপহৃত হলেও ভালো করে দেখলে এর রথপগও রাহাপগগুলি বোঝা যায়, যার থেকে বোঝা যায় এটি একটি রেখ দেউল। তাছাড়া উৎসর্গলিপিতে এটি একটি রেখদেউল বলে উল্লেখিত হয়েছে। 'বসুকর নবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন/অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিব পাদপদ্মেষু'। অর্থাৎ ৯২৮ মল্লাব্দে (১৬২২ খ্রীস্টাব্দ) শ্রীবীরসিংহ কর্তৃক অতিললিত দেবকুল (দেউল) শিবপাদপদ্মে নিহিত (সমর্পিত) হল।

বাইশ বর্গফুট পাভাগের ওপর পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু রেখদেউলটি দণ্ডায়মান। পশ্চিমমুখী মল্লেশ্বর মন্দির ল্যাটারাইট পাথরে নির্মিত।
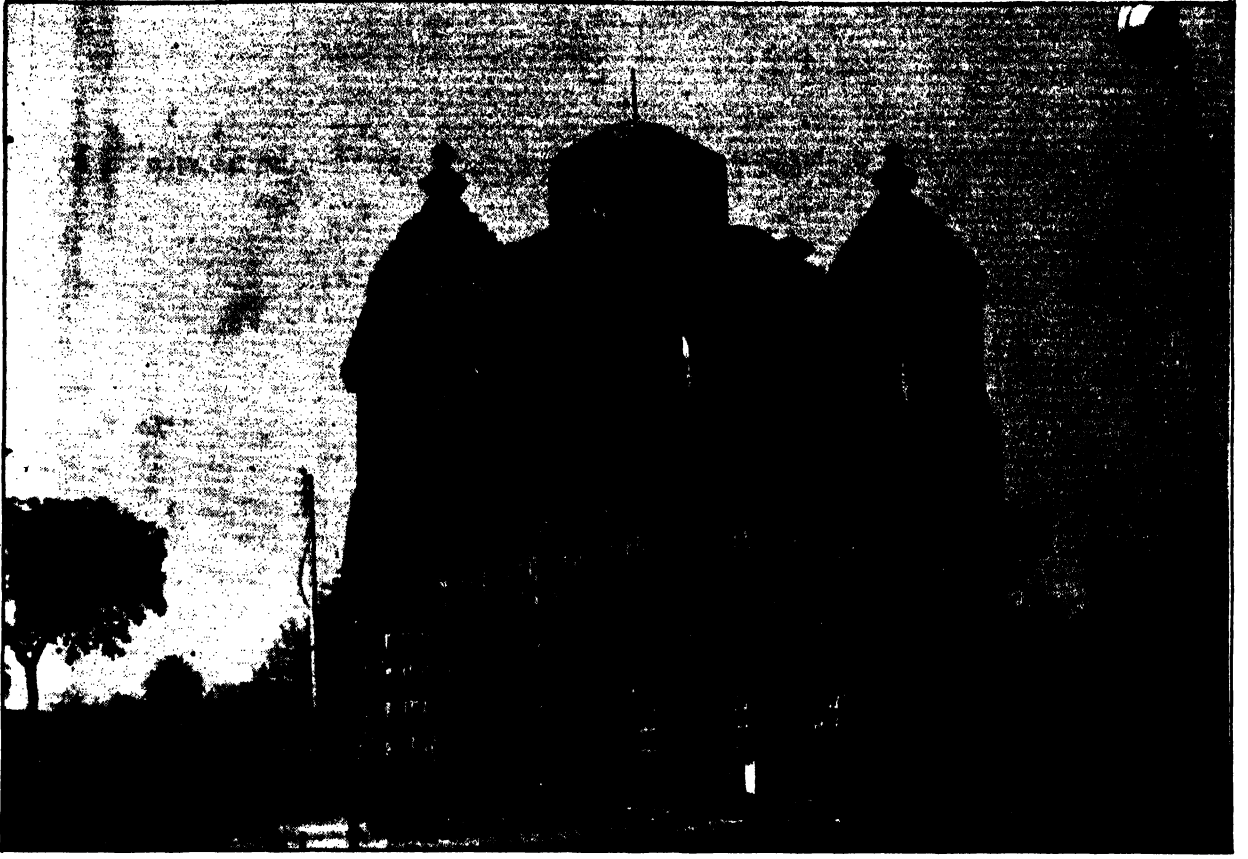
পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট ইটের তৈরি রাধাশ্যাম মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা চিত্রিত

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের পূর্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডি বি স্পুনারের ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দ বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শেষ পর্যায়ে এর প্রাচীন চূড়া ভেঙে পড়ে। পরবর্তীকালে বর্তমান আটকোণা চূড়াটি নির্মিত হয়। প্রবেশপথে মাথার ওপর কুলুঙ্গির মধ্যে সবুজ ক্লোরাইট পাথরের হাতিটি খুব সুন্দর।

শিলা ভাস্কর্যে অলঙ্কৃত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির মধ্যে রাধাশ্যাম মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।' লালজী মন্দিরের দক্ষিণে প্রাচীর বেষ্টিত অঙ্গনে ল্যাটারাইট পাথরে নির্মিত দক্ষিণমুখী রাধাশ্যাম মন্দির। বর্গাকারে তৈরি আসনের ওপর দৈর্ঘ্য প্রস্থে চল্লিশ ফুট ও পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু মূলমন্দির। মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিমে ত্রি-খিলান খোলা দালান ও উত্তরে রয়েছে ঢাকা বারান্দা। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ অলঙ্করণের ওপর পঙ্কের পলেস্তারা করা হয়েছে। অলঙ্করণের মধ্যে রয়েছে জ্যামিতিক ও ফুলপাতার নকশা। কুলুঙ্গির মধ্যে দু'সারিমূর্তি দেওয়ালের দু'পাশে কার্নিশের নিচে স্থাপিত। ছোট কয়েক সারি অনুরূপ অলঙ্করণ প্রবেশের খিলানের তিনদিকে উৎকীর্ণ হয়েছে। সম্মুখের ত্রি-খিলান দালানের ভিতরের গাত্রেও বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিগ্রহ মন্দিরের বাঁ-পাশে রাজসভায় রামসীতা ডাইনে দেবগণ পরিবেষ্টিত অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণু ও দরজার ওপর দু-দিকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় ১৬৮০ শকাব্দে (১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ) মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়। মল্লরাজবংশ পতনের পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের সব দেব বিগ্রহ একত্রিত করে সেবাপূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের প্রাণের দেবতা হলেন মদনমোহন জীউ। মদনমোহন জীউ অজস্র কিংবদন্তির নায়ক। সাড়ে চার ফুট বর্গাকায় আসনের ওপর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে চল্লিশ ফুট ও পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু মন্দির। দক্ষিণমুখী; ইঁটের তৈরি এই একরত্ন মন্দিরটি এই জাতীয় মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ত্রি-খিলান দালান। এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল এর গাত্রে সর্বত্র টেরাকোটা অলঙ্করণের প্রাচুর্য ও উৎকর্ষতা। খিলানের দু-পাশের গাত্রে ও কার্নিশের নিচে ছোট ছোট কুলুঙ্গির মধ্যে নানান দেবদেবীর মূর্তি বসানো হয়েছে। নিচের প্যানেলে পশুপক্ষী, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। স্তম্ভগুলি সজ্জিত হয়েছে কীর্তনীয়া দল এবং বিভিন্ন যুদ্ধ দৃশ্যে। গর্ভ মন্দিরের দেওয়াল ও বিভিন্ন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়েছে। মদনমোহন মন্দির গাত্রে এতোগুলি উন্নতমানের টেরাকোটা ভাস্কর্যের সন্নিবেশ দেখে গবেষক মিঃ স্পুনার বলেছেন, 'নকাশি কাজের জন্য যে পরিমাণ শ্রম এখানে ব্যয়িত হয়েছে তার তুলনা রাঢ়দেশে বিরল।"

মন্দিরের উৎসর্গলিপিতে রয়েছে 'শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দন পদম্ভোজেষু তৎপ্রীতয়ে। মল্লাব্দে ফণীরাজশীর্ষ গণিতে মাসে শুচো নির্মলে। সৌধং সুন্দর রত্নমন্দিরামিদং সার্দ্ধং স্বাচেতোহলিনা।

> **ঐতিহাসিকগণের মতে, হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়ে কৈবল্য লাভ করার পর, সেই সত্যধর্মকে চারিদিকে প্রচারের উদ্দেশ্যে তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর দামোদর নদীপথ ধরে বিহারীনাথ পাহাড়ে পদার্পণ করেন। পরবর্তী শতাব্দী কালের মধ্যে আসেন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। ক্রমশ বিহারীনাথ জৈনদের প্রধান শক্তিশালী প্রচার-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিহারীনাথ পাহাড়ের চারিদিকে বিভিন্ন গ্রামে জৈন ধর্মাবলম্বী সরাক গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য থেকে।**

শ্রীমর্দ্দাজন সিংহ ভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মানা ১০০০।" দুর্জন সিংহের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন বিগ্রহ তাঁর অধস্তন পুরুষ চৈতন্য সিংহ কলকাতাস্থ বাগবাজারে গোকুল মিত্রের নিকট বন্ধক রাখেন। পরে অনুরূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু তাও পরবর্তীকালে অপহৃত হয়েছে। ফলে নতুন মূর্তি আরও আনা হয়।

মন্দির স্থাপত্যরীতির সর্বশেষ রীতি হল বহুরত্ন বা চূড়ার সন্নিবেশ। এই জাতীয় মন্দিরের মধ্যে শ্যাম রায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চল্লিশ বর্গফুট পাভাগের ওপর দৈর্ঘ্য প্রস্থে সাঁয়ত্রিশ ফুট আয়তনের পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু প্রধান মন্দির। দক্ষিণমুখী এই শ্যাম রায় মন্দিরের অলঙ্করণ বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্করণ চিত্র। এই মন্দির গাত্রের অতীব সুন্দর চিত্রগুলির মধ্যে রাসমণ্ডলীর যে চিত্র তা তুলনাবিহীন। মন্দিরের ইঞ্চি পরিমিত স্থানও সুন্দর চিত্রে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি চিত্র এত সুন্দর নিখুঁত ও জীবন্ত হয়ে ওঠেছে যে, এত অজস্র চিত্র সৃষ্টিতে শিল্পীদের কোথাও এতটুকু উপেক্ষা বা আলস্য চোখে পড়ে না। তাদের নৈপুণ্য ও মুনশিয়ানার নিরিখে বিচার করলে, এই টেরাকোটা শিল্প ও শিল্পীদের চরম উৎকর্ষতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এর স্থাপত্যশৈলীও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ফুলকাটা ত্রি-খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা চারদিকে ঘিরে রয়েছে। যার মধ্যে গর্ভগৃহকে বেষ্টন করে রয়েছে পরিক্রমা পথ। এর মূল চূড়া আটকোণা। সংস্কারের ফলে অলঙ্করণ শূন্য শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। অপর চূড়া চারটি চারকোণা ও কার্নিস সজ্জিত।

মন্দিরের পূর্বগাত্রে আছে উৎসর্গলিপি। 'শ্রীরাধিকা কৃষ্ণমুদে শকেঙ্কবে/দাঙ্কযুক্তে নবরত্নং। শ্রীবীরহাম্বীর নরেশ সুনুর্দৌনৃপ শ্রীরঘুনাথ সিংহ। মল্লশকে ৯৪৯। শ্রীরাজা বীর সিংহ'। অর্থাৎ নরেশ বীর হাম্বীর পুত্র নৃপতি রঘুনাথ সিংহ ৯৪৯ মল্লাব্দে (১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দ) এই রত্ন মন্দির নির্মাণ করেন। এছাড়াও আরো লিপি মন্দিরের বিভিন্ন অংশে সংস্থাপিত হয়েছে। এই সব লিপিতে শিল্পী ও স্থপতিদের নাম উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে একজন যুবরাজের নামও উল্লেখ রয়েছে।

বিষ্ণুপুর শহর থেকে সোনামুখীগামী সড়কের জয়কৃষ্ণপুর মোড় থেকে অযোধ্যাগামী পশ্চিমমুখী সড়কের দু' কিমি দূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে ধরাপাট গ্রামে নেংটা শ্যামচাঁদের মন্দিরটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ওড়িশা স্থাপত্য শৈলীর মাকড়া পাথরের নির্মিত মন্দিরটির উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ফুট। মন্দিরটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হল পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম গাত্রে উৎকীর্ণ তিনটি মূর্তি। পূর্ব গাত্রে চর্তুভূজ, গলায় মালা, উপবীত, হাতে চক্র, গদা, পদ্ম। বোঝা যায় এটি একটি নারায়ণ মূর্তি। উত্তর বহিগাত্রে অর্থাৎ মন্দিরের পশ্চাদপটে রয়েছে পাঁচ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া ছাই রঙের শিলাপৃষ্ঠ উৎকীর্ণ, উলঙ্গ পুরুষ চিহ্নযুক্ত মূর্তি। মূর্তির পদতলে পদ্ম। পণ্ডিতগণের মতে মূর্তিটি জৈন তীর্থঙ্করের। এই জৈন তীর্থঙ্কর পরবর্তী বৈষ্ণবীয় প্রভাবে নেংটা শ্যামচাঁদে রূপান্তরিত হয়েছে। যেখানে স্থানীয় বহু নারী সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় পূজা মানত করে। পশ্চিমগাত্রেও অনুরূপ একটি তীর্থঙ্করের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরের পাশে নির্মিত হয়েছে মনসা থান। যেখানে একটি সর্পফণা যুক্ত তীর্থঙ্কর মূর্তি মনসাদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মল্লরাজত্বকালে ১৩২৩ শকাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। পাশেই একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। গবেষকদের মতে এই ধ্বংসস্তূপ ছিল জৈন উপাসনালয়। যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সেখানের মূর্তিসমূহ এই মন্দির গাত্রে সংস্থাপিত হয়েছিল।

জয়কৃষ্ণপুর মোড় থেকে পূর্বদিকে পাঁচ কিমি দূরে ষাড়েশ্বর খালের পূর্ব পাড়ে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে ডিহর গ্রামে মাকড়া পাথরে নির্মিত পাশাপাশি দণ্ডায়মান, ষাড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর মন্দির দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জয়পুর থানার অন্তর্গত জয়পুর থেকে দশ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম হল ময়নাপুর। এখানে ল্যাটারাইট পাথরে নির্মিত পশ্চিমমুখী সপ্তপীড় দেউল মন্দির আছে। এর সম্মুখাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত জগমোহনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। মন্দিরটির নির্মাণকাল নবম খ্রিস্টাব্দ। গ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে ধর্মঠাকুর যাত্রাসিদ্ধ রায়ের মন্দির। যাত্রাসিদ্ধ রায়কে কেন্দ্র করে দশম খ্রিস্টাব্দ রামাই পণ্ডিত তাঁর বিখ্যাত ধর্মমঙ্গল কাব্য শূন্যপুরাণ রচনা করেন।

বিষ্ণুপুর কোতুলপুর সড়কের জয়পুর অতিক্রম করে আরও ৬ কিমি পার হয়ে ডানদিকে সলদা গ্রামের মধ্যে দিয়ে ২ কিমি পশ্চিমে গেলেই গোকুল নগর গ্রাম। এই গ্রামের এক প্রান্তে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের মধ্যে রয়েছে পঁয়তাল্লিশ ফুট বর্গাকার আসনের ওপর পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু মূল মন্দির। বাঁকুড়া জেলার এটি একটি বৃহত্তম পাথরের মন্দির। মন্দিরকে ঘিরে আছে মন্দির পরিক্রমার পথ। মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে দশাবতারসহ নানা দেবদেবীর মূর্তি। পাথরের এমন পঞ্চরত্ন মন্দির বাঁকুড়া জেলাতে নেই বললেই চলে। উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় প্রথম রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে ৯৪৯ মল্লাব্দে (১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত হয়েছিল। এই অঙ্গনের দক্ষিণ দিকে নাটমন্দিরটি ধ্বংস হতে বসলেও এর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য যথেষ্ট। নয় ফুট চওড়া পাথরের দেওয়াল, তিনটি সাড়ে সাতশ

ফুট প্রস্থের পাথরের ফুলকাটা খিলান, উনষাট ফুট লম্বা ও একচল্লিশ ফুট প্রস্থের বৃহৎ আসনের উপর এই অতিথিশালাটি নির্মিত হয়েছিল। অদূরে আরেকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, এর সম্মুখে একটি সবুজ ক্লোরাইট পাথরের বরাহ মূর্তি, উঁচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সপ্তরথ পদ্ধতিতে নির্মিত পূর্বমুখী পাথরের গন্ধেশ্বর শিবের রেখদেউল, সামনেই ছড়িয়ে থাকা বৃহৎ আমলকের ধ্বংসাবশেষ, এখানে প্রাপ্ত কয়েকটি তীর্থঙ্করের মূর্তি ইত্যাদি সামগ্রী সমূহ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মূল্যবান সামগ্রী হওয়া সত্ত্বেও এগুলি উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে দীর্ঘকাল। প্রসঙ্গত বলি যে গোকুলনগর গ্রামের সন্নিকটে সলদা গ্রামে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পুকুর খননকালে একটি খুব সুন্দর পাথরের মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু তা গবেষণার জন্য কোনও গবেষণাগারে প্রেরিত না হয়ে, 'ভারতীয় চিরাচরিত প্রথানুসারে ফুল-বেলপাতাসহ সিন্দুর চর্চিত হয়ে গ্রামে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মন্দির নির্মাণের আয়োজন চলছে।

তালডাংরা থানা, তালডাংরা বিষ্ণুপুরগামী সড়কের আমডাংরা মোড়া থেকে দক্ষিণদিকে ২ কিমি দূরে পুরন্দর খালের পূর্বতীরে ৩ ফুট উঁচু ও কুড়ি বর্গফুট পা ভাগের ওপর ২৫ ফুট উঁচু মাকড়া পাথরের বাংলা আটচালা রীতিতে নির্মিত মন্দিরটি একটি বিশেষ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। মন্দিরে কৃষ্ণমূর্তিটি রামকৃষ্ণ নামে পূজিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত বলি যে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন মন্দিরে যে সব দেব বিগ্রহ রয়েছে, তার পাথরের প্রকৃতি, রং ও শিল্প নৈপুণ্য দেখে বোঝা যায় এগুলি বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। মন্দিরের নির্মাণকাল একটি আর্যার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত হয়েছে। যার অর্থ ৯৮৩ মল্লাব্দে দ্বিতীয় বীর সিংহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল।

বাঁকুড়া পরিমণ্ডলে তথা মধ্য রাঢ়ে জৈনরা যে এক সময় বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল, বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা মন্দির ও মূর্তিসমূহ তারই সাক্ষ্য বহন করে। যেমন বাঁকুড়া শহর থেকে তালডাংরাগামী সড়কের ধারেই পাঁচমুড়া গ্রাম থেকে আরও দক্ষিণে দেউলভিড়া গ্রামে অবস্থিত ১৪ বর্গফুট আসনের উপর ৪০ ফুট উঁচু রেখ দেউল। এর শিখর বিন্যাস হয়েছে ত্রিরথ পদ্ধতিতে। মন্দিরের গায়ে তিনটি বৃহৎকুলুঙ্গি আছে। অনুমিত হয় এগুলির মধ্যে মূর্তি সংস্থাপিত ছিল। মন্দিরের সন্নিকটস্থ গাছের তলায় যে মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে, সম্ভবত তা এই মন্দির গাত্র হতে তোলা হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখাংশে একটি ভগ্নস্তূপ ঢিবি রয়েছে। সম্ভবত এটি জগমোহন ছিল। মন্দিরটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এটি যে জৈনদের দ্বারা নির্মিত এবং তাদের যে উপাসনা কেন্দ্র ছিল সে বিষয়ে প্রায় সকলে এক মত। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঁকুড়া পরিমণ্ডলে জৈনধর্ম অবলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং, এই মন্দির তার পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরে যে ত্রিরথ প্রযুক্তি কৌশল অনুসৃত হয়েছে, তা সপ্তরথ প্রযুক্তি থেকে প্রাচীন। এই ভাবে বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর মধ্যে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

বাঁকুড়া শহর থেকে ষোলো কিমি দূরে বাঁকুড়া খাতড়া সড়কের শুলুক পাহাড়ি বাস স্টপেজের থেকে আরও ৪ কিমি পূর্বে ভতড়া গ্রামে রয়েছে ৩০ ফুট উঁচু মূল মন্দির। এই নবরত্ন মন্দিরের সম্মুখগাত্রে রয়েছে অপূর্ব টেরাকোটা ভাস্কর্য। ভতড়া গ্রামের ৪ কিমি পূর্বে

খ্রিস্টীয় দশম শতকের পাথরের দেউল · দেউলভিড়া

চৌরাবাদ গ্রামে একটি ছোট মাকড়া পাথরের মন্দির আছে। বর্তমানে তা শিবমন্দিরে পরিণত হয়েছে। বহু পূর্বে এখানে বাসুলী দেবী পূজিতা হতেন। স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস ও দাবি ছাতনার বাসুলী দেবী হলো চৌরাবাদের এই মন্দিরের বাসলী। কিভাবে তা ছাতনায় স্থানান্তরিত হলো সে বিষয়ে কিছু কিংবদন্তি প্রচলিত থাকলেও এর সুস্পষ্ট স্মরণ তমসাচ্ছন্ন।

দক্ষিণ বাঁকুড়া হল জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতির পীঠস্থান। পাশাপাশি তেমনি এখানে রয়েছে আর্যেতর সংস্কৃতির নিদর্শন। এদিকের প্রাপ্তভূমি রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত অম্বিকা নগরে রয়েছে অম্বিকাদেবী মূর্তি। অম্বিকা নগর থেকে ৪ কিমি পশ্চিমে পরেশনাথে প্রাচীনকালে এক সমৃদ্ধ জৈনধর্ম কেন্দ্র ছিল। সেখানকার জৈনদেবী অম্বিকা কালক্রমে হিন্দু দেবী অম্বিকা অর্থাৎ দুর্গাদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কাঁসাই ও কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলে ৮ বর্গফুট আসনের ওপর ১৫ ফুট উঁচু পাথরের দেউল মন্দির হল অম্বিকা মন্দির। এই মন্দিরের সঙ্গে বিষ্ণুপুর মহকুমার ডিহরের ষাড়েশ্বর মন্দিরের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের পাশে অবস্থিত মূর্তিটিকে বলা হয় তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্তি। গবেষকদের মতে এই
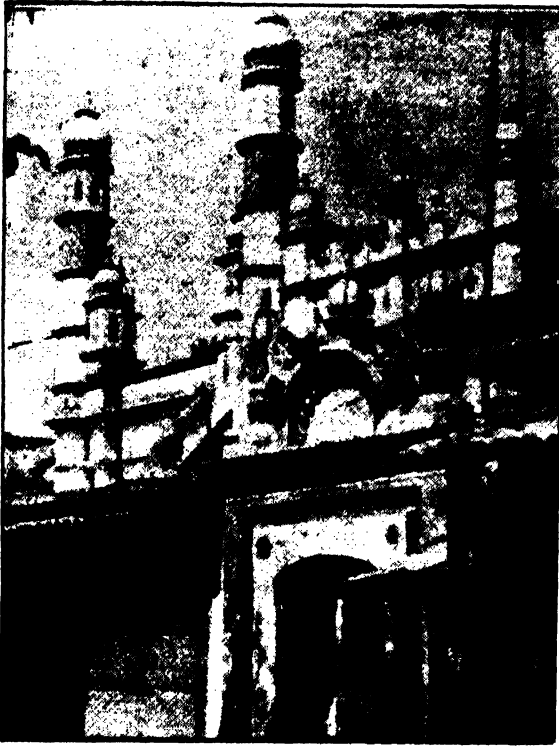
বাঁকুড়া শহরের একটি প্রাচীন মসজিদ, সৌজন্যে—শেখর ভৌমিক

মূর্তিগুলি বাঁকুড়া জেলার সব থেকে প্রাচীন শিলামূর্তি।

মন্দিরের মতো বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা শিলামূর্তিগুলির যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে। যেমন খাতড়া থানার পোরকুল গ্রামের কুমারী নদীর তীরে একটি অবলোকেতেশ্বর দশভূজা মূর্তি শায়িত রয়েছে। আরেকটি অনুরূপ মূর্তি রয়েছে কাঁসাই নদীর তীরে পরেশনাথ পাহাড়ে ইন্দপুর থানার অন্তর্গত গ্রামে কালো কোষ্ঠী পাথরের দশভূজা মূর্তি বিরাজিত। প্রাকৃতিক কারণে ও পরিচর্যার অভাবে উক্ত মূর্তি দুটির বাহু বিনষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমান চামুণ্ডা দেবীর অষ্টবাহু রয়েছে। দুটি বাহু এমনভাবে বিনষ্ট হয়েছে যা সহজে বোঝা যায় যা সহজে ধরা যায় না। এই দেবীর অষ্টবাহু থেকে গ্রামের নাম ও দেবীর নামকরণ হয়েছে আটবাইচণ্ডী। দুর্গা স্তোত্রানুসারে বৈদিক দেবী চামুণ্ডা হিসাবে পরিচিত।

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ১৬ কিমি দক্ষিণে বাঁকুড়া তালডাংরা সড়কের শিবডাঙ্গার মোড় থেকে প্রায় ৮ কিমি দূরে তালডাংরা থানার পশ্চিমে অবস্থিত হাড়মাসড়া গ্রামে মাকড়া পাথরে নির্মিত ওড়িশা শৈলীর এক পঞ্চরথ শিখর দেউলের কাছেই ৫৮ ফুট উচ্চতা ও আটাশ ইঞ্চি প্রস্থের একশিলা মূর্তি, যা তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ রূপে পরিচিত, একটি উল্লেখযোগ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই গ্রামে রায়পাড়ায় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত সামান্য টেরাকোটার অলঙ্করণ যুক্ত দক্ষিণমুখী লক্ষ্মী জনার্দনের দালান মন্দির অদূরে নবরত্ন রাসমঞ্চ এবং পাঁচঘসিয়া (বৈদ্য) পরিবারের টেরাকোটা অলঙ্কৃত লক্ষ্মী জনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দির এখানের মন্দিরগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছাতনা থানার অন্তর্গত দেউলভিড়া গ্রাম, বিশপুরিয়া রোড থেকে ৩ কিমি দূরে দুটি জোড়ের সঙ্গমস্থলে ব-দ্বীপের মতো স্থানে হাজার বছরের প্রাচীন অপরূপ লোকেশ্বর বিষ্ণু, নটরাজ শিব ও শুদুর্লভ কুবেরের মূর্তিটি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অতিমূল্যবান সামগ্রী।

বাঁকুড়া তথা মধ্য রাঢ়ের মন্দির স্থাপত্যকে যদি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি সুচারুরূপে বোঝা যায়। যেমন এক্তেশ্বর, সোনাতপলে যে যুগের স্থাপত্য নিদর্শন তার পরবর্তী অধ্যায় জানতে হলে বহুলাড়া, ধরাপাট, মৈঠার কনকলতা ইত্যাদি স্থানে যেতে হয়, এই প্রাচীনত্ব ছাড়িয়ে কিছু নতুনত্বের স্বাদ পেতে হলে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর নগরী পরিক্রমা করতে হয়, মিলন উৎসুক সাংস্কৃতিক ধারার মিলনের মধ্য দিয়ে যে আধুনিকতার প্রতিবিম্ব প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, বাঁকুড়ার মন্দির স্থাপত্যের সেই প্রস্ফুটিত শতদল হল রত্নমন্দির বা মঞ্চ, যা বার্ষিক আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবের জন্যই ব্যবহৃত হত, যেমন রাসদোল উৎসব। এ রকম রত্ন বা মঞ্চ মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুরন্দরপুর, মানকানালি, বিগ্না, বাঁকুড়া দোলতলা পাঠকপাড়া, পাত্রবাগড়, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ ইত্যাদি। বাংলার চারচাল, আটচাল রীতিতে যে মুনশিয়ানার আয়োজন রত্ন বা মঞ্চমন্দির তার পরিণতি।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের মতো বাঁকুড়ার নানা প্রান্তে গড়ে ওঠে মুসলমানদের উপাসনালয় বা মসজিদ। মন্দিরে যেমন স্থাপত্য বৈচিত্র্য অলঙ্করণ প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় মসজিদে কিন্তু তা নেই। সাধারণত মসজিদের স্থাপত্য হল তিনটি দ্বারবিশিষ্ট একটি কক্ষ। মধ্যিখানে ইমামের নমাজ পাঠের আসন এবং খুত বা পাঠের চেম্বার। মসজিদের বহিরঙ্গে কক্ষের ওপর পাশাপাশি তিনটি গম্বুজ। তাকে ঘিরে থাকে মিনার। মসজিদের আয়তন ও আকারের ওপর নির্ভর করে মিনারের সংখ্যা। অধিকাংশ মসজিদ পূর্বমুখী। এর সম্মুখগাত্রে জ্যামিতিক নক্শা ও লতাপাতা ফুলের অলঙ্করণ থাকে। তার ওপর ব্যবহৃত হয় তীব্র রং। মন্দির সাধারণত রাজা, জমিদার অথবা বিত্তবান ব্যক্তির অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়। মসজিদ স্থানীয় সর্বস্তরের মুসলমানদের দেয় অর্থে নির্মিত হয়। একটি পরিচালকমণ্ডলী মসজিদের সব কাজ পরিচালনা করে। এক সঙ্গে অনেকগুলি মসজিদ পরিচালনা করে একটি কেন্দ্রীয় মণ্ডলী বা ওয়াকফ্ কমিটি। পরিচালক মণ্ডলী নির্দিষ্ট বেতনে ইমাম নিযুক্ত করে। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় প্রায় আটাশটি মসজিদ আছে। মসজিদের ছোট সংস্করণ হল ইদ্‌গা। তিনদিক ছোট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা স্থান হল ইদ্‌গা। এর ওপর কোনও ছাদ বা আচ্ছাদন থাকে না। এখানেও ইসলামপন্থীরা নমাজ পাঠে অংশগ্রহণ করে। বাঁকুড়া জেলায় প্রায় সাতাশটি ইদ্‌গা রয়েছে। দরবেশ ফকিরের সমাধি বা মাজারেও মসজিদের মতো নমাজ সহ তাদের অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুর শহরের বুকে কোরবান সাহেবের সমাধিক্ষেত্র হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ধর্মবিশ্বাস ধরে আছে। তেমনি বাঁকুড়া শহরের বুকে অনেকগুলি পীরের থান বর্তমান রয়েছে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাস ও মিলনের প্রতীকরূপে।

মল্লভূম বাঁকুড়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমন ও বসতি স্থাপন সম্পর্কে জানা যায় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি রিপোর্টে :—

"Census 1951./ West Bengal/. District Hand Books Bankura./ by A Mitra. Page xxv Religions in Bankura. Mahammadans are found in greatest strength in the Vishnupur sub-Division. and especially in the Thanas

ইসমাইল গাজির দরগা : লোকপুর :

কোরবানতলায় কোরবান সাহেবের মাজার : বিষ্ণুপুর

bordering on Burdwan. viz. Kotulpur and Indas. Which account for nearly one-half of the total number. They are Sunnis belonging to the Hanifi sect, and the Majority are believed to the descendant of local converts."

এই বিবরণী থেকে বোঝা যাচ্ছে বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ার পূর্ব সীমান্ত ইন্দাস থানা হয়ে মুসলমানরা বাঁকুড়ায় প্রবেশ করে। সঙ্গে তাদের নেতা বা ধর্মীয় গুরু সম্প্রদায় আসেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁরা কিভাবে স্থানীয় মানুষদের ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয় তার কিছু কিছু কারণ জানতে পারি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি বিবরণী থেকে। যার থেকে বোঝা যায় বাঁকুড়ার মাটিতে ধর্মান্তরিতকরণ ঘটেছিল সহজ-সরল ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এ পথেই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা বাঁকুড়া জেলায় সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে। মল্লভূম বাঁকুড়ায় মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার ঘটে মল্লভূমের ইন্দাস, কোতুলপুর ও বিষ্ণুপুর শহরাঞ্চলে। তার মূলে রয়েছে মল্লরাজাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা। বাঁকুড়া জেলায় যে স্থানে মসজিদ রয়েছে তা হল যে, বাঁকুড়া, ছাতনা, বাদুলাড়া, নতুনগ্রাম, ধলগড়া, পুণিশোল, পুণ্যপাণি, খাতড়া, বেলুট, পাথরডাঙ্গা, পাঁচমুড়া, বিষ্ণুপুর, মাজপুর, আগুড়িয়া, পখন্না, সোনামুখী, দ্বারিক, বেলাড়া, পানপুকুর, কাটাদিঘি, রসুলপুর, ইন্দাস, খুশবাগ, লব্দা, মুকুলপুর, কুমরুল।

ইদ্‌গা রয়েছে যে স্থানে, জলহরি, কাপিষ্টা, ডিব্রুডি, সিমলাপাল, রায়পুর, কোতুলপুর, লালবাজার (বেলিয়াতোড়), বাহাদুরপুর (বেলিয়াতোড়), চাঁদ, চকাই, কাটাবাঁধ, ধগড়া, পাত্রসায়ের, প্রকাশঘাট, জামকুঁড়ি, ফকিরডাঙ্গা ও সাপাগাড়া।

ভারতে ইংরেজ শাসনের মধ্যযুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চার্চ মিশনারি সোসাইটি সর্বপ্রথম বাঁকুড়া জেলায় খ্রিস্টান ধর্মের পতাকা বহন করে আনে। এরা গোড়াপত্তন করলেও ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ 'ওয়েস্লীয়ান মেথাডিস্ট সোসাইটি' বাঁকুড়া জেলায় কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এদের এখানে প্রধান কর্মসূচি ছিল শিক্ষা, চিকিৎসা ও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার।

চার্চ মিশনারি সোসাইটি খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বর্তমান বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় তাদের প্রথম গির্জা গড়ে তোলে। যা বর্তমান বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। ওয়েস্লীয়ান মেথাডিস্ট মিশনারি সোসাইটি বাঁকুড়া খ্রিস্টান মণ্ডলীর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর মিশনের প্রধান রেভারেন্ড উইলিয়াম স্পিঙ্ক একটি সুন্দর সুবিস্তৃত স্থানে উপাসনালয় বা গির্জা নির্মাণের

সোনতপাল মন্দির (ইটের স্থাপত্য) সৌজন্যে : প্রকাশচন্দ্র মাইতি

উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া পুরুলিয়া অহল্যাবাঈ সড়কের পাশে খ্রিস্টান কলেজের সম্মুখে বর্তমান স্কুলডাঙ্গা মোড়ের পাশে আট'শ তিরিশ ডেসিমেল জমি ক্রয় করে। এখানে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় গির্জা ও পাদরীর থাকার বাসস্থান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মধ্যপ্রদেশ থেকে একদল হিন্দি ভাষী লোক আসে রেলওয়ে শ্রমিক হয়ে। এরাই তখন বৃহৎ গোষ্ঠী যারা প্রথম খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের জন্য বাঁকুড়া শহরের পশ্চিমাঞ্চলে নতুন চটিতে দেড়শ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। এখানে এক'শটি পরিবারের জন্য কাঁচা ঘর তৈরি করে গড়ে ওঠে খ্রিস্টানপল্লী। বর্তমানে যা খ্রিস্টানডাঙ্গা নামে পরিচিত। এই পল্লীতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে একটি গির্জা নির্মিত হয়।

বাঁকুড়ার খ্রিস্ট মতালম্বীরা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। (১) Church of North India–পূর্বেকার ওয়েস্লীয়ন মেথাডিস্ট মিশনারি চার্চ এর নাম পরিবর্তিত হয়। (২) Assembly God Church–এর পক্ষ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ একটি গির্জা নির্মাণ করা হয়।

বাঁকুড়া জেলার মহকুমা শহরে বিষ্ণুপুরে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মের প্রবেশ ঘটে। খ্রিস্টান সোসাইটি কর্তৃক নির্মিত M. E. স্কুলের মাটির বাড়িতে গির্জার প্রয়োজনীয়তা সাধিত হয়। এখানে গির্জা স্থাপিত হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। বিষ্ণুপুরে বিদেশি মিশনারিরা থাকতেন না, একজন ধর্মযাজক বা প্রচারক থাকতেন। এখানে খ্রিস্টধর্মীর সংখ্যা মাত্র পঁচিশ।

বাঁকুড়ার দক্ষিণাঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজ সম্প্রসারিত হয়ে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে সারেঙ্গায় একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মিশনারিদের শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মতো সেবাব্রতে আকৃষ্ট হয়ে এসব অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৃহৎ সংখ্যক মানুষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এখানের কাজের দায়িত্বে ছিল সেন্ট্রাল মিশনের।

কুচডিঙ্গা, কুচ্‌লঘাটি, গাড়রা, জামশোল, তেলিজাঁত, বেড়াবাইদ ইত্যাদি গ্রামে ১৯০১-১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গির্জা নির্মিত হয়। বাঁকুড়া জেলার বৃহৎ গির্জা নির্মিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড এ ই উডফোড় সাহেবের সক্রিয় ভূমিকায়। তৎকালে এর নির্মাণে ব্যয় হয় ষোলো হাজার টাকা। সারেঙ্গা ও সন্নিকটস্থ গ্রামে বর্তমান খ্রিস্টান জনসংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এদিকের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হয়। পরে এই অঞ্চল দু-ভাগে বিভক্ত হয়—সারেঙ্গা ও সেন্ট্রাল মিশন।

রাইপুর ও রাণীবাঁধ থানায় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টিয়ান মিশনারিরা তাদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। প্রথমে সারেঙ্গা থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে কাঁসাই নদীর ওপারে রাইপুরের কাছে দেউলি গ্রামে তাদের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। একটি পরিবার ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ এখানে প্রথম খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে নীলকরদের একটি কুঠি স্থাপিত হয়। সেখানেই মিশনারিরা থাকত এবং পরে সংলগ্ন স্থানে একটি মাটির গির্জা গড়ে ওঠে। আশি বিঘা জমির ওপর এখানে মিশনারিদের যে কেন্দ্রভূমি গড়ে ওঠে তা পরবর্তীকালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং খ্রিস্টান পরিবারসমূহ অন্যত্র চলে যায়।

রাইপুর থানার কুটামড়ি, রাধাগোবিন্দপুর, বেনাগুলী ইত্যাদি গ্রামে আদিবাসী পরিবারগুলি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হয়। এইসব এলাকায় কোনও কোনও গ্রামে মাটির গির্জা আছে। আর কিছু গ্রামে ব্যক্তি-বিশেষের বাড়িতে গির্জার প্রয়োজনীয়তা মেটানো হয়। সামাড়ি গ্রামে দশ-বারোটি খ্রিস্টান পরিবারের মধ্যে একটি গির্জা আছে। বাঁকুড়া জেলায় বর্তমান খ্রিস্টধর্মালম্বীদের সংখ্যা প্রায় ২৪৭০।

বৈচিত্র্যময় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার সমগ্র মন্দিরের মধ্যে মধ্যরাঢ়ের সর্বস্তরের জনজীবনের সুপ্রাচীনকালের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস নিহিত রয়েছে, যা যে কোনও নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের কাছে যেমন অত্যন্ত মূল্যবান, তেমনি বাঁকুড়া জেলার বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পথ প্রশস্ত করে জেলার গৌরব সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। এই বৃহত্তর ঐতিহাসিক গবেষণার স্বার্থের কথা চিন্তা করে মন্দিরগুলি আশু সংরক্ষণ ও সংস্কার অত্যন্ত আবশ্যক।

তথ্যসহায়ক :—

১। প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া—পরেশনাথ দাশগুপ্ত

২। বাঁকুড়ার মন্দির—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ গীর্জা—প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বাঁকুড়া সংস্কৃতি—প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। লোকায়ত জীবনের ক্রমবিকাশ—মন্টু দাস

৭। District Handbooks Bankura–A. Mitra

লেখক পরিচিতি : সদস্য, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ

বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক ইমারত

গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকেই 'জঙ্গলমহল'-এর সদর দপ্তর বাঁকুড়া শহরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকাংশ ইমারত গড়ে উঠতে থাকে এবং কিছু ভবন বেসরকারি প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল। ....প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে সামাজিক আধিপত্য ভোগ করত বংশানুক্রমিক ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত অভিজাতবর্গ। সে যুগে তাঁরাই ছিলেন শাসক শক্তির সহযোগী শ্রেণী ; তাঁরাও বেশ কয়েকটি ইমারত নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন।"

ভৌগোলিক দিক থেকে বাঁকুড়া জেলা বর্তমান দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। সাংস্কৃতিক ভূগোল অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলের এই প্রশাসনিক ক্ষেত্র 'রাঢ়' নামে অভিহিত অঞ্চল বিভাগের অঙ্গ। পণ্ডিতদের মতে, আবুল ফজল যখন 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন অর্থাৎ মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে অধুনা বাঁকুড়া জেলা নামে পরিচিত অঞ্চল ছিল অংশত 'সরকার-ই-মদারণ' নামক প্রশাসনিক বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত এবং অংশত স্বাধীন বিষ্ণুপুররাজের নিয়ন্ত্রণাধীন। আবার বিষ্ণুপুর, পাচেত, চন্দ্রকোণা ইত্যাদি কয়েকটি জমিদারি সমষ্টিগতভাবে 'সরকার-ই-মদারণ'-এর পশ্চিম সীমান্তবর্তী একটি পৃথক রাজস্ব বিভাগ হিসাবে গণ্য হত। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব জাফর খানের আমলে প্রশাসনিক সুবিধা ও ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা সুবার প্রশাসনিক বিভাগগুলির পুনর্গঠন করা হয়। ফলে পূর্বতন ৩৩টি সরকার বিভাগের স্থলে ১৩টি বৃহত্তর চাকলা বিভাগে রূপান্তরিত করা হয়। অন্যতম চাকলা ছিল বর্ধমান। সরকার-ই-মদারণ ও বিষ্ণুপুর করদ রাজ্য বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং বাঁকুড়া জেলা অঞ্চল এবং পূর্বতন সরকার-ই-মদারণের কিছু কিছু অঞ্চল ও করদ বিষ্ণুপুর জমিদারিভুক্ত অঞ্চল নিয়ে পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলার আবির্ভাব ঘটে। আবার নবাব জাফর খানের চাকলা বিভাগ সৃষ্টির মধ্যেও বাঁকুড়া জেলার উৎপত্তির বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার সময় বাংলায় অনেকগুলি জেলা বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীকালে পূর্বতন প্রশাসনিক বিভাগের আঞ্চলিক এক্তিয়ার হ্রাস করে অধিকাংশ জেলা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন 'বর্ধমান' চাকলা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বাঁকুড়া, বীরভূম ও হুগলি জেলা। (Ref.-The Revision of the Boundary Commissioner's on villages in the province of Bengal : Rowland N. L. Chandra, Calcutta, 1907, Page-17—20) ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই সুবা বাংলাকে অর্থাৎ বর্তমান বাংলা-বিহার-ওড়িশা অঞ্চলকে ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রশাসনিক জেলা এককে খণ্ডীকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সাতচল্লিশটি জেলা। বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। এভাবে অনেক সংযোজন-বিয়োজন ও অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'বাঁকুড়া একটি পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ—এর এক বিজ্ঞপ্তি বলে প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তিতে 'বাঁকুড়া' নামক জেলার সঙ্গে জেলা জজের পদ যুক্ত করা হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে ব্রজেন্দ্রকুমার শীলকে বাঁকুড়া জেলার জেলাজজ পদে ও বর্ধমান জেলার সেসনস্ বিভাগের সহকারি সেসনজজ পদে নিয়োগ করা হয়। ১৭ মে ১৮৮১ সৃষ্টি হয়েছিল বিষ্ণুপুর মহকুমা। পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলার আয়তন দাঁড়ায় ২৬২১ বর্গমাইল।

বাঁকুড়া জেলার শাসনকেন্দ্রের নামও বাঁকুড়া বা জেলার সদরকেন্দ্র হল বাঁকুড়া। বস্তুত জেলা কেন্দ্রের নাম অনুসারেই জেলাটিরও নামকরণ হয়েছে বাঁকুড়া। 'বাঁকুড়া' নামক পশ্চাৎপদ গ্রামটির প্রতি ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসকদের বিবেচনায় বাঁকুড়া গুরুত্ব অর্জন করেছিল। সামরিক কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে কলকাতার কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বিষ্ণুপুরের চেয়ে বাঁকুড়াকেই দেশের এ অংশের শাসনকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল। শিউভট্টের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মারাঠা অভিযানের সময় কোম্পানি সেনাবাহিনী বাঁকুড়া বা বাকুণ্ডা নামক একটি স্থানকে তাদের বিশ্রামস্থল হিসাবে ব্যবহার করেছিল বলে মনে করা হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন সীমান্ত সর্দারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় এই স্থানটিতে কোম্পানি বাহিনী শিবির সন্নিবেশ করেছিল (Ref.-Bankura District Gazetteer, 1968 : Edited by A. K. Bandyopadhyay, Page : 525)। ১৭৮৮-৯৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে ক্রিস্টোফার কিটিং ছিলেন বিষ্ণুপুর-বীরভূম সংযুক্ত জেলার কালেক্টর। তাঁর আমলে১৭৮৯—৯১ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ বাঁকুড়ার রাইপুর অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল 'প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ'। এ বিদ্রোহ দমনের জন্য বাঁকুড়া নামক গ্রামটিকে করা হয়েছিল অন্যতম প্রধান সামরিক ঘাঁটি। এভাবে সামরিক শিবির হিসাবে বাঁকুড়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে বাঁকুড়া ১৭৯৯-১৮০০ খ্রিস্টাব্দের 'দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহের' পরিপ্রেক্ষিতে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'জঙ্গল মহল' জেলার সদরকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। (বাঁকুড়াকে সদর দপ্তর করে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নং রেগুলেশন অনুযায়ী 'জঙ্গল মহল' জেলা গঠনের কারণ ছিল চুয়াড় বিদ্রোহের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চলে আদিবাসীদের লুঠতরাজ। 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা' নামক আদিবাসী অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'জঙ্গলমহল' জেলা ভেঙে দেওয়া হয়)। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে 'বাঁকুড়া শহর' জেলার সদর কেন্দ্র চিহ্নিত হওয়ায় শহর বাঁকুড়ার উৎপত্তি ও বিকাশের সূচনা ঘটে। এখনকার বাঁকুড়া শহরটি পুরনো দিনের বাঁকুড়া গ্রামের নাম অনুসারে নামাঙ্কিত হলেও ঔপনিবেশিক যুগে জেলা শাসনকেন্দ্র হিসাবে এর সূচনা ঘটেছিল ছাতনারাজের অধীনস্থ সামন্তভূম অঞ্চলে (বর্তমানে যে রাস্তাটি পাঠকপাড়া থেকে বের হয়ে কালীতলা পল্লী ভেদ করে মাচানতলা হয়ে পৌরভবন, বড় পোস্ট অফিস, জেলা গ্রন্থাগার ও কালেক্টরেটের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হয়ে জেলখানাকে ডান পাশে রেখে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেছে সেই রাস্তাটিই মোটামুটি মল্লভূম ও সামন্তভূমের সীমানা বিভাজক রেখা)। শহর বাঁকুড়ার এই গৌরবোজ্জ্বল বিকাশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত বিচিত্র নির্মাণশৈলীর বেশ কিছু ইমারত যে ইমারতগুলির অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল সরকারি আনুকূল্যে, কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং কিছু বেসরকারি সংগঠনের উন্নয়মূলক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে। এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়ই হল 'পুরনো ইমারতগুলির ইতিহাস'। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সরকারি অফিস-কাছারি হিসাবে বড় বড় ইমারত গড়ে উঠে।

পুরনো বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় ইমারতগুলির নির্মাণশৈলী হল Early Christian Style, Gothic Style, Renaissance Style, Roman Style এবং Modern Style। কাঠকয়লায় পোড়া ইট, মিহিচুন, খোয়া, সুরকি, মাটির টালি, শাল কাঠের কড়িবরগা বা লোহার কড়িবরগা, সেগুন কাঠের জানলা-দরজা, লোহার পাটি, মেথি ভেজানো জল, খয়ের ও বেলের আঠা প্রভৃতি
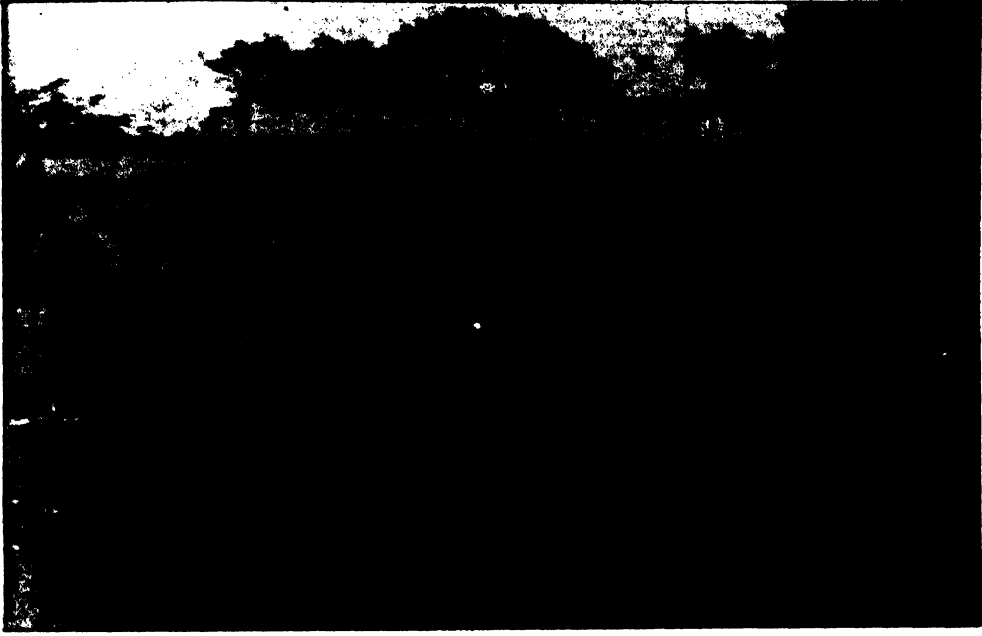
বাঁকুড়ার সার্কিট হাউস — ছবি চঞ্চল দাস

দ্রব্যগুলি ইমারতগুলির নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হয়েছে (বাস্তুকার ও স্থপতি রবীন্দ্রনাথ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

এই প্রবন্ধে আলোচিত ইমারতগুলি নিম্নরূপ :

(১) ইদ্‌গামহল্লার 'ইদ্‌গা' ও শহরের মূল মসজিদ

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে মেহেরুন্নিসা বেগম নামে জনৈকা বিধবা মুসলিম রমণী ইদ্‌গামহল্লার 'ইদ্‌গা'টি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইদ্‌গার প্রাচীন গাত্রে ফার্সি লেখা সমন্বিত একটি প্রস্তর ফলক ছিল। এ লেখার বক্তব্য হল, 'মোয়াল গণি'—'চু মেহেরুন্নিসা খানম আজ সিদ্‌ক দিল বনা মস্‌জিদি কারু মেহমান সাদাইয়ে খুর্দ কুস্ত তারিখ আজরে আজিম বা বখশাদ আজরে হাজিমষ খুদাই। হিঃ ১২২৪' (১২২৪ হিজিরা সন হল—১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ)।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের (১২২৬ হিজিরা সনে) ডিসেম্বর মাসে শেখ ইব্রাহিম নামে একজন সওদাগর বা ব্যবসায়ী শহরের মাচানতলাস্থিত মসজিদটি 'মসক্' (Mosque) নির্মাণশৈলীতে নির্মাণ করিয়েছিলেন। মসজিদটির দ্বিতীয় পর্বে সম্প্রসারণ ঘটেছিল ১৩৪৩ হিজিরা সনে বা ১৯২৫ খৃস্টাব্দে। বর্তমান সময়েও (নভেম্বর-ডিসেম্বর '২০০০) মসজিদটির সামনের দিকটি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

(২) সার্কিট হাউস

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে কেন্দুয়াডিহি অঞ্চলে বা পূর্বতন দেবীপুর গ্রামে স্থাপিত হয় 'সার্কিট হাউস'। তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার ও তাঁর কোর্ট বসার জন্য ব্যবহৃত হত এই 'সার্কিট হাউস'। সমতল ছাদবিশিষ্ট 'সার্কিট হাউস'টির আয়তন ৮০ ফুট x ৬২ ফুট = ৪৯৬০ বর্গফুট। বাইরের দিকের অফিসঘরটির আয়তন ছিল ৫৫ ফুট x ১৬ ফুট = ৮৮০ বর্গফুট।

প্রথম ও দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহের সূচনাপর্ব থেকে সার্কিট হাউসের পূর্বদিকের লোকপুর অভিমুখী রাস্তার বামপার্শ্বের ডাঙায় বসবাস করত ব্রিটিশ সরকারের সিপাহিরা। এজন্য এ স্থানটি 'সিপাহিডাঙা' নামে পরিচিত। শোভাবাজার রাজপরিবারের সদস্য ও বাঁকুড়ার জেলাশাসক কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ১৯০৬-০৭ সালে সিপাহিডাঙাতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী বাড়ি—'সিলভার ওক' নির্মাণ করিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সিপাহিডাঙার মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক রাজনৈতিক সম্মেলন। সভানেত্রী ছিলেন হেমপ্রভা মজুমদার।

(৩) কাছারি বা আদালত ভবন

১৮০৭-এ নির্মিত হয় জেলাজজের কাছারি ও রেজিস্টারের কাছারি (বর্তমানের ওল্ড ট্রেজারি বিল্ডিং) ভবন।

সমতল ছাদবিশিষ্ট দুটি কাছারিরই আয়তন ছিল সমান ৫০x৫০=২৫০০ বর্গফুট। কাছারি দুটির নির্মাণ ব্যয় ছিল সমান, প্রতিটির ২৫০০ টাকা। তখন জেলাজজ ও জেলাশাসক ছিলেন উইলিয়াম ব্রান্ট।

১৯১৮—২০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে বর্তমান ব্যবহৃত বাঁকুড়ার জজ ও সাবজজ আদালত ভবন নির্মিত হয়। সে সময় জেলাজজ ছিলেন যথাক্রমে জে জনসন, এস সি মল্লিক ও জি সি সেন। তৎকালীন বাঁকুড়ার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব অজয় দত্ত ও বিজয় দত্ত ভ্রাতৃদ্বয় ওই ভবনগুলি নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন।

(৪) জেলখানা ও বর্তমান পুলিশ লাইন চত্বর

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় বাঁকুড়ার দেওয়ানি জেলখানা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর উইলিয়াম ব্রান্ট মাটির দেওয়াল ও

বাঁকুড়ার আদালত ভবন ছবি : চঞ্চল দাস

খড়ের চালওয়ালা দেওয়ানি জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন (বর্তমান জেলখানা চত্বরে পূর্বদিকের 'কনডেমড্ বিল্ডিং'-এর স্থলে)। এখানেই গড়ে উঠেছিল 'ব্রোস্টেল'।

১৮০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দে ৯৫০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল সিভিল জেল, পাচকদের ঘর, স্টোররুম ও প্রহরীদারোগাদের বাসগৃহ।

১৮১৭-তে নির্মিত হয়েছিল 'জেল হসপিটাল'। ১৮২৯-এ নির্মিত হয় ২৫১ x ৪৫ ফুট—আয়তনবিশিষ্ট 'ক্রিমিন্যাল জেল'। জেলাশাসক ক্যাপ্টেন বেলের সময়কালে (১৮১৯-২০ খ্রিস্টাব্দ) গড়ে উঠেছিল অসুস্থ কয়েদীদের জন্য 'হাসপাতাল' ও ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আসামী ও দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের জন্য 'ক্রিমিন্যাল জেল'।

সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ছাতনারাজের কাছ থেকে কোম্পানি প্রশাসন চিরকালীন ইজারার শর্তে ১২৫ বিঘা ১১ কাঠা ১০ ছটাক জমি সংগ্রহ করে। এই জমিতেই গড়ে উঠেছিল 'ক্যান্টনমেন্ট'। ওই 'ওল্ড ক্যান্টনমেন্ট গ্রাউন্ড' নামে পরিচিত জমিতেই গড়ে উঠেছে এখনকার 'পুলিশ লাইন' এবং কিয়দংশ 'স্টেডিয়াম'। ১৮৩২ সালেও দক্ষিণ বাঁকুড়ার 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা' প্রশমিত হলে সরকার এই ক্যান্টনমেন্টে বেশ কিছুদিন সেনাবাহিনী রেখেছিলেন। সেনাবাহিনীর ব্যবহারের প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই জমি ও বাড়িগুলি জেলা কারাধ্যক্ষের অধীনস্থ হয়, ১৮৭২ পর্যন্ত এই জমি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল এবং পরে যা আরক্ষাধ্যক্ষের অধীনে চলে যায়।

(৫) পুলিশ সুপার বা আরক্ষাধ্যক্ষের কার্যালয় ভবন

বর্তমান বাঁকুড়া কালেক্টরেট চত্বরে সদর মহকুমা শাসকের অফিস ও তার পার্শ্ববর্তী ভবনটি নির্মিত হয় ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি কোর্ট চেম্বার এবং কোর্ট অফ্ সার্কিটের আদালত হিসাবে ব্যবহারের জন্য ওই দ্বিতল ভবনটি তৈরি হয়। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে জেলাশাসক ও জেলাজজ উইলিয়াম ব্লান্ট ১৩,৭৪৮ টাকা ৮ আনা ব্যয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন দুটি বারান্দাযুক্ত ওই দ্বিতল ভবনটি।

(৬) প্রথম জমিদার বাড়ি

ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে বাঁকুড়া জেলার সমাজব্যবস্থায় একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। শ্রেণীটি হল সাধারণভাবে কথিত 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'। শ্রেণীটি ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, পেশাভিত্তিক এবং দরপত্তনি ভূমিস্বত্বের সঙ্গে যুক্ত। তৎকালীন বাঁকুড়া শহরে এই শ্রেণীটির অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন শহরবাসী প্রথম জমিদার হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (১৮০০-১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। বর্ধমানরাজ এস্টেটের নায়েবের কন্যা মঙ্গলাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। ব্যক্তিগত ও সরকারি প্রভাবে হরিশঙ্কর মাত্র এগার শত একুশ টাকা এক আনা এক পাই বার্ষিক খাজনায় ২৬টি মৌজার পত্তনিস্বত্ব লাভ করেছিলেন। হরিশঙ্করের পিতা গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৭৮১—১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ) ফার্সিভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল ইন্দাস থানার সোমসার গ্রাম। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর মাসিক বিশ টাকা বেতনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারি উকিল নিযুক্ত হয়ে বাঁকুড়া আসেন।

বাঁকুড়ার প্রথম জমিদার বাড়ি বা হরিশঙ্করবাবুর বাড়ি (বর্তমানে জি পি সিংহ রোডস্থিত) তৎকালীন শহর বাঁকুড়ার এক বিস্ময়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এক দলিলে খামারবাড়ি, খাজনাঘর, দেউরিঘর সহ দোতলা দালানের উল্লেখ আছে। বাড়ির চৌহদ্দির মোট পরিমাণ ৫ বিঘা ৩ কাঠা। ১৮১২ (গুরুপ্রসাদের আমল থেকে) থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ—২০ বছর সময় ধরে হরিশঙ্করবাবুদের পাকা ইমারত

নির্মিত হয়েছিল। তিনি তৎকালীন বাংলার বাবু কালচারের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। তাঁর বৈঠকখানায় বসতো বাঈজি নাচের আসর। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া টাউন কমিটি গঠনের মাধ্যমে সরকার পৌরসভার সূচনা ঘটায়। বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছিলেন টাউন কমিটির সরকার মনোনীত সদস্য। হরিশঙ্করবাবুর স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি আজও ইতিহাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

বাঁকুড়া জেলায় ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে সমাজে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এই শ্রেণীটি হল সাধারণভাবে 'বুর্জোয়া' ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীটি ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, পেশাভিত্তিক ও দরপত্তনি ভূমিস্বত্বের সঙ্গে যুক্ত। আইন ব্যবসা, চিকিৎসা ব্যবসা, শিক্ষকতা, সরকারি চাকরি, ঠিকাদারি, নীলচাষ ও নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পেশাকে উপজীব্য করে এই 'তথাকথিত' মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল।

(৭) রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গলমহলের জেলাশাসক ও কালেক্টর ক্যাপ্টেন কেমিনের আমলে নির্মিত হয়েছিল 'সদর আমিনের কাছারি ভবন'। ভবনটির আয়তন ৬৫ ফুট x ৬০ ফুট, নির্মাণকার্যে ব্যয়িত অর্থ ৪৫০০ টাকা। এই ভবনটির ছাদ খিলানাকৃতি বা আরচড (Arched)। বর্তমানে ভবনটি ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডরুম বা জেলা মহাফেজখানা হিসাবে (সম্ভবত ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে) ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৮) পশু হাসপাতাল ভবন

বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের বিপরীত দিকে এবং জিলা পরিষদ বিশ্রামাগারের পশ্চিমদিকে অবস্থিত শহরের পশু হাসপাতাল ভবনটি ছিল পুরনো বাঁকুড়ার একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে এই দাতব্য চিকিৎসালয়টির সূচনা। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় চিকিৎসালয় ভবন। ডব্লু ডব্লু হান্টার তাঁর স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টস অফ বেঙ্গল (ভলিউম চার, পৃষ্ঠা ৩০২)-এ বলেছেন ১৮৩৯-এ বাঁকুড়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল।

১৯১৭ খিস্ট্রাব্দে 'ডিসপেনসারি' বা দাতব্য চিকিৎসালয়টি পশু হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়।

(৯) সাংবাদিক রামানন্দর বাড়ি

প্রায় ২০০ বছর আগে (১৭৯৯—১৮০০ খিস্টাব্দ) বাঁকুড়ার পাঠকপাড়া (পণ্ডিত জগমোহন রচিত 'দেশাবলী বিবৃতি' নামক তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে 'পাঠকপাড়া'কে 'বঙ্গালগ্রাম'রূপে উল্লেখ করেছেন— অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনের দশকে। মল্ল আমলের প্রথম পর্বে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণ পাঠকপাড়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন) পল্লীতে বাস করতেন রমানাথ ভট্টাচার্য—যিনি পেশায় ছিলেন পুরোহিত ও একজন নিম্নবিত্ত গৃহস্থ। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গানারায়ণও ছিলেন পুরোহিত। গঙ্গানারায়ণ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামসদনকে বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়ে বি এ পাস করান এবং পরবর্তী সময়ে রামসদন 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' পদে নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ হতে রামসদন 'রায়বাহাদুর' খেতাবও লাভ করেন। রামসদনই ওই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি, যিনি 'ভট্টাচার্য' পরিবর্তে 'চট্টোপাধ্যায়' পদবি ব্যবহার করতে শুরু করেন। ফলে এ পরিবারের 'ভট্টাচার্য'—'চট্টোপাধ্যায়' পদবিতে রূপান্তরিত হয়। রামসদনের তিন পুত্র যথাক্রমে সুকুমার, বিজয়কৃষ্ণ ও বসন্তকুমার ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও স্বনামখ্যাত কৃতীপুরুষ।

রমানাথ ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ সামান্য লেখাপড়া শিখে 'জেলার' হিসেবে সরকারি চাকরি করতেন। শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামেশ্বরও কর্মসূত্রে 'জেলার' ছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রামানন্দ (চট্টোপাধ্যায়) ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক। পাঠকপাড়ায় ওই গৃহেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫—১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পাঠকপাড়ার দ্বিতল বাড়িটি নির্মিত হয় ১৮৪০—৪২ খ্রিস্টাব্দে।

'বাঁকুড়া জেলা রামানন্দ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমিতি' ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রামানন্দর জন্মভিটের প্রবেশদ্বারে যে প্রস্তর ফলকটি গ্রথিত করেন, তাতে লেখা আছে—

'দেশবরেণ্য মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ ৩০শে মে (বঙ্গাব্দ ১২৭২ সালের ১৭ জ্যৈষ্ঠ) এই গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বাঁকুড়া জেলা রামানন্দ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমিতি কর্তৃক এই স্মৃতিফলক স্থাপিত। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২।' ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া গোঁড়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজে সমাজচ্যুত হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পর রামানন্দ পৈতৃকভিটা পরিত্যাগ করে স্কুলডাঙাস্থিত ব্রাহ্ম মন্দিরের (বর্তমান গান্ধী বিচার পরিষদ গ্রন্থগার) উত্তরদিকে দ্বিতল পাকা ইমারত তৈরি করেছিলেন নিজের বসবাসের জন্য—যে বাড়িটি এখন পরিত্যক্ত ও ভগ্নাবস্থায় ইতিহাসের বোবা সাক্ষী হিসাবে বিরাজমান।

(১০) জিলা স্কুল

ডাঃ জি এন চিক ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ১১ই আগস্ট মাসিক তিন'শ টাকা বেতনে 'সহকারি সিভিল সার্জেন' (বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সি এম ও এইচ) পদে নিযুক্ত হয়ে বাঁকুড়া জেলায় আসেন। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে আসীন ছিলেন। তাছাড়া চিক সাহেব অন্যতম বিশিষ্ট নীলকরও ছিলেন। সিভিল সার্জেন ও নীলকর ডাঃ জি এন চিক এবং তৎকালীন জেলা দায়রা জজ ফ্রানসিস গোল্ডসবেরী প্রমুখের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় জেলার প্রথম ইংরেজি স্কুল 'বাঁকুড়া ফ্রি স্কুল', যার বর্তমান নাম 'বাঁকুড়া জিলা
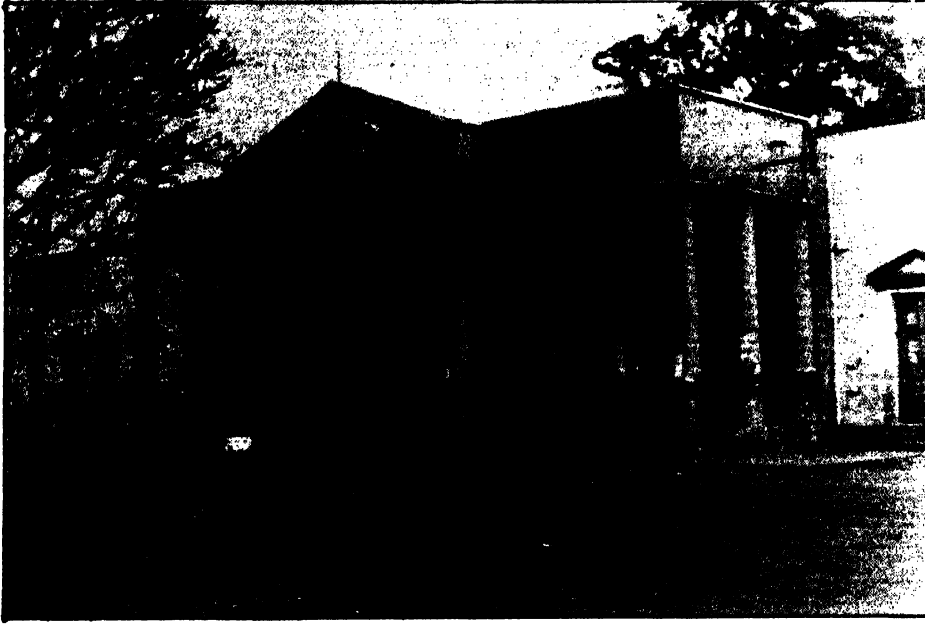
বাঁকুড়ার জেলা স্কুল ছবি : শুভ্রশেখর চক্রবর্তী

স্কুল'। তার আগে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ওই ভবন ছিল 'সিপাহি ব্যারাক হাসপাতাল'। সিপাহি ব্যারাক হাসপাতলে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওই ভবনটি (যা বর্তমান জেলা স্কুলের 'হলঘর' হিসাবে ব্যবহৃত হয়) নির্মিত হয়। সম্মুখভাগে সুউচ্চ থামের উপর স্থাপিত ছাদযুক্ত বারান্দা সহ ওই উঁচু বাড়িটির আয়তন ছিল ১৫০ ফুট x ৪৬ ফুট। এটি শহর বাঁকুড়ার অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম।

১৮৪০ থেকে এই ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাঁকুড়া ফ্রি স্কুল'। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'জেলা স্কুল' নামে সরকারি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর প্রথমে পূর্বদিকের এবং পরে পশ্চিমদিকের অংশের বিস্তার ঘটে। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজা মহাতাব চাঁদ বাহাদুরের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়েছিল বর্তমান বিদ্যালয় ব্যবহৃত অফিসঘরটি। বাড়িটি (এখন সহকারি প্রধানশিক্ষক মহাশয় যেখানে বসেন) পূর্বদিকের দেওয়ালে গ্রথিত একটি প্রস্তরফলকে লেখা আছে—

This Room
Erected through the liberality of
Maharajadhiraj Mahatabchand Bahadur
of Burdwan
A.D. 1851

বর্তমান জেলা স্কুলের ছাত্রাবাস ভবনটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অস্ত্রাগার ছিল বলে অনেকে মতপোষণ করেন। ১৮০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দ ওই অস্ত্রাগারটির নির্মাণকাল বলে মনে করা হয়।

(১১) কালীতলার বড়বাড়ি বা বৈপ্লবিক বাড়ি ও হরিসভা

হরিহর মুখোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০২ খ্রিঃ) চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর-মণিরামপুর থেকে বাঁকুড়া শহরে এসে বর্তমান কালীতলাপল্লীতে দ্বিতল পাকা বাড়ি তৈরি করে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী ও জেলার প্রথম ভারতীয় সরকারি উকিল। আপাতদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকারের আস্থাভাজন। হরিহর মুখোপাধ্যায়ের পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বাড়িটি (যা 'বৈপ্লবিক বাড়ী' নামে পরিচিত, স্বাধীনতা-উত্তরকালে 'বৈপ্লবিক বাড়ি' নামাঙ্কিত ফলকটি গ্রথিত হয়েছে বলে জানা যায়) নির্মাণ করেন ১৮৬৩-৬৪ সময়কালে এবং বাড়ির পিছনের 'শ্রীধর জিউ'-এর মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত টাউন কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম বেসরকারি ভারতীয় চেয়ারম্যান (৯ মে' ১৮৮৫ হতে ৩১ আগস্ট ১৯০০) ছিলেন হরিহর মুখোপাধ্যায়। তিনি আমৃত্যু গোপনে এই জেলায় বৃটিশ শাসন উচ্ছেদকল্পে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 'রামদাস পালোয়ান'-এর আখড়ার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। এই পরিবারের মন্মথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯০০-১৯০১ সময়কালে বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ও চারণকবি মুকুন্দদাস সহ বহু স্বনামধন্য বিশিষ্ট বিপ্লবী কালীতলার ' 'বৈপ্লবিক বাড়ি'-তে এসেছেন বলে জানা যায়। হরিহর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় তাঁরই বাড়িতে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল 'বাঁকুড়া শিল্প বিদ্যালয়'। বর্তমানে ওই বাড়িতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরস্বতী শিশুমন্দির) পরিচালিত হচ্ছে—ওই বিদ্যালয়ের অফিসঘরের এক কোণে একটি গ্রথিত প্রস্তরফলকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বা রচনার একটি অংশ 'লগ্নি..... যত' উৎকীর্ণ করা আছে। নিচে তারিখ দেওয়া আছে 'শক ১৮১৫, ১২ অগ্রহায়ণ'। ১৮১৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। অনেক প্রবীণ মানুষের মতে (শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন উপলক্ষে প্রেরিত) ওই প্রস্তরফলকে লিখিত

বিখ্যাত বৈপ্লবিক বাড়ি — ছবি · নিবেদিতা চক্রবর্তী

অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শুভেচ্ছা বার্তা বা আশীর্বাণী'। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলিকে বর্তমান কালীতলাস্থিত 'পুলিশ ক্লাব মেস' বাড়িটিতে নজরবন্দী করে রাখা হয়—এই সময় বাঁকুড়ায় যুগান্তর দলের সংগঠন বিস্তার লাভ করে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ধমান জেলার প্যামড়া গ্রাম থেকে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন কৃষ্ণধন মিত্র। তাঁর পুত্র নটবর বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস্ করে কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ডাঃ নটবর মিত্র ছিলেন কালীতলাপল্লীতে স্থাপিত 'হরিসভা'-র এক সদস্যাবিশিষ্ট অছি। হরিসভা সংলগ্ন 'রামদাস (চক্রবর্তী) পালোয়' নর কুস্তির আখড়া'টি বাঁকুড়া জেলায় স্বদেশি যুগে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের প্রজনন ক্ষেত্র বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। নটবর মিত্র ওই আখড়ার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ওই আখড়ায় বহু বিখ্যাত বিপ্লবীর যাতায়াত ছিল।

(১২) বড়বাজার

পুরনো বাঁকুড়ায় হাট বসত হাটতলায়। তৎকালীন 'হাটতলা'র জায়গাটিতে পরবর্তী সময়ে 'পোদ্দারপাড়া'র 'ষোল আনা শিব-দুর্গার মন্দির'টি স্থাপিত হয়েছে। পরে ওই স্থান হতে হাট স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে বর্তমান বড়বাজার বা চকবাজার নামক স্থানে। এই বাজার স্থাপন ও পাকা আচ্ছাদন নির্মাণে অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রভু ও বন্ধু জি এন চিকের স্মৃতি রক্ষার্থে বাজারটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০নং আইন অনুযায়ী বাজারটি নির্মিত হয়েছিল। বাজারটির দ্বারোদঘাটন করেন তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লু এস ওয়েল্‌স্। চকবাজারের ওই পাকা দালানটিতে বসে মৎস্য বিক্রেতাগণ কিছুদিন আগেও মাছ বিক্রি করতেন।

(১৩) পূর্বতন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় ভবন

বাঁকুড়া আদালত চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দক্ষিণমুখী একটি ভবনে এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক (ঘোড়া-সিংহ সমন্বিত) ভাস্কর্যে শোভিত। সূচনাপর্বে এই ভবনটি জেলাজজের বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হত, পরে বিচারালয় হিসাবে এবং স্বাধীনোত্তর পর্বে বহুকাল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে বাঁকুড়া আদালতের একটি বিভাগ ও পূর্তদপ্তরের একটি বিভাগের কার্যালয় হিসাবে পরিচিত।

এই ভবনটি প্রসঙ্গে শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শানবান্দা গ্রামের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮) লিখেছেন—বর্তমান জেলখানা সম্মুখের সেনা ব্যারাকটি সংস্কার করে ক্রমশ মিশনারিদের আশ্রয়, মুন্সেফ আদালত ও পি ডব্লু ডি কার্যালয় হয়েছে।

মূল বাড়িটির দক্ষিণদিকের দেওয়ালে শোভিত একটি প্রস্তরফলকে লেখা আছে—

Erected A.D. 1867 under immediate Superintendence of Mr. J. Fritchley, Jailor of Bankoorah, with convict labour —সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, পুরো ভবনটি কয়েদিদের শ্রমে নির্মিত হয়েছিল।

(১৪) পৌরসভা ভবন

বাঁকুড়া শহরের পৌর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেলাশাসক জে পি গ্রান্টের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল চার সদস্যের 'টাউন কমিটি'। জেলাশাসক ছাড়া অন্য তিনজন সদস্য ছিলেন পুলিশ সুপার জে এম জি চিক, হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৬নং আইন অনুযায়ী ১৮৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে গঠিত 'টাউন কমিটি' বাঁকুড়া

শহর বাঁকুড়ার বিকাশে ইউরোপীয় নীলকর, সরকারি কর্মচারী ও মিশনারিদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে সামাজিক আধিপত্য ভোগ করত বংশানুক্রমিক ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত অভিজাতবর্গ। সে যুগে তাঁরাই ছিলেন শাসক শক্তির সহযোগী শ্রেণী ; তাঁরাও বেশ কয়েকটি ইমারত নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

পৌরসভার সূচনা করে। প্রথম বেসরকারি ভারতীয় পৌরপ্রধান ছিলেন হরিহর মুখোপাধ্যায়।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া পৌরসভার কাজ প্রথম শুরু হয় বর্তমান বড়বাজারস্থিত টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভবনে। ওই ভবনটির মালিক ছিলেন রামসাগরের হাজরা পরিবারের শ্রীধর হাজরা। ১৯১৭ পর্যন্ত পৌরসভার কাজ চলে ওই ভবনে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পৌরপ্রধান বাবু রাসবিহারী ব্যানার্জির নেতৃত্বে বর্তমান পুরভবনটি নির্মিত হয়। নতুন ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন ছোটলাট রোনাল্ডসে সাহেব। ১৯৭৩ ও ১৯৯০—৯৩ বর্তমান ভবনটির সম্প্রসারণ ঘটে।

(১৫) মিশন বালিকা বিদ্যালয়

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া শহরে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্থায়ীকেন্দ্র হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল 'মিশন হাউস'। যে ভবনটি এখন মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের 'অফিসঘর' হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানেই ছিল 'মিশন হাউস'-এর সদর কার্যালয়। তার আগে মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের মূল গৃহটিও ছিল নীলকর সাহেবের কুঠি। নীলকরদের কাছ হতে ক্রয় করে এখানেই মেথডিস্ট মিশন সোসাইটি স্থাপন করেছিল তাঁদের সদর দপ্তর। তাই এই ভবনটি 'ওল্ড মিশন হাউস' নামেও পরিচিত। মিশন হাউসটিতে জন রিকেট নামক একজন নীলকরের কুঠি ছিল। তাই যে রাস্তাটি মিশন গার্লস স্কুলের পাশ দিয়ে কলেজ মোড় থেকে চাঁদমারিডাঙার মধ্য দিয়ে ভৈরবস্থান মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই রাস্তাটির আদি নাম রিকেট রোড।

১৯০৬-এর জানুয়ারি মাসের পর 'লালবাজার বালিকা বিদ্যালয়'টি (এখন মিশন গার্লস হাই স্কুল নামে পরিচিত) মিশন হাউসে স্থানান্তরিত হয়।

১৮৮০—৮৭ পর্যন্ত খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে এখানে 'ফিমেল ট্রেনিং স্কুল' পরিচালিত হয়েছিল।

বর্তমান মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত পুকুরের চারপার ইঁট দিয়ে বাঁধানো ছিল। কথিত আছে, জনৈক আর্মেনিয়ান সাহেব ওষুধ তৈরির জন্য বিলেতে 'বিষ' রপ্তানির উদ্দেশ্যে এই পুকুরে সাপের চাষ করতেন। ওই আর্মেনিয়ান সাহেবের নামও ছিল ডাঃ রিকেট। তাছাড়া বিদ্যালয় চৌহদ্দির এক কোণে একাধিক কবরেরও চিহ্ন দেখা যায়।

(১৬) হিল হাউস

জেমস্ হিফম্যান অ্যান্ডারসন ১৮৭৮—৮৩ পর্যন্ত বাঁকুড়ার জেলাশাসক ছিলেন। ভারতীয় প্রশাসন কৃত্যক থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্কটল্যান্ডে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ১৮৭৮—৮৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে অ্যান্ডারসন সাহেব বাঁকুড়ায় বিশাল সম্পত্তি বানিয়েছিলেন। এই সময়েই বাঁকুড়ার অন্যতম সুন্দর ইমারত 'হিল হাউস' (বর্তমানে জেলাশাসকের আবাসস্থল), 'কেন্দুয়াডিহি হাউস'

ছবি : চঞ্চল দাস

হিল হাউস
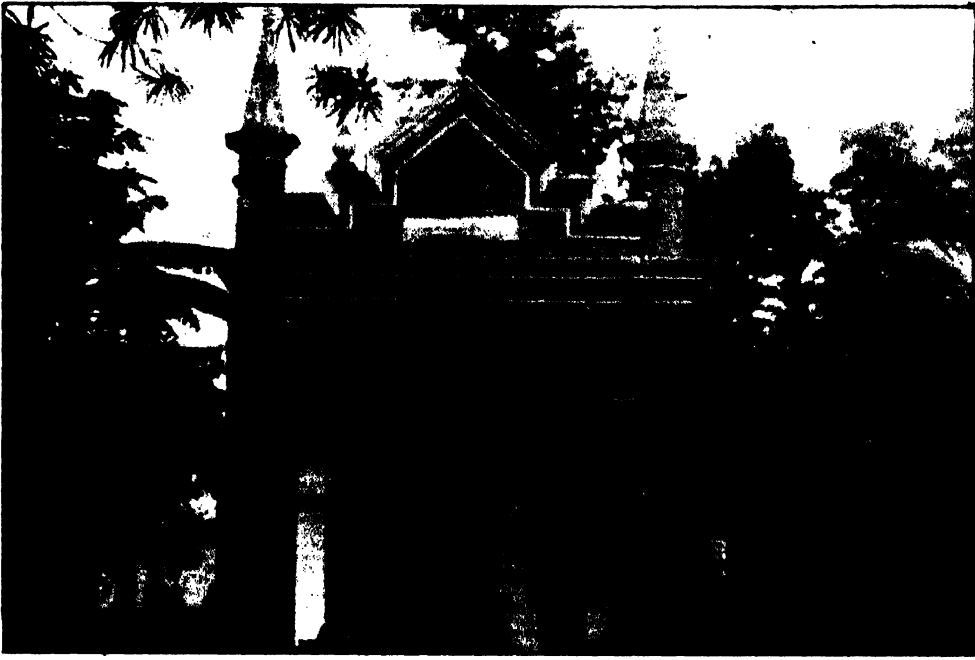
বাঁকুড়ার ব্রাহ্মসমাজ মন্দির (১৮৮১-৮২)　　ছবি চঞ্চল দাস

(বর্তমানে ডিস্ট্রিক্ট জজের বাংলো) প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। অ্যান্ডারসন স্কটল্যান্ডে চলে যাওয়ার পর বাঁকুড়ায় তাঁর বিশাল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিল কলকাতার বিখ্যাত 'গ্রিণ্ডলে অ্যাণ্ড কোম্পানি'।

'২১ জুন অ্যান্ডারসনের বাঁকুড়াস্থ সম্পত্তি তিন খণ্ডে নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় হবে'—এই মর্মে একটি সংবাদ কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের প্রথমপর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। (১) হিল হাউস নামক বাড়ি সহ ১৪ একর জমি, (২) একটি পুকুর সহ অ্যান্ডারসনের বাগান নামে পরিচিত ১১৯ বিঘা জমি (এখন যেখানে মিশন বয়েজ স্কুল, মিশন হাউস, খ্রিস্টান কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত) (৩) কেন্দুয়াডিহি হাউস নামক ইমারত সহ ৩০ একর জমি।

২২ জুন, ১৯০৪ স্থানীয় খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃপক্ষ হিল হাউস ও তৎসংলগ্ন ১৪ একর জমি ১৪,৫৫০ টাকার নিলাম ডাকে ক্রয় করেন। সরকারি উকিল কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৭৩০০ টাকায় অ্যান্ডারসনের বাগান কেনেন। তখন হিল হাউসে জেলা ও দায়রা জজ অম্বিকাচরণ সেন বসবাস করছেন। নিলামের অব্যবহিত পরে জেলা প্রশাসন দেখেন—শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'হিল হাউস'ই হচ্ছে জেলাশাসক বা জেলাজজের সরকারি বাসভবন হওয়ার উপযুক্ত স্থান। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার লক্ষ্যে, উদ্ভূত আইনগত জটিলতা নিরসনের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসন বিশেষ ক্ষমতাবলে 'হিল হাউস' অধিগ্রহণ করে এবং কলেজ স্থাপনের জন্য অ্যান্ডারসনের বাগানও অধিগ্রহণ করে। ১৯০৬-এর অক্টোবর মাস থেকে জেলাশাসকের সরকারি বাসভবন হিসেবে 'হিল হাউস' ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিগ্রহণের পর প্রথম বসবাসকারী জেলাশাসক হলেন ডব্লু সি লিডিয়ার্ড।

(১৭) বাঁকুড়ার ব্রাহ্মমন্দির

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের সূচনা হয়। প্রায় ত্রিশ বছর (১৯১১ পর্যন্ত) ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। সূচনাপর্বে (১৮৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দ) স্কুলডাঙাস্থিত পাকা উপাসনাগৃহ 'ব্রাহ্ম মন্দির' নির্মিত হয়েছিল। ওই উপাসনাগৃহটি এখন গান্ধী বিচার পরিষদের গ্রন্থাগার ভবন। মন্দিরে বিস্তৃত চত্বরের উত্তরাংশে পুরোহিতের বসবাসের জন্য একটি মাটির তৈরি কাঁচাঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রখ্যাত ব্রাহ্মপণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ কেদারনাথ কুলভী এখানে পুরোহিত হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৮৮০-র দশকে জেলায় ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ১৬ জন, বাঁকুড়া সদর থানায় ১২ জন, খাতড়ায় ৩ জন ও ইন্দাসে ১ জন। কেদারনাথ কুলভীর প্রভাবে ও পরামর্শে (বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯১-এ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।

(১৮) লালবাজার চার্চ

লালবাজার অঞ্চলের 'গির্জা' বা 'চার্চ' ভবনটি লালবাজার পুলিশ ফাঁড়ির পূর্বদিকে (যেখানে এখন গড়ে উঠেছে একজন চিকিৎসকের দ্বিতল ভবন) অবস্থিত ছিল। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মেথডিস্ট মিশনের রেভারেণ্ড জে আর ব্রডহেড বাঁকুড়ায় স্থায়িভাবে বসবাস করার পর তাঁর পরিচালনায় মিশনারিদের ধর্মপ্রচারমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। লালবাজারে গির্জাটি ১৮৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে নির্মিত হয়েছিল। ১৮৮২-র ২৮ ফেব্রুয়ারি রেভারেন্ড ব্রডহেড কর্তৃক 'এ' চ্যাপেলে সম্পাদিত হয়েছিল এক বছর বয়স্কা এক বালিকার ব্যাপটিজম্ অনুষ্ঠান (Ref.-Baptism Register, Methodist Church, Central Chapel, Bankura)। শহরের লালবাজার

১৭৮৮-৯৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে ক্রিস্টোফার কিটিং ছিলেন বিষ্ণুপুর-বীরভূম সংযুক্ত জেলার কালেক্টর।তাঁর আমলে১৭৮৯—৯১ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ বাঁকুড়ার রাইপুর অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল 'প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ'। এ বিদ্রোহ দমনের জন্য বাঁকুড়া নামক গ্রামটিকে করা হয়েছিল অন্যতম প্রধান সামরিক ঘাঁটি। এভাবে সামরিক শিবির হিসাবে বাঁকুড়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে বাঁকুড়া ১৭৯৯-১৮০০ খ্রিস্টাব্দের 'দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহের' পরিপ্রেক্ষিতে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'জঙ্গল মহল' জেলার সদরকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়।

অঞ্চলের গির্জাটি পরবর্তীকালে মিশনারিদের পরিচালনাধীন একটি বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমকালীন চার্চ গড়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুরে ও ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে সারেঙ্গায়। ১৮৮৪-তে বেশ কয়েকটি ধর্মান্তরকরণের ঘটনা বাঁকুড়া চ্যাপেলে ঘটেছিল। খ্রিস্টান কলেজের অধ্যক্ষ আর্থার ব্রাউনের উদ্যোগে ১৯২৬-২৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান স্কুলডাঙা মোড়স্থিত কেন্দ্রীয় গির্জাটি নির্মিত হয়। ব্রাউন সাহেব চার্চ ও চার্চ সম্পর্কিত ঘরবাড়ির একটি তালিকা তৈরি করে গেছেন—যা বিশপ অফিসে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়।

(১৯) রাহাদের লালবাড়ি

লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্যান্য ইমারতের মাঝে ঢাকা পড়েছে স্কুলডাঙা সুকান্ত স্ট্যাচুর সন্নিকটস্থ বিখ্যাত 'লালবাড়ি'টি। দ্বারভাঙ্গা এস্টেটের ম্যানেজার হিসাবে ভুবনমোহন রাহা বাঁকুড়ায় এসেছিলেন ১৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে। ভুবনমোহন ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত 'লালবাড়ি' নামক ইমারতটি নির্মাণ করেছিলেন। বাড়িটি একতলা, কিন্তু গঠনবৈচিত্রময়তায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাড়িটির সম্মুখে একটি বিশাল খিলান বা 'আর্চ' আছে যা স্থপতিদেরও অবাক করে।

সেকালে বনেদি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের বাড়িগুলি লালরঙেরই হত বলে জানা যায়।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অমরকানন থেকে ফেরার সময় গান্ধীজি রামপুর মনোহরতলার এই লালবাড়িতে রাত্রি যাপন করেছিলেন। বাড়িটির সামনে একদা ছিল একটি টেনিস কোর্ট। স্বাধীনোত্তরকালে বহুদিন এখানে 'এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স অফিস' ছিল।

(সূত্র : অজিত মিশ্র, রামপুর)

(২০) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভবন

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে শহরের কেন্দ্রস্থলে রেভারেন্ড জে ডব্লু ডুথি গ্রন্থাগার ও সভাগৃহ হিসাবে ব্যবহারের জন্য নির্মাণ করেছিলেন 'সেন্ট্রাল হল'—যেখানে বর্তমান 'জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক' গড়ে উঠেছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত চেহারা পরিবর্তন করে আধুনিক আদলে ব্যাঙ্ক ভবনটি শহরের কেন্দ্রস্থল আলোকিত করে রেখেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ভবনটি 'গির্জাগৃহ' হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক প্রবীণ মানুষের মতে এই ভবনটি ছিল ওয়েসলিয়ান মিশন প্রতিষ্ঠিত আদি গীর্জা গৃহ। সূচনাপর্বে বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান বা খ্রিস্টান কলেজের ক্লাসও এখানে হয়েছে বলে জানা যায়।

(২১) নীলাম্বর মঞ্জিল (লোকপুর) ও মালতীকুঞ্জ (কাঠজুড়িডাঙা)

আনুমানিক ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন তৎকালীন কাশ্মীর রাজ্যের দেওয়ান নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই নীলাম্বরবাবুর দানকৃত বাগানবাড়িতেই 'বেলুড় মঠ' প্রতিষ্ঠিত)। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পূর্বতন নদিয়া জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের) কুষ্টিয়া অঞ্চলে। বাঁকুড়ায় এসে তিনি কাঠজুড়িডাঙা পল্লীতে বিশাল জমির ওপর স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন—যার নাম দিয়েছিলেন 'মালতীকুঞ্জ'। মালতীকুঞ্জ ভবনটি নির্মিত হয় ১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দে—স্বাধীনোত্তরকালে যে ভবনে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের ছাত্রাবাস গড়ে উঠেছে। লোকপুর অঞ্চলে গিসবর্ন কোম্পানির নীলকুঠি সহ জমিজমা ও শুশুনিয়া পাহাড়ের নিকটে ১২৪৪ বিঘা আয়তনের পরাশীবনা মৌজার পত্তনি স্বত্ব ক্রয় করেন। ১৮৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে লোকপুর অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের দুটি নীলকুঠি ছিল। একটি স্কেলস্ নামক জনৈক নীলকর সাহেবের বসতবাড়ি এবং অন্যটি গিসবর্ন কোম্পানির নীলকুঠি। এরা যথাক্রমে ৬ টাকা ও ৪ টাকা করে পৌরকর দিতেন বলে পৌরনথি (১৮৭৭-৭৮) থেকে জানা যায়। লোকপুরের নীলকুঠিতে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে যে বাগানবাড়িটি নির্মাণ করেন, তার নাম রেখেছিলেন 'নীলাম্বর মঞ্জিল'। (নীলকর জে এন চীকের নীলকুঠিটি হল লোকপুরস্থিত 'কোহিনুর হাউস'—অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার যার মালিকানা পরবর্তীকালে পেয়েছিলেন। যেখানে একদা বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস ছিল এবং সে সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ওই বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এখন বাড়িটির মালিক দ্বিজপদ দাসের পুত্র দীপক দাস)। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পরিবারটি আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হতে থাকে এবং ফলস্বরূপ তাঁর পৌত্র কমলনাথকে দশ হাজার টাকায় 'মালতীকুঞ্জ' বাড়িটি বন্ধক দিতে হয়েছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বা ১৩১৮ বঙ্গাব্দে কলকাতায় সংগঠিত হয়েছিল 'বাঁকুড়া সম্মিলনী'— নেতৃত্বে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় (যাঁর আদি নিবাস ছিল মালিয়াড়া গ্রামে), সম্পাদক ব্যারিস্টার হৃষিন্দ্র সরকার, সহ-সম্পাদক প্রবোধচন্দ্র রায় (কলকাতা কর্পোরেশনের পদস্থ কর্মচারী), এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাই ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রায়বাহাদুর ঋষিবর

মুখোপাধ্যায়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল' স্থাপন ছিল 'বাঁকুড়া সম্মিলনী' নামক সংস্থাটির প্রথম স্মরণীয় কীর্তি। ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বদান্যতায় 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল' লোকপুরের 'নীলাম্বর মঞ্জিল' নামক ইমারত সহ বিস্তৃত ভূখণ্ড দান হিসেবে লাভ করে।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জনৈক ব্যবসায়ী ত্রিকমাদাস কুবেরজীর অর্থানুকূল্যে মেডিকেল স্কুল হাসপাতালের 'বহির্বিভাগ' নির্মিত ও সূচিত হয় এবং তার কয়েক মাস পর 'অন্তর্বিভাগ' শুরু হয়। তখন এখানে চারজন চিকিৎসক চিকিৎসা করতেন। এর কিছুকাল পরে মঙ্গলা দাসী নামক জনৈকা মহিলা ও তৎকালীন বাঁকুড়া মহিলা সমিতির সদস্যাদের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত হয় পাটপুর মোড়স্থিত 'প্রসূতি ভবন' (যা এখন সদর হাসপাতাল নামে পরিচিত)।

বাঁকুড়া সম্মিলনীর অন্যতম কর্মকর্তা শহরের কালীতলানিবাসী রায়বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে 'অপারেশন থিয়েটার' শুরু হয়। তৎকালীন বাঙলার প্রধান শল্য চিকিৎসক মেজর জেনারেল বি এস্ মিলস্ আই এম এস এ ভবনটির শিলান্যাস করেন। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ওয়ার্ড স্থাপন ও স্থানীয় হাসপাতালে ছাত্রদের শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯১৭—২৪ খ্রিস্টাব্দের ক্যাথেডাল সেটেলমেন্টের জন্য কেন্দুয়াডিহিতে নির্মিত যাবতীয় বাড়ি ও বাগান 'বাঁকুড়া সম্মিলনী'কে বার্ষিক এক টাকা খাজনায় স্থায়িভাবে ইজারা দেওয়ায় স্কুলটি এখানে স্থানান্তরিত হয় এবং হরির্তাকি বাগানের জমিতে বহু অর্থব্যয় করে নির্মিত হয় ছাত্রাবাস, যা বর্তমানে ফার্মেসি ইন্সটিটিউশনের এক্তিয়ারভুক্ত।

৫ জানুয়ারি, ১৯৩৫ কোতুলপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলে ও সুরেন্দ্রনাথের দানকৃত অর্থে নির্মিত হয় চল্লিশ শয্যাবিশিষ্ট 'অন্তর্বিভাগ'—যা 'কোলে বিল্ডিং' নামে পরিচিত। ওই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বাঙলার গভর্নর জন অ্যান্ডারসন। তার উপরে নির্মিত হয় 'আইসোলেসন ব্লক' ও সাধারণের বিশ্রামগৃহ।

এভাবে স্বাবলম্বনের আদর্শ অনুসরণ করে 'বাঁকুড়া সম্মিলনী'র উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল প্রায় একশো পঞ্চাশ শয্যাবিশিষ্ট সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলের হাসপাতাল ভবন।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মেডিকেল স্কুলটির কলেজে রূপান্তরকরণ এবং ১৯৬২-তে রাজ্য সরকার কর্তৃক মেডিকেল কলেজটির অধিগ্রহণ বাঁকুড়ার ইতিহাসে উজ্জ্বলতম ঘটনা। তারপর বর্তমান বর্ষে (২০০০) সেখানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সূচিত হয় 'বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল'-এর এক অনন্যসুন্দর জনমুখী কর্মপ্রবাহ।

(২২) বঙ্গবিদ্যালয় ভবন

বেনারস থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রসারিত সুদীর্ঘ বেনারস রোডের পাশে নির্মিত বারোটি সরাইখানার মধ্যে বাঁকুড়া জেলার আড়ড়া, বাঁকুড়া শহর, রামসাগর ও জয়পুরে চারটি সরাইখানা নির্মিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল পথিকদের, বিশেষত কপর্দকশূন্য তীর্থযাত্রীদের বিনাব্যয়ে নিরাপদ রাত্রিবাসের সুযোগ প্রদান। এই উদ্দেশ্যে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় পর্যটকদের জন্য ইদ্‌গামহল্লায় নির্মিত হয়েছিল সরাইখানা বা মুসাফিরখানা (Ref.- Bankura District Letters issued, 1802-69, Edited by Sinha & Banerjee, Page : 176)। এটি পশ্চিম ছাতনা চৌকির মদনগোপালপুর মৌজায় অবস্থিত। সরাইখানার জমির পরিমাণ ২ বিঘা ১৬ কাঠা ১০ ছটাক। ২৫০ ফুট x ১৩ ফুট আয়তনের সরাইখানা নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল দুহাজার টাকা। তখন জেলার কালেক্টর ছিলেন উইলিয়াম ব্লান্ট।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরাইখানা ভবনটি 'বঙ্গবিদ্যালয়' নামে পরিচিত। তৎকালীন বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ হতে 'মুসাফিরখানা' নামে জীর্ণ পাকা বাড়িটির চল্লিশ বছর মেয়াদি লিজ পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন জেলাবোর্ডের সদস্য ও বিদ্যালয় কমিটির সম্পাদক বসন্তকুমার নিয়োগীর অবদান স্মরণীয়। এই লিজ পাওয়ার পর শহরের দশের বাঁধ পার থেকে 'বঙ্গবিদ্যালয়' ১৮৯০ হতে মুসাফিরখানায় স্থানান্তরিত হয় (সূত্র : বাঁকুড়া দর্পণ, ১৬ মার্চ' ১৯৩৪)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৮০-র পূর্বে বাঁকুড়ায় নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রথম প্রচেষ্টাস্বরূপ 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' বা 'মডেল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও কিছু সময়ের জন্য ওই মুসাফিরখানায় গড়ে উঠেছিল। পরে হিন্দু রক্ষণশীল মনস্কতার জন্য বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।

(২৩) হিন্দু হাই স্কুল ভবন

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাঁকুড়া শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দক্ষিণাচরণ বরাট ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী 'হিন্দুস্কুল' নামে একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়টি প্রথমে দোলতলা পল্লীতে, তারপর ইন্দারাগোড়ায় একটি কাঁচা মাটির বাড়িতে (যেখানে এখন দেশবন্ধু ব্যায়ামাগার গড়ে উঠেছে) এবং তারপর দক্ষিণাচরণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত পাকা বাড়িতে, শহরের নতুনগঞ্জ এলাকায় (যে ভবনটিতে এখন টাউন বয়েজ স্কুল বিদ্যমান) অবস্থিত ছিল। অবশেষে ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু স্কুল পুনরায় স্থান পরিবর্তন করে লালবাজারের পিলগ্রিম রোডে নিজস্ব নবনির্মিত ভবনে স্থায়িভাবে গড়ে ওঠে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। কুচকুচিয়ার মিশনারি বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হওয়ার প্রাক্কালে গড়ে ওঠে হিন্দু স্কুল। আবার কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষকের অভিমত, শহরে মিশনারিদের প্রভাব খর্ব করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গড়ে ওঠে 'হিন্দুস্কুল'।

(২৪) ব্রায়ান কুষ্ঠাশ্রম

ইংল্যান্ডের ব্রাইটনের অধিবাসিনী মিসেস ব্রায়ান প্রদত্ত ৫০০ পাউন্ড অর্থে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে বদরা গ্রামে 'ব্রায়ান কুষ্ঠাশ্রম' স্থাপিত হয়। 'মিশন টু লেপার ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ইস্ট' ব্রায়ান কুষ্ঠাশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 'মারকুইয়েস অব ডাফরিন'। পরে মিঃ জ্যাকসন্ তাঁর প্রয়াতা কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে এই কুষ্ঠাশ্রম চত্বরে 'এডিথ হোম' নামে অন্য একটি বিভাগের সূচনা করেন। কুষ্ঠরোগীদের যেসব ছেলেমেয়েরা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়নি—সেইসব সুস্থ ছেলেমেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় এই 'এডিথ হোম'-এ। সেখানেই তাদের লেখাপড়া ও হাতের কাজ শেখানো হত।
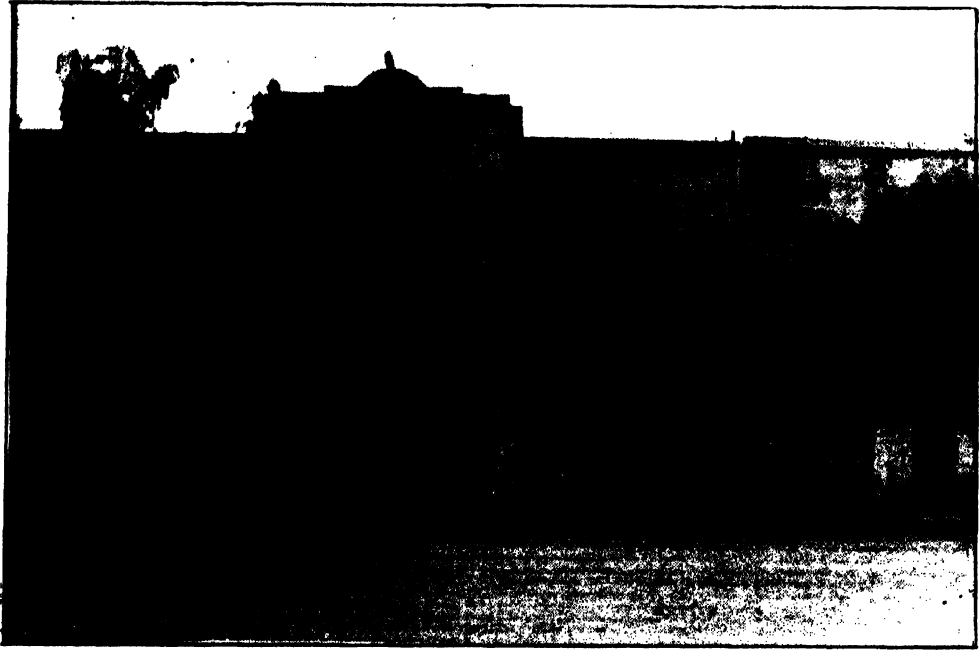
ওয়েসলিয়ান বা খ্রিস্টান কলেজ — ছবি : নিবেদিতা চক্রবর্তী

(২৫) ওয়েসলিয়ান বা খ্রিস্টান কলেজ

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন, সোমবার ওয়েসলিয়ান কলেজ (বর্তমান খ্রিস্টান মহাবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা' হল বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ওয়েসলিয়ান মেথিডিস্ট মিশনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড জন রিচার্ডস শহরের কুচকুচিয়া অঞ্চলে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৮৯-এ একটি হাই স্কুল বিভাগ এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়। কুচকুচিয়া অঞ্চলে গড়ে ওঠা ওই উচ্চবিদ্যালয়ে মাত্র এগারজন ছাত্র নিয়ে 'ওয়েসলিয়ান কলেজ'-এর সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুদিন কেরানিবাজারের 'সেন্ট্রাল হল' (বর্তমান বি ডি সি সি ব্যাঙ্ক ভবন)-এও ওয়েসলিয়ান কলেজের ক্লাস হয়েছিল।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের পর জেলাশাসক জেমস্ হিফম্যান অ্যান্ডারসন অবসর গ্রহণের পর স্কটল্যান্ডে চলে যান এবং তখন বাঁকুড়ায় তাঁর বিশাল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিল কলকাতার 'গ্রিন্ডলে অ্যান্ড কোম্পানি'। ওয়েসলিয়ান মিশন কর্তৃপক্ষ হিল হাউস সহ তৎসংলগ্ন ১৪ একর জমি এবং সরকারি উকিল কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিলাম ডাকে গ্রিন্ডলে কোম্পানির কাছ হতে ক্রয় করেন অ্যান্ডারসনের বাগান ও পুকুর। তারপর অনেক আইনগত জটিলতা ও বাধা অতিক্রম করে তৎকালীন সরকার কলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে অ্যান্ডারসনের ১১৯ বিঘা বাগান ও পুকুর অধিগ্রহণ করে ১৭ জানুয়ারি, ১৯০৬। ওই অধিগৃহীত জমিতে পরে নির্মিত হয়েছিল কলেজ ভবন ও দুটি ছাত্রাবাস। কুচকুচিয়া অঞ্চল হতে স্থানান্তরিত হয়ে এখানে মিশন হাই স্কুল (বর্তমান খ্রিস্টান কলেজিয়েট স্কুল) এবং স্কুলের খ্রিস্টান ছাত্রদের জন্য 'বোর্ডিং হাউস' নির্মিত হয়। জমির পূর্বপ্রান্তে উঁচু জমিতে নির্মিত হয় 'মিশন হাউস'। লালবাজারের বালিকা বিদ্যালয় (লালবাজার চার্চ ও হিলহাউস শিরোনামে ইতিপূর্বে আলোচিত— যা পরে 'মিশন বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। বর্তমান বিদ্যালয় চত্বরে বা ওল্ড মিশন হাউসে স্থানান্তরিত হয়।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ওয়েসলিয়ান কলেজের বর্তমান ভবন নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯। ১৯১০-এর আগস্টে বাংলার রাজস্ববোর্ডের তৎকালীন বিশিষ্ট সদস্য মিঃ ব্ল্যাক নবনির্মিত কলেজ ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ওই বছরই কলেজটি ডিগ্রি কলেজের মর্যাদা পায়। ১৯১১-১২ বর্ষে এখানে সহশিক্ষার প্রবর্তন হয়। ১৯১৭-তে কলেজটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে পরিণত হয় এবং ১৯২৩-এ ওই ভবনের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ফেলো রেভারেন্ড জন মিচেল ছিলেন কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ (১৯০৩-০৯)। প্রতিষ্ঠা পর্বে শ্রীকান্ত কর্মকার, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুলদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য—এই তিন বাঙালি অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৯-এর পর জন মিচেলের অবসরের পর রেভারেন্ড আর্থার ব্রাউন (রামানুজ করের মতে ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যক্ষ মিচেল সাহেব বিলেতে গমন করায় ব্রাউন সাহেব অধ্যক্ষ পদে আসীন হন) সুদীর্ঘকাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

(২৬) হেনরি উইলিয়াম উডফোর্ডের কুঠি

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের (বি এন আর) আদ্রা-খড়গপুর শাখার স্থায়ী 'ওয়ে ইন্সপেক্টর' (পি ডব্লু আই) হেনরি চার্লস লোথিংয়ের মাটির তৈরি আবাসগৃহ তৈরি হয় বর্তমান বাঁকুড়ার কেঠারডাঙা অঞ্চলে, যেখানে এখন 'রামকৃষ্ণ মিশন' অবস্থিত। পরবর্তী সময়ে (১৯০৫-০৬) অন্যতম ইন্সপেক্টর হেনরি উইলিয়াম উড়ফোর্ড এই কুঠিতে বসবাস করেছেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এই সম্পত্তি কিনে নেন তৎকালীন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট লৌহব্যবসায়ী গোপীনাথ দত্ত।

বাঁকুড়ার প্রাতঃস্মরণীয় সৎ ব্যবসায়ী ও দানবীর বিপিন দত্তের পিতা ছিলেন গোপীনাথ দত্ত। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে গোপীনাথ দত্ত 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন'কে বাঁকুড়া কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এই সম্পত্তি দান করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী মহেশ্বরানন্দজি (ডাক্তার মহারাজ, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে যাঁর নাম ছিল বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র (১৮৯০-১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ), কালীতলার বাসিন্দা) রামকৃষ্ণ মিশনের বাঁকুড়া কেন্দ্রটি স্থাপন করেন। ১৯৪১-এ এই জমির উপর নির্মিত হয় মিশনের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও রোগীদের থাকার জন্য অতিথিশালা।

(২৭) জেলা উদ্বাস্তু ও ত্রাণদপ্তরের কার্যালয়

বর্তমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদের উত্তরদিকে রাস্তার ওপারে শহরের কেন্দ্রস্থলে জীর্ণপ্রায়, গাছ-গাছালিতে ঢাকা একটি বাড়ি বিদ্যমান—যা এখন 'জেলা উদ্বাস্তু ও ত্রাণদপ্তরের কার্যালয়'-এর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনটির দক্ষিণমুখী প্রধান দরজার উপরিভাগে গ্রথিত একটি প্রস্তরফলকে লেখা আছে।—

The building owes his existence to the benevolent energy of our popular and beloved Magistrate and collector Kumar Ramendra Krishna Deb, A.D. 1906

এই বাড়িটি জেলা কাছারি প্রাঙ্গণের অন্তর্গত ১.৬৫ কাঠা সরকারি জমির উপর বর্ধমান বিভাগীয় কৃষি সমিতির বাঁকুড়া জেলা উপসমিতির বীজ গুদাম ও সভাগৃহ হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছিল। সে সময় (১৯০৬) জেলাশাসক কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ছিলেন উক্ত কৃষি সমিতির বাঁকুড়া জেলা উপসমিতির সভাপতি।

(২৮) সি এম ও এইচ বাংলো

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঁকুড়ার সিভিল সার্জেন (বর্তমান নাম সি এম ও এইচ) ছিলেন ভি এ ওয়াট। কানকাটার মোড় ও ভৈরবস্থানের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানের দক্ষিণদিকে অবস্থিত সিভিল সার্জেন বা সি এম ও এইচ (মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক)-এর বাংলোটি ওয়াট সাহেবের আমলে নির্মিত হয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকার পনের হাজার টাকায় ওয়াট সাহেবের আবাসস্থলটি সিভিল সার্জেন বা সি এম ও এইচ-এর সরকারি বাসভবন হিসাবে ব্যবহারের জন্য অধিগ্রহণ করে।

(২৯) এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল

রানী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স অ্যালবার্টের জ্যেষ্ঠপুত্র অ্যালবার্ট এডোয়ার্ড (১৮৪১-১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম এডোয়ার্ড হয়ে ইংলন্ডের সিংহাসনে বসেন। দশ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর প্রায় ৬৯ বছর বয়সে ৬ মে, ১৯১৯ পরলোক গমন করেন। কলকাতায় সংগঠিত 'সপ্তম এডোয়ার্ড স্মৃতি রক্ষা কমিটি'র অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে বাঁকুড়ায় 'এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল' নির্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা অনুদান দেন। এই ভবনের প্রবেশ পথের শীর্ষে জেলার অন্যতম বৃহৎ খিলানাকৃতি (Arched) স্থাপত্যকর্মটি বহু স্থপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৌরসভার পিছনে মোহনবাগান পার্কের দক্ষিণে অবস্থিত বাঁকুড়ার 'এডোয়ার্ড' মেমোরিয়াল হল ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ইতিহাসের বহু সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ভবনটির পশ্চিমমুখী প্রধান দরজার উপরে একটি ফলকে লেখা আছে—

'Emperor Edward VII Memorial hall opened on 2nd December' 1911, by A. Ahmad C.S. Magistrate and Collector, Bankura.'

মেমোরিয়াল হল নির্মাণের সূচনাপর্বে এখানে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আঞ্চলিক সংস্কৃতিচর্চা হত এবং একটি গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই দুর্ভিক্ষে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল যদিও জেলার গেজেটিয়ারে (১৯৬৩) ওই দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ নেই। ওই সময় একটি দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিল গঠন করা হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি এই এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত একসভায় তৎকালীন জেলাজজ, জেলাশাসক জে সি ভ্যাস, খ্রিস্টান কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব, রেভারেন্ড এ আর স্পুনার, মৌলবী এজাহার হোসেন, বসন্তকুমার নিয়োগী, প্রসন্নকুমার বন্দোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর সাহানা এবং 'বাঁকুড়া দর্পণ'-এর সম্পাদক রমানাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে নিয়ে মোট পঞ্চান্নজনের একটি দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং তাঁদের উদ্যোগে 'বাঁকুড়া জেলা চ্যারিটেবল ফেমিন রিলিফ ফান্ড' তৈরি হয়েছিল। ওই ফান্ডের জন্য মোট উনত্রিশ হাজার তিনশো সত্তর টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

(সূত্র—অজিত মিত্র (ফটোগ্রাফার), বাঁকুড়া)

১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে সংগঠিত হয়েছিল 'বাঁকুড়া ক্লাব'। এ সময় একটি 'ট্রাস্টিবোর্ড' গঠিত হয়। সেই ট্রাস্টিবোর্ডে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন—জেলাশাসক, সিভিল সার্জেন বা সি এম ও এইচ (মেম্বার-সেক্রেটারি), ডিস্ট্রিক্ট জজ (সদস্য), পৌরপ্রধান, বাঁকুড়া পৌরসভা, রায়বাহাদুর বসন্তকুমার নিয়োগী, সরকারি উকিল কুমুদকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ও রামভগত বাজোরিয়া প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

—ডাঃ অনবদ্য সেন, প্রাক্তন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বাঁকুড়া)

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের (ডিসেম্বরে ?) এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। ভাদুলের সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ (কংগ্রেস নেতা মণীন্দ্রনাথ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র) সে সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলাশাসক এম এ টি আয়েঙ্গার, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বীরেন পালিত, শান্তিদেব ঘোষ, নীলিমা সেন, মানিকলাল সিংহ, ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, সুখময় চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

(সূত্র : অজিত মিত্র বাঁকুড়া)

বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হওয়ার আগে কিছুকাল এখানে জেলা গ্রন্থাগারের কাজও পরিচালিত হত বলে জানা যায়।

(৩০) গুরু ট্রেনিং স্কুল ভবন

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'গুরু ট্রেনিং স্কুল'টির জন্য ১.০৫৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। তারপর প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় 'গুরু

কমিটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সময় থেকেই বাঁকুড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী মোহনলাল গোয়েঙ্কা ও হরিকিষণ রাঠীর সঙ্গে আবুল কালাম আজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(৩২) সম্মিলনী কলেজ

১৯১৮—২০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে কেন্দুয়াডিহি মৌজায় নির্মিত 'ভূমি সমীক্ষা ভবন'টি বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত।

১৯৪৮-এ 'বাঁকুড়া সম্মিলনী' কর্তৃপক্ষ 'ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স (আই এস সি) কলেজ' (যার নামকরণ হয়েছে পরবর্তীকালে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। খরক বা খড়্ সিং নামে এক নেপালি দারোয়ানের নামে বার্ষিক এক টাকা ইজারায় সরকারের কাছ হতে ভূমি সমীক্ষা ভবনটি নিরানব্বই বছরের জন্য লিজ নেয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই 'আই এস সি কলেজ'-এর সূচনা হয় এবং ওই বছরেরই আগস্ট মাসে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে।

(৩৩) গুরুদাসী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও গঙ্গানারায়ণ চতুষ্পাঠী

বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারের মতো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামসদন চট্টোপাধ্যায় (রামানন্দর জ্যেঠতুতো দাদা) ও তাঁর পরিবার কলকাতা প্রবাসী হলেও বাঁকুড়ার সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক ছিল সেবামূলক মানসিকতায় উৎসারিত।

রামসদন তাঁর পিতা সংস্কৃত পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণের স্মৃতিতে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে 'গঙ্গানারায়ণ চতুষ্পাঠী' (বর্তমানে পৌরসভা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং বর্তমান অধ্যক্ষ হলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সংস্কৃত পণ্ডিত কালীপদ মুখোপাধ্যায়) ও ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল তাঁর মা গুরুদাসীর নামে 'গুরুদাসী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠাপর্বে চিকিৎসালয়টি ছিল বর্তমান টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্মুখস্থ নকুল মণ্ডলের দোকান বাড়িটিতে। সে সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়টির পরিচালনার জন্য তৎকালীন জেলাশাসক ব্রজদুর্লভ হাজরা ত্রিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজ (সূত্র : বাঁকুড়া জেলার বিবরণ—রামানুজ কর, পৃষ্ঠা ৫২) বাঁকুড়া পৌরসভার তৎকালীন পৌরপ্রধান বাবু রাসবিহারী ব্যানার্জির হাতে তুলে দেন। প্রতিষ্ঠাতা চিকিৎসক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ রামদাস চক্রবর্তীর আন্তরিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় চিকিৎসালয়টির সূচনাপর্ব সমৃদ্ধশালী ও দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছিল। শুরু থেকেই চিকিৎসালয়টি বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনস্থ একটি জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান।

বর্তমান দাতব্য চিকিৎসালয়টির একতলা ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ২৩ জানুয়ারি, ১৯৫৯। তৎকালীন জনপ্রিয় জেলাশাসক, রণজিৎ ঘোষের সহধর্মিণী প্রীতি ঘোষ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ভবনটি নির্মিত হয় পৌরপ্রধান উদয়ভানু ঘোষ, কমিশনার সৃষ্টিধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিমাই কুণ্ডু এবং প্রাক্তন চিকিৎসক ডাঃ ভবানীকিঙ্কর চক্রবর্তীর আন্তরিক প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা ও অর্থানুকূল্যে।

দ্বিতল, দোচালা নহবতখানা, বিষ্ণুপুর

ট্রেনিং স্কুল ভবন' (বর্তমান সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পুরনো ভবনগুলি) নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

(৩১) ধর্মশালা

১৩ জানুয়ারি, ১৯১৭ হরিকিষণ রাঠী ও নরমল বাজোরিয়ার মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির ভিত্তিতে বর্তমান নূতনগঞ্জ এলাকায় রাঠীদের জমিতে ও বাজোরিয়াদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয় 'বাঁকুড়া ধর্মশালা'। সূচনাপর্বে ধর্মশালাটি শহরের সভা-সমিতি ও সম্মেলনের স্থান হিসেবে বিবেচিত ও ব্যবহৃত হত।

১৯৪৫-এ বাঁকুড়ায় অন্তরীণ থাকার পর কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এখানে একটি জনসভা করে বাঁকুড়া কংগ্রেস

মা সারদামণির স্মৃতিমন্দির, জয়রামবাটি

(৩৪) হার্টমহাতাব বিদ্যালয়

১৯৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে (জ্যৈষ্ঠমাস, ১৩৪২, বঙ্গাব্দ) জেলাশাসক হার্টসাহেব ও জেলাজজ মহাতাব ভট্টাচার্যের যৌথ উদ্যোগ ও আনুকূল্যে শহরের ইদগামহল্লা অঞ্চলে হরিজন সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বর্তমানে 'হার্টমহাতাব প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয়' নামে বিদ্যমান। এই অঞ্চলটিও এখন 'হার্টমহাতাবপল্লী' হিসেবে পরিচিত। বিদ্যালয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন তৎকালীন জেলাশাসক ও জেলাবোর্ডের সভাপতি জে এম চ্যাটার্জি।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীলচন্দ্র পালিত ও জগদীশচন্দ্র পালিতের পরিচালনায় বাঁকুড়ার কেরানিবাজারে কুমিল্লা অভয় আশ্রমের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এখানে একটি 'হরিজন পাঠশালা'ও পরিচালিত হত। অভয় আশ্রম পরবর্তীকালে স্কুলডাঙায় স্থানান্তরিত হলে 'হরিজন পাঠশালা' বসত ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে (বর্তমানে গান্ধী বিচার পরিষদ গ্রন্থাগার)। বিদ্যালয়টির স্থায়িত্ববিধানকালে সুশীল পালিতের নিরলস প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসাবে জেলাশাসক এস জি হার্ট (হার্ট ১৯২৮—৩০ খ্রিস্টাব্দ সময়ে বাঁকুড়ার জেলাশাসক ছিলেন) কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে যান। পরে জেলাজজ মহাতাব ভট্টাচার্যও বিদ্যালয়টির জন্য অর্থের ব্যবস্থা করেন। বাঁকুড়ার জনৈকা পুত্রহারা জননী প্রয়াত সন্তানের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি শিবমন্দির ও কূপ খননের জন্য অর্থদান করেন। এভাবে অর্থ সংগৃহীত হলে ১৯৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে পৌরপ্রধান অধ্যক্ষ বেভারেন্ড ব্রাউন পৌরসভাকে দানকৃত জমির উপর বিদ্যালয়গৃহ, শিবমন্দির ও কূপ খনন করান। বিদ্যালয়টি হরিজন ও নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই স্থাপিত হয়েছিল, সেই বিদ্যালয়টিই হল পূর্বোক্ত 'হার্টমহাতাব প্রাথমিক বিদ্যালয়'—যা হল 'অভয় আশ্রম'-এর অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলনের অন্যতম ফলশ্রুতি।

(৩৫) মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আদালত বা কাছারি চত্বরে সরকার কর্তৃক ইজারা প্রদত্ত জমির উপর স্থাপিত হয়েছিল 'মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র'। তৎকালীন বাঁকুড়ার জেলাশাসক সুধাংশুকুমার হালদারের সহধর্মিণী উষা হালদারের উদ্যোগে ১,২,৩ মার্চ, ১৯৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঁকুড়ায় ছিলেন। উষা হালদার ছিলেন সমাজসেবিকা অল ইন্ডিয়া উইমেন কনফারেন্সের বাঁকুড়া শাখার সভানেত্রী। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া শহরে একটি 'প্রসূতি ভবন বা মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র' স্থাপিত হয়েছিল (এখন যেখানে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অফিস)। ১ মার্চ, ১৯৪০ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপরোক্ত মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে (১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দ) ওই মাতৃমঙ্গল ভবনেই গড়ে উঠেছিল 'মহিলা চিকিৎসালয়' বা 'লেডি ডাফরিন জেনানা হসপিটাল'। ওই চিকিৎসালয়ে বহিঃ ও অন্তর্বিভাগ ছিল। অন্তর্বিভাগে ২৮টি শয্যা ছিল—তার মধ্যে ২০টি পুরুষ ও ৮টি মহিলা। তবে ওই হাসপাতালটির স্থায়িত্ব কয়েক বছরই সীমাবদ্ধ ছিল।

শহর বাঁকুড়ার এই গৌরবোজ্জ্বল বিকাশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত বিচিত্র নির্মাণশৈলীর বেশ কিছু ইমারত যে ইমারতগুলির অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল সরকারি আনুকূল্যে, কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং কিছু বেসরকারি সংগঠনের উন্নয়মূলক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে।

(৩৬) পাওয়ার হাউস

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সরকারের মাধ্যমে অধিগৃহীত জমির উপর 'বি এন ইলিয়াস অ্যান্ড কোম্পানি', 'পাওয়ার হাউস' নির্মাণ করেছিলেন। তখনই বাঁকুড়ায় প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলন হয়। ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে নিকটতম বৈদ্যুতিক ল্যাম্পপোস্টের এক হাজার গজ পরিধির মধ্যে অবস্থিত বাড়িগুলির গৃহকরের ২১/২ শতাংশ 'বিজলি কর' (Electric duty) আরোপিত হয়েছিল।

কিন্তু ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজে ও হস্টেলে ডায়নামোর সাহায্যে প্রথম শহরের বিজলি বাতি জ্বালিয়েছিলেন। রামগড়ের রাজার নিলামকৃত পাখা বা ফ্যানগুলি এনে কলেজ ভবনে লাগিয়েছিলেন।

(৩৭) গুপ্ত এস্টেট

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের আগে বাঁকুড়া শহরে এসেছিলেন একজন কুখ্যাত নীলকর মিঃ স্কেল। মিঃ স্কেল ১৮৭৭—৯০ পর্যন্ত জেলা বোর্ডের সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন। লোকপুর মহল্লায় একটি দ্বিতল ভবনে (বর্তমানে যে ভবনটি এন সি সি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তরের একটি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে) মিঃ স্কেল বসবাস করতেন। পৌরসভার পুরনো রেকর্ডে দেখা যায় যে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওই বসতবাড়িটির জন্য বাঁকুড়া পৌরসভাকে ৬ টাকা পৌরকর দিয়েছেন। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ছিলেন বলে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় স্কেলের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের পরে তিনি বাঁকুড়া ত্যাগ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তারপর কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ডি গুপ্ত ওই বাড়িটি ক্রয় করে তাঁর 'বাগানবাড়ি' হিসাবে ব্যবহার করতেন। তখন থেকে বাড়িটি 'গুপ্ত এস্টেট' নামে পরিচিত।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত ছাড়ো'' আন্দোলনের সময় প্রথম সারির জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের অন্যতম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। এই সময় অর্থাৎ ১৯৪৫-এর এপ্রিল-মে এই দুমাসের জন্য তাঁকে বাঁকুড়ায় অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। এই 'গুপ্ত এস্টেট' নামের বাড়িটিতে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল। (Ref.-India wins Freedom : Moulana Abul Kalam Azad, Page : 105) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এখানে অবস্থানকালে আজাদ সাহেবের রান্নার জন্য নিযুক্ত পাচকের তৈরি খাবার তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ওই পাচককে তাঁর সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাঁকুড়া জেলায় ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে সমাজে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এই শ্রেণীটি হল সাধারণভাবে 'বুর্জোয়া' ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীটি ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, পেশাভিত্তিক ও দরপত্তনি ভূমিস্বত্বের সঙ্গে যুক্ত। আইন ব্যবসা, চিকিৎসা ব্যবসা, শিক্ষকতা, সরকারি চাকরি, ঠিকাদারি, নীলচাষ ও নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পেশাকে উপজীব্য করে এই 'তথাকথিত' মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এই সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকেই 'জঙ্গলমহল'-এর সদর দপ্তর বাঁকুড়া শহরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকাংশ ইমারত গড়ে উঠতে থাকে এবং কিছু ভবন বেসরকারি প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল। কারণ, শহর বাঁকুড়ার বিকাশে ইউরোপীয় নীলকর, সরকারি কর্মচারী ও মিশনারিদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে সামাজিক আধিপত্য ভোগ করত বংশানুক্রমিক ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত অভিজাতবর্গ। সে যুগে তাঁরাই ছিলেন শাসক শক্তির সহযোগী শ্রেণী ; তাঁরাও বেশ কয়েকটি ইমারত নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে পরম্পরাগত ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থাপিত হলে ও ঘাটওয়ালি, জায়গীরদারি ইত্যাদি পূর্বতন ভূমিব্যবস্থা অধীন জমি বাজেয়াপ্ত হলে বিগত দিনের অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্য খর্ব হয় ও সরকারি দাক্ষিণ্য প্রত্যাশী অথবা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে আর্থ-সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নতুন সুযোগ গ্রহণকারী নবোদ্ভুত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের সহযোগী হিসাবে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে। কয়েকটি দেশজ পরিবার ও জেলান্তর থেকে আগত বেশ কিছু সংখ্যক পরিবার এই শ্রেণীটিকে পরিপুষ্ট করেছিল।

তথ্যসূত্র :

(১) Bankura District Letters Issued (1802-1869) : Edited by Sinha & Banerjee

(২) Bankura District Gazetter, 1968 : Edited by A. K. Bandyopahyay

(৩) Bankura District Gazetter, 1908 : L.S.S.-O' Malley

(৪) বাঁকুড়া : তরুণদেব ভট্টাচার্য

(৫) বাঁকুড়া জেলার বিবরণ : রামানুজ কর

(৬) বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি : রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী

(৭) বাঁকুড়ার প্রাচীন ইমারত (যন্ত্রস্থ) : গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী

(৮) খেয়ালী পত্রিকা গোষ্ঠী, কুচকুচিয়া রোড, বাঁকুড়া

ব্যক্তিঋণ : *অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া*
গৌতম দে, সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ।

লেখক : চিকিৎসক, সম্পাদক—'খুশির খেয়ালী'

মল্লভূমের শিল্পসংস্কৃতি ও বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর জৈনমূর্তি লক্ষ করা গেলেও হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের ?-নিদর্শন সংখ্যা এবং প্রকারভেদে কম তো নয়ই বরং অধিকতর। শুধু মূর্তি নয়, প্রাচীন বৈষ্ণব এবং শৈবধর্ম যে এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তার দৃষ্টান্ত কম নেই।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের 'ভূম' রাজ্যগুলির অন্যতম হলেও ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ এই দুই দশক ধরে মল্লভূম তথা মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের বিচিত্র বিকাশ বিস্ময়কর। কেউ কেউ তদানীন্তন মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরকে পূর্ব ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট কলা নগরীরূপে আখ্যাত করেছেন।[১] এঁরা মনে করেন এ সময়ে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের এই সমুন্নত বিকাশের পশ্চাতে ছিল, ওড়িশা আর নবদ্বীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ।

শুধু সাংস্কৃতিক বিকাশই নয়, বিষ্ণুপুর যে অন্তিম মধ্যযুগে একটি যথার্থ সামন্ত নগরীতে পরিণত হয়েছিল, তার স্মৃতি আজও দুর্নিরীক্ষ নয়। গড়, গড়খাই, গড়দরজা আজও এই দুর্গনগরীর অতীতের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কেল্লা সংলগ্ন কামানঢালার মাঠ এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অনেকে মনে করেন ওড়িশা সীমান্তবর্তী মল্ল রাজধানীর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা অনেকাংশে মোগল স্বার্থেই নির্মিত হয়েছিল। এক সময় মুর্চার পাড় থেকে তোপধ্বনি করে সারা মল্লভূমে শারদীয়া দুর্গার অষ্টমী পূজার সন্ধিক্ষণ ঘোষিত হত সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে। বর্তমানে মল্ল রাজপরিবার তথা মল্লভূমে সর্বজন-পূজ্যা মাতৃকা শ্রীশ্রীমৃন্ময়ীর পূজায় অষ্টমীর সন্ধিক্ষণ ঘোষণার জন্য তোপধ্বনি করা হলেও পূর্বের জলুস আর নেই। তবু আজও বিষ্ণুপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলি সন্ধিক্ষণের এই তোপধ্বনির প্রতীক্ষায় সশ্রদ্ধচিত্তে প্রতিটি মুহূর্ত গোনেন।

বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ এই দুই শতকে যে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে তা প্রধানত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্পর্শেই সম্ভব হয়। বিষ্ণুপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে যে প্রচুর সংখ্যক মন্দির নির্মিত হয়, তার তুলনা মেলা ভার। শুধু সংখ্যায় প্রচুর নয়, মন্দিরগুলি আকার আয়তনে এবং নির্মাণচাতুর্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রচুর সংখ্যক ব্যয়বহুল মন্দির নির্মাণই শুধু নয়, প্রতিটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক-একটি গ্রাম বা পল্লী রচনা করা হয়েছিল, দেখা যায়। জয়পুর থানার গোকুলনগরের শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদের মন্দির, পাত্রসায়ের থানার বীরসিংহ গ্রামের শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, জয়পুর থানার বৈতল গ্রামের শ্যামাচাঁদের পঞ্চরত্ন মন্দির এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলির তদানীন্তন গুরুত্ব এইসব গ্রামের থেকেই বোঝা যায়। প্রতিটি গ্রামই বর্ধিষ্ণু এবং মল্লরাজাদের মন্দিরগুলি তাদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এ থেকে মল্ল রাজত্বের ব্যাপ্তি এবং সমৃদ্ধি সহজেই বোঝা যায়।

বিষ্ণুপুর দুর্গের অভ্যন্তরেও প্রচুর সংখ্যক বিভিন্ন রীতির মন্দিরের একত্র সমাবেশ লক্ষ করা যায়। একই স্থানে এতগুলি বিভিন্ন রীতির মন্দিরের একত্র সমাবেশ বড় একটা চোখে পড়ে না। বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত মন্দিরগুলির একত্র সমাবেশকে যাদুঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন—'দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে প্রথমেই মনে হয় যেন বাংলার দেবালয়ের ঐতিহাসিক যাদুঘরে এলাম। দুর্গটি যেন দেবালয় সংরক্ষণের জন্যই তৈরি হয়েছিল।' ওই গ্রন্থেই তিনি মন্দির-স্থাপত্যের রীতিবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন—'বাংলার দেবালয় স্থাপত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বিষ্ণুপুর দুর্গের ভিতরেই রচিত হয়ে আছে—নির্মাণকালের দিক থেকে নয়, গড়নের দিক থেকে। যিনি বিষ্ণুপুরের দেবালয় দেখেননি, তিনি বাঙালি হয়েও বাংলার শিল্পকলার অমরাবতী দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।'

বিষ্ণুপুরের এই শিল্প বিকাশ যে বাঙালির শিল্পভাবনারই একটি বিশিষ্ট অধ্যায় এবং বৈষ্ণব ধর্মের স্পর্শে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুর রাজসভা বিজয়ের ফলেই যে তা সম্ভব হয়েছিল, তার উল্লেখ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ) ইতিহাসে।[২]
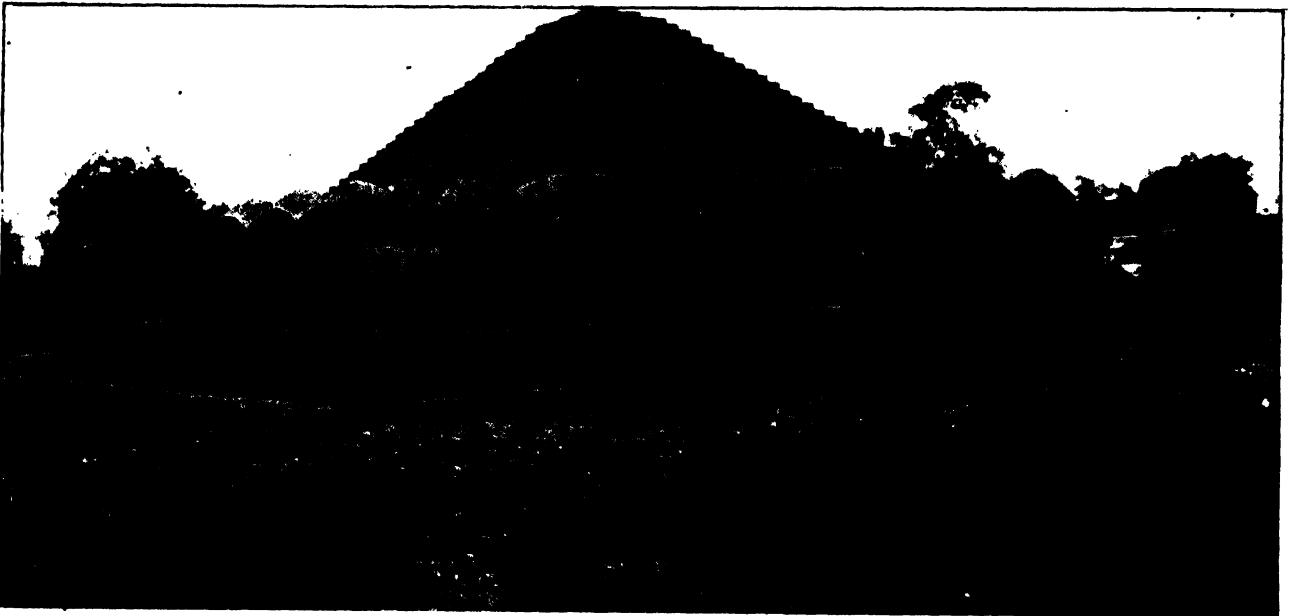
রাসমঞ্চ : বিষ্ণুপুর। বাঙলার চালাঘর ও মিশরীয় পিরামিডের সমন্বয়ে ঝামা পাথরের ইটে তৈরি রাসমঞ্চ। মল্লভূমরাজ বীর হাম্বিরের সময়ে সম্ভবত ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত

মন্দির স্থাপত্যের এমন বিচিত্র বিকাশ সত্যই তুলনারহিত। প্রায় চারশো বছর আগে মল্লরাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত পিরামিডাকৃতি রাসমঞ্চটি গঠন-পদ্ধতির দিক থেকে অতুলনীয়। জোড়বাংলা রীতির মন্দির-স্থাপত্য এপার বাংলা ও ওপার-বাংলায় বেশ কিছু থাকলেও বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা আপন স্থাপত্য-রীতির বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম, শ্রীশ্রীমদনমোহন প্রভৃতি একরত্ন মন্দিরের স্থাপত্যরীতি এবং বিশালত্ব অভিনব। একরত্ন মন্দিরগুলির শিখরদেশ বা চূড়া বিভিন্ন প্রকার। বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনের কাছাকাছি দ্বাদশবাড়ি গ্রামের একরত্ন মন্দিরটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও এর দোলমঞ্চ সদৃশ (kiosk) চূড়া (সরু সরু স্তম্ভের উপর নির্মিত) সহজেই পথচারীর দৃষ্টি কাড়ে। শলদা-গোকুলনগরের পঞ্চরত্ন মন্দিরটির চূড়াগুলিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ যাদবনগরের (বিষ্ণুপুর স্টেশনের কাছে) মন্দিরটি। মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও তার পূর্বতন সৌন্দর্য এখনও দুর্নিরীক্ষ নয়। সমধিক বিচিত্র ওন্দা থানার এল্যাটি বা বেলাটুকরি গ্রামের 'বৌদ্ধগয়া'র সদৃশ আকারবিশিষ্ট দেউলটি। বিখ্যাত মন্দির গবেষক ডেভিড ম্যাক্‌কাস্টন এটিকে পীঢ়া দেউলের এক সম্প্রসারিত রূপ বলেছেন। মল্লরা ওড়িশারীতির রেখদেউলও একাধিক নির্মাণ করেছেন। মহাদেব-মল্লেশ্বরের বিচিত্র গঠন দেউলটি ছাড়াও মল্ল রাজধানীর ধারেপাশে এমন কি বেশ দূরের একাধিক দেউল নির্মিত হয়েছে মল্লরাজাদের আমলে। বিষ্ণুপুরের হাজরাপাড়ায় অবস্থিত অধুনাবিলুপ্ত শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদের মন্দিরটি ছিল জগমোহনযুক্ত খাঁটি ওড়িশারীতির ল্যাটারাইট-নির্মিত রেখদেউল, ঠিক ওন্দা থানার বিক্রমপুরে অবস্থিত দেউলটির অনুরূপ। শিহড় গ্রামের প্রসিদ্ধ মহাদেব-শিবের মন্দিরটিও সপ্তদশ শতকে নির্মিত জগমোহনযুক্ত রেখদেউল, বড়জোড়া থানার (বড়জোড়া গ্রামের) খুঁটগেড়িয়ার অপরূপ রেখদেউলটির উপরেও ওড়িশার প্রভাব সুস্পষ্ট। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের মাথায় কিছু বৈষ্ণব মোটিফের নিরিখে এটিকে সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব মন্দির বলে মনে করা হয়। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত মুনিনগরের শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ বিগ্রহের দেউলটি নির্মাণ-চাতুর্যে সমধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মূল মন্দিরটির সম্মুখভাগে এক হ্রস্বতর দেউল নির্মাণ করে (অন্তরাল সৃষ্টি করে) জগমোহন রচনার বিচিত্র কৌশলটি মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অভিনবত্বের পরিচায়ক। পাত্রসায়ের বাজারে (থানা পাত্রসায়র) অবস্থিত সর্বজনবিদিত শ্রীশ্রীকালঞ্জয় শিবদেবতার মন্দিরটির চারপাশে অলিন্দ বা বারান্দা নির্মাণ করে এখানে যেন একরত্ন মন্দিরের বিভ্রম সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন শিল্পী। সর্বজনপূজ্য এই শিবদেবতার গাজন হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়, অনেকে এতে বৌদ্ধপ্রভাব অনুমান করেন। বিষ্ণুপুর শহরের মহাপাত্রপাড়ার শ্রীশ্রীমুরলীমোহনের মন্দিরটিও গঠনবৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। মূল মন্দিরের (একরত্ন) চারদিকে এখানেও বারান্দা যুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থাপত্যরীতির অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে যেন মল্লভূমে। মল্লভূমের অধিষ্ঠাত্রী সর্বজনপূজ্যা দেবী শ্রীশ্রীমৃন্ময়ীর মন্দিরের দক্ষিণদিকের একজোড়া দীর্ঘাকৃতি রেখদেউল এবং বড় পাথর দরজার (দুটি দুর্গদ্বারের মধ্যে বৃহত্তর দুর্গদ্বারটির) অদূরে শ্যামকুণ্ড পুষ্করিণীর তীরবর্তী একজোড়া ইঁটের দেউল গঠনবৈচিত্র্যে

ইঁটের কারুকাজ সতলাড়া মন্দির
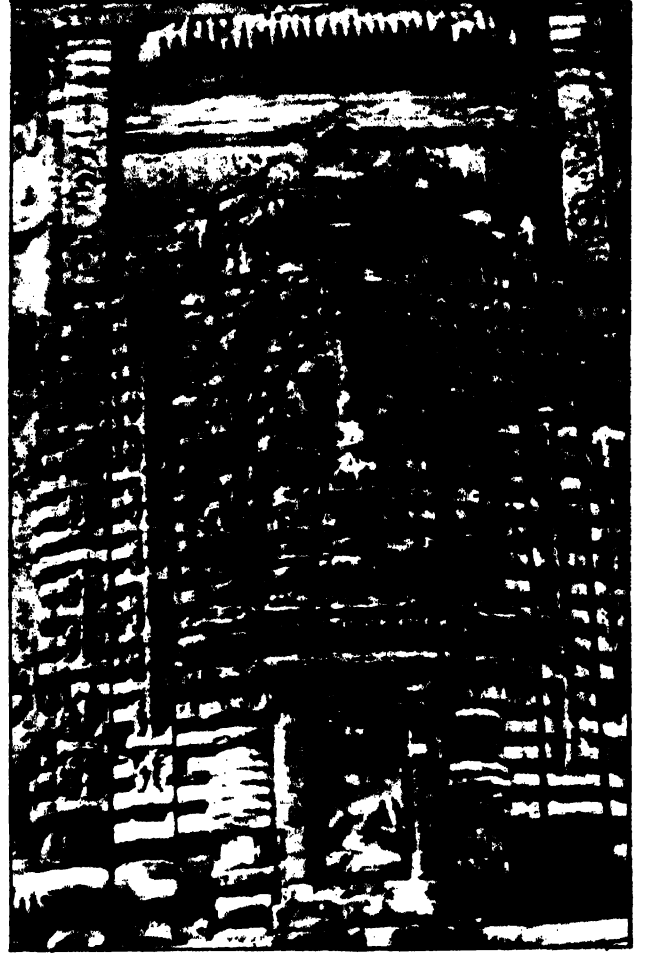
সমুজ্জ্বল। এই দুটি মন্দিরের সর্বাঙ্গ এককালে টেরাকোটা চিত্রে আচ্ছাদিত ছিল। অধিকাংশ টালিতেই ছিল 'গজসিংহ' মোটিফ। মন্দিরদুটির স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যে ওড়িশার প্রভাব পরিস্ফুট করারই যেন চেষ্টা করেছেন শিল্পী।

মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে শিখর মন্দিরের উপরেই মল্লরাজাদের সমধিক পক্ষপাতিত্ব ছিল। ধনুকাকৃতি বঙ্কিম (চালাঘরের অনুসরণে নির্মিত) ছাদের উপর এক বা একাধিক চূড়া বসিয়ে 'রত্নমন্দির' নির্মাণের যে ব্যাপক আয়োজন মল্লরাজাদের স্থাপত্যকীর্তিতে চোখে পড়ে তাও এই শিখরমন্দির নির্মাণেরই প্রবণতাজাত। এই চূড়াগুলিও প্রকারান্তরে রেখ আর পীঢ়া দেউলের সমন্বয়ে রচিত। এও হিন্দু-ক্লাসিক স্থাপত্যরীতিরই অনুবর্তন। শিখরমন্দির মৎস্য-পুরাণানুমোদিত।

একথা সর্বজনবিদিত যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতিরই পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। শাস্ত্র-সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, চিত্রকলা-সঙ্গীত সর্বত্রই এই ক্লাসিক সংস্কৃতির বিবর্তিত বাতাবরণটি লক্ষ করা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও সংস্কৃতিতে। তাছাড়া এ জেলায় রেখ ও পীঢ়া দেউলের (ওড়িশা রীতির) এক সমৃদ্ধ অতীত ঐতিহ্য বর্তমান। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া

অপরূপ সৌষ্ঠবযুক্ত ছিল, তা আজও অনায়াসেই অনুমান করা যায়। পুরুলিয়া জেলার গড়জয়পুর থানার অন্তর্গত দেউলঘাটা বা বোড়ামে এমনি তিনটি ইঁটের তৈরি রেখদেউল রয়েছে কাঁসাই নদীর তীরে। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মাঝে কোনও প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই। দুটি জেলা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দিক থেকে প্রায় অভিন্ন এক সাংস্কৃতিক বলয়েরই অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, সারা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির সংস্কৃতি যেন একই সুরে বাঁধা। আপাতরুক্ষ অথচ বহুবৈচিত্র্যে বিশিষ্ট এই সাংস্কৃতিক বলয় খাস বাংলা (বা মোটামুটিভাবে উত্তরবঙ্গ) থেকে পৃথক।

যাই হোক, বাঁকুড়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ওড়িশারীতির রেখদেউলের বহুল সমাবেশ উল্লেখযোগ্য। শুধু ইঁটের নয়, প্রস্তর নির্মিত (ওড়িশারীতি) রেখদেউলের সংখ্যাও এখানে কম নয়। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ার (বিখ্যাত মৃৎশিল্প কেন্দ্র : থানা তালডাংরা) অদূরে অবস্থিত দেউলভিড়ার প্রস্তর নির্মিত রেখদেউলটিকে দশম শতকের বলে চিহ্নিত করা হয়। এটিও ওড়িশারীতির একটি রেখদেউল। বিষ্ণুপুর শহরের ৫ মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী ডিহর গ্রামে সর্বজনপূজ্য দুই শিবদেবতা শ্রীশ্রীষাঁড়েশ্বর ও শ্রীশ্রীশৈলেশ্বরের দুটি প্রস্তরদেউলও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরদুটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে মতান্তর আছে, কেউ কেউ মন্দিরদুটিকে ত্রয়োদশ শতকের বলে মনে করলেও বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই দেউল-যুগলকে একাদশ শতকের বলে মনে করেন। মন্দির-দুটির গায়ে ল্যাটারাইট-ভূমির (বেস) উপর পঙ্খের প্রলেপ দিয়ে নির্মিত চিত্রগুলির ক্ষয়ের মধ্যেও (বর্তমানে উপরের চুনের আস্তরণ প্রায় সম্পূর্ণ অবলুপ্ত) ভঙ্গিমা বা আসন ইত্যাদিতে অনেক ক্ষেত্রে বহুলাড়ার মন্দির-চিত্রের আঙ্গিকগত সাদৃশ্যের আভাস পাওয়া যায়। মন্দিরের অঙ্গের এই অলঙ্করণগুলির নিরিখে এগুলিকে ত্রয়োদশ শতকের পূর্ববর্তী মনে করা যেতে পারে।

এক্তেশ্বর শিব মন্দির (১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ) ছবি : দেবীচন্দন চৌধুরী

জেলায় তথা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে দশম-একাদশ শতকের ঐতিহ্যমণ্ডিত একাধিক রেখদেউল আছে।

বাঁকুড়া জেলায় রেখ ও পীঢ়া দেউলের সমৃদ্ধ সমারোহ। এইসব রেখ ও পীঢ়া দেউলের উৎস ওড়িশা হলেও ওড়িশারীতির একটি বিবর্তিত গঠন আঙ্গিক দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ওইসব মন্দিরের স্থাপত্যরীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং থেকে উদ্ভূত ওড়িশারীতির রেখদেউলের এই বিশিষ্ট ধারাটি (জগমোহন বা মুখমণ্ডপহীন) দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের (মানভূম, সিংভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি) উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এই ধারাবাহী বেশ কয়েকটি রেখ ও পীঢ়া দেউলের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় বাঁকুড়া জেলায়। এরই মধ্যে দুটি (দশম শতকের) ইটের রেখদেউল আজও আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত বহুলাড়া গ্রামের দেশপূজ্য শিবদেবতা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরের ইটের দেউলটি ভারতবিখ্যাত। শতাধিক বৎসর পূর্বে লিখিত ও প্রকাশিত জেমস ফার্গুসনের গ্রন্থে বহুলাড়ার মন্দিরের ছবি আছে। এই বহুলাড়ার অদূরে অবস্থিত সোনাতপল গ্রামের অনুরূপ ইটের তৈরি দেউলটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি যে এককালে বহুলাড়ার মন্দিরের মতোই

ওড়িশারীতির রেখদেউলের প্রচুর নিদর্শন এখনও প্রচুর সংখ্যায় টিকে থাকলেও, পীঢ়াদেউলের নিদর্শন বর্তমানে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক সরসীকুমার বসু সরস্বতী মনে করেন, অধুনা দুষ্প্রাপ্য যে তিনটিমাত্র 'পীঢ়া' দেউলের নিদর্শন বঙ্গদেশে দৃষ্টিগোচর হয়, তার তিনটিই বাঁকুড়া জেলায়। এগুলি হল বাঁকুড়া শহরের প্রায় সংলগ্ন এক্তেশ্বর গ্রামের বিখ্যাত শিবদেবতা শ্রীশ্রীএক্তেশ্বরের মন্দির (নন্দীমণ্ডপ), জয়পুর থানার ময়নাপুরের বিখ্যাত ধর্মঠাকুর শ্রীশ্রীযাত্রাসিদ্ধি...

অনেকে মনে করেন, এখানের রেখদেউলগুলি জৈন দেউল।* এ অঞ্চলে জৈনমূর্তির সংখ্যা প্রচুর হলেও অধিকাংশ মূর্তিই দশম শতক বা তার পরবর্তী, এমত প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া জেলায় কোনও জৈনমূর্তির সঙ্গে কোনও লিপির অস্তিত্ব দেখতে না পেয়ে এগুলির গঠন-আঙ্গিকের বিচারে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অথচ বেশ কিছু শৈব ও বৈষ্ণবমূর্তি এ জেলায় লক্ষ করা যায়, যেগুলি দশম শতকের

পূর্ববর্তী। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া-শিলালিপি বঙ্গে বিষ্ণুপূজার প্রাচীনতম সাক্ষ্য বহন করছে। এই জেলায় এত প্রাচীন কোনও জৈন নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। অবশ্য চতুর্থ শতকের (শুশুনিয়ালিপির কাল পণ্ডিতদের মতে চতুর্থ শতক—গুপ্তযুগ) কোনও বৈষ্ণবমূর্তি বা শৈবমূর্তিও এ জেলায় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবু প্রাপ্ত জৈনমূর্তির সঙ্গে এ জেলার শৈব ও বৈষ্ণব মূর্তিগুলির তুলনা করলে দেখা যায়, শৈব ও বৈষ্ণবমূর্তিগুলি উক্ত জৈন মূর্তিগুলির সমসাময়িক তো বটেই, ক্ষেত্রবিশেষে ব্রাহ্মণ্যমূর্তিগুলি প্রাচীনতর। বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ থানার সারেংগড় (অম্বিকানগরের সন্নিকট) থেকে সংগৃহীত এবং বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ভগবান বিষ্ণুর হৃষীকেশ প্রকরণের মূর্তিটির নির্মাণকাল নবম শতক বলে ধার্য হয়েছে। বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত পাত্রসায়ের থানার কাস্তোড়ের (চক্রাকার শিলাপটে উৎকীর্ণ) নটরাজ মহাদেবের মূর্তিটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নবম শতকের পূর্ববর্তী বলে নির্দিষ্ট করেছেন। অতএব মূর্তি বা কোনও লিপি বা অন্য কোনও নির্ভরযোগ্য পাথুরে প্রমাণ অনুযায়ী একথা বলা শক্ত যে বাঁকুড়া তথা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত রেখদেউলই জৈনদেউল।

বিশেষ করে, বর্ধমান জেলার বরাকরের অন্তর্গত বেগুনিয়ার মন্দিরগুচ্ছের (group) মধ্যে চতুর্থ রেখদেউলটির (সদর রাস্তা থেকে ঢুকলে শেষেরটি) প্রবেশদ্বারের মাথায় সুস্পষ্টভাবে লকুলীশ মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। মন্দিরটির সময়কাল সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক সরসীকুমার বসু সরস্বতী মহাশয় তাঁর ARCHITECTURE OF BENGAL গ্রন্থে লিখেছেন "Temple No. IV at Barakar reproduces the prominent characteristics of the early Nagara design and offers a general resemblance to the Parasuramesvara at Bhubanesvara which is dated in the latter half of the seventh century......... From the fundamentals of its architectonic form it does not appear to have been much removed in date from that of the Parasuramesvara, at Bhuvanesvara" সরসীকুমারের অভিমত অনুসারে আলোচ্য বেগুনিয়া গ্রুপের চতুর্থ দেউলটি বঙ্গে প্রাপ্ত ওড়িশারীতির শিখরদেউলের মধ্যে প্রাচীনতম। (The earliest movement of the Sikhara type in Bengal appears to be temple No. IV at Barakar (Burdwan district West Bengal--ARCHITECTURE OF BENGAL by S. K. SARASWATI : G BHARADWAJ & Co. Calcutta, 1976) পুরুলিয়া জেলার গড়জয়পুরের অন্তর্গত বোড়াম বা দেউলঘাটার তিনটি ইঁটের দেউলসংলগ্ন প্রান্তরে শৈবশাক্তমূর্তি ছাড়া অন্য কোনও মূর্তি দেখেননি বেগলার।[৪] বহুলাড়ার (শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির) দেউলকেও তিনি শিবমন্দিরই বলেছেন[৫] (The temple was originally saivie)। পুরুলিয়ার 'পাড়া' গ্রামে দুটি দেউল দেখা যায়। কোলারের রিপোর্ট অনুযায়ী বলা যায় মন্দিরগুলি সুপ্রাচীন 'The most ancient and interesting objects here are, however two temples, to the east of, and just outside the village; one is of brick, the other of a soft kind of stone. এই দুটি

বাঁকুড়া জেলায় তথা মল্লভূমে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশের পূর্বেও বিশেষত পাল-সেন যুগে যে এখানে পাশুপত শৈবধর্ম এবং সুপ্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম তথা ভাগবদ্ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। বিষ্ণুদেবতার ব্যূহ ও বিভব (অবতার মূর্তি) গুলিই তার সূচক। বিশেষ করে ভগবান বিষ্ণুর অনন্তশায়ী মূর্তি বঙ্গের অন্যত্র দুর্লভ হলেও এখানে (বিষ্ণুপুরে) একাধিক।

মন্দিরের মধ্যে পাথরের মন্দিরটিতে তিনি দেবীলক্ষ্মীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন। দেবীর মথার উপরে মালাধর দুই গজ লক্ষ করা যায়। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী মন্দিরের অদূরে ইঁটের মন্দিরটি দণ্ডায়মান। এই মন্দিরটিকে বেগলার পাথরের মন্দিরটির চেয়ে প্রাচীনতর বলে মনে করেছেন। মন্দিরের মধ্যে তিনি দশভূজা এক দেবীমূর্তি দেখেছেন। মনে হয় মূর্তিটি দেবী শ্রীশ্রীদশভূজা মহিষমর্দিনীর।

পুরুলিয়ার তেলকুপিতে এক সময় ১৩-১৪টি মন্দির লক্ষ করা যেত। এত বড় প্রত্নক্ষেত্র বঙ্গদেশে বিরল। এখানের অধিকাংশ মন্দিরে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর মূর্তি দেখা যেত। শিবলিঙ্গ ছাড়াও ভগবান বিষ্ণু, দেবী লক্ষ্মী, সূর্যদেবতার মূর্তি ছিল মন্দিরে। বিশেষ করে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের মাথায় উৎকীর্ণ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি থেকে মন্দিরগুলিকে ব্রাহ্মণ্য মন্দির বলা অসঙ্গত নয়।

শুধু তাই নয়, বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর জৈনমূর্তি লক্ষ করা গেলেও হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মূর্তি-নিদর্শন সংখ্যা এবং প্রকারভেদে কম তো নয়ই বরং অধিকতর। শুধু মূর্তি নয়, প্রাচীন বৈষ্ণব এবং শৈবধর্ম যে এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তার দৃষ্টান্ত কম নেই। বর্ধমান জেলার বরাকরের অন্তর্গত বেগুনিয়া গ্রুপের অন্যতম এবং প্রাচীনতম মন্দিরটিতে ভগবান লকুলীশের মূর্তির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। লকুলীশ শৈবধর্মের পাশুপত শাখার প্রবর্তক। পাশুপত শাখাকে শৈবধর্মের প্রচীনতম শাখারূপে গণ্য করা হয়।

শুধু বেগুনিয়ার (বর্ধমান-বরাকর) চতুর্থ মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের মাথাতেই নয়, বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার শলদা গ্রাম থেকে সংগৃহীত এবং বর্তমানে বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত একটি সুবৃহৎ পাথরের খিলানের শীর্ষদেশেও লকুলীশ মূর্তি লক্ষ করা যায়। খিলানটিতে একাধিক ওড়িশারীতির রেখ ও পীঢ়াদেউলের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ওড়িশা রীতির দেউলের অনুকৃতি ছাড়াও কিছু শৈবশাক্তমূর্তি এবং দু-প্রান্তে লম্ফমান সিংহ বা ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরূঢ়া দুই নারীমূর্তি লক্ষ করা যায়। খিলানটির মধ্যস্থলে 'কৃত্তিমুখ'। এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা

তথা আচার্য যোগেশচন্দ্র 'পুরাকৃতি ভবন' পরিদর্শনে এসে এই পাথরের খিলানটিকে 'পরবর্তী গুপ্ত' কিংবা পালযুগের প্রথমের দিকে (Later Gupta or Early Pala) বলে শনাক্ত করেন।

খিলানটিতে উৎকীর্ণ অলঙ্করণ থেকে এর উপর ওড়িশা শিল্পরীতির প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তাছাড়া সমসাময়িককালে ওড়িশায় পাশুপত শৈবধর্মের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। ভুবনেশ্বরে একাধিক শৈব-মন্দির এবং ভগবান শিবের মূর্তি লক্ষ করা যায়। মনে হয়, ওড়িশা থেকেই বাঁকুড়ায় পাশুপত ধর্ম প্রবেশ করেছে।

বাঁকুড়া জেলা ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে নটরাজ শিবের নৃত্যমূর্তি লক্ষ করা যায়। এরই মধ্যে কান্তোড়ের (জেলা-বাঁকুড়া, থানা-পাত্রসায়ের) চক্রমধ্যে মহাদেব শিবের নৃত্যমূর্তিটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নবম শতকের পূর্ববর্তী বলেছেন। কান্তোড় ছাড়াও ইঁদপুর থানার দেউলভিড়ার (নবনির্মিত) মন্দিরে একটি অপূর্ব 'লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি' ও কুবেরমূর্তির সঙ্গে একটি প্রস্তর চক্রমধ্যে উৎকীর্ণ মহাদেব শিবের নৃত্যমূর্তি লক্ষ করা যেত। বর্তমানে তিনটি মূর্তিই অপহৃত। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুরের এক বৃক্ষতলে এখনও অনুরূপ নৃত্যমূর্তি দেখা যায়। মূর্তিটি কালগ্রাসে দারুণভাবে ক্ষয়ে গেলেও মূর্তির আদলটি ভালই বোঝা যায়। বাহনোপরি শিবের নৃত্যমূর্তির একটি ভগ্নাবশেষ বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে লক্ষ করা যায়। মূর্তির অংশ বিলুপ্ত, শুধু বৃষবাহন এবং তার দুপাশে বাদ্যযন্ত্র সহ শিবগণদের উপস্থিতি থেকে সঙ্গতভাবে এই অনুমান করা যায়। অনুরূপ মূর্তি পুরুলিয়া জেলার কোশজুড়ি গ্রামের প্রাচীন শিবমন্দিরের সম্মুখবর্তী নতুন দালান মন্দিরে মহেশ্বর শিবের অনুরূপ নৃত্যমূর্তি বর্তমান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপুরের (বর্ধমান) সংলগ্ন বামুন-আড়া গ্রামের নৃত্যমূর্তিটি। এখানে অষ্টভুজ এক শিবমূর্তিকে বৃষবাহনোপরি নৃত্যরত অবস্থায় দেখা যায়। মহাদেবের মূর্তিটি ঊর্ধ্বলিঙ্গ। ওড়িশার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং সংগ্রহশালায় তিনটি অপূর্ব সুন্দর উমা-মহেশ্বর মূর্তির একটিতে ঊর্ধ্বলিঙ্গ মহেশ্বর মূর্তি লক্ষ করা যায়।

পণ্ডিতরা মনে করেন, পাশুপত শৈবধর্মের মূর্তিগুলি প্রধানত ঘোর রূপের হয়ে থাকে। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের লকুলীশখচিত খিলানটি যে শলদা ঘোষপাড়ায় (জয়পুর : বাঁকুড়া) সংগৃহীত হয়েছিল, পুরাকৃতি ভবনের 'মহাকাল' মূর্তিটিও প্রায় সেখান থেকেই সংগৃহীত হয়। শলদা ডোমপাড়ার বিখ্যাত ধর্মরাজ শ্রীশ্রীশঙ্খাসুরের দালান-মন্দিরের বারান্দার কুলুঙ্গিতে সর্বোপরি নৃত্যরত এক ভৈরবমূর্তি দেখা যায়। বলা বাহুল্য এগুলি সবই 'ঘোর' রূপের শৈবমূর্তি। এই শলদা-গোকুলনগর-ফুলনগর অঞ্চলে বিশালাকৃতি একাধিক শিবলিঙ্গ চোখে পড়ে। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বর এবং শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ উল্লেখযোগ্য। শলদার এ অঞ্চলে ডোমদীঘির পাড়ে দেউলের আমলক এবং অন্যান্য ভগ্নাংশ প্রচুর সংখ্যায় লক্ষ করা যায়।

শুধু শিবদেবতা বা শৈবমূর্তিই নয়, ভগবান বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবমূর্তিও এই অঞ্চলে (শলদা-গোকুলনগর-রাজগ্রাম) একাধিক লক্ষ করা যায়। শলদা-গোকুলনগরের অবতার [illegible]

ধরাপাট মন্দির গাত্রে খোদিত তীর্থঙ্কর

মূর্তিগুলি বিরল বৈশিষ্টের অধিকারি। গোকুলনগরের শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ বিগ্রহের বিশাল পঞ্চরত্ন (ল্যাটারাইটের) মন্দিরটির পিছনের দিকে অবস্থিত একটি পুকুরের পাড়ে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্তিটি বিস্ময়কর সৌষ্ঠবে-সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। ক্লোরাইট পাথরের এমন বিশালাকৃতি আদিম প্রাণশক্তিতে সমুজ্জ্বল বরাহমূর্তি বঙ্গদেশে দুর্লভ। সমান বৈশিষ্টের অধিকারি এখানের অদূরে রাজগ্রামের বাসুদেবপুর মৌজায় অবস্থিত নৃসিংহদেবতার (অবতার) মূর্তিটি। রাজগ্রামেরই একাংশে দেশবিখ্যাত শ্রীশ্রীধর্মরাজ ঠাকুরের মাড়োর কাছে একটি উন্মুক্ত বেদিতে দেখা যায় বামনাবতারের ত্রিবিক্রম মূর্তি। একসময় রাজগ্রামের অদূরে অবস্থিত ফুলনগরে অনুরূপ এক ত্রিবিক্রম বামনাবতার মূর্তি দেখা যেত। এই (শলদা) গোকুলনগর থেকে সংগৃহীত বিষ্ণু দেবতার অনন্তশায়ী মূর্তিটিও (বর্তমানে বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত) বঙ্গদেশে বিরল। অসামান্য অঙ্কন-চাতুর্যে অনুপম এই মূর্তিটি বঙ্গীয় শিল্পকলার এক বিরল সংযোজন। মূর্তিটিকে দশম শতকের বলে অনুমান করা [illegible] বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ থানার অন্তর্গত অম্বিকানগরের সন্নিকট [illegible] কাসাই-কুমারী জলাধারের নিচে

অবলুপ্ত) সারেংগড় পুরাক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ভগবান বিষ্ণুর হৃষীকেশ প্রকরণের নবম শতকের (বর্তমানে কলকাতার জাতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত) মূর্তিটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জয়পুর (বাঁকুড়া) পুরাক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত বর্তমানে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত একাধিক বিষ্ণুমূর্তির (ভগ্ন) হস্তধৃত আয়ুধের বিচিত্র ক্রমবিন্যাসে ব্যূহবাদের আভাস। একাধিক শক্তি বা শাক্তমূর্তিরও উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ঘটেছে এই জেলায়। শৈব-শাক্ত এবং বৈষ্ণবমূর্তির একত্র সমাবেশে প্রাচীন গুপ্তযুগের ধর্মীয় বাতাবরণটিই এখানে আভাসিত। গুপ্তযুগের ভগবতধর্মের সুপ্রশস্ত প্রেক্ষাপটে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবধর্মের একত্র সমাবেশ লক্ষ করা যায় মধ্যপ্রদেশের সাঁচীর সন্নিকট উদয়গিরি গুহা-মন্দিরে।* অনেক পরবর্তীকালে হলেও শলদা-গোকুলনগর পুরাক্ষেত্রে যেন তারই প্রতিচ্ছবি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শুশুনিয়া লিপিতে চক্রস্বামী বিষ্ণুপূজার মাধ্যমে ভগবদ্ধর্মেরই আভাস। পণ্ডিতরা মনে করেন পাল-সেন যুগে বঙ্গে ভাগবদ্ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে বলে অনেকে মনে করেন। বাঁকুড়া তথা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ওড়িশারীতির মন্দিরগুলির নির্মাণকাল দশম শতক। এখানে প্রাপ্ত জৈনমূর্তি এবং অনেক ব্রাহ্মণ্যমূর্তির সমসাময়িক। ক্ষেত্রস্থলে অনেক হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য মূর্তির নির্মাণকাল যে প্রাচীনতর—সেকথা আগেই বলা হয়েছে। অতএব উক্ত রেখদেউলগুলিকে নির্বিচারে জৈনদেউল বলার পূর্বে গভীর গবেষণার প্রয়োজন আছে। কারণ জৈনধর্ম ও জৈনমূর্তি ছাড়াও এখানে সমসাময়িক এমন কি প্রাচীনতর হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং মূর্তির অস্তিত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে এবং বেশ কিছু মূর্তির (বাঁকুড়া জেলার) বিশদ বিবরণও দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গ তথা ভারতের সর্বত্র জৈনধর্মের সঙ্গে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমন্বয় যতটা চোখে পড়ে সংঘর্ষ ততটা নয়।'

দ্বিতীয়ত বাঁকুড়া জেলায় তথা মল্লভূমে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশের পূর্বেও বিশেষত পাল-সেন যুগে যে এখানে পাশুপত শৈবধর্ম এবং সুপ্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম তথা ভাগবদ্ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। বিষ্ণুদেবতার ব্যূহ ও বিভব (অবতার মূর্তি) মূর্তিগুলিই তার সূচক। বিশেষ করে ভগবান বিষ্ণুর অনন্তশায়ী মূর্তি বঙ্গের অন্যত্র দুর্লভ হলেও এখানে (বিষ্ণুপুরে) একাধিক। এমন কি মল্লরাজবংশের অন্তিমকালে গোপালসিংহ নির্মিত জোড়মন্দিরের (লালবাঁধের দক্ষিণ পাড়ের মন্দিরগুচ্ছের মধ্যে একই প্রাকারে তিনটি একরত্ন মন্দিরকে জোড়মন্দির বলা হয়) উত্তরপ্রান্তের মন্দিরটিতে একটি অনন্তশয়ন বিষ্ণুদেবতার প্রস্তরভাস্কর্য চোখে পড়ে। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে বড় আকারের অপূর্ব অনন্তশায়ী-বিষ্ণুদেবতার মূর্তিটি ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরপটে উৎকাত অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি লক্ষ করা যায়। অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তিও অবতারমূর্তির মতোই প্রাচীন ভাগবদ্ধর্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্যবাহী। বিষ্ণুবাসুদেব পূজা বা ভাগবদ্ধর্মের সাক্ষ্য বহন করছে বাসুদেবপুর গ্রাম-নামগুলিও। বিষ্ণুপুর সংলগ্ন বাসুদেবপুর গ্রামে পাল-সেন যুগের (কষ্টিপাথরের) এক অপূর্ব বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি আজও যথারীতি পূজিত হচ্ছেন। জয়পুর থানার রাজগ্রাম সংলগ্ন বাসুদেবপুর মৌজায় অবস্থিত ভগবান বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের কথা আগেই বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য পূর্বোক্ত (মধ্যপ্রদেশের) উদয়গিরি দুর্গের

বিষ্ণুপুর রাধাশ্যাম মন্দিরে টেরাকোটায় চিত্রিত রাসমণ্ডল

গুহাগাত্রে একটি অনিন্দ্যসুন্দর অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তিও লক্ষ করা যায়। আগেই বলা হয়েছে, শুশুনিয়া গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে চক্রস্বামী বিষ্ণুপূজার মাধ্যমে গুপ্ত ঐতিহ্যবাহী ভাগবদ্ধর্মেরই আভাস। প্রাচীন বিষ্ণুপূজার কেন্দ্র বা বৈষ্ণব তীর্থগুলিতে অবতার মূর্তির সঙ্গে অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি প্রায় আবশ্যিকভাবেই বিদ্যমান দেখা যায়। গয়ার বিখ্যাত বিষ্ণুপাদ মন্দিরের সংলগ্ন প্রান্তরে অনুরূপভাবে এক অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি লক্ষ করা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে, বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে প্রবেশ করার পূর্বেই যে প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম বা ভাগবদ্ধর্ম এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল এবং শাখায় পল্লবে পল্লবিত হয়ে এক বৈষ্ণবীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল তার আর একটি প্রমাণ হল—শ্রীনিবাস আচার্য অপহৃত পুঁথির সন্ধানে বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে প্রথম প্রবেশ করেই দেখলেন, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ করছেন আর রাজা বীর হাম্বীর তা শুনছেন—

'আরদিন ভোজন করিয়া যায় দুইজনে।
তাহা উত্তরিলা যাঁহা রাজা বিদ্যমানে।।
ভাগবত পড়ে পণ্ডিত রাজা তাহা শুনে।
অর্থ করে ভালমন্দ কিছুই না জানে।।
সে দিবস আইলা বাসা ব্রাহ্মণের ঘরে।
আর দিন পুনশ্চ যান রাজ বরাবরে।।
রাসপঞ্চাধ্যায়ী পড়ে সদর্থ না জানে।
বসিয়া ঠাকুর কিছু করে নিবেদনে।।
ব্যাসভাষিত এই গ্রন্থ ভাগবত।
'শ্রীধর স্বামীর টীকা আছয়ে সম্মত।।

ভক্তি রত্নাকরের মতে বীরহাম্বীর আচার্য শ্রীনিবাসকে ভ্রমর গীতা পাঠের অনুরোধ করেন। 'শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম না জানিলে রাজা বাছিয়া বাছিয়া—'ভ্রমর গীতা' শুনিতে চাহিতেন না।' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি : রাজ অতিথি : পুস্তক বিপণি)। পুঁথি চুরির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'যে রাজার সভায় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পঠিত হয়, রাজা স্বয়ং সে পাঠ শ্রবণ করেন, সে রাজা কখনো পথে-ঘাটে পথিকের সর্বস্ব লুন্ঠন করিতে গুণ্ডা নিযুক্ত রাখিতে পারেন না।' (গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি : রাজ অতিথি : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

যাই হোক, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেই শ্রীনিবাস মল্ল রাজসভা বিজয় করেন। শ্রীনিবাস গোস্বামী সিদ্ধান্তমতে শ্রীমদ্ভাগত পাঠ করে বীরহাম্বীরের মনে এবং সমস্ত রাজসভায় এক ভাবান্তর সৃষ্টি করলেন।

শুনিয়া আনন্দ হয় রাজার অন্তর।
সভাতে যতেক লোক হৈল চমৎকার।।

এমনি করে শ্রীনিবাস রাজা তথা মল্লভূমের মনোহরণ করলেন। রাজা শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। ক্রমশ মল্লভূমের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম বিষ্ণুপুরকে স্পর্শ করিয়াছিল। এই ভাগবত পাঠ তাহারই পুণ্যাদ পরিণাম। এই পুণ্যেই রাজা শ্রীনিবাসের দর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভাগবত পাঠ তাহারই পশ্চাৎ পটভূমি। শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের সম্মুখের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের বাঁদিকের প্রায় ভিত্তিসংলগ্ন পটিতে একটি গোস্বামীচিত্র (টেরাকোটা চিত্র) আছে। চিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ পুঁথিপাঠরত এক গোস্বামীর পাশে এক রাজপুরুষ পাঠ শুনছেন। এটিকে মল্ল রাজসভা বিজয়ের ঐতিহাসিক চিত্র মনে করা অসঙ্গত নয়।

যাই হোক বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে টেরাকোটা অলঙ্করণ শুধু সৌন্দর্যে অসামান্য নয়, তাৎপর্যও গুরুত্বপূর্ণ বটে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা এখানের মন্দির টেরাকোটার প্রধান উপজীব্য। শ্রীশ্রীশ্যামরায়, জোড়বাংলা ও শ্রীশ্রীমদনমোহনে যথাক্রমে রাসলীলা, বৃন্দাবনলীলা (অসুরবধ—গোষ্ঠলীলা) এবং কৃষ্ণজন্মের আখ্যানবস্তু মন্দির-টেরাকোটায় রূপলাভ করেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত তথা কৃষ্ণলীলার সর্বোত্তম লীলা হল রাসলীলা। বৈষ্ণব বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক অভিব্যক্তির কেন্দ্রবিন্দু বা উৎস এই রাসলীলা। শ্যামরায় মন্দিরে ছোটবড় চল্লিশটির মতো রাসচক্র দিয়ে মন্দিরটির তাত্ত্বিক শ্রেণীকরণ করা হয়েছে যেন। প্রেমভক্তির প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বোত্তম রস মধুর রসের অভিব্যক্তি ঘটেছে এখানের টেরাকোটায়। রাসমণ্ডল ছাড়াও মন্দিরের (শ্যামরায়) পূর্বদিকে উৎকীর্ণ গোপীস্কন্ধে ন্যস্ত বাহুভার নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণের চিত্রগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের এক শ্লোকেরই যেন চিত্ররূপ। কৃষ্ণকে সুখী করেই পরিতৃপ্ত গোপীরা। মন্দিরের নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে নৃত্যরত শতাধিক গোপীচিত্রে যেন তারই অভিব্যক্তি। গুপ্তযুগের 'গজেন্দ্রমোক্ষ' ক্লাসিক চিত্রটির মাধ্যমে শরণাগতির ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে শ্যামরায়ের মন্দিরে। পশ্চিমের বারান্দায় 'গজকচ্ছপের যুদ্ধচিত্রে' একই ব্যঞ্জনা। সখ্য-দাস্য রতির প্রকাশও লক্ষ করা যায় এখানের টেরাকোটায়।

**একথা সর্বজনবিদিত যে,
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেক্ষাপটে
প্রাচীন ভারতীয়
ক্লাসিক সংস্কৃতিরই পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল।
শাস্ত্র-সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, চিত্রকলা-সঙ্গীত
সর্বত্রই এই ক্লাসিক সংস্কৃতির বিবর্তিত
বাতাবরণটি লক্ষ করা যায়,
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও সংস্কৃতিতে।
তাছাড়া এ জেলায় রেখ ও পীঢ়া দেউলের
(ওড়িশা রীতির) এক সমৃদ্ধ
অতীত ঐতিহ্য বর্তমান।**

পৌরাণিক সমন্বয়ের একটি সমৃদ্ধ বাতাবরণ লক্ষ করা যায় এখানে। পশ্চিমের বারান্দায় ভগবান বিষ্ণুর দশাবতার প্যানেলের পাশাপাশি মহাদেবীর দশমহাবিদ্যা প্যানেল। এ মন্দিরের ওপরতলার কেন্দ্রীয় চূড়ায় 'হরিহরের' টেরাকোটা চিত্রটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গর্ভগৃহে প্রবেশের (দক্ষিণের বারান্দা থেকে) গলিপথটির ডানদিকে নানা সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের একত্র চিত্রে 'সর্বধর্মসমন্বয়ের' ইঙ্গিত। মোগলযুগে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা সরকারিভাবে হয়েছিল—সম্রাট আকবরের 'দীন-ইলাহী' ধর্ম সেই প্রয়াসেরই অন্যতম অভিব্যক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতের পারিজাতহরণ চিত্রটি দেখা যায় এই মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায়। পারিজাতহরণ চিত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, ভারতের সীমা ছাড়িয়ে বহির্ভারতে পাড়ি দিয়েছে দেখা যায়। গোস্বামী গ্রন্থের একাধিক শ্লোক টেরাকোটায় মূর্ত হয়েছে। মঞ্জরী ভাবসাধনার প্রধান প্রবক্তা রূপ গোস্বামী হলেও শ্রীনিবাস আচার্য মঞ্জরী ভাবসাধনার অন্যতম প্রধান প্রচারক ছিলেন। শ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রে 'মঞ্জরী ভাবসাধনা'র ইঙ্গিত দুর্নিরীক্ষ্য নয়। শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে (ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের দুপাশে) কুঞ্জকুটিরে লীলারত রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান ভক্তের মূর্তিগুলি মঞ্জরী ভাবসাধনার ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মনে হয়। পূর্বদিকের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের মাথায় উৎকীর্ণ 'রামরাবণের যুদ্ধ' চিত্রটি চিত্তাকর্ষক। যুদ্ধরত রামরাবণের মূর্তির পাশে করজোড়ে দণ্ডায়মান হনুমানের চিত্রটিও ভক্তিবাদের দ্যোতক।

জোড়বাংলা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা অসুরবধ থেকে মথুরা যাত্রা কংসবধ চিত্রিত হয়েছে। জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণদিকে কৃষ্ণলীলা আর তারই সমান্তরালে পশ্চিমের দেওয়ালে রামকথা। রামজন্ম থেকে আরম্ভ করে তাড়কাবধ এবং রামের বিবাহ। এই মন্দিরে বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। একইভাবে রামকথা আর কৃষ্ণকথা ব্যক্ত হয়েছে একই রসপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত

করে। বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট করার জন্য মাতৃক্রোড়ে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নকে যেমন (পশ্চিম দেওয়ালে) চিত্রিত করা হয়েছে, দক্ষিণের (অগ্রবর্তী দোচালায়) ত্রিখিলান প্রবেশপথের ডানদিকে মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণ-বলরামও উৎকীর্ণ হয়েছেন। এমন কি পশ্চিমের দেওয়ালে ভয়ঙ্কর দেবীযুদ্ধের নিচে গণেশজননী, স্কন্দমাতার বাৎসল্যরসাত্মক চিত্রগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। অষ্টমাতৃকা মূর্তিও চিত্রিত হয়েছে। এখানে সমসাময়িক ঘটনারূপে পর্তুগিজ যুদ্ধ যেমন চিত্রিত হয়েছে, মোগল-সামন্তদের আভিজাত্য ও বিলাসব্যসন তেমনি চিত্রিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রের সংখ্যা স্বল্প। কিন্তু বিন্যাস-চারুতায় বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এখানে মহাভারতের যুদ্ধ এবং কৃষ্ণের জন্মকথা চিত্রিত হয়েছে। এখানের মন্দিরে হংসলতা প্যানেলটি সমধিক আকর্ষণীয়। খড়বাংলার শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরে টেরাকোটার সংখ্যা অতি স্বল্প। এখানে কয়েকটি উজ্জ্বল এবং জীবন্ত টেরাকোটার মধ্যে 'গজেন্দ্রমোক্ষ' ও 'পুঁথিপাঠে'র চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনেরই (শরণাগতি এবং শ্রবণ-মনন) অভিব্যক্তি ঘটেছে। 'গজেন্দ্রমোক্ষ' চিত্রটি শরণাগতির প্রতীক এবং পুঁথিপাঠের চিত্রটিতে পরিস্ফুট হয়েছে শ্রবণ এবং স্মরণ। পুঁথিপাঠরত গোস্বামীর সম্মুখে মালা হাতে দুই নারী শ্রোতা। তাঁরা পাঠ শুনছেন এবং মালা জপ করছেন। সতেরো শতকে (খ্রিস্টিয়) ভক্তিভাবের উক্ত পটভূমিকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তাত্ত্বিক ইশারা অম্লান এখানের মন্দির টেরাকোটায়।

বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটায় শুধু বিষয়বৈচিত্র্য এবং দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণই নয়, টেরাকোটা চিত্রের অসামান্য স্টাইলটিও সমধিক আকর্ষণীয়। পার্শ্বগত ভঙ্গিতে বেসরিলিফে উদ্গাত টেরাকোটা মোটিফগুলিতে রয়েছে চিত্রের আবেদন। এই টেরাকোটা চিত্রগুলিতে সমকালে বিকশিত রাজস্থানি চিত্ররীতিই অনুসৃত হয়েছে। এখানে বিকশিত (পুঁথি পাটার উপর) মিনিয়েচার চিত্রকলায় এই রাজস্থানি রীতিবৈচিত্র্য সমধিক পরিস্ফুট।

অনেকে মনে করেন রাজস্থানি চিত্ররীতির একটি ধারা ওড়িশা থেকে এসে বঙ্গদেশের পশ্চিমের জেলাগুলিতে অবস্থানকালে বঙ্গের লোকচিত্ররীতির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর থেকে সংগৃহীত মল্লরাজ বীরহাম্বীরের সময়ের একখানি পাটাচিত্রে এই বিবর্তন লক্ষ করেছেন গবেষকরা। বিষ্ণুপুরের সতেরো শতকের মন্দির টেরাকোটায় সূত্রধর শিল্পীদের দারুশিল্পের আঙ্গিকটি যেমন সুস্পষ্ট পরবর্তীকালের সম্মুখভঙ্গিতে উচ্চ রিলিফে উদ্গাত এবং 'বনকের' পালিশপ্রলিপ্ত টেরাকোটা মোটিফগুলিতে তেমনি কুম্ভকার শিল্পীদের প্রভাব অনুভূত হয়।

যাই হোক, সপ্তদশ শতকের বিষ্ণুপুরে যে অভিনব শিল্পবিকাশ ঘটেছিল তা শুধু বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া নয় বঙ্গের শ্লাঘার বস্তু। বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বীরহাম্বীরের এই দীক্ষাগ্রহণ শুধু মল্লভূমের নয়, বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সেদিন যুগান্তর এনেছিল।' এখানের স্থাপত্য আর ভাস্কর্যে যেমন ওড়িশার প্রভাব অনুভূত হয়, মল্লভূমের তৎকালীন চর্চা-চিন্তা শিক্ষাদীক্ষায় নবদ্বীপের প্রভাবও তেমনি দুর্নিরীক্ষ্য নয়। আচার্য

জোড়বাংলা মন্দির বিষ্ণুপুর

যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংগৃহীত কয়েক হাজার পুঁথির সংগ্রহ ছাড়াও এই অঞ্চল থেকে পূর্বেই গাড়ি গাড়ি পুঁথি অন্যত্র চলে গেছে। এই পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে সংস্কৃত পুঁথিই সর্বাধিক। আর তার মধ্যে পুরাণ, মহাকাব্য, দর্শন ন্যায়, স্মৃতির প্রচুর পুঁথি অতীতকালের বিষ্ণুপুরে তথা মল্লভূমে শত শত টোল-চতুষ্পাঠীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। গবেষকরা মনে করেন একসময় মল্লভূম বঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট এক চর্চাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ন্যায় এবং স্মৃতির প্রচুর চর্চা হয়েছিল এখানে। নব্যন্যায় এবং নব্যস্মৃতির চর্চার ধারা নবদ্বীপ থেকে এখানে প্রবাহিত হয়। মাত্র দু'শতকে অথবা তারও কম সময়ে মল্লভূম তথা বিষ্ণুপুরের এই সর্বাত্মক বিকাশ বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বিনয় ঘোষ যথার্থভাবেই বলেছেন—'বিষ্ণুপুরের রাজারা বাঙালি এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন বাঙ্গালী রাজাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। .....বিষ্ণুপুরের রাজাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী, স্বাধীনতাপ্রীতির কাহিনী, সাংস্কৃতিক বদান্যতা ধর্মানুরাগ ও উদারতার কাহিনী আজ রূপকথার মত অবিশ্বাস্য মনে হলেও এককালে ঐতিহাসিক সত্য ছিল।' হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি গ্রন্থে লিখেছেন—'বৈষ্ণবধর্ম বিষ্ণুপুরকে নূতন সংস্কৃতিতে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল। নূতন স্থাপত্যশিল্পের উন্নততর রুচির পরিচায়ক বহু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বিষ্ণুপুরে। তথায় ভাস্কর্যের এবং চিত্রশিল্পের নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সঙ্গীতের সাধনায় বিষ্ণুপুর দিল্লি ঘরানার গৌরবস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছিল।' বিষ্ণুপুরের এই অতীত গৌরব আজ অনেকাংশে ম্লান হলেও আজও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

১। Two Centuries from the close of the 16th to the close of the 18th saw the magnificent floraison of Bengali art and culture as a late provincial phase of our pan-Indian medieval art and culture--in and around Vishnupur in the tract known as Mallabhum. ...East of Benares we have no town which is worth mentioning as a city of art—excepting Gaya in South Bihar, and Vishnupur in Bankura district, West Bengal, by Suniti kumar Chatterjee, Modern Review, 1933.

২। 'শ্রীনিবাসের মল্ল রাজসভা বিজয় বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বৃহৎ ঘটনা। সাহিত্যে না হোক সঙ্গীত ও কারুশিল্পে বাঙ্গালীর শিল্পভাবনা এখানে একটু নতুন পথে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।' 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ ; ডঃ সুকুমার সেন।

৩। এ জেলায় প্রচুর জৈনমূর্তি থাকলেও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি বড় একটা কম নয়। একাধিক ব্রাহ্মণ্যমূর্তি দশম শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয়। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার কাস্তোড় গ্রামের চক্রমধ্যে উৎকীর্ণ ভগবান শিবের নটরাজ মূর্তিটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নবম শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেছেন। বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ থানার অন্তর্গত সারেংগড় থেকে সংগৃহীত বর্তমানে ভারতীয় সংগ্রহশালায় (কলকাতা) সংরক্ষিত বিষ্ণুদেবতার হৃষীকেশ মূর্তিটিও নবম শতকের। বিশেষ করে ওড়িশার সমসাময়িককালের সমস্ত রেখদেউলই মহাদেব শিবের মন্দির। বেগুনিয়া বরাকরের ৪র্থ মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের মাথায় ভগবান লকুলীশের মূর্তিটি এ প্রসঙ্গে সমধিক তাৎপর্যপূর্ণ। শিবদেবতার মন্দিররূপে রেখদেউলই প্রচলিত। আধুনিককালেও রাঢ়বাংলায় তথা বাঁকুড়ায় শৈবমন্দিরগুলির অধিকাংশই দেউল মন্দির।

৪। 'A remarkable circumstance here is, that all the temples, without exception, of which can now be ascertained, appear to have been Saivic; there is no Vaishnavic or other sculpture at all in the whole place; there must, therefore have been a large and rich, and probably intolerant, Saivic establishment here'. **Tour Through Bengal Provinces**–J. D. BEGLAR.

৫। The object of worship inside is named Siddheswara, being large lingam apparently in situ. I conclude, therefore, that the temple was originally Saivic. Besides the lingam, there are inside a naked Jain standing figure, a ten armed female, and a Ganeca; the Jain figure is clear proof of the existence of the Jain religion in these parts in old time, though I cannot point to the precise temple or spot which was devoted to this sect. বহুলাড়া মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধ স্তূপের (ক্ষুদ্রাকার) প্রতিকৃতি তখন আবিষ্কৃত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। TOUR THROUGH BENGAL PROVINCES : J. D. BEGLAR.

৬। উদয়গিরি (মধ্যপ্রদেশ) দুর্গমন্দিরে গুহাভ্যন্তরে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবধর্মের এমনি এক সমন্বয় লক্ষ করা যায়। গুহাপ্রবেশের মুখে একটি শিবলিঙ্গ উমা-মহেশ্বরের চন্দ্রানন একত্র সমাহৃত। পিছনের গিরিগাত্রের একপাশে বরাহ অবতারের ভারতবিখ্যাত মূর্তি এবং অপর পাশে মহাদেবী মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। মূর্তিটি অভিনব এবং সমধিক তাৎপর্যপূর্ণ। দেবীর উপরের দুটি হাতে টানটান করে ধরা গোধা বা গোসাপ। শলদা-গোকুলনগরে অনুরূপভাবে মহাকাল, ভৈরব, শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বর মন্দিরে দেবী মহিষমর্দিনী আর গণেশ মূর্তির পাশাপাশি বিষ্ণুর অবতার মূর্তি এবং অনন্তশায়ী মূর্তি। প্রায় একই স্থানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত দুই উল্লেখযোগ্য শক্তিমূর্তি। একটি মাতৃকা বা রাহী অপরটি আপাতদৃষ্টিতে শিরোপরি দণ্ডায়মান শক্তি হলেও করালবদনা-ঘোরা-কালিকামূর্তি বলে মনে হয় না—দেবী সৌম্য প্রসন্নবদনা এক মহিমাময়ী শক্তিমূর্তি। কেউ কেউ মূর্তিটিকে যোগিনী (মতান্তরে চণ্ডিকা) মূর্তি বলেছেন। এই শলদা থেকে ঐরাবতবাহনা এক নারীমূর্তি সংগৃহীত হয়ে বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত। মূর্তিটিকে ঐন্দ্রী বা ইন্দ্রাণী মূর্তি বলে মনে করা হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে মাতৃকা চামুণ্ডারও একটি মূর্তি লক্ষ করা যায়।

৭। ভারতের প্রায় প্রতিটি পুরাক্ষেত্রে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য মন্দির বা মূর্তির পাশাপাশি জৈন মন্দির বা মূর্তির উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কি একই সম্প্রদায়ে সাময়িক বিবাদ-বিসম্বাদ বা স্থানীয়ভাবে দ্বন্দ্ব-কলহ স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু মোটের উপর ভারতের ধর্ম বা পুরাক্ষেত্রের সামগ্রিক চেহারা যতটা সমন্বয়ের, ততটা সংঘর্ষের নয়। ইলোরা, খাজুরাহো, ওড়িশার বিভিন্ন অংশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জৈনধর্মের স্বাভাবিক সমন্বয়ের চিত্র দুষ্প্রাপ্য নয়। মধ্যপ্রদেশের সাঁচীর সন্নিকট উদয়গিরি গুহায় শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। এই গুহারই উপরের একটি গুহায় এক ধ্যানী তীর্থঙ্কর (জৈন) মূর্তি চোখে পড়ে। মূর্তিটি উপযুক্ত মর্যাদায় গুহামন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গদেশে তথা এই বাঁকুড়া জেলায় এ চিত্র একাধিক। বিষ্ণুপুরের উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে ধরাপাটের মন্দিরে দুটি তীর্থঙ্করমূর্তির পাশে একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি সহজেই লক্ষ করা যায়। শলদার সংলগ্ন গোকুলনগরের শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক সময় অনন্তশয়ন বিষ্ণুদেবতার মূর্তির পাশাপাশি জৈনতীর্থঙ্কর নেমিনাথের যে মূর্তিটি ছিল সেটি বর্তমানে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সযত্নে সংরক্ষিত। কাঁসাই-কুমারীর জলাধারের তলায় বর্তমানে অবলুপ্ত সারেংগড়ের বিখ্যাত পুরাক্ষেত্রে দেখেছি শৈব-শাক্ত মূর্তির পাশাপাশি মনুষ্যপ্রমাণ তীর্থঙ্করমূর্তির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। পুরুলিয়া জেলার ভজুডি স্টেশনে নেমে কিছুদূর গেলেই ইস্রি নদী (?) পেরিয়ে এক পুরাক্ষেত্রে এমনি জৈন আর বৈষ্ণবমূর্তির সহাবস্থান চোখে পড়ে। এক মনুষ্যপ্রমাণ তীর্থঙ্করমূর্তির (পাকবিড়রা-পুরুলিয়া) পাশাপাশি দেখা যায় এক বিষ্ণুমূর্তি। একটি বীরস্তম্ভও এখানে লক্ষ করা যায়। এটিতে সশস্ত্র বীরমূর্তির সঙ্গে স্তম্ভের মাথায় সিংহমূর্তি(?) দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত শ্রীশ্রীশ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রে অনুরূপ সমন্বয়ের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। মন্দিরের দক্ষিণদিকের বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের গলিপথের ডানদিকে বিভিন্ন ধর্মগুরুর (পোশাকের পার্থক্যে সুচিহ্নিত) চিত্রের সঙ্গে একটি দিগম্বর জৈনতীর্থঙ্কর মূর্তি বিরাজমান। শুধু তাই নয়, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মদর্শনেও এই সমন্বয়প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভগবান বুদ্ধের, দশাবতার (বিষ্ণুদেবতার) শ্রেণীভুক্তি সর্বজনবিদিত। অনেকে মনে করেন লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তিগুলি বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের মিশ্রণজাত। রাখালদাস বলেছেন (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ : প্রথম সংস্করণ : পৃষ্ঠা ২৫৫) লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তিগুলি এমন এক সময় তৈরি হয়েছিল যখন প্রাচীন ভাগবত-বৈষ্ণবমূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানী লোকেশ্বরের মিলন মিশ্রণ ঘটেছিল। 'The particular class of specimens, therefore, indicates a blending of the older Bhagabata class of Vaishnava images and the Lokesvaras of the later Mahajana school of Buddhism. (E. I. S. M. S. page 96) বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের সমন্বয়ের জন্য যেমন, হরিহর, মহাযানী বৌদ্ধ ও শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের সমন্বয়ের জন্য লোকেশ্বর শিব এবং লোকেশ্বর বিষ্ণুও ঠিক তেমনি।' **পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ।** বিনয় ঘোষ লোকেশ্বর বিষ্ণু দেবতার মূর্তিগুলিকে যুগসন্ধির দেবতা বলেছেন। তিনি পাতুনের (বর্ধমান) লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'পাতুনের একাধিক লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি থেকে বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলের এই যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস আলোকিত হয়ে ওঠে।' **পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। বিনয় ঘোষ।**

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মানভূম-সিংহভূম জুড়ে প্রচুর লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি চোখে পড়ে। বাঁকুড়া সংলগ্ন শ্রীশ্রীএক্তেশ্বর শিবমন্দিরে একটি নাগচ্ছত্রযুক্ত লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি (৪ ফুট আনুঃ) ছাড়াও ছোট আকারের শিলাপটে উৎকীর্ণ একটি লোকেশ্বর বিষ্ণুদেবতার মূর্তি দেখা যায়। বিহারীনাথ পাহাড়ের (বাঁকুড়া-তিলুড়ি) পাদদেশে অবস্থিত একটি মন্দিরে এক নাগচ্ছত্রযুক্ত দ্বাদশভূজ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি উল্লেখযোগ্য। গঠন সুষমায় মূর্তিটি অনবদ্য। জয়পুর থানার (বাঁকুড়া) শলদা গ্রাম প্রবেশের মুখে একটি বৃক্ষতলে (এখানে ল্যাটারাইট পাথরের উপর পঙ্কের প্রলেপ দিয়ে নির্মিত নকুলীশমূর্তিটি দেখা যায়) একটি নাগচ্ছত্রযুক্ত বিষ্ণুমূর্তির উপরের অংশ (আবক্ষটুকু) বর্তমানে দেখা যায়। মূর্তির পাশে একদা অবস্থিত (বর্তমানে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত শঙ্খপুরুষ মূর্তিটির গঠনভঙ্গিমায় পদ্মপানি অবলোকিতেশ্বরের গঠন ভঙ্গিমার আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এই বিচিত্র লীলায়িত ভঙ্গিমাটি লক্ষ করা যায় যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের ত্রিভঙ্গ সূর্যমূর্তিটিতেও। সূর্যমূর্তির সাধারণভাবে (স্থানক) ঋজু ভঙ্গিমাই লক্ষ্য করা যায়। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সূর্য মূর্তিটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যে প্রায় অনন্য। শঙ্খপুরুষ ও সূর্যের ত্রিভঙ্গমূর্তিতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিমালক্ষণ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

লেখক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক, রাঢ়ের প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ও চর্চার অন্যতম পথিকৃত।

বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্প : টেরাকোটার কাব্য

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

টেরাকোটা শিল্পসমাবেশের রাজ-ঐশ্বর্য দেখতে হলে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি আগে দেখতে হবে। বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের রাজধানী City of Art। বিষ্ণুপুরের নানাবিধ বিচিত্র সৌন্দর্যের নিদর্শনের মধ্যে টেরাকোটা ঐশ্বর্যে এবং মধ্যযুগীয় প্রদীপ্তিতে শ্রেষ্ঠ।
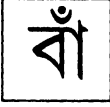
বাঁকুড়া আমার জন্মস্থান নয়, কৈশোরের ক্রীড়াভূমিও নয়, বাঁকুড়া আমার যৌবনের কর্মস্থান। কর্মসূত্রে একটানা ৩০ বছর বাঁকুড়ায় ছিলাম। তো যে জেলা আমাকে অন্ন দিল, আমার ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ, পড়াশোনার সুযোগ দিল, সে জেলা সম্বন্ধে জানবো না ? সুযোগও মিলে গেল। ৩০ বছর আগে আকাদেমি অব ফোকলোরের পরিচিত পণ্ডিতরা ডঃ দুলাল চৌধুরীর নেতৃত্বাধীনে বাঁকুড়া এলেন। এবং বাঁকুড়ার সদর শহর বাঁকুড়ায় আমার মেসে উঠলেন। কয়েকবার এসেছেন তাঁরা। ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রয়োজনে। দলের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম। সেই আমার বাঁকুড়া টেরাকোটা দর্শনের আরম্ভ। তারপর অব্যাহত ছিল সেই সৌন্দর্যদর্শন, সৌন্দর্যমুগ্ধতা। বাঁকুড়াকে গভীর ভালবাসার অবকাশ পেলাম। আমি পণ্ডিত নই, বিশেষজ্ঞও নই। আমি দর্শক। ভগবান আমাকে একজোড়া বড় বড় চোখ দিয়েছেন। টেরাকোটার সৌন্দর্য নানা স্থানে, নানা সময়ে দেখে দেখে আমার চোখ ভরে গেল। ভরে গেল মন। তার কথাই সংক্ষেপে বলব।

বাঁকুড়া জেলা টেরাকোটা শিল্পে ঐশ্বর্যশালী। শুধু বিষ্ণুপুর নয়। টেরাকোটা শিল্পের দুটি ভাগ—অভিজাত শিল্প এবং লোকায়ত শিল্প। মাটির পুতুল, রকমারি বিনোদন দ্রব্য, শৌখীন দ্রব্য, পূজা দ্রব্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গার্হস্থ্য দ্রব্য বস্তুনিচয়। এই সবই যা পাওয়া যায় তা লোকায়ত শিল্পের নমুনা। কিন্তু মন্দির-টেরাকোটা ? তার তো প্রধান উদ্যোক্তা ধনী মানুষ, রাজা মানুষ। তাঁদেরই আগ্রহে অধ্যবসায়ে নির্মিত হয়েছে মন্দির-টেরাকোটা এবং মন্দির গাত্রে সংযোজিত হয়েছে। তাঁদের মানসিকতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যদিও এক বিশেষ শ্রেণীর কারিগর মাটির চৌকো ছোট-বড় প্লেটের উপর কাজ করে অবশেষে পুড়িয়ে নিয়েছেন পোয়ানে। তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর কুমোর ছিলেন, 'সূত্রধর' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের মানসিকতা আলাদা। মধ্যযুগের সেই শিল্পগোষ্ঠী আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। সেই কারণেই কিনা, সঠিক জানি না, রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির তৈরির সময় কোনও টেরাকোটা মন্দিরশিল্পী পাওয়া যায়নি। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণকাজ শেষ হয়। মন্দির গাত্রে টেরাকোটা কাজের টালি বসানোর জন্য সারবন্দী ছোটবড় ঘর কাটা আছে। যেমন দেখেছিলাম হুগলি জেলার সুখরিয়ার 'আনন্দ ভৈরবাণী'র মন্দিরে। সেখানে অবশ্য টেরাকোটা শিল্পকাজ দিয়ে ঘরগুলি ভরাট করা। আমাদের প্রশ্ন, তাহলে এসব মন্দির টেরাকোটা কোন্ শ্রেণীতে পড়বে ? অভিজাত শিল্পশ্রেণীতে, না লোকায়ত শিল্প শ্রেণীতে ? বাঁকুড়ার ঘোড়া না হয় লোকায়ত শিল্পের অন্তর্গত। কিন্তু বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি ? শুধু আলাদা করে মন্দিরের টেরাকোটার কাজগুলি ? আমাদের মনে হয়েছে অভিজাত শিল্প এবং লোকায়ত শিল্প—এই রকম দুটি বিভাজন কৃত্রিম ও অমূলক।

টেরাকোটা শিল্পকারুকাজকে কাব্য বললাম কেন ? অকারণে নয়। ধরুন একটা কুঁজো। হাঁদা পেট, সরু গলা। দেশে দেশে যুগে যুগে কুঁজোর এই একই গড়ন। কখনো রঙটা কালো বা লাল। এ পর্যন্ত কুঁজো আমাদের নিত্য ব্যবহারের জিনিস। তার বেশি কিছু আশা করি না। কিন্তু যদি কোনও শিল্পী ওই কুঁজোর গায়ে ফুলকারি কাজ এঁকে সাজিয়ে দেয়, তাহলে যে চমৎকারিত্ব আসবে তা কিছুক্ষণ নয়নভরে দেখার বিষয় হবে। কুঁজো এখন ঠাণ্ডা জলের ভাণ্ডমাত্র নয়। আঁগরের চিত্র 'লা সূর্য'-এর সৌন্দর্য বিভাষিত তরুণীর হাতের ঠাণ্ডা জলপাত্র মাত্র নয়। তা নিছক একক শিল্পবস্তু, কাব্য। ছোট ছোট মাটির ঘট বা ভাঁড় কুমোরপাড়ায় অনেক দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তার একটি হাতে তুলে নিয়ে দেখুন কী সহজ নিপুণতায় গড়া হয়েছে এর বাঁকানো কানাটি। কী মানানসই হয়েছে এর বসার জায়গায় খুরোটি। সব মিলিয়ে ভাঁড় তখন কাব্য। দেখতে জানলে, রূপ আবিষ্কার করতে জানলে, আশ্চর্য অনবদ্য কাব্য। আমার সঙ্গে এক সময় চিত্রশিল্পী তপন কর বাঁকুড়ার কিছু শহর গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। যেমন বাঁকুড়ার মাচানতলায়, লালবাজারে, বেলেতোড়ের পাড়ায় পাড়ায়, কুমোরের দোকানে। সর্বত্রই তিনি ছোট ছোট ভাঁড় ও ঘট সংগ্রহ করছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন এদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, অনবদ্য সৌন্দর্য, রেখার নৈপুণ্য, জ্যামিতিক অঙ্গবিন্যাস। বেঁটেখাটো ভাঁড়গুলি তখন অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছিলেন আমার চোখে। বেলেতোড়ের পাড়ায় দেখেছিলাম রঙিন ভাঁড় বা ঘট। কাজ করা, আলপনা আঁকা, বিভিন্ন বিচিত্র বর্ণলেপনে। ঘরোয়া তুলি দিয়ে অবলীলায় সেই সব ঘট অংকন করতে দেখেছি শিল্পী কুমোরকে। সেই ঘট আমাদের পড়ার টেবিলে ফুলদানি হিসাবে শোভা পায়। দেবীর পায়ের কাছে পবিত্র গঙ্গাজল, কচি ডাব, ফুল ইত্যাদি দিয়ে পূজার উপকরণ হিসাবে কাজে লাগাই। এগুলি মঙ্গলঘট বা লক্ষ্মীঘটরূপেও ব্যবহৃত হয়। এই ভাঁড়ই আবার তুম্বো ঘটির মতো—সবদিক ঢাকা লক্ষ্মীভাঁড় হিসাবে বিক্রি হতে দেখেছি সোনামুখীর হাটে। লক্ষ্মীভাঁড় নিতান্ত প্রয়োজনের দ্রব্য, নিছক গদ্যের উদাহরণ, কিন্তু যখন তার গায়ে নানা রঙের স্প্রে দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় তখন তা হয়ে ওঠে কাব্য।

আমরা নাকটেপা লাল রঙের মাটির ছোট ছোট পুতুল বাঁকুড়ায় দেখিনি। যেমন দেখেছিলাম হুগলি জেলার বিখ্যাত শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে তারকনাথের মন্দিরের কাছে 'মনোহর'পট্টীতে। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি রাশি রাশি ছোট ছোট নাকটেপা পুতুল দোকানে সাজানো রয়েছে অন্যান্য পাথরের সব ব্যবহার্য বস্তুর সঙ্গে। কাঠের পুতুল, মাটির পুতুলের আধিক্যের জন্যই ওইসব দোকানপাড়ার নাম হয়েছিল 'মনোহর'পট্টী। সার্থক নাম। এখন আর একটিও পাওয়া যায় না, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ওইসব শিল্পসামগ্রী। এখন প্লাসটিকের পুতুল দিয়ে দোকানগুলি সাজানো। এখনও সেই নাম 'মনোহর'পট্টী। নাকটেপা মাটির পুতুল সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় নিশ্চয়ই আছে—যদিও আমার চোখে পড়েনি।

তবে বিষ্ণুপুরে অনেক খুঁজে পেয়েছিলাম সবুজ ও লাল রঙের ছোট ছোট অতিক্ষুদ্র 'বরকনে' পুতুল। একে হিঙ্গুলও বলে। আগে ছোট ছোট মেয়ের বিয়ে হত। তাই সেই গৌরী বিবাহে গায়ে হলুদের তত্ত্ব হিসাবে হিঙ্গুল পুতুল ডালায় সাজিয়ে পাঠানো হতো মেয়ে বা কনের বাড়ি। যা নিয়ে কচি কন্যে খেলা করতে পারবে। এখন এই সব পুতুল দানের চল্ নেই। তবু কোনও কোনও পরিবার বিয়ের আগে হিঙ্গুল পুতুল অর্ডার দেন। বিষ্ণুপুরে একটিমাত্র কুমোর পরিবারে এই পুতুল মেয়েরা তৈরি করেন। আবার তাঁরা শঙ্খশিল্পীও বটে। ছোট ছোট ১/১½ সাইজের পুতুল, পুড়িয়ে নিয়ে গরম থাকতে থাকতে গালায় চোবানো হত। তাহলে জল পড়ে পুতুল নষ্ট হবে না।
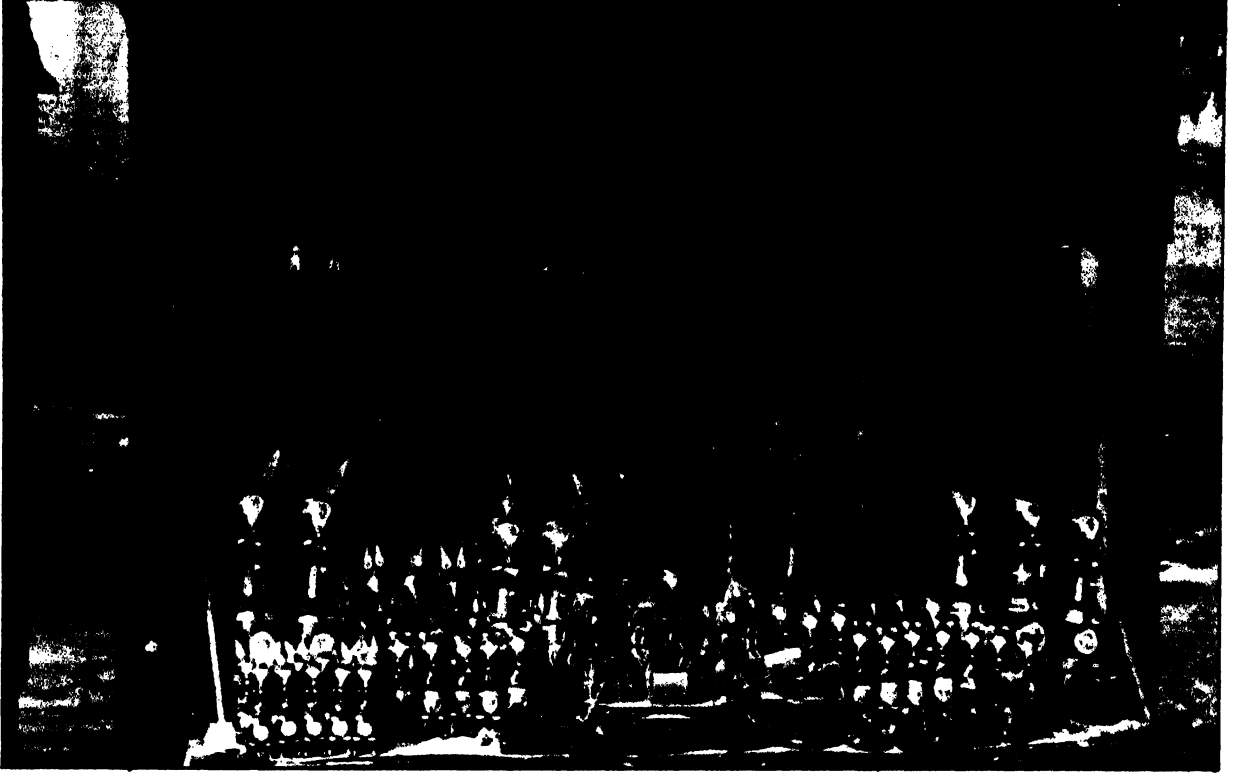
বাঁকুড়ার পোড়া মাটির ঘোড়া লোকায়ত শিল্পের অন্তর্গত, এছাড়া আছে পোড়া মাটির পুতুল

আর এক ধরনের পোড়া মাটির পুতুল আছে। নাম রেল-পুতুল। পাঁচমুড়ায় কোনও এক কুমোর বাড়িতে দেখেছি। এখন আর পাওয়া যায় কিনা জানি না। মোটা মোটা গোল দুটো রেললাইন পাতা, তার উপর বসে আছে তিনজন মানুষ, আরোহী। সবই পোড়ামাটির।

ষষ্ঠী পুতুল বাঁকুড়ায় বিখ্যাত। বাঁকুড়ায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। গোড়াবাড়ি, বাঁকুড়া সদর শহর, সোনামুখি, বেলেতোড়, কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, খাতড়া বাজারে বা কুমোর পাড়ায় বিক্রি হয়। ষষ্ঠী ঠাকরুণ আমাদের পুত্র-কন্যা নাতিপুতির দেবতা। মা ষষ্ঠীর কৃপা না হলে মায়েদের সন্তান হয় না। ষষ্ঠীপুতুল লাল এবং কালো। কালো রঙের পুতুলই অধিক দেখা যায়। অনেকটা মহেঞ্জোদাড়োর 'মাতৃকা' মূর্তির মতো। স্থূল উদরা, পীবরস্তনী—দুধে ভরা। ঘরে এনে পূজা করে মেয়েরা। ব্রত পালন করে। এই পুতুল হুগলি জেলায় তেমন দেখি না। হুগলি জেলা আমার জন্মস্থান, পিতৃভূমি। কোলে পুত্ কাঁখে পুত্ এই পুতুলের পায়ের কাছেও পুত্র-কন্যার ছোট ছোট মূর্তি সংযোজিত। যেমন 'ভিনাস' চিত্রের বিখ্যাত সব বিদেশি নমুনায় দেখি উড়ন্ত 'কিউপিড', ডানা মেলে উড়ছে। এখানে ষষ্ঠীপুতুলে অবশ্য কিউপিডরূপী পুত্রের ডানা নেই। তা অত্যন্ত ব্যবহৃত উপযোগী বাস্তবের প্রতিমূর্তি। প্রতীক মূর্তি।

বোঙা হাতি। সিংবোঙা সাঁওতালদের দেবতা। সিংবোঙার কাছে মানত্ হিসাবে এই পুতুল দেওয়া হয়। মারাংবুরু, জাহের এরাও সাঁওতালদের দেবতা। এইসব পূজাতেও কখনো কখনো সিংবোঙার পূজার মতো মানত্ করা হয় বোঙা হাতি। গঠনটি বিশিষ্ট, সুচারু অলংকৃত, সুমিত সুন্দর। হাতি যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সেইভাবে সামনে থেকে দেখলে যে বিশেষ ফর্মটি ধরা পড়ে সাধারণ মানবচক্ষে, সেই আদলটি এখানে ধরা হয়েছে। হাতির স্থির মূর্তি, সুস্থির সর্ব অবয়ব শুঁড় নামানো। হাঁদা-পেটা সাধারণ স্থূলশরীরী হাতির থেকে অবয়ব ভিন্নতাই শুধু নয়, এই মৃৎপুতুলগুলি নির্মাণে এমন এক চারুশিল্পের হাত এবং চোখ কাজ করেছে যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দর্শকের দৃষ্টিতে খুশির আলো লাগে। এই হাতির রঙ কালো, উচ্চতায় মাঝারি। লাল রঙের বোঙা হাতি দেখিনি। বনবাসী আদিবাসীদের বড় আপন এ পুতুল।

মাটির শঙ্খ। সামুদ্রিক শঙ্খের যেমন 'কয়েল' আছে, এ শঙ্খের ভিতরেও তেমনি কয়েল তৈরি করেন কুমোর শিল্পী। এ শাঁখও বাজে, বাজানো যায় ফুঁ দিয়ে। পাঁচমুড়ার বিশিষ্ট শিল্পবস্তু। ভারি মোটা মাটির আস্তর দিয়ে এর গড়নটি তৈরি হয়। লাল এবং কালো রঙের। এর পিঠের উপরে, সামুদ্রিক শঙ্খের উপর আজকাল যেমন কারুকৃতি করা হয়, তেমনি কারুকৃতি থাকে। শুধু বাজানোর জন্য এই শঙ্খ কেনা হয় না, ঘর সাজাবার জন্যেও সমাদর করে কিনে আনে মানুষজন। বেশ দামী।

মনসার বারিঘট ও মনসার চালি। চালা থেকে চালি। দুর্গার চাল যেমন প্রতিমার মাথায় উপরেপিছনে থাকে, সে রকম নয়। বারিঘট— মনসার বেদিতে রাখা হয় পবিত্র জলে ভরে। ঘট ভরে জল রাখার নিয়ম আছে বলে, আবহমানকাল ধরে, এই শিল্পবস্তুটি তৈরি হয় নানা রকমের। মা-মনসার বারিঘট ছোট ও বড় ধরনের মাটির কলসি। তার গায়ে উদ্যত ফণা সর্পমূর্তির চমৎকার বিন্যাস। একাধিক সর্প। মাচনাতলা ও লালবাজারের কুমোরপাড়ায়ও দোকানে দেখতে পাওয়া

যায়। একাধারে ভয়ংকর ও সুন্দর এই শিল্পিত বস্তুগুলি। মনসার চালি অনেক আগেও করেছেন, এখনও করেন পাঁচমুড়ার শিল্পীরা। ছোট মনসার মূর্তি—তাকে ঘিরে ছোট-বড়ো অনেক লতানে সাপ—একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে বা বিস্তার নিয়ে এই চালি তৈরি করে। যেমন বাঁকানো দুর্গাচাল হয় তেমনি উপরের দিকে বাঁকানো অর্ধবৃত্তাকার তার তিন পাশে একটি একটি সাপের ফণা সাজানো। অনেকগুলি সর্পফণা। একটি বড় সাইজের চালি আছে বাঁকুড়া শহরের রামপুরের একটি মনসামাড়ে। অর্থাৎ মন্দিরে। মন্দিরকে এখানে 'মাড়' বলে। চালি বড় বলে তিন থাক। একে অপরের সঙ্গে জোড় লাগানো এমন করে যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আরও দুটি-তিনটি দেবীমূর্তি তৈরি করে লগ্ন করে দেওয়া হয়েছে চালির মধ্যে। একজন মানুষ আপন শরীরের দুদিকে দু-হাত লম্বা করে দিলে যতখানি জায়গা নেয়, ততখানি চওড়া হয় কোনও কোনও চালি। তেমনি মানুষ সমান উচ্চতা। আর একটি আছে বাঁকুড়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় সংগ্রহশালায়। পার্থ কুণ্ডু কয়েক বছর আগে বাঁকুড়া পর্যটনের উপর একটি পুস্তিকা করেছিলেন পঞ্চায়েতের জন্য, তাতে একটি মনোরম ছবি আছে। লাল বা কালো রঙের হয়। তবে লাল তেমন দেখা যায় না। একটি দেখেছিলাম পরিমল বৌদির দোকানে অনেক বছর আগে। বিষ্ণুপুরের সংগ্রহশালায় আর একটি আছে। মনসার চালির একটি অপূর্ব পাতাজোড়া ফটো ছবি ছাপা আছে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়েতে। *একটি স্তনবতী যুবতী হাত বাড়িয়ে কাপড় দিয়ে রঙ লাগাচ্ছে চালিটিতে। কুমোরপাড়ায় তোলা ছবি। যদিও প্রথাগত শিল্পকর্ম, যদিও মাটির তৈরি বলে ভঙ্গুর, তবুও এই টেরাকোটা শিল্পকর্মটি বাঁকুড়া জেলার শিল্পবস্তু নির্মাণের ও আবেগ আগ্রহের শ্রেষ্ঠ বস্তু বিবেচিত হতে পারে। এর চেয়ে সুন্দরতর নির্মাণ আর চোখে পড়বে না। এক-একটি টেরাকোটা মনসার চালি ৪/৫ হাজার টাকার কম নয়—এতই মূল্যবান। একটি লোকায়ত শিল্পকর্ম Perfection-এর কতখানি উচ্চতায় উঠতে পারে তার উদাহরণ এটি। বাঁকুড়ার কাঠের ঘোড়া এর সঙ্গে মূল্যে ও রূপে পাল্লা দিতে পারে। অন্য কিছু তো দেখি না মাটির ঘোড়া হয়তো রূপে অনবদ্য। কিন্তু অত দামি নয়, এবং ভঙ্গুর।

ষষ্ঠী পুতুল বাঁকুড়ায় বিখ্যাত। বাঁকুড়ায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। গোড়াবাড়ি, বাঁকুড়া সদর শহর, সোনামুখি, বেলেতোড়, কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, খাতড়া বাজারে বা কুমোর পাড়ায় বিক্রি হয়। ষষ্ঠী ঠাকরুণ আমাদের পুত্র-কন্যা নাতিপুতির দেবতা। মা ষষ্ঠীর কৃপা না হলে মায়েদের সন্তান হয় না। ষষ্ঠীপুতুল লাল এবং কালো। কালো রঙের পুতুলই অধিক দেখা যায়। অনেকটা মহেঞ্জোদাড়োর 'মাতৃকা' মূর্তির মতো। স্থূল উদরা, পীবরস্তনী—দুধে ভরা। ঘরে এনে পূজা করে মেয়েরা। ব্রত পালন করে।

বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া ভঙ্গুর হলেও নাটকীয় গঠনে, বলিষ্ঠ অবয়বে, এমন এক শৈলী ধারণ করে আছে যা আমরা ভাবি না। আমরা কল্পনাও করি না। হেনরি মুরের ঘোড়া নয়, সুনীল দাসের ঘোড়ার ছবির একটির মতোও নয়, ঘোড়া মন্দির টেরাকোটার অলংকৃত হয়ে যে দৃষ্টিনন্দন রূপ পেয়েছি তাও নয় বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া। কলকাতার শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ঘোড়াটির মতো তো নয়ই। বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া নিজস্ব শৈলীতে একক ও অনবদ্য। অবাস্তব গড়ন, কিন্তু অনস্বীকার্য ভঙ্গি। প্রতীকী তাই এমন। রাজস্থানের প্রস্তরের ঘোড়া, পুরী কোনার্কের সজ্জিত রাজকীয় প্রস্তর নির্মিত ও সজ্জিত ঘোড়াগুলির মতোও নয়। ঘুঘুবেসের মাটির চাকা লাগানো খেলনা ঘোড়াও নয়। বস্তারের মাটির ঘোড়াও নয় বাঁকুড়ার ঘোড়া। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলের বাস্তবের অনুরূপ অন্ধ অনুকরণ নয় এ ঘোড়ার চালচলন। বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া বলতে পাঁচমুড়ার ঘোড়াকে বোঝায়। National Awards for Master craftsmen-এর পদক পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন দিল্লিতে, রাসবিহারী কুম্ভকার, ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি। রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন দান করেছিলেন। এ ঘোড়ার নির্মাণ তাঁরই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মনোগ্রামে এই ঘোড়ার ছবিই গৃহীত হয়েছে।

দুটি সরলরেখা ৮/১০ ইঞ্চি তফাতে সমান্তরালের আদলে উপর দিকে তুলুন। ২/৩ হাত। দু-জোড়া পা, সামনের বুক, উর্ধ্বমুখী গলা খাড়া লম্বা, কান উৎকর্ণ। পিছনের পাও অবক্র সোজা। দুজোড়া পাই দৃঢ় সংবদ্ধ মাটিতে। খুর নেই, চোখ ছোট, কান লম্বা উর্ধ্বমুখী, লেজ অতি ক্ষুদ্র বক্র। বাস্তব ঘোড়ার 'অ্যানাটমি' দেখে দেখে এ ঘোড়া তৈরি নয়। গতি আর স্থিতি, ঘোড়ার দুরন্ত গতি এবং ঘুমন্ত দাঁড়ানো ঘোড়ার স্থিরতা—দুইই ধরতে চেয়েছেন শিল্পী আপন নির্মাণে। ঘোড়াটি দেখলেই মনে হবে বলিষ্ঠ সচেতন। ওই সমান্তরাল রেখা দুটির মাঝখান দিয়ে আর একটি সরলরেখা টানলে সমান দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে ঘোড়ার অবয়ব। শুধু মুখটা এগিয়ে এসেছে, সে মুখে লাগাম লাগানো। কিন্তু সরল সমতল পিঠে তাজ পড়ানো নেই। লাল বা কালো। হাওড়ার ঘুঘুবেস গ্রামের মতো চুনে ডোবানো সাদা নয়। এই ঘোড়াই বিগত ত্রিশ বছর ধরে তৈরি করে যাচ্ছেন পাঁচমুড়ার কুম্ভকারেরা। অবশ্য ওখানের কেউ কেউ অন্য ধরনের ঘোড়া তৈরি করছেন, কিন্তু সেগুলি নিতান্ত তৈরি, রাসবিহারী কুম্ভকারের মতো সর্বজয়ী সৃষ্টি নয়।

খাড়া পা, চ্যাপ্টা বুক, লম্বা গলা, উর্ধ্বমুখী দুটি কান—সবই একই 'লেভেলে' তৈরি ঘোড়া, অনেক দেখা যাবে, বিষ্ণুপুর পাকা বাঁধের ধারের দোকানগুলিতে। লাল ও কালো রঙের বড় বড় টেরাকোটা ঘোড়া। কিন্তু সেই ঘোড়াগুলিতে খোদার উপর খোদ্‌কারি করা হয়েছে। 'সফিস্‌টিকেশন্' করা হয়েছে। শহরে স্পর্শ লেগেছে সেগুলিতে। সাদা তেল রঙ বাজার থেকে কিনে অভিজ্ঞ তুলিতে তাদের উপর আঁকা হয়েছে নানা ফুলকারি কাজ, নানা আলপনা। লোকেরা কেনেও সেগুলি। কিন্তু তারা বোঝে না 'অরিজিনাল' কাজ নয় সেগুলি। লোকায়ত শিল্পের ফর্ম ভাঙা হয়েছে সেখানে।

হিন্দু দেবস্থানে ঘোড়া ছাড়া হাতিও মানত হিসেবে দেওয়া হয়। এই হাতির গঠনশৈলীও বিচিত্র

বাঁকুড়ার ঘোড়া মানে শুধু পাঁচমুড়ার ঘোড়া নয়। রাজগ্রাম, মুরলু, সোনামুখী, কেয়াবতী, স্যান্দরা প্রভৃতি জায়গায় কুম্ভকার শিল্পীরা ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের ঘোড়া তৈরি করেন। কেয়াবতীর ঘোড়ার সঙ্গে রাজগ্রামের ঘোড়ার মিল নেই। রাজগ্রামের ঘোড়া অনেকটাই বাস্তব আদলের এবং সুতালংকৃত। সে ঘোড়ার মর্যাদা রাজকীয় মর্যাদা। রাজগ্রাম বাঁকুড়া শহরের বিপরীতে দ্বারকেশ্বর নদের ওপারে। কেয়াবতীর ঘোড়া লম্বা ঠ্যাং, লম্বা গলা, যেন উট হতে হতে ঘোড়া পর্যন্ত হয়ে থেমেছে। দেখলেই মনে হবে আদিম বনবাসী শিল্পীদের অকৃত্রিম গঠন নমুনা। এ ঘোড়া পাঁচমুড়ার ঘোড়ার মতো 'চাকে' বসিয়ে তৈরি নয়, হাতে গড়া, আঙুলের টিপ্‌নি দিয়ে গড়া। এ ঘোড়া পাঁচমুড়ার ঘোড়ার মতো ফাঁপাও নয়। পাঁচমুড়ার ঘোড়া গলা খুলে নেওয়া যায়, পিছনের পা পেটের কিছু অংশ পর্যন্ত খুলে নেওয়া যায়। এই তিনটি অংশে পরস্পর খিলান করে যুক্ত থাকে। কান ও ছোট লেজও খুলে রাখা যায়। রাজগ্রাম, স্যান্দরী, কেয়াবতীর ঘোড়া সে রকম নয়, একঢালা গড়ন। তবে রাজগ্রাম ও স্যান্দরার ঘোড়াও পাঁচমুড়ার মতো ফাঁপা। স্যান্দরার ঘোড়া অনেক 'স্লিম' এবং খুব সুন্দর। এ ঘোড়াও অলংকৃত। পাঁচমুড়ার ঘোড়ার গলায় খুব সামান্য অলংকার বসানো। কোনওটায় আছে কোনওটায় নেই। আর সারা জেলাজুড়ে দেবস্থানে যে অসংখ্য অজস্র 'একানে' ছোট ছোট ঘোড়া মানত হিসাবে দেওয়া আছে, সেসব ঘোড়া কাদের তৈরি ? সেসব তৈরি করেন বাঁকুড়ার নানা কুম্ভকার শিল্পী অল্প আয়াসে, দামও অল্প। এই 'একানে' ছোট ছোট ঘোড়াগুলিই প্রকৃতপক্ষে 'বাঁকুড়ার ঘোড়া'। পীরের দরগা, কবরস্থান, দেবমন্দির, 'থান' অর্থাৎ গাছের তলায় লৌকিক দেবদেবীর স্থানে এই ঘোড়া মানত করা হয়। সবই 'একানে', চাকের সাহায্য ছাড়াই আঙুলের টিপসি দিয়ে এই ঘোড়াগুলি গড়া। শস্তা। সরু ঠ্যাং, সরু গলা ও পেট এ ঘোড়ার। বিশেষ গঠনবৈশিষ্ট্যের জন্যই এগুলিও চোখে পড়ে। 'বৃদ্ধভূমি' এই বাঁকুড়ায় কেন এত ঘোড়া, কতদিন ধরে এই রীতি চলে আসছে কিছুই জানা যায় না। তবে আদিম শৈলীর যে অনুসরণ, সে কথা বলে দিতে হয় না।

হাতি। যেখানে ঘোড়া সেখানেই হাতি। এই হাতিও হিন্দুদের দেবমন্দিরে দেবস্থানে মানত হিসাবে দেওয়া হয়। পেটমোটা শুঁড়তোলা বৃহৎ হাতির অবয়ব গঠন তৈরি করেই মাটির হাতি তৈরি হয়ে আসছে বাঁকুড়ায়। বোঙা হাতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির ভিন্ন শৈলীতে তৈরি। দৃষ্টির পার্থক্য যে সচেতনভাবে এই প্রকারের হাতি তৈরি করেছে, তা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারেন দর্শক। আমরা বলেছি লোকায়ত শিল্প সাধারণত গোষ্ঠীশিল্প। অতীতকাল থেকে একই হাতি-ঘোড়া তৈরি করে চলেছেন এক এক স্থানের নমস্য শিল্পীরা। পাঁচমুড়া এই হাতির জন্যও বিখ্যাত। প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পধারা থেকেই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ঘোড়ার ঘরানা। যেমন বিগমার ঢোকরা শিল্পের ঘোড়া, কেঞ্জাকুড়ার বাঁশ চেরাতির ঘোড়া, শুশুনিয়ার বেলে পাথরের ঘোড়া, রামপুরের কাঠের ঘোড়া এবং বিষ্ণুপুরের বালুচরী সিল্ক শাড়ির ঘোড়ার কাজ। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের পথেঘাটে যেমন ছোট ছোট পাথরের উট, পাথরের গণেশ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি বাঁকুড়ায় শুধু মাটির—টেরাকোটা অর্থাৎ পোড়ামাটির। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ

পাথরের দেশ, বাংলায় শুধু মাটি। এ সবই গোষ্ঠী শিল্প, প্রথাগত এবং লোকায়ত শিল্পীমানসের উদাহরণ।

বাঘমুখ ছাইদানি ও 'ফাইটার' বুল ছাইদানি বা এমনি 'ফাইটার' বাইসন। এগুলিও দেখবার মতো এবং খুবই প্রচলিত বাঁকুড়ায়। তেজিয়ান, বলিষ্ঠ, লড়াই করতে উদ্যত অজস্র বাইসন বাঁকুড়ার নিজস্ব ঘরানায় তৈরি। বহু দর্শক সমন্বিত মাঠে ম্যাটাডোরের সঙ্গে লড়াই করা বাইসন নয়, অথবা বনচিত্রের মতো প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষদের আঁকা গুহাগাত্রের বাইসনের মতোও নয়, মাটির তৈরি দুটি বাঁকুড়ার বাইসনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হবে লড়াই করছে। পিঠটা কেটে গোল ছিদ্র করে ছাইদানি হিসাবে ব্যবহৃত সামগ্রীর ষাঁড়ও বাঁকুড়ায় প্রচুর তৈরি হয়। কাশ্মীরের তৈরি মেষের মতো অলংকৃত নয়, বা বেনারসের ছাইদানির গায়ে রকমারি কাঁচ বসিয়ে শৌখীন ছাইদানিও নয়। এই বাঁকুড়ার ছাইদানিগুলি মোটা ভারি এবং বর্ণে কালো। বাস্তবের কাছাকাছি এর স্টাইল। তিনদিকে তিনজোড়া বাঘমুখ বাটি—ছাইদানিও বাঁকুড়ায় প্রচুর পাওয়া যায়। ঢোকরাশিল্পী বিগমায় বসে পিতলের বাঘমুখ ছাইদানি ইদানীং তৈরি করে চলেছেন। দেখতে সুন্দর এবং মাটির বাঘমুখ ছাইদানী দামেও শস্তা। তাই ঘরে ঘরে, বাজারে হাটে মেলায় এই ছাইদানি বিক্রি হয়। বিড়ি-সিগারেট খাওয়া বাঙালি এগুলি কেনেও এবং সংগ্রহ করে রাখে।

নিতান্ত হতদরিদ্র এইসব শিল্পীর জীবন।* সূত্রধরদের জীবন, কুম্ভকারদের জীবন। স্যান্দরায় এক শিল্পীকে দড়ির খাটিয়ায় বসে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলতে দেখেছিলাম। ৭৪ বছরের বৃদ্ধ শিল্পী সারা জীবন মাটির ঘোড়া তৈরি করেছেন। এখন আদর নেই, কেউ কেনে না। এখন কেনে পাঁচমুড়ার ঘোড়া। এখন খুব চল্ ওই ঘোড়ার। ওই টপ্‌টপ্ করে অশ্রুপাতের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম এঁদের হাতের আঙুলে যতই যাদু থাকুক, পেটে ভাত নেই, চালে খড় নেই। বুঝেছিলাম সব শিল্পসৃষ্টির মতোই এঁদের সৃষ্টি ও দুঃখ সম্ভব, বেদনা সম্ভব। এঁরা দুঃখের সমুদ্রে ডুব দিয়ে কোনও প্রকারে বেঁচে আছেন। এঁদের শিল্পকর্মের আদর হয়, কিন্তু এঁদের আর্থিক অবস্থার সুব্যবস্থা হয় না। সৃষ্টি যিনি করেন সৃষ্টি না করে তিনি পারেন না থাকতে; চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গখের মতো। তিনি খেতে পেতেন না, ভাই থিয়ো মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাতেন, তাতে কোনও প্রকারে চলতো। সারা জীবনে একটি ছবিও তাঁর বিক্রি হয়নি। শেষ জীবনে তিনি পাগল হয়ে গেলেন এবং আত্মহত্যা করে জীবনের অবসান ঘটান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছবি কোটি কোটি ডলারে এখন বিক্রি হচ্ছে। তাই বলছিলাম শিল্পী ও শিল্পমাত্রেই বেদনাসম্ভব দুঃখসম্ভব।

পৃথিবী-লগ্ন টেরাকোটা শিল্পকলা ও আকাশলগ্ন টেরাকোটা শিল্পকলা। লোকায়ত শিল্পধারাকে এই দু ভাগেও ভাগ করা যায়। পৃথিবীলগ্ন শিল্পকলার আলোচনা এতক্ষণ করলাম। এই দু ধারার শিল্পকলাই কিন্তু পৃথিবী থেকে মাটি নিয়ে নির্মাণ। বিমূর্ত মাটি থেকে মূর্তি বার করে নেওয়া। সে প্রতিভা যাঁর থাকে তাঁরই থাকে। জোর করে শেখানো যায় না। যেমন বাঁকুড়ার চিত্রশিল্পী বিশ্বরূপ দত্ত দুর্গা বা রাবণের ছবি আঁকেন। সে অভিনব। তেমন মূর্তি আমরা মন্দিরে দেখিনি বা পুরাণের পাতাতেও নেই। সেই জন্যই তিনি বিশ্বআদৃত শিল্পী, প্রতিভাবান। পৃথিবীলগ্ন শিল্প নিদর্শনকে হাতে তুলে নিয়ে দেখা যায়।

> **জোড়বাংলো মন্দিরে আছে সাধারণ নরনারীর তালবাদ্য বাজানো ও সঙ্গীতচর্চার দৃশ্য। মনে পড়ে যায়, বিষ্ণুপুরের এককালের মার্গ সঙ্গীতের প্রখ্যাতি লক্ষ্মৌ-দিল্লির সঙ্গে তুলনীয় ছিল। মধ্যযুগের মন্দির গাত্রে, রাজাদের ও চারুকলার শিল্পীদের অভিনিবেশ সেই দিকে ছিল, তাই এত অপূর্ব সব সঙ্গীতময় দৃশ্যাবলী।**

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা যায়। ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর মনের কোণে স্থান পায়। তার তারিফের শেষ থাকে না। আর এক ধরনের লোকায়ত শিল্প আছে যা আকাশে আকাশে মাথা উঁচু করে থাকে। কখনো বা হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়, কিন্তু ঘরে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় না। এমনই বিশালত্ব। পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চয়ের সম্মিলিত বিশালত্ব। এগুলি চোখের দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকলেও দূরে বহু দূরে এদের অবস্থান। এগুলিকেই আকাশলগ্ন শিল্পকলা বলেছি। এগুলি মন্দির টেরাকোটা শিল্পবস্তু। মৃত্তিকালগ্ন পৃথিবীলগ্ন শিল্পকলা যেমন বাঁকুড়ার ঘোড়া, মনসার চালি, বারিঘট, মাটির শঙ্খ প্রভৃতি। পৃথিবীলগ্ন টেরাকোটা ও আকাশলগ্ন টেরাকোটা দু ধরনের শিল্পনিদর্শনই আমাদের আনন্দ দেয়। শিল্পের আনন্দ। শিল্পের সৌন্দর্য দেখার আনন্দ। এতক্ষণ পৃথিবীলগ্ন শিল্পকলার আলোচনা করেছি, এখন আকাশলগ্ন শিল্পকলার আলোচনা করব। মন্দির টেরাকোটা শিল্পের আলোচনা করব।

[২]

টেরাকোটা শিল্পসমাবেশের রাজ-ঐশ্বর্য দেখতে হলে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি আগে দেখতে হবে। বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের রাজধানী City of art। বিষ্ণুপুরের নানাবিধ বিচিত্র সৌন্দর্যের নিদর্শনের মধ্যে টেরাকোটা ঐশ্বর্যে এবং মধ্যযুগীয় প্রদীপ্তিতে শ্রেষ্ঠ। বাঁকুড়া জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আগে দেখে নেওয়ার কথা বলেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার। সকালের কমনীয় রৌদ্রে, দুপুরের উজ্জ্বলতায়। গোধূলির মেঘমেদুর আলোকে, জ্যোৎস্নাপ্লুত রজনীর মায়াময় চন্দনবর্ণ আলোতে দেখতে হবে। জোড়বাংলো মন্দিরের স্থাপত্য সৌন্দর্য ও টেরাকোটার সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার, মিলেমিশে অনবদ্য মহাকাব্য রচনা করেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আলোতে তাই দ্রষ্টব্য। তাজমহল যেমন দেখতে হয় বিভিন্ন সময়ে, দিনের রৌদ্রকরোজ্জ্বলতায়, তেমনি দেখতে হয় কোজাগরি পূর্ণিমার নির্মল চন্দ্রিমাবিধৌত আলোকধারায়। বাঁকুড়ার 'তাজমহল' জোড়বাংলা মন্দির। কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল নয়, বর্ণরক্তিম। বর্ণরক্তিমার বিচ্ছুরিত বিভা যে দেখতে জানে সেই দেখতে পায়।

---

* পৃঃ ৭২, বাঁকুড়ার মন্দির, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌষ ১৩৭১।

[বলাকা কাব্যের ৭ নং কবিতাটি (একথা জানিতে তুমি) তাজমহল দেখে রবীন্দ্রনাথ লেখেননি। তাজমহল দেখে যে কবিতা রচনা করেন সেটিও ওই বলাকা কাব্যেই আছে। সেটি কেউ পড়ে না। ৯নং কবিতা। দ্বিতীয় কবিতাটিতে বলেছেন 'পাষাণ সুন্দরী', বলেছেন 'অমর পাষাণ'। প্রথম কবিতাটিতে লিখলেন—'একবিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল/এ তাজমহল'। তাজমহল কি 'এক বিন্দু' নয়নের জলের মতো ক্ষুদ্র ? তাজমহল প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে বিশাল সুউচ্চ মহান।] শাজাহানের মতোই রাজা রঘুনাথ মল্লদেবের সময় নির্মিত পাঁচ চূড়া অর্থাৎ শ্যাম রায় মন্দির ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে আর জোড়বাংলা অর্থাৎ কালাচাঁদের মন্দির নির্মিত হয় ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে। মন্দির নির্মাণ করে গর্ভগৃহে দেবমূর্তি স্থাপন করেই রাজারা ক্ষান্ত হননি। মন্দির গাত্র অপূর্ব অজস্র টেরাকোটা মূর্তিশিল্পে, ফুলকারি কাজে ও নকশায় সাজিয়েছেন। টেরাকোটার এমন বিপুল সমাবেশ অন্যত্র দেখা যায় না। আমরা অম্বিকা কালনার মন্দির, আঁটপুরের মন্দির, আরামবাগ-পারুলের মন্দির, মহানাদের মন্দির, গুপ্তিপাড়ার মন্দিরশ্রেণী দেখেছি। কিন্তু এমন রাজ ঐশ্বর্যের সঙ্গে তারা তুলনীয় নয়।

জোড়বাংলা মন্দিরের চেয়ে শ্যাম রায় মন্দির মাত্র ১০ বছরের পুরনো হলেও বর্ণগরিমায় ও উজ্জ্বলতায় জোড়বাংলার পাশে দাঁড়াতে পারে না। শ্যাম রায় মন্দিরের টেরাকোটা সজ্জা কালচে ধূসর হয়ে

বিষ্ণুপুরে মন্দিরের টেরাকোটা স্থাপত্য নিদর্শন

গেছে। অথচ পাশাপাশি অবস্থিত এই দুটি মন্দির একইভাবে সাড়ে তিনশো বছর ধরে ঝড় জল শিলাবৃষ্টি এবং রৌদ্র সহ্য করেও অটুট আছে। যেমন প্রায় অটুট আছে এক হাজার বছরের পুরনো বহুলাড়া মন্দিরের টেরাকোটার কাজ। শ্যাম রায় মন্দিরের টেরাকোটার কাজ সূক্ষ্ম, নিপুণতায় অভিজ্ঞ। জোড়বাংলা মন্দিরের টেরাকোটার কাজ তুলনায় একটু বড় সাইজের। মাটির প্লেটে মূর্তি গড়ে নিয়ে পোয়ানে পুড়িয়ে মন্দির গাত্রে লগ্ন করে দেওয়া হয়েছে। কত দীর্ঘ ধৈর্যে অভ্যস্ত নিপুণতায় একাধিক শিল্পী যে এইসব কাজ করেছেন তা ভেবে দেখবার বিষয়। পুরী কোনার্কের পাথরের বৃহৎ ছন্দিত মূর্তি এখানে দেখা যাবে না বা দিলওয়ারা মন্দিরগুলির প্রস্তরমূর্তি ও অলংকরণের নিদর্শন এখানে হয়তো নেই, কিন্তু রাঢ় বাংলার শিল্পী মাটি পুড়িয়ে যে শিল্পবস্তু নির্মাণ করেছেন তার আয়ুও সাড়ে তিনশো বছর হয়ে গেল। রাঢ় বাংলায় তথা সমগ্র বঙ্গদেশে মূর্তি গড়ার পাথর পাওয়া যায় না। তাতে কি হয়েছে ? মাটি তো আছে। মাটি পুড়িয়ে মূর্তি ও জাফরি নির্মাণের প্রচণ্ড আবেগ ও নৈপুণ্য যেভাবে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে তা আবিশ্বের গুণিজনের প্রশংসার বিষয়। গোষ্ঠী শিল্প হলেও তাঁদের শিল্পীমানস সবদেশে সর্বকালে প্রশংসনীয়। মানুষের অর্থ হলে, মানুষ ধনী হলে, এ যুগে বড় বাড়ি করে, গাড়ি কেনে। কিন্তু মল্লরাজারা মন্দির বানিয়েছেন। সবই বিষ্ণুমন্দির। তাঁরা প্রথমের দিকে শাক্ত ছিলেন কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরের নাম হয় 'গুপ্তবৃন্দাবন'। রাজাদের বসতবাটি কবেই কালের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেছে, কিন্তু মন্দিরগুলি প্রায় অটুট আছে। কোন্ পুণ্যফলে ? শিল্পের আয়ু, টেরাকোটা শিল্পের আয়ু তাদের দীর্ঘজীবন দিয়েছে।

শ্যাম রায় মন্দিরের টেরাকোটা অলংকরণের মধ্যে প্রথমেই নজরে পড়বে আনন্দদৃশ্য-আনন্দ-নিকুঞ্জ দৃশ্য ও প্রেম-মিলনের দৃশ্য। অসংখ্য মূর্তি সারিতে সাজানো ওই মন্দিরের সম্মুখভাগে রাধার মুখ তুলে ধরে দেখছেন কৃষ্ণ, এই দৃশ্য দৃষ্টি কেড়ে নেবে। শুধু রাধাকৃষ্ণ নয়, ললিতা সখীও আছেন। তিনটি মূর্তির ঘন সমাবেশে। কোথাও মুখ তুলে দেখছেন, কোথাও চুম্বন করছেন, আলিঙ্গন করছেন। হাস্যসুন্দর, বিকশিত হাস্যের রেখাও ফুটে উঠেছে কোনও কোনও মুখে। আর গর্ভগৃহে আছে বৃহৎ 'রাসমণ্ডল'। চক্র সুবৃহৎ। হাতে হাত ধরে উদ্দাম গোপিনীদের ত্রিভঙ্গ মূর্তির সারি বৃত্তাকারে পরপর সাজানো। মনে হবে তাদের নাচ শুধু দেখছি নয়, তাদের সংগীত, নৃত্যবাদ্যের শব্দও শোনা যাচ্ছে। দেখে দেখে মনে হয়, 'আয় সখি সবে মিলি/হাতে হাতে ধরি ধরি/নাচিবি ঘিরি ঘিরি/গাহিবে গান'। এ গান লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ কি রাসমণ্ডলচক্র দেখেছিলেন ? মাঝখানে ছোট গোল বৃত্তের মধ্যে আছেন কৃষ্ণ, বাঁশি বাজাচ্ছেন এবং তাঁর দুপাশে রাধিকা ও ললিতা। কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ। আর সবাই আনন্দিত নারী। মন্দিরের বহির্গাত্রেও রাসমণ্ডলের অনবদ্য শিল্প কারুকৃতি চোখে পড়বে। এই রকম দুটি ছোট রাসমণ্ডল ভাস্কর্য আছে আঁটপুরের মন্দিরগাত্রে। সেগুলি তুলনায় নিতান্তই ছোট। বৃক্ষতলে কৃষ্ণ, বংশীবাদনরত। শ্রীকৃষ্ণের একক মূর্তিও অনেক আছে। এক সময় লিখেছিলাম—'শ্যাম রায় মন্দিরের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মূর্তি ও কারুকলার সমাবেশ যেন লক্ষ কোটি তরঙ্গভঙ্গিম কারুকার্যময় সমুদ্র'। একথা যে কতখানি সত্য তা ভাল করে না দেখলে বোঝা যায় না। মন্দিরের বহির্গাত্রে

লোকায়ত শিল্প সাধারণত গোষ্ঠীশিল্প। অতীতকাল থেকে একই হাতি- ঘোড়া তৈরি করে চলেছেন এক এক স্থানের নমস্য শিল্পীরা। পাঁচমুড়া এই হাতির জন্যও বিখ্যাত। প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পধারা থেকেই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ঘোড়ার ঘরানা। যেমন বিগমার ঢোকরা শিল্পের ঘোড়া, কেঞ্জাকুড়ার বাঁশ চেরাতির ঘোড়া, শুশুনিয়ার বেলে পাথরের ঘোড়া, রামপুরের কাঠের ঘোড়া এবং বিষ্ণুপুরের বালুচরী সিল্ক শাড়ির ঘোড়ার কাজ। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের পথেঘাটে যেমন ছোট ছোট পাথরের উট, পাথরের গণেশ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি বাঁকুড়ায় শুধু মাটির— টেরাকোটা অর্থাৎ পোড়ামাটির।

স্তম্ভমালায়, অলিন্দে, গর্ভগৃহে, চারটি চূড়ায়—তার ভিতরে ও বাইরে, সর্বত্র মূর্তি সমাবেশ। মূর্তি প্যানেল ও অলংকরণ সমাবেশ।

জোড়বাংলা মন্দিরে আছে সাধারণ নরনারীর তালবাদ্য বাজানো ও সঙ্গীতচর্চার দৃশ্য। মনে পড়ে যায়, বিষ্ণুপুরের এককালের মার্গ সঙ্গীতের প্রখ্যাতি লক্ষ্ণৌ-দিল্লির সঙ্গে তুলনীয় ছিল। মধ্যযুগের মন্দির গাত্রে, রাজাদের ও চারুকলার শিল্পীদের অভিনিবেশ সেই দিকে ছিল, তাই এত অপূর্ব সব সঙ্গীতময় দৃশ্যাবলী।

বৈষ্ণবদের মন্দির মাধুর্য রসের মন্দির, তবুও আছে যুদ্ধ দৃশ্য। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুদ্ধ দৃশ্য। পাঁচচূড়া শ্যাম রায় ও একচূড়া জোড়বাংলা উভয় মন্দিরে। জোড়বাংলায় বাস্তব যুদ্ধ দৃশ্যের আধিক্য। নিকট-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিয়ে শিল্পী গড়েছেন নতুন নতুন বিষয়ের মূর্তি। হার্মাদ দস্যুদের নৌ-অভিযান, বন্দুক হাতে সিপাহি, উদ্যত বন্দুক, অস্ত্র হাতে দ্বাররক্ষী বা প্রহরী। তুলনায় রামায়ণ ও ভাগবতের কাহিনীকথা অবলম্বনে যুদ্ধ দৃশ্যই চোখে পড়ে বেশি, উভয় মন্দিরে। তার মধ্যে প্রধান রাম-রাবণের যুদ্ধ ও রাক্ষস সৈন্য এবং বানর সৈন্যের মুখোমুখি যুদ্ধ। দশমুখ রাবণের যুদ্ধ রাম-লক্ষণের সঙ্গে। গড়ুর পাখির সঙ্গে যুদ্ধ। ঘোড়ার ও হাতির পিঠে যুদ্ধবাজ সৈন্য। বাঁকুড়ার রকমারি ঘোড়া মন্দিরগাত্রেও আছে। তবে গুপ্তিপাড়ায় রামচন্দ্র মন্দিরের প্রায় সারা গাত্রে যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য ছড়ানো ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর মূর্তি সমাবেশে, ততখানি না হলেও, এই সব যুদ্ধ দৃশ্যের চোখে পড়ার মতো প্রাচুর্য নিয়ে মন্দির দুটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। মহাভারতের কাহিনী চিত্রাংশে প্রায় নেই বললেই চলে, অবশ্য ভীষ্মের শরশয্যার দৃশ্য চোখে পড়ে। মন্দিরগাত্রে এবং বাঁকুড়ার লোক সাহিত্যে, রাবণ-কাটা দুর্গাপূজায়, রাসযাত্রায়, ভাদুটুসু গানে, গিন্নি পালন উৎসবের গানে, সাঁওতালি লোকগীতিতে, রাম কথকতায় কেন এত রামকে স্মরণ ? ভাগবতের দৃশ্য কথার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ ললিতা তো আছেনই, তার সঙ্গে কৃষ্ণের বাল্যকৈশোর জীবনের কাহিনীদৃশ্যও সংযুক্ত হয়েছে। বকাসুর বধ, পুতনা বধ, গোবর্ধন ধারণ, ননীচুরি, নৌকাবিলাস, কৃষ্ণকর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, কদম্বতলে কৃষ্ণের বাঁশি বাজানো, কালীয়দমন প্রভৃতি দৃশ্য। তারই সঙ্গে আছে কংসবধ। স্বাভাবিক যুদ্ধ দৃশ্যের মধ্যে মল্লযুদ্ধও দেখা যায়। আর আছে সামান্য মৈথুন দৃশ্য। এই দিক থেকে মল্লরাজাদের ও মৃৎশিল্পীদের সংযম প্রশংসনীয়। অসভ্য নারী-পুরুষের রতিকলার দৃশ্যের নোংরামি থেকে এই মন্দিরগুলি মুক্ত। বৈষ্ণব মন্দির বলেই বোধ হয় ! কোনার্ক পুরীর সংবলিত দৃশ্যের মতো প্রাচুর্য চোখকে পীড়া দেয় না, ওইসব মন্দিরের প্রণয়কলার দৃশ্যাবলী। 'নরনারীকুঞ্জর' বা 'নবগোপীকুঞ্জ'র চিত্রের অপূর্ব নির্মাণও এই মন্দিরগাত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নজন গোপীনী বিভিন্নভাবে শুয়েবসে একটি হাতি সৃষ্টি করেছেন আর তার উপর আরাম করে বসে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন। ধন্যবাদ কৃষ্ণকে। এইসব দৃশ্য যতখানি জোড়বাংলা মন্দিরে অলংকৃত হয়ে এসেছে, ততখানি দর্শনীয় হয়ে ওঠেনি শ্যাম রায় মন্দিরে।

তারপর দেখার, সামাজিক দৃশ্যাবলী ও পশুপক্ষীর দৃশ্যসমূহ। এইসব ঘটনাদৃশ্য দেখে বোঝা যায়, শিল্পীদের মন শুধু অলৌকিকতায় বিধৃত ছিল না, দেবরসে মজ্জিত ছিল না। তাঁরা পারিপার্শ্বিক মানবজীবনের খুঁটিনাটি ঘরোয়া দৃশ্যাবলীর দিকেও তাকিয়েছেন। তাঁরা যে জীবনযাপন করতেন সেই বাস্তব জীবনের দিকেও তাকিয়েছেন পরম মমতায়। এক সময় এই সব পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক ঘটনাদৃশ্য, টেরাকোটা শিল্পের বহুলতার মধ্যে দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, এদের সঙ্গে ধরে ধরে বিষয় ও বস্তু অনুযায়ী মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে পদ্যবদ্ধ বর্ণনাগুলির তুলনা করি। সে আর হয়নি।

সামাজিক দৃশ্য যেমন—মাছ নিয়ে বিক্রি করছে জেলের মেয়ে, মেয়েরা বসে ভাগবত পাঠ শুনছে, সিঁদুর পরাচ্ছে এক নারী অন্য নারীর সিঁথিতে, এক রমণী অন্য রমণীর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, আয়েসী পুরুষ শুয়ে আছে আর এক নারী তার পা টিপে দিচ্ছে, ভুঁড়িওয়ালা পুরুষ হুঁকো টানছে, দলমর্দন কামান দাগছে, অস্থলে (সরাইখানাকে তৎকালে অস্থল বলা হতো)। সাধুবাবাজি বসে আছেন, পদ্মাসনে বসে আছেন সাধু, তাঁর সামনে ভক্তবৃন্দ বসে আছে, আগুন পোহাচ্ছে নারীরা, নারী পরিবেষণ করছে, পুরুষ ভোজন করছে, সপুত্র নারীকে আশীর্বাদ করছেন সাধুবাবাজি। নৌকাযাত্রার প্যানেল অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এছাড়াও আছে শাক্ত বিষয়ক দৃশ্যাবলী। দশাবতার প্রভৃতি ভগবানের রুদ্র মূর্তির প্যানেলও আছে মন্দির-প্রবেশের দ্বারের তিনদিকে—উঠেছে মাথার উপরে ও দুটি দিকে। কালী ও দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি শাক্ত মূর্তির দৃশ্য বৈষ্ণব মন্দিরে সংযোজিত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, শিল্পীরা ছিলেন মুক্তমনা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাঁদের ছিল না। লোকসাহিত্যের যে সাধারণ ধর্ম লোকশিল্পকলা টেরাকোটা অলংকরণেও সেই উদার ধর্ম-মানসিকতার প্রকাশ।

পশুপাখির বহুল দৃশ্যও মন্দিরগাত্র অলংকৃত করেছে। ঘোড়া হাতি তো আছেই। রকমারি যুদ্ধের ঘোড়া ছাড়াও সুদৃশ্য ঘোড়ার বহুলতা। হাতিরা পিঠে সওয়ার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধে সহায়ক হাতি। জোড়বাংলা ও শ্যাম রায় উভয় মন্দিরেই এদের প্রাচুর্য। দুটি ময়ূরের
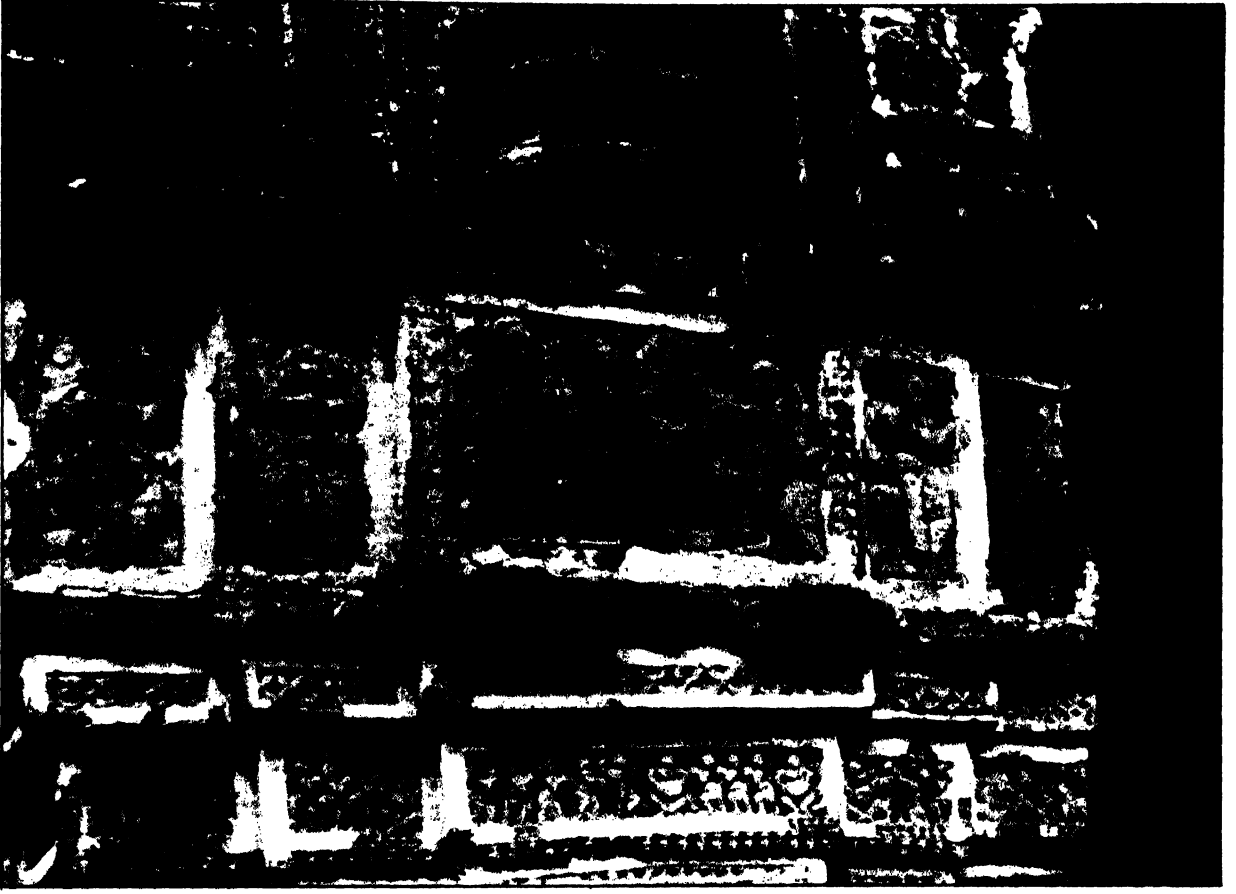
বিষ্ণুপুরে মন্দিরের টেরাকোটা সৌন্দর্য

মুখোমুখি দৃশ্যও অপূর্ব। সাপ আছে, আছে হংসলতা। মৃত্যুলতা মন্দিরের রাঢ় অঞ্চলে পা-ভাগে। পশু শিকার করছে ব্যাঘ্র, মানুষকে কামড়ে ধরেছে ব্যাঘ্র। গাড়ি টানছে গোরু। হরিণ ও গোরুর পাল ছুটে যাচ্ছে। যা বনভূমি বাঁকুড়ার ও গোচারণ ভূমি বাঁকুড়ার সাধারণ দৃশ্য। আজও দেখা যায়। বাগালরা মাঠে গোবুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জ্যামিতিক নকশা, জাফরি, ফুলকারি কাজ—ফোটা ফুল ও ফুলকুঁড়ি, কল্পলতাপাতা প্রভৃতি অলংকরণ প্রাচুর্য মুগ্ধ করে দর্শককে। বিশেষ করে মন্দিরের স্তম্ভগুলিতে, খিলানে, অর্ধস্তম্ভে এই টেরাকোটা শিল্পকাজ এতই মনোরম ও বহুল যে মনে হয় যেন জড়োয়া গহনা পরে দাঁড়িয়ে বা বসে আছেন জমিদারগিন্নি। কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখেননি শিল্পী।

টেরাকোটা মন্দির ভাস্কর্য মূর্তিগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য মূর্তিগুলির বিভঙ্গ রূপ। জৈন তীর্থংকরদের মতো আজানুলম্বিত বাহুর স্থির দণ্ডায়মান মূর্তি নয়। সংকীর্তন বাদ্যের আসরে এবং সাধারণ সামাজিক মূর্তিতে ওই ধরনের বিভঙ্গ মূর্তি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বাঁকুড়ার স্মরণীয় মানুষ যামিনী রায়ের বৈষ্ণব চিত্রাবলীতে ওই ধরনের বিভঙ্গ মূর্তির পুনরাবির্ভাব মন্দির টেরাকোটার প্রভাব বলেই মনে হয়। ত্রিভঙ্গ মুরারি কৃষ্ণের অঙ্গছন্দ কি এই ভাবেই জয়ী হয়েছে ? আর লক্ষণীয় বা রিলিফের কাজ। টেরাকোটা ভাস্কর্যগুলি ত্রিমাত্রিক নয় দ্বিমাত্রিক। ভাস্কর্যগুলির পশ্চাদভাগ দেখা যায় না।

সোনামুখীর পঁচিশ চূড়া মন্দির ও বহুলাড়ার রেখদেউল একচূড়া মন্দির এবং জোড়বাংলা ও পাঁচচূড়া মন্দিরের টেরাকোটাগুলি ভাল করে দেখলেই বাঁকুড়ার মন্দির টেরাকোটা শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হবে। বাঁকুড়া, রাজগ্রাম, কি অযোধ্যার মন্দিরগুলির সুন্দর, কিন্তু তাদের টেরাকোটা সজ্জা গতানুগতিক। সামাজিক দৃশ্যে কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দৃশ্যগুলি প্রায় একই রকম। মন্দিরশৈলীও তেমন বিশাল নয়। পাথরের চূড়া মন্দির এবং রেখদেউল যা আছে তার কারুকাজ সামান্য—যা আমাদের আলোচ্য বিষয় পরিধির মধ্যে পড়ে না।

পঁচিশ চূড়া মন্দিরের চূড়াগুলি বিন্যস্ত এলোমেলো ও বাহুল্য মনে হলেও এর টেরাকোটার কাজগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবেশ পথ ও স্তম্ভ অলিন্দ সমন্বিত এ মন্দিরের সম্মুখ ভাগ যতখানি না মূর্তিময় তার থেকে অনেক বেশি দর্শনীয় মূর্তিশ্রেণী পাশের দেওয়ালে। পশ্চাৎ দেওয়ালে একটি শিলালিপি আছে। এর পাশের দেওয়ালটিই এখন সম্মুখের দেওয়াল। সেখানে মূর্তিশ্রেণীর অপূর্ব সমারোহ। ও সি গাঙ্গুলি তাঁর Indian Terracotta Art গ্রন্থে এই মন্দিরের শিল্পকলার ছবি যোগ করেছেন এবং সপ্রশংস বর্ণনা করেছেন এর কলাচারুত্বের। সুখারিয়ার আনন্দ ভৈরবাণীর মন্দির বা অম্বিকা কালনার কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ও লালজির বা আঁটপুরের মন্দির বা দুটির টেরাকোটা সৌন্দর্যের সঙ্গে কিছু অংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ওই মন্দিরের টেরাকোটা

রাধাবল্লভ মন্দির, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ, পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া, ছবি : দেবচন্দন চৌধুরী

সজ্জার। শ্রীধর মন্দিরে মৃত্যুলতা আছে এবং যা অভিনব তা হচ্ছে মুখের মুখর উপস্থিতি ঘটেছে মন্দিরটিতে। 'মুখলতা' বিন্যাসও বলা যায়। খিলান অংশে উপরিভাগে দুটি টিয়াপাখির মূর্তি এতই জীবন্ত যে তাড়া দিলে মনে হয় এখনই উড়ে যাবে আকাশে। শ্রীধর মন্দিরটি অর্বাচীন কালে ১২৫২ বঙ্গাব্দে নির্মিত। প্রতিষ্ঠাতা কানাই রুদ্রদাস ও মৃৎশিল্পী হরি সূত্রধরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অন্যভাবেও ধরা পড়ে। রাম-রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য এই মন্দিরে তেমন নেই। তেমন নেই রাক্ষস ও বানর সৈন্যের মুখোমুখি যুদ্ধদৃশ্য। যদিও আছে গুহক চণ্ডাল নদী পার করে দিচ্ছে রাম, সীতা, লক্ষ্মণকে। আছে হনুমান, দশমুণ্ড রাবণ। তা ছাড়াও আছে অনেক মূর্তি। বল্কলবসন পরিহিত ত্রিমুণি, অনন্তশয়ান বিষ্ণু, তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা, গড়ুর বাহন বিষ্ণু, কার্তিক জননী দুর্গার সঙ্গে মহাদেব, কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ, ত্রিমুণ্ড ব্রহ্মা প্রভৃতি মূর্তিশ্রেণী। আর আছে চিরাচরিত খেটিক, দশাবতার মূর্তি সমাবেশ, আলাদা আলাদা প্লেটে। ১/১ টালি সাজিয়ে যেমন মূর্তি সমাবেশ ঘটিয়েছেন শিল্পী, তেমনি ১০/১২ ইঞ্চি দীর্ঘ মূর্তিও অনেক আছে। এখানে যুদ্ধদৃশ্য তেমন না থাকলেও অনেকগুলি সিপাহি মূর্তি, সৈনিক মূর্তিও অনেক আছে। আধুনিককালে নির্মিত বলে মূর্তিমালায় আধুনিকতার ছাপ।

বহুলাড়ার মন্দিরটি অনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত। এত প্রাচীন ইঁটের মন্দির বাঁকুড়ায় আর নেই। সোনাতোপলের মন্দিরের জীর্ণ ভগ্ন অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে, সাম্প্রতিককালে কিছু সরল সংস্কার হয়েছে। বহুলাড়া মন্দিরটি রেখদেউল শ্রেণীর নাগরশৈলীর মন্দির। সত্যিই রেখদেউল, রথপগ ছাড়াও বহু রেখা উর্ধ্বে অর্ধে লম্বভাবে সাজানো এবং অজস্র কার্নিস সমন্বিত। মোটা রেখাগুলির জন্য অপূর্ব গড়ন পেয়েছে এই সুউচ্চ মন্দিরটি। মাথাটা ভেঙে গেছে। আমলক কলস নেই, কিন্তু ত্রিশূল আছে, সাম্প্রতিক কালে প্রোথিত। রেখা তৈরি করা মাটির মন্দিরে সহজ ছিল, কিন্তু রেখাগুলির বিন্যাস এক অবাক করা চারুত্ব দিয়েছে। রেখাগুলি কিন্তু সাড়া রেখা নয়, অলংকৃত নক্সা করা। মন্দিরটি সাতটি ভাগে বিভক্ত, কারুকার্যও কার্নিসে। অপূর্ব ফুলমালায় সজ্জিত, মাঝে মাঝে কিছু পরী বা উড়ন্ত যক্ষ-যক্ষী মূর্তি। গাত্রে কয়েকটি কুলুঙ্গিতে বৃহৎ টেরাকোটা মূর্তির সমাবেশ ঘটেছে। আর আছে ওই দেবালয়টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুকৃতি। কারুকার্যের বহুলতায় মনে হয় সফেন সমুদ্র তরঙ্গের সংহত মূর্তি ধারণ করে আছে মন্দিরটি। ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূর্তি বিন্যাস হয়নি মন্দিরটিতে। এটি জৈন মন্দির, নাকি বৌদ্ধ মন্দির ? ! এখন অবশ্য সিদ্ধেশ্বর শিব পূজিত হয়ে এটি শিবমন্দিররূপে বহু খ্যাত।

[৩]

বাঁকুড়ার মন্দির টেরাকোটা শিল্প-সৌন্দর্যের সামান্য বর্ণনা আমরা করলাম। সৌন্দর্য চোখে দেখার। সে সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মনে হয়েছে রূপে রূপে রূপময় এসব মন্দির যা দেখে দেখে 'নয়ন না তিরপিত ভেল'। কিন্তু 'গুণে মন ভোর ?' আমার এই অক্ষম বর্ণনায় তার কতটুকু আভাস ধরে তুলতে পেরেছি ? 'গুণে মন ভোর'— ব্যাপারটি মনের, মননের বিষয়। মন্দিরের গর্ভগৃহের পূজ্য দেবতাকে হয়তো প্রণাম নিবেদন করতে ভুলে গেছি, মন্দিরগাত্রের সম্মিলিত অতুল সৌন্দর্যের দেবতাকে বারবার প্রণাম নিবেদন করেছি। আজও করি মনে মনে।

সহায়ক গ্রন্থ ও ব্যক্তি

'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা' ও 'শিল্পরূপময় বাঁকুড়া'—এই প্রবন্ধ লেখকের পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ, যার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই লেখকের প্রবন্ধ যা ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, বিষয় ছিল বঙ্গের নানা স্থানের মন্দির টেরাকোটা সৌন্দর্য, সেগুলি থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তরুণ গবেষক ও বাঁকুড়া বিষয়ে অভিজ্ঞ সুশান্ত কবিরাজের সঙ্গে কথা বলে উপকৃত হয়েছি।

লেখক : বিশিষ্ট গবেষক, গ্রন্থকার ও প্রাবন্ধিক

বাঁকুড়ার চারু ও কারুশিল্পচর্চা

উৎপল চক্রবর্তী

পটচিত্র দেখেই, কথিত আছে, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় অনুপ্রাণিত হন। তাঁর গ্রাম বেলিয়াতোড়ের পটশিল্পীদের সহজ-সুন্দর জোরালো রেখা, উজ্জ্বল মাটির রং এবং বিচিত্র জনজীবনের ছন্দ, পুরাণ-রূপকথা আর লৌকিক, অলৌকিক বিশ্বাসের, সংস্কারের রূপারোপ তাঁকে ইউরোপীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির জটিলতা থেকে দেশজ স্পষ্ট সুবোধ্য ভাষায় চিত্ররচনায় উদ্বুদ্ধ করে।
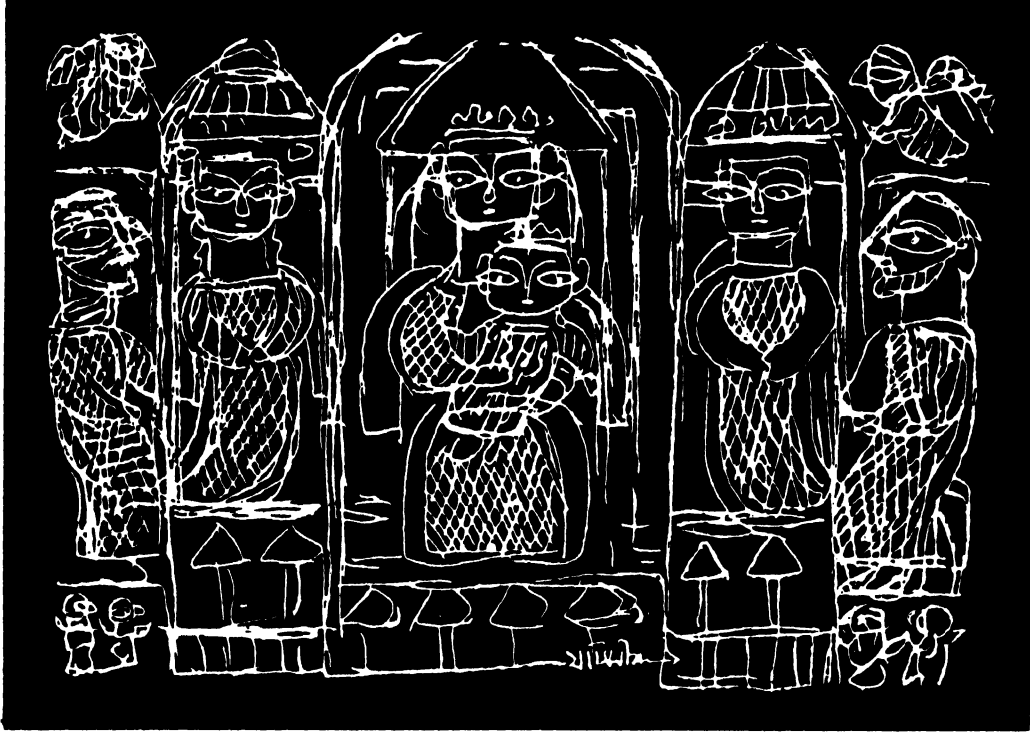
প্যাটার্নধর্মী রূপকল্পের মাধ্যমে যামিনী রায়ের ছবির বিষয়ভাবনা পৌঁছে যায় দর্শকমনে

'মন্দির গান ঘোড়া
এই তিন নিয়ে বাঁকুড়া'

যদি এমন একটি আধুনিক ছড়া কেউ লেখেন তবে ছড়ার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হয়তো তেমন ফুটবে না। কিন্তু নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত হবে বাঁকুড়ার সৌন্দর্য বিষয়ক তিনটি সত্য।

এক ◻ বাঁকুড়ার যে খ্যাতি আজ ভারতব্যাপী তার কারণ বিষ্ণুপুরের অসংখ্য মন্দির এবং অনুপম মন্দির ভাস্কর্য, টেরাকোটার অপরূপ অলংকরণ।

দুই ◻ বিষ্ণুপুরেরই মল্লরাজ-আমলে উদ্ভূত মার্গসঙ্গীতের বিশেষ রীতি 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' নামে যা পরিচিত। এবং পাশাপাশি জেলা জুড়ে লোকগানের বিচিত্র সহজ সুন্দর সুর। এবং—

তিন ◻ অতি অবশ্যই পোড়ামাটির উন্নতগ্রীবা ঘোড়া যা অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো আজ বিশ্বপরিক্রমারত।

এই তিনটি সত্যের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি আজও অম্লান। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিষ্ণুপুর ঘরানার চর্চা ঈষৎ স্তিমিত। অপরপক্ষে লোকগানের চর্চার ব্যাপ্তি এখন সুদূরগামী। প্রাণময়তায় শ্রবণমনোহর।

কিন্তু বাঁকুড়ায় এই সৌন্দর্য-এষণার কি শুরু মধ্যযুগে? মল্লরাজাদের আমলে? ইতিহাস-জিজ্ঞাসু মনের সামনে পাথুরে প্রমাণ রেখে জানায়, না, প্রাগৈতিহাসিক কালেই উন্মেষ ঘটেছে এই সৌন্দর্য চেতনার। জেলার পশ্চিম প্রান্তে শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকা থেকে পাওয়া গেছে অসংখ্য পাথরে তৈরি হাতিয়ার। পর্বতগুহায় খোদিত আছে এক লিপি যা বাংলার আদি শিলালেখের অন্যতম। এবং সেই শিলালিপিতে আঁকা আছে একটি চক্র যার শিল্পসুষমায় মুগ্ধ হতে হয়।

অনুমান করা চলে, বোধহয় বিশ্বাসও করা যায়, ওই প্রাগৈতিহাসিক পাথুরে হাতিয়ার বা পরবর্তী সময়ের শিলাপটের লেখায় স্থানীয় মানুষের সৌন্দর্যবোধই উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী যে বিস্তৃত অঞ্চল রাঢ়ভূমি হিসেবে পরিচিত তার কেন্দ্রস্থলে বাঁকুড়া। আদি থেকে আজ অবধি এখানে সময়ের স্রোতে মিলিত হয়েছে অনার্য ও আর্য সভ্যতা, জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু এবং অংশত মুঘল সংস্কৃতির ধারা, যার উর্বর পলিতে জন্ম নিয়েছে মন্দির ভাস্কর্য, ধর্মীয় ও লৌকিক জীবনচর্যা। এরই সঙ্গে একদিকে লালমাটিতে ঢাকা উপল-বন্ধুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অন্যদিকে শাল-মহুয়ার ছায়ার মায়া। আপাতরুক্ষতার পাশাপাশি পাথর-ভেজানো ঝরনার অবিরল ধারা। উদাসবৈরাগ্য আর শ্রমকঠিন জীবনসংগ্রাম। এক অত্যাশ্চর্য যুগলবন্দী। এ সবই প্রতিবিম্বিত হয়েছে এ জেলার সৌন্দর্য চেতনায়। পাথুরে আয়ুধ আর চিত্রিত পটে তারই অভিব্যক্তি। কারুকাজ আর চারুকলায় এই ললিত-কঠোর, দ্বন্দ্ব-মধুর চরিত্রই বাঁকুড়ার সৌন্দর্যচর্চার বিশিষ্টতা।

চারুকলাচর্চা

শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায় চন্দ্রবর্মণের শিলালিপিতে যে চক্র খোদিত আছে যদি তাকেই বাঁকুড়ার আদি চিত্রচর্চার প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হয়, এবং সেই তক্ষণ-শিল্পী বাঁকুড়াবাসী ছিলেন এমন অনুমিত হয়, তাহলে, লেখা চলে, আদি মধ্যযুগেই এ জেলায় চিত্রকলার চর্চার সূত্রপাত। আপশোস জাগে, আলতামিরার মতো

গুহাচিত্র কেন আঁকলেন না প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা যাঁরা বাস করতেন ওই শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকাতেই।

বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সংরক্ষিত সংখ্যাধিক পুঁথির অলংকরণ এবং অসংখ্য পাটাচিত্র জেলার চারুকলা চর্চার অন্যতম উদাহরণ। এ সবই পালযুগের বলে অনুমান। হয়তো সে সময় থেকেই এ জেলায় পটের ছবি আঁকারও শুরু। সে ধারা এখন বিষ্ণুপুরে অব্যাহত, যদিও শিল্পীর সংখ্যা সীমিত। জেলার অন্যান্য গ্রামে, যেমন ছাতনা, নওয়াডিহি, কালাপাহাড়ি, মধুবন, হিড়বাঁধ, গড়মানা এবং বেলিয়াতোড়ে একসময় পটের ছবি আঁকা হত ব্যাপকভাবেই। আদিবাসী সমাজেও ছিল পটের চলন। এবং এই পটচিত্র দেখেই, কথিত আছে, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় অনুপ্রাণিত হন। তাঁর গ্রাম বেলিয়াতোড়ের পটশিল্পীদের সহজ সুন্দর জোরালো রেখা, উজ্জ্বল মাটির রং এবং বিচিত্র জনজীবনের ছন্দ, পুরাণ রূপকথা আর লৌকিক, অলৌকিক বিশ্বাসের, সংস্কারের রূপারোপ তাঁকে ইউরোপীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির জটিলতা থেকে দেশজ স্পষ্ট সুবোধ্য ভাষায় চিত্র রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। এ ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুর মন্দির টেরাকোটাও প্রভাব বিস্তার করে অবয়ব গঠনে। লিখেছেন যামিনী রায়, "...পালিশ হলো (ইউরোপীয় আঙ্গিক) কিন্তু প্রাণটা প্রায় চাপা পড়ল। সভ্যতার বিড়ম্বনায় শিল্প হাঁপিয়ে উঠল। আজকের শিল্পীরা তাই অভিযান শুরু করেছেন এই রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে। পালিশ ছাড়ো, প্রাণের দিকে নজর দাও'...এই প্রাণময় শিল্পের সাধক, বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরানার শিল্পী যামিনী রায় বেলিয়াতোড়ের পটভূমি ভোলেননি। বিষ্ণু দে লিখছেন, "...(তাঁর ল্যান্ডস্কেপে)...আমি অন্তত কিছুতেই ভুলতে পারি না সংখ্যায় শতাধিক সেইসব বহির্দৃশ্যচিত্র— বাঁকুড়ার দিগন্তবিস্তৃত উষর মাঠ, ... বেলেতোড়ের কুঠি, রেললাইনে স্টেশনের দুরন্ত বাঁক...কত বলা যায়।' বাংলার চিত্রশিল্পের ইতিহাসের অপরিহার্য অধ্যায় যামিনী রায় তাই জেলার গর্ব। যামিনী রায়ের মতো বিশ্ববিশ্রুত আর একজন শিল্পী ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজও বাঁকুড়ার। শহরের যুগীপাড়ার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের যে কিশোর নাটকের সিন, ঠাকুর দেবতার ছবি, শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদার প্রতিকৃতি এঁকে, স্বদেশি পোস্টার লিখে, ছুতোরদের সঙ্গে মূর্তি গড়ে চিত্রচর্চা শুরু করেন, তাঁকে প্রায় আবিষ্কার করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নিয়ে যান শান্তিনিকেতনে। স্বশিক্ষিত রামকিঙ্করের ছবি দেখে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলালকে, 'একে কি শেখাবে, এ তো সব শিখে এসেছে।' তবু আচার্য নন্দলালের তত্ত্বাবধানে শিল্পশিক্ষা নিয়ে ক্রমে ভারতের অন্যতম সেরা ভাস্কর হয়ে ওঠেন রামকিঙ্কর। রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ প্রশ্রয়ে শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গণ ভরিয়ে দেন তাঁর সৃষ্টিতে, যে সৃষ্টির সর্বাঙ্গে সেই বাঁকুড়ার অসমতল রুক্ষতা, শ্রমকঠিন সংগ্রামের নির্ভুল সংকেত।

বাঁকুড়ার আর একজন সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুয়ামশিনা গ্রাম থেকে শান্তিনিকেতনে যান। ভারতীয় অঙ্কনশৈলী আত্মস্থ করে, কলাভবনের প্রথম যুগের এই রূপতাপস সৃষ্টিসুখের আনন্দে আত্মমগ্ন ছিলেন আজীবন। কিছুদিন কলকাতার আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করেন। প্রচারবিমুখ ধ্যানতন্ময় এই শিল্পী বহুজননন্দিত না হলেও শিল্পরসিকজনের চিত্তে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন। বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক

শিল্পী রামকিঙ্কর বেজের ভাস্কর্য রূপ ও রূপাতীতের সহাবস্থান, মননের সঙ্গে মিশেছে প্রকৃতির ছন্দ

ইতিহাসে চিত্রকলার ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই স্মরণীয় একটি নাম, গৌরববাহী এক শিল্পী-প্রতিনিধি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগে এই ত্রয়ী এদেশের চিত্রকলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন এবং সেই কারণেই বাঁকুড়ারও সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। শোনা যায়, যামিনী রায়ের এক বোনও সৃজনশিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন। চিত্রচর্চার এই ঐতিহ্য সম্প্রসারিত করেছিলেন পি দালাল, লালমোহন পাল, মনোহর নন্দী, রামকিংকর সিংহ প্রমুখেরা; যদিও শেষোক্ত জন আলোকচিত্রী হিসেবেই সমধিক পরিচিত। সাম্প্রতিক কালে বাঁকুড়ার বহু ছেলেমেয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনের কলামহাবিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হচ্ছেন, শিখছেন। সফলতা অর্জন করেছেন। শহর জুড়ে বহু অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বাসুদেব চন্দ, বিশ্বরূপ দত্ত প্রমুখ সুখ্যাত শিল্পীরা অনলস প্রয়াসে চিত্রচর্চা করছেন। তাঁদের কারও কারও ছবি বিদেশেও প্রদর্শিত হচ্ছে। অভিব্যক্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে চিত্রকলা চর্চার কর্মশালা রাজ্য চারুকলা পর্ষদের উদ্যোগে। শুশুনিয়াতে হয়েছে ভাস্কর্যের কর্মশালা। যামিনী রায় এবং পটচিত্রের ধারা অনুসরণ করে তাকে নতুন রূপে উপস্থিত করছেন জেলার অনেক শিল্পী। শুধু জেলা শহরে নয়, জেলার সর্বত্র যে

শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায় চন্দ্রবর্মণের শিলালিপিতে যে চক্র খোদিত আছে যদি তাকেই বাঁকুড়ার আদি চিত্রচর্চার প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হয়, এবং সেই তক্ষণ-শিল্পী বাঁকুড়াবাসী ছিলেন এমন অনুমিত হয়, তাহলে, লেখা চলে, আদি মধ্যযুগেই এ জেলায় চিত্রকলার চর্চার সূত্রপাত। আপশোস জাগে, আলতামিরার মতো গুহাচিত্র কেন আঁকলেন না প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা যাঁরা বাস করতেন ওই শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকাতেই।

চিত্রচর্চা অনলস তার অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে থাকে বইমেলা, বিষ্ণুপুর মেলা বা স্থানীয় অন্যান্য গ্রামীণ মেলায়। ছাতনা, কমলপুর, পাত্রসায়ের বড়জোড়া, মালিয়াড়া, ইন্দাস, খাতরা, অম্বিকানগর, গোড়াবাড়ি, মুকুটমণিপুর, রাণীবাঁধ, সোনামুখী—জেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে আছে চারুশিল্পচর্চার নমুনা। সোনামুখীতে বা বিষ্ণুপুরে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে চিত্রচর্চার। জেলার সর্বত্র নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার উৎসাহ। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত বালুচরী শাড়ির আদি নকশাকার অক্ষয় দাস বা অক্ষয় পাটরাঙা আজও জেলাবাসীর কাছে স্মরণীয় নাম। বিষ্ণুপুরের ঐকতান বা রূপকলা জাতীয় প্রতিষ্ঠান জেলার চিত্রচর্চারই সপ্রাণ উদাহরণ।

আপশোস হয়, যে জেলার চিত্রশিল্পচর্চার ইতিহাস এমন সমৃদ্ধ, সে জেলার প্রশিক্ষিত তরুণ শিল্পীরা একজোট হয়ে একটা নতুন শিল্প আন্দোলন কেন গড়ে তুলছেন না, যা হবে দেশজ শিকড়ের রসে পল্লবিত। বাঁকুড়া পথিকৃৎ তো হতেই পারে এ ক্ষেত্রে। সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত তো তার আছেই।

কারুকলা চর্চা

চিত্ররচনার যে ঐতিহ্য বহু প্রাচীন কাল থেকে বাঁকুড়া বহন করছে, যার প্রত্নসাক্ষ্য শুশুনিয়ার গুহালিপিতে, অনুমান করা চলে অক্ষর খোদাইয়ের সেই শিল্পীদলের বংশধরেরাই হয়তো আজও ওই পাহাড় অঞ্চলে তক্ষণ কাজের ধারাটি বজায় রেখেছেন। শুশুনিয়ার ওই ধারাজলের মতোই তা অফুরান, অবিরল, স্বতঃস্ফূর্ত। লক্ষাধিক বছর আগে তৈরি সেখানকার প্রত্নাশ্মর হাতিয়ারগুলো যেমন হাতকুঠার, ছেদক ইত্যাদির সুসমঞ্জস গঠনরীতি নিঃসন্দেহে সেই সময়ের মানুষের কারুকাজ করার দক্ষতার প্রমাণ। মধ্যযুগের নৃপতি জনৈক চন্দ্রবর্মার শিলালিপি খোদিত আছে ওই পাহাড়ের গুহায়। ওই লিপিচিত্রে একটি বৃত্ত, বৃত্তরেখা স্পর্শ করে বাইরের দিকে প্রলম্বিত চোদ্দটি অগ্নিশিখা। কেন্দ্রস্থলে আর একটি শিখা। অসাধারণ দক্ষতায় খোদিত এই শিলালেখ ও প্রদীপ পণ্ডিতজনের অন্বেষা এবং শিল্পরসিকদের মুগ্ধতা দাবি করেছে। পণ্ডিতদের কেউ কেউ বলেন, এটি একটি বর্ষচক্র, প্রাচীন চান্দ্রমাস বা সূর্যাবর্তের সঙ্গে গূঢ় সম্পর্কযুক্ত। পৌষ সংক্রান্তির দিন এখানে বিশেষ উৎসব হয় বলে, অনেকে বলেন যে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ সুদৃশ তুষুপ্রদীপ বা তুষু খলার গঠন সৌকর্যের সঙ্গে এর মিল আছে।

যেন প্রাচীন শিলালেখর অগ্নিশিখা থেকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়েছেন একালের শিল্পীরা। কিন্তু শুধু কাব্যিক বিশ্বাস নয়, এখনও পাথর খোদাইয়ের কাজ করেন এই পাহাড়-লগ্ন বাসিন্দারা। শুশুনিয়ারই পাথর কেটে থালা, বাটি, ধূপদানি, ছাইদানি, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি এবং আরও নানা ধরনের শিল্পবস্তু তৈরি করেন কারুকরা। এই সব শিল্পীদের অনেকেই জেলা, রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। উচ্চমানের পাথর ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পেলে এঁরা বিশ্বজয় করতে পারবেন এমন বিশ্বাস করা চলে।

দশাবতার তাস

মল্লরাজ বীর হাম্বির যেদিন শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন, সেদিন বাঁকুড়ার শিল্পজগতেও ঘটেছিল এক পরিবর্তনের সূচনা। মন্দির ভাস্কর্যে এবং অলংকরণে, রাজসভার সঙ্গীতে এবং অন্তঃপুরে অবসর যাপনের জন্য দশাবতার তাস খেলার রাজকীয় অভ্যাসে তার স্ফুরণ ঘটে। ওড়িশা থেকে এসেছিল এই তাসের রাজবৈভব। ৪ ইঞ্চি ব্যাসের এই তাস রঙে-রেখায় নয়নশোভন। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, বামন, জগন্নাথ বা বুদ্ধ

মনসা, পোড়ামাটির শিল্প
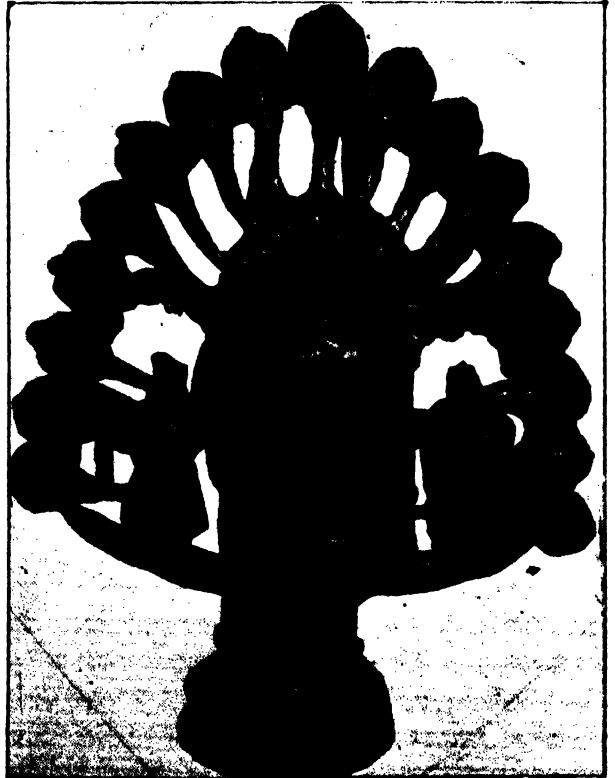
পরশুরাম, বলরাম ও কল্কি এবং এর সঙ্গে উজির ও দশ অবতারের দশটি প্রতীক এই তাসের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক জটিল জীবনযাত্রায় জটিল বিন্যাসে এই তাস খেলার অবসর মেলে না বলে এই খেলা প্রায় অবলুপ্ত। কিন্তু চমৎকার শিল্পবস্তু হিসেবে এই তাসের আকর্ষণ রয়েই গেছে। বাংলায় একমাত্র বাঁকুড়াতেই এই তাস তৈরি হয়। আজও। সংগ্রাহক শিল্পরসিকেরা।

টেরাকোটা বা পোড়ামাটির কাজ

যে দৃপ্তগ্রীব ঘোড়া বাঁকুড়ার গৌরববাহী, বাংলার হস্তশিল্পের প্রতীক বিশ্বপরিক্রমায় রত, তা তৈরি হয় পাঁচমুড়া গ্রামে। বিষ্ণুপুর মন্দিরের অসাধারণ টেরাকোটার অলংকরণ যাঁরা করেছিলেন, রাজদণ্ড ভেঙে পড়ার পর তাঁদের অনেকেই নানা স্থানে চলে যান। পাঁচমুড়াতেও। গড়ে ওঠে শিল্পী পরিবার। শুরু হয় নতুন ধরনের টেরাকোটার কাজ। ঘোড়া, হাতি, মনসাঝাড়, শঙ্খ, ছাইদানি, ধূপদানি গৃহসজ্জার নানা উপকরণ তৈরি হতে লাগল। বোধহয় ধর্মীয় প্রয়োজনেই ঘোড়ার গলা এমন উঁচু করেছিলেন তাঁরা। এবার শুরু হল দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে ভিন্ন রূপারোপ। এখানকার শিল্পীরাও জেলা রাজ্য ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান লাভ করেছেন।

পাঁচমুড়া ছাড়াও সোনামুখী, রাণীবাঁধ, বিবরদা, স্যাঁদড়াতেও পোড়ামাটির কাজ হয়। স্যাঁদড়ায় তৈরি গোলাকৃতি হাতি বা বোঙা হাতি নামে পরিচিত—পোড়ামাটি শিল্পের এক নতুন রূপ। পাঁচমুড়াতে এখন সিরামিক্সের কারখানাও স্থাপিত হয়েছে। তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের কাপ, প্লেট, ফুলদানি ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প : শঙ্খশিল্প

শাঁখের ওপরে সুরচিত নকশা ইদানীং শিল্পমনস্কদের বিস্ময় সৃষ্টি করছে। বিষ্ণুপুর হাটগ্রাম, শাসপুর ইত্যাদি অঞ্চলে শঙ্খমালা, শঙ্খবালা, আংটি, চুড়ি, শাঁখা, কলমদানি, ছাইদানি, দরজায় ঝোলাবার চিক তৈরি হচ্ছে। একসময় পাত্রসায়ের অঞ্চলে তৈরি হত প্রাকৃতিক দৃশ্য সংবলিত পদক। ঘুটগড়িয়ার শিল্পীরা শঙ্খবলয়ের ওপর রঙিন নকশা আঁকত। সাধারণত তিওকুটি, জার্জির, কাচ্চাম, ধলা ও পাটিশঙ্খ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আগে দক্ষিণ ভারত থেকে আনা হত। এখন সরকারিভাবে সরবরাহ করা হয়। এই শিল্পের কারিগররাও জেলা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। **জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী—অশ্বিনী নন্দী।**

ঢোকরা শিল্প

কোন সুদুর অতীতে মধ্যপ্রদেশ থেকে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন একদল কারিগর যাঁরা পেতলের ও ব্রোঞ্জের কাজ করতেন। আজ বিক্না গ্রামে তাঁরা গড়ে তুলেছেন শিল্পভাণ্ডা। প্রদীপ, পিলসুজ, দেবদেবীর মূর্তি, অসংখ্য অলংকৃত শিল্পবস্তু এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করে অসাধারণ 'ঢোকরা'র কাজ সৃষ্টি করেন তাঁরা। এই কাজের শিল্পীরাও জেলা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। **জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী : যুদ্ধ কর্মকার।**

ঢোকরা শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন

কাঠের কাজ

পোড়ামাটির ঘোড়ার ভঙ্গুরতা এবং দূরস্থানে নিয়ে যাবার অসুবিধাজনিত কারণে কাঠের ঘোড়ার প্রচলন বাড়ছে। বাঁকুড়া শহরের রামপুরে, অদূরে জগদল্লায়, হাটগ্রামে কাঠ খোদাই করে নানাবিধ সৌন্দর্যময় মূর্তি ও জীবজন্তু তৈরি হয়। এই কাজ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর শিল্পীরাও রাজ্যস্তরে ও জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। **জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী : হীরালাল।**

পেতল ও বেলমেটালের কাজ

একসময় কেঞ্জাকুড়ায় বিষ্ণুপুরে পেতলের কাঁসার কাজ হত ব্যাপক উদ্যমে। নকশা করা থালা, গেলাস, কলসি তৈরি হত।
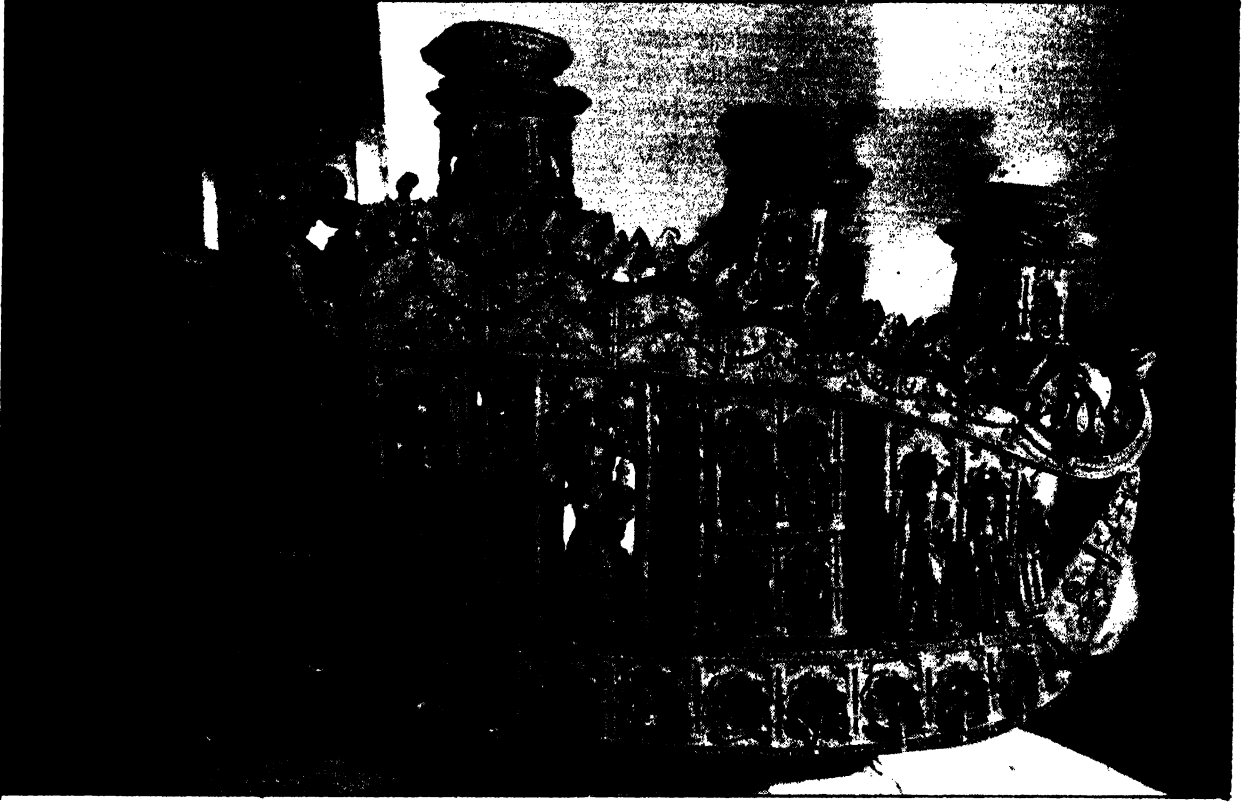
টেরাকোটা ও পোড়া মাটির অসাধারণ কারুকার্যময় টুসু নৌকাপ্রদীপ

স্টেনলেস স্টিল ও অন্যান্য বিকল্প বস্তুর আবির্ভাবে এ কাজের শিল্পীরা অনেকেই অন্য পেশায়। নতুন নকশায় যেমন বিষ্ণুপুরের দলমাদল কামান, জোড়বাংলা মন্দির বা রাসমঞ্চ তৈরি করে পেপার ওয়েট হিসেবে ও বাজারে চালু করা হয়েছে। কেঞ্জাকুড়ার অনেকে বাঁশের কাজে লিপ্ত আছেন।

বাঁশের কাজ

ছান্দারের অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ১৯৮০ সালে জেলা শিল্পকেন্দ্র আয়োজিত হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম বাঁশের তৈরি নানা ধরনের খেলনা প্রদর্শন করে। এর চাহিদা বাড়ে। অভিব্যক্তিরই একজন শিল্পী কেঞ্জাকুড়ায়, নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে স্থাপন করেন ত্রিনেত্রী নামে বাঁশের কাজের জন্য সংস্থা। ক্রমে বাঁকুড়ায় এই কাজ এক নতুন হস্তশিল্পের নমুনা হয়ে বহুজনের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এখন ছান্দার, কেঞ্জাকুড়া ছাড়াও অন্যান্য বহুস্থানে এই কাজ হয়। সোনামুখীতে বাঁশের পাত্তি দিয়েও চমৎকার প্রতিকৃতি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য সৃজন করছেন শিল্পীরা।

অভিব্যক্তির শিল্পকাজ

মূলত চিত্রচর্চা ও লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকের চর্চাকেন্দ্র হলেও কারুকাজে অভিব্যক্তির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অন্তত তিনটি নতুন মাধ্যমে শিল্পকাজ করে জেলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা গেছে। বাঁশের কাজ ছাড়াও, শ্লেট খোদাই, বেলমালার কাজ এবং ধানের কাজে সংস্থার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। বেলমালা শিল্প জেলার অন্যতম হস্তশিল্প। বেল খোলা থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে দানা বের করে মালা গেঁথে বিক্রি করেন গ্রামের মেয়েরা। ধর্মীয় কারণে এর চাহিদা আছে। এখানে সেই মালা দিয়ে গৃহসজ্জার নানা উপকরণ তৈরি করা হচ্ছে। ধান দিয়ে একধরনের চাঁদমালা জেলার অনেক গ্রামের মেয়েরা করেন। তাকেও নতুন করে নকশা সাজিয়ে গৃহসজ্জার উপকরণে পরিণত করা হয়েছে। শ্লেট খোদাই করে মূর্তি, কলমদানি, ছাইদানি, পশুপাখি ইত্যাদিও তৈরি হচ্ছে। এইসব কাজ শেখানোর জন্য জেলা শিল্পকেন্দ্র এবং ডি আর ডি এ-র সহায়তায় বিভিন্ন ব্লকে অভিব্যক্তির শিল্পীরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। গোড়াবাড়ি গ্রামের আঁকাজোকা সংস্থাও এর সঙ্গে জড়িত। অভিব্যক্তির অনেক শিল্পী জেলা ও রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

বালুচরী শাড়ি

বাঁকুড়ার তাঁতের শাড়ির চাহিদা একসময় প্রবল ছিল। এখনও লুঙ্গি-গামছার চাহিদা কম নেই। রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া, সোনামুখী ইত্যাদি স্থানে কারিগরও ছিলেন অনেক। এখন চাহিদা বালুচরীর। বিষ্ণুপুরে তৈরি হয় এই শাড়ি। এখন পাঁচমুড়াতেও হচ্ছে। নয়নলোভন অসামান্য নকশায় সজ্জিত এই শাড়ি এখন বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। নতুন উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় নকশার উন্নতির চেষ্টাও ঘটানো হচ্ছে। বালুচরীর শিল্পীরাও রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

অন্যান্য

বিষ্ণুপুরে এ ছাড়াও চারকোনা ও ছয়কোনা লণ্ঠন তৈরি হয়, যাকে অনায়াসে শিল্পবস্তুতে পরিণত করা যায়। খাতড়া ও ছাতনায় লাক্ষার কাজ হয়। ছাতনায় লাক্ষার পুতুল তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সোনামুখীতে শোলার কাজ হচ্ছে। বাঁকুড়ায় বাটিকের কাজ হয়। শুরু হয়েছে পাটের কাজও। নানা ধরনের শিল্পবস্তু নির্মিত হচ্ছে পাট দিয়ে। গোড়াবাড়ি অম্বিকানগরে হাড়ের চিরুনি ইত্যাদি তৈরির রেওয়াজ আছে। বিষ্ণুপুরে পটচিত্র আঁকা হয় এখনও। জেলার অন্যান্য জায়গায় লুপ্তপ্রায়। মালিয়াড়ায় ও বেলেতোড়ে খড় দিয়ে একধরনের চমৎকার নকশা তৈরি হচ্ছে। হেতিয়াতে বাঁশপাতা দিয়ে একধরনের সুন্দর অলংকৃত শিল্পদ্রব্যের কাজ হচ্ছে।

বহুল প্রচারিত প্রচলিত উপাদানগুলি ছাড়াও নিতান্ত তুচ্ছ উপাদান থেকেও, যেমন কয়লা, চক, গাছের ডালপালা, বালি, সছিদ্র বেলখোলা, অ্যালুমিনিয়াম পাত, মাটি, প্লাস্টার অব প্যারিস ইত্যাদি দিয়েও জেলার কারুশিল্পী অতিসুন্দর শিল্পসম্ভার নির্মাণ করছেন। বাঁকুড়ার ঐতিহ্যকে বহমান রেখেছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা কারুশিল্পে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান, তাঁদের সিংহভাগই বাঁকুড়ার শিল্পী। এ গৌরব নিঃসন্দেহে প্রাণিত করে আবহমান বাঁকুড়ার কারুকদের।

একনজরে বাঁকুড়ার হস্ত বা কারুশিল্প

বাঁকুড়া : কাঠের কাজ, শাঁখের কাজ, শোলার কাজ, বেলমালার কাজ, পাটের কাজ, বাটিক, বাঁশের কাজ ইত্যাদি।

বিষ্ণুপুর : বালুচরী শাড়ি, টেরাকোটা, দশাবতার তাস, পট, বেল মেটালের কাজ, বাঁশের কাজ ইত্যাদি।

সোনামুখী : বাঁশের কাজ, শোলার কাজ, পোড়ামাটির কাজ, রেশমের কাজ।

খাতড়া : লাক্ষার কাজ, বেলমালার কাজ, বাঁশের কাজ ইত্যাদি।

রাণীবাঁধ ও বিবরদা : পোড়ামাটির কাজ

রাজগ্রাম : তাঁতের কাজ

হাটগ্রাম : শঙ্খের কাজ, কাঠ খোদাই

শুশুনিয়া : পাথর খোদাই, কাঠ খোদাই, বেলমালা

ঘুটগড়িয়া : বেলমালা, বঁড়শি

বেলেতোড় : পট, খড়ের কাজ, বাটিক, বেলমালা

ছান্দার : শ্লেট ও পাথর খোদাই, কাঠ খোদাই, বেলমালা, ধান ও বাঁশের কাজ, পোড়ামাটির কাজ ও বিচিত্র অপ্রচলিত উপাদানের কাজ

কোতুলপুর : ধানের কাজ, বাঁশের কাজ ইত্যাদি

বিক্না : ঢোকরা

পাঁচমুড়া : পোড়ামাটির কাজ, সিরামিক্স

স্যাঁদড়া : পোড়ামাটির কাজ

জগদল্লা : কাঠের কাজ

মালিয়াড়া : খড়ের কাজ

হেতিয়া : বাঁশপাতার কাজ

কেঞ্জাকুড়া : বাঁশের কাজ, কাঁসা-পেতলের কাজ, তাঁত

গোড়াবাড়ি : বেলমালার কাজ, বাঁশের কাজ

বড়জোড়া : বেলমালা, বালির কাজ

এ ছাড়াও বাঁকুড়ার অধিকাংশ গ্রামেই বেলমালার কাজ হয়। এবং প্রচারের আলোতে উদ্ভাসিত নয় এমন অনেক হস্তশিল্পী ও হয়তো সকলের অগোচরে নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পসৃজন করে চলেছেন। তাঁদের কাজের বাজার তৈরি এবং জনসমক্ষে আনার দায়িত্ব যেমন সরকারিভাবে এই কাজের জন্য নিয়োজিত দপ্তরের, তেমনই শিল্প রসিকদেরও।

চারু ও কারুকলা চর্চায় দীর্ঘদিন যাবৎ বাঁকুড়া একটি অনন্য স্থানে। কারুকাজ ও লোকসঙ্গীতের এত বৈচিত্র্য অন্য জেলায় খুব কমই আছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অদ্যাবধি এই ধারা অব্যাহত শত বিপর্যয়েও। এ জেলাই শিল্পের জগতকে দিয়েছে যামিনী রায়, রামকিঙ্কর, সত্যেন্দ্রনাথ; এ জেলারই টেরাকোটা, মন্দির ভাস্কর্য, দৃপ্তভঙ্গির অনুষঙ্গে গড়া পোড়ামাটির ঘোড়া শিল্পের দুনিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে।

তাই, 'মন্দির গান ঘোড়া/এই তিন নিয়ে বাঁকুড়া'—এই আধুনিক ছড়া যদি কেউ লেখেন, সমগ্র বাঁকুড়া-শিল্পজগত পরিক্রমার পর তাঁর মনে হবে সৌন্দর্যচর্চার ওই তিনটি সত্যের পরেও আরও অনেক দিক রয়ে গেছে যা হয়তো ওই ছড়ায় ধরা যায়নি।

মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের একশো উনত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে শিল্পীদের প্রশস্তিসূচক যে বাক্যবন্ধটি আছে, পদ্যে তার বঙ্গানুবাদ হল,

'মালাকার আর শিল্পীরা যবে কারুকার্যে রত
তাদের হাত শুদ্ধ সদাই শাস্ত্রের অভিমত।'

অনুমান করা যায়, প্রশংসার এই শ্লোক সমাজের অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মানুষের চেয়ে শিল্পীরা শ্রেষ্ঠতর বলেই হয়তো উচ্চারিত হয়েছে। হয়তো এ সিদ্ধান্ত তর্কাতীত নয়। কিন্তু যে জেলায় অনেক শিল্পীর আবাস, সুনির্মিত সুচারু শিল্প যেখানে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ধারাবাহিক, সন্দেহ নেই, সে জেলা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেতেই পারে। এ বিচারে বাঁকুড়া অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্রের দাবিদার।

শুধু যে আপশোসের উল্লেখ করেছি আগেই, অসীম সম্ভাবনাময়, বিপুল ঐতিহ্যসমন্বিত চারু ও কারুশিল্পে রত্নগর্ভ এ জেলায় ছবি আঁকা ও হস্তশিল্পে যদি সংগঠিত ভাবে নবসৃষ্টির জোয়ার আসে তাহলে হয়তো নতুন চিত্রভাষা, কারুকাজের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। ইদানিং কিছু উদ্যোগ সক্রিয় হয়ে উঠছে জেলার বিভিন্ন স্থানে।

আশা করা যায়, বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করে, বাঁকুড়ার এই শিল্পচর্চা একদিন বাংলায় স্বমহিমায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মনুসংহিতায় বর্ণিত সেই 'শুদ্ধহাত'-এর স্পর্শ চিত্ররূপময় করে তুলবে বাঁকুড়াকে।

তথ্য উৎস : জেলা শিল্পকেন্দ্র বাঁকুড়া, শৈলেন দাস, কান্তি হাজরা

লেখক : প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ছান্দার প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ভাস্কর্য শিল্পী ও সাহিত্যিক

রামায়ণ-পট : রামের দুর্গাপূজা (উপরে), বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধ (নিচে)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঁকুড়া জেলার ওন্দায় অঙ্কিত

লোকায়ত সমাজের লোকশিল্প : বাঁকুড়ার পট

মন্টু দাস

পরিশ্রমমাফিক পট-এর দাম পাওয়া যায় না। শিল্পের দাম অর্থমূল্যে দেওয়া যায় না। শিল্পীরা তাদের শিল্পের সঠিক মূল্য কোনদিনই পায় না। মনের মাধুরী মিশিয়ে শিল্পী স্বকীয়তায় যে শিল্পকলা রূপারোপ করে অর্থমূল্যে কি তার মূল্যায়ন করা যায়, যায় না। এটা চিরন্তন সত্য। প্রকৃত শিল্পীর বিশেষত লোকশিল্পীদের যেন দুঃখ দিয়েই জীবন গড়া।

পশ্চিম রাঢ় তথা লোকায়ত বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের একটা অনন্য ও ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য আছে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে বাঁকুড়ার লোকশিল্প-সংস্কৃতি তার স্বকীয় ঐতিহ্য-রীতিতে ঋদ্ধ। এখানকার লোকশিল্পের সঙ্গে আদিবাসী অ-আদিবাসীদের লৌকিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃতি মিলেমিশে হয়ে গেছে একাকার। শুশুনিয়া পর্বত গাত্রদেশে খোদিত মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার শিলালিপিচিত্র থেকে বেলিয়াতোড়ের পটচিত্র, বিষ্ণুপুর ঘরানার উচ্চাঙ্গ-মার্গ সঙ্গীত থেকে তুসু, ভাদু, ঘেঁটু গানের সুদৃঢ় বন্ধনে সৃষ্ট সংস্কৃতির প্রকরণ অন্যত্র বড় একটা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই দেখা যায়, বাঁকুড়া জেলার লোকশিল্পধারা কোনও খাতে প্রাণের স্বচ্ছন্দ আবেগে ধাবিত, আবার কোনও খাতে এই শিল্পধারা অতীব শীর্ণ। এমনই একটি শীর্ণকায় লোকশিল্পধারা 'বাঁকুড়ার পট'। অথচ একদা এই পটচিত্রধারা প্রাণের আবেগে ছিল জীবন্ত। বাঁকুড়ার পট, বাঁকুড়ার পোড়ামাটির টেরাকোটা ঘোড়ার মতো বিশ্ববিজয়ের পথ পরিক্রমা করতে না পারলেও জনগণ-মনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি ভারতগৌরব যামিনী রায়ের আত্মপ্রকাশ। বেলিয়াতোড়ের প্রাচীন পটুয়াদের পট তথা প্রাচীন বাংলা পট অনুকরণ না করে অনুসরণের ভেতর দিয়েই যামিনী রায় হয়েছিলেন শিল্পী যামিনী রায়। আর এখানেই বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের গর্ব। যামিনী রায় "মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়, কালীঘাট ইত্যাদি জায়গার অসংখ্য পটচিত্র সংগ্রহ করেন। এই পর্ব থেকেই যামিনী রায় পূর্ব-অধীত বিদেশি শিল্প-শৈলী বর্জন করে পুরোপুরিভাবেই লোকায়তধর্মী প্রকাশভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। শেষ দিন পর্যন্ত এই রীতিকেই সমৃদ্ধ করে গেছেন।" এখানেই পটুয়াদের কৃতিত্ব, পটুয়াদের বৈশিষ্ট্য। তাই বাঁকুড়ার তথা বাংলার পট ও পটুয়াসমাজের পুনরুজ্জীবনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, এই জাতশিল্পী পটুয়ারা এখনও পট আঁকে সৃষ্টির আনন্দে। সেই আনন্দধারাকে সামনে রেখে বর্তমানে পটচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি 'ফর্ম'-এর কৌশল পালটেছে। আধুনিক লোকশিল্পীদের তুলির টানে-রঙে পরিস্ফুট হচ্ছে পটচিত্র সৃষ্টির অনন্য রূপমাধুর্য। বাংলা-পটচিত্র সম্পর্কে মূল্যবান অভিমত দিয়েছিলেন বাঁকুড়ার মাটির সন্তান বিশ্ববন্দিত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'অর্ধ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "পটুয়ারাও প্রধানত রেখার সাহায্যেই তাহাদের মনের কথা আশ্চর্য নিপুণভঙ্গিতে বলিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির জলধারা যেমন মাটির উপর দিয়া ডালপালার ভঙ্গিতে স্বাভাবিকভাবে গড়াইয়া চলিয়া যায়, পটুয়াদের পটরেখাগুলিও যেন তুলির মুখ হইতে সহজে বাহির হইয়া ছবির রূপ ধরিয়াছে। বাঙালি ধনী হুঁকা হাতে তামাক খাইতে বসিয়াছে, প্রণয়ীযুগল পরস্পরকে সপ্রেম স্পর্শে প্রেম নিবেদন করিতেছে, তরুণীদীর্ঘ কেশ রোদে শুকাইতেছে, বিড়াল প্রকাণ্ড চিংড়িমাছ ধরিয়াছে—এইরূপ নানা বিষয়ই দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙালি পটুয়ারা তুলির বাঁকা টানে আঁকিয়া গিয়াছে। .....বাংলাভাষা যেমন বাঙালির নিজস্ব ভাষা, তেমনই বাংলার পট বাঙালির একান্ত নিজস্ব চিত্র।" এমনি একটি ঐতিহ্যবাহী বাংলা পট চিত্রায়ন-লোকশিল্প যথাযথ পরিচর্যার অভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে

কালীঘাটের পট

যাচ্ছে। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে ১২শ শতাব্দীর ওড়িশা পট আজও প্রাণবন্ত। পুরীর সন্নিকটে রঘুরাজপুরের লোকশিল্পী চিত্রকরেরা Orisa Folk Paintings রীতি অনুসরণ করে আজও আঁকেন জগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রা পট। তীর্থযাত্রী এবং পটশিল্পরসিকেরা এই পটচিত্র ক্রয় করেন। স্বাভাবিক কারণেই ওড়িশার পট বর্তমানেও জীবিত। পটচিত্র একটি আদিম (প্রিমিটিভ) চিত্রশিল্পশৈলীভুক্ত হলেও এর আবেগ প্রকাশ প্রায় সর্বব্যাপ্ত। The Patua-art of Bengal সম্পর্কে যামিনী রায়ের উক্তি এখানে ভীষণভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন, "What is it that the Patua-art wants to express ?

It is certainly not a meticulous copy of nature, it is as certainly a conveying the essence thereof. For it had for its aim a direct expression of the emotion aroused by the universal essence of the nature around."

লোকায়ত বাঁকুড়ার লোকশিল্প 'পট' একদা সারা বাংলা, বিহার, ওড়িশাসহ যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশ্বজোড়া ছিল এর খ্যাতি ও পরিচিতি। কুমোরটুলি-কালীঘাটের পটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁকুড়ার পটও বিচরণ করত অবিশ্রান্ত। এখন বাঁকুড়ার পটচিত্রকে বলা হত বেলিয়াতোড়ের পট "বেলেতোড়ি পট" ও বিষ্ণুপুরের পট "বিষ্ণুপুরী পট"। লোকায়ত সমাজভুক্ত লোকশিল্পীদের হাতের টানে তুলির কৌশলে ও লোকভাবনা থেকে যেসকল চিত্রকলা পরিস্ফুট হয় তাকে বলা হয় পট > পটচিত্র আর যারা পটচিত্রের রূপারোপ করে তাদের বলা হয় পটুয়া > পটো > পটেরি > চিত্রকর > চিত্রগুপ্ত > পটিদার ইত্যাদি। নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি-উপজাতি সমাজ থেকেই বেরিয়ে আসতো এই সকল পটুয়া চিত্রকর। এছাড়াও মুসলমান চিত্রকর পটুয়া > পটেরিরাও পট দেখিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য উপার্জন করত। মুসলমান পটেরিরাই সত্যপীরের দোয়া গান গেয়ে চামর বুলিয়ে উপার্জনের পথিকৃত। হিন্দু পটুয়ারাও ফকির সাহেব সেজে "ভেক" ধরে অর্থ উপার্জন করত এবং এখনও করে। বাঁকুড়ার পটুয়াদের প্রধান পট হচ্ছে "যমপট"। এছাড়া গুটানো পট বা জড়ানো পটের অন্যতম পট হচ্ছে জগন্নাথ-বলরাম সুভদ্রা পট, সিঞবোঙা, জায়েরএরামারাংবুরু পট। আমার বিচার, পাপপুণ্য পট, দুর্গাপট, লক্ষ্মীপট, মনসা পট, কৃষ্ণলীলা পট ও দশাবতার পট আঁকে পটুয়ারা নৈপুণ্যের সঙ্গে মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজস্ব শিল্পশৈলীতে, আর এখানেই পটুয়াদের বিশেষত্ব। আদিবাসী সাঁওতালেরা পট আঁকে তাদের ঘরের নিকানো দেওয়ালে উঠোনে। এদের পট অঙ্কনে চিত্রিত হয় গাছ গাছালি, লতা পাতা ফুল, পশুপাখি। সৌন্দর্যপ্রিয় সাঁওতাল মেয়েদের আঙুলের টানে দেওয়াল রঙে প্রস্ফুটিত হয় স্বর্গীয় রূপমাধুর্য। বেলিয়াতোড়-বিষ্ণুপুরের পটুয়ারা পট আঁকে কাপড় কাগজের জমিনে। পুরাতন সাদা কাপড়ে অথবা মার্কিন থান কাপড়ে অথবা পাতলা চটের উপরে খড়িমাটিতে তেঁতুল বীচির 'কাই'-এর আঠার প্রলেপ মাখিয়ে মসৃন পাথরের সাহায্যে ঘসে ঘসে পটের জমিন বানানোর পর দেশজ গাছগাছড়ার পাতা ও ছালের কষ দিয়ে তৈরি রং ও মাটি রং, ভুষা দিয়ে তৈরি রং এর প্রয়োগে আঁকা হয় পট। এটাই পট আঁকার প্রাচীন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে লোকশিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় ও তুলির টানে 'পট' এর সীমাহীন সৌন্দর্য চিত্রশিল্পীদের ভাষায় বিমোহিত করে, নিয়ে যায় সৌন্দর্যলোকে। পটুয়ারা দেবলোককে নামিয়ে আনতে পারে বাঁকুড়ার লালমাটির পথে প্রান্তরে।

বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় আর বিষ্ণুপুর ছিল পটশিল্পের প্রাচীন চর্চাকেন্দ্র। এছাড়াও একদা পটুয়াদের বসবাস ছিল বাঁকুড়া সদর মহকুমা, বিষ্ণুপুর মহকুমা ও খাতড়া মহকুমার সর্বত্র। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাঁকুড়ার পট হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি বাংলা পট চিত্রায়ন বাংলাদেশ থেকেই লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। কিছুদিন আগেও গ্রামীণ পটুয়াদের পট, মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, হিঙ্গুল পুতুল, মুখোশ পুতুল বিক্রি হত এক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কালঞ্জয় শিবপোক্তার, বেলেতোড়ে, মালিপোতার ধর্মরাজের গাজন মেলায়। ইদানীং সমীক্ষায় জানা যায় যে এইসব কুটিরশিল্পসম্ভার গাজন মেলায় বড় একটা বিক্রি হয় না। তবে এইসব লোকশিল্পের বিশেষত পট ও হিঙ্গুল পুতুলের বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

এই প্রবন্ধে বেলিয়াতোড় ও বিষ্ণুপুরের পটুয়া চিত্রকরদের জীবনকথামুখ তুলে ধরাই উদ্দেশ্য, যাতে করে লোকশিল্প রসিক জনসাধারণ ও সরকার এই অবলুপ্ত প্রায় 'পট' শিল্পটিকে পুনরুজ্জীবনদানে এগিয়ে এসে সহায়তার হাত প্রসারিত করেন।

বেলিয়াতোড়ের পট ও পটুয়া সমাজ ঃ

বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার অন্তর্গত বেলিয়াতোড় > বেলেতোড় একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ধর্মরাজের গাজন এখানে খুবই প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে শিল্পী যামিনী রায়ের বসতবাটির সামনেই পটুয়াদের বসবাস। পটুয়াদের পাড়ার নাম পটেরিপাড়া বা পটোপাড়া। প্রাচীনকাল থেকেই পটুয়া চিত্রকরেরা এখানে মনের মাধুরী মিশিয়ে 'পট' অঙ্কন করে চলেছে। অতীতে পটচিত্রকে পটুয়ারা পরিমার্জিত শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেনি, তখন ওরা পট আঁকত ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনে। অনেকে হয়তো বলবেন সেটা আবার কি ? বেশ কিছুদিন আগেও দেখেছি বেলেতোড়ের পটুয়ারা লম্বা ফালি কাপড়ের মসৃণ জমিনে গুটানো বা জড়ানো পট আঁকত। যমপট দেখিয়ে গানের মাধ্যমে তারা উপার্জন করে জীবিকার্জন করত। এদের জীবন-জীবিকা অতিবাহিত হত এক রকম ভিক্ষান্নের দ্বারা। এক কথায় এরা ভিক্ষাজীবী। অনেকের মনে হয়ে থাকতে পারে এরা কেমন ভিখারি ? এরা ভিক্ষাজীবী অথচ চিত্রকর। তবে এদের ভিক্ষাবৃত্তিতে একটা স্বতন্ত্রতা ছিল বা আছে। এ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করি যে, বেলিয়াতোড়ের পটোরা ছিল হিন্দু সমাজভুক্ত অথচ এদের আচার-আচরণ, চলন-বলন ছিল গ্রাম্য বাঙালি মুসলমানদের মতন। অনেকে হয়ত বলবেন এ আবার কেমন

বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের পটে আদিবাসী সাঁওতালদের ধারতি সৃষ্টিতত্ত্ব পটচিত্র বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের নিজস্ব সম্পদ। সব জেলার পটুয়া চিত্রকরেরা যমপট, জগন্নাথ পট আঁকে। কিন্তু বেলিয়াতোড়ের পটুয়ারা জগন্নাথ পট দেখিয়ে মারাংবুরু সিঞবোঙা জায়েরএরা-র গান গেয়ে উপার্জন করে। বেলিয়াতোড়ের পটুয়ারা জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা পটকেই সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে রূপান্তরিত করে সিঞবোঙা, মারাংবুরু ও জায়েরএরা পটে।

বেলিয়াতোড়ের জগন্নাথ পট

কথা ? এই কথার সূত্র-সন্ধানে (১৯৭০-৮০) অনেকবার সরজমিনে তদন্ত করতে, খোঁজ নিতে গেছি বেলেতোড়ের পটুয়া বা পটো পাড়ায়, দেখেছি, জেনেছি এদের জীবনসংগ্রামের জীবনযাত্রার চলন্তিকা। আশ্চর্য হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি পটুয়াদের জীবন-যাপন প্রণালী দেখে। একই অঙ্গে যেন কত রূপ। অর্থ উপার্জনের সময় পটো-চিত্রকরদের চেনাই যায় না যে, এরা হিন্দু না মুসলিম। সাতসকালে পটুয়া চিত্রকরেরা তালিপট্টিওয়ালা আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে বড় বড় কাঁচের রংবেরঙের পুঁতির মালা গলায় পরে হাতে কালো চামর আর লম্বা ঝোলা ঝুলিয়ে গ্রামের পথ ধরত ফকির-পীরসাহেবের সাজে। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে চাষীবাসী পরিবারের গিন্নিবান্নিদের সামনে যমপট, জগন্নাথ পট, মনসা পট, মারাংবুরু পট তুলে ধরে সত্য পীরের গান শুনিয়ে, পট দেখাত। পট দেখে, গান শুনে গৃহস্থের মেয়ে-বউরা বাটিভর্তি চাল, বিরিকলাই তরিকরকারি (আনাজ) ঢেলে দিত ফকির বাবার ঝোলায়। পটুয়া চিত্রকরেরা আনন্দের সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চাদের মাথায় বুলিয়ে দিত কালো চামর। গাইত—'মুস্‌কিল আসান করো দোহাই সত্যপীর।' কৃষিজমিহীন পটুয়ারা এইভাবে অর্থোপার্জনের পথ বেছে নিয়েছিল।

বেলেতোড়ের পটুয়া চিত্রকরেরা হিন্দু। ওদের ঘরের আঙিনায় তুলসী মঞ্চ। গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণ। মেয়েরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুলসি থানে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে মাথা ঠেকায় আবার মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানায় বসবাসকারী পটুয়া-চিত্রকরদের অধিকাংশই কিন্তু মুসলমান ধর্মাবলম্বী, তবে এরাও জগন্নাথ পট, যমপট, মারাংবুরু পট দেখিয়েই উপার্জন করত এবং বর্তমানেও করে।

বেলেতোড়ের পটুয়া পাড়ার মেয়ে-বউরা ঘরের উঠোনে বসে তৈরি করত হিঙ্গুল পুতুল, মুড়কি পুতুল। হিঙ্গুল তেল রঙে রাঙিয়ে হিঙ্গুল পুতুল বিক্রি করত চাল মুড়ির বিনিময়ে। মধ্যবিত্ত ও ধনীর দুলালী কুমারীরা কিনত হিঙ্গুল পুতুল। সাজাত 'খেলাসান' খেলাঘর। তখনকার দিনে হিঙ্গুল পুতুলের বিয়েতে সাত মন তেল পুড়ত ধুমধামে। পটুয়া বউয়ের হাতের আঙুলের টানে তৈরি সুষমামণ্ডিত হিঙ্গুল পুতুল আজ হারিয়ে গেছে আধুনিকতার জৌলুসে।

বেলেতোড়ের পটেরি পাড়ার অধিবাসী পটুয়াদের গ্রামের মানুষ, কাছের মানুষ ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী যামিনীরঞ্জন রায়। যামিনী রায়ের আমলের পটুয়া দয়াল চিত্রকরের ছিল রমরমা অবস্থা। দয়ালের ছেলে গোকুল চিত্রকর ছিল একজন নামকরা পটুয়া। গোকুলের কাছ থেকে জেনেছিলাম, যামিনী রায়ের পিতৃ পিতামহদের কালেও বেলেতোড়ে ছিল পটুয়াদের বসবাস। রায়, মিত্র, নিয়োগীরা ছিলেন বেলিয়াতোড়ের জমিদার। তখন বেলিয়াতোড়ে ছিল তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের আধিক্য। লাল কল্লাচের ঢেউ খেলানো শুষ্কমাটির ধূ-ধূ প্রান্তর। এখানের আনন্দ উৎসব ধর্মরাজের গাজন ছিল বেশ প্রসিদ্ধ। আষাঢ় মাসের শেষ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজনে মাতোয়ারা হয়ে উঠত বাঁকুড়া। নৃতাত্ত্বিক বিচারে জানা যায় এখানের আদি অধিবাসীরা ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব হয়ে পড়লে 'ধর্ম' বুদ্ধ হয়ে যান ধর্মরাজ। সেকাল থেকে একাল অবধি সেই ট্রাডিশানকে সামনে রেখে আষাঢ়ি পূর্ণিমাতে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করেই ইদানীংকালেও ধর্মরাজের গাজন পালিত হয়ে চলেছে। ধর্মরাজের গাজনে বেলিয়াতোড়ের পটুয়া-মৃৎশিল্পীদের হাতে বানানো লম্বা লম্বা ঠ্যাংওয়ালা সাদা ঘোড়া বা ধর্মরাজের ঘোড়া আজও বিক্রি হয়। পটুয়াদের পটও বিক্রি হত সেকালের গাজন মেলায়। বর্তমানে ধর্মরাজের গাজনে বড় একটা হিঙ্গুল পুতুল, মুড়কি পুতুল বিক্রি হতে দেখা যায় না। বর্তমানে এই গাজন মেলার বিশেষ আকর্ষণ বেলেতোড়ের মেচাসন্দেশ। বেলেতোড়ের পটো > পটেরি পাড়ার সন্নিকটেই ছিল যামিনী রায়ের বাড়ি। সেই সুবাদে যামিনীর বাল্য-শৈশবের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছিল পটুয়াদের সান্নিধ্যে, পটোদের ঘরে। ফলে তার শিশু-কিশোর মন টানত পটুয়াদের পট অঙ্কনের রং বানানোর কাজে। দেশজ পদ্ধতিতে রং বানাতে এখান থেকেই হাতেখড়ি নিয়েছিলেন যামিনী রায়। পটোরা ছিল তাঁর আত্মার আত্মীয়। পটোরা যামিনীকে জানত তাদেরই ঘরের ছেলে বলে। যামিনী রায় সম্ভবত শিখেছিলেন পটলচেরা চোখ আঁকার তুলির টান দিতে যে পটলচেরা চোখের টানে যামিনী রায় চিরজীবী হয়ে আছেন। এক্ষেত্রে বেলিয়াতোড়ের পটুয়া চিত্রকরদের অবদান অনস্বীকার্য।

বাঁকুড়া জেলার তফসিলিজাতিদের প্রধান দেবতা বিষহরি মনসা। তাই সর্বক্ষেত্রেই মনসার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, পরিলক্ষিত হয় বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের পটে। মনসা পট দেখিয়ে পটুয়ারা গান গায়—

"জয় মা মনসাদেবী গো জয় বিষহরি।
অষ্টনাগের মাথায় পরমা সুন্দরী।।
সাতালি পর্বতে যে এই নোয়ার বাসর !
তাই শুয়ে গো নিদ্রা যায় বেহুলা লখিন্দর।।
পথে পথে যায় গো নাগ করে ঝলমল।
সমুখেতে দেখে কালি ডুয়াড়ি জঙ্গল।।"

১৯৭০ সালের ২৮ ডিসেম্বর আমি বালিগঞ্জ লেক টাউন থেকে শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। বাড়ির

> **শোকাভিভূত পরিবার পটীদারের স্তোকবাক্যে অভিভূত হয়ে মৃতের স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে মৃতের ব্যবহৃত থালা, বাটি গেলাস চালকলাইসহ পটীদারকে দান করে দিত, এখনো দেয়। আদিবাসী সাঁওতালদের দেখেছি গরু-বাছুর পর্যন্ত দান করে দিতে। এখনও গ্রাম্য জনজীবনে হিন্দু ও সাঁওতালদের মধ্যে পটীদারকে মৃতের সংগতির উদ্দেশ্যে দান করার প্রথা ও রীতি প্রচলিত রয়েছে। আজও গ্রামবাংলার মানুষকে 'যমপট'কে মান্য করতে দেখা যায়, হিন্দুরা যেমন মান্য করে আদিবাসী সাঁওতালেরা ততোধিক মান্য করে।**

স্টুডিও-র ভেতরে গিয়ে দেখি শিল্পী ইজেলের সামনে বসে তুলি হাতে নিমগ্ন যেন এক ঋষি। সামনে মাটির খোলায় (মালসা) দেশজ গোলা রং। নানান দেশজ রঙে মিশিয়েছেন তেঁতুল বীচির আঠা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি এখনও কেন দেশজ পদ্ধতিতে গোলা রঙের ব্যবহার করেন ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "এ রঙের ব্যবহার শিখেছিলাম দেশের পটুয়াদের কাছে, এ রঙে ছবির উজ্জ্বলতা বাড়ে। আমিও তো পটো। পট আঁকি।" যামিনী রায় নিজেকে পটো বলতে গর্ব বোধ করতেন।

১৯৮০ সালের কথা। আমি ছান্দারের শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে বেলেতোড়ের পটোপাড়ায় গিয়েছি সমীক্ষার কাজে। পটেরি পাড়ায় গিয়ে দেখেছিলাম পটুয়াদের দুরবস্থা, অবক্ষয়। দেখেছিলাম ওরা পট দেখিয়ে উপার্জনের পথ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ভেলকু চিত্রকর বলেছিল, "এখন আমরা পট ছেড়ে চট ধরেছি। ছেল্যারা বাজারে চটে বসে তরকারি বেচে, রিকশা টানে, চাষে খাটে—আর মেঁয়ালোকরা কাঁচের চুড়ির ডালা (ঝুড়ি) মাথায় ফেরি করে। সাবেকি পট আর নাই। সব বিক্রি করে দিয়েছি। কলকাতার বাবুরা কিনে নিয়ে গেছে। আমরা কজন বুড়া জাতকম্ম করে খাচ্ছি।" অনেক অনুরোধের পর মথুর, গোকুল, প্রমথ চিত্রকর গুটিকয়েক জড়ানো পট এনে দেখাল, ভেলকু চিত্রকর বলল, কিছুদিন আগে বাঁকুড়ার অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় কিছু পট নিয়ে গেছেন, শান্তিনিকেতনের সংগ্রহশালায় রাখবেন। বর্তমানে সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত 'বাঁকুড়ার পট' লোকশিল্প অবলুপ্তির পথে হাঁটছে। একটা লোকশিল্পের অপমৃত্যু বড়ই, দুঃখের, বড়ই বেদনার, বড়ই মর্মন্তুদ। তবে বেলিয়াতোড়ের পট সংরক্ষিত রয়েছে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে। এছাড়া বিষ্ণুপুরে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রয়েছে বেশকিছু পট ও পাটাচিত্র, যে পটগুলো বাঁকুড়ার পটুয়াদের জীবন্ত স্বাক্ষর।

বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের পটে আদিবাসী সাঁওতালদের ধারাতি সৃষ্টিতত্ত্ব পটচিত্র বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের নিজস্ব সম্পদ। সব জেলার পটুয়া চিত্রকরেরা যমপট, জগন্নাথ পট আঁকে। কিন্তু বেলিয়াতোড়ের পটুয়ারা জগন্নাথ পট দেখিয়ে মারাংবুরু সিঞবোঙা জায়েরএরা-র গান গেয়ে উপার্জন করে। বেলিয়াতোড়ের পটুয়ারা জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা পটকেই সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে রূপান্তরিত করে সিঞবোঙা, মারাংবুরু ও জায়েরএরা পটে। এরা পট দেখিয়ে গায় 'ধারতি' সৃষ্টি তত্ত্বের গান।

"হীনকু জয় জয় সিঞবোঙা মারাংবুরু তালারে
জাহের এরা সিকড়ি মালায় মালালাঃআ বোঙা
দীওড়ীয় দিপিলাকাওয়ানায়।
সিঞ বোঙা বাঁইনি গাঁই, কাঁপিল গাঁই
এমানকোক আড়াঁগোলেনা। বারেয়া ফেঁড় ভাসাওলেনা
অনা ফেঁড়রে বাবেয়া তিজু কিন জানামলেনা
উনকিন তিজু খন বারেয়া
হাঁস হাঁসিল চেঁড়ে কিন জানামলেনা....। ইত্যাদি

"জঁহার গঁসাই মারাংবুরু"

"মা আমগে বানচাও তিনিচ্
আলে দ কাঁড়া মানমি কানালে
মা গঁসাই আমাঃ দাঁড়েলে এমকাতাম কানা।
আমগে আঁয়ুর তিনিচ্। আম যেমনলে রাঁসকা
হচয়েৎ মেয়া, আলে হঁ অনকাগে
আমরেন হপন লেকাগে এঞ্জলেম।
ধারতি রেন বোঙা বুরু খন আমগেম সরেশা।
মা গঁসাই নও দুক হারকেৎ
বান চাও কালেমে। খন আর নংকাগে।

পটুয়াদের ধারতি সৃষ্টিতত্ত্বের পটচিত্রে উল্লেখ আছে—
সিঞবোঙা, মারাংবুরু জাহেরএরা তোমাদের জয় হোক। তোমরা ধারতি সৃষ্টি করেছ তোমাদের প্রণাম করি। পিতলের মালায় সাজিয়ে তোমাদের পূজা করি। ধারতি সৃষ্টিতত্ত্বে উল্লেখ আছে—যখন পৃথিবী ছিল না, তখন ছিল জল আর জল। সৃষ্টিকর্তা পাঠালেন বাইনি গাই, কাপিল গাই। তাদের মুখের লালা বা ফেনা পড়ে জলে। সেই ফেনা থেকে সৃষ্টি হয় দুটি পোকা। এই পোকা থেকে জন্ম নেয় একটি হাঁস ও একটি হাঁসিনী। বেনাবনে হাঁসিনী দুটি ডিম পাড়ে। ডিম ফেটে বেরিয়ে আসে এক বালক ও এক বালিকা। এই বালক-বালিকার জন্মের পরমুহূর্তে সিঞবোঙা অর্থাৎ ব্রহ্মা সাত দিন রাত্রি অগ্নিবর্ষণ করেন। এই অগ্নিবর্ষণেও শিশু দুটি জীবিত থাকে। তখন মারাংবুরু ওই শিশুদের পাহাড়ের সুড়ঙ্গে আশ্রয় দেন, এরপর সিঞ বোঙা, মারাংবুরু ও জাহেরএরা জলের তলার সকল জীবকে জলের উপর উঠে আসতে এবং মাটি সংগ্রহ করে আনতে আদেশ করেন। জলের ভেতরের জীবকুল মাটি সংগ্রহ করতে বিফল হলে সর্বশেষে কেঁচো পেটের ভেতরে করে মাটি নিয়ে আসে। মারাংবুরুর আদেশে কেঁচোর মাটি কচ্ছপের পিঠে রেখে কপোতকে ঘাস আনতে আদেশ করেন।
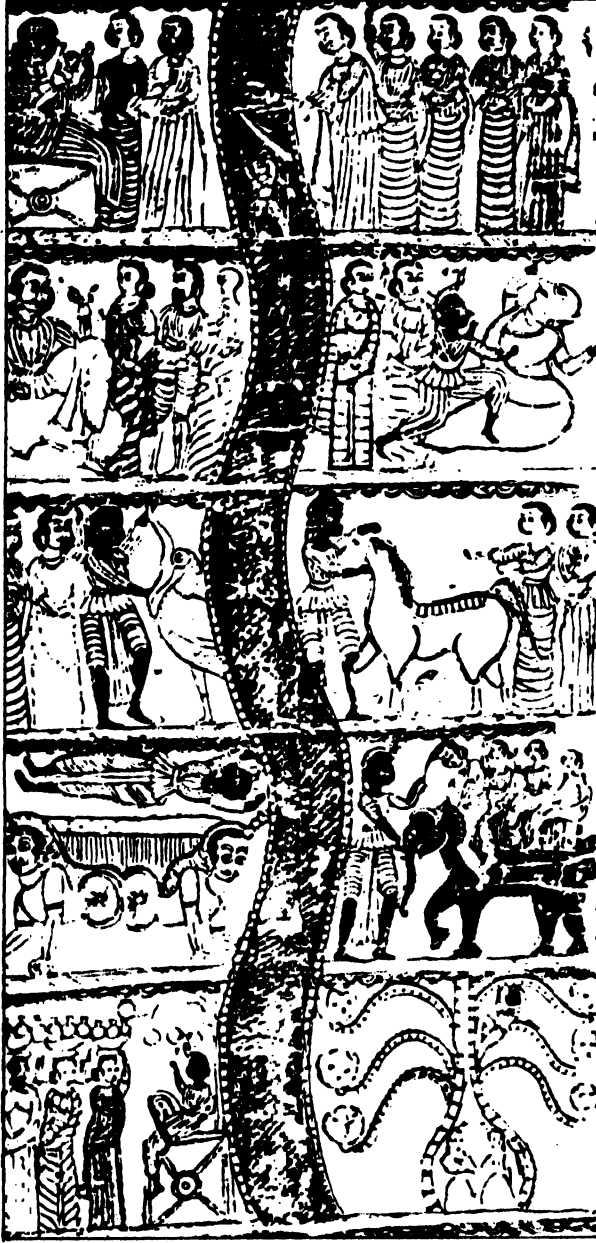
বাংলা পট বা জড়ানো পট

তখন ঘাস আর মাটি দিয়ে আড়াই হাতের বসুমতী সৃষ্টি করেন। বালক-বালিকাদের বসুমতী 'ধারতি'তে বসবাসের আদেশ করেন এবং তারা যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে 'নেবুবুরুবীর' বন্য-সৃষ্টি করে। এদের নামকরণ করা হয় পিলচু হাড়াম ও পিলচুবুড়ি। মারাংবুরু এদের হাতে মাটি খোঁড়ার খন্তা দিয়ে বলেন—তোমরা বনে যাও সেখান থেকে সেকাচাউলী ঘাসের বীজ দিয়ে মদ 'হাড়িয়া' তৈরি কর। সেই মদে মাতাল হলে তাদের কাম জাগে এবং তাদের বিয়ে হয়। তারা সেখানে জন্ম দেয় সাত পুত্র এবং সাত কন্যা। এরপর পিলচু হাড়াম সবসময় মাতাল হয়ে থাকে এবং তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। পিলচু হাড়ামের সঙ্গে যায় সাত পুত্র এবং পিলচুবুড়ির সঙ্গে যায় সাত কন্যা। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর শিকার ক্ষেত্রে উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তখন ওরা পূর্ব পরিচয় বিস্মৃত হয়ে গেছে। এমত সময়ে সাত পুত্র ওই সাত কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলে কন্যারা তাদের পরিচয় জানতে চায়। এ সম্পর্কে সাঁওতালি ভাষায় উদ্ধৃতি—

আপ বাং চিলি জাতি আলেবাং চিলিজাতি
বাবনকুলি বেগার লেখায় বাবন বিহাবাপলাঃয়া
কড়কো লায়েদা আলে দো হেসেন পায়ড়া
কচে কাড়বা, ডাহার ধুড়িরেলি হারা... (ইত্যাদি)

জানা যায়, পিলচু হাড়ামও পিলচুবুড়ির সাত কন্যা পুত্রদের মিলনে এবং মারাংবুরুর কৃপায় সৃষ্টি হয় ধারতি ও মনুষ্য জাতি।

বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের জড়ানো পটে আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ ভাবনা ও ধারতি সৃষ্টিতত্ত্ব কথা, লোককাহিনী বিশেষভাবে পরিস্ফুট ও প্রণিধানযোগ্যও বটে। 'মানব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন ইডেন গার্ডেন, আদম-ইভ বিষয়ক পাশ্চাত্য পুরাণে প্রচলিত আছে, সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি কাহিনীও অনেকটা সেইরকম। তবে পার্থক্য যেটুকু সেটুকু নিপুণ সৌন্দর্যবোধের ও চিরন্তন সত্যধর্মী ইঙ্গিতের।' হিন্দু ধর্মে পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী বর্ণিত আছে রামাঞ্রী পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' কাব্যগ্রন্থে। ধারতি সৃষ্টি সম্পর্কিত সাঁওতালী পটের গানের সঙ্গে শূন্য পুরাণের গানের ও পটের মিল চমৎকার। হিন্দুপল্লীতে একই পটচিত্র দেখিয়ে পটুয়ারা গান গায়—

"নাহিরেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি শশী নহি ছিল নহি রাত্রি দিন।।
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাশ।।
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল।।"

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূমের পটুয়ারা বংশানুক্রমিকভাবে দেব বিশ্বাস, পাপ পুণ্য বিশ্বাস ও ধর্ম বিশ্বাস-নির্ভর জীবনের পট-উপার্জনকে সামনে রেখে অঙ্কন করে চলেছে আজও। এই পটচিত্রগুলোকে বলা যায় লোককলার নিদর্শন।

।। বিষ্ণুপুরের পটচিত্র ।।

প্রাচীন মল্লভূমের রাজধানী শিল্পনগরী বিষ্ণুপুর। মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা শিল্প, একদা ছিল বিশ্ববিখ্যাত। পোড়ামাটির টেরাকোটা শিল্প সৌন্দর্য খ্যাতির পাশাপাশি আর এক বিশ্ব-পরিচিত চিত্রশিল্পের নাম বিষ্ণুপুরী পটচিত্র। দশাবতার তাস পট ও দুর্গাপট আজও সমহিমায় জীবিত এবং শিল্পরসিকের মন কাড়ে। সুপ্রাচীনকাল থেকে এই পটচিত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে বিষ্ণুপুর শহরের শাঁখারি বাজারের ফৌজদার পরিবার। ওরা বংশপরম্পরায় অঙ্কন করে চলেছে দশাবতার তাসের পট ও দুর্গাপট। বিষ্ণুপুর রাজের বদান্যে, শিল্পপ্রীতি ও পরিচর্যার কারণে বিষ্ণুপুরী পট আজও সগর্বে বেঁচে আছে। জানা যায় যে, মহাবনীনাথ বীর হাম্বীর শুধুই 'রাজা' ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পকলাবোদ্ধা। তিনি বিষ্ণুপুরের পটচিত্রকর ফৌজদারদের শিল্পকর্ম উত্তরণের জন্য প্রায় ২৫০ বিঘা আবাদি জমির বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। রাজ দরবারের দেবী মৃণ্ময়ী মন্দিরে পূজিত দুর্গাপট > 'পটেশ্বরী' পট অঙ্কনের জন্যই

'পটেশ্বরী'—প্রাচীন দুর্গাপট ; বিষ্ণুপুরের পট

এই জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাই সেকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনটি দুর্গাপট প্রতিবছর অঙ্কন করে চলেছে ফৌজদারেরা। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে আঁকেন তিনটি পট যথা—১। বড় ঠাকুরাণি, ২। মেজ ঠাকুরাণি ও ছোট ঠাকুরাণি। এই দুর্গাপটকে বলা হয় পটেশ্বরী, পুজো হয় জীতাষ্টমী থেকে দুর্গা সপ্তমীর পূর্ব দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী পর্যন্ত। এছাড়াও এই শিল্পীরাই আঁকেন কুচিয়াকোল রাজবাড়ির পুজোর জন্য আর একটি পট। মার্কিন কাপড়ে খড়িমাটি তেঁতুলবীচির আঠার প্রলেপ দিয়ে বানানো মসৃন জমিনে আঁকেন দুর্গাপট ও দশাবতার পট। ৪ x ৬ দৈর্ঘ্যের দুর্গাপট। এই পটের উপরে থাকে নন্দী ভৃঙ্গি আর মহাদেব। মাঝে থাকে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা আর দুই দিকে শোভাবর্ধন করে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। আর দশাবতার পটে থাকে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রামচন্দ্র, বলরাম, ভৃগুরাম, বুদ্ধ (জগন্নাথ), কল্কি। সারা বছর ধরে পট আঁকা হয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উপার্জনের তাগিদে।

বিষ্ণুপুরের পটচিত্রকরেরা তফসিলি জাতিভুক্ত নয়, এরা সূত্রধর জাতিভুক্ত বর্ণ হিন্দু। এদের উপাধি রাজদত্ত 'ফৌজদার'। আদি-নিবাস জয়পুর থানার অন্তর্গত লাউগ্রাম। এই সূত্রধরেরা মল্লরাজের সৈন্যবাহিনী 'ফৌজ'-এ যোগ দিয়েছিল। কার্তিক সূত্রধর রাজানুদেশে ওড়িশা রীতিশৈলীতে দশাবতার তাসের পট অঙ্কন করে বীর হাম্বীরকে সন্তুষ্ট করায় রাজা কার্তিক সূত্রধরকে ফৌজদার উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং শিল্পকর্মের উত্তরণকল্পে ভূমিদান করেছিলেন। ভূমিস্বত্বভোগী হিসেবে ফৌজদার পরিবার বংশপরম্পরায় রাজবাড়ির জন্য দুর্গাপট অঙ্কন করে চলেছেন। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বলা যায়। বিষ্ণুপুর-মল্লভূম-এর সর্বশেষ রাজা কালীপদ সিংহদেব ও তদীয় সুহৃদ বন্ধু ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্তী হয়ে একটি ৪ x ৬ মাপের অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত দুর্গাপট ও দশটি দশাবতার তাস পট উপহারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। আমি আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি হিসেবে দুর্গাপট চিত্রটি সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমার পরম হিতৈষী ডঃ দেবব্রত সিংহঠাকুর ও কুচিয়াকোল রাজবাড়ির সন্তান সত্যব্রত সিংহঠাকুর আমাকে একটি অমূল্য পুঁথি-পট প্রদান করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের এই পটচিত্রগুলো ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত অম্বরী তামাক, মতিচুর, বালুচরি ও মল্লভূম শাড়ি, গোযানে ব্যবহৃত লণ্ঠন, টেরাকোটা শিল্প, পোড়ামাটির ঘোড়া এবং বিষ্ণুপুরী পট।

বিষ্ণুপুরের দশাবতার গোলাকার তাসের পটচিত্রের 'পটেশ্বরী' পটচিত্রের মতন একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। এই শিল্পের প্রাচীন ইতিকথা যেমন আছে, তেমনই আছে ধর্মীয় ভাবনাচিন্তা, প্রভাব ও সাহিত্য-সংস্কৃতি। তাই বলি, দশাবতার তাসপটকে খেলার তাসের সঙ্গে তুলামূল্য করলে পটচিত্র শিল্পকে এবং পটশিল্পীদের শিল্পকলার যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে না। তথাপি দশাবতার তাসকে খেলার সামগ্রী হিসেবে ধরলেও কিন্তু তাস চিত্রাঙ্কন শিল্পটিকে কোনমতে গুরুত্বহীন বলে গণ্য করাটাও যথাযথ হবে না। দশাবতার তাস পটচিত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, "মৃত্তিকা শিল্পীদের মধ্যে গদাধর ফৌজদার, কেদার ফৌজদার (সূত্রধর) প্রভৃতির যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং দশাবতার তাস চিত্রণেও তাঁরা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে যতীন ফৌজদার, সুধীর ফৌজদার, পটল ফৌজদার, ভানুপদ পাল, অনিল সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীরা বিষ্ণুপুরে পরিচিত। চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা ক্রমে এদের কমে যাচ্ছে কারণ বর্তমান সমাজে এদের চিত্র বা মূর্তির সমাদর নেই।" আমার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের পটশিল্পী শ্রীসুধীর ফৌজদারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি সরকারি চাকরির ফাঁকফোকরে দুর্গাপট ও দশাবতার তাসের পট চিত্রিত করতেন। এই জাত শিল্পীর হাতের পটের ভীষণ চাহিদা ছিল। কতই না দেশ-বিদেশের শিল্পরসিক মানুষ আসতেন তাঁর সান্নিধ্যে। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরের পাশেই শাঁখারিপাড়ায় সুধীর ফৌজদারের বাড়ি। আমি তাঁর কাছে শুনেছিলাম, জেনেছিলাম বিষ্ণুপুরের পটেশ্বরী দুর্গাপট ও দশাবতারের গোল পটের চাহিদার কথা। তবে তিনি বলতেন, পরিশ্রমমাফিক পট-এর দাম পাওয়া যায় না। শিল্পের দাম অর্থমূল্যে দেওয়া যায় না। শিল্পীরা তাদের শিল্পের সঠিক মূল্য কোনদিনই পায় না। মনের মাধুরী মিশিয়ে শিল্পী স্বকীয়তায় যে শিল্পকলা রূপারোপ করে অর্থমূল্যে কী তার মূল্যায়ন করা যায়, যায় না। এটা চিরন্তন সত্য। প্রকৃত শিল্পীর বিশেষত লোকশিল্পীদের যেন দুঃখ দিয়েই জীবন গড়া।
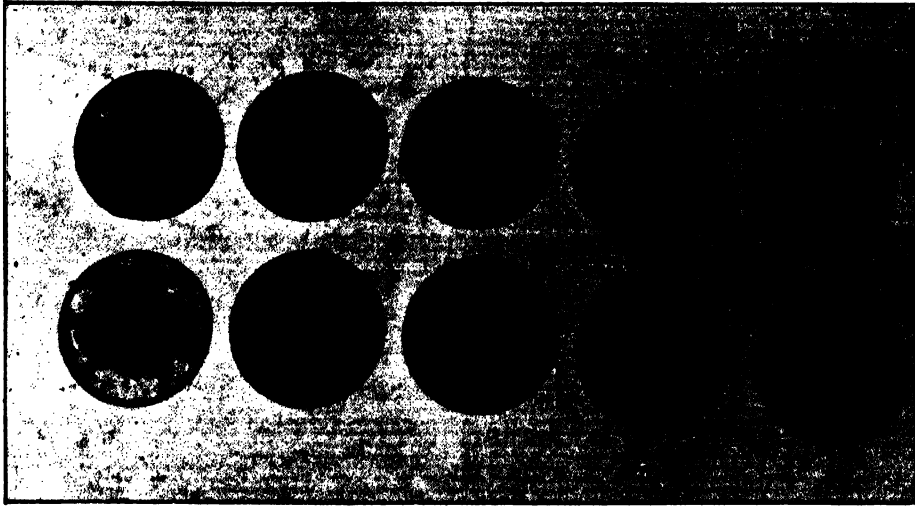
প্রাচীন দশাবতার তাস পট, বিষ্ণুপুর

এখন দেখা যাক বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাস পটচিত্রে দশাবতার কেমন করে এল। দুর্গাপট "পটেশ্বরী" দুর্গাপুজোর জন্য রাজাদেশে অঙ্কন করানো হয়েছিল দেবী দুর্গার প্রতীক হিসেবে কিন্তু তাস-এ দশ-অবতার ? সে সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে জানা যায়, দশাবতার তাসের বিন্যাসে কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" কাব্যের "প্রলয়-পয়োধিজলে"-র শ্লোকের প্রভাব রয়েছে। এ সম্পর্কে পুরাতাত্ত্বিক ডঃ মানিকলাল সিংহের অভিমত—"জয়দেব দশাবতার বন্দনায় যেসব অবতারের অবতারণা করছেন তাদের প্রথম তিনটি অবতার বৈদিক, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অবতার পৌরাণিক। তার মধ্যে দাশরথী রামকে পুরাণে গ্রহণ করা হয়নি। শবরীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর নারদ পঞ্চরাত্রে রামচন্দ্রকে অবতার বলে মেনে নেওয়া হয়। নবম অবতার বুদ্ধ ও দশম অবতার কল্কি ঐতিহাসিক।" তিনি আরও বলেছেন, "দশাবতার তাসের কল্কি অবতারের চিত্র মুঘল রাজপুরুষের। কল্কি অবতার পায়জামা ও জামা পরিহিত।" বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাস পটচিত্রে যে মুঘল চিত্রশৈলীর প্রভাব নেই এমন কথা বলা যাবে না। কারণ মুঘল বাদশাহী আমলে মুঘল তাসের প্রচলন ছিল। মুঘল তাসের মোট সংখ্যা ১৪৪ আর বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাসের মোট সংখ্যা ছিল ১২০। তবে দশাবতার তাসের স্বতন্ত্রতা এখানেই যে, এই তাসের মুখ্য পট হল দশটি অবতারের চিত্রে চিত্রিত। পটচিত্র বর্ণনায় দেখা যায়, মৎস্যের প্রতীক মাছ (মীন), কূর্মের কচ্ছপ (কাছিম), বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের করমফুল, বামনের ভাণ্ড, বলরামের গদা, ভৃগুরামের কুঠার, বুদ্ধের পদ্ম, কল্কির ছোরা (কাটারি) গোলাকৃতি কাপড়ের জমিনে নানান দেশজ রং প্রয়োগে অঙ্কিত-চিত্রিত হয়। বর্তমানে তাস খেলার জন্য দশাবতার তাসের প্রয়োজনের দিন ফুরিয়ে গেলেও দশাবতারের দশটি পটচিত্রের চাহিদা বেড়েই চলেছে এবং গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে 'দশাবতার পট'-এর বেশ চাহিদা আছে। বেলিয়াতোড়ের গুটানো বা জড়ানো পটের ডিজাইন নকশা আর বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসপট ও 'পটেশ্বরী' পটচিত্রের অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত ডিজাইন নকশা স্থান করে নিয়েছে বালুচরী মল্লভূম শাড়ির অঙ্গসজ্জায়। বিষ্ণুপুরী পট আজও বেঁচে আছে কিন্তু বেলিয়াতোড়ের পট বিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে। বেঁচে আছে আশুতোষ মিউজিয়ামে যামিনী রায়ের সংগ্রহশালায় ও শান্তিনিকেতন এবং বিষ্ণুপুরে আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি পুরাকৃতিভবনে।

পটীদার (চিত্রকর)

পটীদার (চিত্রকর) নামের আর একশ্রেণীর চিত্রকর পটুয়ারা প্রাচীনকাল থেকে ইদানীংকাল পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় তো বটেই বেঁচে আছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। এরা তফসিলি জাতি, উপজাতি শ্রেণীভুক্ত। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের সন্নিকটে ভরতপুর, কালীপাহাড়ী, রানীবাঁধ, খাতড়া, হিড়বাঁধ, তালডাংরা, ওন্দা ইত্যাদি গ্রামে পটীদারদের বাস, এখনও কয়েকজন পটীদার আছে। মৃতমানুষের পট দেখিয়ে, মৃতের কৃতকর্মের কথা শুনিয়ে উপার্জনই এদের জীবিকা। বাঙালি সমাজের গ্রাম্য জীবনের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে পটীদারদের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে চলেছে। দেখা যায় কোনও এক গ্রামের চাষীবাসী বিত্তশালী, মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রিয়জন মারা গেলে মৃতের পট সঙ্গে নিয়ে পটীদারেরা উপস্থিত হয় শ্রাদ্ধবাসরে। সেখানে পট দেখিয়ে পটের গান গেয়ে বলে, "তুমার বাপের চেহারা পটে উঠেছে গো, পটীদারের পটে। আকাশের পানে চেয়ে দেখ গো তুমার বাপ সগ্‌গে যাচ্ছে গো, সগ্‌গে যাচ্ছে। তুমার বাপের ভাত মুড়ি খাবার কাঁসার থালা, জামবাটি, গেলাস আমাকে দান দিতে বলে গেছে, দিয়ে দাও, নচেৎ সগ্‌গের পথ আটক হবেক গো, আটক হবেক......দিয়ে দাও গো দিয়ে দাও......"। শোকাভিভূত পরিবার পটীদারের স্তোকবাক্যে অভিভূত হয়ে মৃতের স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে মৃতের ব্যবহৃত থালা, বাটি গেলাস চালকলাইসহ পটীদারকে দান করে দিত, এখনো দেয়। আদিবাসী সাঁওতালদের দেখেছি গরু-বাছুর পর্যন্ত দান করে দিতে। এখনও গ্রাম্য জনজীবনে হিন্দু ও সাঁওতালদের মধ্যে পটীদারকে মৃতের সংগতির উদ্দেশ্যে দান করার প্রথা ও রীতি প্রচলিত রয়েছে। আজও গ্রামবাংলার মানুষকে 'যমপট'কে মান্য করতে দেখা যায়, হিন্দুরা যেমন মান্য করে

আদিবাসী সাঁওতালেরা ততোধিক মান্য করে। এখানে বলে রাখা ভালো, এই প্রথা, সংস্কৃতি না অপসংস্কৃতি সে প্রশ্ন তোলাটাই অবান্তর। শ্রদ্ধাটাই এখানে বড় আর পটীদারদের অঙ্কিত পটগুলোও লোকচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে অল্প পরিসরে বাঁকুড়া জেলার পটচিত্র এবং পটুয়া সমাজ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল। এখনও বাঁকুড়ার পটুয়াদের পটচিত্র অনেকের কাছে অনালোচিত ফলে "বাঁকুড়ার পট" লোকশিল্প এবং শিল্পীরা শিল্পরসিকদের কাছে অজানা রয়ে গেছে এটা স্বীকার করে নিতেই হয়। বাঁকুড়া তথা বাংলার পট ও পটুয়া চিত্রকরদের লোকশিল্প জনসমক্ষে তুলে ধরার স্বার্থে এবং মৃতপ্রায় লোকশিল্পটির পুনরুজ্জীবনদানকল্পে ১৯৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ তিনদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতার যৌথ উদ্যোগে তৎসহ বাঁকুড়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনায় বিশ্বখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের পৈত্রিক বসতবাটিতে ও প্রাঙ্গণে একটি পট প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ এবং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্রের সভাপতি সুধী প্রধান মহাশয়। এই পটচিত্র প্রশিক্ষণ শিবিরে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম থেকে ১৯জন পটুয়া যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মথুর চিত্রকর, সনাতন চিত্রকর, হাসু চিত্রকর (বেলিয়াতোড়), সাধন গরাই (হীড়বাঁধ, বাঁকুড়া), অরুণ পটুয়া, নান্টু পটুয়া (বীরভূম), শেখ মেহিনুর চিত্রকর, দুঃখীশ্যাম চিত্রকর, গোপাল চিত্রকর, স্বর্ণ, বিরজা চিত্রকর, নয়াগ্রাম (মেদিনীপুর) প্রমুখ। এরা শিবিরে বসে পটচিত্র সম্পর্কে ভাবের বিনিময় ও আলোচনা করে। আমি এই শিবিরে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পটচিত্রকর ও পটুয়াদের সমাজজীবন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে খোঁজখবর নেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। জেনেছিলাম বাংলা পটচিত্রের সম্ভাবনাময় ধারার কথা, পরিচর্যার কথা ও চর্চার কথা। জেনেছিলাম প্রচারের অভাবে বাঁকুড়ার পটের প্রভাব দিনে দিনে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। এই শিবিরে পটুয়াদের পট ও পটুয়া সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে কতিপয় প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে অনেকে বাড়ির ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের জন্য লোকশিল্প যথা—পট, টেরাকোটা, ডোকরা প্রভৃতি হস্তশিল্পাদি ব্যবহার করতে স্বচ্ছ মননের পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু প্রচারাভাবে অনেকে জানেন না এই লোকশিল্প কোথায় পাওয়া যায়। পটচিত্র প্রশিক্ষণ শিবির থেকে আমার উপলব্ধি হয়েছে যদি পটোদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, যদি মূলধন লগ্নি করা যায়, যদি বাজার নির্মাণ করা যায়, তবেই পট নামক লোকচিত্র শিল্পটি পুনরুজ্জীবন লাভ করতে পারবে, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই।

আধুনিক পটশিল্পী, রামকিংকর সিংহ, ভাদুল বাঁকুড়া

সহায়িকা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা,
ঋণ স্বীকার

১। বাংলার লোকসংস্কৃতি—ড আশুতোষ ভট্টাচার্য
২। অর্ধশতাব্দীর বাংলা—শান্তাদেবী
৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ
৪। বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা—ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত
৫। The Patua-art of Bengal–Jamini Roy
[The art of Jamini Roy, A centenary volume]
৬। The renaissance of Patachitras.
[Business Standard Sunday 6 July, 1980]
৭। সুচেতনা শারদ সংখ্যা ১৪০৭ (২০০০) বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ
৮। লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম, বাঁকুড়া
৯। পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি—ডঃ মানিকলাল সিংহ

পটচিত্র

১। কালীঘাটের পট।
২। বেলিয়াতোড়ের জগন্নাথ পট।
৩। "পটেশ্বরী" দুর্গাপট। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন পট।
৪। বিষ্ণুপুরের দশাবতার পট।
৫। আধুনিক পট—শিল্পী রামকিঙ্কর সিংহ। ভাদুল, বাঁকুড়া
৬। বাংলা পট। জড়ানো পট

পটচিত্র লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

আলোকচিত্র তুলেছে—স্টুডিও মনটেজ, বাঁকুড়া

লেখক : বাঁকুড়ার সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সুচেতনা সাহিত্য পত্রিকা ও বাঁকুড়া সংস্কৃতি পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক।

পাথরের আটচালা মন্দির ও মন্দিরলিপি, তেজপাল ('বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' থেকে গৃহীত)

খড়বাংলা মন্দির ও মন্দিরলিপি, বিষ্ণুপুর
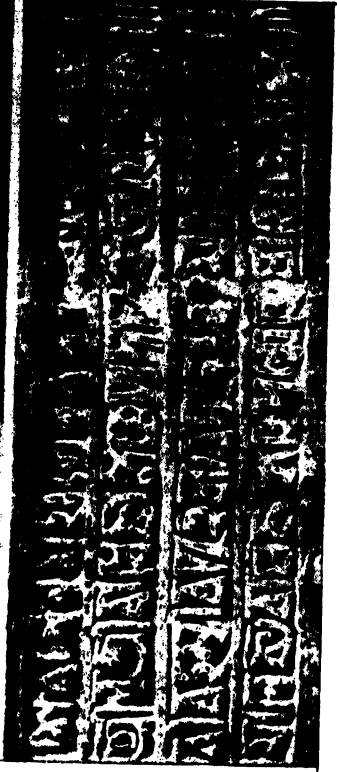
বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি

উপেন কিসকু

মোটকথা, আদিবাসী সমাজজীবন এখনও সমষ্টিকেন্দ্রিক। নাচ, গান ও সামাজিক প্রতিটি ক্রিয়াকর্মেই ব্যক্তি থেকে সমষ্টিই প্রধান। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী সমাজজীবনেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। তা সত্ত্বেও এদের সংস্কৃতির মূল নিহিত একাত্মবোধের মধ্যে এবং সমষ্টিগত ধারণায়।

রা ঢ় বঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলা। ১৮৮১ সালে বর্তমান বাঁকুড়া জেলা স্থায়ী রূপ লাভ করে। এর পূর্বে ২৪ বার জেলার সীমানা পরিবর্তন করা হয়েছে। জঙ্গল মহল হিসেবে পরিচিত এ জেলার বিভিন্ন অংশকে কখনও বর্ধমান বা মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আর এসবই করা হয়েছে বিদেশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি ও এলাকায় স্বাধীনচেতা জনগোষ্ঠীগুলিকে পদানত করার তাগিদেই। বিদেশি শোষণ ও শাসনকে অস্বীকার করে বারবার অস্ত্র তুলে নিয়েছেন এলাকার বনজীবী, কৃষিজীবী মানুষ। একাত্ম হয়েছেন, ঐক্য গড়ে তুলেছেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই।

ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাব দুশো বৎসর পূর্বেই সংগঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক চুয়াড় বিদ্রোহ। পরবর্তীকালে পাইক বিদ্রোহ (১৭৬৭—১৮১৬), কোল বিদ্রোহ (১৮৩২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), ভূমিজদের গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা (১৮৩২), মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫—১৯০০) বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তকে আলোড়িত করেছিল। এই বিদ্রোহের উত্তরপুরুষ বর্তমান আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিই বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে।

আদিবাসী শব্দটি সাধারণত ইংরেজি aboriginal or Tribe শব্দের বাংলা অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ইংরেজিতেও আদিবাসী শব্দটি অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এ শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে আদিম আধিবাসী। ভারতবর্ষের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ৮ কোটি হলেও পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা ৩৮ লক্ষ। বাঁকুড়া জেলায় এদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯০ হাজার। রাজ্যের মোট আদিবাসী জনসংখ্যার ৮.১৬ শতাংশ বাঁকুড়া জেলায় বসবাস করেন। জেলার আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সাঁওতাল (৮০.০৪ শতাংশ) সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যদের মধ্যে ভূমিজ (১০.৮৯), মাহালি (.৪৯), কোড়া (৩.৩৯) খেড়িয়া/শবর (.৬৬), মুণ্ডাদের (.৫৮) বসবাস এ জেলায়।

বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি প্রোটোঅস্ট্রলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী নিজস্ব ভাষা ভুলে বাংলাভাষা গ্রহণ করলেও এদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। যেমন ভূমিজ, খেড়িয়া/শবর প্রভৃতি। এমন কি এঁরা নিজেদের হিন্দুধর্মের মানুষ বলেই পরিচয় দেন। যদিও গাছপূজা, পাথরপূজা, কালীপূজা, গরাম বা ধর্মদেবতা প্রভৃতি লোকায়ত দেব-দেবীর পূজা করে থাকেন। এঁরা পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের অঙ্গীভূত হচ্ছেন।

এতদসত্ত্বেও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাঁকুড়া জেলাতেও বেশ কিছু জনগোষ্ঠী (যেমন সাঁওতাল-মুণ্ডা) নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা সজীব রেখে বসবাস করছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পিছনে যেমন আদিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রেও এটা সমানভাবে সত্য। যুগ যুগ ধরে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী ভাবনা বাঁকুড়াকে নতুন শক্তি দিয়েছে। এ ধারা আজও অব্যাহত। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব বহু ঝড়-ঝাপটা, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও আদিবাসী
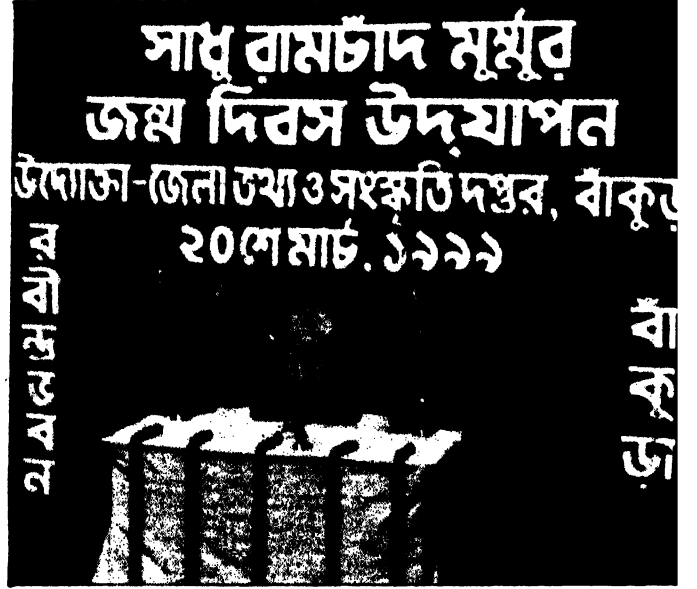
মনীষী সাধু রামচাঁদ মুর্মুকে প্রতি বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন বাঁকুড়াবাসী সকলেই

সংস্কৃতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে আছে। এর মূল কারণ এর দৃঢ়ভিত্তিক এবং সহযোগিতাপূর্ণ কাঠামো। শত অত্যাচার এবং বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও এর স্বাতন্ত্র্য এবং জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করা যায়নি।

এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে আদিবাসী সমাজ ও সাংস্কৃতিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন এসেছে যুগ যুগ ধরে সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতিতে ও চিন্তাধারায়। সেগুলিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে আপন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। কারণ, যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেছে।

বাঁকুড়ার আদিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগই কৃষিজীবী। শবরদের একাংশ এখনও ফলমূল আহরণকারী থেকে গেছে। মাহালি জনগোষ্ঠী কুটিরশিল্পী হিসাবে পরিচিত। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস, কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বিভিন্ন পূজা-পার্বণ এবং হাটবাজারের মাধ্যমে, যোগাযোগের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বহুদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও, বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, একই শিক্ষার অঙ্গনে শিক্ষা লাভ প্রভৃতির কারণে বৃহত্তর জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। অন্যদের পূজা উৎসব অনুষ্ঠানে শুধু যোগদান নয়, অনেকে পূজা বা উৎসবকেই নিজস্ব বলে গ্রহণ করে নিচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের নামকরণের মধ্যেও এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের আদিবাসীদের ন্যায় বাঁকুড়া জেলার আদিবাসীগণও জীবিকার সন্ধানে কখনও চা-বাগানে, কয়লাখনিতে যেতে বাধ্য হয়েছে। এদের সামান্য অংশ ফিরে এলেও বেশির ভাগই ফিরে আসেনি। প্রতি বৎসরই বহুসংখ্যক আদিবাসীকে চাষের প্রয়োজনে বর্ধমান ও হুগলিতে যেতে হয়। কৃষিমজুরদের একটা অংশ ওখানে স্থায়িভাবে বসবাস করলেও বেশির ভাগ অংশটাই প্রতি বৎসর কাজের শেষে ফিরে আসে। তাছাড়া বহু

সংখ্যক আদিবাসী যুবক-যুবতী পুলিশ বিভাগে, সরকারি দপ্তরে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত। এভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেছে, এর মধ্য দিয়েও আদিবাসী সমাজজীবনে নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছে।

জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দর্শন ও মানসিকতা গড়ে উঠেছে। অতীতে আদিবাসীদের জীবন ছিল জঙ্গলকেন্দ্রিক। জঙ্গলের ফলমূল আহরণ, পশুপাখি শিকার এবং জঙ্গল সাফ করে জমি হাসিল করে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা ছিল মূল জীবিকা। জঙ্গল ধ্বংস হওয়ায় এবং পশুপাখি কমে যাওয়ায় শিকার এখন আনুষ্ঠানিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও জঙ্গল আদিবাসীদের নিকট জীবিকা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রেই অবস্থান করছে। সেজন্য জঙ্গল রক্ষায় আদিবাসীদের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার বন রক্ষা কমিটির মাধ্যমে বন রক্ষার কাজে জঙ্গল সংলগ্ন আদিবাসীদের যুক্ত করেছেন। এদের বেশির ভাগই আদিবাসী। বনসম্পদের এক-চতুর্থাংশ বন রক্ষা কমিটির সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকে কংগ্রেসের রাজত্বকাল পর্যন্ত বনজসম্পদের অধিকার থেকে আদিবাসীদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। এখন সে অধিকার তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এর পূর্বেও আদিবাসী মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই বহু এলাকাতে জঙ্গল রক্ষার কাজে ব্যাপৃত থেকেছে। এর বহু উদাহরণ দক্ষিণ বাঁকুড়াতে ছড়িয়ে আছে।

আদিবাসী সমাজে পূজা ও উৎসব অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বিভিন্ন পূজাকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন উপজীবিকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পূজা বা উৎসবের উৎপত্তি। অতীতে শিকার যখন মুখ্য উপজীবিকা ছিল, তখন শিকারকেন্দ্রিক বহু উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এখনও এ সবের অবশেষ রয়ে গেছে। যেমন প্রতি বৎসর সাকরাত বা মকর সংক্রান্তির লক্ষ্যভেদ করার অনুষ্ঠান। সারা গ্রামের যুবকরা তীর-ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ করার নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন। যিনি প্রথম লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন তাঁকে ওই বৎসরের জন্য গ্রামের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁকে কাঁধে চড়িয়ে নাচতে নাচতে গ্রামের মোড়ল

> **বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার বন রক্ষা কমিটির মাধ্যমে বন রক্ষার কাজে জঙ্গল-সংলগ্ন আদিবাসীদের যুক্ত করেছেন। এদের বেশির ভাগই আদিবাসী। বনসম্পদের এক-চতুর্থাংশ বন রক্ষা কমিটির সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকে কংগ্রেসের রাজত্বকাল পর্যন্ত বনজসম্পদের অধিকার থেকে আদিবাসীদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। এখন সে অধিকার তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।**

বা মাঝির ঘর নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মোড়লের পক্ষ থেকে নতুন কাপড় দিয়ে বরণ করা হয়। অতীতের ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদেই আজও বহুসংখ্যক সাঁওতাল আদিবাসী নির্দিষ্ট দিনে রানিবাঁধ, রাইপুর, সারেঙ্গা, সোনামুখী বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে শিকারের উদ্দেশ্যে সমবেত হন। সুতান টাণ্ডিতে রাত্রিযাপন করেন। নাচগান হয়। অমীমাংসিত সামাজিক বিরোধের বিষয়গুলি বিচার করা হয়। সবচেয়ে বড় শিকার উৎসব হয় বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অযোধ্যা পাহাড়ে। বাংলা-বিহার-ওড়িশা থেকে ১০/১৫ হাজার আদিবাসী মানুষ সমবেত হন অযোধ্যার পাহাড়ে। প্রবাদ আছে 'যে যুবক অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার যায়নি, সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়নি।' হিংস্র জীবজন্তুর আধিক্য ছিল বলে অযোধ্যা শিকার থেকে জীবিত ফিরে আসাকে বীরত্বপূর্ণ কাজের মর্যাদা দেওয়া হত। সেজন্য এ প্রথা এখনও চালু আছে যে শিকারে যাওয়ার সময় প্রতি ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর হাতের নোয়া খুলে নিয়ে যান। শিকার শেষে ফিরে এলে গ্রামে উৎসবের ধুম পড়ে যায়। সারা গ্রাম বেরিয়ে পড়ে, বাড়ির মেয়েরা পুরুষদের বরণ করার জন্য ঘটি জল নিয়ে গ্রামের প্রান্তে সমবেত হন। পা ধুয়ে নতুন কাপড় দিয়ে বরণ করেন। স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় হাতের নোয়া পরিয়ে দেয়। সর্বোচ্চ বিচার (সুপ্রিম কোর্ট) 'ল মহল' বিচারও অযোধ্যাতে সম্পন্ন হয়। এভাবে উৎসব আকারে না হলেও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিও শিকারে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

আদিবাসীদের প্রায় সকলেই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। সেজন্য উৎসব অনুষ্ঠানগুলি কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ১ মাঘ নববর্ষ হিসাবে চিহ্নিত। সেদিন থেকেই শিকার আরম্ভ হয়। তাছাড়া এখ্যান হিসাবে দিনটি পালন করেন। ভূমিজ, শবর আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি গরাম, বড়াম, কুদরাসিনি, ন্যাকড়াসিনি, চন্দ্রসিনি প্রভৃতি বা কোনও পাহাড়ি লোকায়ত দেবদেবীর পূজা করে থাকেন।

এছাড়া প্রকৃতি যখন নতুন পাতা ও ফুলে নিজেকে সাজিয়ে তোলে তখন দোল পূর্ণিমার সময়কালে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাহা বা ফুল উৎসবে মেতে ওঠে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাহা উৎসব অতিক্রান্ত না হলে নতুন ফুল, ফল বা পাতা কিছুই ব্যবহার করেন না। মুণ্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি গোষ্ঠী সাহ্‌রুল উৎসব হিসেবে এটিকে পালন করে থাকেন। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির নিকট এটি বসন্ত উৎসব। বাহা বা সাহ্‌রুল জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়। তিনদিন যাবৎ অনুষ্ঠানটি পালিত হয়।

বাঙালির দুর্গাপূজার সময় সাঁওতাল জনগোষ্ঠী চারদিন যাবৎ পুরুষেরা দাঁসায় নাচ করেন। মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, মেয়েদের ব্লাউজ এবং শাড়ি ধুতির মতো পরিধান করেন। হাতে ধনুকের সঙ্গে লম্বা লাউ দিয়ে সুন্দর বাদ্য তৈরি করা হয়। এ নাচ খুবই জনপ্রিয়। নিজগ্রাম বা প্রতিবেশীর গ্রামে প্রতিটি ঘরে ঘুরে ঘুরে সারাদিন ধরে এ নাচ চলে। নাচের বা গানের সঙ্গে প্রায়ই 'হায় হায়' আওয়াজ তোলেন—এটা যেন বিলাপের সুর। এ থেকে মনে হয় কোনও জাতীয় বিপর্যয়ের সময় সংগঠিতভাবে দেশান্তরিত হওয়া বা ছদ্মবেশে অস্ত্র সহ শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে পশ্চাদপসরণকে স্মরণ করার জন্যই এ নাচ। যদিও দুধরনের প্রবাদই লোকমুখে শোনা যায়।

এছাড়া অন্য পূজা বা উৎসবগুলি সমস্তই ফসলকেন্দ্রিক। বাঙালিদের বারো মাসে তের পার্বণের মতো ফসলচক্রের বিভিন্ন

আদিবাসী নৃত্য একতা ও শিল্প-সৌন্দর্যের ছন্দময় প্রকাশ

সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যেমন বীজ বপনের সময় এবং শিম রোপণের সময় আষাঢ়ি ফসল নিড়ানোর সময় হেড়হেৎ সিম, ভাল ফলনের জন্য ভাদ্র মাসে করম পূজা হয়ে থাকে। চাষ শেষ হলে কৃষিকার্যের প্রধান সহায়ক গোরুর জন্য গো-বন্দনা (বাঁদনা) বা সহরায় উৎসব পালিত হয়। রাঢ়-বাংলার বহু কৃষিজীবী গোষ্ঠী এ উৎসব পালন করে থাকেন। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি গুরুত্ব সহকারে এ উৎসব পালন করে থাকেন। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সহরায় উৎসব পাঁচ দিন যাবৎ জাতীয় উৎসব হিসেবে পালন করেন। এজন্য কিছু গ্রামে দিন নির্দিষ্ট করা থাকলেও অধিকাংশ গ্রামে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরবর্তী পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত সকলের সুবিধামতো দিন স্থির করা হয়। উত্তর বাঁকুড়ার আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি মকর সংক্রান্তির সময়কালে এ উৎসব পালন করেন। বাহা এবং সহরায় এ দুই জাতীয় উৎসবে প্রতি বৎসর মেয়েজামাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নতুন কাপড় দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

এছাড়া ফসল ওঠার সময় অধিক শস্যের আশায় জাহ্বাড় এবং ফসল ওঠার পর নাওয়াই বা নবান্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মাঘ মাসে মাঘ-সিম-পূজা গ্রামের যুবক-যুবতী সকলের নিরাপত্তার জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

ফসল ওঠার পর সকলের ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসবের জন্য অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে রুগুা বা ছোট মকর এবং পৌষ সংক্রান্তিতে সাকরাত বা বড় মকর খুব ধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল ব্যতীত অন্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি টুসু পরব হিসেবেও আমাদের জেলায় পালন করে থাকেন।

আদিবাসী সমাজ পরিচালিত হয় পঞ্চায়েতের মতো সুন্দর সমাজ কাঠামোর দ্বারা। গ্রামস্তরে মাজহি, জগ-মাজহি, পারানিক, জগ-পারানিক, গোডেৎ এবং নায়কে মোট ছ'জনকে নিয়ে গ্রামের বিচার থেকে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং গ্রামীণ পূজা প্রতিটি কাজই সম্পন্ন করেন। এঁদের বাদ দিয়ে কোনও কাজ হয় না। প্রতি ব্যক্তির জন্য কাজ নির্দিষ্ট করা আছে। দ্বিতীয় স্তর কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পরগনা এবং কয়েকটি পরগনার ওপর দিহরী সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এদের ওপর থাকে সর্বোচ্চ সংস্থা 'ল মহল'। ল মহলের নির্দেশ সকলের নিকট অবশ্যপালনীয়। বর্তমানে পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনিক কোর্ট-কাছারি চালু থাকায় অনেক আদিবাসী এসবের আশ্রয় নিচ্ছে বলে আদিবাসীদের পুরানো কাঠামো শিথিল হলেও গ্রামীণ ক্ষেত্রে এর প্রভাবকে এখনও অস্বীকার করা যায় না।

আদিবাসী সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পর্যালোচনা করলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় দেখতে পাব। সমাজ পরিচালিত হয় সাম্যবাদী ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে। কয়েক বছর পূর্বেও চাষ বা গৃহনির্মাণের কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করত। এখন সে স্থানে মজুরি দখল করলেও কোনো কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে এর অবশেষ রয়ে গেছে। জন্ম বা মৃত্যুতে পুরো গ্রাম অশৌচ পালন করে। শুদ্ধ হওয়ার অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত গ্রামের কোনো পরিবারেই কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয় না। শিকার থেকে প্রাপ্ত পশু-পাখির মাংস যত কমই হোক সমানভাবে ভাগ করে খায়। পুরুষ-নারীনির্বিশেষে সকলেই শ্রমদান করেন। শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করেন। কন্যাপণ প্রথা চালু আছে। অন্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি আলোচনা করে কন্যাপণ নির্ধারণ করে থাকে। পরিমাণ নামমাত্র। কিন্তু সাঁওতাল সমাজে কন্যাপণ মাত্র সাত টাকা। তিনটে কাপড় এবং একটি গাইগরু দেওয়ার নিয়ম আছে। ফলে বধূ হত্যার মতো ঘটনা আদিবাসী সমাজে এখনও অনুপস্থিত। ভূমিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে ভেদাভেদ থাকলেও সাঁওতাল সমাজে অনুপস্থিত। স্বামী পরিত্যক্ত বা বিধবাদের পুনর্বিবাহ করার রীতি আছে। এরা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নয় আবার শত্রুর প্রতি থাকে তীব্র ঘৃণা। জীবনটা এদের কাছে কাজ করার জন্য। লাভ-লোকসানের হিসেব এক্ষেত্রে গৌণ। অল্পে তুষ্ট, সঞ্চয় করার অভ্যাস এখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। প্রতিদিন কাজ করে যা রোজগার করেন সাধারণত তাই ব্যয় করেন। নাচগানের প্রশিক্ষণের জন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। গ্রামে বড়দের সঙ্গে নাচগান উৎসবে যোগদানের মধ্য দিয়েই ব্যবহারিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি স্বচ্ছন্দে আয়ত্ত করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীগণ নাচ গানের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন। শহরে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে অপরাধবোধহীন এ ধরনের আনন্দানুষ্ঠান কল্পনাই করা যায় না।

মেয়েরা খোঁপায় ফুল গুঁজে পরিপাটি করে সাজতে ভালবাসেন। ঘরদোর খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নিজস্ব তৈরি রং (গিরু পাথর, খড়, গোবর) দিয়ে ঘর-দোর অপূর্ব শিল্পসুষমায় সাজিয়ে তোলেন। দেওয়ালে যে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় সেটা সিমেন্টের মতো শক্ত। বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় থাকে না। এটা এদের নিজস্ব পদ্ধতি। আলপনা ও বিভিন্ন দেওয়ালচিত্র দিয়ে ঘর সাজানোর মধ্য দিয়ে সাঁওতাল রমণীর উন্নত শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

মোটকথা, আদিবাসী সমাজজীবন এখনও সমষ্টিকেন্দ্রিক। নাচ, গান ও সামাজিক প্রতিটি ক্রিয়াকর্মেই ব্যক্তি থেকে সমষ্টিই প্রধান। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে আদিবাসী সমাজজীবনেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। তা সত্ত্বেও এদের সংস্কৃতির মূল নিহিত একাত্মবোধের মধ্যে এবং সমষ্টিগত ধারণায়।

লেখক : মন্ত্রী—অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাঁকুড়া জেলার লোকধর্ম ও লোকদেবতা

মিহির চৌধুরী কামিল্যা

বাঁকুড়া জেলায় লোকদেবতা অসংখ্য। একক প্রচেষ্টায় তার হিসেব নেওয়াও কঠিন। প্রাচীন প্রায় গ্রামেই এঁদের অবস্থান। কিছু হলেন একান্তই গ্রামদেবতা—একটি মাত্র গ্রামে একটি মাত্র নামে সেই গ্রামটির মানুষদের দ্বারাই তিনি পুজো পান।

লোকসংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম ও প্রধান উৎস লুকিয়ে আছে প্রাচীন লোকধর্ম ও লোকদেবতাকে ঘিরে। আত্মরক্ষার তাগিদে, কিংবা অজ্ঞতা ভয় ভীতি ও কুসংস্কারের জন্যেই লোকদেবতাদের জন্ম—সমাজবিজ্ঞানীদের এই মত অবশ্যই সত্য। কিন্তু এটাও তো ঠিক, আপনি লোকসংস্কৃতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের যেদিকে তাকাবেন, সেদিকেই দেখবেন এই লোকদেবতাদের সাক্ষাৎ বা প্রচ্ছন্ন প্রভাব। সমাজবিজ্ঞানী তাই লক্ষ করেছেন, একটি অঞ্চলের অধিকাংশ লোক-উৎসব, লোকসংগীত, লোকবাদ্য, লোকনৃত্য, লোকগল্প, লোকশিল্প, লোকঅর্থনীতি কালে কালে গড়ে উঠেছে এইসব লোকদেবতাদের অবলম্বন করেই। এঁদের ঘিরেই গড়ে উঠেছিল লৌকিক সম্প্রীতি ও সংহতি ; হাজার বছর ধরে জনজীবনের ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা, ইতিহাস ঐতিহ্য উদ্ভূত হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে। তার মধ্যে অনেক অবিশ্বাস্য ভাবনা, উদ্ভট চেতনা, বিচিত্র বিশ্বাস ও কুৎসিত-কুসংস্কার কালে কালে জেগে উঠেছে। কিন্তু সেগুলিকে বাদ দিলে, লোকদেবতাদের এমন অনেক দিক আছে, যা জনজীবন, জনসমাজ ও জনসংস্কৃতিকে 'দেউলে' করেনি।

বাঁকুড়া জেলার লোকদেবতাদের সম্পর্কেও এই কথাটি খাটে। পশ্চিমবাংলার বোধহয় সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা বাঁকুড়া। তড়া-গড়া ডুংরি-দাড়াং, পাহাড়-পর্বত, টিলা-নদী ও জঙ্গলে এর সারা গা আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে কাঁকুরে লালমাটির বিস্তীর্ণ মাঠ। দূরে দূরে ছোট-বড় সব গ্রাম। শিক্ষাদীক্ষা, আলোক ও সভ্যতা থেকে দূরে থাকা দরিদ্র শ্রমজীবীদের বাস। সারা গ্রাম জুড়ে আদি-পুরুষের সংস্কার, বিশ্বাস, রীতি-নীতির নিরুপদ্রব আনাগোনা। এইসব প্রাচীন গ্রামে যদি কেউ যান, দেখবেন সে গ্রামের কোথাও না কোথাও পুজো পাচ্ছেন এইসব গ্রাম দেবতারা। এক খণ্ড শিলা, কিংবা কিছু পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, কিংবা ছোট-বড় একটি মাটির ঢিপি, অথবা কোনও না কোনও একটি গাছ তাঁর প্রতীক। এই স্থানটি হল তাঁর 'মড়ো' বা 'থান'। সেখানে তাঁর কোনও মন্দির নেই। একদা কোনও বাঁধানো বেদিও ছিল না। অথচ নির্দিষ্ট দিনে সারা গ্রামের সব স্তরের মানুষ তাঁর পুজো দিচ্ছে বিচিত্র উপচারে, পশুপাখি বলি দিয়ে, কখনও বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধনে। লোকবিশ্বাস অনুসারে, তিনি গ্রামের অভিভাবক, গ্রামরক্ষাকারী। গ্রামবাসী তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করে, তিনি তাঁদের তাই দেন। তিনি খাদ্য, সন্তান, সুবৃষ্টি, সুশস্য দেন। মড়ক, মহামারি রোগ, শোক থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন। দুর্বৃত্ত ও হিংস্র পশুর আক্রমণরোধ করেন। গবাদি পশুকে সুস্থ রাখেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট হলে মানুষের ক্ষতিও হয়। তাই কল্যাণ লাভের আশায় তাঁর পুজো। সন্তুষ্ট করতেই তাঁর বার্ষিক উৎসব। আর তার মধ্যে থেকেই উপাসকরা পেয়েছেন উৎসবের আনন্দ, মেলার সম্প্রীতি। তাঁর নামেই তাদের জীবনে এসেছে বিচিত্র মানস-সম্পদ—লৌকিক সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, গালগল্প প্রভৃতি। তেমনই এসেছে বিচিত্র বস্তু সম্পদ—নানা শিল্পকলা, মাটি পাথর, বাঁশ বেতের অসামান্য সব উপকরণ। পরবর্তীকালে এসেছে মন্দিরশিল্প।

॥ এক ॥

বাঁকুড়া জেলায় লোকদেবতা অসংখ্য। একক প্রচেষ্টায় তার হিসেব নেওয়াও কঠিন। প্রাচীন প্রায় গ্রামেই এঁদের অবস্থান। কিছু হলেন একান্তই গ্রামদেবতা—একটি মাত্র গ্রামে একটি মাত্র নামে সেই গ্রামটির মানুষদের দ্বারাই তিনি পুজো পান।

১। কালামদন (কালামহাদন) :

বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার প্রসিদ্ধ গ্রাম ফুলকুসমা। গ্রামের পশ্চিমে 'হিড়োল বাগিচা'য় আঁকুড়্যাতলায় আছেন এ গ্রামের গ্রামদেবতা কালামদন। ইংরেজির 'এল' আকৃতির একটি কালো পাথর খণ্ড তাঁর প্রতীক। তাঁর তিন পাশে কয়েক লক্ষ প্রাচীন-নবীন পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার স্তূপ। নিত্য পুজো। পুজো করেন ঘন্টেশ্বরী ব্রাহ্মণ। পয়লা মাঘ 'এখ্যানে' তাঁর বার্ষিকী। এদিন মেলা। ভক্তরা 'আগুন-সন্ন্যাস' করেন। এ গ্রামে গরাম, মনসা, কলকাসিনি, শিব, ষষ্ঠী, কালাচাঁদ প্রভৃতি অনেক লোকদেবতা আছেন। কিন্তু গ্রামবাসী তাঁদের বিবাহ, অন্নপ্রাশন, গৃহনির্মাণ ও নানা শুভকাজে এঁর নামেই ষোলোআনা (এক টাকা) মান্য তুলে রাখে। ভক্তদের বিশ্বাস—সারারাত ধরে তিনি সারা গ্রামে পাহারা দেন। নামটি শুনে মনে হয় ইনি বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা—কালামহাযান, কালামহাদন, কালামদন। আমার বিবেচনায় ইনি একান্ত লোকদেবতা। যার মূলে আছে ভয়-ভীতির দেবতা 'মহাদানা' পুজো। যাদু বিশ্বাস এঁর উদ্ভবের মূলে।

২। ঝাঁপুড়্যা :

রাইপুর থানার সারেসকোলের গ্রামদেবতা ঝাঁপুড়্যা। শেওড়াতলায় থান। প্রতীক পোড়ামাটির হাতিঘোড়া। মাঝি সমাজের 'গুলি' পদবীর ব্যক্তি তাঁর পূজারি। বছরে তিনদিন তাঁর পুজো—'শ্রীপঞ্চমী', 'রোহিণী' ও 'এখ্যান' বা পয়লা মাঘ। পয়লা মাঘ বার্ষিকী। পশুপাখি বলি হয়। মেলা বসে। প্রধানত নানা রোগের ওষুধ নেওয়ার জন্যে ভিড় হয়। কিন্তু তিনি ফসলদাতা দেবতা। উর্বরতাবাদের দেবতা। ভক্তরা তাঁকে মানে শিব বলে। তাই কল্পিত হয়েছে, তাঁর মাথাভর্তি এলোমেলো জটা। তাই তিনি ঝাঁপুড়্যা।

৩। কঁকাঠাকুর :

রাইপুর গ্রামে আছেন ভয়ভীতির দেবতা কঁকাঠাকুর। ঠিক বাসলী থানের পাশেই। প্রতীক হাতি-ঘোড়া। ঝোপে তাঁর অবস্থান। 'বড় ভোগ' (মদ) দিয়ে তাঁর পুজো। শাণ্ডিল্য গোত্রের লোহারেরা তাঁর পূজারি। সারা গ্রামবাসী তাঁর পুজো করে প্রধানত শিরঃপীড়া ঘটলে, ঘাড় বেঁকে গেলে এবং অসংখ্য মানুষ আসে শিশুদের বোবা রোগ সারানোর জন্যে। প্রাচীন কুসংস্কার থেকেই এ দেবতার জন্ম। একটি অসম্ভব যাদু বিশ্বাস এঁর পুজোর পেছনে।

৪। ঘোড়াপাহাড়ী :

রাইপুর থানার খড়িগেড়্যা গ্রামের একদা তিলিদের কুলদেবতা ছিলেন ঘোড়াপাহাড়ী। এখন গ্রামবাসীর ঠাকুর। গ্রামপ্রান্তে থান। মাকড়াপাথরের স্তূপের ভেতর তাঁর প্রতীক। বছরে তিনদিন পুজো—আষাঢ়ে, জমিতে প্রথম লাঙল নামানোর দিন। আষাঢ়-শ্রাবণে জমিতে 'পচান' দেওয়ার দিন। অঘ্রাণে প্রথম 'বড়ধান' কাটার দিন। এ পুজোর নাম 'জাঁতাল'। সকালে 'বাল্যভোগ'—দুধ, গুড়, চিড়ে, কাঁঠাল কোবে। দুপুরে পায়েস-ভোগ, খিচুড়ি ভোগ। পূজান্তে দরিদ্রনারায়ণ সেবা। এ দেবতার নামে কোনও বলি হয় না। সম্প্রতি শিবের ধ্যানে পুজো। লোকবিশ্বাস, তিনি ক্ষেত্র-দেবতা, শস্যরক্ষাকারী ও সুফলনদাতা। ফলে তিনি উর্বরতা তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত।

[illegible] ভাদু টুসু পুজো পান অনেকটা দেবীদের মতোই
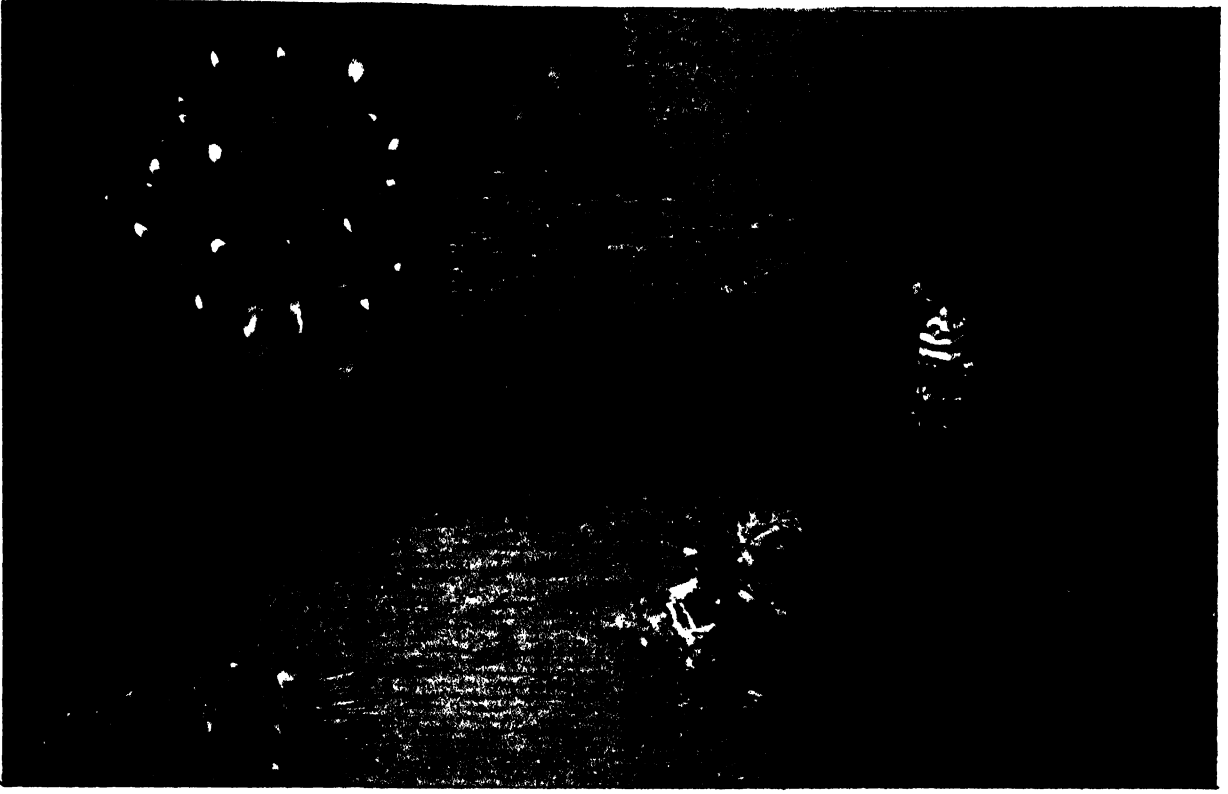
৫। মুড়াভাঙা :

রাইপুর থানার জামবনি-হরিপুরের গ্রামদেবী মুড়াভাঙা। কোঁদতলায় তাঁর থান। তিন স্তরযুক্ত মাকড়া পাথর তাঁর প্রতীক। লোকে বলে—ইনি পাতাল ফোঁড়া। কালী, বাঘুত, জামনানি ও কেঁদুইসিনি নামক তিন দেবীকে নিয়ে তাঁর বাস। পূজারি 'দুলে' পদবীর বাউরি সমাজের লোক। পয়লা মাঘ, শ্রীপঞ্চমী ও দশহরায় তাঁর পুজো। 'বড়ভোগ' তাঁব নৈবেদ্য। প্রধানত মাথায় আঘাত লাগলে তাঁর পূজা। ফলে এক অলৌকিক যাদু বিশ্বাস এঁর পুজোর মূলে।

৬। দুলালী :

রাইপুর থানার নীলজোড়া গ্রামের গ্রামদেবী দুলালী। 'লুতিডিবাদে' শেঁয়াকুলের ঘন ঝোপে তাঁর থান। সিঁদুর মাখা শিলা তাঁর প্রতীক। তফসিলি উপজাতির সর্দারেরা তাঁর পূজারি। বছরে পাঁচদিন তাঁর পুজো—পয়লা মাঘ, শ্রীপঞ্চমী, চৈত্র সংক্রান্তি, রোহিণী ও অম্বুবাচীতে। অঘ্রাণে ধান পাকলে তাঁর 'জাঁতাল'। পায়েস ও খিচুড়ি ভোগ তাঁর নৈবেদ্য। পাঁঠাবলি হয়। প্রধানত গবাদি পশুর রোগে অসুখে, হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশে তাঁর পুজো। এমনি দেবতা আছেন তাই জেলার কোতুলপুর গ্রামের বালিঠে গ্রামের 'বড়ম', রাইপুর থানার পাটগাড়া গ্রামের 'সাতবৌনি' ও মেদিনীপুরের মৌহাটি গ্রামের 'চন্দ্রগোল'। 'দুলাল' অর্থাৎ বাবুই-তুলসী। দুলাল বনে তাঁর থান বলে এ রকম নাম। কিন্তু তিনি বৃক্ষদেবতা থেকে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে এক অভিনব যাদু বিশ্বাসে পরিণত হয়েছেন।

৭। বনপাহাড়ী :

সিমলাপাল থানার হাতিবাড়ির গ্রামদেবী বনপাহাড়ী। কালাপাহাড় ও বাঘুৎ তাঁর সঙ্গী। হাতি-ঘোড়া তাঁদের প্রতীক। জঙ্গলে তাঁর থান। তফসিলি মাঝি তাঁর পূজারি। পয়লা মাঘ ও দশহরায় তাঁর পুজো। খিচুড়ি ভোগ ও মাংস তাঁর নৈবেদ্য। সারাদিন ধরে দরিদ্র নারায়ণের সেবা। অস্পৃশ্যতা বর্জন ও সংহতি নির্মাণের উল্লেখ্য নিদর্শন। বন ও বন্যপশুর তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বনে বনে যারা কাজ করে, কাঠ-মধু, তসর গুটি ও ফলমূল সংগ্রহ করে, তারা এর পুজো দেয়, প্রধানত বন্যপ্রাণী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। ফলে অরণ্যশক্তির এই দেবীর উৎসে আছে এক অনন্য যাদু বিশ্বাস। তাই জঙ্গল মহলে তাঁর দৌর্দণ্ডপ্রতাপ।

৮। বলদ্যাবুড়ি :

সিমলাপাল থানার হাতিবাড়ি-রায়বাঁধের গ্রামদেবী বলদ্যাবুড়ি। ক্ষেতের মাঝে শেঁয়াকুলের ঝোপে তাঁর অবস্থান। হাতিঘোড়া তাঁর প্রতীক। ওরা মাঘ—বছরে একদিন তাঁর পুজো। পূজারী 'মাল' পদবীর উপজাতি। খিচুড়ি ভোগ তাঁর নৈবেদ্য। থানে দরিদ্রনারায়ণের সেবা। বিস্তৃত মাঠে মেলা। সেকালে সারা অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা বলদের পিঠে জিনিসপত্র নিয়ে নানা স্থানে ব্যবসায় যেত। রাত্রি বাস করতো বলদ্যাবুড়ির থানে। থানের সামনে শিব মন্দির। চাতালে বিশ্রামের ভালো ব্যবস্থাও। সম্ভবত এই গাঁ-ঘোরা ব্যবসায়ীদের বলদ রক্ষার জন্যেই বলদ্যাবুড়ির প্রতিষ্ঠা। সুতরাং ইনি প্রাচীন পশুপুজোর নিদর্শন।

৯। খুদ্যানাড়া :

ছাতনা থানার জিড়রা গ্রামে আছেন খুদ্যানাড়া। একটি পাথরের পাটায় এক যথার্থ বীরমূর্তি অঙ্কিত—তাই হল খুদ্যানাড়ার প্রতীক। এমনই বীরমূর্তি ছাতনার কামারকুলিতে, থুম পাথরে ও অসংখ্য স্থানেই আছে। পণ্ডিতেরা এগুলিকে বলেন, 'মুণ্ডাদের সমাধি প্রথার নিদর্শন'। সম্প্রতি পুজো করেন 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পদবীর ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু প্রধান ব্রতী কর্মকার। সারা বছরে একদিন—১০ বৈশাখ তাঁর পুজো। সম্প্রতি শিবের ধ্যানে পুজো। অর্থাৎ অনার্য আর্য সংস্কৃতির মিলন। লোক বিশ্বাস, শিশুর কান্না থামাতে এ দেবতার পুজো।

এমনই আর এক দেবতা আছেন বাঁকুড়া থানার সানবাঁধা গ্রামে। তাঁর নামই 'কাঁদন্যাবুড়ি'। হাতিঘোড়ার প্রতীকে তিনি বিদ্যমান। শিশুদের কান্না উপশমের জন্যে তাঁর পুজো। এও এক যাদু বিশ্বাস। প্রজননবাদের সঙ্গেও এঁরা সম্পৃক্ত।

১০। বাঁদাড়া ও ছড়িদাও :

ইঁদপুর থানার সাতামী গ্রামে এই দুই দেবতা আছেন গাছতলায়। এঁদের কোনও মূর্তি নেই, প্রতীক নেই। গাছের তলায় কল্পিত মূর্তিতে তাঁদের পুজো। বাঁদাড়ার পুজো ১লা মাঘ—'বড়ভোগ' দিয়ে। কিন্তু প্রচুর বলি হয়, থানে বসে প্রসাদ বিলি হয়। মেয়েদের এ প্রসাদ ছোঁয়া নিষিদ্ধ। তাঁর থানে কোনও নারী যাবে না। অথচ ইনি বন্ধ্যাত্ব-মোচন ও স্ত্রী-ব্যাধি নিবারণের দেবতা।

প্রতীকহীন ছড়িদাও পুজো পান ১লা মাঘ। এঁর থানেও প্রচুর পশুপাখি বলি হয়। তিনিও সন্তানদাতা দেবতা। শিশুদের যাবতীয় রোগের তিনি উপশমকারী। সম্ভবত একদা এই দুই দেবতাই ছিলেন প্রাচীন বৃক্ষ পুজোর সঙ্গে যুক্ত। এখন যুক্ত হয়েছেন প্রজননতন্ত্রের সঙ্গে।

১১। আমতুল্যা :

ইঁদপুর থানার পায়রাচালির গ্রামদেবতা আমতুল্যা। ধানক্ষেতের আলে পলাশ ঝোপে তাঁর থান। পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া তাঁর প্রতীক। ১লা মাঘ, রোহিণী, অম্বুবাচী ও ইঁদ একাদশীতে তাঁর পুজো। পূজারি বাউরি সমাজের মানুষ। প্রধান নৈবেদ্য 'বড়ভোগ'। ১লা মাঘ বার্ষিকীতে বলি ও খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়। আমগাছের তলায় আছেন বলে আমতুল্যা। কিন্তু তিনি কলেরা, বসন্ত মহামারি নিবারক বলে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ তিনি শীতলা শক্তিতে সমন্বিত। বর্ধমানের রোঁয়াই গ্রামের 'বোঁয়াইচণ্ডী', হুগলির নয়নবাটির 'বুড়িমাই' ও মেদিনীপুরের এক গণ্ডগ্রামের 'গোঁড়িবুড়িও' শীতলাশক্তির প্রকাশ।

১২। তেঁতুলমিলা :

ছাতনা থানার সীমান্তে মনিহারা-টোল্যা মোহনডাঙ্গার গ্রামদেবতা তেঁতুলমিলা। তেঁতুল গাছের নীচে তাঁর থান। হাতিঘোড়া তাঁর প্রতীক। 'মাল' পদবীর উপজাতি তাঁর পূজারি। ১লা আষাঢ় ও ১লা মাঘ তাঁর পুজো। লাল মোরগ তাঁর প্রিয় বলি। ভূত ছাড়ানোতে তাঁর দেশজোড়া খ্যাতি। পূজারি কবচ দেন। এখনও এই অঞ্চলে ভূতে পাওয়া, ডাইনি, পুকোস, কুদরা, সন্ন্যাসী লাগা কিংবা ভুলান লাগায় তাঁর সাড়ম্বর

> গ্রামের কোথাও না কোথাও পুজো পাচ্ছেন এইসব গ্রাম দেবতারা। এক খণ্ড শিলা, কিংবা কিছু পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, কিংবা ছোট-বড় একটি মাটির ঢিপি, অথবা কোনও না কোনও একটি গাছ তাঁর প্রতীক। এই স্থানটি হল তাঁর 'মড়ো' বা 'থান'। সেখানে তাঁর কোনও মন্দির নেই। একদা কোনও বাঁধানো বেদিও ছিল না। অথচ নির্দিষ্ট দিনে সারা গ্রামের সব স্তরের মানুষ তাঁর পুজো দিচ্ছে বিচিত্র উপচারে, পশুপাখি বলি দিয়ে, কখনও বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধনে। লোকবিশ্বাস অনুসারে, তিনি গ্রামের অভিভাবক, গ্রামরক্ষাকারী।

পুজো। এ সবই আদিম কুসংস্কার। অর্থাৎ তেঁতুলমিলার মধ্যে আছে অপদেবতার কল্পনা—এক প্রাচীন যাদু বিশ্বাস। অশরীরী আত্মা বা ভূত-প্রেতের ভয় থেকে যার জন্ম।

১৩। খয়রাবুড়ি :

বাঁকুড়া থানার কুলমুড়ার গ্রামদেবী খয়রাবুড়ি। আঁকুড়্যা তলে হাতি-ঘোড়ার প্রতীকে তিনি বিদ্যমান। প্রাচীন ছত্রীদের ঠাকুর। এখন পুজো করেন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। হিন্দু-মুসলমান, সাঁওতাল সকলেই এঁর পুজো দেয়। সম্প্রতি দুর্গার ধ্যানে পুজো। তাঁর পুজোর নৈবেদ্য ভাজা কলাই ও কুসুমবিচি মেশানো মুড়ি। এ ছাড়া পশুবলি হয়। বাতরোগ সারাতে তাঁর দেশজোড়া নাম। যাত্রী এলেই পুজো। সেবাইত ও পূজারি ওষুধ দেয়। তাঁর ওষুধ খেলে রোগীকে মুড়ি তেল গুড় টক আমিষ ও পান ছুঁতে নেই। একদা খয়রাবুড়ি পুজো পেতেন তাঁর আদিম থানে—কৃষি দেবতা বলে। এখন গ্রামে এসে তিনি হয়েছেন বাতরোগ উপশমকারিণী। অর্থাৎ অলৌকিক যাদু বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি যুক্ত।

১৪। ঝগড়াই :

জয়পুর থানার বৈতলে আছেন ঝগড়াভঞ্জিনী। তাঁর ডাক নাম 'ঝগড়াই মা'। উট্‌কো ঝগড়া, মামলা-মকদ্দমা ঘটলেই তাঁর পুজো। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা তাঁর মন্দির নির্মাণ করেছেন। সপ্তরেখ মন্দির, বিশাল চত্বর, আটচালা, নাটচালা। সামনে বুড়ো শিব ও ষষ্ঠী। ৯৬৫ মল্লাব্দে (১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দ) এসব করেছেন মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ। মন্দিরের ভেতরে অপরূপ মাতৃমূর্তি—সহস্রদল পদ্মের উপর অষ্টভূজা মূর্তি। বাঁদিকের তিন হাতে ধনুক সাপ ও খড়্গ। ডানদিকের তিন হাতে ত্রিশূল মালা ও মুদ্রা। তাঁর ডান পা হাতির উপরে। বাঁ পা সিংহের উপরে। একই সঙ্গে তিনি মহিষাসুরমর্দিনী ও করিঙ্গাসুরমর্দিনী। অবিকল এমনই একটি মূর্তি আছে বৈতল থেকে ২ মাইল পূর্বে নারায়ণপুরে—তিনিও অষ্টবাহু দুর্গা। লোকে বলে, তিনি ঝগড়াই-এর

বোন। ঝগড়াই-এর নিত্য পুজো। ভাদ্রের শেষ শনিবারে তাঁর 'সয়লা' উৎসব। সারা অঞ্চলের মানুষ এদিন ভেঙে পড়ে। সয়লা বা মিত্রতা পাতাতে আসে শতশত যাত্রী। ভাত, ডাল, তরকারি দিয়ে তাঁর পুজো হত। থানে বসে সব সম্প্রদায়ের মানুষ প্রসাদ পায়। শারদীয় পুজোতে তাঁর আর একবার সাড়ম্বর পুজো। লোকে বলে, তিনি শুধু ঝগড়াই মেটান না—শ্বেতী, রাতকানা একশিরা প্রভৃতি রোগে ও স্ত্রী-ব্যাধি নিবারণে দলে দলে লোকে তাঁর পুজো দেয়। মাদুলি নেয়। হত্যা দেয় অনেকে। সয়লা উৎসবে বিশাল মেলা। এদিন 'কাদামাটি খেলা' হয়। ঝগড়াইমাকে নিয়ে অসংখ্য লোককথা প্রচলিত। শুধু বন্ধ্যাত্ব মোচন নয়, সম্প্রীতি সৃষ্টিতে তাঁর অসামান্য নামডাক।

সারা বাঁকুড়া জেলায় গ্রামে গ্রামে এমনই অসংখ্য লোকদেবতারা আছেন। খাতড়া থানার পাঁপড়া গ্রামের মাঠদেবতা কালোসোনা। তিনি সুফলনের দেবতা। রাণীবাঁধ থানার তুংচাঁড়রোর হাতিখেদা—তিনি হাতিভয় নিবারণকারী দেবতা। কোতুলপুর থানার মসিনাপুরে বাঁশদেব। তিনি বৃষ্টির দেবতা। ইঁদপুর থানার কুমির পাথর-বাগডিহার পাশে ভালুকা গ্রামের বাগাল্যা। তিনি পশুরক্ষক দেবতা। ছাতনা থানার পাহাড় শুশুনিয়ায় আছেন লড়সিং। তিনি সুবৃষ্টির দেবতা। পাউড়ি আছেন সিমলাপাল থানার বনদুবরাজপুরে ও রানীবাঁধ থানার ধডাঙ্গা গ্রামে। দুই স্থানের দেবতাই করগা নামক পাথর শিল্পীদের দেবতা। যারা পাথর কেটে থালা বাটি ঘটি প্রদীপ নির্মাণ করে, কিংবা যারা কাঠ কুঁদে খাটের পায়া পাইকনা ইত্যাদি তৈরি করে। শালতোড়া থানার রাউতোড়া গ্রামে আছেন ভিরকুনাথ। তিনি পূর্বপুরুষ পুজোর নিদর্শন। পূর্বপুরুষ পুজোর এমনই নিদর্শন আছে রাইপুর থানার সারেঙ্গা গ্রামের লখন-মাঝি ও সাধন-বোঙ্গা, ওন্দা থানার বেলিয়াড়া গ্রামের চাঁদরায়, ছাতনা থানার জিড়রা গ্রামের বুড়াবুড়ি, রাইপুর থানার সিমলি গ্রামের ননদভাজ, ছাতনা থানার থুমপাথরের ভাসুরবোয়াসিন, ওন্দা থানার মেদিনীপুর গ্রামের খঁকাখুঁকি প্রভৃতি। এঁরা কিন্তু একই শক্তির আধার নন। কিন্তু অধিকাংশই প্রজননবাদের সঙ্গে যুক্ত।

॥ দুই ॥

বাঁকুড়া জেলায় আর এক শ্রেণীর লোকদেবতারা আছেন—যাঁদের একটিমাত্র নাম, অথচ অসংখ্য গ্রামে তাঁরা পুজো পাচ্ছেন। এঁরা হলেন—মনসা, চণ্ডী, সিনি বাসলী, সাতবহিনী, রংকিনী, ষষ্ঠী এবং গরাম, বড়াম মাদানা, কুদরা, সন্ন্যাসী, বাঘুৎ, পঞ্চানন, ভান সিং, ভৈরব শিব ও ধর্মঠাকুর। এঁরা প্রায় গ্রামেই আছেন। শয়ে শয়ে আছেন। আমরা তন্মধ্যে কিছু অতি বিখ্যাত থানের লোকদেবতার পরিচয় দিচ্ছি।

১। বাঘুৎ :

বাঁকুড়ার এক ভয়ঙ্কর, হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকদেবতা বাঘুৎ। সারা দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় তাঁর অগণিত থান। রাইপুর থানার কালুড়ি, কোলমুড়ারি, ফুলকুসমা, পাথরা, মণ্ডলডিহা, রসপাল, শালপাতড়া—রানীবাঁধ থানার হেঁদাপাথর, ফুলঝোর, বনতল ও রানীবাঁধে তাঁর প্রসিদ্ধ থান। কোথাও বাঘের মূর্তি। কোথাও হাতি-ঘোড়ার প্রতীক। বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষাকারী দেবতা বাঘুৎ। দক্ষিণবঙ্গে এঁর নাম 'দক্ষিণ রায়'। উত্তরবঙ্গে এঁর নাম 'কুমিরদেব', কোচবিহারে 'ডাংধরা', জলপাইগুড়িতে 'মহারাজা ঠাকুর', আসামে 'সাতশিকারী'। কিন্তু বাঁকুড়ার বাঘুতের মতো কেউ এমন অসম্ভব মেজাজী বলে কথিত নয়। মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার শিলমোহরে বাঘচিত্র আছে। সমাজে 'বাঘ' পদবী আছে। নরখাদক বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতেই এঁর পুজো। সুতরাং বাঘুৎ পশু পুজোর নামান্তর—বাঘ পুজোর অনন্য নিদর্শন।

২। মাদানা :

সারা উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়ায় মাদানার অনেক থান। মিথিলা, তিলাবেদ্যা, বাদকোনা, মণিহারা, কুলমুড়া বেলিয়াতোড়, বাঘডিহা, নদ্যাপুর, কাঞ্চনপুর, বেলাবাঘড়ায় তিনি প্রসিদ্ধ কৃষি দেবতা। প্রায় স্থানেই বাউরি পূজক। চাষীরা তাঁর উপাসক। ১লা মাঘ 'এখ্যানে' তাঁর 'জাঁতাল'—ঘি খিচুড়ি দিয়ে, পশুপাখি বলি দিয়ে। এছাড়াও চাষের আগে-পরে-মাঝে তাঁর পুজো। সারাদিন ধরে থানে উৎসব। 'মহাদানব' থেকে 'মাদানা'। তার অর্থ 'দৈত্য'। সংস্কারাচ্ছন্ন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর

আটবাইচণ্ডী : প্রাক-মুসলিম যুগের পাথরের চামুণ্ডা মূর্তি

স্বাভাবিক কারণেই লোকদেবতাদের প্রভাব নেমেছে একেবারে নীচের ধাপে। কিন্তু তাদের ঘিরে সৃষ্ট হয়েছে হাজার হাজার লোকগান। এঁদের মেলাকে ঘিরে এখনও বাঁকুড়াবাসী পাতা নাচ, কাঠি নাচ, ঘোড়া নাচ, খাঁটি নাচ, ভুয়াং কিংবা লবয়ে নাচে মেতে ওঠে। এঁদের ঘিরে বিকনায় ঢোকরা শিল্প, পাঁচমুড়ায় মৃৎশিল্প, শুশুনিয়ায় পাথরশিল্প। এঁদের ঘিরে যেসব মন্দির শিল্প গড়ে উঠেছে, এঁদের নামে যে সব শিলামূর্তি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি কিন্তু জেলার গৌরব।

বাউরিদের তিনি ছিলেন একান্ত দেবতা। তখন ছিলেন ভয়ভীতির দেবতা। পরে তিনি উন্নীত হয়েছেন প্রজননবাদের দেবতায়, শস্যদাতা বলে।

৩। গরাম :

বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে প্রাচীন লোকদেবতা বলে গরাম ঠাকুর মর্যাদা পেয়েছেন। সারা দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় তাঁর শতাধিক থান। হাতি-ঘোড়া বা গাছ, পাথর তাঁর প্রতীক। উপজাতি ও সাঁওতালেরা তাঁর উপাসক। ১লা মাঘ, দোলপূর্ণিমা এবং প্রথম বৃষ্টির পরে, রোয়ার আগে, ধান কাটার আগে ও পরে সারা চাষী সমাজ তাঁর পুজো করে। এ জেলার গোপালপুর, গোড়োল, চেলাপাড়া, জামথলি, ধোবারগ্রাম, বুড়িশোল ও বারোপায়া প্রভৃতি অসংখ্য গ্রামে গরামের মেলা বসে। দিনরাত চলে কাড়ানাকাড়ার বাজনা। 'বড়ভোগ' তার প্রধান নৈবেদ্য। ভক্তরা সবরকম প্রার্থনা তাঁকে জানায়। তিনি সুবৃষ্টি, রোগমুক্তি, শস্যবংশবৃদ্ধি ইত্যাদির দেবতা। পাথরে বৃক্ষে নদীর ভেতরে তাঁর পুজো বলে তাঁকে আমি প্রজননবাদের সঙ্গে প্রাচীন প্রস্তর পুজো, বৃক্ষপুজো ও নদীপুজোর নামান্তর মনে করি। এঁকে নিয়ে প্রচুর গান, গল্প, কাহিনী।

৪। বাসলী :

বাঁকুড়া জেলার ছাতনাকে ঘিরে শতাধিক স্থানে আছেন লোকদেবী বাসলী। ছাতনা শহরে তাঁর প্রধান পীঠ। এখানে তাঁর দুটি থান—একটি থানার কাছে, অন্যটি রাজদরবারে। প্রথমটি বড়ুচণ্ডীদাসের পূজিতা বাসলী—এখন তাঁর মন্দির ধ্বংস হয়েছে। আছে 'বাসলী পুকুর', 'ধোপা পুকুর' ও 'চণ্ডীদাসের সমাধি'। রাজদরবারে তাঁর পঞ্চরত্ন মন্দির। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রানী আনন্দকুমারীর নির্মাণ। এখানে প্রাচীন প্রস্তরখোদিত নারীমূর্তি। দুই স্থানেই নিত্যপুজো। থানা গোড়ায় বার্ষিক উৎসব ফাল্গুনে, শুক্লা সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত। রাজদরবারে তাঁর বার্ষিকী ১১-১২ জ্যৈষ্ঠ। এখানে ডাল, ভাত ও খালাপোড়া মাঠ তাঁর নৈবেদ্য। শাস্ত্রীয় মর্যাদায় পুজো। তা হলেও গ্রাম দেবতার সব লক্ষণ তাঁর পুজোরীতিতে। তিনি প্রধানত বন্ধ্যাত্ব মোচনের দেবতা। এই বাসলীকে স্মরণ করেই বড়ুচণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লিখেছেন : 'গাইল বড়ুচণ্ডীদাস বাসলীগণ'।

৫। আটবাইচণ্ডী :

সারা বাঁকুড়া জেলায় চণ্ডীনামে দেবতা আছেন কয়েক শতাধিক। নানা স্থানে নানা নাম। খুদকুড়ি গ্রামে খুদাই চণ্ডী, বিশিন্ডা গ্রামে বিশাই চণ্ডী, শিহড়ে বসনচণ্ডী, মেলেড়ায় নেওটন চণ্ডী। আটবাইচণ্ডী গ্রামে তাঁর নাম আটবাইচণ্ডী। ইনি একটি বিস্ময়াবহ শিলামূর্তি। এক বলিষ্ঠপুরুষের উপরে এক বিকটদর্শনা দশভূজা নারী দণ্ডায়মানা। দশহাতে অস্ত্র কিংবা মুদ্রা। কোমরে ঝুলন্ত ছোরা. গলায় ও কপালে মুণ্ডমালা। মাথার চুলে মড়ার খুলি। সারা দেহটি যেন এক নরকঙ্কাল। দৈর্ঘ্যে ৩ ফুট, প্রস্থে ২ ফুট। বলাবাহুল্য, এ মূর্তি অনেক পরবর্তী সংযোজনা। এখন চণ্ডীর ধ্যানে পূজিত। ১ মাঘ বার্ষিকী ও মেলা।

৬। মনসা :

সারা জেলাতেই মনসা আছেন গ্রামে গ্রামে। তাঁর প্রাচীন শিলাখোদিত মূর্তি আছে রাউৎখণ্ড, ডাংগরসাই, লাপুর, বারপেট্যা, কুচেকোন, বাজেময়নাপুর, বেলিয়াড়া, ভৈরবপুর, ফুটকরা ও জয়কৃষ্ণপুরে। আর সর্বত্রই আছে পাঁচমুড়ার তৈরি মনসাচালি,

সিজ গাছের নিচে, মনসার থান : দেশড়া

জেলার সর্বত্র আছেন শিব। আমরা এ পর্যন্ত সাত শতাধিক শিবথানের তালিকা করেছি। তন্মধ্যে বিখ্যাত থান—এক্তেশ্বর, বোলাড়া, ডিহর, শিহড়, নিকুঞ্জপুর, লোদনা, পাঁচান, পাত্রসায়র, জগন্নাথপুর, ঝাঁটিপাহাড়ি, সায়েঙ্গা, রাইপুর, বিষ্ণুপুর, কোয়ালপাড়া দারিয়াপুর (সোনামুখী থানা), শাশপুর করিশুণ্ডা, আমরুন, সালনা (পাত্রসায়র থানা), বীরসিংহ (পাত্রসায়র) প্রভৃতি। অসংখ্য স্থানেই তাঁর ঐতিহাসিক মন্দির। বোলাড়ার মন্দির বিস্ময়কর। প্রতিদিন তাঁর পুজো। সোম-শুক্রবারে প্রচণ্ড ভিড়। ফাল্গুনে শিবরাত্রী। চৈত্রে গাজন।

মনসাঝাড়। গৃহস্থবাড়িতে তাঁর পুজো উনুনে সিজডানে। তাঁর প্রধান পুজো জ্যৈষ্ঠে দশহরায়, শ্রাবণসংক্রান্তি ও আশ্বিনে ডাকসংক্রান্তিতে। এ সময় ঝাঁপান হয়। বিষ্ণুপুর রাজবাটি প্রাঙ্গণে এখনও হয় 'বাঘঝাঁপান'। অযোধ্যাগ্রামে কালীবুড়ি মনসার উৎসব জেলার শ্রেষ্ঠ মনসা উৎসব। দশহরায় অনুষ্ঠিত। এ সময় দেবীর গাজন—ভক্ত্যানাচ, প্রণামসেবা, দণ্ডীখাটা, আগুনসন্ন্যাস, ফুলকাড়ানো ও সয়লা। মনসা সর্পদেবতা। তিনি যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে নিয়ে অগণিত গান, গল্প, কাহিনী।

৭। রংকিণী :

জেলার বেশ কিছু স্থানে লোকদেবী রংকিণী আছেন—তন্মধ্যে লক্ষ্মীসাগর, পাত্রসায়র, খাতড়া, কৃষ্ণনগর (বড়জোড়া থানা) ও হতাকাটার রংকিণীপুজো প্রসিদ্ধ। তাঁর শিখাখোদিত ভয়ংকর মূর্তি আছে লক্ষ্মীসাগরে। প্রায় ২.৫ ফুট উঁচু। মাথায় পাথরের চূড়া। তিনি নৃমুণ্ডমালিনী, অষ্টভুজা, শৃগালবাহিনী। গোল চোখ। বিকট দাঁত। পদতলে ভৈরব। নিত্যপুজো। লোকের ধারণা—তিনি নররক্তপিপাসু। প্রাণরক্ষার্থে তাঁর পুজো, একদা প্রতিটি স্থানেই নরবলি হতো। তবে এখন তিনি পুজো পান কোথাও স্ত্রীব্যাধি বা মড়ক মহামারী নিবারনী বলে, কোথাও পশুরক্ষার্থে। আদিবাসীদের কাছে তিনি 'শিকারদেবতি'। রংকিণীকে নিয়ে প্রচুর লোকগল্প।

৮। বড়াম :

জেলার অসংখ্য আদিবাসীপল্লীতে পুজো পান বড়াম। একদা তিনি ছিলেন ভূমিজদের দেবতা। বৈতল, বালিঠা, গোপীবল্লভপুর, শিহড় প্রভৃতি গ্রামে ভূমিজরাই তাঁর প্রধান উপাসক। মকরসংক্রান্তিতে তাঁর বার্ষিকী। এদিন শুকর বলি হয়। থানে বসে সকলে অন্নপ্রসাদ নেয়। বনাজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষার্থে তাঁর পুজো। জানডাঙ্গা, লেদরা, পড়াশ্যা, কালুড়ি, জানকিবাঁধ প্রভৃতি স্থানে তিনি পশুরক্ষাকারিণী। বড়ামকে নিয়ে অসংখ্য লোককথা।

৯। শিব :

জেলার সর্বত্র আছেন শিব। আমরা এ পর্যন্ত সাত শতাধিক শিবথানের তালিকা করেছি। তন্মধ্যে বিখ্যাত থান—এক্তেশ্বর, বোলাড়া, ডিহর, শিহড়, নিকুঞ্জপুর, লোদনা, পাঁচান, পাত্রসায়র, জগন্নাথপুর, ঝাঁটিপাহাড়ি, সায়েঙ্গা, রাইপুর, বিষ্ণুপুর, কোয়ালপাড়া, দারিয়াপুর (সোনামুখী থানা), শাশপুর করিশুণ্ডা, আমরুন, সালনা (পাত্রসায়র থানা), বীরসিংহ (পাত্রসায়র) প্রভৃতি। অসংখ্য স্থানেই তাঁর ঐতিহাসিক মন্দির। বোলাড়ার মন্দির বিস্ময়কর। প্রতিদিন তাঁর পুজো। সোম-শুক্রবারে প্রচণ্ড ভিড়। ফাল্গুনে শিবরাত্রী। চৈত্রে গাজন। এই দুই সময় অগণিত থানে মেলা। গাজন উৎসব দেখার মতো—
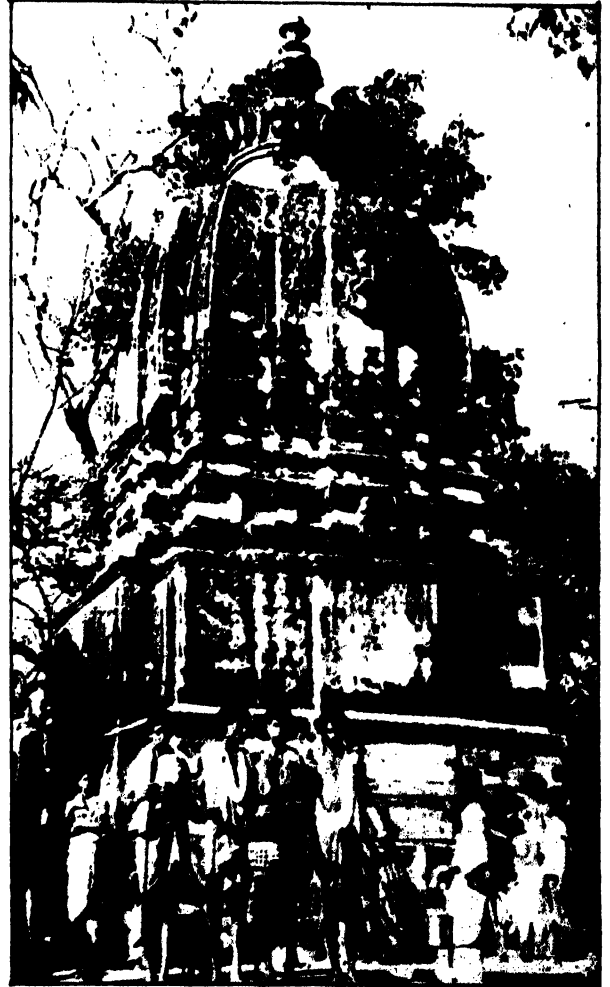
জগন্নাথপুরের পাথরের শিব মন্দির

পাথরের ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিব মন্দির : ডিহর

বিচিত্র শ্রেণীর ভক্ত্যার সমাবেশ—বাণফোঁড়া, দণ্ডীখাচা, আগুনসন্ন্যাস, হিন্দোল, বেতভাঙা, চড়কে ঘোরা প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধনা করেন ভক্ত্যারা। ভক্তদের কাছে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর—তাই তাঁর নাম—এক্তেশ্বর, মল্লেশ্বর, সারেশ্বর, ষাঁড়েশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, হাকন্দেশ্বর প্রভৃতি। শিবপুজো পান প্রধানত তিনি সন্তানদাতা বলে। তবে তিনি ক্ষেত্রপাল কৃষিদেবতাও। শিবকে নিয়ে প্রচুর লোকগীতি আছে।

১০। ধর্মঠাকুর :

জেলার এক প্রধান লোকদেবতা ধর্মঠাকুর। শিবের মতোই তাঁরও অসংখ্য নাম—কালু রায়, ক্ষুদি রায়, বাঁকা রায় বা ক্ষুদিনারায়ণ, বীজনারায়ণ, স্বরূপনারায়ণ, রূপনারায়ণ। ময়নাপুরে নাম যাত্রাসিদ্ধি, রাজশোলে আঁধারকুলি। তাঁর প্রসিদ্ধ থান—ময়নাপুর, বেলেতোড়, মটগোদা, বৈতল, মসিনাপুর প্রভৃতি। প্রত্যহ পুজো। প্রধান উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমায়। ঠিক শিবের গাজনের মতোই উৎসব। ময়নাপুরে হয় 'গৃহভরণ' (ঘরভরা) অনুষ্ঠান। বেলেতোড়ে গাজন আষাঢ়-পূর্ণিমায়। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় গাজন ইন্দাস, খাঁড়ারি, দামোদরবাটি, মেজিয়া ও বেহারে। তবে ধর্মঠাকুরের কোনও মূর্তি নেই। গোলশিলা তাঁর প্রতীক। প্রধানত কুষ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ ও বন্ধ্যাত্বমোচনে তাঁর প্রসিদ্ধি। এঁকে নিয়ে প্রচুর আখ্যান কবি, ক্ষুদ্রকবিতা ও লোকগীতি মেলে।

১১। সিনি ঠাকুর :

বাঁকুড়ায় সিনি অন্তিম এক লোকদেবী আছেন শতাধিক গ্রামে। শিলাখণ্ডে, মাটির ঢিপিতে, গাছের গুঁড়িতে, বিলে খেতে পুকুরে, গ্রামে-গঞ্জে তিনি পুজো পান। তিনি একান্ত লৌকিক দেবী—নামেই তার প্রকাশ : আঁকুড়্যাসিনি, এঁদুয়াসিনি, কুঁকড়াপিনি, খাঁদাইসিনি, গরাসিনি, ঘোলাসিনি, চাঁচসিনি, ছেঁদাসিনি, জিনাসিনি, দামাসিনি প্রভৃতি। তন্মধ্যে বাঁকুড়া শহরে জিনাসিনি, লোদনার লদাসিনি, ছান্দারের জঙ্গলাসিনির পাথরে খোদিত চমৎকার মূর্তি স্থাপিত। জিনাসিনি অশ্বারোহিণী। তাঁর ৪ হাতে সাপ, গদা, অসি ও চক্র। সিনিদেবীদের পুজোর প্রধান দিন পয়লা মাঘ। শস্য, সন্তান, সুবৃষ্টি প্রদাত্রী ও মড়কমহামারী, দুর্ভিক্ষ নিবারণী বলে তাঁর পুজো।

১২।

বাঁকুড়া জেলার সর্বত্রই পুজো পান বসন্তনাশিনী শীতলা, ক্ষেত্রঠাকরুণ সাতবৈনী, শিশুরক্ষক পঞ্চানন্দ, ভয়নিবারক সন্ন্যাসী, ধনদেবতা কুদরা ও অরণ্যদেবতা ভৈরব। ব্রতদেবতা হিসেবে পুজো পান ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ। ভাদু-টুসুও পুজো পান অনেকটা দেবীদের মতোই। আদিবাসী সমাজের বিশেষ ব্রত করম। উত্তর বাঁকুড়ার নড়রা, উদয়পুর, কৃষ্ণপুর, সাভানপুর প্রভৃতি গ্রামে দেখি ভেঁপুব্রত—তিনিও সন্তানদাতা। এছাড়াও নানাস্থানে নানা নামে পুজো পান আরও বহু লোকদেবতা। যেমন—অম্বিকানগরে অম্বিকা, রসপালে বলরাম, সাবড়াকোণে ডেঙ্গো-রামকৃষ্ণ, সোনামুখীতে সোনামুখী পাঁচালে পরেশমণি, সুখসায়রে যোগাদ্যা, রাইপুর ও সাহারজোড়ায় মহামায়া প্রভৃতি। কালীও এখন পুজো পাচ্ছেন লোকদেবী বলে।

খাতড়া থানার পাঁপড়া গ্রামের মাঠদেবতা কালোসোনা। তিনি সুফলনের দেবতা। রাণীবাঁধ থানার তুংচাঁড়রোর হাতিখেদা—তিনি হাতিভয় নিবারণকারী দেবতা। কোতুলপুর থানার মসিনাপুরে বাঁশদেব। তিনি বৃষ্টির দেবতা। ইঁদপুর থানার কুমির পাথর-বাগডিহার পাশে ভালুকা গ্রামের বাগাল্যা। তিনি পশুরক্ষক দেবতা।

স্বাভাবিক কারণেই লোকদেবতাদের প্রভাব নেমেছে একেবারে নীচের ধাপে। কিন্তু তাদের ঘিরে সৃষ্ট হয়েছে হাজার হাজার লোকগান। এঁদের মেলাকে ঘিরে এখনও বাঁকুড়াবাসী পাতা নাচ, কাঠি নাচ, ঘোড়া নাচ, খাঁটি নাচ, ভুয়াং কিংবা লবয়ে নাচে মেতে ওঠে। এঁদের ঘিরে বিকনায় ঢোকরা শিল্প, পাঁচমুড়ায় মৃৎশিল্প, শুশুনিয়ায় পাথরশিল্প। এঁদের ঘিরে যেসব মন্দির শিল্প গড়ে উঠেছে, এঁদের নামে যে সব শিলামূর্তি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি কিন্তু জেলার গৌরব।

লেখক : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক

বাঁকুড়া জেলার পার্বণ ও মেলা

নমিতা মণ্ডল

নিত্যদিনের দুঃখ-বেদনা-খরা-দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে পূজা-পার্বণ ও মেলার বৈচিত্র্যধারায় সতত অভিষিক্ত বাঁকুড়াবাসীর প্রাণ। মিলনের মধ্যেই সামাজিক মানুষ জীবনের ছন্দ খুঁজে পায় আর মিলনের সেই অন্তরঙ্গ রূপটি জীবন্ত হয়ে ওঠে মেলার মধ্যে।

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"
—রবীন্দ্রনাথ

সত্যই তাই। নিত্যদিনের দুঃখ-বেদনা-খরা-দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে পূজা-পার্বণ ও মেলার বৈচিত্র্যধারায় সতত অভিষিক্ত বাঁকুড়াবাসীর প্রাণ। মিলনের মধ্যেই সামাজিক মানুষ জীবনের ছন্দ খুঁজে পায়। আর মিলনের সেই অন্তরঙ্গ রূপটি জীবন্ত হয়ে ওঠে মেলার মধ্যে। তাছাড়া উৎসবমুখর জাতি হিসাবে পরিচিত বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যথার্থ রূপটিও খুঁজে পাওয়া যায় বিভিন্ন উৎসব, পূজা, পাল-পার্বণ এবং মেলাগুলির মধ্যে। বিশেষ করে গ্রামীণ মেলাগুলি। এই মেলাগুলি আজ অগ্রসরমান আধুনিক যন্ত্রযুগের মধ্যেও তার স্বকীয়তা বজায় রেখে চললেও কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে সব মেলাগুলিই এক। সে কারণে এই বাংলায় শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের সঙ্গে লোকধর্মের এক গভীর অন্তরঙ্গ এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যার শিকড় গ্রাম-গ্রামান্তরে পালিত ধর্মানুষ্ঠানগুলি ও তাদের প্রকাশমাধ্যম পার্বণ ও মেলার মধ্যে প্রোথিত।

গ্রাম্য-সংস্কৃতির অভিব্যক্তি লোকধর্ম। মানুষের জীবন-চেতনা, ভয়ভীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে লৌকিক দেবদেবীর। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক জীবনচর্যায় বহু আচার অনুষ্ঠান বিশ্বাস-সংস্কার-রীতি-নীতি লুপ্ত হয়ে গেলেও গ্রামবাংলার পরব-মেলা-গাজন-ব্রতকথা আজও রয়ে গেছে নানান সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

"...আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়, তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এটি প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার জন্য বর্ষাগম, তেমনি বিশেষভাবে পল্লী হৃদয় ভরিয়া দিবার উপযুক্ত মেলা।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বদেশী সমাজ ; ভাদ্র ১৩১১

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তস্থিত জেলা বাঁকুড়া। আয়তনগত দিক থেকে এ জেলা পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থতম জেলা ; লোকসংখ্যায় নবম স্থানের অধিকারী ; আর শিক্ষাগত দিক থেকে পঞ্চম জেলা হিসেবে স্বীকৃত। রাঢ় সংস্কৃতির পীঠস্থান বাঁকুড়া। বাংলার 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' প্রবাদটিকে অতিক্রম করে বাঁকুড়ার পার্বণ ও মেলাগুলি প্রমাণ করেছে যে, খরা-ব্যাধি-অজন্মা-দারিদ্র্য-অনগ্রসরতা ইত্যাদি সব অভিশাপকে তুচ্ছ করে এ জেলাবাসী হাসতে জানে, নাচতে ও গাইতে জানে, গর্জন করে গাজন ও চড়কে মাততে জানে, জানে পাল-পার্বণ ও উৎসবয়-মেলায় নিজেদের হারিয়ে দিতে। এর কারণ কী ? কারণ এ জেলার বৈচিত্র্যময় প্রাগৈতিহাসিকতা ও ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক ধারা। প্রাচীন রচনা জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আয়ারঙ্গ সুক্ত' থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ/পঞ্চম শতকের বাঁকুড়া তথা রাঢ় অঞ্চলের কথায় জানা যায় যে, এ অঞ্চলের অধিবাসীরা একদা ছিল ঘোরতর পশ্চাৎপদ ও অসভ্য। কিন্তু কালের স্রোতে এ জেলার নানান ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ-আদিবাসী অর্থাৎ আর্য-অনার্য ধর্মের মিলন মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এক বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে জেলার পার্বণ ও মেলাগুলির মধ্যে।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে 'মেলা' শব্দের অর্থ বলেছেন 'সমাগম'। মূল ধাতু 'মিল'। আবার বহু শতাব্দী ধরে 'মেলা' শব্দটি 'মণ্ডব' রূপে ব্যবহৃত। অন্যত্র দেখা গেছে পার্বণাদি বা উৎসবে বহু লোকের সমাগম উপলক্ষে বসত বাজার। এই বাজারই পরবর্তীকালে 'মেলা'র রূপ নেয়। আসলে মেলা হল সকলের মিলিত হবার অস্থায়ী অথচ অনিবার্য কোনও সামাজিক বন্দোবস্ত। সাধারণত উৎসব, পাল-পার্বণ-পূজা-আরাধনা-হাট ইত্যাদি উপলক্ষে বড় মাঠে, নদীর ধারে, বাঁধা চালা ঘরে, গৃহস্থের আঙিনায় কিংবা গ্রামের ষোল আনার ফাঁকা মাঠ ঘিরে পণ্যসামগ্রী বেচাকেনার ও লোকাচারসহ আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নিয়ে যে বৈচিত্র্যমূলক সম্মিলন তাই হল 'মেলা'। লোকসাধারণের মনের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক থাকায় জেলার মেলাগুলি হয়ে ওঠে জেলার লোকসংস্কৃতির হৃদস্পন্দন। মেলার মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় নিজেকে। দেখতে পায় জগৎকে। শুধু আনন্দধারা নয় পার্বণ ও মেলার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক দিকগুলো। বস্তুতই 'মেলা' যেন সৃজনশীল মনের ব্যাপ্তি ও জীবনবিকাশের আকৃতি স্বরূপ। সমাজের সর্বজনীনরূপটি মেলার অঙ্গনে ফুটে ওঠে বলেই সমস্ত উৎসব বা মেলার মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্যের চিরন্তন প্রকাশ ঘটে। বাঁকুড়া জেলার মেলা সম্পর্কে একটি লোকছড়া—

"খাতড়া থানার ইন্দপরব / সিমলাপালের ছাতা হে।
বিষ্ণুপুরের দুগ্‌গা পূজা / আরো সুন্দর রাস হে।।"

বাঁকুড়া জেলার মেলাগুলির রূপগত দিকসমূহকে তিনটি মোটা ভাগে ভাগ করে নিতে পারি যথা—(১) আদিম সংস্কৃতিবিষয়ক মেলা, (২) কৃষি বা ঋতু বিষয়ক মেলা, (৩) বাণিজ্যিক মেলা।

আদিম সংস্কৃতিবিষয়ক মেলাগুলি হল মূলত আদিবাসী মেলা ও পরব। সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ প্রকারের তফসিলি আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে। বাঁকুড়া জেলার ১৯৯১ সালের জনগণনায় এ জেলার জনচিত্রটি নিম্নরূপ—

এ জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাস অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে বেশি। তবে শুধু সাঁওতাল গোষ্ঠী নয়, কোড়া, ভূমিজ, খেড়িয়া, শবর, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি, বিরহোড় গোষ্ঠীও এ জেলায় রয়েছে। এদের আচার অনুষ্ঠানকে ঘিরে মাসে মাসে অনুষ্ঠিত হয় নানা পরব ও মেলা। যেমন—বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত মাঃ মড়ে পরব। বৈশাখে সেন্দরা, আষাঢ়ে এরঃসিম, ভাদ্রে হাড়িয়ার সিম, ছাতা পরব, আশ্বিনে মারাংবুরু ও দাঁশায় পরব, কার্তিকে বাঁধনা, সহরায় উৎসব। অগ্রহায়ণে আবাগি পরব, ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত করম পরব, দাঁশায় পরব। পৌষে নাগরদোলা, মাঝে শালুই হলা, ফাল্গুনে বাহা পরব। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরবগুলি হল (ক) করম

সাঁওতাল আদিবাসীদের নৃত্যগীতের উৎসব উদ্‌যাপন

জনগণনা ১৯৯১

মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
২৮,০৫,০৬৫	১৪,৩৭,৫১৫	১৩,৬৭,৫৫০ জন
গ্রামীণ জনগণ— মোট ২৫,৭২,৫৮৭	১৩,১৭,৫১৬	১২,৫৫,০৭১ জন
শহুরে জনগণ— মোট ২,৩২,৪৭৮	১,১৯,৯৯৯	১,১২,৪৭৯ জন
তফসিলি জাতি— মোট : ৮,৭৯,৯৩১	৪,৪৯,০৭৮	৪,৩০,৮৫৩ জন
তফসিলি উপজাতি— মোট : ২,৮৯,৯০৬	১,৪৭,০৩৬	২,৮৯,৯০৬ জন

পরব (খ) জাগরণ, (গ) ছাতা পরব, (ঘ) বাঁধনা / সহরায় পরব, (ঙ) বেজা বেঁধা ও শিকারোৎসব, (চ) বাহা পরব, (ছ) নাগরদোলা পরব।

(ক) **করম পরব**—সং. পর্বণ থেকে জাত পরব শব্দটি আদিবাসী সমাজেও প্রচলিত। অরণ্য ও কৃষিনির্ভর বাঁকুড়ার আদিবাসী গোষ্ঠীর শস্য উৎপাদন ও উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত করম পরবের প্রধান আকর্ষণ নাচ ও গান। 'করম' বৃক্ষকে কেন্দ্র করে এই পরব অনুষ্ঠিত হলেও কিছু কিছু লোকসংস্কৃতিবিদ করম পরবের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। বর্তমানে অনেক বর্ণহিন্দুও এ পরবে অংশগ্রহণ করায় পরবের তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) **জাগরণ**—সাঁওতালদের নৃত্য-গীতের উৎসব জাগরণ ওদের উচ্ছল জীবনের আঙ্গিক।

(গ) **ছাতা পরব**—ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে বরুণ দেবতার কাছে ছাতা ধরে বৃষ্টি বন্ধের আবেদনার্থে এই পরব। মূল উদ্দেশ্য শস্যহানি না হওয়া।

(ঘ) **বাঁধনা/সহরায় পরব**—সাঁওতালদের সামাজিক পরবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ও আনন্দদায়ক পরব হল বাঁধনা ও সহরায়। হান্টার সাহেব এই উৎসবকে 'জোহরাই' বলেছেন। সাঁওতালদের ভাষায় 'সহরায়'কে 'হাতী চলকান' (হাতী তুলা) পরবও বলে। সাধারণত এই উৎসবের ব্যাপ্তি কার্তিক অমাবস্যা থেকে (কালীপূজা) পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত। উৎসব পাঁচদিনের। প্রথম দিন 'উম', দ্বিতীয় দিন 'বঙ্গা', তৃতীয় দিন 'খুন্টাও', চতুর্থ দিন 'খুন্টাতোৎ', পঞ্চম দিন 'জালে'। অরণ্যসন্তান ও শিকারজীবী হলেও বর্তমানে অরণ্যহীনতার জন্য এই সমাজ কৃষিজীবী। তাই এই পরবে শুধু ফসল নয় ফসল উৎপাদনের অন্যতম সহায়ক গোরুও ওদের আরাধ্য। সাঁওতাল পল্লীর মেয়েরা গানে গানে, সহরায়কে বরণ করে আনে এভাবে—

'এতম তীরে লটা দাঃ / কঁয়ে তীরে হাটাঃ দ,
হাতী লেকান সহরায় / দহিনায় আতাং আগুয়ে।'

অর্থাৎ— ডান হাতে ঘটি আর বাঁ হাতে কুলা সমেত হাতিতুল্য সহরায়কে বরণ করে আনছেন নায়কে অর্থাৎ পুরোহিত।

বাঁকুড়া জেলার গৃহস্থবাড়ির শাশুড়িরা এসময় করেন 'জামাই বাঁধনা' বা 'জামাই বান্না'। উদ্দেশ্য কন্যার সন্তানলাভ। আজকাল এ পরব তিনদিন পালন করেই পরবের সমাপ্তি ঘটায়। এদিন হয় খুন্টাও। অর্থাৎ গোরুকে খুঁটিতে বেঁধে তার সঙ্গে খেলা। সেদিন কোনও পুজোর ব্যাপার নেই। মেয়ে জামাই এমনকি বাখালকেও সেদিন নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়। এ দিন সকলের কাছে অবারিত। তবে 'বঙ্গা' র দিন বাড়ির পুজোতে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। সেদিন ওদের ভারী আনন্দ, গানে আছে—

'খল তিরয়ো, মুচি তুমদাঃ / দেলাং তিরয়ো কুলহীতে
দেলাং তুমদাঃ আখড়াতে—'

...সেদিন সন্ধ্যায় হয়তো আকাশে চাঁদ উঠেছিল। বাতাসে মাৎকম বাহা (মহুয়া ফুল) আর সারজম গেলির (শাল মঞ্জরীর) গন্ধ ছিল। প্রাত্যহিকতার অনুভূতিতে একটা বোধ চনমন করে উঠেছিল নায়িকার রক্তে। শিকার কাঁধে থমকে গিয়েছিল সে। সামনে আবছা আলোয় অরণ্য। পিছনে থমকে যাওয়া গোষ্ঠী। সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন নরম লাগছিল তরুণীকে। সেদিন কি ওরা নেচেছিল ? নাচের সঙ্গে কি কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল ?

অর্থাৎ—ওহে, খলের বাঁশী, ওহে মুচির মাদল, বেরিয়ে এসো কুলহিতে। ঢুকে যাও আখড়ার মাঝে। বাঁশী ও মাদল যেন কথা বলে, কথা শুনে। তিনদিনের সমাপ্তিতে হয় 'বেজহাতু এঃ' বা তীরবিঁধা প্রতিযোগিতা।

(ঙ) **বেজাবেঁধা পরব**—বেজাবেঁধা কথাটির এক অর্থ তীরবিদ্ধ। অন্য অর্থ বিজয় সিদ্ধ। পুরাকালে রাজারা শরৎকালে ও মাঘ মাসে দিগ্বিজয়ে ও শিকার যাত্রায় বের হতেন। মাঘ মাসের ১লা 'এখ্যান' দিন আদিবাসীদের কাছে শিকারোৎসবের দিন, কারণ যুদ্ধ যাত্রার প্রয়োজন না থাকায় ওরা শিকার যাত্রায় বের হয়। শিকার করা পশু-পাখি এনে আনন্দভোজে মেতে ওঠে। তাই এই অনুষ্ঠানটি আজ প্রতীকী যাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলান্তর্গত মল্লভূম রাজধানী বিষ্ণুপুর রাজ দ্বিতীয় গোপাল সিংহের আমলে 'এখ্যান' পরবের আড়ম্বর ম্লান হয়ে এসেছিল। খর্ব হয়েছিল স্বাধীনতা। শিকারের জন্য অনুমতি নিতে হত জেলাশাসকের। রাজা লিখতেন—

> "বিষ্ণুপুর কিল্লানিবাসী মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপাল সীংহদেবের নিবেদন এই যে খানদানের দস্তরমতো প্রতিসন মাহ মাসের ১লা তারিখে এখান্দ শিকার হয়। এই শিকারে থাকি দস্তরমতে যোগাযোগ ও জেলা বাকুড়া ম্যাজেষ্টারী আদালাইতে থাকা বিষয়ের দারোগার নামে ঘাট আগলান মদদ দিবার বিষএ আজ্ঞাপত্রী প্রতিসন প্রচার হয় অতএব আগসনে উপরক্তি নিয়মিত প্রথার মতে পরআনের ঘাটার নামে পরাবাধিতে মজ্জী হয়। নিবেদন ইতি।"

সংগ্রহ : পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৬২

রাজসিক এই রীতি এখন আর নেই, তবু পয়লা মাঘ আজও সারা মল্লভূমে মাংস খাবার রীতি প্রচলিত। শিকারোৎসব যে কতখানি জনপ্রিয় ছিল তার অবশেষ এই মাংস খাবার রীতিতে আর মন্দিরময় বিষ্ণুপুরের বহু মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার নিদর্শনে টিকে আছে।

(চ) **বাহা পরব**—আদিম যুগের সেই অরণ্য—যেখানে সারজম (শাল) হেসা (অশ্বত্থ) বাড়ে (বট) কোউহার (অর্জুন) ইত্যাদি গাছের নিচে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার। ঝোপেঝাড়ে ওঁৎ পেতে আছে বাঘ, গুৎরু (সিংহ), ঘন ঘাসের মধ্যে বিঞ (সরীসৃপ) নাম না জানা অতিকায় প্রাণী—তারই মধ্য দিয়ে দল বেঁধে চলেছে কৃষ্ণবর্ণের একটা গোষ্ঠীর মানুষ। সবার আগে এক তরুণী—নায়িকা, মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী সমাজের একচ্ছত্র অধিকারিণী। তার নির্দেশে চলেছে গোষ্ঠী। দেহ জুড়ে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা, চোখে শিকার অন্বেষণের চকচকে লোভ। এক জান্তব জিজীবিষা। শিকার হত্যায় সেই নায়িকার ধারালো নখ-দাঁত রক্তাক্ত। দেহ ক্ষত-বিক্ষত। ...সেদিন সন্ধ্যায় হয়তো আকাশে চাঁদ উঠেছিল। বাতাসে মাৎকম বাহা (মহুয়া ফুল) আর সারজম গেলির (শাল মঞ্জরীর) গন্ধ ছিল। প্রাত্যহিকতার অনুভূতিতে একটা বোধ চনমন করে উঠেছিল নায়িকার রক্তে। শিকার কাঁধে থমকে গিয়েছিল সে। সামনে আবছা আলোয় অরণ্য। পিছনে থমকে যাওয়া গোষ্ঠী। সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন নরম লাগছিল তরুণীকে। সেদিন কি ওরা নেচেছিল ? নাচের সঙ্গে কি কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল ? যা ওদের শিকার ধরার সময় শব্দ থেকে আলাদা ? অথবা উগ্র লালসাধ্বনি থেকে পৃথক ?

ইতিহাসাশ্রিত এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তবে তাকে সংস্কৃতির প্রথম দিন বলা যেতে পারে এবং স্বীকার করতেই হয় যে, ভারতের মাটিতে সংস্কৃতির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এই গোষ্ঠীর মধ্যেই। ...আজ নানা পরিবর্তন এসেছে ওদের জীবনে। আর্যরা ওদের বিচ্ছিন্ন করেছে অনার্য বলে। বীরবুরু দাড়ে নাড়ি (ঘন জঙ্গল) পরিণত হয়েছে বীরবুরুতে (বনে)। বনের অস্তিত্ব টিকে আছে কয়েকটি বৃক্ষে ; কিন্তু আজও ওরা মাৎকম বাহা বাতাসে মদির হয়। সারজম গেলি অনেক দূরের সৌরভ বয়ে আনে। আর ভোঁতা নাকের পাটায় যখন সেই গন্ধ লাগে তখনই বাহা পরবের বাজনা বেজে ওঠে সাঁওতাল পল্লীতে। 'বাহা' শব্দের অর্থ 'ফুল'। কিন্তু এ ফুল গোলাপ বা গন্ধরাজ নয়। এ বাহা-'মাৎকম বাহা', যা সৃষ্টির আদি লগ্নে ওদের মাতাল করেছিল।

আগে মাঘী পূর্ণিমায় এখন ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যার যে কোনও একদিন বাহাপরব পালন করে বাঁকুড়ার আদিবাসী গোষ্ঠী। প্রাত্যহিকতার গ্লানি ভুলে গেজগুরিজ (উৎসবোপযোগী পবিত্রীকরণ) করে নেয় পরিবেশ ও পরিজনকে। তারপর নায়কি (পুরোহিত) আর নায়কে এরা (পুরোহিত পত্নী) দুজনে মারাংবুরু জাহের এরার (প্রধান দেবতাদ্বয়, দম্পতি) আশীর্বাদ নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হয়।

সাঁওতাল বসতি থেকে জাহের বুটা (দেবস্থান) পর্যন্ত আনন্দের ঢল নামে বাহা পরবের সকালে। সাঁওতাল সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—স্বতঃস্ফূর্ততা আনন্দোচ্ছলতা। আনন্দকে যখন নিজের মধ্যে ধরে রাখা যায় না, বারেবারেই সবার মাঝে সর্বপ্রাপতার ধারণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে তখনই হয় পরব বা উৎসব। 'বাহা পরব'ও তাই। আদিকাল থেকে এই গোষ্ঠী বড় অসহায়। নানা বাধাবিঘ্ন ও জটিলতার মাঝে জীবন টিকিয়ে রাখা বড় কঠিন বিষয়। প্রতিদিন মানুষের জীবনের সঙ্গে ওই জিজ্ঞাসার প্রশ্ন জেগে থাকে। তাই মারাংবুরু অভয় দিলেন শিটার (দেবদূত) মারফৎ চলার পথে বাধা দূর করার জন্য বাহা উৎসব করতে। বাহা সেরেঞ তারই গান। বাহা পরবের পদ্ধতিকরণ কারণের উল্লেখ বাহা সেরেঞে আছে—

> "নে গঁসায় বাহা এঞুতুম তেলে/এ মাম্ চালাম্ কান্ গঁসায়।
> যাগে কুড়োউ আকান জুটোউ আকান/আতাং কাঃ তালে গঁসায়।।"

[অর্থাৎ—হে প্রভু ; বাহা পরবের নাম করে তোমাকে উৎসর্গ করছি: যতটুকু সংগ্রহ করা হয়েছে, যতটুকু জুটেছে ততটুকু তুমি গ্রহণ কর।]

বাহা পরবের রাত বাহা নাচে উদ্দাম। বাসন্তী রাত। আকাশে চাঁদ। বাতাসে ফুলের গন্ধ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ একাত্ম হলে তার শক্তি হয় অসীম। রাত শেষ। বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে। গ্রামের মেয়ে বউরা জেগে। মুখে হাঁড়িয়ার গন্ধ। মনে পরবের আনন্দ। আবছা আলোয় ওদের মুখ দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। তবু মনে হয় সেই আদিম পৃথিবী—সেই জল-মাটি-আকাশ। সেই আদিম নারীগোষ্ঠী-নায়িকা একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে জীবন। মাঝে মারাংবুরু এবং জাহেরএরা।...রাত ভোর হয়। সূর্য ওঠে। নিত্যকালের সূর্য। উপেক্ষিত সাঁওতাল পল্লী থেকেও সূর্য দেখা যায়। তার দৈনন্দিন আহ্নিক গতিতে কখনও বা সুখ, কখনও দুঃখ। সেই সুখ-দুঃখের কূল যখন ভেঙে পড়ে তখন সে অলৌকিক শক্তির আবাহন করে। মেলা বসে। সাঁওতাল জীবনের ক্যালেন্ডারে আসে বাহা (বসন্তকাল)। সহরায় (হেমন্ত নবান্ন) করম (শরতে জন্ম-মৃত্যুর অনুষ্ঠান)। এক যুগ পর আসে জমশিম্ (বৃহদায়তন ধর্মীয় উৎসব) এবং বসে কুতরাসিনির মেলা, জঙ্গল সিনির মেলা। এভাবেই বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী গোষ্ঠী করম-বাধনা-জাগরণ-বাহা পরবের আনন্দে নিজস্ব মেলাগুলিকে বাঙ্ময় ও উজ্জ্বল করে তোলে।

(ছ) **নাগরদোলা পরব**—বাঁকুড়ায় সাঁওতালদের এই পরব এক বিচিত্র ও আদিম উৎসব। সাঁওতাল ধর্মচেতনার সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয়ে হয়তো এটির উদ্ভব ঘটেছে। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন উপোস করেন ওঝা বা জিয়াসী। সংক্রান্তির দিন স্নান সেরে উৎসব ক্ষেত্রে আসার পর বঙ্গা বা দেবতা তার উপর ভব করে, উনুনে বড় কড়াইতে মহুয়ার তেল চাপিয়ে গুড়ে তৈরি আরসা পিঠে ছেড়ে দেয়। ওঝা/জিয়াসী মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গরম তেলের ওপর থেকে খালি হাতে পিঠেগুলি ছেঁকে তোলেন। সঙ্গে চলে নাচগান ও হাড়িয়া পান। বাঁকুড়া থানায় সাংড়া ও পাকুড়ডিহায় পরবটি অনুষ্ঠিত হয়। দুই জায়গাতেই সেদিন মেলা বসে। তাছাড়া গঙ্গাজলঘাটি থানার বেলবনি, শালতোড়া থানার উদয়পুর, তালডাংরা থানা সদরেও একইভাবে এই অনুষ্ঠান কারণে মেলা বসে। আবার রায়পুর থানার জামিরডিহায় পরব মেলায় মাটির হাতিঘোড়া রেখে চাঁদমালা ধূপধুনো তেল সিঁদুর, হলুদ, নতুন গামছা, কাপড়, চিঁড়ে, দুধ, ঘি, গুড় , দই ইত্যাদি দিয়ে পুজো করা হয়। মেলার আয়ু একদিন। বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে গাছতলা পুকুরপাড় ছোট আটন প্রভৃতিতে এ রকম হাতিঘোড়া দিয়ে পুজো করা ও পরব করা যেন জেলাগত ধর্মীয় উৎসব।

২। কৃষি বা ঋতু বিষয়ক মেলা

বৈশাখ থেকে চৈত্র কিংবা চৈত্র থেকে বৈশাখ পর্যন্ত ঋতুচক্রের আবর্তনে বাঁকুড়ার লাল রুক্ষ মাটি মানবমনের আনন্দধারায় সিঞ্চিত হয়ে ওঠে বারো মাসে তেরো নয় তেইশ পার্বণের আনাগোনায়। এদের নিয়ে মেলাও হয় অসংখ্য। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে জেলার মেলাগুলিকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায় (১) আঞ্চলিক, (২) শহুরে।

আঞ্চলিক মেলাগুলি সাধারণত ধর্মকেন্দ্রিক। যেমন :

(১) শিবের গাজন মেলা (২) ধর্মরাজের গাজন মেলা, (৩) মনসার মেলা বা ঝাঁপান উৎসব (৪) বৈষ্ণবীয় মেলা, (৫) শাক্ত মেলা, (৬) লৌকিক মেলা, (৭) ব্রতানুষ্ঠান পরব এবং (৮) বাউল মেলা ইত্যাদি।

শহুরে মেলাগুলি শিক্ষামূলক। যেমন—শিশুমেলা, বইমেলা, কৃষিমেলা, শিল্পমেলা ইত্যাদি।

১। **আঞ্চলিক মেলা**—আঞ্চলিক মেলাগুলি অঞ্চল ভেদে সৃষ্ট

মটগোদার শনি মেলা, মানতকারীরা খড়ের মোড়কে চাষের প্রথম ফসল দান করে মানত শোধ করছেন ছবি : লেখিকা

দেব-দেবীর মাহাত্ম্যব্যঞ্জক ধর্মীয় মেলা। বাঁকুড়া শৈব-শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন অঞ্চল। তাই এ অঞ্চলের প্রাচীন মেলাগুলির অধিকাংশই শৈব মেলা।

বহু লৌকিক দেবদেবী অধ্যুষিত জেলা হিসেবে বাঁকুড়া বিখ্যাত হলেও এ জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা হলেন শিব। কারণ, গণনায় প্রায় ২০০ মতো শিব পরিচয় আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। এদের নামবৈচিত্র্য অভিনব।—মল্লেশ্বর, একেশ্বর, ষাঁড়েশ্বর, রত্নেশ্বর, হর্ষেশ্বর, বরুণেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, বুড়োশিব, বুনোশিব, মৃত্যুঞ্জয়, কালীঞ্জয়, পঞ্চানন, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি। এ অঞ্চলের শিব আর্য-অনার্য ধর্মচিন্তার এক সমন্বিত রূপ। বাণফোঁড়, চড়ক, আগুনঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ, ধুনো পোড়ানো, হত্যে দেওয়া প্রভৃতি দেহ লাঞ্ছনার মাধ্যমে মানত পূরণের নিষ্ঠুর আত্মনিগ্রহকে অক্লেশে সহনীয় করে এ জেলার মানুষ ধর্মীয় আচারে শিবপুজোয় মন্ত্রোচ্চারণ করে বলে—

"আদৌ শিবং পূজয়িত্বা, শক্তিপূজা ততঃপরং
অতএব মহেশানি আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ॥"

কাজেই শক্তিপূজা অপেক্ষা শিবপূজার মহিমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিব-গাজনে মাতে বাঁকুড়াবাসী। বৎসরের সব মাসেই শিবপুজো হয়। ধর্মানুষ্ঠান ও উৎসবাদির মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী 'শিব গাজন'। চৈত্র-বৈশাখ মাস জুড়ে এ জেলার গ্রামগুলি শিবনামে মুখর হয়ে ওঠে। চৈত্রমাসে এ জেলার ত্রিশটি (৩০টি) এবং বৈশাখ মাসে একশত কুড়ি (১২০টি) শিব গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এ তথ্য পেয়েছি অশোক মিত্র আই সি এস সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' ৪র্থ খণ্ড ১৯৭৪ গ্রন্থ থেকে। এসব গাজন পরব মেলাগুলি যদিও শৈব অনুষ্ঠান তথাপি এসব মেলাতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়।

শিবমূর্তি বা শিবলিঙ্গ পূজিত হয় না এমন গ্রাম এ জেলায় দেখা যায় না। তবে প্রাচীন শিবমন্দিরগুলির অধিকাংশই জেলার প্রধান প্রধান নদনদী দ্বারকেশ্বর, দামোদর, কংসাবতী, কুমারী ইত্যাদির অববাহিকায় গড়ে উঠেছে। আর এইসব শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে।

বাঁকুড়ার একেশ্বর শিব সমন্বয়ের শিব। নামকরণেই তার প্রমাণ (একতা + ঈশ্বর = একেশ্বর)। জনশ্রুতি আছে সামন্তভূমের রাজার সঙ্গে মল্লভূমের রাজার একদা রাজ্যসীমা নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধের মীমাংসা করেছিলেন স্বয়ং শিবশম্ভু, এই দুই ভূমের সীমানা দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে—একটি মন্দির স্থাপন করে। এই মন্দিরটি হল একেশ্বর মন্দির। জনশ্রুতির অন্তরালে সামান্য ইতিহাসও ছুঁয়ে গেছে। মল্লভূম ও সামন্তভূম রাজাদের ঐক্যিয়ার নির্দেশক ঈশ্বর বলেই এ স্থানের দেবতা একেশ্বর এবং শিবভাবনায় ভাবিত মানুষ এ স্থানের নাম দিলেন একেশ্বর। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন একেশ্বরে হয় শিবের পূর্ণ উৎসব ও মেলা। স্বদেশ ও বিদেশ থেকে আগত হাজার হাজার দর্শকমণ্ডলীর সমাগমে ও একইসঙ্গে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবধারার ত্রিবেণী সঙ্গমে একেশ্বরের মেলা হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মরাজের মেলা—লৌকিক ছড়ায় পেয়েছি—

"ধর্মরাজের ঘোড়া,
বাঁ পা'টি লটর-পটর ডান পা'টি খোঁড়া।"

সম্ভবত শিবের গাজন প্রভাবিত ধর্মের গাজন। ধর্মগাজনের উদ্ভব আনুমানিক ১৭-১৮ শতকে। ব্যাপকতা রাঢ় অঞ্চলে। বাঁকুড়া রাঢ়ের কেন্দ্রমণি। এ জেলার ময়নাপুর, বেলিয়াতোড়, মটগোদা কাপিষ্ঠা, বৃন্দাবনপুর ইত্যাদি গ্রাম ধর্মঠাকুরের গাজনের জন্য প্রসিদ্ধ। ধর্মরাজের স্বরূপ সম্বন্ধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> Dharma who is however described as the supreme deity, creater and ordianer of the universe, superior event. Brahma, Vishnu and Siva and at times identified with them and he has nothing of the abstraction of the Buddhist Dharma about him :

এই ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে যেসব মেলা অনুষ্ঠিত হয়, বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে তা প্রায় একই রকম। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—"মেলা ভারতের পল্লীর সার্বজনীন উৎসব। কোনও উৎসবের প্রাঙ্গণের মুক্ত অঙ্গনে সকল গ্রামবাসীর মধ্যে উদ্ভাসিত মিলনস্থল হইল মেলা।" এ সব মেলার একদিকে ভক্তরা দণ্ডী কেটে সারা পথ পরিক্রমা করে। অন্যদিকে চলে ভক্তমণ্ডলীর 'বাণফোঁড়া'র কৃচ্ছ্রসাধন। সেইসঙ্গে রাস্তার দুধারে মেলা প্রাঙ্গণে দোকানদার ও গ্রামবাসী মেলা দর্শনার্থীদের সমাবেশ। মানুষের হট্টগোল, শিশুর কান্না, ছোটদের হুল্লোড়, বয়স্কদের ভক্তিমানাতা সব মিলিয়ে মেলাকেন্দ্রগুলি হয়ে ওঠে সনাতন ভারতের এক শাশ্বত চিত্র।

বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজের গাজনের সূত্রপাত হয় আষাঢ় পূর্ণিমায়। রথের দিন স্থাপিত হয় ঘট। পুরোহিত পুজো করেন তিন গ্রামদেবতা। মহাদানা, স্বরূপনারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী। মহাদানা পাথরের টুকরো বাউরিদের দেবতা। স্বরূপনারায়ণ শিলাখণ্ড—সর্বসাধারণের দেবতা। লক্ষ্মীদেবী রায়বাড়ির উপাস্য—মূর্তিহীন। রেকাবির উপর ধান ও লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে তাঁর স্বরূপ। একে বলা হয় 'সমাজবদ্ধ' অনুষ্ঠান। মটগোদার মেলাতে আচার-অনুষ্ঠান নয় 'মেলা'ই প্রধান। ময়নাপুরে কমপক্ষে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী ভক্তা নাহলে গাজন অনুষ্ঠিত হতেই পারে না। নারী ভক্তাদের বলা হয় 'আমিনী'। ধর্মঠাকুরের নাম হাকেন্দশ্বর। তিনি শিব। ধর্মরাজ হলেন যাত্রাসিদ্ধি রায়। একটি আটচালা মন্দিরে তাঁর অধিষ্ঠান। ভেতরে কাঠের মঞ্চে ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। জনশ্রুতি যাত্রাসিদ্ধি রায় রামাই পণ্ডিতের (শূন্য পূরাণ রচয়িতা) উপাস্য দেবতা। যাত্রাসিদ্ধি রায়ের গাজনমেলা হয় বৈশাখে। বার্ষিক পুজো ভাদ্রমাসে। মেলাও বসে। এ সময় 'সয়লা' উৎসব নামে একটি অনুষ্ঠান পালিত হয় যেখানে ধর্মঠাকুরকে সাক্ষী রেখে ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়।

ধর্মরাজ গাজনের সর্বোৎকৃষ্টতা দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে। তৎকালীন বৌদ্ধসংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুসংস্কৃতির মিলনে কালের প্রয়োজনেই সাধিত হয়েছিল এই গাজন। হিন্দু ধর্মে এই মিলনই 'গাজন' নামে লোকোৎসবে পরিণত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ও মিলনের মধ্য দিয়ে এই গাজনোৎসবগুলি আমাদের ধর্মীয় ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে জনপ্রিয় মহোৎসবরূপে পালিত হয়ে আসছে। বহুদিন আগে এই গ্রামে দশহরার দিন গাজন হত। সে গাজনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মনসার 'সঙ' সাজা। কিন্তু প্রতি বছরই এই সঙ সাজা নিয়ে নানান বিভ্রাট ঘটত। তাই গ্রাম্য ষোলআনার সভায়

বেলিয়াতোড় অঞ্চলে ধর্মরাজের গাজনে অনুষ্ঠিত 'হিন্দোল বাণ'। লোকসংস্কার এই বাণ করলে পেটের অসুখ নিরাময় হয়

জনগণের ইচ্ছায় গ্রামের ছোট রায়দের নেতৃত্বে একটি 'গাজন কমিটি' গঠিত হয়। চালু হয় ধর্মরাজকে কেন্দ্র করে গাজন। এই গাজন মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ধর্মরাজের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। যার শুরু ধর্মরাজের মন্দির থেকে, গন্তব্য স্থানীয় তাঁতিপুকুর। উদ্দে- পাটস্নান। সঙ্গে ঢাক, ঢোল ও নানান বাজনা। রাস্তার দুদিকে দর্শকদের ভিড়। শোভাযাত্রার প্রথমে ভক্তাদের মাথায় ধর্মরাজের পাটা—এরা তাঁতি পরিবারের লোক। এঁদের পূর্বপুরুষ দামোদরের তীরে ধর্মরাজশিলা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। ধর্মরাজের জয়ধ্বনি দিয়ে নাচতে নাচতে ভক্তার দল এগিয়ে চলে, পিছনে আসে যাত্রাকলসী। বিরাট আকৃতির মাটির কলসিটি সারা বছর পূজিত হয় মন্দিরে। বেতের ছড়ি দিয়ে ভক্ত্যারা কলসিটি ঘিরে রাখেন—আর তখন কাঠের সাদা ঘোড়ায় একজন সওয়ারীকে দেখা যায় যার কোলে মহাদানা শিলা। সারা বছর গাছতলায় অবস্থান করলেও এদিন তিনি রাজকীয় মর্যাদায় ঘোড়ার পিঠে ব্রাহ্মণের কোলে চড়ে স্নান করতে যান। জয়ধ্বনি ওঠে 'জয় মহাদানার জয়'। জয়ধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতে ঘোড়ার পিঠে পুরোহিতের কোলে চড়ে এসে হাজির হন স্বরূপনারায়ণ। শেষে আসেন ধর্মরাজ। বিরাট তাঁর ঘোড়া। অলৌকিক জাঁকজমক. শ্রদ্ধায় ভালবাসায় হাজার হাজার কণ্ঠে স্বতোৎসারিত হয় 'জয় বাবা ধর্মরাজের জয়'। ধর্মরাজের মেলা জমজমাট হয়ে ওঠে। এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ বাণফোঁড়া পর্ব। কত রকমের বাণ—লোহার বাণ, নলীবাণ, ঢেঁকিবাণ, হিন্দোলবাণ, লড়কিবাণ, দশমুখীবাণ ইত্যাদি। ধর্মরাজ গাজন মেলার এই বাণফোঁড় অনুষ্ঠান যেন মেলার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া ধর্মপূজার প্রবর্তক এবং শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিতকে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রহবিপ্র বলেছেন। গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্যের অর্থাৎ ধর্মঠাকুরের দ্বাদশরূপের আবির্ভাব। যথা—কালু রায়, দোলু রায়, ক্ষুদি রায়, যাত্রাসিদ্ধি, স্বরূপনারায়ণ, শ্যাম রায়, মোহন রায়, কাঁকড়াবিছা, দল-মাদল, বাঁকুড়া রায়, বাঁকা রায়, চাঁদ রায়, বুড়া রায় ইত্যাদি। এ কথা ঠিক যে ধর্মঠাকুরের প্রতিটি নামের একটি করে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা আছে। যেমন—কাঁকড়াবিছা নামাঙ্কিত ধর্মঠাকুর হলেন বৃশ্চিক রাশির সূর্য। বুড়া রায় হলেন সংক্রান্তির সূর্য। ধর্মঠাকুরের মতো COSMIC DEITY রাঢ় বঙ্গে আর দ্বিতীয় নেই—ইনি যেন তথাগত বুদ্ধ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—'গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে সূর্যতেজ প্রশমিত করিয়া কৃষিকার্যের সহায়ক জলবায়ু করিবার জন্য এই লৌকিক প্রথার উদ্ভব হইয়াছে।' তাই ধর্মরাজ শুধু আঞ্চলিক দেবতা নন, তিনি কৃষিদেবতাও।

মনসা পরব ও ঝাঁপান উৎসব মনসাদেবীর আরাধনা শুধুমাত্র রাঢ় বাংলায় নয়, ভারতের সব প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিতা হন। যেমন—দক্ষিণ ভারতে 'মুদামা' ও 'মঞ্চাম্মা' নামে দুটি সর্পদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে 'মঞ্চাম্মা' থেকেই মনসা শব্দের উৎপত্তি। | মঞ্চাম্মা > মনচাঅম্মা > মনচামাতা > মন্সামাতা > মনসা | এই পূজায় কোথাও জীবিত সর্পের আবার কোথাও সর্পাধিষ্ঠিত বৃক্ষের (মনসা বৃক্ষ Cactus) পূজা হয়। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন, উভয়েই উর্বরতা ও উৎপাদনের প্রতীক।

বাঁকুড়া জেলার মনসাদেবীর আরাধনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীর (দশহরা) দিন থেকে ডাক সংক্রান্তি (আশ্বিন সংক্রান্তির) দিন পর্যন্ত মনসাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় নানা উপচারে জাঁকজমকে গাজন ও মেলার অনুষঙ্গে। সেইসঙ্গে কোথাও একমাস কোথাও চারমাসব্যাপী মনসামঙ্গলের গান ও ঝাঁপান (সাপ খেলার প্রদর্শন) উৎসব চলে।

ঝাঁপান—মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার বিশিষ্ট উৎসব এই ঝাঁপান। বৈচিত্র্যে যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি ভয়ংকর। অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ মাসে। ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয়—বাঁকুড়ার মানকানালি, লাউদা, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। বেলিয়াতোড়ে একসময় খুব জাঁকজমক করে ঝাঁপান হত। বিখ্যাত গুণিন ছিলেন নিবারণ লোহার। মুখোমুখি মাচা বেঁধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। মন্ত্র পড়ে, সাপ উড়িয়ে, গলায় জড়িয়ে, মুখে পুরে ভয়ংকরভাবে লড়াই হয় গুণিনদের মধ্যে।

মল্লরাজাদের সময় বিষ্ণুপুরে ঝাঁপান উৎসবে খুব জাঁকজমক ছিল। উৎসবের রেশ কিছুটা এখনও রয়ে গেছে। শ্রাবণ সংক্রান্তি বা মা-খল দিনে গুণিনরা দলবলসহ ভড়পি বা ঝাঁপি নিয়ে বিষ্ণুপুরের রাজবাড়িতে চলে আসেন। কেউ আসেন চতুর্দোলায়, কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ আবার চাকা লাগানো কাঠের ঘোড়া কিংবা বাঘের পিঠে চড়ে। চতুর্দোলায় রাখা মাটির তৈরি বাঘের পিঠে চড়েন কেউ। রাজাকে সম্মান দেখিয়ে শুরু করেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলা। কেউ কেউ গায়ে হাতে সাপ জড়ানো ছাড়াও নাকের ডগায়, কানের পাতায়, আঙুলে ও ঠোঁটে সাপ ঝুলিয়ে দেন। ঢাক বাজাতে বাজাতে বলেন, 'বাজুক বিষম ঢাকি, চলুক ঝাঁপান।' বছরের শ্রেষ্ঠ গুণিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার

মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন। পুরস্কার পেতেন টাকাকড়ি বা জমিজমার নিষ্কর স্বত্ব। মল্লরাজাদের এখন আর সে ঐশ্বর্য নেই, ফুলের মালাই এখন পুরস্কার। এতেই সম্পূর্ণতা পায় বাঁকুড়া জেলার মনসা পরব।

জীমূতবাহনের পূজা ও শিয়াল-শকুনি পরব—বাঁকুড়া জেলার গৃহস্থদের এই বিশিষ্ট লোকউৎসব অনুষ্ঠিত হয় আশ্বিন মাসের জিতাষ্টমী তিথিতে। ভিজে মটর ও কলাই ভর্তি পিতলের কলস-মুখে শশা দিয়ে শালুক ফুলে সাজিয়ে পুজো করা হয়। বাড়ির সামনে বা কোনও খোলা মাঠে আতা গাছের ডাল পুঁতে মাটির তৈরি শিয়াল-শকুন সাজিয়ে রাখা হয়। বিষ্ণুপুরে দেখেছি ফাঁকা মাঠে বট ডাল কিংবা কোনও বড় গাছের ডাল পুঁতে চারদিকে গভীর গর্ত করে সেই গাছের ডাল পোঁতা গোড়ায় কলাই ফুল, হলুদ, সিন্দুর ইত্যাদি দিয়ে পুজো করেন পুরোহিত। পুজো হয় রাত্রে চার প্রহরে চারবার। পরদিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শিয়াল-শকুনি নিয়ে স্নান করতে যায় নিকটবর্তী নদী বা পুকুরে। একগলা জলে দাঁড়িয়ে শিয়াল-শকুনকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—

'শেয়াল গেল খালে   শকুন গেল ডালে
ও শেয়াল মরিস না
লোক হাসিটা করিস না।....

তারপর ডুব দিয়ে শশা কামড়িয়ে প্রিয় সখীর সঙ্গে 'ডুবে শশা' পাতিয়ে ব্রত ভঙ্গ করে। শেষ হয় শেয়াল-শকুন পরব।

ভাদু ও তুষু পরব এবং মেলা—এ দুটিই মেয়েদের উৎসব। গানে গানে এ উৎসবের শুরু, শেষও গানে। সময়ের স্রোতে কিছু লোকাচার উৎসব দুটির মধ্যে ঢুকে গেলেও তা উপলক্ষ মাত্র। দুটি উৎসবই কৃষিভিত্তিক। 'ফার্টিলিটি কাল্ট'। এমনিতেই বাংলার ঘরে প্রতিমাসেই উৎসব। প্রাকৃতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে এক এক ঋতুতে এক এক পরব। অধিকাংশ উৎসব পালিত হয় বার-ব্রতের মধ্য দিয়ে। তাই উৎসব দু-পর্যায়ের এক—খোলামেলা মুক্ত পরিবেশে। দুই—গৃহস্থের গৃহকোণে। ভাদু ও তুষু মূলত গৃহস্থের অন্তঃপুরে পালিত উৎসব, তবে বিসর্জনের দিন এই উৎসব কেন্দ্রীভূত হয় মেলাতে আর তখন জমে ওঠে তুষু ও ভাদু পরব।

ভাদু পরব—ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম ভাদুপরব। ক্ষেত্র সমীক্ষায় জেনেছি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার সরাকরা জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রায় ২৫০০ বছর ধরে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনধারা বহন করে আসছে। এদের প্রধান পরব হল ভাদু। এদের মুখাশ্রিত সঙ্গীতধারায় ভাদু পরবের ঐতিহ্য আজও টিকে আছে। বর্তমানে উচ্চ-নিম্ন সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ভাদু পরবে অংশ নিচ্ছে, তবে মেয়েরাই সারা ভাদ্রমাস ধরে সন্ধ্যায় ভাদুদেবী বা ভদ্রেশ্বরীকে ঘিরে গানের সুরে সুরে একাত্ম হয়ে ভাদুপুজো করেন। তারপর ভাদ্র সংক্রান্তিতে হয় ভাদুর জাগরণ। যে ঘরে ভাদু প্রতিমা রাখা হয় সে ঘরটি শালুক দোপাটি প্রভৃতি ফুল দিয়ে সাজিয়ে সামনে নৈবেদ্য হিসেবে রাখা হয় মণ্ডা, মিঠাই, খাজা, জিলিপির সুসজ্জিত থালা। ভাদ্র মাসে আউশ ধান পাকে, কেটে ঘরে তোলা হয়। ভাদু ভাদোই ধানে নবান্ন উৎসব। ধানকাটার পর দিনকয়েকের যে সচ্ছলতা আসে ভাদু উৎসবের গানে তার প্রতিধ্বনি—

"ভাদ্র মাসে ভাদোই ধান/কি বর্ষণ অভিরাম।"

কিংবা "ভাদ্রমাসে বতর দেয় গতরে/তাতেই চাষীর ঘুম সরে।"

মানভূম বা বর্তমান পুরুলিয়ায় বাইদা ও তড়া জমির পরিমাণ বেশি ছিল। আউশের নবান্ন উৎসব স্বভাবতই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। হয়তো পঞ্চকোট রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ছিল উৎসবটির পিছনে। নতুন জেলা শহর বাঁকুড়া তখন গড়ে উঠেছিল। জীবিকাহীন বাউরিরা কাজের খোঁজে নতুন শহরে এসে জড়ো হয়েছে। শহরে নানা ধরনের মানুষ। তাদের মধ্যে প্রধান ঠিকাদার ও বণিক। বাউরিরা শ্রমিকের কাজ পেল, মেয়েরা কামিন। রূপ-যৌবন পণ্য হল। বাঁকুড়া শহরে ভাদু-পরব গণিকাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। বর্তমানে গৃহস্থের কুমারী মেয়েরাও ভাদু নিয়ে নিশিপালন করে। ভাদুগানে রয়েছে প্রাচীনত্ব ও আধুনিকতার ছাপ যা লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যধারার প্রতীক। মেলা হয় বড়জোড়া, বাঁকুড়া ইত্যাদি স্থানে।

তুষু পরব—মকর পরব আমন ধান কাটা হয় অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে। খামারে তুলে ঝাড়াই-মাড়াই করে ধান ভানা বা ভাঙা চলে গোটা পৌষমাস ধরে। কুমারী মেয়ে ও কমবয়সী বধূদের কাজ সেটি। প্রত্যন্ত গ্রামে 'ধানের কল' তখনও বসেনি। শহরে সবে ২/১টি বসেছে কিন্তু পথ দুর্গম, খরচও বেশি। কাজেই ধান ভানতে হয় ঢেঁকিতে। শ্রমসাধ্য ও একঘেঁয়ে এই কাজটিকে গ্রামের মেয়ে-বউরা পরবে পরিণত করলেন অনায়াসে। কারণ ঢেঁকির ওঠানামার সঙ্গে পা ফেলে ধান ভানতে ভানতে তাঁরা গলা ছেড়ে গানও জুড়ে দিলেন। ঢেঁকির আওয়াজের সঙ্গে মিশে গেল কণ্ঠস্বর। এখানে কোনও লজ্জা বা কুণ্ঠা ছিল না। অংশীদার ছিলেন কেবল মহিলারাই।

প্রথম ধান ভাঙার পর তুষটুকু মাটির সরায় রেখে সরাটিকে সাজিয়ে তোলা হত। আলপনা আঁকা হত সরার গায়ে। তুষের ওপর গাঁদা ফুল দিয়ে মন্দির চূড়া তৈরি করে সাজিয়ে তুলতো 'তুষু খলা'। তারপর তাকে ঘিরে বসত মেয়েরা। সান্ধ্য আসর জমজমাট হয়ে উঠত তুষুগানে—

"উঠ উঠ উঠ তুষু উঠ করাতে এসেছি
তোমারি সব সঙতি মোরা তুষু পুজতে বসেছি।"

গোটা পৌষমাস জুড়ে গ্রাম বাঁকুড়ার প্রতিটি ঘরে ঘরে চলে এরকম তুষু গানের সান্ধ্য আসর। অবসর বিনোদন, একঘেঁয়েমি পরিশ্রমের হাত থেকে সাময়িক বিশ্রাম পাবার অবকাশটুকু ধর্মীয় আবরণে মুড়ে বাড়ির মেয়েরা নিজেদের সৃজনশীলতাকে এভাবেই ফুটিয়ে তুলতেন। পৌষ-সংক্রান্তিতে আসত বিসর্জনের পালা। কাছাকাছি নদী/পুষ্করিণীতে যাওয়ার পথে মেয়েদের মধ্যেই চলত দলগত প্রতিযোগিতা। সবই হত গানের মাধ্যমে যেমন—

"আমার তুষু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝলমল করে গো
উয়ার তুষু হ্যাংলা মাগী, আঁচল পাত্যে মাগে গো।"

সঙ্গে সঙ্গে অন্য দল গেয়ে ওঠেন—

"এ চালে ধান ও চালে ধান সকল খেল হাঁসে গো
তুমার তুষুর খাঁদা নাকে বোরলে (বোলতায়) চাক বাঁধে গো।"

মহিলাদের এ এক অনবদ্য কবির লড়াই। তুষুর কোনও মূর্তি নেই। প্রদীপ ঘেরা 'তুষু খলা' বা চৌদোলা তুষুর প্রতীক। বিসর্জনের দিন তুষু খলার চারদিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে গাঁদাফুলের সমারোহে সাজিয়ে কোথাও সেটিকে চৌদোলার ভিতরে দিয়ে কোথাও সুসজ্জিত খলাটিকে

তুষু পরব উপলক্ষে হাটের দোকানে তুষুখোলা, আলোখোলা এবং অন্য পূজাপার্বণের জন্য পোড়া মাটির ঘট ঘোড়া হাতি ইত্যাদি, সোনামুখি হাটতলা

নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে মেয়েরা অশ্রুসজল কণ্ঠে সমস্বরে গেয়ে ওঠেন—

"তিরিশ দিন রাখলুম মাকে, তিরিশ সলতে দিয়ে গো
আর রাখতে লারলম মাকে, মকর আইছেন লিতে গো...।"

এরপর শুরু হয় মকর পরব। নদীতীরকে কেন্দ্র করে এ পরব 'মেলা'য় রূপ পায় কোথাও ১দিন কোথাও ৩দিন কোথাও বা ১ সপ্তাহব্যাপী। বাঁকুড়া জেলার পরকুলের মেলা বিখ্যাত মেলা। তুষু ভাসানের সবচেয়ে বড় জমায়েত। এ অঞ্চলে তুষু প্রতীকী নন, মাটির কন্যামূর্তি।

খাতরা থানায় কংসাবতীর তীরে পৌস সংক্রান্তির দিন জাঁকজমকের সঙ্গে ভাসানো হয় তুষু। বিষ্ণুপুরে তুষু ভাসেন চৌদলে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বাঁধ ও নদীতট গমগম করে ওঠে। নাচগান, ঢাকঢোল ও কাঁসির শব্দের সঙ্গে মেয়েদের উচ্চ গ্রামে তুষুগানের সুরেলা স্বরে নদীতট হয় উচ্ছ্বসিত। সারা বছরের প্রতীক্ষিত চাষীও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষেরা উন্মুখ হয়ে থাকে এই দিনটির জন্য কারণ এদিন চলে যাবতীয় জিনিসপত্র বেচাকেনার তীব্র প্রতিযোগিতা। মেলার রূপ পূর্ণতা লাভ করে।

শক্তিপূজা ও উৎসব : শাক্তপ্রভাব বাঁকুড়া জেলার মাটিতে মিশে আছে। মনসা ছাড়াও কালী, দুর্গা, রক্ষাকালী, বাশুলী, চণ্ডী, নাচনচণ্ডী, মহামায়া, রঙ্কিনী, অম্বিকা, গন্ধেশ্বরী, বাসন্তী, ভগবতী, মহিষমর্দিনী, মাতঙ্গী, যোগাদ্যা, মৃন্ময়ী, সংকটতারিণী প্রভৃতি। মল্লরাজারা আদিতে শাক্ত ছিলেন। মল্লবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্ল দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। মৃন্ময়ী মল্লরাজাদের কুলদেবী। শক্তিপূজায় মল্লরাজারা সম্ভবত এক সময় নরবলি দিতেন এ জেলার বহুস্থানে দুর্গাপূজায় মুণ্ড পূজা হয়। বিষ্ণুপুরে ও সোনামুখীতে ও বাঁকুড়ার কানকাটায় নারীমুণ্ড প্রতীকে দেবী দুর্গার পূজা হয়।

জেলায় এমন থানা কম আছে, যেখানে কালী রক্ষাকালী বা মহামায়ার মন্দির বা থান নেই। ভক্তোবাঁধ সলদা লেগোরে রক্ষাকালী জাগ্রত। নিবিশা গড়গড়্যা বনকাটা বিবড়াদা দিগপাড়ের কালীও কম জাগ্রত নন। সাহারজোড়া ও বাঁকুড়ায় মহামায়ার মন্দির রয়েছে। নানারূপে নানা মাহাত্ম্যে চণ্ডী জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছেন। পেঁচাশিমুল, মালিয়াড়া, আটবাইচণ্ডী পরেলা বোঁয়াইচণ্ডী প্রভৃতি জায়গার চণ্ডী জাগ্রতা ও মেলার মহিমায় বিখ্যাত। অন্যান্য দেবীদের প্রভাবও জেলায় কম নয় এর মধ্যে বিষ্ণুপুরের মল্ল ও ছাতনার সামন্তদের দুর্গোৎসব যথেষ্ট বিখ্যাত এবং বৈচিত্র্য ও আড়ম্বরে উল্লেখযোগ্য। তবে মল্লরাজাদের দুর্গাপূজায় শাস্ত্রাচার অপেক্ষা লোকাচার বেশি কাজেই এটি এখন সার্বজনীন লোকউৎসবে রূপ পেয়েছে। মহাষ্টমীতে এ পূজার আড়ম্বর সর্বাধিক। সেদিন যেন মহোৎসব। সেদিনের দেবী উগ্রচণ্ডা বা চামুণ্ডা। প্রতীক মানকচু— আসলে ইনি বিশালাক্ষী। দেবীর ১৮ হাত। স্নান করানো হয় ঘরে। রাজাও স্নান সেরে রাজপোশাক পরে তরবারি হাতে করে রাজ— পুরোহিতের পিছনে এসে কাছা ধরে দাঁড়িয়ে দেবীকে দর্শন করে দুবার অঞ্জলি দিয়ে তোপ দাগার হুকুম দেবার সঙ্গে সঙ্গে কামানে তোপ দাগা হত। একে বলা হয় 'তামির' সংকেত। জলভরা বড় গামলায় তামার কুঁড়ি আগেই ভাসিয়ে দেওয়া হত। কুঁড়িটি ডুবে যাওয়ার মুহূর্তটি ছিল মহাষ্টমীর শুভক্ষণ। রাজ ইঙ্গিতে গর্জে উঠত কামান, শুরু হত মহাষ্টমীর বলিদান। প্রথাটি বদলেছে। এখন ঘড়ি দেখে সংকেত করা

হয় তোপধ্বনির। কামানে বারুদ পুরে মূর্চা পাহাড়ের উপর অপেক্ষারত মাদোড়েরা আগুন দেয় বারুদে। মল্লভূমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঢেউয়ের মতো ভেসে ভেসে চলে যায় তোপধ্বনি। মল্লভূমজুড়ে শুরু হয় মহাষ্টমীর পুজো। এই তোপধ্বনিকে আজও বলা হয় 'মল্লেররা'।

দশমীর দিন বিষ্ণুপুরজুড়ে চলে আর একটি উৎসব। রাজবাড়ির বাইরে। মুখোশ নাচ। স্থানীয় ভাষায়, রাবণ কাটার বাঁদর নাচ। বাঁদরের সং সেজে নেচে নেচে ভিক্ষেয় বের হয় অনেকে। মুখোশ এঁটে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র সেজে বিজয়ার দিন কুম্ভকর্ণ বধ, একাদশীর দিন ইন্দ্রজিৎ এবং দ্বাদশীর দিন রাবণ বধ। মহা আড়ম্বরে রঙ্গকৌতুকের ভিতর দিয়ে এই রাবণ বধ পরব পালিত হয় আজও। মেলাও বসে তিন দিন।

ছাতনার সামন্তরাজাদের দুর্গাপূজার বৈচিত্র্যও কম নয়। রাজাদের নামও জীবিতকাল রক্ষা করার অদ্ভুত উপায় তারা অনুসরণ করেন। সপ্তমীর দিন একটি পেটিকায় একখানা কাগজে রাজার নাম, বছর ও তারিখ লিখে পেটিকার আগেকার অংশের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। সেদিন রাজবাড়িতে রক্ষিত বারোজন সামন্তের অস্ত্রশস্ত্র বের করা হয়। অষ্টমীর দিনে পুজো শেষ হলে শুরু হয় ডালা দৌড়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ'দুয়েক লোক ডালা মাথায় করে রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ান। রাজার কাছ থেকে সংকেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেন দৌড়। ডালা দৌড়ের মতো খাঁড়া দৌড়ও হত দশমীর দিন। বারোজন সামন্তের অস্ত্রের অংশ নিয়ে ছুটতেন সামন্ত বংশধরেরা। যিনি আগে এসে রাজবাড়ির মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছতে পারতেন তাঁকে ধুতি ও চাদর পুরস্কার দেওয়া হত। এতে খুব গৌরব ছিল। সেদিন দরবার বসত। প্রজারা রাজাকে সাধ্যমতো নজরানা দিত আর রাজা 'খাওয়াসের' মারফত তাদের একটি করে পানের খিলি উপহার দিতেন। ডালা ও খাঁড়া দৌড় আজও ছাতনার দুর্গাপূজায় হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে মেলা বসে তবে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ আড়ম্বর ততটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাঁকুড়াস্থিত সোনামুখী শহরে মহা আড়ম্বরে কালী ও কার্তিক পুজো হয়ে থাকে। তবে দুয়ের মধ্যে কার্তিক পুজোর ধুম বেশি। বড় ও মাইত কার্তিক তলায় মেলাও বসে চারদিন। কার্তিকের নামও বহুবিধ। বড় কার্তিক মাইত কার্তিক, মহিষগোঠ কার্তিক, নব কার্তিক, বাবু কার্তিক, ডেঙ্গো কার্তিক ইত্যাদি। পুজোর সংখ্যা শতাধিক। বর্ধমান জেলার কাটোয়া ছাড়া কার্তিক পূজায় এত ঘটা ও জাঁকজমক পশ্চিমবাংলায় আর কোথাও দেখা যায় না।

সোনামুখীতে কালীপুজোর ঘটাও কম নয়। পুজোর সংখ্যা যেমন প্রচুর প্রতিমার চেহারাও তেমনই বিচিত্র। নামও তদনুরূপ। এ অঞ্চলে এক সময় তন্তুবায় ও বণিক সম্প্রদায়ের বাস ছিল-বেশি। দুর্গাপূজার আগে ধুতি শাড়ি ও নানা বস্ত্র তৈরির ক্লান্তিকর পরিশ্রমের পর কালী ও কার্তিক পুজোয় মেতে উঠত শ্রমজীবী মানুষের দল। আজ আর সে পরিবেশ নেই। কিন্তু আনন্দের মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে 'মেলা'র আয়োজনে।

বৈষ্ণবীয় মেলা : বৈষ্ণবীয় মেলা ও উৎসবগুলির মধ্যে প্রধান হল বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের রথের মেলা, বাঁকুড়ার পঞ্চরাত্রির মেলা, ওন্দা গ্রামের দোল উৎসব ছাতনার চণ্ডীদাস মেলা ইত্যাদি।

আষাঢ় মাসের রথযাত্রা বাদ দিলে ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রভাবিত বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে শোনা যায় নামসংকীর্তনের সুরেলা ধ্বনি, 'জয় রাধেগোবিন্দ জয়....'। এ জেলার ১৯টি থানার অন্তর্গত যতগুলি গ্রাম আছে আমার মনে হয় সব গ্রামেই বসে নামগানের আসর। এই সব মেলাগুলিতে গ্রামবাসীদের আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী কোথাও ২৪ প্রহর, কোথাও পঞ্চরাত্রি, কোথাও নবরাত্রি, কোথাও রাস, কোথাও ঝুলন কোথাও দোল উৎসব ইত্যাদি হয়ে থাকে।

পঞ্চরাত্রি উপলক্ষে পল্লী অঞ্চলে যে মেলা বসে সেই মেলা পল্লীর দরিদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক জীবনে সাময়িকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে। বাঁকুড়া শহরের দোলতলায় এবং অন্যান্য পঞ্চরাত্রির মেলাগুলো অবশ্য বেশ জমকালো। বিগত দিনের ওই সব মেলায় নানান টুকটাক খেলনাসামগ্রী ছাড়াও খাঁটি সরষের তেলেভাজা, 'মনোমোহিনী চপ' পাওয়া যেত। বিক্রি হত বিরাট বিরাট আকৃতির পাঁপড়। সবই ছিল পয়সা জোড়া। মাত্র একটি তামার পয়সার বিনিময়ে পাওয়া যেত তালপাতার এক বিরাট ভেঁপু। তখনকার দিনে ১৬টি 'বালক' দল মিলে সেজেগুজে পথযাত্রা অভিনয় করত কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন বিষয়। মেলা থাকত চার-পাঁচদিন। বাঁকুড়ার দোলতলার পঞ্চরাত্রি মন্দির ও মেলায় নিষিদ্ধ পল্লীর পতিতাদের বহু দান আছে। কারণ পতিতাদের সম্পত্তির ভাগ তখন কেউ নিতে চাইত না পাপের ভয়ে। তাই মৃত্যুর আগে এরা মন্দিরের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিত কাঁসার বাসন, জমি, স্বর্ণালঙ্কার টাকা। এখনও এই জন্যই নিষিদ্ধ পল্লীর পতিতারা পুজোর একটা ভাগ পেয়ে থাকে। মেলা চলাকালীন পাঁচদিন ধরে চলে অন্নপূর্ণার পুজো। আবার বাঁকুড়ার সন্নিকটে ঘোষের গাঁ ও রাজগাঁয়েও বেশ ধূমধাম করে পঞ্চরাত্রির উৎসব ও মেলা বসে। বহতা নদীর মতোই বাঁকুড়ার পঞ্চরাত্রির মেলাগুলি হরিনামের বৈষ্ণব রসে সিক্ত হয়ে বাঁকুড়াবাসীকে পাঁচটা দিন আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আনন্দরসের কথা প্রসঙ্গে স্মরণে আসে 'রাস' কথাটি। যার উৎস রস থেকে। অর্থাৎ রসসিক্ত ব্যক্তিরাই রাসের লীলা বোঝেন। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে রাসোৎসব হলেও জগৎবিখ্যাত রাসোৎসব হল বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব। ঐতিহাসিকেরা বলেন, মল্লভূম এক সময় ছিল জঙ্গলভূম, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল, মল্লরাজারাও প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে শাক্ত কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের সংস্পর্শে এসে মল্লরাজ বীরহাম্বির বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে কঙ্করময় বিষ্ণুপুরের ভূমি ও বিষ্ণুপুরবাসীর মন বৈষ্ণবরসে সিক্ত করে তোলেন। তবে একথা সত্য যে শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাবের আগেও বিষ্ণুপুরের রাজসভায় ভাগবতের পাঠ হত। ব্যাসাচার্য পণ্ডিতের সঙ্গে ভাগবতের ব্যাখ্যা নিয়েই শ্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠা হয় মল্লভূমে, কিন্তু মহারাজ বীরহাম্বির ভাগবত শুনতেন তারও পূর্ব থেকে, শ্রীনিবাস আচার্যের রসাল ভাগবত ব্যাখ্যা তাঁর চোখে নতুন আলো ফেলেছিল। যে ভক্তিরসসিন্ধু ছিল পাষাণ ভূমিতে আবদ্ধ সে হঠাৎ মোহনা পেল শ্রীনিবাসের কণ্ঠে। সুতরাং শ্রীনিবাস যেন মহাপ্রভুর প্রেমগঙ্গার ভগীরথরূপে ধরা দিলেন, বিষ্ণুপুরে মহারাজ বীরহাম্বিরের ভক্তির কাছে। তিনি বলেছিলেন, 'মাত্র নয় বৎসর বয়সে ষাট হাজার গোপীর সঙ্গে বিহার করতে পারেন এমন যে প্রেমিক তিনিই কৃষ্ণ'। সেই

কৃষ্ণকে অবলম্বন করেই বিষ্ণুপুরের রাসলীলা। এ রাসলীলায় যে সব বিগ্রহের সমাবেশ হয় সেগুলির মধ্যে রসেরই প্রাধান্য। ১০৮টি বিগ্রহের সমাবেশ ঘটে এই উৎসবে। এই উৎসবে বৈষ্ণব সংস্কৃতির পক্ষপুটকে আশ্রয় করে বহু মানুষ বহু উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। তাই এই উৎসব ও মেলার প্রধান আকর্ষণ যেমন ফুলমালায় সুসজ্জিত কৃষ্ণভাবে ভাবিত ১০৮টি বিগ্রহের সমাবেশে, একই সঙ্গে প্রদীপমালায় আরতির নান্দনিক দৃশ্য, তেমনই অন্যতম আকর্ষণ Mass worship বা সমবেত পূজারতি। চোখে না দেখলে বোঝা যায় না তার কি শক্তি। মহাপ্রভুই এই Mass worship প্রবর্তন করে গেছেন। বিষ্ণুপুরের রাসোৎসবে তার প্রভাব এখনও অম্লান। এই উৎসবকে ঘিরে যেমন মেলা হয়ে ওঠে জমজমাট তেমনই, বর্তমানে বিষ্ণুপুর মেলা নামে সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রবর্তনী মেলাটিও শুধু শহর বিষ্ণুপুর নয় জেলা বাঁকুড়া ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকে এক গুরুত্বপূর্ণ মেলারূপে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

বাঁকুড়ার রথের মেলা : ঠাকুর দেবতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রথের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই প্রধান। এই রথযাত্রা আষাঢ় মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে হয়। বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্রাকে ঘিরে বৈষ্ণব প্রভাবিত এই অনুষ্ঠানে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষই এই উৎসবে যোগদান করে থাকে।

বাঁকুড়ার রথের একটা ইতিহাস আছে। বাঁকুড়ার ব্যাপারীহাটের একদল ব্যবসায়ী পুরীতে রথ দেখে এসে বাঁকুড়ায় রথের প্রচলন করেন। সেটা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন ঘটনা। তাঁদের সিদ্ধান্তানুযায়ী বাঁকুড়ার মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীগণ [illegible] সুরক্ষা ও উন্নতিকল্পে ক্রেতাদের কাছ থেকে [illegible] আদায় করেন। অনুরূপে সকলের কাছ থেকে চালের মুষ্টিভিক্ষা নিতে শুরু করলেন। এতে যে আয় হল তাতেই তাঁরা অভিভূত। অবশেষে ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮ আরম্ভ হল রথ নির্মাণ। অনুপম সৌন্দর্যভরা বাঁকুড়ার পিতলের বড় রথ। এ রথ আজও পর্যটকদের মুগ্ধ করে।

বাঁকুড়ার যে কোনও মেলায় ভিড় হয় অসম্ভব, কিন্তু বাঁকুড়ার রথের মেলা ও বিষ্ণুপুরের উল্টোরথের মেলায় ভিড় তাৎপর্যমণ্ডিত। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর গাজন মেলার পর এ দুটি রথের মেলার ভিড় দ্বিতীয় ভিড়। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে বোঝা যায় এ মেলায়

(১) মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অবতাররূপে জনগণের হৃদয়ে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।
(২) ধর্মের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির মানসিকরূপ তুলে ধরা হয়।
(৩) কৃষি-শস্য রোপণকালে চাষীদের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা যায়।
(৪) বর্ষায় মেঘের সমাগমে আষাঢ়ে রথের মেলা কৃষিজীবী মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটানোর ইঙ্গিত নিয়ে আসে।
(৫) 'মেলা' মানুষকে পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে।
(৬) এ মেলায় তীর্থযাত্রীর ভিড় হয় না, হয় জনসমুদ্র। লেনদেন ও বেচাকেনার হাটরূপে পরিগণিত হয়।
(৭) বাঁকুড়ার রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা শিথিল করে গৃহস্থের মহিলারাও এ মেলায় অংশ নেন। জাতিভেদ বৈষম্য দূর হয়।
(৮) ঐচ্ছিক চাহিদায় মেলায় সামাজিক বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।
(৯) গ্রামীণ লোকশিল্পীরা নিজ নিজ হাতে তৈরি জিনিসপত্র রথের মেলায় নিয়ে আসে বিক্রির জন্য। এতে তাদের আর্থনৈতিক ও মৌলিক চাহিদা মেটে।

(১০) [illegible]

নান্দনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণে দেখা যায়

(১) মেলায় সব থেকে বিশিষ্ট ব্যবসা (২) বিড়ি ও দোকান। এই দুটি লোকজীবনের বস্তুকে কেন্দ্র করে লোকেদের 'আড্ডা' গুলি মানুষের মনে আনন্দ দেবার প্রবণতা।

(৩) পৌরাণিক ও প্রচারধর্মী লোকসাহিত্যের প্রচলন ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরের উল্টোরথের মেলার প্রমাণ এ হিসেবে দেখা যায় খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা রঘুনাথ সিংহদেবের আমলেই এই রথের প্রচলন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রথটি পাথরের। রাধালালজী এবং মদনগোপালজী এই দুই বিগ্রহকে নিয়েই রথের অনুষ্ঠান। উল্টোরথের দিন সকালে বিগ্রহদ্বয়কে রথে চাপিয়ে রথের দড়ি টেনে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়—সন্ধ্যায় হয় শোভাযাত্রা। বসে রথের মেলা। হরিনাম সংকীর্তনে বিষ্ণুপুরের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

আমরা জানি শুভ রথযাত্রার দিনটি বাঙালি হিন্দুদের কাছে

'পুণ্যাহ'। তাই এ দিনটি যে কোনও শুভকর্ম সূচনাদিবসরূপে গণ্য। ব্যবসায়ী ও সামাজিক উভয় দিক দিয়ে শুভযুক্ত এবং মাস-তিথি-নক্ষত্রযোগে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে এই দিনটি বাঁকুড়াবাসীর কাছে উপযুক্ত আনন্দ ও মেলা দেখার দিন।

বারব্রত ও লৌকিকমেলা—বর্ণহিন্দু বাঙালি মেয়েরা বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত ১২টি মাস ঘিরে সংসার, সন্তান, গৃহ ও সমাজের মঙ্গল কামনায় নানান বারব্রত ও লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনা করে। মাটির ঘট, মাটির হাতি, ঘোড়া, মনসার চালি, লক্ষ্মীসরা, পাথরের মূর্তি, শিলাখণ্ড, মাটির মূর্তি, দেওয়াল চিত্র, তুলসীথান, ফাঁকাবেদী ইত্যাদিতে সারা বছর আমাদের বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন দিনে তিথিতে ও মাসে ধর্মীয় সংঘাত সমন্বয়ের চিত্রে সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে। বর্তমানে গুরুকেন্দ্রিক নানান অনুষ্ঠানও মেলার রূপ পাচ্ছে।

সৃজনমূলক মেলা—যে কোনও মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার উৎসে আছে সৃষ্টির ইতিকথা। তবুও কিছু আকর্ষণীয় ও আরোপিত মেলা এ জেলাকে করেছে সমৃদ্ধ। যেমন বইমেলা, বাউলমেলা, পুষ্পপ্রদর্শনী মেলা এবং শিশুমেলা।

বইমেলা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বদান্যতায়, বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারিকের পরিচালনা ও বাঁকুড়াবাসীর উৎসাহে প্রতি বছর শীতের আমেজে ডিসেম্বর মাসে বাঁকুড়ার রবীন্দ্রভবন ও স্টেডিয়ামের বৃহৎ প্রাঙ্গণে বসে বইমেলা। 'মেলা'র মুক্ত আনন্দের সঙ্গে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পুস্তক সংস্পর্শ ও দেশ-বিদেশের গ্রন্থ পরিচয় সংগ্রহ ও আগ্রহ এ জেলার মনস্তত্ত্ব ও জ্ঞানস্পৃহা বিনোদনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে জেলার মানুষের মনের খোরাক মেটাতে তৎপর। তাই এ জেলায় বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুরূপভাবে শিশুমেলা জনচিত্তে শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়ার আগ্রহ বাড়িয়েছে। পুষ্পমেলা বাড়িয়েছে মানুষের মনের নান্দনিক প্রসার।

বাউল মেলা—বাউল এক বিশেষ সম্প্রদায়। একদা সমাজ বাউলদের ভিখারি বা ফকির রূপে গণ্য করত। হিন্দু সমাজবিন্যাসে বলে, জাত হারালেই বাউল। এই বাউলরা জাতশিল্পী এবং মনের মানুষের খোঁজে উদাসী পথিক। যাযাবরী জীবনযাপনে সারা বছরই এরা ঠাঁই বদল করে এক আখড়া থেকে অন্য আখড়ায়। এক মেলা থেকে অন্য মেলায়। এরকমই এক মহৎ ও বৃহৎ মেলা হল মকর সংক্রান্তিতে জয়দেবের বাউল মেলা। অনুরূপ তাৎপর্যমণ্ডিত বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে শ্রীরামনবমীতে অনুষ্ঠিত মনোহর দাসের মহোৎসব উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বাউল মেলা এবং বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর ধামে ২৯ চৈত্র হয় সারারাত্রিব্যাপী বাউল মেলা। এক্তেশ্বর গাজন মেলার ঐতিহাসিক পটভূমিতে এসে মিশে গেছে একটি শাশ্বত আনন্দধারার সাঙ্গীতিক রূপ যার প্রবর্তক বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি। ১৩৯৬ সালের ২৯ চৈত্র এক্তেশ্বর ধামে শিবের গাজনে একটি মহৎ সঙ্গীত মেলার রূপ-ভাব-রস-ছন্দ উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে সমধিক পরিচিতি লাভ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এই বাউল মেলা। এ মেলা প্রবর্তিত ধর্মীয় মেলা। এমনিতেই বাঁকুড়াকে অভিহিত করা হয় Open air University of Folk Songs and Folk Festivals-এর জেলা বলে। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে ঐতিহ্যমণ্ডিত এক্তেশ্বর শিবের গাজন মেলার সঙ্গে বাউল মেলার সংযোজন বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি ঘটনা। ২৯ চৈত্র গাজনের পূর্ণ দিনে এই মেলায় হাজার হাজার মানুষের কোলাহলে জমজমাট হয়েও ছাপিয়ে যখন বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি আয়োজিত বাউল মেলার মুক্ত মঞ্চে গেরুয়া আলখাল্লা পরে হাতে একতারা বা গুপীযন্ত্র নিয়ে বাউল গান ধরে 'এসো এসো এসো বন্ধু সোনার বাঁকুড়ায়'.... কিংবা 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'...তখন সমবেত ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ যাবতীয় দ্বিধা-সংশয় ভুলে গিয়ে একে অপরের পাশে বসে পড়ে গানের সৌহার্দ্য বন্ধনে। বাউল আসর পূর্ণতা পায় বাউল মেলায়।

এছাড়া বিহারীনাথ পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঠিক পাহাড়ের পাদদেশে সুবিস্তৃত শাল, পলাশ, মহুয়ায় ঘেরা এক মনোরম পরিবেশের মাঝে বসে 'উড়েশ্বরী মেলা'। বাংলার আউল-বাউলের মেলার সঙ্গে উড়েশ্বরী মেলার বহু সাদৃশ্য আছে। এ মেলাতেও প্রেমরসকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে, বাউলের দল ছুটে আসে আর এদের সঙ্গে প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার আবেশে ভেসে যায় মহিশারতি গ্রামসহ আশপাশ গ্রামের অগণিত মানুষজন। মহিশারতি গ্রামটি সাঁওতাল অধ্যুষিত হলেও উড়েশ্বরী মেলা যেন আপামর জনসাধারণের মেলা। এ মেলার হৃদয় থেকে তাই ঝংকৃত হয় বাঁকুড়া জেলার ছাতনার কবি চণ্ডীদাসের মরমী বাণী

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

আবার এ জেলার ভূতশহরে মেলা বসে সংকটতারিণীর। পুজো মূলত রাঠোর বংশের হলেও বর্তমানে তা গ্রামদেবী রূপে পূজিতা। মেলা ১ দিনের। এ মেলার বৈশিষ্ট্য টানামিঠাইয়ের পাহাড় দিয়ে পুজো দেওয়া ও মানত হিসেবে তিনচূড়া, পাঁচচূড়া, সাতচূড়া বিশিষ্ট মিষ্টির পাহাড় উৎসর্গ করা। জেলার মধ্যে বিষ্ণুপুর ও ভূতশহরেই এ পূজা ও মেলা বসে। জনশ্রুতি আছে দেবীকে টানামিঠাই বা বোঁদের পাহাড় দেওয়ার কারণ পাহাড়-পর্বতের মতো বড় বড় সংকট থেকে জেলাবাসীকে ত্রাণ করা—দেবী তাই সংকটতারিণী। শুশুনিয়ার বারুণী মেলাও অনুরূপ এক গ্রাম্য মেলা।

ইসলামধর্মযুক্ত পরব ও মেলা—আদিবাসী বর্ণহিন্দু ও তফসিলিদের মেলা ও পরবগুলিই যে বাঁকুড়া জেলাকে পরিপুষ্ট করেছে তা নয়। এ জেলাতে ইসলাম ধর্মেরও কিছু পরব ও মেলা রয়েছে। ষোল শতকের শেষভাগে বর্ধমান জেলার সীমান্তঘেঁষা ইন্দাস ও কোতুলপুর থানায় ইসলাম ধর্মের প্রচার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ায় ধর্মান্তরিত মুসলমান জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪৩,০০০-এর বেশি। বাঁকুড়া জেলায় এই দুটি থানা ছাড়া অন্য কোথাও মুসলমান জনবসতি এত ঘনসংবদ্ধ নয়। জেলায় যে সব পীর ও গাজীর দরগা আছে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সেখানে মানত করেন। সিন্নি দেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে ইন্দাস থানায় ৮টি বড় দরগা রয়েছে। কোতুলপুর থানার পাথরচটি গঙ্গাজলঘাটি থানার পীর পুষ্করিণী ফকির বেড়াতেও লসকর সাহেবের দরগা আছে। এই দরগায় ও মসজিদে মহরম, ঈদ, ইদ্দুজোহা ইত্যাদি উপলক্ষে উৎসব হয় মেলাও বসে। মুসলমান পীর ও ফকিরদের কাছে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই। বিষ্ণুপুরের কোরবান তলায় উভয় সম্প্রদায় যায় পুজো দিতে, সিন্নি দিতে এবং দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করার মানত করতে।

বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ মেলা এবং পার্বণ অরণ্য ও কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উপর গঠিত। ধর্মীয় আবেগে পরিস্নাত। কোনও কোনও মেলায় রাজকীয় সংস্রব থাকলেও সাধারণ মানুষের

মেলার পথে গরুর গাড়ি, বাঁকুড়ার পথের দুধারে বনা ঝোপজঙ্গল

প্রভাবই বেশি। মেলাগুলিতে পূর্বানুযায়ী ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা চললেও সম্প্রতি ২৪ প্রহর গুরুনাম সংকীর্তন ইত্যাদি উপলক্ষে মেলার ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপও দেখা যাচ্ছে। আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে গ্রামবাংলায় আমোদ-প্রমোদের নানা উপকরণের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু মানুষ শুধু আমোদের জন্য বৈচিত্র্যের জন্য নয়, আন্তরিক মেলবন্ধনের প্রত্যাশায় নিজের আনন্দকে অপরের মধ্যে বিলিয়ে দেবার প্রেরণায় নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে পার্বণে মেতে ওঠে, মেলাগুলিকে সমন্বয়ের পীঠস্থানরূপে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। গ্রাম বাঁকুড়ার গাজন মেলার মধ্যেই গণ-দেবতাকে বোঝা যায়, নরনারায়ণের সেবার মধ্য দিয়েই গ্রামীণ মানুষের জীবনের গতিশীলতা বজায় থাকে। অবাধ আনন্দে গড়ে ওঠে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং জীবনের নানা ছন্দ, নানা অভিব্যক্তি। বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গনে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন পার্বণ ও মেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারায় চিহ্নিত এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ক্ষেত্র সমীক্ষা, পরিসংখ্যান ও জনশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে এ জেলায় প্রায় ২৬০টি মেলার পরিচর্যালিপি দেওয়া সম্ভব নয় বলেই তার উল্লেখ মাত্র করলাম মাসগত ধারাবাহিকতায়। তবে মনে রাখা দরকার জেলার প্রতিটি মেলাই প্রকাশ করেছে জেলার মানুষ ও সমাজকে—এখানেই বাঁকুড়ার পার্বণ ও মেলার সার্থকতা।

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা District Census Hand book 1951 : 1961, রামানুজ কর সম্পাদিত বাঁকুড়া জেলা বিবরণ, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমির ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং লেখিকার নিজস্ব সংগ্রহে প্রাপ্ত বাঁকুড়া জেলার পার্বণ ও মেলার তালিকা—

মাসানুক্রমিক বাঁকুড়া জেলার মেলাসমূহের মোট হিসাব

বৈশাখ —	১১৬	কার্তিক —	৩০	
জ্যৈষ্ঠ —	৪০	অগ্রহায়ণ —	২	
আষাঢ় —	১৭	পৌষ —	২৩	মোট মেলার সংখ্যা
শ্রাবণ —	১৫	মাঘ —	৪৮	
ভাদ্র —	৩	ফাল্গুন —	২৬	
আশ্বিন —	২৬	চৈত্র —	৫৮	
	২১৭	+	১৮৭	৪০৪টি

বাঁকুড়া জেলায় জনসমাবেশভিত্তিক মেলার পরিচয়

মেলার উপস্থিত জনসংখ্যা	১,০০০	১০০১-৫,০০০	৫০০১-১০,০০০	১০,০০১-২৫,০০০	২৫,০০১-৫০,০০০	৫০,০০১-তদূর্ধ্বে	অনির্দিষ্ট সমাবেশ	মোট সংখ্যা
মেলার সংখ্যা	১৭৫	১৩৫	২৬	২১	8	৫	৩৮	808

জেলা বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত বারো মাসের পরব-গাজন-মেলার তালিকা

বৈশাখ

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১.	কুশতড়া	কুশতড়া আবাল গাজনমেলা	২২ বৈশাখ
২.	দশের বাঁধ	দশের বাঁধের গাজন মেলা	১৯ "
৩.	গোপীনাথপুর	পঞ্চরাত্রির মেলা	বৈশাখ সংক্রান্তি
৪.	মেট্যাকলা	মেট্যাকলা স্বরূপ নারায়ণ	চৈত্র-বৈশাখী পূর্ণিমা
৫.	রাঙ্গামেট্যা	শিবঠাকুরের গাজন মেলা	৯ বৈশাখ
৬.	কামারকুলি	" " "	বৈশাখ ২ দিন
৭.	রাজবাড়ি	" " "	"
৮.	ঝাঁটিপাহাড়ি	আদিবাসী পরব	"
৯.	কাপিষ্ঠা	সুন্দর রায়ের গাজন	বৈশাখ-অক্ষয় তৃতীয়ার পর ৪ দিন
১০.	বৃন্দাবনপুর	রায়ের গাজন	বৈশাখ-শ্রাবণের যে কোনও পূর্ণিমা
১১.	বাগান	গাজন মেলা	বৈশাখী পূর্ণিমা
১২.	ভাগড়া	শিবঠাকুরের গাজন মেলা	২৪ বৈশাখ
১৩.	রাওতড়া	" " "	বৈশাখে
১৪.	হরিহরপুর	" " "	১ বৈশাখ
১৫.	শিমলি	" " "	বৈশাখে
১৬.	সিন্দুরপুর	গাজন	বৈশাখে
১৭.	দুবরাজপুর	"	৩১ বৈশাখ
১৮.	মাচাতড়া	মাচাতড়া মেলা	২০ বৈশাখ
১৯.	সোনামুখি	সিদ্ধেশ্বরের গাজন	চৈত্র-বৈশাখ
২০.	আর্যবেচণ্ডী	শিবঠাকুরের গাজন	৩০ "
২১.	ইন্দপুর	গাজন	২০ "
২২.	হাটগ্রাম	"	৩০ "
২৩.	কেশ্যা	"	২ "
২৪.	গড়িগ্রাম	"	১২ "
২৫.	বাউরিশেলি	"	১৫ "
২৬.	নিয়াশ্যা	শিবঠাকুরের গাজন	বৈশাখে ২ দিন
২৭.	শালুকা	" "	" "
২৮.	ইন্দাস	চক্ররাস মেলা	" "
২৯.	"	শিবঠাকুরের গাজন মেলা	" ১ দিন
৩০.	বৈতল (জয়পুর)	" গাজন	" ২ দিন
৩১.	শাসপুর	"	" ৩ দিন
৩২.	ভোলা ওন্দা	"	" ২ দিন
৩৩.	এক্তেশ্বর	"	" ২ দিন
৩৪.	কেঞ্জাকুড়া	"	" ১ দিন
৩৫.	ময়নাপুর	"	বৈশাখ অক্ষয় ৩য়া
৩৬.	ছাতনা (কামারকুলি)	"	বৈশাখ সংক্রান্তি ২ দিন
৩৭.	সোনারেখ	শিবের মেলা	বৈশাখ ১ দিন

জ্যৈষ্ঠ মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১.	মোলবনা	নীলাম্বরের গাজন	২৫ জ্যৈষ্ঠ
২.	সানবাঁধা	আবাল গাজন	২ জ্যৈষ্ঠ
৩.	ঝাঁটিপাহাড়ি	গাজন	জ্যৈষ্ঠ ১ দিন
৪.	বেলিয়াতোড়	ধর্মরাজের গাজন	জ্যৈষ্ঠ ২ দিন
৫.	অযোধ্যা	মনসার গাজন	জ্যৈষ্ঠ দশহরা ২ দিন
৬.	মেজিয়া	ধর্মরাজের গাজন	" ৫ দিন
৭.	রাধানগর	গাজন	" "
৮.	বাঁকুড়া দোলতলা	পঞ্চরাত্রির মেলা	২২ জ্যৈষ্ঠ
৯.	"	রানীর গাজন	১০ "
১০.	সোনারেখ	শিবের মেলা	১০ "
১১.	শীতলা	"	জ্যৈষ্ঠ
১২.	মহিশাবাড়ী	উড়েশ্বরী মেলা	" ৩-৫ দিন
১৩.	বাঁকুড়া শহর	পঞ্চরাত্রি	২২ জ্যৈষ্ঠ
১৪.	গোপালগঞ্জ	আবাল গাজন	জ্যৈষ্ঠ
১৫.	পাত্রসায়ের	কালীঞ্জয় মেলা	জ্যৈষ্ঠ ৩ দিন
১৬.	অযোধ্যা	দশহরা	জ্যৈষ্ঠ / আষাঢ়
১৭.	বগা	গাজন	১ জ্যৈষ্ঠ
১৮.	কেল্যাড়া	"	"
১৯.	আচত্রী	দেবীপূজা	"
২০.	সোনামুখি	গঙ্গাপূজা উৎসব	জ্যৈষ্ঠ
২১.	ছাতনা	রানীর গাজন	১০ জ্যৈষ্ঠ ১½ দিন
২২.	ঝাঁটিপাহাড়	শ্রীনাথ গাজন, বা ছচুক গাজন	২৬ জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ় মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১.	বিষ্ণুপুর	রথযাত্রা	আষাঢ়
২.	বাঁকুড়া শহর	উল্টোরথ	"
৩.	সোনামুখি	"	"
৪.	নড়রা	"	"
৫.	মেজিয়া	রথের মেলা	"
৬.	বেলিয়াতোড়	ধর্মরাজের গাজন	আষাঢ় / শ্রাবণ
৭.	মুড়াকাটা	রথের মেলা	"
৮.	তপোবন	"	"
৯.	বেলিয়াতোড়	ধর্মরাজের গাজনের সূত্রপাত	আষাঢ় পূর্ণিমা
১০.	ছাতনা	রথের মেলা	"

শ্রাবণ মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১.	রামসাগর	মনসা পরব মেলা	শ্রাবণ
২.	কুচুল	মনসা মেলা	শ্রাবণ-ভাদ্র
৩.	মটগদা	ছাতা পরব	শ্রাবণ
৪.	রুদ্র	"	"

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
৫.	বিষ্ণুপুর	ঝাঁপান মেলা শ্রাবণী মেলা	শ্রাবণ সংক্রান্তি
৬.	বাঁকুড়া রামপুর	,,	,,
৭.	বেলিয়াড়া	চাঁদ রায় উৎসব	,,
৮.	বেলুট	,,	,,
৯.	বেলিয়াতোড়	ঝাঁপান	শ্রাবণ মাস
১০.	মানকানালি	,,	,,
১১.	লাউদা	,,	,,
১২.	সোনামুখি	ঝুলন উৎসব	শ্রাবণ
১৩.	এক্তেশ্বর	শিবের মাথায় জলঢালার উৎসব	শ্রাবণ

ভাদ্র মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১.	খাতড়া	ইন্দ্রোৎসব	ভাদ্র ৫ দিন
২.	বিষ্ণুপুর	,, পরব	ইন্দ্রদ্বাদশী ভাদ্র
৩.	ইন্দকুড়ি	,, ,,	,,
৪.	বেলিবান্দা	,, ,,	,,
৫.	বাঁকুড়া জেলার	প্রায় প্রতি গ্রামে ভাদু পরব	সমগ্র ভাদ্র মাস
৬.	জগদল্লা	কালীয়দমন উৎসব	ভাদ্র মাস, কৃষ্ণপক্ষ একাদশী
৭.	পুরন্দরপুর	,,	,,
৮.	বেলিয়াতোড়	,,	,,
৯.	ময়নাপুর	যাত্রাসিদ্ধি পূজা সয়লা উৎসব	ভাদ্র মাস

আশ্বিন মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১.	কেঞ্জাকুড়া	দুর্গাপূজা	৯ দিন
২.	তপোবন	হনুমানজী মেলা	আশ্বিন মাস
৩	রসপাল	দুর্গাপূজা	কার্তিক মাস
৪.	ভুলুই	দুর্গাপক্ষ রাত্রি	আশ্বিন
৫.	পড়াশ্বা	পড়াশ্বা ভানসিং পার মেলা	,, ১ দিন
৬.	রাজাকাটা	,, ,,	,,
৭.	বিষ্ণুপুর	মল্লরাজাদের দুর্গোৎসব	আশ্বিন কার্তিক
৮.	চাতরা	রাবণকাটা রথ	আশ্বিন ২ দিন
৯.	বিষ্ণুপুর	বাঁদর নাচের উৎসব	,, ১ দিন
১০	সোনামুখি	দুর্গোৎসব	,, ১ দিন
১১.	,,	হরনাথ জন্মোৎসব মেলা	,, ৪ দিন
১২.	সিমলাপাল	দুর্গাপূজা উৎসব	বিজয়া দশমী
১৩.	ছাতনা	সামন্ত রাজাদের দুর্গোৎসব	,, ৫ দিন

কার্তিক মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১.	অযোধ্যা	রাসযাত্রা	কার্তিক পূর্ণিমা
২.	সোনামুখি	কালী কার্তিক	কার্তিক
৩.	কোতুলপুর	রাসোৎসব	,,
৪.	ভূত শহর	কালীপূজা মেলা	,,
৫.	বৃধখিলা	রাসোৎসব	তিথি অনুসারে
৬.	অম্বিকা নগর	দুর্গা নবমী পূজা	আশ্বিন/কার্তিক
৭.	রুদ্র	বাঁধনা পরব	কার্তিক
৮.	মটগদা	,,	,,
৯.	রসপাল	দুর্গাপূজা	আশ্বিন/কার্তিক
১০	জামতড়া	রাস	কার্তিক তিন দিন
১১	গোড়াশোল	রাসযাত্রা	,,
১২	বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন আদিবাসী গ্রাম	সহরায় উৎসব	কার্তিক অমাবস্যা থেকে পৌষসংক্রান্তি পর্যন্ত যে কোনও সময় হয়।

অগ্রহায়ণ মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১	সমগ্র জেলায়	নবান্ন উৎসব	অগ্রহায়ণ
২	সাঁওতাল গ্রামে	আগাম উৎসব	,,

পৌষ মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১	এক্তেশ্বর	মকরসংক্রান্তির মেলা	পৌষসংক্রান্তি
২	[illegible]	সর্বমঙ্গলার পূজা উৎসব	পৌষ ২ দিন
৩	হরিপুর	ধর্মরাজের উৎসব	,, ৬ দিন
৪	[illegible]	[illegible] মেলা	পৌষসংক্রান্তি ৪ দিন
৫	[illegible]	[illegible] মেলা	,, তিন দিন
৬	[illegible]	[illegible] মেলা	,, ১ মাঘ
৭	[illegible]	নাগরদোলা পরব	পৌষ পার্বণ
৮	[illegible]	,, ,,	,,
৯	[illegible]	,, ,,	,,
১০	[illegible]	সন্ন্যাসী মেলা	পৌষসংক্রান্তি ২ মাঘ
১১	[illegible]	মকরমেলা	
১২	[illegible]	মকর পরব সংক্রান্তি (হিন্দু মুসলমান)	হিন্দুদের ১ দিন ১ মাঘ মুসলমানদের
১৩	[illegible]	মকরমেলা	পৌষসংক্রান্তি
১৪	বিষ্ণুপুর	,,	,,
১৫	সোনামুখি	[illegible] দাসের মেলা	,,
১৬	[illegible]	মকর সংক্রান্তি	তিন দিন
১৭	[illegible]	নাগরদোলা	,,
১৮	বেলবনি	,,	,,
১৯	উদয়পুর	,,	,,

মাঘ মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১	বিষ্ণুপুর	শিকার উৎসব	১ মাঘ
২	মটগোদা	ধর্মরাজের পূজা উৎসব	মাঘ ৭ দিন
৩	চকসাপুর	পীরের মেলা	,, ৫ দিন
৪	ভূতশহর	সংকটতারিণীর মেলা	সরস্বতী পুজোর পর
৫	মাকাগ্রাম	বেহ্ণাবেঁধা উৎসব	১ মাঘ
৬	তেলিবেড়িয়া	সর্বমঙ্গলা ,,	,,
৭	জয়রামবাটি	শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জন্মতিথি উৎসব	মাঘ
৮	জামভুড়ি	কালীগঙ্গা উৎসব	,,
৯	চিচাগড়ো	এখান মেলা	,,
১০	আমলাসোতা	নাগরদোলা মেলা	৬ মাঘ
১১	তালডাংরা	,, ,,	১ মাঘ

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১২.	জামজুড়ি	শঙ্কর মেলা	২ মাঘ
১৩.	সাংরো	নাগরদোলা	১ মাঘ
১৪.	পাকুড়ডিহা	,,	৩ মাঘ
১৫.	শেওড়াকন্দ	রাস মেলা	,,
১৬.	কোলগুলি	নাগরদোলা	মাঘ
১৭.	খিচকা	নাগরদোলা	মাঘ
১৮.	লালবান্দা	মহাশক্তি মেলা	৪ মাঘ
১৯.	মটগদা	শনিমেলা	মাঘের শেষ শনিবার
২০.	খাতড়া	বাসী গাজন পরব	মাঘ সরস্বতী পূজা
২১.	রাওতড়া	ভানসিং পাঠ	মাঘ ১ দিন
২২.	খেজুরিয়া	,, ,,	,,
২৩.	মালছড়ার	,, ,,	,,
২৪.	ভুড়ভুড়া	বামনীসিনি মেলা	১ মাঘ
২৫.	বুধখিলা	রাসোৎসব	মাঘ তিথি অনুসারে
২৬.	,,	বাঁধনা পরব	মাঘ ৩ দিন
২৭.	তালগড়া	রাসোৎসব	৩ মাঘ
২৮.	বনশোল	বনশোল ধর্মঠাকুরের সনা পরব	মাঘ মাসের শেষ শনিবার
২৯.	চিলাগড়া	বেজ বেঁধা পরব	২ মাঘ
৩০.	সিংরাইডিহি	কাঁড়াকাটা মেলা	৩ মাঘ
৩১.	বালানপাহাড়	শুকলা মেলা	মাঘ
৩২.	সিমলাপাল	জামিরদল মেলা	১ মাঘ
৩৩.	,,	নেকরাসিদ্ধি	,,
৩৪.	বড়বান্দা	এখান পরব	১ মাঘ
৩৫.	গৌরবাজার	,,	,,
৩৬.	আমডাঙ্গা	কৃষ্ণ কেন্দুলী	মাঘ
৩৭.		দেবনগর	,, ,,
৩৮.	এক্তেশ্বর	মেয়েদের মাকরী ব্রত উৎসব	মাঘ-ফাল্গুন মাসে মাকরী ৭মী তিথি
৩৯.	আড়ি	নাগরদোলা মেলা	৪ মাঘ
৪০.	জেমো	,,	৫ মাঘ

ফাল্গুন মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১.	এক্তেশ্বর	শিবরাত্রি মেলা	ফাল্গুন ২ দিন
২.	বহুলাড়া	দোলযাত্রা	,, ৫ দিন
৩.	দুবরাজপুর	,,	,, ,,
৪.	গোকুলনগর	,,	,, ,,
৫.	বাঁকুড়া	রাসমেলা	,, ,,
৬.	পুরন্দরপুর	রাসোৎসব	,, ,,
৭.	মানকানালি	,,	,, ,,
৮.	ছাতারকানালি	,,	,, ,,
৯.	কুমিদ্যা	,,	,, ,,
১০.	জগদল্লা	রাসোৎসব	ফাল্গুন ৫ দিন
১১.	ঝাঁটিপাহাড়ী	চণ্ডীদাসের মেলা	মধুকৃষ্ণাবাসন্তী নবমী
১২.	ওন্দা	দোল উৎসব	দোল পূর্ণিমা ৯ দিন
১৩.	সোনামুখি	দোল উৎসব	দোল পূর্ণিমা ৯ দিন
১৪.	মটগদা	বাহা পরব	ফাল্গুন
১৫.	রানীবাঁধ	,,	,,
১৬.	অম্বিকানগর	মনসা পরব	,,
১৭.	রাজকাটা	,,	,,
১৮.	অম্বিকানগর	দোল পরব	দোলপূর্ণিমা
১৯.	ব্রজরাজপুর	দোল উৎসব	ফাল্গুন
২০.	ইন্দাস	,,	,, ২ দিন
২১.	,,	বাঁকুড়া রায়	বৃদ্ধ পূর্ণিমা
২২.	জয়রামবাটি	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি পালন	১০ ফাল্গুন
২৩.	জয়রামবাটি	শিবরাত্রি ব্রত পালন	ফাল্গুন
২৪.	শুশুনিয়া	শুশুন্যার মেলা	,,
২৫.	ছাতনা	বাশুলী গাজন চণ্ডীদাসের মেলা	মকর সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পরে ফাল্গুন

চৈত্র মাস

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
১.	সোনামুখি	মনোহর দাসের মাহেশের মেলা	শ্রীরাম নবমী চৈত্র বৈশাখ
২.	ছান্দার	চড়ক মেলা	চৈত্র ১ দিন
৩.	হীরাপুর	গাজন	,,
৪.	শালখাড়া (পাত্রসায়র)	মাতঙ্গী পূজা মেলা	,, ২ দিন
৫.	ভাগৎপুর	ভগবতীপূজা পরব	,, ১ দিন
৬.	হরিহরপুর	শিবঠাকুরের গাজন	,, ৪ দিন
৭.	সাসপুর	শিবঠাকুরের গাজন	,,
৮.	বাসলী	দেবীপূজা মেলা	,, ৩ দিন
৯.	চণ্ডীপাথর	বারুণি মেলা	চৈত্রমাস
১০.	জিহার	,,	,, ৩ দিন
১১.	কাঁটাবনী	গাজন মেলা	৩০ চৈত্র
১২.	আড়ালডিহি	,,	১ চৈত্র
১৩.	পুয়াড়া	,,	৩০ চৈত্র
১৪.	ভড়া	শিবের গাজন মেলা	চৈত্রমাস
১৫.	সীতারামপুর	তুর্কি মেলা	চৈত্র-বৈশাখ রামনবমী
১৬.	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুরের গাজন	চৈত্র-সংক্রান্তি
১৭.	দারাপুর	চড়ক মেলা	,,
১৮.	শিহর	,,	,,
১৯.	উত্তরগড়	চড়ক মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি
২০.	দক্ষিণ গড়	,,	,,
২১.	গারোরা	গারোরা মেলা	৩০ চৈত্র
২২.	এক্তেশ্বর	এক্তেশ্বর শিবের গাজন	২৯ চৈত্র
২৩.	মৌলবনা	মৌলবনা মৌলেশ্বরের গাজন	চৈত্র সংক্রান্তি
২৪.	উর্য্যামা	শিবঠাকুরের গাজন	,,
২৫.	পিউরাবনি	,,	,,
২৬.	শুশুনিয়া	বারুণি মেলা	চৈত্রমাসের ৩ দিন
২৭.	ডিহর	,,	,, ৪ দিন

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
২৮.	মনতুমড়া	শিবঠাকুরের গাজনমেলা	চৈত্র সংক্রান্তি ও তার পূর্ব দিন
২৯.	মেট্যালা	,,	চৈত্র মাস
৩০.	জামবেদা	,,	,,
৩১.	গঙ্গাজলঘাটি	,,	চৈত্র সংক্রান্তি
৩২.	কেশিয়াড়া	,,	,,
৩৩.	নবগ্রাম	,,	,,
৩৪.	শালতোড়া	বিহারীনাথের গাজন	,,
৩৫.	টেঁকিয়া	শিবঠাকুরের গাজন	,,
৩৬.	কানুড়িয়া	,,	,,
৩৭.	বড়কসা	,,	,,
৩৮.	শালুনি	,,	,,
৩৯.	জগন্নাথপুর	,,	চৈত্রমাসের ৩ দিন
৪০.	ছাঁদার	,,	চৈত্র মাস
৪১.	পাঁচাল	,,	,,
৪২.	আশুড়িয়া	আশুড়িয়া গাজন পরব	চৈত্রমাসের ৫ দিন
৪৩.	ঘুটগড়িয়া	শিবের গাজন	চৈত্র মাস
৪৪.	হরিহরপুর	হরিহরনাথ ঠাকুরের মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি
৪৫.	ওন্দা	শিবঠাকুরের গাজন মেলা	,,
৪৬.	বহুলাড়া	বহুলাড়ার গাজন মেলা	,,
৪৭.	বড়শুল	বড়শুলের গাজন মেলা	২ চৈত্র
৪৮.	তালঝিটকা	রাসোৎসব	,,
৪৯.	ইন্দাজা	শিবঠাকুরের গাজন পরব	চৈত্র মাস
৫০.	বাঁকুলিয়া	,,	,,
৫১.	কেন্দুয়া	,,	,,
৫২.	কাঁটাকুমারী	,,	,,
৫৩.	রুদ্র	,,	,,
৫৪.	তুলচাড়র	,,	,,
৫৫.	সোনামুখি	বাসন্তী পূজা উৎসব	চৈত্র মাস
৫৬.	রানীবাঁধ	শিবঠাকুরের গাজন মেলা	,,
৫৭.	আকরো	আকরো মেলা	৩০ চৈত্র
৫৮.	ময়নাপুর	হাকন্দ মেলা	চৈত্র মাস ৫ দিন

সাহায্যকারী গ্রন্থসূচি

১। মল্লভূম বিষ্ণুপুর—শিবদাস ভট্টাচার্য
২। বাঁকুড়া জেলা বিবরণ—রামানুজ সম্পাদিত
৩। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—৪র্থ খণ্ড ১৯৭৪
৪। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড—বিনয় ঘোষ, ১৯৭৬
৫। হিন্দুদের দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—৩ খণ্ড হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
৬। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য
৭। District Census Hand Book-1951, 1961
৮। বাঁকুড়ার মেলা গাজন পরব সংখ্যা ১৩৯৯ সংখ্যা—বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি
৯। লোক উৎসবে বাঁকুড়া ১৩৯৩—বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি
১০। বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমির গ্রন্থাগার ও বিশেষ বিশেষ সংখ্যা
১১। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার

লেখক পরিচিতি : শিক্ষিকা, সোনামুখি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক।
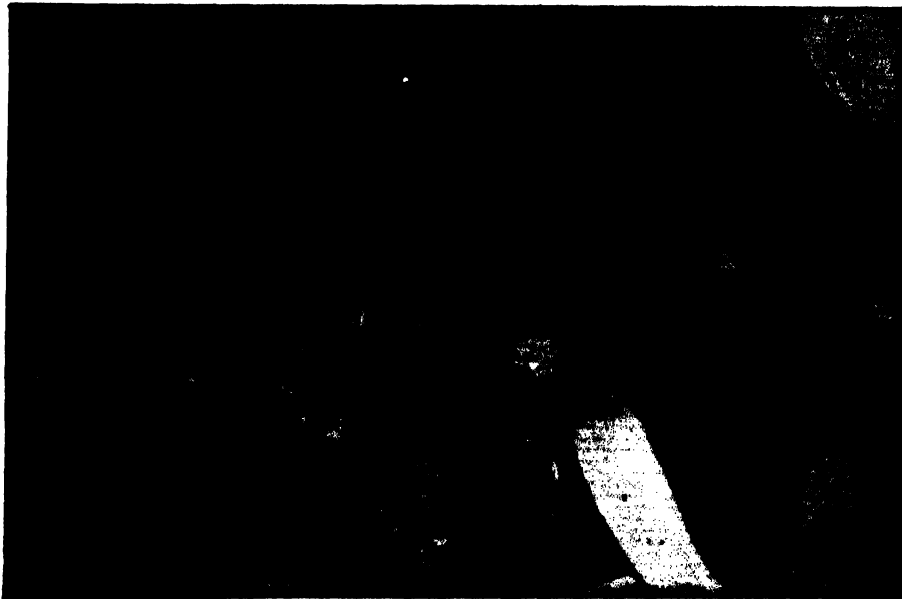
বাঁকুড়া জেলার মটগোদা গ্রামের বিখ্যাত শনিপূজা
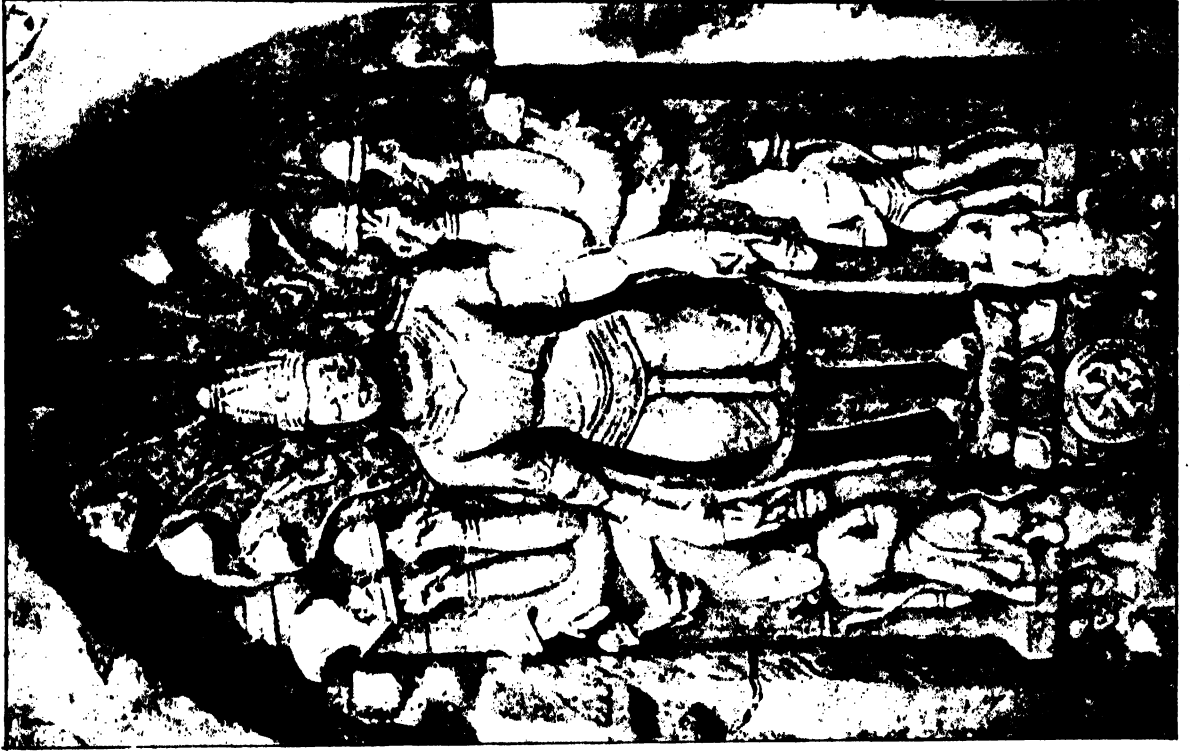
পাথরের দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি, বিহারীনাথ ('বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' থেকে গৃহীত)
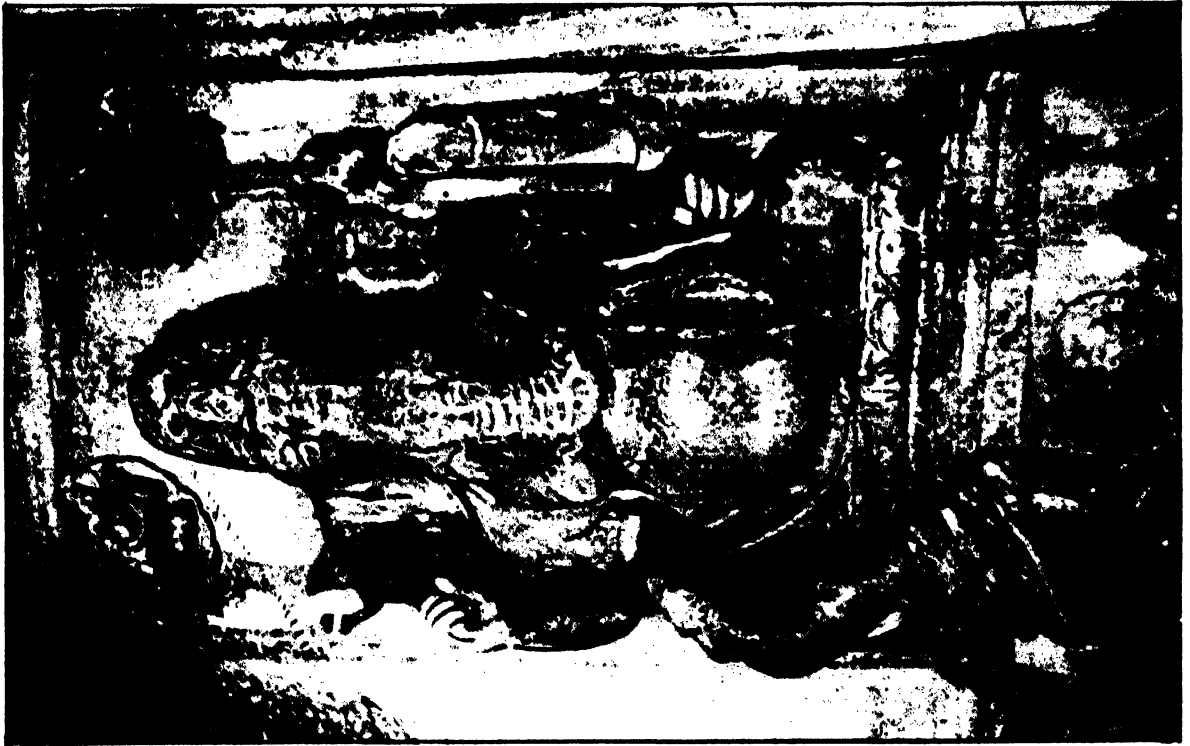
এক্তেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে রক্ষিত পাথরের বিশাল গণেশমূর্তি

বাঁকুড়া জেলার শিষ্ট ও লোকভাষা

সোমা পাল

প্রাচীন ভাষাতত্ত্ববিদগণ ১৮১২ সাল থেকেই ভাষাতাত্ত্বিক সত্য আবিষ্কারের জন্য দ্বারস্থ হয়েছিলেন লোকসাহিত্যের। লোকসংস্কৃতিচর্চা করতে গিয়ে সেই আঞ্চলিক উপভাষারই সাহায্য গ্রহণ করেছেন তাঁরা। কাজেই সেদিক থেকে বিচার করলে লোকজীবনের গভীরে প্রবেশের সঠিক পন্থা হল আঞ্চলিক উপভাষা।

বাসভূমিভেদে ভাষা পরিবর্তনশীল। একই জেলা তথা মহকুমায় অবস্থিত গ্রাম এবং শহর এলাকায় ব্যবহৃত ভাষায় ও ভাষার অন্তর্গত শব্দ-পদ-প্রত্যয় বিভক্তিতেও প্রভেদ দেখা যায়। ভাষার গঠনশৈলী, উচ্চারণগত বৈসাদৃশ্যও অনেক সময় যথেষ্ট লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড তাঁর 'Language' গ্রন্থে ভাষাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। (১) Literary Standard (মান্য সাহিত্যিক ভাষা), (২) Colloquial Standard (চলতি ভাষা), (৩) Sub-Standard (গ্রাম্য ভাষা), (৪) Provincial Standard (প্রাদেশিক ভাষা), (৫) Local dialect (আঞ্চলিক ভাষা)। পৃথিবীর সব দেশের গ্রাম্য ভাষাই সেই দেশের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। মান্য সাহিত্যিক ভাষাই শুধুমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে ও কিছু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমন কি চলতি ভাষাতেও বহু গ্রাম্য শব্দ, আঞ্চলিক কথা ও লোকভাষা মিশে যেতে পারে। আনন্দে, দুঃখে, রাগে, অনুরাগে যে সব কথ্যভাষা, প্রবাদ, প্রবচন, হেঁয়ালি ইত্যাদির ব্যবহার হয় তার আবেদন অনস্বীকার্য। এর শব্দবিন্যাস, উচ্চারণ বিশেষত্ব এইসব কথ্যভাষা, প্রবাদ, প্রবচন ও আঞ্চলিক ভাষাকে একটা বিশিষ্ট মাত্রা দান করেছে।

মূল ভাষা থেকে স্বতন্ত্র উচ্চারণভঙ্গি, স্বতন্ত্র কিছু শব্দ, প্রত্যয়, বিভক্তির বৈশিষ্ট্য নিয়েই উপভাষার সৃষ্টি। তালিকার সাহায্যে বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষা ও সেই উপভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং সেখান থেকে স্পষ্ট হবে বাঁকুড়া জেলার ভাষার অবস্থান ও তার বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং এখান থেকে স্পষ্ট পশ্চিম রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম উপভাষা বাঁকুড়ার আঞ্চলিক উপভাষা। এ ছাড়াও ঝাড়খণ্ডী উপভাষার সঙ্গেও সাদৃশ্য রয়েছে বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের। বাঁকুড়ার জনসংস্কৃতির ইতিহাস লোকধর্মের ইতিহাস, মানবতার ইতিহাস। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে যাত্রা, কথকতা, কবিগান, বাউল-ফকিরের একতারা, সাধক কবিকণ্ঠের তত্ত্বমূলক গান, নিরক্ষর কৃষকের মুখের ভাষা, অরণ্য রমণীর আনন্দিত মনের বাচনিক প্রকাশ। এই অঞ্চলের নারীদের বারব্রত, আচার-অনুষ্ঠান প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের অজানা রহস্যের ভাণ্ডার।

বাঁকুড়া জেলার ভাষা-বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে বাঁকুড়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও গোষ্ঠীগত মানুষের কথা বলাও প্রয়োজন। এখানকার পূর্ব প্রত্যন্তের বিষ্ণুপুর এলাকার প্রায় সমতল জমি, অপেক্ষাকৃত সরস আবহাওয়া থেকে ক্রমশ বাঁকুড়ার মধ্যভাগ পশ্চিম প্রান্ত হয়ে পুরুলিয়া জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের শুষ্ক, খরাপ্রবণ ; উঁচু ডুংরি ও খালবিলজনিত ভৌগোলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। ফলে পশ্চিমবাহী 'হ'-কার প্রাধান্য ও অনুনাসিক প্রবণতা এসেছে। এ ছাড়াও মানুষের ভাবজীবনের অভিব্যক্তিতে শুশুনিয়া, পঞ্চকূট, পরেশনাথ পাহাড় এবং দামোদর, কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি নদীর উপস্থিতিও প্রভাব ফেলেছে যথেষ্ট। এর পাশাপাশি মনে রাখা প্রয়োজন, ব্রাহ্মণেতর সমাজের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বিচরণ খুব স্বচ্ছন্দ ছিল না। ফলস্বরূপ তাদের ভাষায় তথা বাগ্‌যন্ত্রে এসেছে আড়ষ্টতা। এর সঙ্গে শিক্ষাহীনতা যুক্ত হয়ে বাগ্‌যন্ত্রের

[বঙ্গালী, বরেন্দ্রী ও কামরূপীর অবস্থান আলোচনায় অপ্রয়োজনীয় বোধে দেওয়া হল না]

স্বতঃস্ফূর্ত আলোড়ন সম্ভব হয়নি। অন্যান্য লোকভাষার মতো বাঁকুড়ার লোকভাষার উচ্চারণে এই যে শৈথিল্য বা সঠিক ধ্বনিগত উচ্চারণের বিকৃতি—তাকে বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি তার দায়ভার অংশত সামাজিক অবস্থানেও রয়ে যায়। আসলে বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গির মূলে থাকে ভৌগোলিক, অবয়বগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব। কারণ, ব্যক্তি বলতেও বোঝায় তার ভৌগোলিক ও সামাজিক অস্তিত্বের অভিব্যক্ত রূপ।

আলোচনার নান্দীতে বাঁকুড়ার ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের শিকড়ের সন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে পঞ্চদশ শতকের আগে। বাংলাভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের পরেই যে পুঁথিটি স্বীকৃতি দাবি করে, সেটি—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এটি আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়ার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচা থেকে। কবির জন্মস্থান সম্পর্কে নিঃসংশয়িত না হয়েও বলা যায়, এই কাব্যের ভাষার সঙ্গে বাঁকুড়া অঞ্চলের উপভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আদিবাসী নৃত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব বাঁকুড়ার উপভাষায় প্রতিফলিত

(ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত শব্দ যা বাঁকুড়ায় আজও প্রচলিত :

১। '**গাতর** ভরা রাধা পেলা আভরণে ' [কৃষ্ণকীর্তন]
গাতরখাকীর বিটি নাকি কাজ করতে পারবি
[বাঁ. উ. ভা.]

২। '**বিহান** আইলাহোঁ হে সাঁঝ উপসন ' [কৃষ্ণকীর্তন]
সাঁঝ **বিহানে** যাচ্ছ কুথা ? [বাঁ. উ. ভা.]

৩। 'বামন শরীর **মাকড়** বেশ। [কৃষ্ণকীর্তন]
মাকড় মারলে ধাকড়টি খেতে হবে। [বাঁ. উ. ভা.]

৪। 'এবে **কেহ্নে** গোআলিনী পোড়ে তোর মন ' [কৃষ্ণকীর্তন]
হাথে হাথে পান **কেহ্নে** দিলি ভাসুরকে [বাঁ. উ. ভা.]

(খ) ধাতুগত দিক থেকে সাদৃশ্য :

১। ফুটিলছে, রহিলছে ইত্যাদি ক্রিয়ার ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়।
বাঁকুড়ার উপভাষাতে পাওয়া যায়— খেলাইছিলি, ঢিলাইছিলি ইত্যাদি।

(গ) বিভক্তিচিহ্নগত সাদৃশ্য :

১। নিমিত্তার্থে 'ক-এ' বা 'কে' প্রত্যয়ের ব্যবহার।
এহা তত্ত্বজ্ঞানী কর **ঘরকে** গমন। [কৃষ্ণকীর্তন]
ঘাটকে যাব। [মাঠে পায়খানা করতে]

২। সপ্তমী 'ত', 'তে' বিভক্তি যেখানে আধুনিক চলিত ভাষায় লুপ্ত বা 'তাহার', 'তার' স্থানে 'এ', 'য়ে' প্রযুক্ত সেই সকল স্থানে 'ত' বিভক্তি হয়।

ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ। [কৃষ্ণকীর্তন]
তুমার **কথাবার্তাত** বাধাচাকা নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও এ অঞ্চলের শব্দ বৈশিষ্ট্যের কিছু প্রয়োগ দেখা যায়।

১। **ইচা** মৎস্য ডিম পাড়ে তার দাড়ি মুছে।
[মনসামঙ্গল দ্বিজ বংশীদাস]
ইচলা মাছের ডিম। [ইচলা, ইচা = চিংড়ি]

২। পাঁচ **আড়া** মাপি দিল ধান। [কবিকঙ্কণ]
পাঁচ **আড়া** ধানের এক আড়া আগড়া।
[আড়া = ধান মাপার পাত্র, আগড়া = শস্যহীন ধান]

৩। সেনা মরে **জাড়ে**। [কৃত্তিবাস]
জাড়ে হাত পা গুলান পাঁটে সেধাই গেল।
[জাড় = শীত]

৪। সাত গোটে **টেনা**। [কাশীরাম দাস]
এমন কপাল একটা **টেনাও** জুটল না।
[টেনা = ছেঁড়া কাপড়]

৫। কাণে কড়ি **কড়ে রাঁঢ়ী** কথা কয় ছলে। [ভারতচন্দ্র]
কড়ে রাঁঢ়ী আবার শুভ কাজে আসবে কি ?

দুই

ভাষা সাহিত্যের বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে প্রাকৃত ভাষা বা ইতরজনের ভাষা পরবর্তীকালে ভদ্রলোকের ভাষাকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়। সেই

ইতরজনের ভাষাই বর্তমান বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট ও গৌরবান্বিত করেছে। কলকাতা, শান্তিপুর তথা হুগলি-ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলগুলির ভাষা কেন্দ্রীয় উপভাষার মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক দুর্বলতার কারণে, কর্মোদ্যমের অভাবে পশ্চিম প্রান্তিক রাঢ়ী উপভাষায় মূল রাঢ়ী উপভাষার তুলনায় পরিবর্তনশীলতা সেই অনুযায়ী লক্ষিত হয় না। ফলে বাঁকুড়া জেলার ভাষা আপাতদৃষ্টিতে অমার্জিত ও সভ্য-ভদ্র কলকাতাবাসীদের কাছে উপেক্ষিত, অনাদৃত। কিন্তু উপভাষার ক্ষেত্রে বা আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। এ ভাষা অপরিশীলিত হলেও কৃত্রিম নয়, বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ। আঞ্চলিক বিশিষ্টতায় সমৃদ্ধ এই ভাষা প্রবহমান লোকশ্রুতির উপর নির্ভরশীল। তবে এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণে, কথোপকথনে রয়েছে এই ভাষার ছবি। এই উপভাষার প্রধান দুটি জিনিস লক্ষণীয়—(১) অন্যত্র অব্যবহৃত মৌলিক শব্দভাণ্ডার এবং (২) শব্দ উচ্চারণের বিশিষ্ট কৌশল।

আধুনিক শিষ্ট ভাষা বহু পুরাতন শব্দকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করলেও 'বাঁকড়ী' ভাষাতে সেগুলির সযত্ন লালিত ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে। সেই শব্দভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

শব্দ	অর্থ	পদ	বাক্য
অ			
১) **অগা** —	বোকা, মূর্খ।	বিণ.।	ইরকম অগা লোককে নিয়ে কাজ করতে যাওয়া ঝকমারি।
২) **অসার** —	চওড়া।	বিণ.।	কাপড়ের অসারটা খাট।
৩) **অড়র্কক** —	নির্বোধ।	বিণ.।	অমন অড়র্কক লুককে লিয়ে কুথাও যাতে নাই।
৪) **অসটা** —	ন্যাকামি।	বি.।	অসটা দেখলে গা জ্বলে।
৫) **অনামুয়া** —	গালি অর্থে।	বিণ.।	অনামুয়া মিন্‌সে, তুর মরণ নাই।
আ			
১) **আওড়** —	কুঁড়েঘরের এক পাল্লা কবাট।	বি.।	আওড়টা ঠেসিয়ে দাও।
২) **আঁকাড়** —	জড়ানো।	ক্রি.।	ছেলেটাকে আঁকাড় করে ধর।
৩) **আটু-পাটু** —	অস্থির।	ক্রি. বিণ.।	তুমার লেগে মনটা আমার আটু-পাটু করছে।
৪) **আকল** —	কড়া।	বি.।	জল তুলে তুলে হাতে আকল পড়ে গেল।
৫) **আছুলা** —	খোসা ছাড়ানো নয় এমন।	বিণ.।	আছুলা আলুটা সেনে (চটকে) নাও।

শব্দ	অর্থ	পদ	বাক্য
ই			
১) **ইরা-পারা** —	এরা বোধ হয়।	সর্ব.।	ইরা-পারা বাবুদের নোক।
২) **ইঁচরা** —	খুঁচিয়ে দেওয়া।	ক্রি.।	উনানটা এখনও নিভে নাই, ইঁচরিয়ে দাও, ধোঁয়াবে।
৩) **ইকা** —	একা।	বিণ.।	রাত-বিরেতে ইকা যেতে ডর লাগে।
৪) **ইঁজোল-পিঁজোল** —	এক ধরনের কৃষি উৎসব।	বি.।	ইঁজোল-পিঁজোল দিনে ছেল্যাদের বড় মজা।
৫) **ইচলি** —	চিংড়ি।	বি.।	ইচলি মাছের টকটা দিয়োঁ ভাত খায়োঁ দিল।
উ			
১) **উঁকা** —	গোঁয়ার।	বিণ.।	উ বড় উঁকা লোক বটেক।
২) **উলান** —	পরিষ্কার করা।	ক্রি.।	ছেলার মা হইছে গু উলান তো করতেই হবেক।
৩) **উব্‌-জ্বলন্ত** —	অত্যন্ত উষ্ণ।	ক্রি. বিণ.।	উব্‌-জ্বলন্ত চা-টা গলায় ঢাললে কি করে।
৪) **উড়াকল** —	এরোপ্লেন।	বি.।	আকাশ পানে দ্যাখ কেমন উড়োকল যাচ্ছে।
এ			
১) **একচুয়া** —	একবাটি।	বিণ.।	একচুয়া জল দাও তো।
২) **এলকুনো** —	ভেংচি কাটা।	ক্রি.।	উ আমাকে এলকুচ্ছে।
৩) **এগ্‌না** —	উঠান।	বি.।	এগ্‌নায় দাঁড়ায়ে ক্যানে ?
৪) **এগু** —	আগে।	বিণ.।	এগু এগু চল, নয়ত হুঁজুট (হোঁচট) খাবে।
ক			
১) **কাড়া** —	পুং. মহিষ।	বি.।	কাড়াগুলাকে গুয়াল থেকে বার কর।
২) **কাড়া** —	পরিষ্কার করা।	ক্রি.।	'ডিমার চাল কাড়া আর আ-কাড়া।'
৩) **কঁচড়া** —	মহুয়া ফল।	বি.।	বহুত দিন বাদে কঁচড়া ভাজা খেলাম।
৪) **কুঁদকুন্দা** —	সুস্বাস্থ্য।	বিণ.।	মামাঘরে খায়োঁ খায়োঁ আচ্ছা কুঁদকুঁদাটি হয়েঁছে।

শব্দ		অর্থ	পদ	বাক্য
খ				
১) খাড়ি	—	চাবি।	বি.।	ঘরে তালা দিয়ে খাড়িটা হাতে দাও।
২) খ্যান	—	দৈবাৎ।	বিণ.।	খ্যান করে আজ মাছ ধরতে গেলাম আর আজই বৃষ্টি !
৩) খঁকয়ান	—	চেঁছে তুলে নেওয়া।	ক্রি.।	বাটিটা খঁকরে চাঁছিটা খাঁয়ে লে।
৪) খাটো	—	ছোটো।	বিণ.।	শীতকালের বেলা বড্ড খাটো বেলা।
গ				
১) গিজড়া	—	দাঁত বের করে হাসা।	ক্রি.।	বাঁদরি কলা খাবি, দাঁত গিজুড়ে মরে যাবি।
২) গর‍্যা	—	ঘড়া।	বি.।	গর‍্যাটা বার কর জলকে যাব।
৩) গ্যাদে	—	অনেক।	বিণ.।	বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন গ্যাদে খাবি।
৪) গনগন্যা	—	খুব বেশি।	বিণ.।	উনুনটায় এখনও গনগন্যা আগুন রইছ্যে।
ঘ				
১) ঘুষা	—	মুখস্থ করা।	ক্রি.।	পাঠশালাতে আবার নামতা ঘুষা শুরু হইছ্যে।
২) ঘি-কাল্লা	—	কাঁকরোল।	বি.।	বাজারে ঘি-কাল্লা এস্যেছে।
৩) ঘংরা	—	ফাঁপা।	বিণ.।	বুঝতেই পারি নাই কড়িকাঠের ভিতরটা এত ঘংরা হইয়্যাছে।
৪) ঘ্যাঁট	—	চচ্চড়ি।	বি.।	গেরস্তঘরে একটা ঘ্যাঁট না হলে চলে না।
চ				
১) চুকা	—	শেষ হওয়া।	ক্রি.।	খাটো দিনের বেলা, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে চুকতে সন্ধে।
২) চামনি	—	ছোটো উকুন।	বি.।	কি নোংরা মেয়ে, মাথা ভর্তি উকুন আর চামনি।
৩) চ	—	চল্।	ক্রি.।	চটক্ চ বাস পাব নাই।
৪) চিক্	—	মার্জিন	বি.।	দেখছ না চিকের বাইরে এখনও পা রইছ্যে।
ছ				
১) ছা	—	ছেলে।	বি.।	আজকাল ছাদের নেগে বই-পত্তরে কত সুন্দর সুন্দর ছাব।
২) ছাব	—	ছবি।	বি.।	"
৩) ছামু	—	সামনে।	অব্যয়।	ছামুতে যাব লয়।
৪) ছকা	—	সাঁতলানো।	ক্রি.।	ডালটা একবার ঘি দিয়ে ছকে নাও।
জ				
১) জাড়	—	শীত।	বি.।	জাড়ে হাত-পা গুলান ভিতরে সেঁধিই গেল।
২) জুমড়া	—	পোড়া কাঠ।	বি.।	জুমড়া কাঠটা নিয়ে ইদিক-উদিক করো না।
ঝ				
১) ঝাজা	—	বড় ঝুড়ি।	বি.।	এক ঝাজা ভর্তি আম বাজারে এল।
২) ঝলখলি	—	ঝঞ্ঝাট।	বি.।	কি ঝলখেলি রে বাবা, এমন কাজ কেউ করে।
ট				
১) ট্যানা	—	ছেঁড়া কাপড়।	বি.।	এক চিলতে ট্যানাও তো নাই, মুখেই ফড়ফড়ানি।
২) টুকদু	—	একটু।	বিণ.।	টুকদু গেলেই দেখতে পাবে উইখানে ঘরটা।
ঠ				
১) ঠসক	—	অহঙ্কার।	বিণ.।	এই তো রূপের ছিরি, তার আবার ঠসক কত !
২) ঠলজা	—	ঠোঙা।	বি.।	ঠলজা করেই মুড়ি দাও।
ড				
১) ডিংলা	—	কুমড়ো।	বি.।	ডিংলা কাটিতে লারে বৌড়ি, লাউ কাটিতে দৌড়াদৌড়ি।
২) ডুংরি	—	ছোটো পাহাড়।	বি.।	ফুলডুংরি বেশি দূর লয়।
ঢ				
১) ঢেরাঢেরি	—	চোখ টেপা।	ক্রি.।	অলিতেগলিতে অত ঢেরাঢেরি কিসের ?
২) ঢেমন	—	বদমাস।	বিণ.।	ঢেমনা মাগিটা বড় নোংরা।

শব্দ	অর্থ	পদ	বাক্য
ত			
১) **তেঁহর** —	তাঁর।	সর্ব.।	রাজা ম'লে করব শোক আমরা তেঁহর আপন লোক।
২) **তালাই** —	চাটাই।	বি.।	গ্রীষ্মকালের দিন, একটা তালাই-মাদুর হলেই চলবেক।
থ			
১) **থুতি** —	মুখনাড়া দেওয়া।	ক্রি.।	খুব হয়েছে, বেশি থুতি নেড়ো না।
২) **থুবড়া** —	অবিবাহিত।	বিণ.।	থুবড়া বিটি ঘরে, আমোদ করলে চলবেক ?
দ			
১) **দশন** —	তেল দেওয়ার পাত্র।	বি.।	তেলের ভাঁড়ে তেল নাইক দশন মারে ঘা।
২) **দমতক** —	প্রচুর।	বিণ.।	দমতক খাবে আর দমতক কাজ করবে। তবেই শরীর সারবে।
ধ			
১) **ধাড়** —	বড়।	বিণ.।	যত বজ্জাত ওই ধাড় গরুটা।
২) **ধুনা** —	ভীষণভাবে মারা।	ক্রি.।	ও দিদি, গরুটা বাঁধ ধুন্যে দিবেক যে।
ন			
১) **নুচা** —	মালিশ করা।	ক্রি.।	হাতটা মচকে গেইচে, ত্যাল দিয়ে নুচে নাও।
২) **নিখাউকি** —	অল্প খায় যে।	বিণ.।	এমন নিখাউকি হলে শরীর সারবে কি করে ?
প			
১) **পেছা** —	ঝুড়ি।	বি.।	সার ফেলার পেছাটা দাও।
২) **পুহান** —	কাটিয়ে	ক্রি.।	রাতটা পুহানে ঘর যাবেক খন।
ফ			
১) **ফাবড়া** —	ঢিল।	বি.।	পোঙ্গাপুঙ্গির দল গরুটার পেছনে ফাবড়া ছুঁড়তে নেগেচে।
২) **ফরফরা** —	পরিষ্কার।	বিণ.।	ভালো করে কাচবে যেন বেশ ফরফরা হয়।
ব			
১) **বড়াং** —	অহঙ্কার।	বিণ.।	অত বড়াং ভালো নয়।
২) **ব্যাঁত** —	মুখ গহ্বর।	বি.।	ব্যাঁত বা দেখি, প্রসাদটা দিই।
ভ			
১) **ভবক** —	গন্ধ।	বিণ.।	কি রাঁধছ ? আচ্ছা ভবক ছেড়েছে।
২) **ভাব্‌রা** —	এক ধরনের তেলেভাজা।	বি.।	চপ পাও নাই তো ভাব্‌রা নিয়ে এসো।
ম			
১) **মাগ** —	স্ত্রী।	বি.।	ঘরে মাগ আছে তো ?
২) **মুড়ান** —	সমূলে বিনষ্ট করা।	ক্রি.।	ছাগলে গাছটা একেবারে মুড়ান দিয়েছে।
র			
১) **রুখা** —	রাগান্বিত।	বিণ.।	মেয়েমানুষের অত রুখা ভালো লয়।
২) **রাঁড়ি** —	বিধবা।	বি.।	কড়ে রাঁড়ির গয়না পরার শখ কিসের ?
ল			
১) **লাতি** —	নাতি।	বি.।	উ আমার বড় লাতি।
২) **লাদমা** —	মুগুর।	বি.।	উ লাদমা ভেঁজে স্বাস্থ্য করেছে দেখ।
শ, ষ, স			
১) **শাপা** —	অভিশাপ।	বি.।	দিনরাত এত শাপ দেওয়া ভালো লয়।
২) **সাঙ্গা** —	অবৈধ বিবাহ।	বি.।	তুর সাঙ্গা কেউ মানবেক লয়।
হ			
১) **হেঁটেরান** —	অনুরোধ করা।	ক্রি.।	এতবার হেঁটেরান করলাম, তবুও কাজ করলে না !
২) **হড়হড়ান** —	ঢালু।	বিণ.।	সাবধানে যেও ; পথটা বড় হড়হড়ান।

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'ঈ', 'ঐ', 'ঊ', 'ঔ'—এই চারটি স্বরবর্ণের ব্যবহার এই ভাষায় প্রায় নেই বললেই চলে।

তিন

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত কিছু ভাষা বা শব্দসমূহের কারণ ও ব্যবহার কৌশল অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে সমস্ত ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে আলোচ্য নিবন্ধে তার

বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে সেই সূত্রগুলি উদাহরণ সহ দেওয়া হল।

(১) ধ্বনিগত

স্বরধ্বনির আগম

(ক) সর্বনাম পদের আদিতে 'ই' এবং 'উ'-এর আগম ঘটে। যেমন, এরা > ইয়েরা, ওরা > উয়ারা।

(খ) সমাপিকা ক্রিয়া পদে প্রথম ধ্বনির পর 'ই' এবং 'আ'-এর আগম ঘটে। যেমন—
গেছে > গ্যাছে > গেইছে। খেলছে > খেলাচ্ছে।

(গ) স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—অধিক > আধিক, মহাজন > মাহাজন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। অ > আ-তে পরিবর্তিত হওয়া ছাড়াও এ > ই ধ্বনিতে, ও > উ ধ্বনিতে, ঋ > ই ধ্বনিতে, ঐ > ও-তে, ঔ > উ, ঔ > এ-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন—
এদিক > ইদিক, সেখানে > সিখানে, বোন > বুন, কোথায় > কুথায়, পৃথিবী > পিথিবী,
কৃষাণ > কিষাণ > কিষেণ, বৈঠক > বোঠক > বোটক। অশৌচ > অশুচ > ওযুদ, কৌটো > কেটো।

(২) স্বরলোপ

আদি স্বরলোপের উদাহরণ বিশেষ এখানে পাওয়া যায় না। মধ্যস্বরলোপ ও অন্ত্যস্বরলোপ 'বাঁকড়ী' ভাষায় দেখা যায়।

মধ্যস্বরলোপ
ঢেঁকিশাল > ঢেঁক্‌শাল, পয়সা > প-সা।

অন্ত্যস্বরলোপ
তুই > তু, পাতা > পাত, হাঙ্গামা > হাঙ্গাম।

(৩) স্বরসঙ্গতি

শিয়াল > শিয়েল, রাতের > রেতের।

(৪) স্বরভক্তি

ভাদ্র > ভাদর, ত্রাশ > তরাস, শ্রী > ছিরি।

(৫) স্বরধ্বনির সংকোচন

নাতিনী > নাত্‌নী > লাতিন, আশা > আশ।

(৬) সংযুক্ত ব্যঞ্জন

(ক) শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন কখনও কখনও অন্য স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—
প্রসাদ > পেসাদ, প্রণাম > পেন্নাম / পেনাম।

(খ) পদ মধ্যস্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন প্রায়ই লোপ পায়। যেমন—
স্বাদ > সাদ, পশ্চিম > পচিম।

(৭) ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ

মধ্যব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে
কার্তিক > কার্ত্তিক বামন > বাওন।

বাঁকুড়ার ঘোড়ানাচ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ

অন্ত্যব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে
চৈত্র > চোত, সম্মুখ > ছামু।

(৮) ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন

(ক) আদিতে 'ন' স্থানে 'ল' হয়। যেমন—
নাবিক > লাবিক, নিয়ে > লিয়ে।

(খ) বিপরীত পক্ষে 'ল' আবার 'ন' হয়ে যায়। যেমন—
লাল > নাল, লম্ফ > নম্ফ।

(গ) 'স' স্থানে 'ছ' হয়। যেমন—
সক্‌ড়ি > ছক্‌ড়ি, সম্মুখ > ছামু।

(ঘ) তাড়িত ধ্বনি মূর্ধণ্য ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—
চড়াই > চড়ুই, ভুঁড়ি > ভুঁটি।

(ঙ) প্রায়শ 'ড়'-এর উচ্চারণ 'র'-এর মতো হয়। যেমন—
চিংড়ি > চিংরি, বড় > বর।

(৯) ব্যঞ্জনাগম

আদিতে :—	আছাড় > কাছাড়।
মধ্যবর্তীতে :—	অগুণ > অব্‌গুণ।
অন্তে :—	খাবে > খাবেক, করিবে > করিবেক।

বাঁকুড়া জেলার ভাষায় অন্যতম একটি বৈশিষ্ট 'ছেল্যা' শব্দটির দ্বারা পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তান উভয়কেই চিহ্নিত করা হয়। ফলে বৌ বা বিটির ছেল্যা হয়েছে শুনে তা পুত্র না কন্যা প্রথমে নির্ধারণ সম্ভব নয়। পরে কথা প্রসঙ্গে সেটি বিটিছেল্যা না মেয়েছেল্যা জানা সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—

আমার বিটির ছেল্যা হবেক।

বিটিছেল্যাটা ঘাড়ে বসে খাচ্ছে আর সীনামা দেখছে।

(১০) অপিনিহিতি

বৃদ্ধি = বাড় > বাইড়, পক্ষী = পাখি > পাইখ।

(১১) অভিশ্রুতি

অভিশ্রুতি ঘটলেও উচ্চারণে সন্নিকটস্থ স্বরের সন্ধি হয় না। যেমন—মেয়্যা = মাইয়্যা > মেয়ে, এঁড়্যা = আইড়া > এঁড়ে।

(১২) মহাপ্রাণতা

কাকে > কাখে, কাঠি > খাটি > খাড়ি।

(১৩) মহাপ্রাণহীনতা

ধাই > দাই, বুঝিল > বুজিল।

(১৪) সমীভবন

চারটি > চাট্টি, আশ্চর্য > আশ্চজ্জি।

(১৫) বিষমীভবন

ছানা > ছেনা, মুকুল > মোকুল, শিশি > শিশে।

(১৬) মূর্ধণ্যীভবন

দাঁড়ান > ডাঁরান, দণ্ড > ডণ্ড।

(১৭) তালব্যীভবন

মাদুর > মাজুর, সেদ্ধ > সিদ্ধ / সিদ্দ > সিজে।

(১৮) ঘোষীভবন

শকুনি > শগুনি, কাক > কাগ > কেগো।

(১৯) অঘোষীভবন

সুবিধা > সুবিদা, ধোপা > ধোবা।

(২০) বর্ণ-বিপর্যয়

জ্যোৎস্না > জোস্তা, বাতাস > বাসাত।

(২১) জোড়-কলম

মেঘলা + আবছা = মেঘছা।

(২২) সাদৃশ্য

আজকের, কালকের প্রভৃতি শব্দের অনুরূপে সৃষ্টি কৎকের অর্থাৎ কত দামের। যেমন—চালের দরটা কৎকের ?

(২৩) অনুকার ও অনুগামী শব্দ

ছল-চাতুরি, রাত-বিরেত, ঘা-ফুট প্রভৃতি।

(২৪) শ্রুতিধ্বনি

ই + এরা = ইয়েরা।
ভাই + এর = ভায়ের > ভেয়ের।

(২৫) নাসিক্যভবন

(ক) পরবর্তী নাসিক্যধ্বনির লোপবশত পূর্ববর্তী স্বর অনুনাসিক হয়ে ওঠে। যেমন— পেন্সিল = পেঁইসিল
(খ) নাসিক্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াও নাসিক্যভবন হয়। যেমন— হাসি = হাঁসি, চা = চাঁ।
(গ) অনুনাসিক শব্দ অ-নাসিক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— চাঁদ > চাদ, ছোঁয়া > ছোয়া।

(২৬) ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব

এই জেলার ভাষা প্রয়োগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব রূপ। এক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার 'কর্' ধাতুই ব্যবহৃত হয়। যেমন— আনা করাও, বলা করাবে।

(২৭) নামধাতু প্রয়োগ

কোদাল > কদ্‌লান। কিল > কিলান, কিলাই।
জিজ্ঞাসা > জিগ্‌সানো, কনকন > কনকনায়।

(২৮) সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ

খালভরা—খাল ভরে যে।
লিভাতারী—ভাতার (স্বামী) নাই যার।
আলবেলা—আলো আছে এমন বেলা।

(২৯) অব্যয়

খপ্ (শীঘ্র)—খপ্ করো খায়্যে লে।
ব (প্রার্থনা / অনুরোধ)—দে না ব আলাটা একটু দেখাঁইএ।

(৩০) ক্রিয়া

(ক) এই অঞ্চলের উপভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার বেশি। যেমন—
দা (নিশ্চয়তা)—করা দুব, হাঁসাই দিলি।
গম (সম্পূর্ণ)—চলি গেল। নিয়ে গেল।

(খ) **সমাপিকা ক্রিয়া**
করিদি গেল = করিল।
বলিদি গেল = বলিল।
(গ) **অসমাপিকা ক্রিয়া**
করিয়োঁ > কর্যোঁ, হাসিয়োঁ > হাস্যো।
(ঘ) **অস্ত্যর্থক ক্রিয়া**
এখানে অস্ত্যর্থক ক্রিয়া হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয় 'বট' ক্রিয়াটি। যেমন— তুমি ক্যা বট ?
(ঙ) **নস্ত্যর্থক ক্রিয়া**
পারব না = লারব, নয় = লয়।
* নস্ত্যর্থক 'নাই'-এর উত্তর স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় মহাপ্রাণিতরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—
খাবেক নাই, বলবেক নাই।

(১) প্রত্যয়

কৃৎ প্রত্যয়
(ক) অন্তী—
দেখ্ + অন্তী = দেখন্তী, কর্ + অন্তী = করন্তী।
(খ) আন—
কাট + আন = কাটান্।
(গ) কি—
খাও + কি = খাওকি, খাও + কি = খাউকি।

তদ্ধিত প্রত্যয়
(ক) লা—সাঁঝলা, মাঝলা।
(খ) ইয়া—ক্ষুদিয়া, মুনিয়া।
দ্রুত উচ্চারণের ফলে 'ইয়া' প্রত্যয় 'আ' / 'আ্য' হয়ে যায়। এই অঞ্চলের উপভাষায় এই প্রত্যয়যুক্ত শব্দের ব্যবহার অত্যধিক। যেমন—
খেঁড়িয়া > খেঁড়্যা, তেঁতুলিয়া > তেঁতুল্যা।
(গ) উলি—
খাটুলী (ছোটোখাট), মাডুলী (গোবর মেড়ে গোলবৃত্ত)।

(৩২) লিঙ্গ

পুং.	জ্ঞানমান	—	স্ত্রী	জ্ঞানমানী
পুং.	লাতি	—	স্ত্রী	লাতনী
পুং.	ভূমিজ	—	স্ত্রী	ভূমিজানী
পুং.	মাঝি	—	স্ত্রী	মাঝিন / মেঝান
পুং.	মুনিষ	—	স্ত্রী	কামিন
পুং.	মরদ	—	স্ত্রী	মেয়া।

(৩৩) বচন

(ক) **একবচন** — **বহুবচন**
ছা — ছাগুলা / ছাগুলান
(খ) 'গেদে', 'খাতা-খাতা', 'গুচ্ছেক', 'বনী' (বন) যোগে বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন—
গেদে খাঁয়েলে, মৌ উড়ছে খাতাখাতা।
গুচ্ছেক লোক ডেকে কি হবে, শালবনী, জামবনী।

(৩৪) উপসর্গ

(ক) আড় শব্দ যোগে—
আড়বাঁশ, আড়বেলা।
(খ) নাম—
নামজাত, নাম বাঁকড়ো।
(গ) নি (নঞ্ অর্থে)—
নি-খাউকি, নি-গতরী।
(ঘ) নিত্ (চিরকাল অর্থে)—
নিত্রুগী, নিত্ভোগী।

(৩৫) কারক ও বিভক্তি

(ক) কর্তায় 'এ' এবং 'য়' বিভক্তি। যেমন—
রতনে রতন চিনে, কালায় বাজায় আড়বাঁশী, মন করে আনচান।
(খ) মুখ্য ও গৌণ কর্মে বিভক্তিহীনতা। যেমন—
হে কন্যা দান, মাথায় কাপড় টান।
(গ) করণ কারকে প্রথমা বিভক্তি। যেমন—
বেলা যে গেল আর কতক্ষণ কোদাল পাড়বে ?
(ঘ) অধিকরণ কারকে 'কে' বিভক্তি। যেমন—
উ বেলাকে।
(ঙ) অপাদান কারক—
ইয়াল্যে উটা ভারী বটেক।
(চ) বিভক্তিহীন সম্প্রদান কারক—
ঘাসকে গ্যাছে (ঘাসের জন্য)।

নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাঙালি যেমন বর্ণসঙ্কর জাতি, তেমনই বাঁকুড়াবাসীও অনার্যমিশ্রিত। কারণ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় প্রাক্আর্য যুগ থেকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বসবাস। ফলে, বর্তমানে পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতি ও ভাষাতে রয়ে গেছে অনার্য উপাদান। সেই সকল শব্দের উৎপত্তিগত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও অনার্য ভাষা থেকে আগত দেশি শব্দের স্বল্প কিছু উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

গড়া = গোয়াল (কোল শব্দ), ছোট পুকুর (সাঁওতালি ভাষায়)।
ল্যাদা = বোকা / অলস (কোল শব্দ),
আচ্ছা ল্যাদা ছেল্যা বটে (বাঁকুড়াবাসীর ভাষায়)।
মাল = উঁচু জায়গা (দ্রাবিড় শব্দ)।
সিটা = টক (শব্দটি প্রাচীন, অধুনা লুপ্তপ্রায়)।
ভাডুক = ভালুক (খেড়িয়া শব্দ)।
ডোল = বালতি (খেড়িয়া শব্দ)।
চাঁড়ে = তাড়াতাড়ি (খেড়িয়া শব্দ)।
চিহ্বর = চিৎকার কর (খেড়িয়া শব্দ)।
টকি = টোকা (ছোট ঝুড়ি) বীরহোড় শব্দ।

চার

G. A. Grierson তাঁর Linguistic Survey of India, Vol-V, Indo-Aryan family; Eastern Group. Cal-1899

গৈরিক মাটি আর সবুজ পটভূমিতে পবিত্র কিশোরীর মুগ্ধ দৃষ্টি. ছবি : কৌশিক সেনগুপ্ত

গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেন যে, বাঁকুড়ার ভাষা পশ্চিম রাঢ়ীর ভাষা। সাধারণ বাংলা ভাষা থেকে এ অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্য বর্তমান। নিম্নে তার উদাহরণ দেওয়া হল।

সাধারণ বাংলা 'o' বাঁকড়ী ভাষায় 'u' হয়ে যায়। যেমন—

ছোট > ছুট্, তোমার > তুমার।

'এ' হয়ে যায় 'অ্যা'। যেমন—

এক > অ্যাক, গেল > গ্যাল।

'n' বা 'ন' বহুক্ষেত্রে 'l' বা 'ল' হয়। যেমন—

নাচ > লাচ, নাও > লাও, নদী > লদী।

এ অঞ্চলের ভাষায় বিশেষত্ব অক্ষরের বা উচ্চারণের অস্পষ্টতা, অশুদ্ধতা। যেমন—

কাছে > কাচে, বিরুদ্ধে > বিরূদ্দে।

অনেক সময় শব্দ মধ্যস্থিত 'r' বা 'র' কিংবা রেফ উঠে গিয়ে পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব ঘটায়। যেমন—

স্বর্গে > সগ্গে, করছি > কচ্চি।

'নি'-কে 'নাই' অর্থে ব্যবহার করার প্রবণতাও এ অঞ্চলে যথেষ্ট। যেমন— আমি এ কাজ করি নাই।

আবার 'নু'-এর পরিবর্তে 'লাম' বা 'লম্' ব্যবহৃত হয়। যেমন— গিয়েছিনু > গিয়েছিল / গেইছিলম্।

বাঁকুড়া জেলার কথাভাষায় আদিতে 'এ'-কারযুক্ত শব্দ সাধারণত 'ই'-কারযুক্ত হয়। শব্দের মধ্যে বা শেষেও কখনও কখনও ঘটে ব্যঞ্জনাগম ও স্বরাগম। স্বরভক্তির মতো ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙে তার মধ্যে যে আগম ঘটে এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য তদনুসারী নয়। এখানে 'ই'-কার ধ্বনির আগম ঘটে। যেমন—

ই বছর যামন ত্যামন চাইল্যে নাও।

কথ্যভাষায় 'অ'-কার ও 'এ'-কার 'অ্যা' হয়েছে। ফলে, যেমন তেমন > যামন ত্যামন। আবার

বাবু গামছা বিকতে আনেছি লিবেন কি ?

এই উদাহরণে বিকতে > বিক্রি করতে এবং 'আনেছি' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ শিষ্টভাষীদের পক্ষে কঠিন। আসলে এটিতে এক ধরনের শ্রাব্য মাধুর্যের সৃষ্টি হয়—যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অনেক সময় লয় > নয় শব্দটি নেতিবাচক বোঝায় না। যেমন— ডাংটাকে আমি ঘঁষটায় ঘষটায় লিয়ে যাব লয়।

প্রতিটি মৌখিক ভাষাতে কিছু মুদ্রাদোষ থাকে। বাঁকুড়া জেলার কথ্যভাষাতে এই ধরনের বাচনিক মাত্রা বা মুদ্রাদোষ হল 'তাল্যে' > 'তাহলে' এবং 'ইয়া হল্যে' > এই হল / এই যে। আবার কথার মধ্যে ধ্বনিগত মাধুর্যের প্রকাশ ঘটেছে কথার শেষে 'লো' যুক্ত হয়ে।

ইয়া হল্যে, বাবু তুমাকে ড্যাকেছেন।

মেয়া মরদে কুথা যাচ্ছিস **লো** ?

বাঁকুড়া জেলার ভাষায় অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য 'ছেল্যা' শব্দটির দ্বারা পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তান উভয়কেই চিহ্নিত করা হয়। ফলে বৌ বা বিটির ছেল্যা হয়েছে শুনে তা পুত্র না কন্যা প্রথমে নির্ধারণ সম্ভব

বাঁকুড়ার জনসংস্কৃতির ইতিহাস লোকধর্মের ইতিহাস, মানবতার ইতিহাস। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে যাত্রা, কথকতা, কবিগান, বাউল-ফকিরের একতারা, সাধক কবিকণ্ঠের তত্ত্বমূলক গান, নিরক্ষর কৃষকের মুখের ভাষা, অরণ্য রমণীর আনন্দিত মনের বাচনিক প্রকাশ। এই অঞ্চলের নারীদের বারব্রত, আচার-অনুষ্ঠান প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের অজানা রহস্যের ভাণ্ডার।

বাঁকুড়া মহকুমার গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত বাঁকড়ী ভাষার সাবলীল গঠনভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারের বাচনভঙ্গির মাধুর্য যে-কোনও ভাষাতত্ত্ববিদকে আকর্ষণ করবে। বাঁকড়ী ভাষার আদি অকৃত্রিম বাচনভঙ্গি খুঁজে পেতে গেলে যেতে হবে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে, যেখানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে আদি অনার্য অধিবাসীবৃন্দ (অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, সাঁওতাল)। এই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী অনার্য জাতি ভাষা ব্যবহারে এবং শব্দ উচ্চারণে তাদের নিজস্ব বাচনভঙ্গি ধরে রেখেছে বলেই আজও এই বাঁকড়ী ভাষার নিজস্বতাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। শব্দ-বিভক্তি পদ-প্রত্যয়গুলি ব্যবহারের মধ্যে গ্রাম ও শহরের যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। একটি তালিকার সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বাঁকুড়ার শহরাঞ্চল	বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চল
(ক) সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে :	
সে	উ
তুই	তু
তোর, তোমার	তুর, তোহার
আমার	মুর
তোকে	তুকে
তাকে, তার	উয়াকে, উয়ার

নয়। পরে কথা প্রসঙ্গে সেটি বিটিছেল্যা না মেয়েছেল্যা জানা সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—

আমার বিটির **ছেল্যা** হবেক।

বিটিছেল্যাটা ঘাড়ে বসে খাচ্ছে আর সীনামা দেখছে।

একটি জাতির সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে আঞ্চলিক ছড়া, প্রবাদ-প্রধান যা ঠাকুমা, দিদিমার মুখে এখনও সুললিত ছন্দে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান। নানা ধরনের শব্দ আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট বা পুষ্ট হয়ে বাঁকুড়ার কথাভাষাকে যে উর্বর করে তুলেছে তার প্রমাণ হিসাবে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

তুকে বলচি বুলব বুলে তুই কা-কে বুলবি না।

বুললে আমার মাথা খাবি।

একই শব্দ বারবার বলার ফলে বাক্যে একটা বিশেষ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ধরনের বাক্য বাঁকুড়ার কথাভাষায় একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার কথাভাষার আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 'পালাচ্ছি', 'পালাব', 'পালাবি', 'পাইল্যে আয়' প্রভৃতি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এর কারণ হিসাবে হতে পারে যে, এই জেলার কিছু অংশে আজও অস্ট্রিক জাতির বাস এবং তাদের ভাষাগত প্রভাব অন্যত্র থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর এই অস্ট্রিক জাতিই প্রাচীনকাল থেকে ভূমিকম্প, দাবানল, ঝড়, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কিংবা খাদ্যাভাবে বা অন্য উপজাতির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যেত। এর ফলে তাদের কথ্যভাষায় 'পাইল্যে' শব্দটা স্থান করে নিয়েছিল সর্বাধিক। এ কারণেই আজ বাঁকুড়ার কথ্যভাষায় 'পালাচ্ছি', 'পাইল্যে' শব্দের প্রয়োগ বেশি।
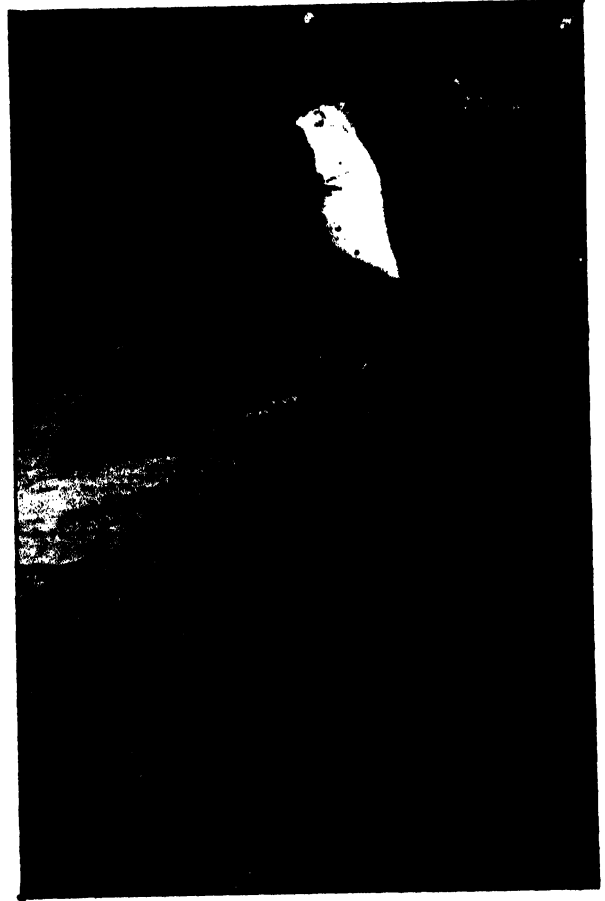
'এগু এগু চল, নয়ত উঁজুট খাবে'—শিশুর হাত ধরে মা চলেছে হাটের পথে

(খ) ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে :

নারবে	লইরবেক
বলছিস্	কচ্চুস
খেয়ে নে	খ্যাঁয়ে লে
নাছিস্	লারছিস্

(গ) বিশেষণ পদের ক্ষেত্রে :

কচি নিম	নিম কচি
লাল আপেল	আপেল লাল

(ঘ) অন্যান্য :

সে যাবে না	উ যাবেক নাই
তুই কি কানা বটে	তু কি কানা বটুস্
কেন	ক্যানে
গালাগালি	বাখান
ছুঁড়ব	ফাব্ড়াব

এখান থেকে স্পষ্ট যে, গ্রাম্য ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্ব যথেষ্ট। আদর্শ ভাষার সঙ্গে এই সব উপভাষার পার্থক্য থাকলেও গ্রামজীবন ও পরিবেশে এর স্থান উল্লেখযোগ্য। গ্রাম্য জীবনযাত্রার মূল বনিয়াদ লৌকিক উপাদানের মধ্যে নিহিত। ফলে লোক-বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্য থেকে বহু শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। গ্রাম্য উপভাষার প্রচলন যদিও ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ, তবুও কোনও সংস্কৃতিকে কোনওভাবেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে রাখা যায় না। আবার অনেক সময় দেখা গেছে একই জেলার অন্তর্গত হয়েও অঞ্চলভেদে জনসমষ্টি একই ধরনের ধ্বনি সমষ্টি ব্যবহার না করে নিজেদের মধ্যে নিয়মমতো অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে ভাববিনিময় করছে। ফলস্বরূপ গড়ে উঠছে ভাষা সম্প্রদায় বা Speech Community.। ব্লুমফিল্ড একেই বলেছেন—

'A group of people who use the same system of speech signals is a speech community'

স্থানের নাম	বাক্যের ব্যবহার	অর্থ
১। বাঁকাজোড়	ভাত খাঁইয়ে ইস্কুলে যাঁ্যয়েছে।	ভাত খেয়ে স্কুলে গেছে।
	গুঁটি ঝুলাকে যাচ্চু কুথাকে ?	বেণী ঝুলিয়ে কোথায় যাচ্ছিস ?
২। ছাতনা	ছাঁতনা।	ছাতনা।
	তুর হাতে ছুলা গেছে।	তোর হাত ছড়ে গেছে।
৩। মাকুড়গী	চাবিখাড়ি কুছু ঠিক রাখবেক লাই।	তালাচাবি কিছু ঠিক রাখবে না।
৪। বনআগুড়ি	দুঁয়ার গুড়ায় উঁটা কি গোবুর লাঁদ ?	দুয়ার গোড়ায় ঐটা কি গোবর ?

উপরি উক্ত তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শব্দের তারতম্য ঘটছে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসে শ্রমজীবী তথা নিচুতলার মানুষদের এবং মেয়েদের প্রাত্যহিক ভাব প্রকাশের বাহন যে কথ্যভাষা অর্থাৎ যাকে লোকভাষা বা উপভাষা বলা যায় সেটিই ভাষার মূল বনিয়াদ। সুধীর করণ তাঁর 'লোকভাষা' প্রবন্ধে বলেছেন—

> নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাঙালি যেমন বর্ণসঙ্কর জাতি, তেমনই বাঁকুড়াবাসীও অনার্যমিশ্রিত। কারণ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় প্রাক্‌আর্য যুগ থেকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বসবাস। ফলে, বর্তমানে পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতি ও ভাষাতে রয়ে গেছে অনার্য উপাদান।

"উপভাষারও স্তরভেদ আছে। রাঢ়ী উপভাষার সাধারণ চলতি রূপ আর আঞ্চলিক গ্রামীণ রূপ ঠিক এক নয়। অন্যান্য উপভাষিক অঞ্চলেও উপরতলার সঙ্গে নিচের তলার প্রাত্যহিক ভাষার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাই ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Colloquial Spoken তাকেই আমরা যথার্থ লোকভাষা নামে অভিহিত করতে পারি।"

লোকসমাজের মুখে মুখে যেমন এই ভাষার অন্তর্গত শব্দের প্রসার ঘটতে পারে, তেমনই লোকভাষার বক্তা সচেতনভাবে কোনও শব্দ ব্যবহার না করার কারণে অঞ্চলভেদে শব্দের তারতম্য ঘটে। ফলে লোকভাষার সাধারণ ক্রিয়ারূপ, শব্দরূপ প্রভৃতির সঙ্গে সম্যক্ পরিচিতি যেমন প্রয়োজন, তেমনই বাচকের নিজস্ব বাক্‌রীতি, শব্দ প্রয়োগবিধিও জানা দরকার। প্রাচীন ভাষাতত্ত্ববিদগণ ১৮১২ সাল থেকেই ভাষাতাত্ত্বিক সত্য আবিষ্কারের জন্য দ্বারস্থ হয়েছিলেন লোকসাহিত্যের। লোকসংস্কৃতি চর্চা করতে গিয়ে সেই আঞ্চলিক উপভাষারই সাহায্য গ্রহণ করেছেন তাঁরা। কাজেই সেদিক থেকে বিচার করলে লোকজীবনের গভীরে প্রবেশের সঠিক পন্থা হল আঞ্চলিক উপভাষা।

বাঁকড়ী ভাষার এই বিশাল শব্দভাণ্ডার এবং ভাষা ব্যবহারের এই বাচনভঙ্গি তথা উচ্চারণগত প্রাচীনতাকে বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়। কারণ, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় শহরে ব্যবহৃত ভাষার প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বাঁকড়ী ভাষার রক্ষণশীলতাকে ধরে রাখতে গেলে সুধীসমাজকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের সেই আন্তরিক মন্তব্য—

'বাংলা ভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এই জন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তিবোধ করি না।'

লেখক : শিক্ষয়িত্রী, কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

রাঢ়ের দর্পণ : আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন

গৌতম দে

বাঁকুড়া জেলার প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালপর্বকে একটি ছোট ফ্রেমে যদি কোনও প্রতিষ্ঠান ধরে রাখার চেষ্টা করছে, তা হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার অমূল্য সংগ্রহশালা আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন।

'ঐতিহাসিক যুগে মহাবীরের চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আর্য সংস্কৃতি জৈনধর্মের বাহনে এই রাঢ়ভূমিতে প্রবেশ করিয়া সার্ধ দ্বি-সহস্র বছর ধরিয়া জোয়ার-ভাঁটার নিয়মে এ জেলায় সংস্কৃতি ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে। কিন্তু তাহারও পূর্বে মানবসংস্কৃতির উষালগ্নের অস্ফুট আলোকে, মানবের অস্ফুট কাকলিতে বাঁকুড়ার বৃদ্ধভূমি যে একদিন জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ সারা জেলায় বিশেষত কাঁসাই, কুমারী আর দ্বারকেশ্বরের উপত্যকায় মুদ্রিত, শুশুনিয়ার বয়োপ্রাচীন প্রস্তর পঞ্জরে উদগত এবং রাঢ়ের উপভাষায় প্রতিধ্বনিত। মানবের আদিমতম জীবনে সংগ্রামের প্রযত্ন প্রয়াসের সুস্পষ্ট চিহ্ন এ জেলার কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর উপত্যকায় হাজার হাজার প্রত্নাশ্মর ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধে বর্তমান। পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অনুর্বর মালভূমি আর পূর্বে উর্বরা গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যশায়িনী রাঢ়কেন্দ্র বাঁকুড়া ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে যেমন বিচিত্র তেমনই ইহার সংস্কৃতি ক্ষেত্র বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষ সমন্বয়ে বিচিত্ররূপিনী। সংঘর্ষের উত্তালতার শেষে বহিরাগত আর্য সংস্কৃতির সমান্তরালে এই ভূখণ্ডের আদিম সংস্কৃতি ধারা সহাবস্থান করিতে করিতে কালক্রমে পাশাপাশি আসিয়াছে ; কখনও বা মিলিয়া-মিশিয়া আপাত দুর্বোধ্য বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে পূর্ণ মানবিকতার সমুচ্চ বিকাশ—বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবের স্থলপদ্ম যেমন দশদিক আলো করিয়া ফুটিয়া আছে অন্যদিকে আদিম বন্যতায় আপাত রূঢ় রক্তলিপ্ত অসংখ্য আদিম ধর্মচর্চা স্বচ্ছন্দে আত্মরক্ষা করিতেছে। সারা ভারতের এমন কি পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রায় সব পর্যায়ের পদচিহ্ন যে এই ভূমিতে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার অনেক প্রমাণই আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আরও অসংখ্য মূল্যবান প্রমাণ এই কঙ্করময় ভূমির অন্ধ জঠরে পুরাতাত্ত্বিকের খনিত্রের অপেক্ষায় দিন গুণিতেছে।'

(পৃষ্ঠা ১. প্রাগৈতিহাসিক পর্ব, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি -মানিকলাল সিংহ)

ভাষাটি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ। উপরোক্ত ভাষ্য থেকে এ কথা বোঝা যাচ্ছে যে বাঁকুড়া জেলার মাটির ওপরে ও নিচে বিরাজ করছে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক অসংখ্য উপাদান।

কালপ্রবাহিকা :

প্রাচীন রাঢ় দেশের কেন্দ্র বর্তমান বীরভূম ও বর্ধমান জেলা। দুই জেলার মূল প্রবাহিকাগুলি হল ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই, অজয় কুনুর, দামোদর প্রভৃতি নদনদী। এই দুই জেলার সংলগ্ন জেলা হল মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া। সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর বিধৌত এই বিস্তীর্ণ এলাকা। গন্ধেশ্বরী, শালি, শিলাই, জয়পণ্ডা ভৈরববাঁকি এসবগুলিই হল পশ্চিমরাঢ়ের প্রাণপ্রবাহ। আঞ্চলিক জীবনযাত্রার কালপ্রবাহের নীরব সাক্ষী। রূঢ় নদনদীগুলির প্রত্যেকটিরই উৎসস্থল ছোটনাগপুর-ওড়িশার পাহাড়গুলি। বছরের অন্য সময়ে নদীগুলি হয় শুষ্ক অথবা ক্ষীণ প্রবাহিনী। বর্ষাকালে দুকূলপ্লাবী দুরন্ত খরস্রোতা। উচ্চাবচ ক্ষয়িষ্ণু উপত্যকার উৎস্থল থেকে প্রতি প্লাবনে ধুয়ে এনেছে যুগ যুগ ধরে কাঁকর মিশ্রিত গেরুয়া মাটি। ক্ষয়িষ্ণু এই মাটিই রাঢ়ের আদিম মৃত্তিকা। মনে হয় জৈন আচারঙ্গসূত্রে বর্ণিত এই সেই বজ্রভূমি। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলার এই মাটি মানুষের প্রতি কোথাও কৃপণ, কোথাও অকৃপণ। এই
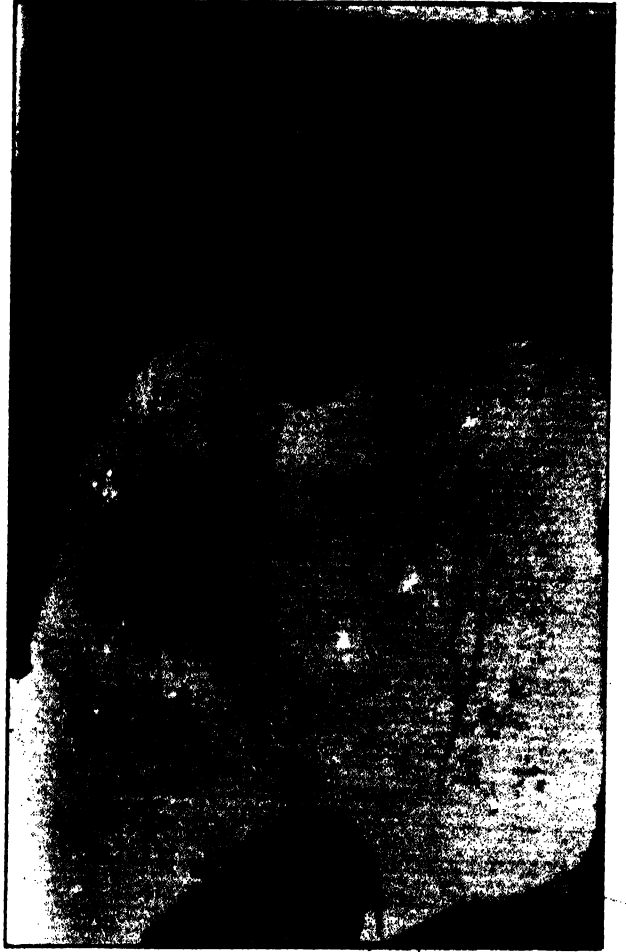
মানিকলাল সিংহ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন।

নদনদীগুলির দুকূলে হয়েছিল পশ্চিম রাঢ়ের বর্তমান জনগোষ্ঠীর সমাজজীবনের সংস্কৃতির সূত্রপাত। এইখানেই তারা স্বপ্ন দেখেছিল ঘর বাঁধার, শস্যোৎপাদনের, বেঁচে থাকার, আর প্রজন্মের পর প্রজন্মের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার।

রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাসের সমগ্র চিত্রটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে প্রত্ন অনুসন্ধানীদের দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে।

পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান :

খুব ধারাবাহিক না হলেও নানাভাবে নানাদিক থেকে বাঁকুড়া জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা যা হয়েছে তার থেকে এখানের আদিম মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন দেখা যাক কখন কিভাবে অনুসন্ধান হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার প্রথম হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। ভি বল সর্বপ্রথম বাঁকুড়া জেলার বিহারীনাথ পাহাড়ের ১১ মাইল দূরবর্তী গোপীনাথপুর গ্রাম থেকে কয়েকটি প্রত্নাশ্মর আয়ুধ আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ হারানচন্দ্র চাকলাদার ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম বাঁকুড়া জেলায় অনুসন্ধান চালিয়ে

এদিকে গুপ্তযুগের শুশুনিয়া শিলালিপিটি বিষ্ণুপূজার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। গুপ্তযুগের পরে ভারতে আর কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি। বাংলায় এরপর পাল-সেন যুগ। বাঁকুড়ায় পাল-সেন যুগের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব যুগে পুঁথির লিখন ও প্রতিলিখন সর্বভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিল। বিনয় ঘোষ মনে করতেন যদি বঙ্গ সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে তা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধের সন্ধান পান। ১৯৫১-৫২ সালে কাঁসাই উপত্যকার গেরাইকা পাহাড়ের দামদি গ্রামে ডঃ মানিকলাল সিংহ নবাশ্মর কুঠার সংগ্রহ করেন। ১৯৫৪—১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক বি বি লাল বাঁকুড়া জেলার দেজুরি গ্রাম থেকে প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ আবিষ্কার করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে ডঃ মানিকলাল সিংহ মালিয়াড়ার নিকটবর্তী মনোহর গ্রাম থেকে কয়েকটি ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ সংগ্রহ করেন। ১৯৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে ভি ডি কৃষ্ণস্বামীর নেতৃত্বে ভারত পুরাতত্ত্ব বিভাগ বাঁকুড়া জেলার কাঁসাই নদী ও তার উপনদী কুমারী এবং ছাতনা থানার শুশুনিয়া পাহাড়ের চারপাশে অনুসন্ধান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রত্নাশ্মর আয়ুধ আবিষ্কার করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ডি সেনের অধিনায়কত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে দ্বারকেশ্বর নদ উপত্যকা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক প্রত্নাশ্মর আয়ুধ সংগ্রহ করেন। প্রায় সমসময়ে বাঁকুড়া জেলার বনআশুড়িয়া গ্রামে রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি কাটানোর সময় ছটি নবাশ্মর কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তবিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে শুশুনিয়া পাহাড়ের চারপাশ ও গন্ধেশ্বরী নদীর ধার থেকে খোঁড়াখুড়ি করে প্রচুর প্রত্নাশ্মর আয়ুধের আবিষ্কার হয়েছে। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে বাঁকুড়া জেলা সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার আগুইবনী গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েকটি তাম্রাশ্মরীর সংস্কৃতির নিদর্শন। এগুলি সংগ্রহ করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর দেবকুমার চক্রবর্তী। মোটামুটি একই সময়ে গঙ্গাজলঘাটি থানার জামবেদো গ্রামের ভক্তাবাঁধ খননের সময় একটি তাম্রযুগের কুঠার পাওয়া গেছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত শিলাই নদী উপত্যকা থেকে তাম্রযুগের অস্ত্র পাওয়া গেছে।

নানাভাবে নানা সূত্রে পৃথক পৃথক উৎখনন ও অনুসন্ধানের ফলে সমগ্র বাঁকুড়া জেলার যত্রতত্র অসংখ্য প্রত্ননিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে ও তা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত আছে। প্রাগৈতিহাসিক দুর্লভ উপাদানগুলি হল বিভিন্ন ধরনের কৌলাল বা মৃৎপাত্র, প্রত্নাশ্মর ও নবাশ্মর আয়ুধ, বিভিন্ন যুগের টেরাকোটা মৃত্তিকা, মাল্যদানা, মুদ্রা ইত্যাদি। বিভিন্ন অনুসন্ধানে সংগৃহীত উপাদানগুলি যদি এক জায়গায় সমবেত করা যায় ও গভীরভাবে এদের অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আদি প্রস্তরযুগ থেকে শুরু করে মধ্য প্রস্তর, নব্যপ্রস্তর, তাম্রযুগ ও লৌহযুগের সমগ্র কালপর্বগুলিকে ছবির মতো বাঁকুড়া জেলার মাটিতেই পাওয়া যাবে।

প্রস্তরলিপির যুগ থেকে ইতিহাসের কালপর্ব। ছাতনা থানার শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তরদিকের গায়ে যে শিলালিপি তা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের অর্থাৎ গুপ্তযুগের। কোনও এক পুষ্করণাধিপতি সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মাকৃত এই শিলালিপি। এটি সংস্কৃত ভাষায়, কিন্তু ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা। শুশুনিয়ালিপিকে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি মনে করা হয়। এই লিপির সময়কালকে যদি ইতিহাসের কালপর্বের সূচনা ধরা হয় তাহলে সেই যাত্রারম্ভ থেকে একেবারে আধুনিক ভারতের জন্মকালের প্রাক্-মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসের অনুসন্ধান বিচ্ছিন্নভাবে নানা সময়ে নানা জনে করেছেন। বাঁকুড়া জেলায় পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন—জে ডি বেগলার (১৮৭২-৭৩), ডব্লু ডব্লু হান্টার (১৮৭৬), ডি বি স্পুনার (১৯১০), অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৩—৬৮), ডেভিড ম্যাককাচ্চন, (১৯৬৭), তারাপদ সাঁতরা, ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড ঃ মানিকলাল সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত
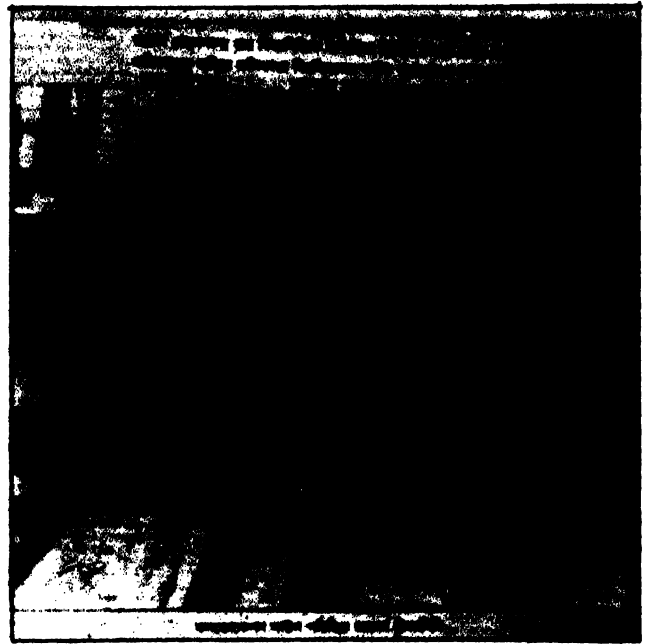
কলকাতার বাইরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে সাম্মানিক ডি. লিট প্রদান।

প্রমুখ। বাঁকুড়া জেলার এই প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালপর্বকে একটি ছোট ফ্রেমে যদি কোনও প্রতিষ্ঠান ধরে রাখার চেষ্টা করছে, তা হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার অমূল্য সংগ্রহশালা আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন। এতাবৎ যা কিছু সংগৃহীত হয়েছে তাকে যদি কালানুক্রমে সাজিয়ে দেখা হয় তাহলে বিস্মিত হতে হবে। যে আদিম মানব সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের কথা বইয়ে পড়া যায় তাকে পাওয়া যাবে। প্রাক্-ইতিহাস ও ইতিহাসের যে স্তরগুলি মানব জাতি অতিক্রম করে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে একেবারে আদি প্রস্তর যুগ থেকে সবকটি এক নজরে পাওয়া যাবে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সম্মুখভাগ

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রসঙ্গ

এক আশ্চর্য যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ ছিলেন যোগেশচন্দ্র। মনীষীদের জীবনের সূত্রপাত হয় একভাবে, শেষ হয় আরেকভাবে। দুকালের প্রান্তভূমির মানুষ ছিলেন যোগেশচন্দ্র। অপরিসীম জ্ঞানপিপাসা আর বুদ্ধির চর্চা ছিল তাঁর সমগ্রজীবনের চালিকাশক্তি। সেই যুগের যে সকল মনীষীগণ পরাধীন মানুষকে জ্ঞানে ও চেতনায় জাগাতে চেয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পুরাতাত্ত্বিক গবেষক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত সঠিকভাবে বলেছেন—আচার্য যোগেশচন্দ্রের বিচিত্র চর্চা আর চিন্তার এবং বহুবিধ কর্মোদ্যোগের ব্যাখ্যা খুঁজতে তাঁর যুগের প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাতে হয়। অষ্টাদশ শতকের এক বিহ্বলতার শেষে বাঙলায় যখন নবযুগের সূচনা হল তখন বঙ্গের বুদ্ধিজীবী মানস নানা দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে একটি সুস্থির আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্ত মাটিতে পদার্পণ করল। পাশ্চাত্যের আলোর হঠাৎ ঝলকানিতে পরবর্তীকালে জাতীয় চিত্র ঝলমল করে উঠলেও প্রথমটা এ আলোর আগুনে বহু পতঙ্গ দগ্ধপক্ষ আহত হয়ে পড়েছিল। যুগসন্ধির প্রবল পরাক্রান্ত কবি মধুসূদনের অঙ্গে এই ক্ষতচিহ্ন দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তাঁর মতো প্রতিভাকে আবর্তে তলিয়ে দিতে না পারলেও যুগসন্ধির দ্বন্দ্বদোলার তরঙ্গ অভিঘাত তাঁকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। কাব্যে জয়মাল্য লাভ করলেও কবিজীবন সহস্র কণ্টকবিদ্ধ। কবির কাব্য আর সাহিত্যে এই কণ্টকজ্বালা সর্বদা উপস্থিত। যাই হোক এ সময় তাবৎ বুদ্ধিজীবী চিত্তে তরুণ গরুড়ের মতো যে দুর্নিবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল—তার তাগিদেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানস দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার তীরে এসে অবতরণ করে। আত্মানুসন্ধানই এই আত্মপ্রত্যয় এনে দেয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে ব্যবহার করে নিজের প্রাচীন ঐতিহ্যকে খুঁজে বের করার চেষ্টাই এ সময় প্রাধান্য লাভ করে। এ সময়ে প্রায় প্রতিটি মনীষী দেশের অতীত ঐতিহ্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হন। নানা পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারও বুদ্ধিজীবী মানসের প্রতিষ্ঠাভূমি সুদৃঢ় করে। প্রাচীন যুগকে নতুন আলোতে উদ্ভাসিত করে বর্তমান যুগের পাদপ্রদীপের সমীপবর্তী করাই মুখ্যত রেনেসাঁ বা নবজন্মের মুখ্য লক্ষণ। তবু এ যুগের এই নবজন্মকে সার্থক বলা হয় না—এ নিয়ে বহু মতান্তর আছে। তবে একথা সত্য, পরাধীন দেশে অশিক্ষা, দারিদ্র্য ইত্যাদির প্রবল বাধা অতিক্রম করে হয়তো স্বাভাবিক নিয়মেই রেনেসাঁ সফল হতে পারেনি—সীমাবদ্ধতা এড়াতে পারেনি। আসল কারণ দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের সঙ্গে তাবৎ জনসমাজের সম্পর্ক মোটেই ছিল না। তাই এপারের প্রচেষ্টা ওপারের বিস্তৃত জনজীবনে কোনও আলোড়ন তুলতে পারেনি। অবশ্য এ পার থেকে প্রচেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এ সময়ের প্রায় সমস্ত মনীষীর ক্রিয়াকর্মে প্রায় সর্বত্র একটা গঠনশীল মনোভাবে সমধিক পরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখনী চালনা করেছেন, উদ্দেশ্য খ্যাতিলাভ বা শিল্পসৃষ্টি মাত্র নয় ব্যাপক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা—মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের শ্রীবৃদ্ধি। দেশের সর্বাত্মক শ্রীবৃদ্ধি যে এতে হয়নি, তা বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছেন। তবে পরাধীনতার প্রতিক্রিয়াজাত একটা জাগরণের তাগিদে দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যেভাবে জাতীয় জীবন নির্মাণে তাঁদের ভূমিকা পালনে অগ্রণী হয়েছিলেন মুখ্যত দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের উদ্ঘাটন করে, তাতে উনবিংশ শতকে বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের অন্তত একাংশে আত্মচেতনার আলোর আভাস দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে আচার্য যোগেশচন্দ্রের আবির্ভাব ; তিনি অবশ্য উনবিংশ-বিংশ দুই যুগেই বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনায় বরাবরই সেই উনবিংশ শতকের প্রোজ্জ্বল আত্মানুসন্ধানের আর জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র আবেগের আভাস পাওয়া যায়।
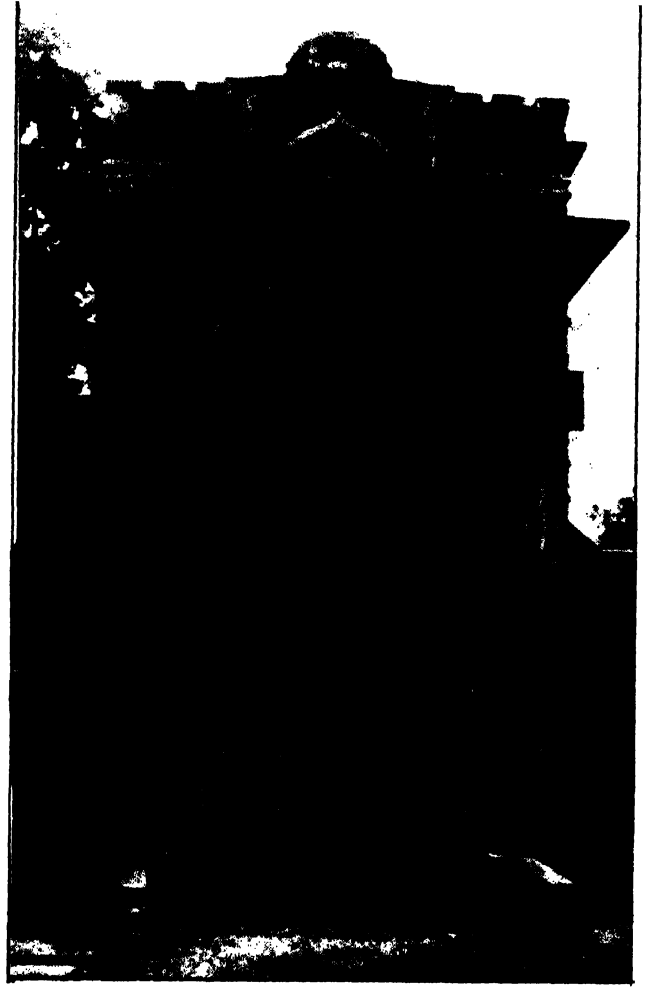
(আচার্য যোগেশচন্দ্র প্রসঙ্গে : চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, এষণা, ১৯৮৫)

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় হুগলি জেলার দিগুড়া গ্রামে ১৮৫৯ সালের ২০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাঁকুড়ার সদরআলা বা সাবজজ ছিলেন। বাল্যে বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে ও জেলা স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ উপাধি লাভ করেন। ওই বছরেই কটক র‍্যাভেনশ কলেজে শিক্ষকতা গ্রহণ করে। প্রায় ৩৫ বছরের বেশি এই কলেজে শিক্ষকতা করার পর ১৯২০ সালে বাঁকুড়ায় ফিরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি শুধু সাহিত্য, সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানচর্চাতেই সীমাবদ্ধ থাকনেনি—শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর 'শিক্ষা প্রকল্প' এবং 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার' নামক পুস্তকে। ওড়িশার পণ্ডিত সমাজ ১৯১০ সালে তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর বাংলা ভাষা সাহিত্য ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯৪০ সালে তিনি 'সরোজিনী বসু' পদক এবং তারপরেই 'জগত্তারিণী' পদক লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত এক সভায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। ১৯৫৫ সালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট (সাম্মানিক) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং পর বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঁকুড়ায় এক বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করে তাঁকে ডি লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৫৪ সাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা যোগেশচন্দ্রের বাসভবনে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং এই দিনই পরিষদ শাখার সংগ্রহশালার নামকরণ হয় 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'। ১৯৫৬ সালে যোগেশচন্দ্র প্রয়াত হন। যোগেশচন্দ্রের প্রধান প্রধান রচনা : আমাদের 'জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী' (১৯১০) 'রত্ন পরীক্ষা' (১৯০৪) ; 'বাঙ্গালা ভাষা' (২ খণ্ড বাঙ্গালা শব্দকোষ) ১৯০৮-১৯১৫ ; 'এনসেইন্ট ইন্ডিয়ান লাইফ' ১৯৪৮ ; 'শিক্ষা প্রকল্প' ১৯৪৮ ; 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার' ১৯৫০ ; 'পূজা-পার্বণ' ১৯৫১ ; 'কোন পথে' ১৯৫৩ ; 'পৌরাণিক উপন্যাস' ১৯৫৫ ; 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল', 'কি লিখি' ১৯৫৬।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের অভ্যন্তর দৃশ্য

বিদ্যানিধির সংগ্রহালয় ভাবনা :

আচার্য যোগেশচন্দ্র বাঁকুড়ার বিদ্বৎ সমাজের কাছে ছিলেন গুরুর আসনে। তৎকালে বাঁকুড়ার তাবৎ লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন আচার্য তাঁদের সকলকেই উদ্বুদ্ধ করেছেন নিজের জেলার অতীতকে জানার, প্রাচীন ইতিহাস জানার অনুশীলন করতে। প্রাচীন ঐতিহ্যগুলিকে জানতে ও তাকে সংরক্ষণ করতে। বলতে গেলে তৎকালে জন-উদ্যোগে সংগ্রহশালার প্রেরণাটির তিনিই সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—'প্রত্যেকে জেলাতেই পুরাবৃত্তের উপকরণ আছে। প্রত্যেক জেলাতেই উপকরণ সংগ্রহ ও রক্ষা, নূতন উপকরণ অন্বেষণ ও বিনিয়োগ নিমিত্ত যে নামেই হউক এক সমিতি স্থাপন কর্তব্য। কয়েক বৎসর পূর্বে কে জানিত দামোদরের দক্ষিণে মহানদ নামক স্থানে পুরাকৃতি পাওয়া যাইবে ? এক এক দিন যাইতেছে, কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু নষ্ট হইতেছে। পুরাকৃতির মূল্য নাই। আর, যে মানুষ তাহার বাসভূমির বর্তমান ও অতীত দশা স্মরণ না করে, সে অন্ধ থাকিয়া কাল কাটায়। স্বদেশের জ্ঞান নিমিত্ত আর কতকাল বিদেশির কৌতূহলের প্রতীক্ষায় থাকিবেন ? যে দেশ নূতন নূতন ধন উপার্জন করে, সে দেশ ধন্য। আর, যে দেশ পৈতৃক ধন রক্ষা করিতে উদাসীন, সে কিসের গৌরব করিবে ? বাঁকুড়ায় যত প্রকারের যত উপকরণ আছে, রাঢ়ের অন্য কোনও জেলাতে তত নাই।'

(বাঁকুড়া পুরাকৃতি রক্ষা-শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়)

বাঁকুড়ার সারস্বত সমাজে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল আচার্যের অনুযোজনায় বাংলা ১৩৪১ সালের মাঘ মাসে, পরে ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাকে সমর্থন করে লেখেন—

'অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঁকুড়া জেলার পুরাকৃতি অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি, ধাতুমূর্তি, শিলা বা ধাতুর তৈরি অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁকুড়া শহরে একটি মিউজিয়ম্ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যার অন্যত্র মুদ্রিত হইল। আমরা তাঁহার প্রস্তাবটির সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি যে সকল প্রাচীন জিনিস রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা একবার নষ্ট হইলে বা বাঁকুড়া হইতে অন্যত্র অপসৃত হইলে আর পাওয়া যাইবে না, অথচ সেগুলি বাঁকুড়া জেলার অমূল্য সম্পদ। প্রবাসীর পাঠকগণ বিক্রমপুরের একটি গ্রাম আড়িয়ালের মিউজিয়ামটি সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ও করিতে পারেন ; একটি

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের অন্তর্বিভাগ

গ্রামে যাহা হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে এবং যাহা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহা একটি শহরে নিশ্চয়ই হওয়া উচিত ও হওয়া সম্ভবপর। ২৫০০০ টাকা কিছু বেশি নয়। বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী এবং বাঁকুড়ায় যাঁহাদের জন্ম কিন্তু অন্যত্র বাস করিতেছেন, এরূপ অনেক লোক আছেন। যাঁহারা এই টাকা দিতে পারেন। যাঁহারা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন নহেন, তাঁহারাও যথাসাধ্য দান করিলে ন্যূনকল্পে দান সংগ্রহ করিয়া দিলে, এই কাজটি হইতে পারে।'

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি। জন্মলগ্ন থেকেই বাঁকুড়া জেলার বিদ্বৎ সমাজের যে উজ্জ্বল তারকারা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সত্যকিংকর সাহানা বিদ্যাবিনোদ, ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামশরণ ঘোষ, হেমেন্দ্রনাথ পালিত, গঙ্গাগোবিন্দ রায় প্রমুখ। গঙ্গাগোবিন্দ রায় প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় সহ এঁদের সকলেই তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলি এই সংগ্রহশালায় দান করেন। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে এর সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হন মানিকলাল সিংহ।

সংগ্রহশালা :

সংগ্রহশালাটির পেছনে অবদান অনেকের। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শশাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রাহা, রজনীকান্ত নিয়োগী, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ, বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইত্যাদি। এ এল ডায়াস পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থাকাকালীন ৫০০০ টাকা অর্থ সাহায্য করেছিলেন। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০,০০০ টাকা গৃহনির্মাণের জন্য ও পরে ক্যাটালগ নির্মাণের জন্য ১০,০০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেছিলেন। বাঁকুড়া জেলা পরিষদ এ পর্যন্ত ৫০,০০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। যে সমস্ত সুধী ব্যক্তি এই সংগ্রহশালা ঘুরে গেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি কালিদাস রায়, অনুরূপা দেবী, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক নির্মল বসু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ প্রমুখ। ১৯৭৫ সালে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষদ শাখার ভবনের (যেটিই মূল সংগ্রহশালা) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন বক্তৃতামালায় এ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ রতন জনকর। এছাড়াও যাঁদের সহযোগিতা ও পরামর্শে এই সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হলেন—বিনয় ঘোষ, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, ডেভিড ম্যাককাচ্চন, তারাপদ সাঁতরা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সবকিছুর ওপর আছে এই জেলার মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। বিষ্ণুপুরের অধিবাসী কেনারাম ভট্টাচার্য ও তাঁর ভাইয়েরা স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য ১০ কাঠা জমি দান করেন ১৯৫৪ সালে। ১৯৬০ সালে সেই জমিতে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের তদানীন্তন মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর।

এত স্বচ্ছ মানুষের স্পর্শে যে সংগ্রহশালা তৈরি হয়েছে তিল-তিল করে সেটি কিন্তু তার সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যেও সমৃদ্ধ। বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্রেককারী বহু দুর্লভ বস্তু এখানে সংরক্ষিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের চিত্রিত

ছাপকাটা আঁচড়কাটা মৃৎ কৌলাল, বিভিন্ন যুগের টেরাকোটা মাতৃকা ও যক্ষী মূর্তিকা, শিলীভূত হরিণের শিং, কাকিনী কার্ষাপণ মুদ্রা, উপরত্নের মাল্যদানা, প্রস্তর যুগের বিভিন্ন আয়ুধ প্রভৃতি। মুদ্রাগুলি ডিহর থেকে প্রাপ্ত এবং সেগুলি মৌর্যশুঙ্গ যুগের। কিছু কৌলাল সংগৃহীত হয়েছে তমলুক থেকে, কিছু পুরুলিয়া জেলায় কুমারী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে। নবাশ্মর আয়ুধগুলি সংগৃহীত হয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্থান ও মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে। মোট কয়েকশত মুদ্রার মধ্যে মৌর্যশুঙ্গ যুগের মুদ্রা ছাড়াও আছে সুলতানি মুঘল ও ব্রিটিশ যুগের। আদিল শাহ, শের শাহ, শাহ আলম, ইব্রাহিম শাহ, নাসিরুদ্দিন, শাজাহান, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজেবের সময়ের মুদ্রা সংগৃহীত আছে।

কয়েকটি প্রস্তরলিপি আছে যেগুলি মল্ল রাজত্বকালের। এছাড়া আছে কতকগুলি পোড়ামাটির লিপি ফলক। সংগ্রহশালার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হল পুঁথির। অন্তত সাত হাজার বাংলা, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পুঁথি রয়েছে। সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির সংখ্যাই বেশি, প্রাকৃত যৎসামান্য। সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতের বিখ্যাত কাব্য, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ ইত্যাদির অসংখ্য প্রতিলিপি আছে। আয়ুর্বেদের সংগ্রহ বিশেষ মূল্যবান। এর মধ্যে চরক বা চক্রপাণি দত্ত, বিজয় রক্ষিত, মাধব কর, নিশ্চল কর প্রমুখ বিখ্যাত আয়ুর্বেদাচার্যের গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে। গ্রন্থের মধ্যে মৃতমঞ্জরী রুগ্বিনিশ্চয় দ্রব্য-প্রদীপ, চরকের চিকিৎসা স্থান, সূত্রস্থান, শরীর স্থান। এছাড়া যোগামৃত্ত টিকা, দ্রব্যভাষা টীকা, প্রভৃতি টীকাগন্থ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পুঁথির মধ্যে হংস দূত, গোবিন্দরতি মঞ্জরি, গীতগোবিন্দ, দানকেলি-কৌমুদি, বিদগ্ধ মাধব, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, ললিত মাধব, ভক্তমাল উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রতিলিপি পুঁথির সংখ্যাই পঁয়ষট্টি। এছাড়া আছে রাগ-রাগিণীর পুঁথি জ্যোতিষ শাস্ত্র, তন্ত্রমন্ত্র, জড়িবুটি ইত্যাদি। বেশির ভাগ পুঁথির লিখন বা পুনর্লিখন অন্তত দুশো থেকে আড়াইশো বছর পূর্বের। পুঁথির সঙ্গে রয়েছে, পুঁথির মলাট অসংখ্য পাটাচিত্র। এগুলি পুঁথির প্রচ্ছদপট। এগুলি সরু পাটার ওপর হয় কাপড় সেঁটে আঁকা অথবা সরাসরি রং দিয়ে পাটার ওপর আঁকা। বেশির ভাগ ছবি রাধাকৃষ্ণের লীলা অথবা চৈতন্যলীলা নিয়ে। চিত্রিত পুঁথির পাতার মতো অসংখ্য না হলেও পটের একটি আকর্ষণীয় সংগ্রহ রয়েছে। হিন্দু দেবদেবী ও লোককথার পট ছাড়াও আদিবাসী শিকার এবং নৃত্যসংবলিত কিছু পটচিত্র আছে। বাঁকুড়া সহ প্রায় গোটা বাংলাদেশেই একসময় পটচিত্র তৈরি হতো। পটশিল্প প্রাচীন। অনেকে মনে করেন হরপ্পার যুগেও পটশিল্প ছিল। সংগ্রহশালার আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগ্রহ গোলাকৃতি দশাবতার তাস। বিষ্ণুর দশ অবতারকে কেন্দ্র করে এই খেলা। মল্ল রাজাদের গৌরবময় কোনও অধ্যায়ে এই খেলার প্রবর্তন হয় মল্লভূমে। এসবের পাশাপাশি পুরাকৃতি ভবনে প্রস্তরমূর্তির সংগ্রহ বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইতিহাসের বিস্তৃত সময়কালকে ধরে রেখেছে প্রস্তরমূর্তিগুলি। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, জৈন সব ধরনের মূর্তির নিদর্শনই রয়েছে। অধিকাংশই এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ। বরেন্দ্রভূমের মসৃণ কারুকার্যময় কালো পাথরের মূর্তিগুলির সঙ্গে এস মূর্তিগুলির পার্থক্য রয়েছে। রাঢ়ের এই মূর্তিগুলি অধিকাংশই ধূসর বেলেপাথরে নির্মিত আপাত কর্কশ এবং ঈষৎ রুক্ষ ও অপেক্ষাকৃত গুরুভার। তবে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যে আকর্ষণীয়। বাঁকুড়া জেলার থেকে সংগৃহীত একটি ত্রিভঙ্গ সূর্যমূর্তি ও একটি অনন্ত শয়ান বিষ্ণুমূর্তি খুবই দুর্লভ সংগ্রহ বলে মনে করা হয়। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূর্তি অপেক্ষা জৈনমূর্তির সংখ্যা অনেক বেশি ও অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ। নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ, আদিনাথ, শান্তিনাথ প্রমুখ জৈন তীর্থঙ্করদের ছোট-বড় অসংখ্য মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। মূর্তিগুলি খ্রিস্টীয় দশম শতকের মধ্যেকার বলে ধারণা।

এগুলি ছাড়া যে সব সংগ্রহ আছে তা হল ঢোকরাশিল্প, পোড়ামাটির বিভিন্ন মন্দির ফলক ও চিত্র। মধ্যযুগের অস্ত্রশস্ত্র যেমন ঢাল, তলোয়ার, কামানের গোলা, পোড়ামাটির গুলি, কিরিচ ইত্যাদি। আরও রয়েছে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানার বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের প্রতিকৃতি, তাঁদের ব্যবহৃত সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি ও তাঁদের পারিবারিক চিত্র।

ডঃ মানিকলাল সিংহ তাঁর পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীতে যে সময় আদিম মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় একেবারে সেই যুগ থেকে অর্থাৎ আদি প্লিস্টোসিন যুগের প্রথম আন্তঃ হিমবাহ যুগ থেকেই বাঁকুড়া অর্থাৎ এই মধ্য রাঢ়েও আদি প্রস্তাশ্মর সংস্কৃতির সূত্রপাত। যদিও তিনি এ কথা মনে করেন যে এখানে আদি প্রস্তাশ্মর যুগে আদিম মানবের বসতিও কম ছিল এবং লোকসংখ্যাও কম ছিল। এ অঞ্চলে সংস্কৃতির বিকাশ
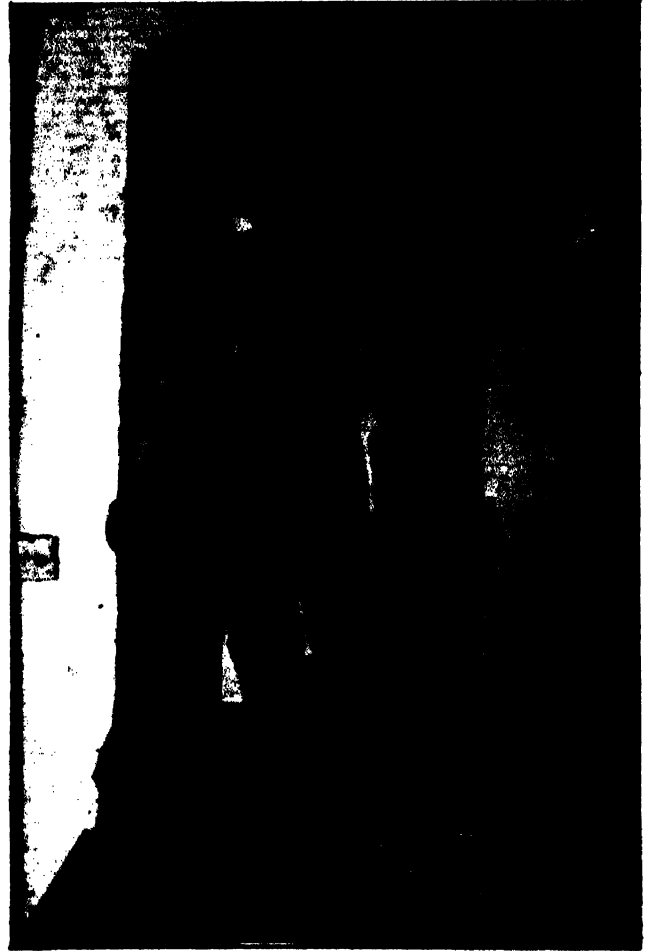
পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত দশম-একাদশ শতাব্দীর সূর্যদেবতা

প্রাগৈতিহাসিক দুর্লভ উপাদানগুলি হল বিভিন্ন ধরনের কৌলাল বা মৃৎপাত্র, প্রত্নাশ্মর ও নবাশ্মর আয়ুধ, বিভিন্ন যুগের টেরাকোটা মৃত্তিকা, মাল্যদানা, মুদ্রা ইত্যাদি। বিভিন্ন অনুসন্ধানে সংগৃহীত উপাদানগুলি যদি এক জায়গায় সমবেত করা যায় ও গভীরভাবে এদের অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আদি প্রস্তরযুগ থেকে শুরু করে মধ্য প্রস্তর, নব্যপ্রস্তর, তাম্রযুগ ও লৌহযুগের সমগ্র কালপর্বগুলিকে ছবির মতো বাঁকুড়া জেলার মাটিতেই পাওয়া যাবে।

ঘটেছিল শেষ প্লিস্টোসিন পর্বের মধ্য ও শেষ প্রত্নাশ্মর যুগে। তাঁর মতে বিষ্ণুপুরের চার কিমি উত্তরে ডিহর নামক স্থানে খননকার্য করে দেখা গেছে যে শুশুনিয়া পরিমণ্ডলের মতো নবাশ্মর আয়ুধ। এর থেকে অনুমান যে ওই যুগের মানুষ অধিক ফসলের আশায় শুশুনিয়া পরিমণ্ডল থেকে গন্ধেশ্বরীর নদী প্রবাহ ধরে নেমে এসে ডিহরে বসতি স্থাপন করেছিল। তাঁর মতে ডিহরে অনুসন্ধান চালিয়ে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কালপর্বের চিহ্ন পাওয়া গেছে। যেমন পাওয়া গেছে নবাশ্মর আয়ুধ, তেমনি পাওয়া গেছে হরপ্পার মতো কৃষ্ণ ও লোহিত কৌলাল। এছাড়া আছে বিভিন্ন উপরত্নের অসংখ্য পলকাটা মাল্যদানা। মাল্যদানাগুলির সঙ্গে উজ্জয়িনীতে আবিষ্কৃত মাল্যদানার সাদৃশ্য আছে। ডিহরে এছাড়া আবিষ্কৃত হয়েছে মোর্যশুঙ্গ আমলের মুদ্রা। ডিহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর ও গন্ধেশ্বরীর মিলন ঘটেছে। এর প্রবাহ তমলুক পর্যন্ত গেছে। ডিহরের নিকট বর্তমান মজা খাতটির পাশে গ্রামগুলির মাঝ দিয়ে একটি স্থলপথ যুগ যুগ ধরে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই পথের অনেকখানি এখন নদীগর্ভে। তবু ডিহর সংলগ্ন ঠাকুরপুর, গহিরহাটি, জয়কৃষ্ণপুর, ধরাপাট, অযোধ্যা, নিশ্চিন্তপুর, ওলা, সাপুর, রাজহাট, বীরসিংহপুরের মধ্যে দিয়ে একটি রাস্তা বাঁকুড়া শহরের রানীগঞ্জের মোড় হয়ে বিহারের মুঙ্গের, রাজগীর, নালন্দা এবং বুদ্ধগয়ার সংযুক্ত ছিল। এ রাস্তাই পূর্বদিকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু হয় বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের রাজত্ব। আদিমল্লের কাল ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ (মল্লাব্দ-১)। শেষ মল্লরাজা চৈতন্য সিংহ ১৭৪৮ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ। মল্ল রাজত্বে একটি বড় সময়কাল ধরে ছিল বিষ্ণুপুর তথা মল্ল রাজ্যসীমায় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও ব্যাপ্তির কাল। শ্রীনিবাস আচার্য হয়ে ওঠেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রাণপুরুষ। মল্লরাজা বীর হাম্বির বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর ভক্তিরসে প্লাবিত হয়ে যায় মল্ল রাজত্বের তৎকালীন বিস্তীর্ণ এলাকা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতচর্চা, আহার-বিহার সর্বত্র নতুন রুচি ও পরিমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়।

রাঢ়ের দর্পণ :

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সংগ্রহশালা থেকে মোটামুটি এইভাবেই বেরিয়ে আসে পশ্চিমরাঢ়ের মানুষের অতীত ইতিহাসের এক প্রামাণ্য চিত্র। আজীবন অনুসন্ধানী ও গবেষক, সংগ্রহশালার জন্য নিবেদিতপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের মতে—বাঁকুড়ায় একদিকে যেমন বঙ্গ সংস্কৃতির আদিম রূপটি ধরা পড়ে, সে রূপটি যে শুধু প্রস্তর আয়ুধেরই তা নয়, এখানে আদিবাসী মানুষের বহু জীবন্ত উৎসবের মধ্যে সেই আদিম শিকারি ও পশুপালক জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখা যায়। কৃষি যুগের স্মারক আদিম যুগ থেকে আসা তুসু পার্বণ দেখা যায়। অন্যদিকে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্তযুগে প্রসারিত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাও এই মাটিতে রয়ে গেছে। এটা শুধু অনুমান নয়। পখন্না থেকে প্রাপ্ত মৌর্য শুঙ্গ যুগে যক্ষী মূর্তি, ডিহর থেকে প্রাপ্ত যক্ষী মূর্তি ও ছাপকাটা মুদ্রা এই সত্য প্রমাণ করে। তাছাড়া জে ডি বেগলার বহুপূর্বেই তাম্রলিপ্ত থেকে পাটলিপুত্র যে রাস্তাটির কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেটি বাঁকুড়ার ওপর দিয়ে গেছে। অতএব মনে করা যেতে পারে এই মহাপথ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ডিহরের যে সভ্যতাকে হরপ্পার সমসাময়িক পরবর্তীকালে বলে মনে করা হয় তার সঙ্গে সংঘাত ও মিলন ঘটেছে উত্তর ভারত থেকে আগত আর্য সভ্যতার। পখন্না থেকে যে যক্ষী মূর্তিটি পাওয়া গেছে সেটি বর্তমানে বেশ কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও আকার অবয়ব বা গঠন ভঙ্গিমায় সেটি উত্তর ভারতের যক্ষী মূর্তির সমগোত্রীয় বলে সরসীকুমার সরস্বতী মনে করেছেন। এদিকে গুপ্তযুগের শুশুনিয়া শিলালিপিটি বিষ্ণুপূজার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। গুপ্তযুগের পরে ভারতে আর কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি। বাংলায় এরপর পাল-সেন যুগ। বাঁকুড়ায় পাল-সেন যুগের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব যুগে পুঁথির লিখন ও প্রতিলিখন সর্বভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিল। বিনয় ঘোষ মনে করতেন যদি বঙ্গ সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে তা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। আর্য-অনার্য স্থানীয় ও সর্বভারতীয় দুধারার অভূতপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে এই রাঢ় ভূমিতে। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সেই রাঢ়েরই দর্পণ।

সূত্র :

১। পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি—মানিকলাল সিংহ। প্রকাশক—চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা, বাঁকুড়া।

২। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন পরিচিতি ও বর্ণনামূলক তালিকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : বিষ্ণুপুর শাখা।

৩। এষণা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার মুখপাত্র—প্রথম সংখ্যা ১৯৮৫

৪। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব—নীহাররঞ্জন রায়, কৃতজ্ঞতা : চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।

লেখক : সম্পাদক, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বাঁকুড়া জেলা শাখা, প্রাবন্ধিক।

বাঁকুড়া জেলার নাট্যচর্চার একাল ও সেকাল

অনাদি বসু

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ধারাপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে বাঁকুড়া জেলা শহরের নাট্যপ্রবাহও বিভিন্ন যুগের বেলাভূমি স্পর্শ করে বয়ে চলেছে। বাঁকুড়ার নাট্যপ্রবাহ কখনও হয়েছে উত্তাল আবার কখনও বা ভাটার টানে নিস্তরঙ্গ হলেও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। থেমে যায়নি।

চির দুঃখ দারিদ্র্য ও খরা কবলিত এই বাঁকুড়া। এর কংকরময় মাটিতে আছে রুক্ষতা আকাশে বাতাসে আছে নীরসতার অবসাদ। তবু তারই মাঝে বাঁকুড়ার কৃতী শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ও নাট্য শিল্পীরা তাঁদের অবদানের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক সাগরে জোয়ার এনেছেন। মাঝে মাঝে ভাটা পড়লেও তার প্রভাব কিন্তু খর্ব হয়নি। এই মাটিতেই জন্মেছেন প্রাচীনতম বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, জন্মেছেন রমাই পণ্ডিত, শুভংকর, জগন্নাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বসন্তরঞ্জন রায়ের মতো মনীষী। জন্মেছেন যামিনী রায় ও রামকিংকর বেজের মতো চিত্রকর ও ভাস্কর। জন্মেছেন সঙ্গীতাচার্য যদুভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর মতো দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ। সাহিত্যিক ও নাট্যকার শক্তিপদ রাজগুরু, চিত্র ও নাট্যশিল্পী রাধামোহন ভট্টাচার্য ও চিত্র পরিচালক শক্তি সামন্তর জন্মও এই বাঁকুড়া জেলায়। 'নরনারায়ণ' ও 'আলিবাবা' রচয়িতা নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দীর্ঘকাল যোগাযোগ এই জেলার কংকরময় লাল মাটির সঙ্গে।

পশ্চিম রাঢ়ের খরা অধ্যুষিত বাংলার শাল মহুয়ার উচ্চাচ্চভূমি গঠনের প্রান্তিক জেলা বাঁকুড়ার সঙ্গে এখন বৃহত্তর বাংলার ও বিশ্বের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। এখানে নাট্যপ্রেমী মানুষেরা জেলাবাসীকে দিয়েছেন এবং দিয়ে চলেছেন নাটকীয় আনন্দ। এখানে মানুষের জীবনযুদ্ধ, ভাবনাচিন্তা, অতীত ঐতিহ্য চারণা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধ, বর্তমান বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যপন্থা নির্দেশন মঞ্চে মঞ্চে অভিনীত নাট্যধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানের নাটক শুধু প্রমোদের উপকরণ মাত্র নয়, মনন চিন্তনেরও দলিল হতে পেরেছে। বিশেষ গোষ্ঠী এখানে কথা বলেছে, বিশেষ ব্যক্তি এখানে কথা বলেছে এবং সেই ভাবেই এ জেলার নাটক বহমান প্রাণোত্তাপের স্বাক্ষর বহন করেছে। একটি জীবন্ত জনপদের বাক্‌প্রতিমা হয়ে উঠতে পেরেছে এ জেলার নাট্যচর্চা।

বাঁকুড়া শহর থেকে বিষ্ণুপুর শহর প্রাচীনত্বের দাবি করে। ইতিহাসের নিরিখে বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি মল্লেশ্বর ভট্টাচার্যদের পারিবারিক থিয়েটারই সম্ভবত এ জেলার মধ্যে প্রাচীনতম অভিনীত থিয়েটার। ১৯১৬ সালে কাদাকুলি মল্লেশ্বর পাড়ায় চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দুটি একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়। এই দুটি একাঙ্কের একটি ব্যঙ্গ নাটক নাম "ডিসমিস" অন্যটি "ঠাকুরদাদার সংসার" নামে একটি প্রহসন। এই সব নাটকের অভিনয় হত দুর্গাপূজোর সময়। এর ধারাবাহিকতা বংশপরম্পরায় বজায় রেখেছিলেন বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্য পরিবার। প্রখ্যাত নাট্য ও চিত্রাভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য এই পরিবারের সন্তান। এই পারিবারিক মঞ্চে তাঁর অভিনীত শেষ নাটক "চন্দ্রনাথ"। বর্তমানে এই পারিবারিক মঞ্চ অবলুপ্ত। অতীতের আর একটি ঐতিহ্যপূর্ণ পারিবারিক থিয়েটার বিষ্ণুপুরের বসু পরিবারের পারিবারিক থিয়েটার বসুপাড়ার "বসুপাড়া ড্রামাটিক ইউনিয়ন" তৎকালীন নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এঁদের নিজস্ব মঞ্চ ও মঞ্চ উপকরণও ছিল। এঁদের অভিনীত "কর্ণার্জুন" "দুর্গাদাস" "জনা" ও "রিজিয়া" আজও সেকালের স্মরণীয় নাট্যাভিনয়। এই শতকের গোড়ার দিকে বিষ্ণুপুর শহরের কিছু সংস্কৃতিবান মানুষ ও তৎকালীন কিছু সরকারি আমলাদের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আরও একটি সাধারণ নাটমঞ্চের
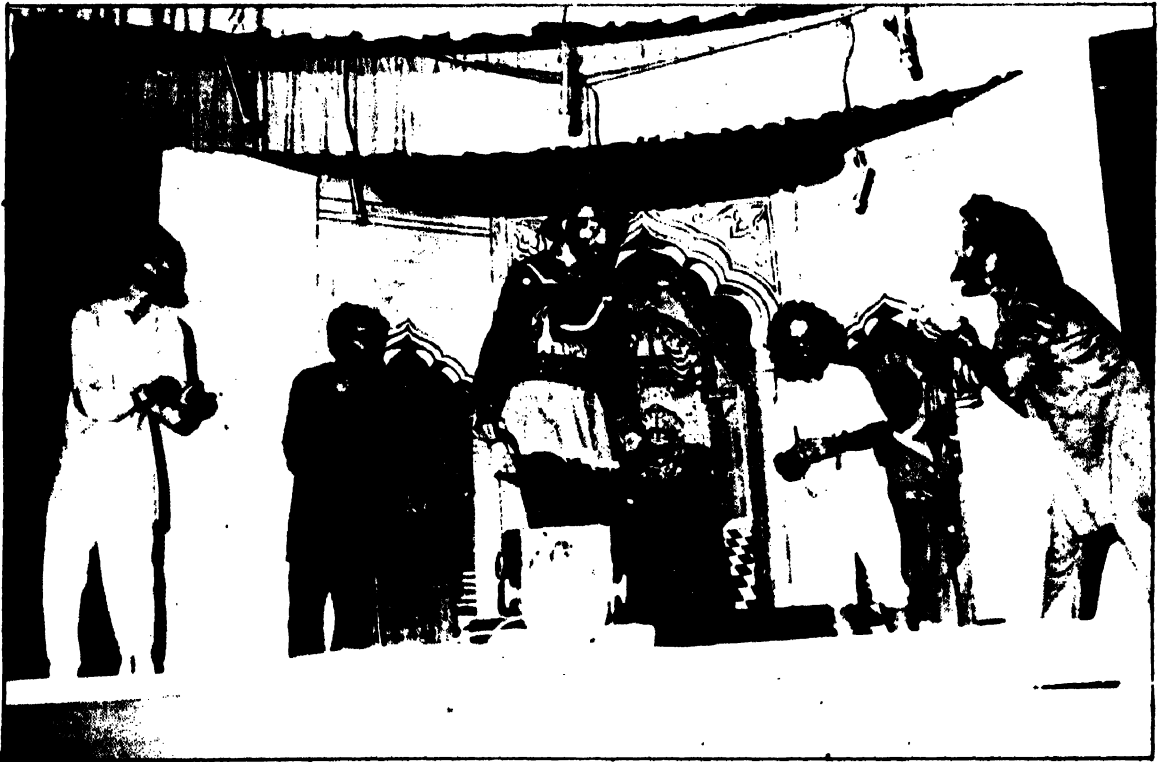
বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ প্রযোজিত 'এবার রাজার পালা'র একটি দৃশ্য

বাঁকুড়া রবীন্দ্রভবনে অষ্টাদের একটি নাট্যপ্রযোজনা শিল্পতীর্থের 'আনন্দ'র দৃশ্য।

পরিচয় পাওয়া যায় যার নাম "মোহনবক্ত থিয়েটার"। যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিষ্ণুপুরের স্বনামধন্য শিক্ষক রাখালচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের পিতা ডাঃ জগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়। প্রয়াত রাখালচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে বিষ্ণুপুর রবীন্দ্র সংসদ আয়োজিত 'রাখাল স্মৃতি একাঙ্ক' নাটক প্রতিযোগিতা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। নাট্যমঞ্চ 'মোহনবক্ত'-এর অবলুপ্তির পর তার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছিল বিষ্ণুপুর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, সুহৃদ সংঘ, ত্রিধারা, শিল্পীগোষ্ঠী ও অফিসেস ক্লাব। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র সংসদ সুভাষ নাট্য সংস্থা, কোরাস, রামধনু সংঘ, রূপক প্রগ্রেসিভ থিয়েটার ইউনিট, ইয়ং ইন্ডিয়া নাট্য সংস্থা রাধানগর, পল্লীজাগরণ গোষ্ঠী কতুলপুর, উদয়ন ও গণনাট্য সংঘ বিষ্ণুপুরের নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। ষাটের দশক থেকে বিষ্ণুপুরের নাট্যচর্চায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ১৯৭৭ থেকে বিষ্ণুপুরের নাট্যচর্চা নাট্যান্দোলনের আকার নেয়। রাজনৈতিক সামাজিক দায়িত্ববোধ, সমাজ সচেতনতা ও সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার প্রচার ও প্রসারে এখানকার নাট্যকর্মীরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায়। বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতা ও প্রগতিশীল নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত বিত্তশালী পরিবার এবং রাজ উপাধিধারী জমিদাররাই ছিলেন সে সময়ের থিয়েটারের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা ছাড়াও সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, ছাতনা, মালিয়াড়া, সাহারজোড়া, কুচিয়াকোল, অম্বিকানগর ইত্যাদি এলাকায় এ ধরনের জমিদার ছিলেন। ফলে সে সব জায়গায় সে সময় যাত্রা থিয়েটারের চলন ছিল বেশি। এইসব জমিদারদের মধ্যে ভেলাইডিহার রাজা ছিলেন থিয়েটার পাগল। সেখানে রীতিমত একটি স্থায়ী মঞ্চ ছিল ও নিয়মিত বিশেষ করে পূজা পার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন নাটক অভিনীত হত। ঠিক একইভাবে মালিয়াড়ায় থিয়েটার অভিনয়ের যে ধারা প্রবাহ বইতো তার গতি উপেক্ষণীয় নয়। বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের বাবা মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সে সময়ের একজন উঁচুদরের নাট্য পরিচালক। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ দিকপাল নট ও নাট্যকারেরা ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একবার এখানকার মঞ্চাভিনয়ে অতিথি শিল্পী হিসেবে অহীন্দ্র চৌধুরী ও নরেশ মিত্র মালিয়াড়ায় এসেছিলেন।

এ জেলার ছাতনা এককালের সামন্তভূমি। ব্রিটিশ শাসনাধীনে মালিয়াড়ার মতো ছাতনাতেও রাজা উপাধিধারী জমিদারেরা থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানে তখন যাত্রা থিয়েটারের ব্যাপক প্রচলন ঘটে তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রয়াত সনাতন দেওঘরিয়া নাট্যকার পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ছাতনার জোড়হিরো অঞ্চলের প্রয়াত শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ত্রিগুণা সিংহদেও এর ঐতিহ্য ধরে রাখতে সচেষ্ট হন। এরপর ১৯৮০ থেকে ছাতনার নাট্যচর্চা এক ভিন্ন মাত্রা পায়। যুগবিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়ের জন্য সৃষ্টি হল ছাতনার রিক্রিয়েশন ক্লাব। নিয়মিতভাবে কৃতিত্বের সঙ্গে এঁরা নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন ও

প্রধানত বিত্তশালী পরিবার এবং রাজ উপাধিধারী জমিদাররাই ছিলেন সে সময়ের থিয়েটারের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা ছাড়াও সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, ছাতনা, মালিয়াড়া, সাহারজোড়া, কুচিয়াকোল, অম্বিকানগর ইত্যাদি এলাকায় এ ধরনের জমিদার ছিলেন। ফলে সে সব জায়গায় সে সময় যাত্রা থিয়েটারের চলন ছিল বেশি। এইসব জমিদারদের মধ্যে ভেলাইডিহার রাজা ছিলেন থিয়েটার পাগল। সেখানে রীতিমত একটি স্থায়ী মঞ্চ ছিল ও নিয়মিত বিশেষ করে পূজা পার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন নাটক অভিনীত হত।

পরিচালনা করেন যার ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ন আছে। ছাতনার কাছে ঝাঁটিপাহাড়ী। সেখানেও নাট্যচর্চার প্রবণতা লক্ষণীয়। এখানে প্রতি বৎসর ঝাঁটিপাহাড়ী ফুটবল অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় নিয়মিত মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা জেলার নাট্য উন্নয়নে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে যা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এছাড়া বেলিয়াতোড়ের নাট্য সমিতি, যুব গোষ্ঠী ও শিল্পী সংসদ, বড়জোড়ার উদয়ন ও আগামী, খাতড়ার কোরক ও সপ্তর্ষি, ওন্দার ইউথ কালচারাল ফোরাম, গঙ্গাজলঘাটির সবুজ সংঘ, সোনামুখীর নবারুণ, দৌবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং ভাদুলের স্পোর্টিং ক্লাব বিশেষ ভূমিকা নিয়ে বাঁকুড়া জেলার নাট্য ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সচেষ্ট। বাঁকুড়া খুব পুরনো শহর নয়। প্রায় একশ দশ-পনের বছরের এই শহর এখন জেলা শহররূপে বিখ্যাত। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ধারা প্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে বাঁকুড়া জেলা শহরের নাট্য প্রবাহও। বিভিন্ন যুগের বেলাভূমি স্পর্শ করে বয়ে চলেছে। বাঁকুড়ার নাট্যপ্রবাহ কখনও হয়েছে উত্তাল আবার কখনও বা ভাটার টানে নিস্তরঙ্গ হলেও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে। থেমে যায়নি।

বাঁকুড়াতে নাট্যচর্চা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। এখানকার প্রাচীনতম নাট্য সংস্থা "রামপুর ড্রামাটিক ইউনিয়ন"। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রয়াত ভোলানাথ রায় ডাঃ ফণীভূষণ দে মহাশয়। এঁদের বিখ্যাত নাটক "নূরজাহান", "হরিরাজ" ও "বঙ্গে বর্গী"। এঁদের সমসাময়িক "অরোরা ক্লাব"। ১৯১৯ সালে বাঁকুড়া শহরের বুকে এই নাট্যসংস্থাটি গড়ে ওঠে। আইনজীবী যামিনী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এঁরা অভিনয় করেন "মিশর কুমারী"। এরপর বিভিন্ন মঞ্চায়নের মাধ্যমে এঁরা অভিনয় করেন দীনবন্ধু, গিরিশ, শিশির ও অহীন্দ্র যুগের বিভিন্ন কালজয়ী নাটক। সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপনা করেন জলধর চট্টোপাধ্যায়, অপরেশ, মন্মথ রায় ও ডি এল রায়ের নাটকও। সে সময় প্রধানত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকই অভিনীত হত। মঞ্চায়নের জন্য উপযুক্ত কোনো স্থান না থাকায় কখনো বা স্থানীয় সিনেমা হলে বা উপযুক্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বা দুর্গামণ্ডপের সামনে মাচা বেঁধে অভিনয় হত। সে সময় বাঁকুড়ার নাট্যাভিনয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরীশ ঘোষ, দানীবাবু ও অমৃতলালেরও প্রভাব দেখা যায়। বাঁকুড়ার অতীতের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রয়াত যামিনী চট্টোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম অবিস্মরণীয়। যামিনীবাবু ছিলেন দক্ষ নট ও পরিচালক। তাঁর অভিনীত মিশরকুমারী নাটকে আবন্-এর ভূমিকা বাঁকুড়ার নাট্য ইতিহাসে এখনও উজ্জ্বল। ভূদেববাবু ছিলেন সেকালের একজন দক্ষ নট। তাঁর অভিনীত গৃহলক্ষ্মী, পরপারে, কারাগার, রাণাপ্রতাপ, সাবিত্রী ও সরমা উল্লেখযোগ্য। ভূদেববাবু এমনি এক লড়াকু নাট্য ব্যক্তিত্ব যিনি সর্বপ্রথম বাঁকুড়ার নাটকে মহিলা চরিত্রে মহিলা শিল্পী নিয়ে অভিনয় করার দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন যা সেকালে শুধু দুঃসাধ্য নয় অকল্পনীয় ছিল। পরপারে ও সাবিত্রী নাটকে তিনি নিষিদ্ধ পল্লীর রেণুকা দাসী, কনক দাসী, ঊষা দাসী, ছবি দাসী ও জ্যোতি দাসীদের নিয়ে নাটক করলেন। সংস্কারের বেড়া ভেঙে বাঁকুড়ার নাট্যাভিনয়ে এই দুঃসাহসিকতা ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি বাঁকুড়ার নাট্য ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বাঁকুড়ার অতীতের নাট্যচর্চায় অভিনেতা প্রয়াত ফণীভূষণ গাঙ্গুলি, নাট্য পরিচালক অভিনেতা তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও অজিত সেনগুপ্তর অবদান আজও স্মরণীয়।

এরপর যুগবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়ার নাট্যপ্রবাহে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। এই সময়ে বাঁকুড়ার নাট্যকর্মীদের মনে নাট্যচর্চার যে নেশা ধরেছিল সেটা আন্দোলন পর্ব বলা চলে না। ছিল শুধুমাত্র আলোড়ন পর্যায়ে। গড়ে উঠল স্থানীয় ডাক্তারদের নিয়ে ডক্টরস্ ক্লাব, মিতালী সংঘ, প্রগতি সংস্কৃতি সংঘ, ডিস্ট্রিক্টস
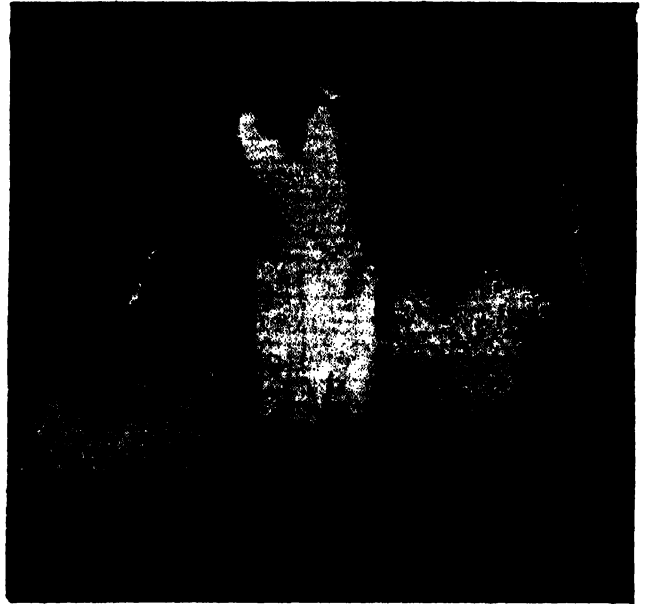
১৯৫১ সালে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট অফিসার্স ক্লাব অভিনীত কালিন্দী নাটকের দৃশ্য।

বাঁকুড়া মিলনতীর্থ প্রযোজিত 'লিং ফিং'-এর একটি দৃশ্য।

অফিসেস ক্লাব। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের পরিবর্তে বাঁকুড়ার রঙ্গমঞ্চে স্থান করে নিল সামাজিক নাটক। ফুরিয়ে যেতে শুরু করল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মঞ্চায়ন। নাটক নির্বাচনে ও অভিনয়ে প্রাধান্য পেল নাট্যকার তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, নীহাররঞ্জন গুপ্ত ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক। কলকাতার বোর্ডের পেশাদার রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ের প্রভাব এসে পড়ল বাঁকুড়ার নাট্যমঞ্চে। নতুন আঙ্গিক ও নতুন অভিনয় ধারায় অভিনীত হল কালিন্দী, দুই পুরুষ ও উল্কা, ক্ষুধা, মমতাময়ী, হাসপাতাল, মাটির ঘর, বিশবছর আগে ও রূপালী চাঁদ। ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত এইভাবে বয়ে চলেছিল বাঁকুড়ার নাট্য প্রবাহ।

এরপর ১৯৫৩-৫৪ সালে বাঁকুড়ায় তৎকালীন জেলাশাসকের বাংলোর প্রাঙ্গণে জেলাশাসক এম এ টি আয়েঙ্গার আই সি এস-এর প্রচেষ্টায় ও বাঁকুড়ার নাট্যামোদী জনসাধারণের সহযোগিতায় নির্মিত হল "নেতাজী মুক্তাঙ্গন মঞ্চ"। আয়েঙ্গার সাহেবের মৃত্যুর পর এই মুক্তমঞ্চের নাম হয় "আয়েঙ্গার মুক্তাঙ্গন মঞ্চ"। বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বন্ধ দরজা খুলে গেল। সৃষ্টি হল প্রগতিশীল বাস্তববাদী নাট্য সংগঠন—অগ্রদূত, সংস্কৃতি পরিষদ, মিলনতীর্থ, মহানন্দের মেলা, অপরূপ, মঞ্চরঙ্গ, রূপরঙ্গ, মৌসুমী, ঐকতান, আনন্দম, নাট্যরূপা, শিল্পীতীর্থ, চার্বাক, সংলাপ, বুলবুল গীতি ও নাট্যসংস্থা, সৌখীন ও পুণ্যশ্লোক। ১৯৬০-৬২ থেকে ১৯৭০-৭৫ পর্যন্ত বাঁকুড়ার বুকে নাট্য আন্দোলন ও নাট্য প্রতিবেশের যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে তা শুধুমাত্র গৌরবের নয় নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক। ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে এখানকার নাট্যচর্চার ধারা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মোড় নেয়। নাটক সমাজ জীবনের দুর্বিষহ জীবনমুখী সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে সমাজের মূল্যায়ন করে ও জাতীয় সমস্যাগুলিকে ভাষা দেয়। অন্যায় অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গণচেতনা সৃষ্টির হাতিয়ার নাটক। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গতানুগতিকতার বেড়াজাল ভেঙে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা নিয়ে নূতন ফর্মে অভিনীত হল—মারীচ সংবাদ, দুইমহল, দানব (গোর্কীর এপিমিজ অবলম্বনে) রক্তকরবী, ডিরোজিও, পথের দাবি, কল্লোল, কয়লা কাটে যারা, রাজরক্ত, ফেরারী ফৌজ, অগ্নিগর্ভ লেনা, হারানের নাতজামাই, আবর্ত, লিঞ্চিং এ এক ক্ষুধিত পাষাণ, গঙ্গা তুমি বইছো কেন ও তিন পয়সার পালা। অভিনয় হতে লাগল বিভিন্ন মানবিক মূল্যবোধের নাটক। ১৯৭২ সালে সৃষ্টি হল "সম্মিলিত শিল্পী পরিষদ"। জেলা শহরের একুশটি নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের এক সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান। সম্মিলিত প্রয়াসে ৭ এপ্রিল ১৯৭৩ সগৌরবে মঞ্চস্থ হল দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" আয়েঙ্গার মুক্তাঙ্গনের মহামিলন মঞ্চে। সে সময় নাট্যদর্পণ ও অগ্রগামী নামে দুটি নাট্যপত্রিকা প্রকাশিত হয় কিন্তু তারা আয়ুষ্মান হতে পারেনি। পরবর্তীকালে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "থিয়েটার ওয়াল" বাঁকুড়ায় সম্প্রতি চলমান নাট্য পত্রিকা।

সেকালের তুলনায় একালে বাঁকুড়ায় পূর্ণাঙ্গ নাট্যাভিনয় অনেক কমে গেছে। প্রাধান্য পেয়েছে একাংক নাট্যাভিনয়। বাঁকুড়ার মঞ্চে রবীন্দ্র নাটকও কম অভিনীত হয়েছে। তারই মধ্যে ডি ও সি ও মঞ্চরঙ্গ অভিনীত বিসর্জন ও শেষরক্ষা, অগ্রদূত অভিনীত নৌকাডুবি, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ অভিনীত রক্তকরবী, মিলনতীর্থ অভিনীত

আনুমানিক ১৮৮০ সালে স্থানীয় চকবাজারে নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে "শ্যামসুন্দর অপেরা"। সম্ভবত এটি প্রাচীনতম অপেরা। এঁদের অভিনীত "বাসুদেব" ও "নরকাসুর" স্মরণীয়। পরবর্তী অধ্যায়ে শ্যামসুন্দর অপেরার স্থলাভিষিক্ত হয় "নিউ শ্যামসুন্দর অপেরা"। এঁদের অভিনীত বভ্রুনাভ, পৃথ্বিরাজ ও যুগান্তর সে সময় আলোড়ন সৃষ্টি করে। গোপীনাথ সুরের দুর্গা অপেরা ছিল নিউ শ্যামসুন্দরের সমসাময়িক। এঁদের অভিনীত লীলাবসান ও প্রবীরার্জুন বেশ নাম করে।

বৈকুণ্ঠের খাতা ও শাস্তি এবং আনন্দম অভিনীত রবিবার উল্লেখযোগ্য।

এর পরের ইতিহাস নাট্যক্ষেত্রে বাঁকুড়ার হতাশা ও অবক্ষয়ের ইতিহাস। এই জেলা শহরের বুকে এককালে কম করেও পনেরটি নাট্যসংস্থা নিয়মিত নাট্যচর্চা ও মঞ্চায়নের মাধ্যমে বাঁকুড়ার নাট্য আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বিভিন্ন জেলা ও প্রদেশ থেকে সারা বাংলা ও সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতার বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করে বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করেছিল আজ তাদের অধিকাংশের অপমৃত্যু হয়েছে। তবুও এই অবক্ষয় ও হতাশার মাঝে উঠে এসেছে শিল্পী সংসদ, অয়নান্ত, সপ্তর্ষি, পিপলস থিয়েটার, বৈতালিক, প্রমিথিউস্, চাতক, মিলনী, স্বাগতম, স্বস্তিক, সবাক ও চরিত্র। মঞ্চে নাটকের দর্পণে প্রতিফলিত হচ্ছে দেশ সময় ও সমাজের বাস্তব রূপ। বর্তমানে একালের নাট্যচর্চার ইতিহাসে জেলার আদিবাসী নাট্যকর্মীদের অবদান ও ভূমিকা এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছে। রাহপুর তিলকা মাড়ওরা অভিনীত "ডৌন", বাঁকুড়া মার্শাল মাড়ওরা অভিনীত "সাঁকওয়া" ও ইদপুর গেড়িয়াকুলা আদিবাসী সিধু-কানু গাঁওতা অভিনীত "দেনাবন কালুকাটার" সাঁওতালী নাট্যাভিনয় উল্লেখযোগ্য। মৌলিক নাটক রচনায় ও মঞ্চায়নে এঁরা সচেষ্ট। বাঁকুড়ার অতীত নাট্যঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষায় কিছু করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারুণ্যের জেদ নিয়ে এঁরা নেমে পড়েছেন নতুন উদ্যমে। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হবে নতুন ইতিহাস। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে বাঁকুড়ার বর্তমান ও ভবিষ্যতের নাট্যান্দোলন।

থিয়েটার এখনও মাইনরিটি কালচার হয়ে আছে। কিন্তু যাত্রাপালা নাটকের ব্যাপ্তি অপরিসীম। যাত্রা হচ্ছে মাস্ কালচার। কোনরকম বাধাহীন জনতার মাঝখানে জনতার হৃদয়ের কাছে অভিনীত হয় বলেই পালা নাটকের শক্তি অপরিমেয়। এ এমন একটা মাধ্যম যা অগণিত দর্শক ও বিশাল জনতাকে অনুপ্রাণিত করে উদ্বুদ্ধ করে ও আনন্দ দেয়। গণচেতনা সৃষ্টির এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার এই যাত্রাপালা। বাঁকুড়ার যাত্রা অপেরাগুলিও অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অবদানের শরিক। আনুমানিক ১৮৮০ সালে স্থানীয় চকবাজারে নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে "শ্যামসুন্দর অপেরা"। সম্ভবত এটি প্রাচীনতম অপেরা। এঁদের অভিনীত "বাসুদেব" ও "নরকাসুর" স্মরণীয়। পরবর্তী অধ্যায়ে শ্যামসুন্দর অপেরার স্থলাভিষিক্ত হয় "নিউ শ্যামসুন্দর অপেরা"। এঁদের অভিনীত বভ্রুনাভ, পৃথ্বিরাজ ও যুগান্তর সে সময় আলোড়ন সৃষ্টি করে। গোপীনাথ সুরের দুর্গা অপেরা ছিল নিউ শ্যামসুন্দরের সমসাময়িক। এঁদের অভিনীত লীলাবসান ও প্রবীরার্জুন বেশ নাম করে। বাঁকুড়ার যাত্রাশিল্পের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন যে কটি দল তাদের মধ্যে শ্যামা অপেরা, সন্ন্যাসী অপেরা, ত্রিনয়নী অপেরা ও বন্ধু অপেরা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিল্পীমিতা অপেরা, কেঠারডাঙ্গা যুবগোষ্ঠী, ভাদুল সরস্বতী অপেরা ও নবীন নাট্য সংঘ দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাদের ভূমিকা পালন করেছে। শ্যামা অপেরার "মা ও ছেলে" এবং "হুকার", সন্ন্যাসী অপেরার "সন্ন্যাসীর তরবারি" "একটি পয়সা" ও "সংক্রান্তি", ত্রিনয়নীর "ভিয়েৎনাম" প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার পরিচয় দেয়। এঁদের যাত্রাভিনয়ে আধুনিকতার ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ছোঁয়া পাওয়া যায়। যাত্রাকে নতুন ফর্মে উপস্থাপনার প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। ছাতনার জোড়হিড়ার লক্ষ্মী অপেরা অভিনীত বাঙালী, দাসীপুত্র ও সোনাইদীঘি খ্যাতি অর্জন করে। এছাড়া নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের আশীর্বাদধন্য বিকনার শ্রীদুর্গা অপেরা, বড়জোড়ার নাট্য নিকেতন, গঙ্গাজলঘাটির রাজপুত যাত্রা সংস্থা, উদয়ন, নবারুণ, ওন্দার বৈশাখী সংঘ, ঝাঁটিপাহাড়ীর পড়পড়া যুবগোষ্ঠীর মতো সৌখীন যাত্রাদলের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব অপেরাগুলির অধিকাংশই আজ অবলুপ্ত। জেলার যে কটি সৌখীন যাত্রা অপেরা আজও শিবরাত্রির সলতের মতো কোনরকমে জ্বলছে সেগুলিরও তেল ফুরিয়ে এসেছে যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। জেলার এই শিল্পে আজও স্মরণীয় বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট বাদক ধরনীধর নাগ ও শেখ ঝুলিয়া, ঢোল বাদক ও নৃত্য শিক্ষক দ্বিজ দাস, পাখোয়াজ ও তবলাবাদক করালী ধীবর, মণি ধারা এবং বেহালা বাদক রাম কালিন্দী স্মরণীয়। যাঁরা যাত্রাদলের সুরপাখির মেরুদণ্ড ছিলেন এঁরা সকলেই প্রয়াত। বিবেকের ভূমিকায় অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তরণী দাস, রাধানাথ সূত্রধর, বিনোদ দাস ও বাদল ধাড়া। এঁদের অনেকেই হারিয়ে গেছেন কালের গর্ভে।

হারিয়ে যায়। অনেক কিছু হারিয়ে যায়। তবু বিস্মৃতির ধূলিমুঠি থেকে স্মৃতির মণিমুক্তা খুঁজে পেয়েছি। তখনই মনে হয়েছে বাঁকুড়ার যাত্রা কাহিনী নাট্য কাহিনী কেবলমাত্র কাহিনী নয়—জীবন্ত ইতিহাস। কিন্তু সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আজ অবলুপ্তির পথে। স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে হয়তো কিছু নাম কিছু নাট্য সংগঠন যাদের কাঁধে ভর রেখে বাঁকুড়ার নাট্য আন্দোলন এগিয়েছে। আমরা ফিরে দেখতে বড় ভালবাসি। এই ফিরে দেখার মধ্যে অনেক সময় স্বচ্ছতা থাকে না। তবুও ফিরে দেখা বাঁকুড়া জেলার নাট্যচর্চার কিছু পরিচয় দিতেই এই প্রচেষ্টা।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। জেলার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্য পরিচালক

বিষ্ণুপুর ঘরানার ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ

মণীন্দ্রনাথ সান্যাল

রবীন্দ্রসংগীতের সুরপ্রবাহের মূল উৎস ছিল বিষ্ণুপুর ঘরানার সুরসম্পদ। প্রথম জীবনে এই ঘরানাকে আশ্রয় করে কবির জীবনসাধনা সঙ্গীতের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। কৈশোর থেকেই কবি বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। যদুভট্ট ছিলেন তাঁর প্রিয় শিল্পী।

ঘরানা শব্দের অভিধানগত অর্থ সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের সঙ্গীতবৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতের বিশিষ্ট ধারা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রবহমান এবং এই পদ্ধতি থেকে জন্ম নেয় নিজস্ব ঘরানা বা গানের প্রকাশবৈশিষ্ট্য বা স্টাইল। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সঙ্গীতের অনুশীলন ভারতীয় সঙ্গীত-ইতিহাসের মধ্য ও উত্তর যুগকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। সঙ্গীতধারার এক উজ্জ্বল ইতিহাস বাংলার বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে একসময় গড়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকে সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল এক সমৃদ্ধ ধ্রুপদ ঘরানা এবং এই ঘরানার নিরলস চর্চা বিষ্ণুপুর তথা সমগ্র বাংলাকে গৌরবান্বিত করেছে।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণের ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় এর সূত্রপাত উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক থেকে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় নিজগৃহে ব্রাহ্মসমাজের জন্যে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। এই বাড়িতে সর্বপ্রথম তাঁর অনুগামী ব্রাহ্মসমাজের জন্যে একটি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন বাংলা তথা ভারতের পথিকৃৎ। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও ছিল যথেষ্ট। ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ হিসেবে তিনিই প্রথম ধর্মসঙ্গীতকে সংযুক্ত করেন। ধ্রুব পদ্ধতির অনুসরণে তাঁর রচিত বেশ কিছু গান সে যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর ৪৪টি গান 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ে বাংলা টপ্পার স্রষ্টা রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) কলকাতার সঙ্গীতসমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানী টপ্পা শিখেছিলেন পশ্চিমাঞ্চলে। ১৮০৪ সালে নিধুবাবু কলকাতায় একটি সঙ্গীতসমাজ স্থাপন করেন। নিধুবাবু বাংলা কাব্যসঙ্গীতের আধুনিক যুগের পথিকৃৎ। নিধুবাবুর পরে টপ্পা সঙ্গীত রচনায় শ্রীধর কথক ও কালী মির্জা বা কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সে সময়ে কবিয়ালদের গানে বাংলার জনজীবনে সঙ্গীতের যেন প্লাবন এসেছিল। কবিয়ালরা উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিসঙ্গীতগুলি সাহিত্যচর্চার নিদর্শনস্বরূপ দেশের প্রায় সকল স্তরে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ছিল 'গানের যুগ'। কবিসঙ্গীত ছাড়া যাত্রা, পাঁচালি, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, বাউলগান, আখড়াই, ঢপকীর্তন, খেউড়, তর্জা, হাফ আখড়াই প্রভৃতি জাতীয় রচনা ও সঙ্গীতে এই পর্ব ছিল পরিপূর্ণ।

উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলায় সাংস্কৃতিক জাগরণের যখন জোয়ার এসেছে। ঠিক সে সময়ে দেশের এক প্রান্তে বিষ্ণুপুর শহরে ধ্রুপদ সঙ্গীতের এক নতুন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে। আত্মপ্রকাশ করেছে এক ধ্রুপদী ঘরানা। অমরশিল্পী রামশঙ্কর ভট্টাচার্য এই ঘরানার স্রষ্টা। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য সিংহের সভাগায়ক। জন্ম ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে। পিতা গদাধর ভট্টাচার্য ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। পিতার কাছ থেকে সংস্কৃতে পাঠ নিতে শুরু করেন তিনি এবং পরিণত বয়সে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্যে রামশঙ্কর বারাণসী গমন করেন। শৈশব থেকেই সঙ্গীতে অনুরাগী এবং সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সহজাত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল সংস্কৃত শিক্ষালাভের অনেক পরে। তাঁর সঙ্গীতগুরু কে ছিলেন— এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কোনও কোনও সঙ্গীতবিদদের মতে তানসেন-বংশীয় বাহাদুর খানের শিষ্য গদাধর চক্রবর্তীর কাছে রামশঙ্কর ধ্রুপদ শিক্ষালাভ করেন। এক মতে, গদাধর চক্রবর্তীর অন্যতম শিষ্য কৃষ্ণমোহন গোস্বামী ছিলেন রামশঙ্করের সঙ্গীতগুরু। তৃতীয় মত—রামশঙ্করের পশ্চিম দেশীয় সঙ্গীতগুরু আগ্রা-মথুরা অঞ্চল থেকে বিষ্ণুপুর রাজদরবারে এসেছিলেন। পুরী যাওয়ার পথে রামশঙ্করের গান শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পুরী থেকে ফেরার পথে বিষ্ণুপুরে কিছুকাল থেকে শিষ্যকে উপযুক্ত তালিম দিয়ে যান।
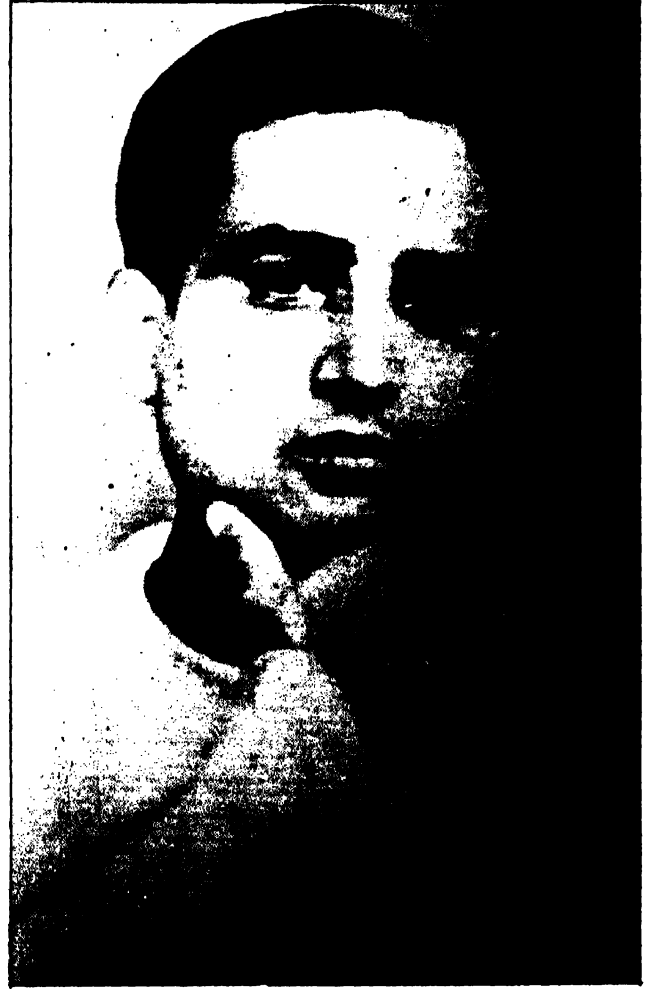
সেকালে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিষ্ণুপুর-রাজসভায় সঙ্গীতশিল্পীদের শুভাগমন হত। অসাধারণ মেধাবী ছিলেন রামশঙ্কর এবং সঙ্গীতে তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। রাজসভায় বিভিন্ন ওস্তাদের গান শুনে এই অসামান্য শ্রুতিধর অধিকাংশ গানই আয়ত্তে এনেছিলেন। এমনি করে তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তানসেন,

বৈজুবাওরা, বিলাস খাঁ, গুলাব খাঁ, নায়ক গোপাল প্রমুখ খ্যাতনামা গুণীজনের সঙ্গীতে। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ সঙ্গীতের যে বিপুল সম্ভার আমাদের চোখে পড়ে, তা থেকে বোঝা যায় যে, গানগুলি ধীরে ধীরে এই ঘরানায় এসে মিলিত হয়েছে। রামশঙ্কর ছিলেন দীর্ঘায়ু এবং সুদীর্ঘকাল ধরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীত সাধনায় ব্রতী ছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে ধ্রুপদের যে-সমস্ত গান পরবর্তীকালে 'সঙ্গীতমঞ্জরী' ও 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার অধিকাংশই এসেছে রামশঙ্করের কাছ থেকে। তিনি বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন।

ঘরানা সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। "বিষ্ণুপুরের মতো স্বাধীন রাজ্যের রাজদরবারে নানা গায়কের উপস্থিতি ঘটতেই পারে এবং সেদিক থেকে এ কথা বলার অবকাশ আছে, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে একাধিক ঘরানা এসে মিশেছিল। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত ধ্রুপদ সঙ্গীতকে বলা হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার গান, গাইবার ভঙ্গীকে বলি বিষ্ণুপুরী চাল। উত্তর ভারতের কোনো বিশেষ ঘরানা যদি বিষ্ণুপুরের উৎস হতো তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরানা না বলে সেনী ঘরানা বা অন্য কোনো ঘরানার নামেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের নামকরণ হতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ, বিষ্ণুপুর-সঙ্গীত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা মনে করি, একাধিক ঘরানার সমন্বয়ই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকে একটি নতুন রূপ দিতে সাহায্য করেছিল। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সুনির্দিষ্ট ধারা নিতে পেরেছিল রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের আমল থেকে। ......রামশঙ্করের সঙ্গীত প্রতিভার যে পরিচয় পাই তাতে এ ধারণা দৃঢ় হয়ে ওঠে রামশঙ্করের কণ্ঠেই বিষ্ণুপুরী চালের উদ্ভব এবং বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে ঘরানাগত বিশেষত্ব সূচিত হয়েছিল।"

সঙ্গীতজ্ঞ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর' গ্রন্থে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—"রামশঙ্করের সঙ্গীত প্রতিভা রাজসভার প্রতিভাশালী সঙ্গীতসাধকদের সংস্রবে বিকশিত হয়ে ওঠে।" —এই বক্তব্য থেকে সহজ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রামশঙ্কর বিভিন্ন ওস্তাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং বহু রাগ ও গান সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অদম্য উৎসাহ, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি যে নিজস্ব ধ্রুপদ সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, সেই পদ্ধতিই সারা দেশে বিষ্ণুপুর ঘরানা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রামশঙ্করের সঙ্গীতজীবন শুরু হয় ১৭৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে। সেই বছর এই মহান শিল্পীর জীবনাবসান হয়। জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সঙ্গীতসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং বিষ্ণুপুরের প্রধান আচার্যরূপে স্বীকৃতি, সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

ঘরানার প্রচার ও প্রসারে রামশঙ্করের অবদানের তুলনা হয় না। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় কয়েকজন সুযোগ্য শিষ্য সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং উত্তরকালে সঙ্গীতজগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন পুত্র রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদুভট্ট। রামকেশব (১৮০৯-১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) ধ্রুপদসঙ্গীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং কোচবিহার-মহারাজের সভাগায়ক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে কলকাতায় সাতুবাবু ও লাটুবাবুর সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন সঙ্গীত পরিবেশণ করেন। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে তিনিই প্রথম কলকাতায় বিষ্ণুপুর ঘরানার গান গেয়ে এর প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কৃতী গায়ক কেশবলাল কলকাতায় তারকনাথ প্রামাণিকের সঙ্গীতসভায় ছিলেন সভাগায়ক। তিনি ও রামকেশব বেশ কিছু গানও রচনা করেছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ) রামশঙ্করের কৃতী ছাত্র। উনিশ শতকে ভারতীয় সঙ্গীতের নবজাগরণে তাঁর অবদানের তুলনা হয় না। উত্তর কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় তিনি ছিলেন সঙ্গীতাচার্য। তাঁর কৃতী ছাত্র স্বনামধন্য শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। অঙ্কমাত্রিক স্বরলিপি রচনা, ঐকতান বাদন, সঙ্গীত-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ের তিনি পথিকৃৎ। তাঁর রচিত কয়েকটি মূল্যবান সঙ্গীতগ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। 'বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়' এবং 'বেঙ্গল আকাদেমি অফ মিউজিক' নামক দুটি বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক। গীতিকাব ক্ষেত্রমোহন বাংলা ও হিন্দি ধ্রুপদ গানও রচনা করেছিলেন। ক্ষেত্রমোহনের সমসাময়িক ছিলেন বিষ্ণুপুরের দীনবন্ধু গোস্বামী। তাঁর কর্মক্ষেত্রও ছিল বিষ্ণুপুরে। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকার হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩২-১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ) ঘরানার অনাতম বিশিষ্ট ধারক ও বাহক। বিষ্ণুপুরে প্রথম সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপনের পর তিনি বহু যশস্বী ছাত্র তৈরি করেছিলেন। সারা বাংলায় ঘরানার প্রসারকল্পে তাঁর অবদান স্মরণযোগ্য। অনন্তলাল ব্রজভাষা ও বাংলায় বেশ কয়েকটি গান রচনা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর তিন কৃতী পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতজগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। চন্দ্রকোণার রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামশঙ্করের শিষ্য এবং পরে তিনি পশ্চিমি ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতে তালিম নিয়েছিলেন। বর্ধমানরাজ মহাতপচাঁদের দরবারে দীর্ঘদিন এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তিনি কিছুকাল সঙ্গীত পরিবেশণ করেছিলেন।

সঙ্গীতসাধক যদুভট্ট (১৮৪০-৮৩ খ্রিস্টাব্দ) কৈশোরে সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন গুরু রামশঙ্করের কাছে। রামশঙ্করের দেহাবসানের পর তিনি বেতিয়া ঘরানার প্রখ্যাত গজানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। যদুনাথ বেতিয়া ঘরানার শিল্পী হলেও বিষ্ণুপুর ঘরানার গান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন গমক-রেয়কযুক্ত খাণ্ডারবানের গায়করূপে। এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই, তাঁর কৈশোরের অবচেতন মনে বিষ্ণুপুর ঘরানার সহজ সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ সঙ্গীতের গভীর ছাপ পড়েছিল, যা ডাগরবানের ধ্রুপদেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জীবনে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালে তাঁর গানে গমক-রেয়কের সঙ্গে রাগের ভাব ও ভাষার ভাবের মধ্যে একটি মিলনসেতু রচিত হয়। গুণীজনের মতে, সম্ভবত এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাছে যদুভট্টের কণ্ঠসঙ্গীত এত সমাদৃত হয়েছিল। সঙ্গীত-রচয়িতা যদুভট্টের কয়েকটি গানের সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ভাঙা গান' রচনা করেছেন।

সংগীতাচার্য সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য তিন পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র অম্বিকাচরণ পরবর্তীকালে ছিলেন ঘরানার প্রকৃত রূপকার। বিষ্ণুপুরের প্রথিতযশা গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীও অনন্তলালের শিষ্য ছিলেন। গুরুর কাছে শিক্ষা শেষ করে তিনি অন্যত্র সঙ্গীতের তালিম নিলেও তাঁর কণ্ঠে বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশেষ প্রভাব ছিল বলে গুণীজনরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী রাগাশ্রিত বাংলা গান গাইতেন এবং স্থানবিশেষে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ ও খেয়ালও পরিবেষণ করতেন সহজাত কণ্ঠে। সঙ্গীতজ্ঞ সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদসঙ্গীতে ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। খেয়াল এবং অন্যান্য সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেও বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ তাঁদের বিশেষ প্রিয় ছিল।

ঘরানার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঙ্গীতবিদ্‌দের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে সঙ্গতি রয়েছে। অনেকে বলেন—"বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদে সহজ, সরল, গমকবর্জিত ও অত্যন্ত পরিমিত অলংকার প্রয়োগ আমাদের মধ্যযুগীয় ডাগর-বাণীর ধ্রুপদের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের সহজ, সরল অথচ ভাবগম্ভীর চাল অনেকটা হিন্দু মন্দিরের প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো। হয়তো বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হভেলি-সঙ্গীতের অনুরূপ বিষ্ণুপদ গানের প্রভাব থাকতে পারে তাতে।"

ঘরানা সম্বন্ধে আর একটি উদ্ধৃতি—"বিষ্ণুপুরের গায়নভঙ্গি সহজ, সরল, অলংকারে ভারাক্রান্ত নয়। রাগের বিশুদ্ধতার দিকেই এই ঘরানার মূল দৃষ্টি। প্রাচীন বন্দিশগুলিই ধ্রুপদ গানের প্রাণস্বরূপ বলে মনে করা হয়। প্রতিটি ধ্রুপদ চার তুকের অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগযুক্ত চারটি তুকের মধ্যেই রাগের পূর্ণ অভিব্যক্তি। ধ্রুপদে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ চলে কিন্তু লয়কারি চলে না, লয়ের মারপ্যাঁচে ধ্রুপদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয় বলে এই ঘরানার ধারণা। লয়ের কাজ শুধু ধামারে—ধামারের অসমছন্দের সঙ্গেই লয়কারির বোঝাপড়া। বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীত চিন্তার বিশেষত্ব হল এই।"

উনবিংশ শতকে রামশঙ্করের শিষ্যরূপে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতশিল্পীরা সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। তাঁদের জন্ম, সঙ্গীতসাধনা ও মৃত্যু সবই উনিশ শতককে কেন্দ্র করে। সুদীর্ঘকাল সুরসাধনার ফলস্বরূপ ধ্রুপদ সঙ্গীতে বৈচিত্র্যের এক বিস্ময়কর স্বাক্ষর তাঁরা রেখে যেতে পেরেছেন।

ঘরানার সঙ্গীতসম্পদের তুলনা হয় না। বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীতসাধকরা লিখেছেন অনেক গান, সংগ্রহ করেছেন তার থেকেও বেশি এবং সযত্নে রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। সংগ্রহশালায় পাওয়া যায় বহু রাগযুক্ত বড়বাণীর চারপদী চৌতাল তালের প্রায় তিনশো গান, ধামার দুশো এবং পঞ্চম সওয়ারি, আড়াচৌতাল, সুরফাঁকতাল, ব্রহ্মতাল, রূপক, তেওরা প্রভৃতি তালের গান প্রায় শতাধিক। সংগ্রহে রয়েছে ধারু, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, কলকলওয়ানা, হপ্তরঙ্গ, স্বররঙ্গ, তালফেরতা, অষ্টাদশ কানাড়া, দ্বাদশ মল্লার, ত্রয়োদশ তোড়ী, নয় প্রকার নট এবং সপ্ত সারঙ্গের ধ্রুপদাঙ্গের সঙ্গীত। এ ছাড়া বিভিন্ন রাগের ওপর রচিত বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের সংখ্যা তিনশোর অধিক। সংগৃহীত হয়েছে তেলানা, ত্রিবট, রাগমালা, রাগের সরগম, চতুরঙ্গ প্রভৃতি যার সংখ্যা সব মিলিয়ে শতাধিক। আছে টপ্পা, ঠুংরি, হোরি ঠুংরি, ভজন, ঝুলন, কাজরি প্রভৃতি ধারার অনেক গান। এ ছাড়া রয়েছে সুরবাহার, বীণা, সেতার, সরোদ, এসরাজ ইত্যাদি বহু যন্ত্রের অনেক গৎ যার মিলিত সংখ্যা তিন শতাধিক। "বিষ্ণুপুর ঘরানার এই বিপুল সংগ্রহ উত্তর ভারতের

আর কোনও ঘরানাতে আছে বলে আমার জানা নেই।" —বলেছেন সঙ্গীতসাধক সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘরানার বহু সংখ্যক গান স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়েছে। সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সঙ্গীতমঞ্জরী' ও 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থ দুটি সম্পাদনা করে ঘরানার সঙ্গীত সংরক্ষণে প্রভূত সহায়তা করেছেন। গ্রন্থে তাঁদের শ্রমসাধ্য বিপুল কাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। দুটি গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ মোট গানের সংখ্যা ৬৫৫। এর মধ্যে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, গজল, ভজন, হোরি, চতুরঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চদশ প্রকারের সঙ্গীত লিপিবদ্ধ আছে। এ ছাড়া উদ্ধৃত হয়েছে তিনটি রাগের আলাপ। গ্রন্থ দুটিতে মোট ১৩৪ জন গীতিকারের সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত হরিদাস স্বামী, তানসেন, বৈজুবাওরা, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, সুরদাস, তুলসীদাস, নায়ক গোপাল প্রমুখ গীতিকার ও শিল্পীবৃন্দ। বিষ্ণুপুরের গীতিকারদের মধ্যে রয়েছেন রামশঙ্কর, যদুভট্ট, অনন্তলাল, রামপ্রসন্ন ও সুরেন্দ্রনাথ। তানসেনের মোট ৬৯টি গান দুই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রামপ্রসন্নবাবু ও গোপেশ্বরবাবু এই মহৎ কাজ সম্পন্ন না করে গেলে বিষ্ণুপুর ঘরানার অমূল্য সম্পদ হয়তো অকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এই সূত্রে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'কণ্ঠকৌমুদী' গ্রন্থেরও উল্লেখ করতে হয়। দুটি গ্রন্থে ঘরানার বেশ কয়েকটি গান লিপিবদ্ধ আছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরপ্রবাহের মূল উৎস ছিল বিষ্ণুপুর ঘরানার সুরসম্পদ। প্রথম জীবনে এই ঘরানাকে আশ্রয় করে কবির জীবনসাধনা সঙ্গীতের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। কৈশোর থেকেই কবি বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। যদুভট্ট ছিলেন তাঁর প্রিয় শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বালককালে যদুভট্টকে জানতাম। তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। .....যদুভট্টের মতো সঙ্গীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ।"

রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে গান শিখেছেন। যদুভট্টর কাছে নিয়মিত শিক্ষালাভ না করলেও তাঁর গান কবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ছেলেবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা ও শেখা হয়েছে তাঁর। পাথুরিয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় বিভিন্ন শৈলীর বিদগ্ধজন প্রায়শ সমবেত হতেন। সেখানে অংশগ্রহণ করতেন অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখ। বিষ্ণুপুর ঘরানার গান তিনি তাঁদের কণ্ঠে শুনেছেন এবং সেই সব সঙ্গীতসাধকদের সংস্পর্শে এসে ঘরানার ধ্রুপদ সম্বন্ধে কবি ক্রমশ শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। পরিণত বয়সে প্রথিতযশা শিল্পী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর গান শুনে কবি মুগ্ধ হন। রাধিকাপ্রসাদ বহুদিন অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীতে তালিম নিয়ে পরে বেতিয়া ঘরানার শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বেতিয়া ঘরানার গানই তিনি বেশি গাইতেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠে বিষ্ণুপুরের গায়কির বিশেষ

সংগীতগুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে একাধিক ঘরানা এসে মিশেছিল। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত ধ্রুপদ সঙ্গীতকে বলা হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার গান, গাইবার ভঙ্গীকে বলি বিষ্ণুপুরী চাল। উত্তর ভারতের কোনো বিশেষ ঘরানা যদি বিষ্ণুপুরের উৎস হতো তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরানা না বলে সেনী ঘরানা বা অন্য কোনো ঘরানার নামেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের নামকরণ হতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ, বিষ্ণুপুর-সঙ্গীত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা মনে করি, একাধিক ঘরানার সমন্বয়ই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকে একটি নতুন রূপ দিতে সাহায্য করেছিল।

প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুরের গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সঙ্গীতমাধুর্যে আকৃষ্ট হন। ঘরানার বিভিন্ন সুরের পরিবর্তিত রূপ, ধ্রুপদের সরল গায়নভঙ্গি, রাগের বিশুদ্ধতা এবং গীতিকারদের বাণীর উৎকর্ষ তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের গান ও শিল্পীদের সম্বন্ধে কবির একাধিক সুচিন্তিত বক্তব্য রয়েছে এবং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই ঘরানার সঙ্গীতকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

কবি ধ্রুপদ গান সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—"আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করা। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে ওজন রক্ষা করা।" বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ সঙ্গীত সুবিন্যস্ত রাগরাগিণী, সুললিত বাণী ও ছন্দের মাধ্যমে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সঙ্গীতের বাণী, ভাব ও রসকে ক্ষুণ্ণ করে এখানে সুরের প্রাধান্য বিস্তারের কোনও প্রচেষ্টা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই এই ঘরানার গীতিপ্রকাশের নিজস্ব ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উত্তরকালে তাঁর ধ্রুপদাঙ্গ ও অন্যান্য সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে এই অনুভূতির যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে। অবশ্য ঘরানার সমস্ত ধ্রুপদ সঙ্গীতই যে এই অনুপ্রেরণার উৎস তা বলা যাবে না। কিছু সংখ্যক গান তাঁকে খুবই প্রভাবিত করেছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই প্রসঙ্গে নিচে কয়েকটি মাত্র গানের উল্লেখ করা হল ; যেমন—(১) ফুলিবন ঘন মোর আয় বসন্ত রি—রঙ্গনাথ (যদুভট্ট) ; (২) আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্ত মে—রঙ্গনাথ ; (৩) সরস সুন্দর বর বসন্ত ঋতু আয়ে—অনন্তলাল ; (৪) অজ্ঞান তম নিকরে গাঢ় ময়ি পতিতে—রামশঙ্কর। এই সব গান এবং অন্যান্য বহু গান থেকে প্রয়োজনমত সুর ও ভাবধারা আহরণ করে কবি রচনা করেছিলেন ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত। সেই সব রচনা আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ধ্রুপদে চার কলি বা তুক বর্তমান, যথা—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। রবীন্দ্রসঙ্গীতে চার কলিই সর্বাধিক এবং গীতিপদ্ধতিও ধ্রুপদের অনুগামী। গানের চারটি অংশের মাধ্যমে সঙ্গীতের সার্বিক গীতিরূপ বিকশিত হয়ে ওঠে—হয়তো এই অনুভবের মাধ্যমে তিনি তাঁর গানে চার তুকের ব্যবহার করেছেন। এটা শুধুমাত্র ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নয়, উত্তরকালে অধিকাংশ গানেই তিনি এই পদ্ধতি সার্থকভাবে অনুসরণ করে গেছেন। কবির জীবনে উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদ গানের এটা একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বলা চলে। তবে ধ্রুপদ গানের সমস্ত বাঁধাধরা নিয়ম তিনি মানেননি। সে কারণে দেখা যায়, তাঁর ধ্রুপদ ও ধামার গানে পশ্চিমি ধ্রুপদের মতো অলংকারের জাঁকজমক, বাঁটের আতিশয্য ও আলাপের বাহুল্য নেই।

হিন্দি ধ্রুপদের প্রকৃতি যেখানে মন্থর ও গম্ভীর, সেখানে চৌতাল, ধামার ও আড়া চৌতাল, আবার দ্রুত অথবা মধ্যলয়ের ছন্দপ্রধান গানে ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল ও তেওরা তালের প্রয়োগ
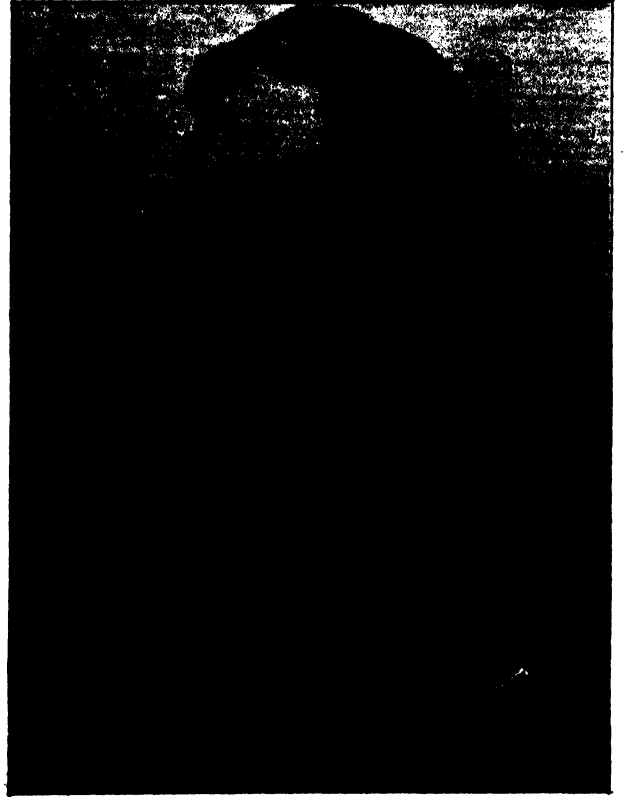
বাংলা সংগীতে নব্য ঘরানার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ

বাংলায় এ পর্যন্ত যত প্রাচীন রাগসঙ্গীত কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বিষ্ণুপুর অন্যতম এবং এই ঘরানা বিশিষ্টতার দাবি রাখে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গত দুশো বছরে রাগসঙ্গীতের অনুশীলন নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হলেও ঘরানা প্রবর্তনের দ্বিতীয় নিদর্শন আর নেই। এ বিষয়ে সারা বাংলায় বিষ্ণুপুরের স্থান অনন্য।

ছন্দকে রসগ্রাহী করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দি ধ্রুপদের এই পদ্ধতি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন—"মধ্যলয়ে এইরূপ গান রচনার প্রতি তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের গুণী ধ্রুপদীয়াদের কণ্ঠে মধ্যলয়ের সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল ও তেওরা তালের গান শুনে।" ধ্রুপদের বাণী, সুর ও ছন্দবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে তিনি যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন ঘরানার বৈচিত্র্যপূর্ণ তালপ্রয়োগের নিপুণতায়। যদুভট্ট সম্বন্ধে জানা যায় যে, বিষমছন্দ ও বিষমপদী তাল তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁর তালের ছন্দ কবিকেও প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে, রবীন্দ্রসৃষ্ট সমস্ত তালগুলি বিষমপদী ছন্দের ; যেমন—ঝম্পক, ষষ্ঠীতাল, নবতাল, রূপকড়া, একাদশী ও নবপঞ্চতাল। এই সমস্ত তাল প্রয়োগে তিনি যে গান রচনা করেছিলেন তার গঠনবিন্যাস ও সুরের বিস্তৃতি অধিকাংশ স্থলে চার কলিযুক্ত ধ্রুপদেরই অনুরূপ।

বিষ্ণুপুর ঘরানার বেশ কিছু রাগ চলনে ভঙ্গিমায় বিশেষত্বপূর্ণ এবং প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে এদের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। এই ঘরানার রামকেলি কড়ি মধ্যম বর্জিত, বসন্ত শুদ্ধ ধা-যুক্ত এবং পা-বর্জিত, আশাবরী কোমল রে-যুক্ত, ভীমপলশ্রীতে দুই নি-র প্রাধান্য, বৃন্দাবনী সারং-এ নি একটিই এবং তা শুদ্ধ নি, বেহাগে কোমল নি-র ব্যবহার, কামোদে কড়ি মধ্যম অস্পৃশ্য, পূরবীতে শুদ্ধ ধা-এর প্রয়োগ, ছায়ানট কোমল নি-বর্জিত ইত্যাদি। প্রচলিত সুরবিস্তারের এই পরিবর্তন কবি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেজন্য তাঁর বেশ কিছু গানে পরিবর্তিত সুরের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গানের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ; যেমন—'মনমোহন, গহন যামিনীশেষে'—এখানে আশাবরীতে কোমল ঋষভের প্রয়োগ ; 'নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে'—রামকেলি রাগকড়ি মধ্যম বর্জিত ; 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে'—কোমল নি-যুক্ত বেহাগ ; 'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা'—শুদ্ধ ধা-যুক্ত পূরবী ; 'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ' এবং 'ঘোর দুঃখে জাগিনু'—বিভাস রাগের দুটি গান শুদ্ধ ধা-সুরাশ্রিত ; বিপুল তরঙ্গ রে'—শুদ্ধ ও কোমল নি-যুক্ত ভীমপলশ্রী। 'জয় তব বিচিত্র আনন্দ'—গানটি বৃন্দাবনী সারং রাগের এবং কোমল নি-বর্জিত। কড়ি মধ্যম ব্যবহার না করে কামোদ সুরে কবির দুটি গান—'যতবার আলো জ্বালাতে চাই' এবং 'অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে।' এরকম আরও উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যায় যে প্রচলিত রাগরাগিণীর পরিবর্তিত সুর তাঁর সঙ্গীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পরিশেষে ঘরানার কয়েকটি অপ্রচলিত রাগ সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রচলিত রাগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা কিছু অপ্রচলিত রাগে গানের সুরারোপও করেছেন। সেই রাগগুলি অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যায় না বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না ; যেমন—রাজবিজয় (ভীমপলশ্রীধর্মী), কুমারী (শ্রীধর্মীয়), লুম (বিলাবল অঙ্গের), জয়াবতী (কাফির ছায়াযুক্ত) ইত্যাদি। রামশঙ্কর রচিত রাজবিজয় সুরের সুপরিচিত গান—'অজ্ঞান তম নিকরে গাঢ় মগ্নি পতিতে।' কবি এর সুর অনুসরণে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন—'সংশয় তিমির-মাঝে না হেরি।' এ ছাড়া লুম-খাম্বাজ সুরে কবির রচিত গান—'আজি যত তারা তব আকাশে।' ঘরানার অপ্রচলিত সুরে রচিত সঙ্গীতের প্রতি কবির যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল উপরোক্ত গানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাংলায় এ পর্যন্ত যত প্রাচীন রাগসঙ্গীত কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বিষ্ণুপুর অন্যতম এবং এই ঘরানা বিশিষ্টতার দাবি রাখে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গত দুশো বছরে রাগসঙ্গীতের অনুশীলন নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হলেও ঘরানা প্রবর্তনের দ্বিতীয় নিদর্শন আর নেই। এ বিষয়ে সারা বাংলায় বিষ্ণুপুরের স্থান অনন্য। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন—"রবীন্দ্রনাথ গানের সকল-কিছু বিষয় বিষ্ণুপুরী গায়কি পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করেছেন।" কবির সঙ্গীত-সাধনায় এই ঘরানার দান অনস্বীকার্য। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে আপন সঙ্গীতধারাকে এক নতুন স্রোতে প্রবাহিত করেছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত—ডঃ অরুণকুমার বসু
২। বিষ্ণুপুর ঘরানা—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৩। রবীন্দ্রসঙ্গীত—শান্তিদেব ঘোষ
৪। রবীন্দ্রসংগীত—ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী
৫। সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৬। বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদী ঐতিহ্য—অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দন, মে ১৯৯৪)
৭। যদুভট্ট—ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ (যদুভট্ট ও তাঁর গান—শ্রীমতী ইতু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশকাল—১৯৯০)
৮। সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর, তাঁর শিষ্যবৃন্দ ও বিষ্ণুপুর ঘরানা : কিছু প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা—মণীন্দ্রনাথ সান্যাল (শিক্ষা-সেমিনার স্মরণিকা, নিখিলবঙ্গ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ১৯৯৯)

লেখক : প্রাক্তন অধ্যাপক, বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয়, সঙ্গীতের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুপরিচিত

মধ্যযুগের বিশিষ্ট গঠন ইটের দেউল : এল্যাটি
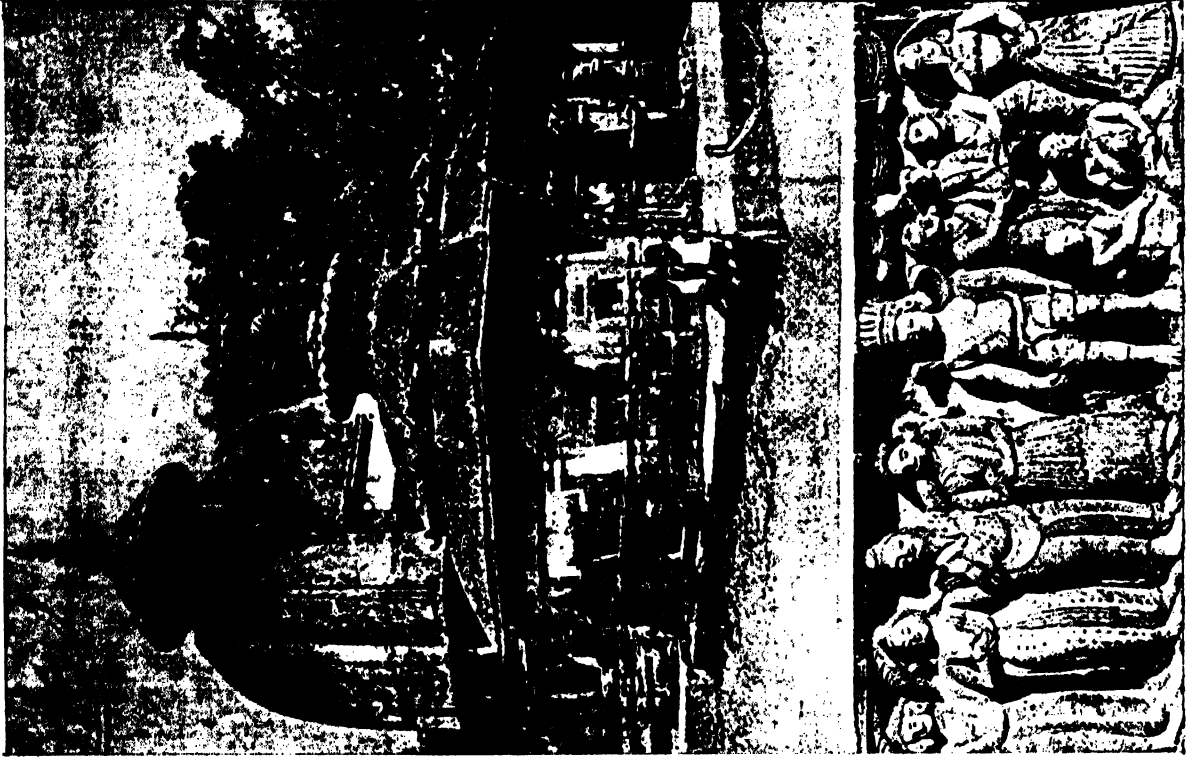
ওড়িশারীতির দেউল, সিহর ও সোনামুখির শ্রীধর মন্দিরে পোড়ামাটির শিবের বিবাহ দৃশ্য
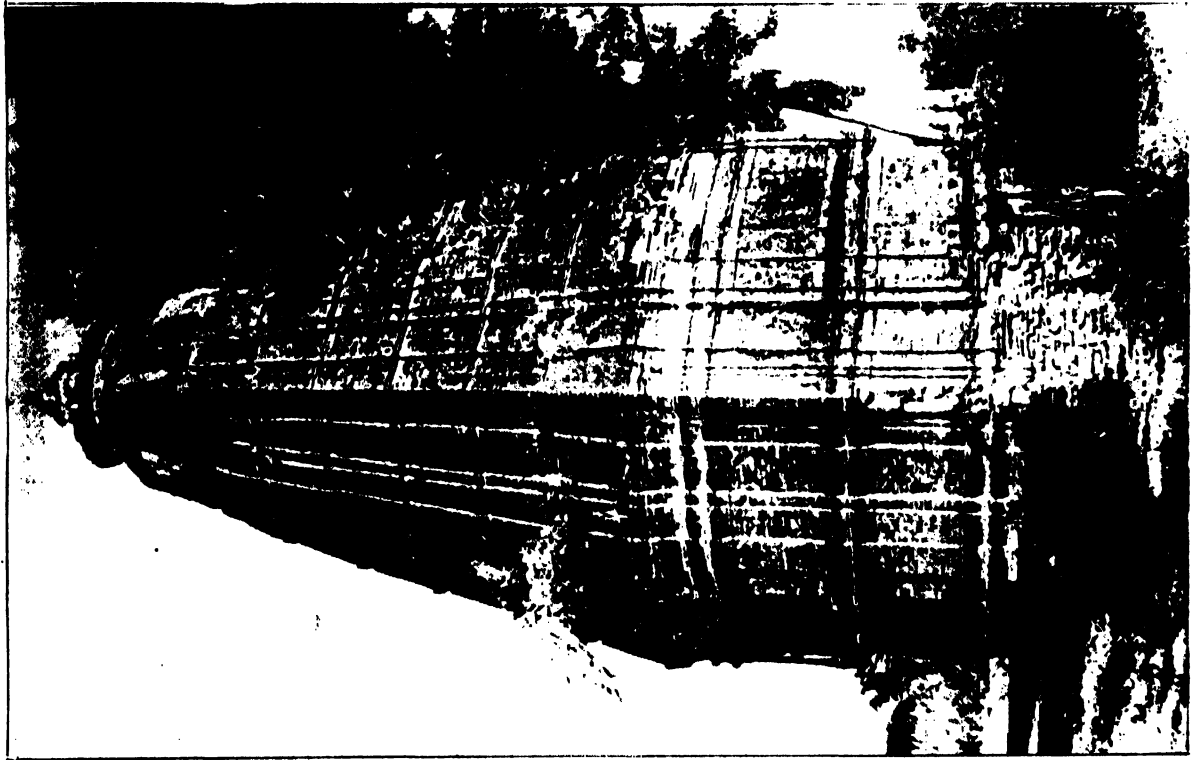
বাঁকুড়া জেলার সংগীতচর্চা

ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য

শুধু বাঁকুড়া কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যাপ্ত ছিলেন গোপেশ্বর তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে। আজও খুঁজলে দেখা যাবে গোপেশ্বরের সংগীত বিবর্তনের ধারাপথ বেয়ে এই প্রজন্মের বহু শিল্পীর মধ্যে প্রবাহিত। এই তো হল যথার্থ সংগীতচর্চা। আর মানুষ চিনতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে গেলেন বিষ্ণুপুর থেকে বোলপুরে। সেখানকার সংগীতভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে।

চর্চা' বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তা হল, নিষ্ঠা-সহকারে কোনও বিষয়ে কোনও ব্যক্তির আত্মনিয়োগ এবং এই নিরন্তর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আসে সেই বিষয়ে উৎকর্ষ।.অর্থাৎ 'চর্চা' জিনিসটা হল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক এবং সেখান থেকে সামাজিক। আবার পরবর্তীকালে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হয়ে যায়। সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে ব্যাপারটা প্রবেশ করে পরিবারে ও ব্যক্তির মধ্যে। বাঁকুড়া জেলার সঙ্গীত-চর্চা সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলেই এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার কথাটাই মনে আসে। বস্তুত, বাঁকুড়া জেলার সঙ্গীত-চর্চা মানেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা এবং হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা আছে, এই বিষ্ণুপুরী সঙ্গীত-ঘর তৈরি হয়েছিল বিষ্ণুপুরের যে মল্লরাজের আনুকূল্যে, তাঁর নাম দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ ঠাকুর। আর এই রঘুনাথের আমলেই এক বিরাট সঙ্গীত-ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হলেন বিষ্ণুপুরে। যাঁর থেকে বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন পরিবারে ও সমাজে প্রবেশ করতে থাকল সঙ্গীত—শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। এইভাবেই বিষ্ণুপুরের ঘরে ঘরে ব্যক্তির মধ্যে শুরু হয়ে গেল সঙ্গীত-চর্চা। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি ও শুনেছি, বিষ্ণুপুরের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সঙ্গীত। সেখানকার আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ধ্রুপদী সঙ্গীত, বাতাস বয়ে নিয়ে চলেছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি, বিষ্ণুপুরের ছোট-বড় মানুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়ে চলেছে সুমধুর সুরধ্বনি, আর বনস্পতি যেন জাগিয়ে তুলছে সঙ্গীতের মর্মরধ্বনি। এই হল বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চার এককালের চেহারা। যে সঙ্গীতচর্চার নায়ক হলেন মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ।

এই রঘুনাথের রাজত্বকাল শুরু ১৭০২ সালে, অর্থাৎ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক কালে। আর এই রঘুনাথ সিংহই ঔরঙ্গজেব-প্রবর্তিত একটি শাসনতান্ত্রিক বিধিনিষেধের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বিষ্ণুপুরকে করে তুললেন সঙ্গীতের স্বর্গরাজ্য। দিল্লির বাদশাহ যখন রাজদরবারে এবং তাঁর সমস্ত রাজ্যে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করে দিলেন, তখন এই স্বৈরাচারী সম্রাটের নির্দেশ উপেক্ষা করে সাহসের বলে বলীয়ান হয়ে তদানীন্তন মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ বিষ্ণুপুরে আশ্রয় দিলেন তানসেনের এক উত্তরসূরি বাহাদুর খাঁ (সেন) নামে এক সঙ্গীতের ওস্তাদকে। তাঁকে বহাল করা হল সভাগায়ক হিসেবে। এখান থেকেই শুরু হল বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চা। সুতরাং ইতিহাসকে যদি সাক্ষী করা যায় তাহলে বলতে হবে, বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের সূত্রপাত 'সেনী-ঘরানা' দিয়ে। কিন্তু আপাতত আমরা 'বিষ্ণুপুর-ঘরানা' সম্বন্ধে বিতর্কে বা বিরোধের মধ্যে যাব না। সব জিনিসেরই তো একটা বিবর্তন আছে। কালের গতিতে একটা ঘরানার সঙ্গে আর একটা ঘরানার মিশ্রণ ঘটে আর একটা নতুন ঘরানা তৈরি হতে পারে। এইভাবেই ঘরানা নতুন থেকে নতুন চেহারা নিতেই পারে। তাই আমরা ঘরানার বিতর্কে না গিয়ে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে জড়িত দুটি অবিসংবাদিত নামকে স্মরণ করব—মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ এবং তাঁর আশ্রিত তানসেনের উত্তরসূরি বাহাদুর খাঁ ওরফে বাহাদুর সেন। এই উৎস থেকে প্রবাহিত হল কতই না সঙ্গীত-ব্যক্তিত্বের ধারা—গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, যদু ভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ। কিন্তু, এই কথাটি আমাদের সব থেকে আগে মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় রঘুনাথের আগ্রহেই বিষ্ণুপুরে শুরু হয় অবৈতনিক সঙ্গীত শিক্ষার আসর। শিক্ষাগুরু বাহাদুর সেন। আর, এই বাহাদুরের প্রথম দিকের শিষ্য হলেন গদাধর চক্রবর্তী ও রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। গদাধর চক্রবর্তী একটি বিশিষ্ট নাম হলেও বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চার প্রাণপুরুষ হিসেবে যে মানুষটি উঠে আসেন, তিনি হলেন সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য।

এই রামশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কিছু জানবার আগে আমরা একটা মূল বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেব। বিষয়টি হল—বিষ্ণুপুরী সঙ্গীত বলতে আমরা প্রাথমিকভাবে দুটি নামকে চিনি—রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও যদু ভট্ট। 'ভট্ট' বলে পরিচিত হলেও তিনি ভট্টাচার্যই। নাম—যদুনাথ ভট্টাচার্য ('রঙ্গনাথ' নামেও পরিচিত)। পিতা—মধুসূদন ভট্টাচার্য। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য হলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং যদু ভট্ট হলেন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুপুরে এখনো পাশাপাশি দুটি পাড়া রয়েছে। একটি হল বারেন্দ্রপাড়া। অপরটি, কাদাকুলি-বিশ্বাসপাড়া। এই বিশ্বাসপাড়াতেই কয়েকটি বৈদিক-ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। যার মধ্যে একটি পরিবারে জন্ম যদু ভট্টের। যদু ভট্ট ছিলেন এক অসামান্য সঙ্গীত-প্রতিভা। কিন্তু বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-ঘরানায় বা বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চায় যে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ অবদান আছে, এমন কথা বলা যায় না। বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-ঘরানা নির্মাণের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও অপরিসীম দান আছে যাঁর, এমন একজনের নাম করলে বলতে হয় রামশঙ্করের কথা। সেজন্য আমরা প্রথমে আসব রামশঙ্কর প্রসঙ্গে।

রামশঙ্কর ছিলেন যথার্থ আচার্য বলতে যা বোঝায়, এমনই এক ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত প্রভৃতি বহু বিষয়ে ছিল তাঁর সমান অধিকার। এ হেন রামশঙ্করের ব্যক্তিত্বের প্রভাব মল্লেশ্বর ভট্টাচার্য-পাড়ায় তথা সমগ্র বিষ্ণুপুরে কী পরিমাণে পড়েছিল, তা আমরা ছেলেবেলায় লক্ষ করতাম একটা বিশেষ মরশুমে। দুর্গাপুজোর সময়। এই সময় নবমীর রাত্তিরে রামশঙ্কর-স্থাপিত দুর্গামণ্ডপে দুর্গা-প্রতিমার সামনে চলত সঙ্গীতানুশীলন। সারা রাত্তির। সঙ্গীত-সাধকেরা মাকে শোনাতেন গান। এই ছিল রীতি। সাধন-রীতি। সুতরাং এই সঙ্গীত ছিল আত্মনিবেদন। বিষ্ণুপুরের আদি সঙ্গীত-চর্চাটাই তাই। মনে হয়, এই আত্মনিবেদনের ব্যাপারটাই রবীন্দ্রনাথকে এতটা আকৃষ্ট করেছিল বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের প্রতি। কিন্তু এই সাধন-সঙ্গীতের পথিকৃৎ হলেন রামশঙ্কর। এই রামশঙ্কর সম্বন্ধে তাঁরই এক উত্তরসূরির কাছে শোনা—তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চশিক্ষার জন্য বারাণসীধামে যান। সেখানে তাঁর শিক্ষাগুরু মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গীত শ্রবণ করতেন এবং তাঁরই সহায়তায় বারাণসীতে ও আশে-পাশে রামশঙ্করের সঙ্গীত-শিক্ষা চলতে থাকে। রামশঙ্কর যে পরবর্তীকালে বারাণসীর বাইরে সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন তার তথ্যও পাওয়া গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রামশঙ্করের প্রপৌত্র অরুণকুমার ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সংগৃহীত একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তথ্যটি থেকে রামশঙ্করের সঙ্গীত-চর্চা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা গঠন করা যেতে পারে। ঘটনাটা এই ধরনের। ১৯৩৮ সাল। বিষ্ণুপুরের অনতিদূরে তিলবাড়ি বলে একটি গ্রাম। সেখানে চলছে কংগ্রেসের অধিবেশন। ওই অধিবেশনে আমন্ত্রিত সঙ্গীত-শিল্পী হলেন ফৈয়াজ

খাঁ। ওস্তাদজী এখানে এসেই খোঁজ করেন রামশঙ্করের। এবং তিনি রামশঙ্করের বাসভবনে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠুকে প্রণাম করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রামশঙ্কর ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষের গুরুভাই। ওই অধিবেশনে তিনি রামশঙ্করের দু-একখানি গানও পরিবেষণ করেন এবং এইভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন না তুলে রামশঙ্করের ওই উত্তরসূরির কথামত বলছি, এই উপলক্ষে রামশঙ্কর-পরিবার থেকে নাকি ওস্তাদজীকে একটি সোনার তানপুরা উপহার দেওয়া হয় এবং তিনি তা সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে এই কথাটা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, একটা সোনার খেলনা তানপুরা দেওয়া ওই পরিবারের পক্ষে কিছুই না, কারণ ওই বাড়িতে (আমরা দেখেছি) পুজোর সময় অষ্টমীর দিনে সমস্ত বিষ্ণুপুরের প্রত্যেকটি পরিবার থেকে একজন করে নিমন্ত্রিত হতেন ভোগ খাবার জন্য। যাই হোক, রামশঙ্কর যে সঙ্গীত-চর্চায় কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা আজকের দিনে আর কল্পনা করাও যাবে না। তিনি ছিলেন কুলপতিসদৃশ এক ব্যক্তিত্ব। আহার দিয়ে, পরিধেয় দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতেন একাধারে সাহিত্য ও সঙ্গীত। আর এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চায় তাঁর পরে যে সব নাম উল্লেখ করা হয়, তার সবই তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরি।

রামশঙ্করের পরে যে নামটি আসে তা হল যদু ভট্ট। গোড়াতেই একটা পার্থক্যের কথা বলে নেওয়া দরকার। রামশঙ্কর ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার ধারক ও বাহক একজন দার্শনিক প্রশিক্ষক। যার জন্যেই তাঁর হাতে তৈরি এতজন বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত মহারথী। যাঁদের অন্যতম হলেন যদু ভট্ট। রবীন্দ্রনাথের কথায়, এত বড় ওস্তাদ আর দ্বিতীয়জন ভারতবর্ষে জন্মান নি। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য হলেও তো যদু ভট্টকে গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন। তাই তাঁকে চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি রবীন্দ্রনাথের। যাই হোক, রামশঙ্করের সঙ্গে যদু ভট্টের তফাৎটা হল, যদু ভট্ট একেবারেই বেহিসেবি এক পথভোলা পথিক। একেবারে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। তাঁ. পরিবারেও তাঁর সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। কিন্তু এই কথাটি সত্য, তাঁর বুনিয়াদটি হল ধ্রুপদী সঙ্গীত, যা তিনি লাভ করেছিলেন গুরু রামশঙ্করের কাছ থেকে। এবং অতি শৈশবে কিছুকাল মাত্র তিনি রামশঙ্করকে পেয়েছিলেন ও ধ্রুপদী সঙ্গীতের তালিম নেন। আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে শোনা, রামশঙ্কর নাকি বালক যদুকে একটি তানপুরাও দেন অনুশীলনের জন্য। যে তানপুরাটি নিয়ে যদু বাড়ির নিকটে অবস্থিত 'মদনমোহন মন্দির'-এ গিয়ে সঙ্গীতানুশীলন করতেন। যদু ভট্টের বুনিয়াদ যে রামশঙ্করের দেওয়া ধ্রুপদী সঙ্গীত, তা অনুমান করা যায় তাঁর রচিত কিছু গান দিয়ে। তাঁর কিছু বাংলা গান আছে, যা একেবারে ধ্রুপদাঙ্গ। যেমন ধরা যাক, 'শশধর তিলক ভাল' 'ভৈরব' রাগে ও ঝাঁপতালে নিবদ্ধ গানটি, অথবা 'বিপদ ভয় বারণ', 'ছায়ানট' রাগে ঝাঁপতালে নিবদ্ধ গানখানি একেবারে ধ্রুপদাঙ্গের। গানগুলি গাইলেই বিষ্ণুপুরী একটা শান্ত, সমাহিত ভাব ফুটে ওঠে। এই গানগুলি থেকে সহজেই অনুমেয়, তাঁর মধ্যে রামশঙ্করের প্রভাব। কিছুদিন শিখলেও তো গুরুর প্রভাব শিষ্যের উপর পড়বেই। যেমন ধরা যাক, যদু ভট্টের বেশ কিছু গানের ছায়া রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে। 'তিলক কামোদ' রাগে রচিত ঝাঁপতালে
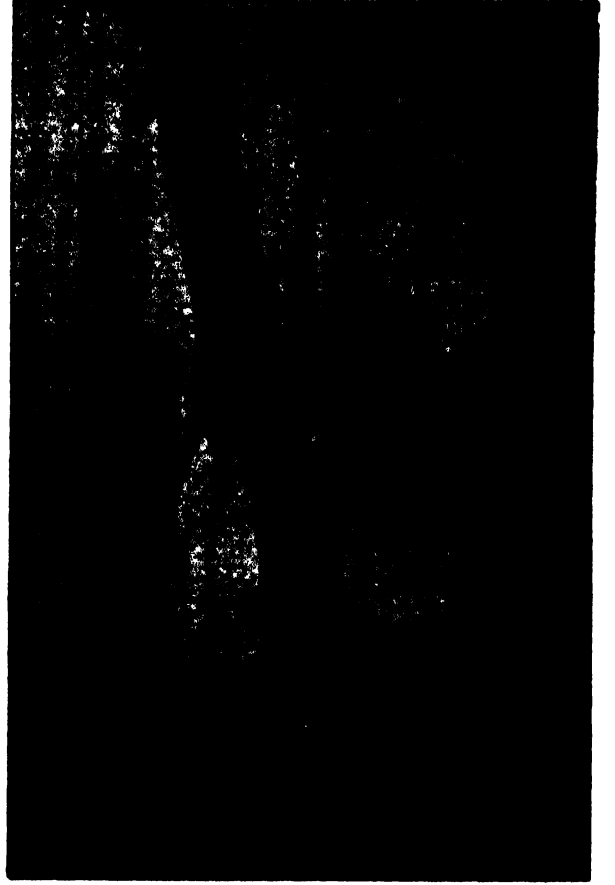
সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবদ্ধ যদু ভট্টের 'কওন রূপ বনি হো রাজাধিরাজ' অবলম্বনে একই রাগ ও তালে রয়েছে কবিগুরুর গান 'মধুর রূপে বিরাজ'। এরকম আরও কিছু এই ধরনের গান রয়েছে। মূল কথাটা হল, বিষ্ণুপুরী ঘরানায় যদু ভট্টের অবদান না থাকলেও রামশঙ্করের বিষ্ণুপুরী সঙ্গীত-চর্চার প্রভাবে তিনি যে প্রভাবিত হয়েছেন এবং উত্তরকালে এই বিষ্ণুপুরী সঙ্গীত যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে তা আমরা অস্বীকার করি কিভাবে ?

যদু ভট্টের পরেই যে নামটি এগিয়ে আসে তা হল সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এক কিংবদন্তি পুরুষ। সঙ্গীত যদি মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা এক অলৌকিক ঐশ্বর্য হয়, সেই ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন গোপেশ্বর। তাঁর চর্চার মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না। যার জন্য তিনি ছিলেন সঙ্গীতাচারীদের এক মহান আশ্রয়। সঙ্গীত বিষয়ে যখন যার যা প্রয়োজন তখন তা মেটাবার জন্য তাঁর আগ্রহটাই যেন বেশি হয়ে উঠত। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখনকার দিনে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যে-সব শিল্পী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন, তাঁরা কোন রাগ পরিবেষণ করবেন আকাশবাণী থেকে ঠিক করে দেওয়া হত। যদি এমন হত, কোনো শিল্পী সেই রাগটির সঙ্গে পরিচিত নন, তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতেন গোপেশ্বরের কাছে। জানতেন তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে

হবে না। একটা ঘটনা বলি। একদিন সঙ্গীতাচার্য স্নানের জন্য তেল মাখতে বসেছেন। এক ভদ্রলোক হাজির। কলকাতা থেকে আসছেন। যে ঘরে গোপেশ্বর গামছা পরে তেল মাখতে বসেছেন, সেই ঘরেই তাঁকে বসানো হল। শুরু হয়ে গেল আলাপচারিতা। ভদ্রলোকের মুখে শুনলেন, কেন তাঁর আগমন। যে রাগটি জানবার জন্য তিনি এসেছেন, গোপেশ্বর ওই অবস্থাতেই শুরু করলেন। তারপর স্নানাহার সেরে বসলেন এবং সারা দিন ধরে তাঁর সঙ্গে ওই রাগটি নিয়ে অনুশীলন করলেন। তারপর ছাড়লেন। এই হল গোপেশ্বরের সঙ্গীত-চর্চা। তার সঙ্গে মানবিকতা। এই প্রজন্মের শিল্পীদের জানা দরকার এই মানবিকতার কথা। চর্চার দিক থেকে ওই পর্যন্ত পৌঁছানো জানি না আর কারো সম্ভব হবে কিনা। কিন্তু চর্চার অর্থ তো এই-ই। এই কারণেই তো রবীন্দ্রনাথ গোপেশ্বরের নাম দিয়েছিলেন 'সুরের সরস্বতী'। এই সুর-সাধনায় তিনি ছিলেন এমনই একাগ্র যে, দিনের বেলায় মশারি খাটিয়ে সুর-সাধনা করতেন, যাতে মশার কামড়ে সাধনায় কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

কিন্তু গোপেশ্বরের সুরসাধনা ছিল ত্যাগের মহিমা-সম্পৃক্ত। নিজেকে সুরঋদ্ধ করে অপরকে সুরসমৃদ্ধ করাই ছিল তাঁর ব্রত। তাই সমগ্র বাঁকুড়া জেলার সঙ্গীত-চর্চা তখনকার দিনে ছিল গোপেশ্বর-কেন্দ্রিক। শুধু বাঁকুড়া কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যাপ্ত ছিলেন গোপেশ্বর তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে। আজও খুঁজলে দেখা যাবে গোপেশ্বরের সঙ্গীত বিবর্তনের ধারাপথ বেয়ে এই প্রজন্মের বহু শিল্পীর মধ্যে প্রবাহিত। এইতো হল যথার্থ সঙ্গীত-চর্চা। আর মানুষ চিনতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে গেলেন বিষ্ণুপুর থেকে বোলপুরে। সেখানকার সঙ্গীত-ভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে।

গোপেশ্বরের পরে আসি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। ব্যাপারটা হবে অনেকটা একই ধরনের। কেননা, গোপেশ্বর-সুরেন্দ্রনাথকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে লক্ষ্মণভাই। আমরা ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি,

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নবমীর রাত্তিরে রামশঙ্কর-স্থাপিত দুর্গামণ্ডপে দুর্গা-প্রতিমার সামনে চলত সঙ্গীতানুশীলন। সারা রাত্তির। সঙ্গীত-সাধকেরা মাকে শোনাতেন গান। এই ছিল রীতি। সাধন-রীতি। সুতরাং এই সঙ্গীত ছিল আত্মনিবেদন। বিষ্ণুপুরের আদি সঙ্গীত-চর্চাটাই তাই। মনে হয়, এই আত্মনিবেদনের ব্যাপারটাই রবীন্দ্রনাথকে এতটা আকৃষ্ট করেছিল বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের প্রতি। কিন্তু এই সাধন-সঙ্গীতের পথিকৃৎ হলেন রামশঙ্কর।

যেখানে গোপেশ্বর সেখানেই সুরেন্দ্রনাথ। তবে, সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-চর্চা ছিল বিলক্ষণ অন্য ধরনের। তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর বহুমুখিতা। কিন্তু, সেটা ছিল সাবলীল। একান্তই রক্তের ধারা। আমরা যখন কোনো আসরে গোপেশ্বর-সুরেন্দ্রনাথকে দেখতাম, তখন জানতাম গোপেশ্বর গাইবেন ধ্রুপদ। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাটা যে কী হবে, বলা কঠিন। কখনো তিনি পাখোয়াজী, কখনো ধ্রুপদিয়া, কখনো জলতরঙ্গ-বাদক, কখনো বা ব্যাঞ্জো-বাদক—এইরকম আর কী। সুরেন্দ্রনাথের বহুমুখিতা ও বৈদগ্ধ্যের ব্যাপারটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সেজন্য তিনি বেশ কিছু গানের স্বরলিপি করিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে। ধ্রুপদাঙ্গের গান। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা শুধু ধ্রুপদের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। যার অর্থ, বাঁকুড়া জেলার সঙ্গীত পেল একটা আন্তর্জাতিক পরিধি। মনে রাখা দরকার, এই সুরেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 'সুরের যাদুকর'। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট থেকে সুরেন্দ্রনাথকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তাতে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন—"উদার আনন্দে কবি যে গানের ঝরণাধারা বইয়ে দিয়েছিলেন তার অনেকটাই হারিয়ে যেত যদি কবির পাশে পাশে এমন দু-একজন মানুষ না থাকতেন যাঁরা গানের সেই পরিচয় লিপির টানে বেঁধে না রাখতেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ধরনের সাধক যাঁরা নীরবে কবির সেই মহার্ঘ দানকে সর্বসাধারণের করে দেবার আপ্রাণ সাধনা করেছেন, তারই কৃতজ্ঞ স্বীকৃতিতে আমি আজ টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুটের পক্ষে তাঁকে 'রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করি।" (*—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৬৭*)।

এত বড় মাপের মানুষ হলেও আমরা কখনো তাঁর মধ্যে দেখিনি নামের মোহ, যশের মোহ, অর্থের লোভ। সঙ্গীত-চর্চাকে নিয়েছিলেন জীবনের ব্রত হিসেবে। নিতান্তই আত্মনিবেদন। না হলে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ কি কখনো আকৃষ্ট হন ?

এর পর বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চায় যে পরিবারটি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তা হল গোস্বামী-পরিবার। এই গোস্বামী পরিবারই বিষ্ণুপুর

সঙ্গীত-চর্চাকে সমৃদ্ধ করলেন একটি পৃথক ধারায়—খেয়াল ও লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। গোস্বামী-পরিবার বিষ্ণুপুরের। কিন্তু এই পরিবারের গানকে কি আমরা বিষ্ণুপুর-ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করব ? আমাদের শৈশবকাল থেকেই দেখে এসেছি, গোস্বামী-পরিবারের সঙ্গীত-চর্চা একটা স্বতন্ত্রতার ছাপ রেখেছিল। একটা অন্য ধরনের শ্রুতিমাধুর্য। যার জন্য বেশ জনপ্রিয়। অর্থাৎ, একই মৃত্তিকার দুটি পরিবার যেন দুটি পৃথক ফসল। কিন্তু কেন ? জ্ঞান গোস্বামীর প্রাথমিক সঙ্গীত-শিক্ষা তাঁর কাকা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। এই রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গীত-শিক্ষার ইতিবৃত্তটা কী ? কলকাতায় নিমতলা স্ট্রিটে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে রাধিকাপ্রসাদ দীর্ঘকাল 'বেতিয়া ঘরানা'র মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে গুরুপ্রসাদের কাছেই অধিক পরিমাণে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা হয়। যার ফলে, বিষ্ণুপুরী উচ্চারণ সত্ত্বেও বিষ্ণুপুরী ঢঙে না গেয়ে 'বেতিয়া ঘরানা' অনুসরণ করে গাইতেন। ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌ সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি যে গান গেয়ে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন, তা হল 'বেতিয়া' ঘরানা'র। সেই আসরে গোপেশ্বরও গান পরিবেষণ করেছিলেন এবং একই মৃত্তিকার দুজন শিল্পীর গানের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজে দুজনেই নিজ নিজ উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কথা বলার উদ্দেশ্য, বিষ্ণুপুরের মাটিতে জন্মেও গোস্বামী-পরিবার বিষ্ণুপুর ঘরানা থেকে একটু পৃথকভাবে নিজেদের চিহ্নিত করেছিলেন যদিও একথা বলা যায় না যে, তাঁদের গানের মধ্যে বিষ্ণুপুরী ঘরানা একেবারেই ছিল না, আমরা এই বিষয়টির উপর নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেব যে, তাঁরা যে মাটিতে লালিত-পালিত তা

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

হল বিষ্ণুপুর। তাহলে তাঁদের গানে বিষ্ণুপুরের প্রভাব তো নিশ্চয়ই থাকবে। আমরা জ্ঞান গোস্বামীর কথায় এবার আসি। জ্ঞান গোস্বামী যে পাড়ায় জন্মেছেন এবং মানুষ হয়েছেন, তার পরিমণ্ডলটা তো ধ্রুপদের। অহরহই বাতাসের মধ্যে দিয়ে ধ্রুপদের সুর, ধ্রুপদী ঢং প্রবেশ করছে। কাজেই তাঁর সঙ্গীত-চর্চা যতই অন্য ঘরানার হোক না কেন, যতই খেয়ালের দিকে প্রবাহিত হোক না কেন, বিষ্ণুপুরী-ঘরানার প্রভাব তাঁর মধ্যে থাকবেই। যার জন্য আমরা দেখেছি, কাজী নজরুল ইসলামের গান যখন তিনি গাইছেন, তখন তাঁর মধ্যে ধ্রুপদ ও খেয়াল—দুটোর প্রভাব পাওয়া যাবে, অবশ্যই যদি সূক্ষ্ম শ্রুতিবোধ পোষণ করা যায়। যেমন ধরা যাক, তাঁর 'সৃজন ছন্দে'—নজরুলের এই গানখানি (তিলক কামোদ) একেবারে ধ্রুপদী ঢঙের। এইখানি ঘরোয়া বৈঠকে আমরা তাঁর মুখে শুনেছি একেবারে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদের কায়দায়। এই গানখানি গাইবার সময় দ্বিগুণ-চৌগুণ তাল বিভাগ করে করে দেখাতেন। আবার যখন 'ছায়ানট' রাগে গেয়েছেন 'শূন্য এ বুকে', তখন একেবারে খেয়ালের ঢঙে। গানের ফাঁকে ফাঁকে যে-তানগুলি তিনি করেছেন সেগুলি শুনলেই তাঁর খেয়াল-চর্চার পারদর্শিতা ফুটে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গীত-চর্চার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা না বললে তাঁকে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হবে না। তাঁর রক্তের ধারার মধ্যে ছিল একটা বৈষ্ণবীয় প্রেম। শত হলেও তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের উত্তরসূরি। তাই, 'শূন্য এ বুকে' গানখানি যখন তিনি গাইতেন এবং তান করতেন, সেই তানগুলির মধ্যে যেন গানটির অন্তর্নিহিত বেদনা প্রতিফলিত হত। এগুলো কিন্তু তাঁর মধ্যে বিষ্ণুপুরী প্রভাব। তাঁর যে-কোনও গান শুনলেই এই ব্যাপারটা ফুটে ওঠে। তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গীত-চর্চা সম্বন্ধে যেসব তথ্য পেয়েছি, তার মূল কথা হল, তাঁর মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ। শুধু খেয়াল নয়, টপ্পা গানেও তিনি ছিলেন অনন্য। শেষের দিকে তিনি নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতগুলি খুব গাইতেন। যেমন ধরা যাক 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে'—এই টপ্পা অঙ্গের গানখানি বা 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা' ইত্যাদি গান। তাঁর সঙ্গীতচর্চার বহুমুখিতা বলে শেষ করা যায় না। এমনও হত, একটি ঘরোয়া আসরে হয়ত দুজন শিল্পী। শুরুটা করবেন তিনি রাগপ্রধান দিয়ে, শেষটা হবে একজন বিখ্যাত খেয়ালিয়া দিয়ে। এমনও হত যে, তিনি হয়ত 'দরবারী কানাড়া' রাগের একটি রাগপ্রধান দিয়ে শুরু করলেন এবং সেই সূত্রে এমন আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন যে, অজান্তে প্রবেশ করে গেলেন 'দরবারী কানাড়া' খেয়ালে এবং ওই সন্ধ্যায় নির্ধারিত শেষ শিল্পী উৎসর্গ করে দিলেন তাঁর গানকে। জ্ঞান গোস্বামী ওই সন্ধ্যায় শুরু করলেন রাগপ্রধান দিয়ে, শেষ করলেন খেয়াল দিয়ে। এই হল জ্ঞান গোস্বামীর সঙ্গীত-চর্চা এবং এই জন্যই তাঁর সময় তিনি বাংলা গানে এনে দিলেন এক অভিনব জনপ্রিয়তার জোয়ার। সুতরাং, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা বাংলা গানকে যে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

জ্ঞান গোস্বামীর পর যে নামটি মনের উপরিভাগে উঠে আসতে চায়, সেটি হল সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নামটিকেই বলা যেতে পারে ওই প্রজন্মের শেষ জ্যোতিষ্ক। যদিও বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ওনার সংযোগটা ছিল খুবই কম। তবুও বিষ্ণুপুরের মাটির

সন্তান তো! কলকাতাবাসী। বিষ্ণুপুরে যেতেন খুবই কম। তাই আমরা বড় একটা পেতাম না ওনাকে বিষ্ণুপুরের অনুষ্ঠানে। কিন্তু বিষ্ণুপুর-ঘরানার প্রভাব যাবে কোথায়? বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা মানেই শান্ত, সমাহিত ভাব। সত্যকিঙ্করের মধ্যে বিলক্ষণ সেই ভাবটি ছিল। সঙ্গীত-চর্চায় ছিলেন কঠোর অনুশীলনব্রতী। বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনা করেন এবং আকাশবাণীতে বাংলা ভাষায় খেয়াল প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আকাশবাণী ত্যাগ করেন।

এখন আসা যাক, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা কিভাবে বিষ্ণুপুরের বাইরে বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীতের পরিমণ্ডল রচনা করতে সহায়তা করেছিল, সেই প্রসঙ্গে। তখমকার দিনে কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগকে যাঁরা অলংকৃত করেন, তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে গোপেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি ছিলেন ধ্রুপদাঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাজা। শেখাতেন ধ্রুপদও। খেয়ালে ছিলেন সত্যকিঙ্করের সুযোগ্য পুত্র অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবলায় সুবোধ নন্দী (বিষ্ণুপুরে 'প্যাঁড়া দা' বলে বিখ্যাত)। এখনো রয়েছেন বিষ্ণুপুরের সত্যকিঙ্কর-পরিবারের নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এইভাবেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা যে শুধু কলকাতাকে প্রভাবিত করেছে তা নয়, আমাদের এই বাংলার বিভিন্ন স্থানে, বিহার জামশেদপুর প্রভৃতি স্থানে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা সামগ্রিকভাবে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে এবং এখনো করে চলেছে। এই বাঁকুড়ার মাটির সন্তান এক বিদুষীর নাম না করলে ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাঁকুড়ার সোনামুখী গ্রাম। সেখানকার সোনা হলেন শান্তিনিকেতনের 'মোহর'। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক প্রবাদপ্রতিম বিদুষী ও সাধিকা। তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চাই প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, তিনি বাঁকুড়ার মাটির একজন। সঙ্গীতে আত্মনিবেদনই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

এবার প্রসঙ্গান্তরে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নয়, লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নয়, ধ্রুপদ নয়—একেবারে সাধারণ মানুষের গান—লোকগীতি। আমাদের ছেলেবেলায় একটা ছড়া মুখে মুখে প্রচারিত ছিল—

'গান-বাজনা মোতিচুর
তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর'

প্রকৃতপক্ষে, তখনকার বিষ্ণুপুর মানেই গান-বাজনা। ছেলেবেলায় শুনেছি যত্র-তত্র সাধারণ মানুষের গান। কারখানায় শ্রমিকেরা বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে যে গান গাইত তার মধ্যে সুর ও তালের কত সমৃদ্ধি। সাপুড়ের গান, তার সঙ্গে বাঁশির সুরের মধুর রাগিণী, সাঁওতালদের ঝুমরা গান, মাদল-বাদন প্রণালী যেন একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলত। আর ছিল পদাবলী কীর্তন, তার সঙ্গে খোল বাদনের ছিল মণিকাঞ্চন যোগ। এ ছাড়া বিভিন্ন উৎসবে সমাজের অতি সাধারণ স্তর থেকে উঠে আসা গান, বাউল গান—এই সর্ব। কত আর বলা যাবে? একটি উৎসবের গানের প্রসঙ্গে আসা যাক। তুষু-উৎসব। মকর-সংক্রান্তিতে পালিত হয়। বাঁকুড়ার এই তুষু-গানের কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। গানের অংশবিশেষ উল্লেখ করা যাক্—

'তুষু-তুষু করি আমরা
তুষু আমার ঘরে গো।
....
.... ''

ভেলা নিয়ে মেয়েরা চলেছে জলাশয়ে ভাসিয়ে দিতে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে যাচ্ছে। আর বলছে—

"আমার তুষু তোমার তুষু
তুষু নাই মা ঘরে গো"।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই গানটির ছন্দ। ছন্দটি হল আগাগোড়া ২ + ৪। যাকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট তাল বলা হয়। ষষ্ঠীতাল। কাগজে লিখে যদি গান শোনানোর উপায় থাকত, তাহলে এই মুহূর্তেই শুনিয়ে দেওয়া যেত কিভাবে রবীন্দ্রসৃষ্ট ষষ্ঠীতালের আগেই বিষ্ণুপুরের বা বাঁকুড়ার তুষু-গানে ষষ্ঠীতাল বিরাজ করত। মনের গভীর থেকে একটা প্রশ্ন উঠে আসে—বাঁকুড়া জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সুর ও ছন্দের উৎকর্ষ এল কিভাবে। এর উত্তর যুক্তি দিয়ে পাওয়া মুশকিল। উত্তরটা খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ে একটি মানুষের কথা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এই ইংরেজ কবির বিখ্যাত উক্তি— 'নেচার ইজ আওয়ার টিচার'। বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়া জেলার মাটিতেই রয়েছে সঙ্গীত, আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সঙ্গীত, পাহাড়ে-গুহায়, নদীতে-দীঘিতে, বনে-জঙ্গলে, সর্বত্র রয়েছে সঙ্গীত। তাহলে বাঁকুড়া জেলা যে লোকগানে অলৌকিক হয়ে উঠবে—এ আর বিচিত্র কী?

অতি আধুনিক কালের বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের চর্চা কী রকম—জানবার কৌতূহল নিয়ে ওখানকার সঙ্গীতমহলের কিছু প্রবীণ ও কিছু নবীনের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। বেরিয়ে এল দুটি দৃষ্টিভঙ্গি। প্রবীণের মতে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ-চর্চা অস্তাচলগামী, টপ্পা গানের চর্চা নেই বললেই হয়। জ্ঞান গোস্বামী যে ধরনের শ্যামাসঙ্গীত বা রাগপ্রধান চর্চা করতেন, তা-ও এখন অস্তের পথে। গোপেশ্বর-সুরেন্দ্রনাথ যে শুদ্ধাচারে ধ্রুপদ-চর্চা করতেন, তার শিক্ষার্থীও এখন নেই, যদিও শেখাবার মতো দু-একজন আছেন। আবার, নবীনদের মতে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা ঠিকই আছে, লোকগীতি লোকেরা ঠিকই ধরে রেখেছে। বর্তমানে বিষ্ণুপুরের ছেলেমেয়েরা বেশ উৎসাহ সহকারেই গান-বাজনা শিখে চলেছে—শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, লঘু শাস্ত্রীয়

বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত মহিলা শিল্পী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী

রামশরণ সংগীত মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর

সঙ্গীত, বাংলা গান, লোকগীতি। এর সঙ্গে আছে বাদ্যযন্ত্র চর্চাও। অর্থাৎ, বিষ্ণুপুরের গান 'গেল-গেল' বলে হইচই করার কোনো হেতু এখনও পর্যন্ত হয়নি। এঁদের মতে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত-চর্চা ভালই চলছে। সরকারি আনুকূল্যে প্রতি বছর এখানে 'বিষ্ণুপুর উৎসব' পালিত হয় মহা ধুমধামে। এই উৎসবের মধ্যে একটি দিন নির্ধারিত আছে বিষ্ণুপুরের ছেলেমেয়েদের গানবাজনায় অংশগ্রহণের জন্য। এ ছাড়া সরকারি উদ্যোগে বহিরাগত শিল্পীদের গান শোনানোর ব্যবস্থা হয়। এখানকার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়েও সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং, বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত-চর্চা রীতিমতই আছে।

বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চার বর্তমান হালহকিকৎ সম্পর্কে এই দু-ধরনের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে একটি উদারনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বিবর্তনের ধারাপথে প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণিজগতে যেমন অভিযোজন আছে, মনোজগতেও তাই। এটি বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেলের সূত্র। বিবর্তনতত্ত্বেও ডারউইন বলে গেছেন যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথা। এই বিবর্তনের ধারাপথকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে মেনে নিতেই হয়। এবং দার্শনিক হেগেলের সূত্রটি সামনে রাখতে হয়। যেখানে তিনি বলছেন তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কথা। মনোজগতেও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। সুতরাং শিক্ষা হোক, সংস্কৃতি হোক, সেখানে চলেছে 'বাদ-প্রতিবাদ ও সমবাদ' এই ত্রিমুখী প্রক্রিয়া। প্রকৃতি-জগতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পাশাপাশি যে পদ্ধতিতে রয়েছে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন'। সুতরাং যে পদ্ধতিতে এই প্রকৃতির বুক থেকে ডাইনোসরের মতো অতিকায় প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গেল, সেই একই পদ্ধতিতে মনোজগতের অধিবাসী শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আস্তিত্বের সংগ্রাম হয়েই চলেছে এবং হয়ত দেখা যাবে, এই বিজ্ঞান, অতিবিজ্ঞান ও কর্মব্যস্ততার যুগে ধ্রুপদের মতো কঠিন বা অতিভারী চর্চা মানুষের মন থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই যদি বৈজ্ঞানিক সত্য হয় তখন রামশঙ্কর-যদু ভট্ট-গোপেশ্বর-সুরেন্দ্রনাথের বিষ্ণুপুরকে আজকের যুগে আশা করা কি অতিভাবাবেগতার নামান্তর নয়? যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে হবে। তাহলেই দেখতে পাব, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চা ঠিকই আছে। স্থানমাহাত্ম্য বলে যদি কিছু থাকে, তা আজও আছে: এবং থাকবেও। বিষ্ণুপুরের মাটিতে সঙ্গীত আছে। সেখানকার ছেলেমেয়েরা বিষ্ণুপুরী ঐতিহ্যের গান যে একেবারেই শিখতে চায় না তা নয়। কিন্তু এখানে মনে হয়, একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এখনও বিষ্ণুপুরের কলকাতাবাসী সন্তানদের বিষ্ণুপুরের ছেলেমেয়েরা যদি একটা নিয়মিত ব্যবধানে পেত, তাহলে এই প্রজন্মের মধ্যে ধারাটা কিছুটা পরিমাণে হলেও তো থাকত। এক্ষেত্রে বড়দেরও একটা দায়-দায়িত্ব রয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য সুতরাং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যা প্রয়োজন তা হল সমাজ সচেতনতা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। সরকারের দিক থেকে 'বিষ্ণুপুর মেলা', সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়কে সরকারি অনুদান দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসাহ দান তো চলছে এবং সাধারণ মানুষ চাইলে তা চলবেও। সুতরাং, এখন যা প্রয়োজন, তা মনে হয়, সঙ্গীত জগতের প্রবীণ যাঁরা রয়েছেন, যাঁদের সহযোগিতায় বিষ্ণুপুরের এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য চিনবে ও অনুসরণ করার চেষ্টা করবে, তাঁদের এগিয়ে আসা ও আত্মনিবেদন করা। বড়দের কাছে না পেলে ছোটরা বড় হবে কিভাবে? আমার মনে হয়, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চাকে বজায় রাখা সমাজের দায় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি নির্ভর। দ্বিতীয় শর্তটি ঠিকই আছে, কিন্তু প্রথমটি? সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে, তবেই বাঁকুড়া জেলার সঙ্গীত-চর্চা ঠিক থাকবে।

লেখক : শিক্ষক, বিশিষ্ট সংগীত-সমালোচক
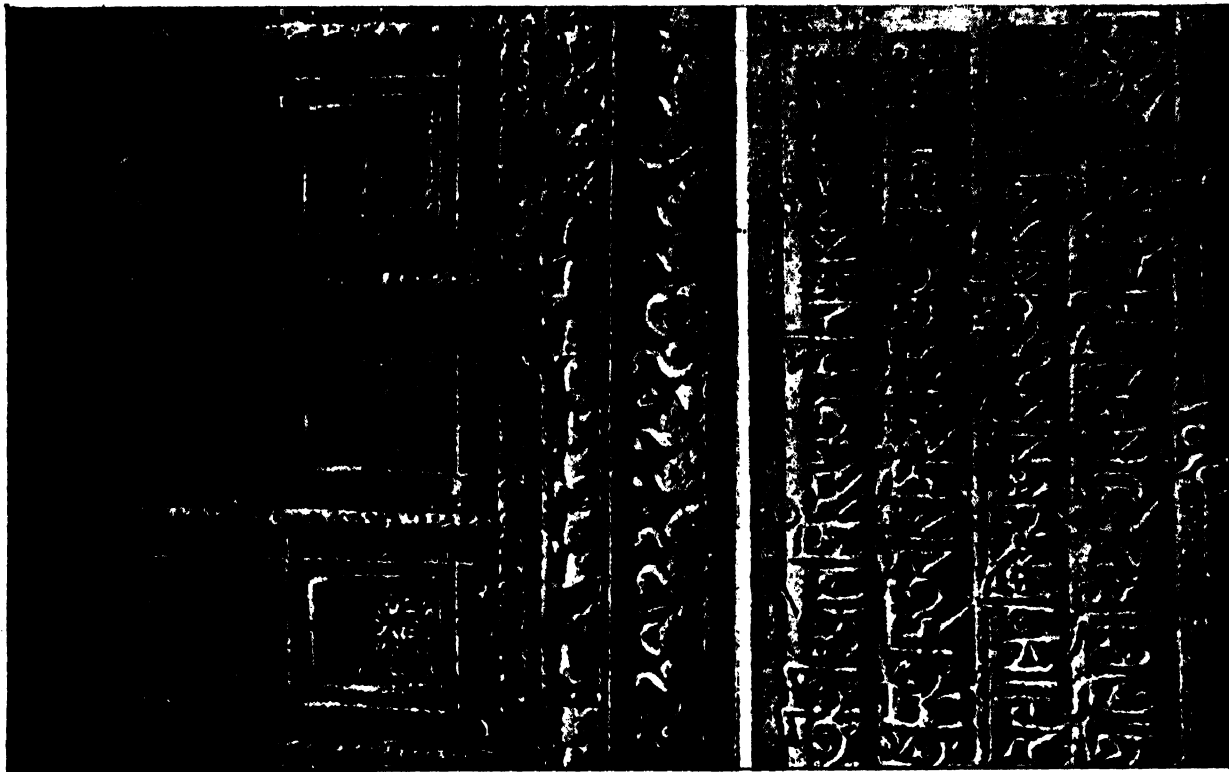
মদনমোহন মন্দিরের টেরাকোটা সজ্জা ও মুরলীমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি : বিষ্ণুপুর

রাধাদামোদর মন্দিরের টেরাকোটা সজ্জা, হদলনারায়ণপুর

ইংরেজ রাজত্বকালে শহর বাঁকুড়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রসঙ্গ

শেখর ভৌমিক

এ পর্যন্ত জানা বাঁকুড়া শহর তথা বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদ সাময়িকপত্র 'বাঁকুড়া দর্পণ'। তবে তারও আগে নূতনচটির বাসিন্দা অবিনাশচন্দ্র দাসের উদ্যোগে 'বাঁকুড়া হিতৈষী' নামে এক সংবাদপত্রিকা প্রকাশিত হত বলে শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীও সাম্প্রতিক গ্রন্থে লিখেছেন, পৌরসভার নথিপত্র থেকে মনে হয় যে, শহরে 'পাক্ষিক সমালোচক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত।

জন ক্রমফিল্ড একদা লিখেছিলেন, 'কলকাতার উপর বাংলার আধুনিক ঐতিহাসিক বা গবেষকদের মাত্রাতিরিক্ত মনোনিবেশের ফলে মফস্বল বাংলার বিভিন্ন জায়গার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা উপেক্ষিত হচ্ছে'।[১] অথচ ক্রমফিল্ড আমাদের জানিয়েছেন, হাজারিবাগ বা বাঁকুড়ার মতো জেলাতেও 'কোডারমা মাইকা মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন' বা বাঁকুড়া এগ্রিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর মতো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল[১]। সুতরাং তাঁর এই আক্ষেপ ভিত্তিহীন বা অমূলক নয়।

ইংরেজ আমলের সরকারি কাগজপত্র থেকে হালের প্রতিবেদন সব ক্ষেত্রেই বাঁকুড়ার উল্লেখ এক দরিদ্র ও অবহেলিত জেলা হিসাবে। ইংরেজ শাসনের শুরুতেই 'View of the Revenues of Bengal' (১৭৮৮)-এ গ্রান্ট বাঁকুড়াকে 'আদিম অসভ্যদের বাসভূমি' বা দস্যু-তস্করের আড্ডা—ইত্যাদি বাছাই করা বিশেষণে ভূষিত করেছেন[২]। হ্যামিলটনও লিখছেন 'The name of this district implies a waste territory and backward stage of Civilization'।[৩] ১৮৩৮-এ হরচন্দ্র ঘোষ লিখছেন, 'প্রাকৃতিক সুযোগের অভাবে এখানকার অধিবাসীরা এখনও অজ্ঞতার অন্ধকারে এবং নৈতিক অধঃপতনের মধ্যেই রয়ে গেছে। উন্নতির প্রচেষ্টা অধিবাসীদের মধ্যে এখনও দেখা যায়নি।[৪] হয়ত এই নৈতিক অধঃপতনের জন্যই 'দেশাবলিবিবৃতি'র রচয়িতা লিখেছেন 'দারিকেশী নদী পর্যন্ত মলভূমি ধর্মবর্জিত'।[৫]

রবার্টসনের প্রতিবেদনেও দেখছি, বাঁকুড়া বাংলার সবচেয়ে অনগ্রসর জেলা এবং কৃষিই এখানে প্রধান।[৬] অথচ সেই কৃষির অবস্থাও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মোটেই উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না বলে লিখেছেন বিনয়ভূষণ চৌধুরী'।[৭] বিংশ শতকেও এই চিত্র অপরিবর্তিত। রামানুজ কর তাঁর গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'বাঁকুড়া জেলার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইতেছে।'[৮] আর জেলার ৮০ শতাংশেরও বেশি-মানুষ কৃষিতে নিয়োজিত থাকলেও অবস্থা আজও তেমন উন্নত হয়ে ওঠেনি বলে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে।[৯]

এই অনগ্রসরতা কিন্তু জেলার সারস্বত সাধনা বা সাংস্কৃতিক জীবনকে রুদ্ধ করতে পারেনি। বাংলা ১২৬০ সালে (ইং ১৮৫৩) যদুনাথ সর্বাধিকারী উত্তর ভারত ভ্রমণে যাবার পথে বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি জায়গায় অবস্থান করেছিলেন। তিনি সোনামুখীতে 'ইরেজি ও ফারসি শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত আছে' বলে লিখেছেন।[১০] এর ঠিক দশ বছর পর ১৮৬৩ সালে গ্যাস্ট্রেলের প্রতিবেদনে জেলায় গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাচ্ছি। তিনি আরও লিখেছেন ১০টি বিদ্যালয়ে ৮৫৫ জন ছাত্র ছিল।[১১]

১৮৭৪ সালেই অর্থনৈতিক সংগ্রহশালা স্থাপনের উদ্দেশ্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল—'Bankura District Economic Museum Committee'।[১২] ১৮৮৫-র পৌরসভার নথিপত্রে পাচ্ছি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উল্লেখও।[১৩]

বিংশ শতকে গড়ে উঠল ব্রাহ্মসমাজের মতো প্রতিষ্ঠানও। নীলমণি চক্রবর্তীর 'আত্মজীবন স্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন, প্রায়শই তিনি বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যেতেন। ব্রাহ্মবন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ গুহ ছিলেন বিদ্যালয়সমূহের উপ-পরিদর্শক। বিষ্ণুপুরের উকিলদের মধ্যে তিনি অগ্রণী।[১৪]

কৃষ্ণকুমার মিত্রও লিখেছেন 'বাঁকুড়া স্কুল'-এর শিক্ষক কেদারনাথ কুলভির কথা। তাঁর চরিত্রের প্রভাবে বাঁকুড়ার ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, মোক্তার ও হাকিমরা তাঁর 'অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। এঁদের অনেকেই ব্রাহ্মধর্মানুরাগী হয়েছেন'।[১৫] কুলভিবাবু ব্রাহ্ম বিবাহ 'রেজিস্ট্রার'ও হয়েছিলেন।[১৬]

এডওয়ার্ড টমসন বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজে ইরেজি পড়াতেন। তাঁর উপন্যাস 'An Indian Day'র প্রায় সবকটি চরিত্রই বাঁকুড়ায় অবস্থানকালে যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তাদের আদলে সৃষ্ট। শুধু নাম বদল করেছেন, যেমন বাঁকুড়ার পরিবর্তে বলছেন বিধুগাঁও বা ছাত্‌নার পরিবর্তে হাত্‌না। তিনিও বলেছেন, জেলার ক কমলাকান্ত নিয়োগীর পরিবার ব্রাহ্ম এবং দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ইংল্যান্ডের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।[১৭] আর সামান্য হলেও ১৯২৪ সালে ব্রাহ্মসমাজের সহ-সম্পাদক সুরেন্দ্রশশী গুপ্তের আবেদনে সাড়া দিয়ে নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য পৌরসভার তিন টাকা সাহায্য দানের কথা নথিপত্রে পাওয়া যাচ্ছে।[১৮]

প্রতিবেশী এবং আর্থিক ক্ষেত্রে অগ্রসর বর্ধমানের মতো জেলা থেকে প্রকাশিত 'বর্ধমান সঞ্জীবনী'র গ্রাহক সংখ্যা যেখানে ১৮৯৩ সালে ৩২০, বা ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'চারুবার্তা'র গ্রাহক সংখ্যা ৩০০, সেখানে ১৮৯৩-র মার্চে এই 'অনগ্রসর' জেলার প্রথম সংবাদ সাময়িকপত্রর গ্রাহক সংখ্যা ৩৬০, ১৯১২-য় যা গিয়ে পৌঁছয় ৪৫৩-তে।[১৯] সুতরাং মানসিক বা বৌদ্ধিক অনগ্রসরতার কথা বলি কি করে ? তবে আত্মসন্তুষ্টির কোনও জায়গা নেই। কারণ, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যার ৮০ পৃষ্ঠায় 'লক্ষ্মী' লিখছে—'বাংলায় শিক্ষিতের হার তুলনা করলে বাঁকুড়ায় শিক্ষিতের সংখ্যা কম নয়—১১%। কিন্তু সব জেলাতেই সাপ্তাহিক বা মাসিক দু-তিনটি পত্রিকা চলছে, পাঠকসংখ্যাও বেশি। কিন্তু বাঁকুড়ায় এরূপ উন্নত ভাবের একমাত্র 'লক্ষ্মী' পত্রিকার পাঠক আশানুরূপ নয় কেন ? 'জেলায় সাহিত্যচর্চার অভাবই এর কারণ। আমরা কি এই লিপ্সা জাগাতে পারি না ?'

যাই হোক এই সমস্ত চেতনা কিন্তু আকস্মিক নয় বা দুর্ঘটনাও নয়। এর একটি সুনির্দিষ্ট পটভূমি ছিল। এক সুসংহত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষই যে এই চেতনার বা কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এই মধ্যবিত্ত পৌরসভায় পুরপিতা হয়েছেন। তারও আগে কান্তি চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ সিং বা রামতারক রায়রা 'ডিসপেনসারি কমিটি'-তে গেছেন।[২০] তাঁরা লোকাল বোর্ড নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, সারস্বত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন, সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন, 'Marriage among the Hindus has now-a-days become a regular trade' জাতীয় পণপ্রথা-বিরোধী মন্তব্য করে[২১] প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিরিঞ্চি দত্তের সেই পাচক ব্রাহ্মণকে আমরা জানি বাঁকুড়া নিবাসী যে বীর শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে একরাত্রে রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীকে বিবাহ করে দেশে চলে যায়, আর ফেরেনি[২২]।

সংবাদ সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও প্রকাশের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্ক নিবিড়। সুতরাং কিভাবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঁকুড়া শহরে গড়ে উঠেছে বা সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণ করছে তা কিছুটা দেখে নেওয়া আবশ্যক।

প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে উনিশ শতকে বাঁকুড়া শহরের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক সরকার নিয়ে আসে নতুন নতুন সম্ভাবনা। আশপাশের গ্রাম বা ভিন্ জেলা থেকেও ভাগ্যান্বেষীরা ভিড় জমায়— 'In many Cases the cities in less developed areas were established in a colonial period as centres of administrative control ....such cities have always attracted a number of rural residents ....looking for Jobs. (in trades. construction. services and administration) for small amount of cash, excitement or independence from their families or more generally pursuing the hope of changing their status in life.'[২০] বস্তুত এই প্রলোভনেই মানুষ শহরে এল, গড়ে উঠল জাতি বা কুলবৃত্তি- ভিত্তিক বসতিবিন্যাস—পোদ্দারপাড়া, তাঁতিমহল্লা রক্ষিতমহল্লা, ঘটকমহল্লা, লোহারমহল্লা—[২১] ইত্যাদি। তবে বৃত্তিগত সচলতাও ছিল। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থরাও হাটবাজার থেকে শুরু করে লবণ বা আফিম ব্যবসাও করেছেন। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত এক পুরনো আফিম বিক্রির পাট্টায় দেখেছি বিক্রেতার নাম রাম স্বরণ (এই বানানই আছে) গোস্বামী, পাট্টার তারিখ ১৮৬১। শ্রীপান্থ লিখেছেন, ১৮১৫-র 'মেকলে মিনিট', ১৮৩৭-এ আদালতে ইরেজি ভাষার প্রচলন ইত্যাদি জন্ম দিয়েছে নতুন নতুন বাবুকে। বাবুয়ানার নতুন শর্ত বিদ্যা।[২৫] 'Yes' 'No বা 'Very well'-এর জোরে সেকালের বাঙালি বাবুরা ইংরেজদের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন।[২৬]

জমির উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে না পেরে মধ্যস্বত্বভোগীর সন্তানরা বিভিন্ন 'হাই স্কুলে' ভিড় জমিয়েছিল। ১৮৭২-৭৩ সালে বাঁকুড়া জেলার ১৯২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চবিদ্যালয় ছিল তিনটি, মধ্য ও প্রাথমিক যথাক্রমে ২২ ও ১৬৪টি, মহিলা বিদ্যালয় তিনটি।[২৭] সরকারি চাকরি পাওয়ার আশায় মানুষ ইংরেজি শিখছিল। বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করে। মধ্যবিত্তদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কেন বাড়ছে, সে সম্পর্কে ১৮৮১-৮২ নাগাদ 'সোমপ্রকাশ' লিখছে, 'আমাদিগের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য।' ইংরেজের অধীনে চাকরি সামাজিক মর্যাদার সবচেয়ে শক্তিশালী 'elevator'। কোনও বাঙালি ব্যবসায়ী যদি লক্ষপতিও হন, তাহলেও একশত টাকা বেতনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট চাকুরের কাছে তাঁর সামাজিক মর্যাদা নগণ্য।[২৮] তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েটদের তালিকায় বাঁকুড়া জেলা থেকে ১১ জন ছিলেন দেখতে পাচ্ছি।[২৯] এঁদের কেউ শিক্ষক, কেউ বা ব্যবহারজীবী/উকিল। পরে আরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল, প্রশাসনেও এঁরা ঢুকে পড়লেন—বেইলির ভাষায়— 'Service Gentry'।[৩০] ১৮৭২-৭৩ সালে বাঁকুড়া জেলায়
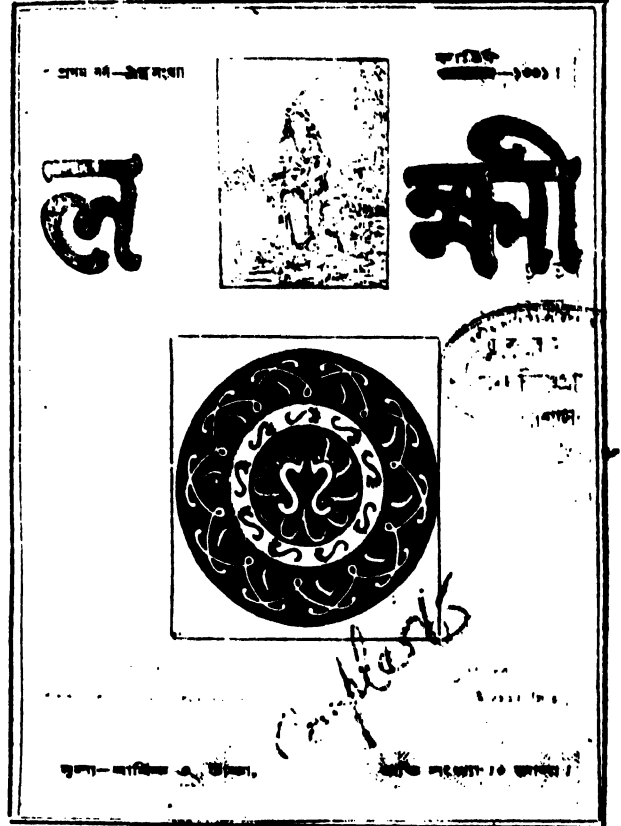
১৩৩১ সালে প্রকাশিত 'লক্ষ্মী' পত্রিকা

সর্বমোট ২৫৪ জন শিক্ষক ছিলেন।[৩১] আবার ১৮০৯, ১৫, ১৭, ১৮১৮ বা তারও পরবর্তী সময়ে 'Judicial and Police Establishment'গুলিতে দেখছি কিভাবে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ধীরে ধীরে প্রশাসনে ঢুকে পড়ছিলেন। শহরের ১৪টি মহল্লায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি ১১২। এর মধ্যে ব্যানার্জি, মুখার্জি, মিত্র বা সরকারদের পাশাপাশি সংখ্যায় কম হলেও পোদ্দার, তাম্‌লি বা মুসলমানও আছেন।[৩২] এঁরাই বাঁকুড়া শহরের প্রথম বাঙালি 'ভদ্রলোক', বি বি মিশ্রর 'The Educated Middle Class' বা বিনয় ঘোষের 'নাগরিক মধ্যবিত্ত'।[৩৩] শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত প্রসারের ফলে ক্রমে রাজনৈতিক ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে তাঁদের আধিপত্য বাড়ছিল। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার- শিক্ষক—এঁরাই ক্রমে জেলার রাজনৈতিক মুখপাত্র হয়ে উঠছিলেন। এঁদের সঙ্গে ছোট জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারি বা বিদ্যালয় পরিদর্শকরাও ছিলেন। ১৯০৫-৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর গড়ে ১৯৩৫ জন গ্রাজুয়েট হয়েছে। এর শতকরা ২৫ জন ওকালতিবৃত্তি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা সর্বাধিক (আনুপাতিক হারে)। আসলে আইন ব্যবসা ও ডাক্তারি—দুটিই স্বাধীন পেশা ও তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণের সুযোগও সেখানে বেশি। এই সুযোগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত উকিলবাবুরা নিলেন।[৩৪] বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম দিককার পুরপিতাদের যতজন সম্পর্কে জানতে পেরেছি তার সাতজনই

ওকালতি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, দু-একজন ডাক্তার। পৌরসভা তৈরিরও আগে যখন 'টাউন কমিটি' ছিল, তখনও দেখতে পাচ্ছি সেই কমিটির সদস্যরা অনেকেই এই নতুন নেতৃত্বের প্রতীক। হরিহর মুখোপাধ্যায় ও হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছিলেন ওই টাউন কমিটির সদস্য। প্রথমজন ছিলেন উকিল এবং পরবর্তীকালে বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম ভারতীয় 'চেয়ারম্যান'।[৩৩] আর হরিশঙ্করবাবু ছিলেন উনিশ শতকের বাঁকুড়া শহরের এক ধনী জমিদার।[৩৪] এই নতুন নেতৃত্ব কিন্তু সমাজের শীর্ষদেশে যাবার জন্য মন্দির বানাননি বা কথকতার ব্যবস্থাও করেননি। এরা দাঁড়ালেন ভোটে, জাঁকিয়ে বসলেন পৌরসভা বা 'লোকাল বোর্ড'-এর মতো প্রতিষ্ঠানে।[৩৫]

বাঁকুড়া পৌরসভার নথিপত্র থেকে উনিশ শতকের যে পুরপিতাদের নাম পাচ্ছি তাঁদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের বা সামাজিক অবস্থানের দিকে দেখলেই ব্যাপারটা অনেক স্পষ্ট হয়। যেমন কান্তিচন্দ্র চ্যাটার্জি, ইনি ছিলেন 'Deputy Magistrate and Deputy Collector'। এঁর ভাই বামুনদাসও ছিলেন পেশকার, আদিনিবাস হুগলির গুপ্তিপাড়া।[৩৬] ইন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাসরা এসেছিলেন বালি উত্তরপাড়া থেকে ওকালতি সূত্রে, এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যোতিষচন্দ্র ছিলেন নাজির।[৩৭] নটবর মিত্র ছিলেন ডাক্তার, আদি নিবাস বর্ধমান জেলার প্যামড়া গ্রাম।[৩৮] বিনোদবিহারী মণ্ডল, বসন্তকুমার নিয়োগী, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনজনই উকিল।[৩৯] নবীন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন জেলা জজের সেসন আদালতের 'এসেসার'।[৪০] শেষের দুজনই 'Economic Museum Committee'-তে ছিলেন। আলি জামিন ছিলেন ব্যবসায়ী,[৪১] নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার।[৪২] গগনলাল ও সারদাপ্রসাদ পাঠক ছিলেন সদরের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট।[৪৩] গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন উকিল, হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ।[৪৪] রামচন্দ্র দীক্ষিত কোতুলপুরের 'Rural Sub-Registrar' ছিলেন।[৪৫] প্রতাপনারায়ণ সিং ছিলেন 'Deputy Magistrate and Deputy Collector', তিনি আবার লোকাল বোর্ডের 'চেয়ারম্যান'ও হয়েছিলেন।[৪৬]

১৮৮৫-র 'Local Self- Govt. Act' অনুমোদিত হওয়ার পর এই উদীয়মান, উচ্চাভিলাষী নেতৃত্বের অনেকেই 'লোকাল বোর্ড' বা 'জেলা বোর্ড' নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আরও বৃহত্তর স্বীকৃতি চাইলেন। ১৮৮৬-র প্রথম লোকাল বোর্ড নির্বাচনে বাঁকুড়া শহরের যে নাগরিকরা বাঁকুড়া থানা থেকে নির্বাচিত হন বা মনোনীত হন তাঁদের মধ্যে বাঁকুড়া 'ম্যাজিস্ট্রেসি'র প্রধান করণিক ও শেরিস্তাদার কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, উকিল বসন্তকুমার নিয়োগী, বিনোদবিহারী মণ্ডল ; আলি জামিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৪৭] আগে যে 'Economic Museum Committee'র কথা উল্লেখ করেছি, তারও অনেক সদস্যই আবার 'লোকাল বোর্ড'-এও ঢুকে পড়েছিলেন। যেমন— খাতড়া থানা থেকে নির্বাচিত হাড়মাসড়ার জমিদার, 'রোড সেস' কমিটি ও জেলা বিদ্যালয় কমিটির সদস্য নদের চাঁদ রায় এবং অযোধ্যার জমিদার বেণীমাধব ব্যানার্জি ও কুচিয়াকোলের জমিদার রাধাবল্লভ সিং।[৪৮]

যাই হোক্ ইংরেজি শিক্ষিত এই ব্যক্তিবর্গের একাংশকেই বাঁকুড়ার প্রথম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বলেও অভিহিত করা যায়। গ্রামসীর

> **প্রতিবেশী এবং আর্থিক ক্ষেত্রে অগ্রসর বর্ধমানের মতো জেলা থেকে প্রকাশিত 'বর্ধমান সঞ্জীবনী'র গ্রাহক সংখ্যা যেখানে ১৮৯৩ সালে ৩২০,বা ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত চারুবার্তা'র গ্রাহক সংখ্যা ৩০০, সেখানে ১৮৯৩-র মার্চে এই 'অনগ্রসর' জেলার প্রথম সংবাদ সাময়িকপত্রর গ্রাহক সংখ্যা ৩৬০, ১৯১২-য় যা গিয়ে পৌঁছয় ৪৫৩-তে। সুতরাং মানসিক বা বৌদ্ধিক অনগ্রসরতার কথা বলি কি করে ?**

ভাষায় এঁরাই অর্থাৎ এই শিক্ষক বা উকিলরাই চিরাচরিত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। এঁরা সমাজকে প্রদান করেন আদর্শ, দর্শন, মূল্যবোধ, যা আবার শাসকশ্রেণীকে সহায়তা করে আধিপত্য বিস্তারে, শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপ সম্পর্কে আর মানুষ প্রশ্ন তোলে না।

আবার এই একজন চিরাচরিত বুদ্ধিজীবীই আবার সৃষ্টিশীল বা 'Organic' হয়ে ওঠেন, যখন তিনি ইতিহাসের ধারাকে বুঝে কাজ করেন, গণ-আন্দোলনের সময় জনতার নেতৃত্ব দেন। এই পর্যায়ে অনেক সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী আবার 'ক্রান্তিকালীন' বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠেন বলে গ্রামসীর অভিমত।[৪৯]

গ্রামসীর বক্তব্যের পটভূমিকায় ঔপনিবেশিক বাঁকুড়ার বুদ্ধিজীবীদের কথা খানিকটা বলা যেতে পারে। এখানেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক, উকিল, ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন আবার টোলের পণ্ডিতরাও ছিলেন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর এঁরা নির্ভরশীল ছিলেন। তাই প্রাথমিক পর্বে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা সমর্থন / আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনকে।

বাঁকুড়াতেও দেখছি, সরকারের তরফ থেকে ১৮৮৭-তে রানী ভিক্টোরিয়ার 'জুবিলি' উৎসব পালনের প্রস্তাবে পূর্ণমাত্রায় সাড়া দেন পৌরসভার এই মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব। ২১(২৭ ?) জানুয়ারি (১৮৮৭ খ্রিঃ) পৌরসভা সিদ্ধান্ত নেয় 'Public building'-এ আলোকসজ্জা, আতসবাজি, ধর্মস্থানে প্রার্থনা, থিয়েটার, যাত্রাভিনয় ও দরিদ্রদের সাহায্যদান দ্বারা এই উৎসব পালিত হবে। মহেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে অন্নদাপ্রসাদ সেন, সারদাপ্রসাদ পাঠক, কুলদাপ্রসাদ মুখার্জি, গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মণ্ডল ও আলি জামিনকে নিয়ে এক 'উৎসব কমিটি' গঠিত হয়েছিল। ১৮৮৭র ৫ ফেব্রুয়ারি, সভা সিদ্ধান্ত নিয়ে 'General Jubilee Fund'-কে ৫০ টাকা দেয়।[৫০] কলকাতায়ও দেখছি, যুবরাজ ও তাঁর সঙ্গীদের ১৮৭৬ সালে ভবানীপুরে নিজ বাড়িতেও অভ্যর্থনা করার জন্য হাইকোর্টের সরকারি উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গ করে যে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজিমাত' কবিতা রচনা করলেন, সেই হেমচন্দ্রই আবার এই 'জুবিলি' উৎসব উপলক্ষে রচনা করে ফেললেন 'ভারতেশ্বরী মহারানী' কবিতা।[৫১] আসলে সেই পর্বে ইংরেজ শাসন অপছন্দ ছিল না বুদ্ধিজীবীদের। ১৯১০ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ

লিখেছেন, 'ইংরেজ শাসনে সকলেই এক মহান নৃপতির আশ্রয়ে অবস্থিত এবং একই মহতি ভারতীয় জাতির অন্তর্নিবিষ্ট'।[৫২] ১৮৭৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি নিলে ময়মনসিংহের ব্রাহ্ম কালীকৃষ্ণ ঘোষ গীত রচনা করেছিলেন—

—'..... দয়াবতী মহারানী
মোদের জননী যিনি
রাজা রাজেশ্বরী তিনি
আর, কারে করি ভয়।'[৫৩]

লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের আগমন উপলক্ষে বাঁকুড়া শহর কিভাবে নহবৎখানা, বিজয়তোরণ ইত্যাদি দ্বারা সেজেছিল ১৮৯২-এর ঐ ১৫ জুন তারিখের বাঁকুড়া দর্পণে তার উল্লেখ আছে।[৫৪]

'বাবু' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ' কেরানি, মাস্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দি, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র সম্পাদক ও নিষ্কর্মা'—মধ্যবিত্তের এই দশ অবতার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন এঁদের 'ইষ্ট দেবতা ইংরাজ'। ঔপনিবেশিক বাঁকুড়াতেও বঙ্কিমের প্রায় সব অবতারই আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৫৫] উনিশ শতকের কলকাতায় যেমন এদের নিয়ে নানা প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'বনমালী সরকারের বাড়ি, গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি। আমিরচাঁদের দাড়ি, হুজরিমল্লের কড়ি।'[৫৬] ঠিক তেমনই বাঁকুড়া শহরেও বাবুদের নিয়ে চালু ছিল নানা প্রবাদ—'হরিশঙ্করবাবুর বাড়ি, কুলদাবাবুর গাড়ি, আলি জামিনের দাড়ি' বা বাবু তো বাবু হরিশঙ্করবাবু', যদিও খুব বেশি সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাঙালি ভদ্রলোককে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলা প্রগতিশীলতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিলটন সিংগার এক ধরনের 'Cultural Broker'-এর কথা বলেছেন।[৫৭] অনেকটা এর সঙ্গে ভদ্রলোকদের তুলনা চলে। একথা ঠিক যে, ভদ্রলোকরা সেদিন ইংরেজ বণিককে অভিনন্দন জানিয়েছিল। প্রথমদিকে ইংরেজ শাসনের প্রতি মোহ রামমোহনের মধ্যেও ছিল। জীবিকার প্রয়োজনে, উন্নততর সভ্যতার আকর্ষণে উনিশ শতকে তাঁরা ইংরেজের সহযোগী হন। সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জমি, লগ্নি এবং অন্যান্য ব্যবসার সুযোগসন্ধানই এদের উদ্দেশ্য ছিল বলে অমলেশ ত্রিপাঠি লিখেছেন।[৫৮] ইংরেজ শাসক ও বাঙালি অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্যই দ্বারকানাথ ঠাকুর 'বেলগাছিয়া ভিলা'য় মিস্ ইডেনের জন্য ভোজসভার আয়োজন করেন।[৫৯]

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই মোহ কি নিচুতলায় ছিল না ? তারাও জমিদারের চেয়ে কখনও ব্রিটিশরাজকেই 'মা-বাপ' ভেবেছে। শরৎচন্দ্রে 'মহেশ'-এ দেখছি। জমিদারের পেয়াদার হুমকির প্রত্যুত্তরে গফুর বলছে, 'মহারানীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়'।[৬০] আবার বাঁকুড়ার এক গ্রাম্য কবির রচনায় দেখছি,

'.....কুঠের (কুষ্ঠের) ওষুধ লিয়ে পাদরীবাবা (মিশনারী) আসে ছুটে, ওরা বলে না ইবাগ থেকে বেটা পালা কুঠে ...'[৬১] —এ সব কি মোহ নয় ?

ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় যতদিন সাহেব ও বাবুদের এই সহযোগিতা অনিবার্য ছিল, ততদিনই সে বন্ধুত্ব ছিল। তারপরই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও বিপ্লব। বিংশ শতকের প্রারম্ভে এভাবেই জন্ম
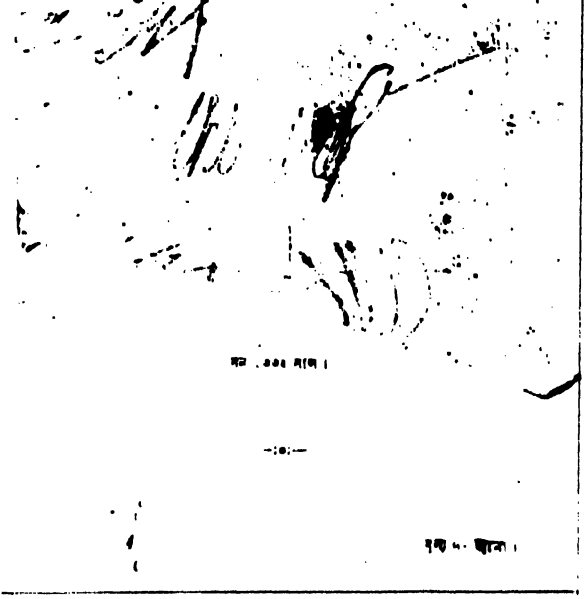
বাঁকুড়া জেলার বিবরণ (সন ১৩৩২ সাল), রামানুজ কর স্বাক্ষরিত গ্রন্থ

হল 'বিপ্লবী ভদ্রলোক'-এর। অর্থাৎ এবার তিনি পুরোদস্তুর গ্রামসীর সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী, তিনি বুঝতে পারছেন ইতিহাসের স্রোত কোন্ দিকে বইছে। 'বাঁকুড়া দর্পণ'-এ তাই দেখছি স্বদেশি প্রসঙ্গ, 'লক্ষ্মী'তে গান্ধীকে নিয়ে নাটক 'মহাত্মা মঙ্গল' বা 'দেশের দুর্দশায় প্রতি সরকারি ঔদাসীন্য'র মতো প্রবন্ধ। ১৯৩৭-এর মার্চে বাঁকুড়াতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভার যে সম্মেলন হয়, তার সদস্যদের সিংহভাগই ছিলেন শহুরে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক'।[৬২] ভদ্রলোকদের মধ্যে এই বোধ জন্মে ছিল যে বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুতেই তারা কম নয়, সুতরাং কেন তারা অধস্তন শ্রেণী হিসাবে থাকবে ? এভাবেই বোধহয় বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনে সৃষ্টি হয়েছিল এক ধরনের জাতীয়তাবোধের।[৬৩] তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'দালালির দলিল'-এ ভদ্রলোক নেই। ভদ্রলোকই প্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সচেতন ও আধুনিক বিপ্লবের নান্দীপাঠ করেছে।[৬৪]

প্রায় সব জায়গার মতোই বাঁকুড়াতেও এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরাই সংবাদ সাময়িকপত্রের প্রথম প্রকাশক। আসলে সংবাদ সাময়িকপত্র উদ্ভব ও প্রসারের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্ক যে নিবিড় তা আগে বলেছি। দুটির বিকাশই

১ম বর্ষ। শ্রাবন ১৩২৭ ১ম সংখ্যা

চিকিৎসা-দর্পণ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীমোহিনীমোহন রায় এম্-বি,

ও

ডাক্তার শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ,

কোতুলপুর (বাঁকুড়া)।

কোতুলপুর (বাঁকুড়া) চিকিৎসা-দর্পণ কার্য্যালয় হইতে

ডাক্তার শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

অগ্রিম মূল্য ২৲ দুই টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা
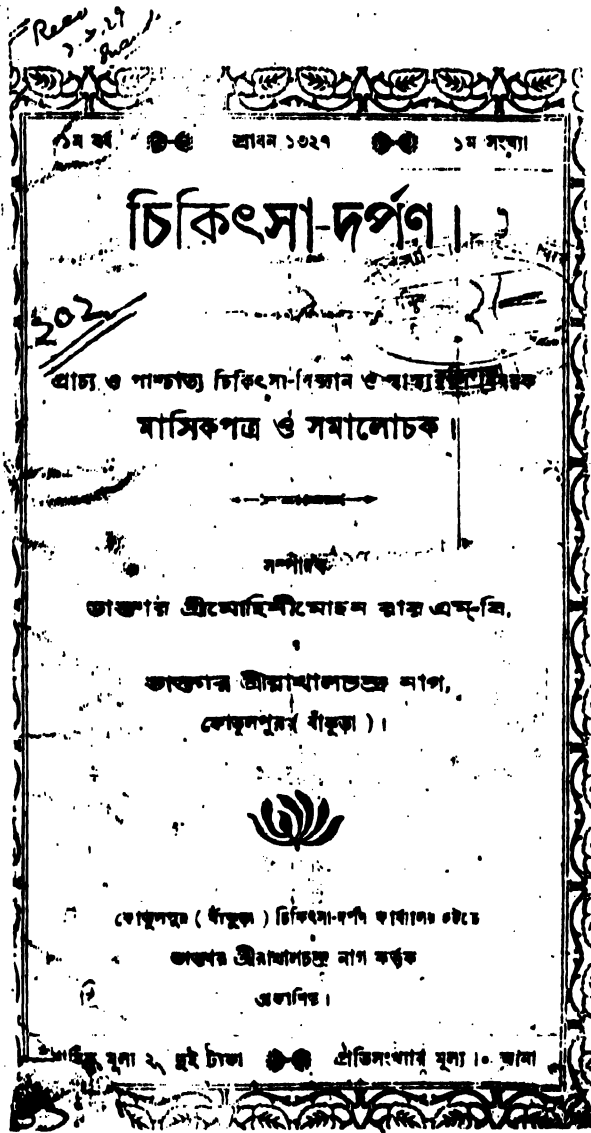
মাসিকপত্র চিকিৎসাদর্পণ, ১ম বর্ষ শ্রাবণ ১৩২৭, ১ম সংখ্যা

সমান্তরালে ঘটেছে। এই শ্রেণীই সভা-সমিতি গঠন ও সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোক্তা হিসাবে বা তার মাধ্যমে সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে এসেছিল। বাঁকুড়া জেলাতেও 'বাঁকুড়া জেলা কৃষি ও হিতকরী সমিতি'র মতো সভার উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'বাঁকুড়া লক্ষ্মী' পত্রিকা। আসলে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-চিন্তা বা দাবি ও চাহিদা প্রকাশের জন্য কান্তিচন্দ্র চ্যাটার্জি বা নটবর মিত্র বা কুলদাবাবুর মতো মানুষরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, আর এই পটভূমিতেই বাঁকুড়া জেলার প্রথম সংবাদ সাময়িকপত্রটি পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হল, 'বাঁকুড়া দর্পণ' নামে।

এ পর্যন্ত জানা বাঁকুড়া শহর তথা বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদ সাময়িকপত্র 'বাঁকুড়া দর্পণ'। তবে তারও আগে নূতনচটির বাসিন্দা অবিনাশচন্দ্র দাসের উদ্যোগে 'বাঁকুড়া হিতৈষী' নামে একটি সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হত বলে শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন।[৬৫] অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীও সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থে লিখেছেন, পৌরসভার নথিপত্র থেকে মনে হয় যে, শহরে 'পাক্ষিক সমালোচক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত।[৬৬] কিন্তু আসল ব্যাপার হল 'দ্বারভাঙ্গা ট্রেডিং কোম্পানি'র ম্যানেজার তাঁদের পত্রিকা 'পাক্ষিক সমালোচক'-এ ছাপানোর জন্য পুরপিতাদের সভার বিবরণী চেয়েছিল, সে ব্যাপারে ১৮৮৫-র (সম্ভবত ছাপার ভুলে ওটি ১৮৭৫ বলা হয়েছে) ১৬ জানুয়ারি পুরপিতারা সিদ্ধান্ত নেন—'as the character of the paper is not known, the manager should be requested to send a copy of the paper.'[৬৭] কিন্তু এই 'পাক্ষিক সমালোচক' প্রকাশিত হত দ্বারভাঙ্গা থেকে, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়।[৬৮]

ব্রজেনবাবু লিখেছেন 'বাঁকুড়া নগরে ১৮৯০ সনে স্থাপিত মুখার্জি প্রেস হইতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ সোমবার 'বাঁকুড়া দর্পণ' পাক্ষিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা সাপ্তাহিকপত্রে পরিণত হয়। ১৮৯২—১৯৩৭-এর জুন পর্যন্ত রায়সাহেব ডাঃ রামনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীকাল হইতে অদ্যাবধি ডাঃ রামরবি মুখোপাধ্যায় এর সম্পাদক আছেন।[৬৯] জেলাশাসকের Criminal Jurisdiction, original Proceedings-এও (Under section 4, Act XXV of 1867) দেখছি, 'It appears from the copy of declaration dated 12.3.1891, signed by Ramnath Mukherjee of Bankura for carrying on the printing business of a Periodical paper called—'Bankura Darpan', that he is the only owner of the press.'[৭০] তবে 'Report on Native papers'-এ ১৯১২ খ্রিঃ নাগাদ রামনাথের সঙ্গে বিশ্বনাথ মুখার্জিকেও সম্পাদক হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। সম্ভবত ইনি উকিল ছিলেন, কারণ 'ডিগ্রি' দেখানো হচ্ছে বি এল।[৭১] ১৮৯২-এর ২০ মার্চ থেকে দর্পণের উল্লেখ নিয়মিতভাবে 'Report on Native papers'এ পাচ্ছি, ১৮৯৩ এর 'Week ending' ১৮ মার্চে প্রথম তার গ্রাহক সংখ্যা (৩৬০) উল্লেখ করা হচ্ছে। তরুণদেব ভট্টাচার্য কিসের ভিত্তিতে দর্পণের প্রকাশকাল ১৮৮৫ বললেন, তা আমার কাছে অজ্ঞাত।

বাঁকুড়া জেলা থেকে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলেও আজ তার প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। জেলা গ্রন্থাগার বা বিষ্ণুপুর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এও আমি পাইনি। তাই আমি যা আলোচনা করব, তা নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই করব, লোকমুখে শোনার উপর ভিত্তি করে নয়। 'বাঁকুড়া লক্ষ্মী', 'লক্ষ্মী' ও 'চিকিৎসা দর্পণ'-এর দু-একটি সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলকাতা)-এ আছে। দর্পণ সম্পর্কে ভরসা 'Report on Native papers', আর আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে কয়েকটি, ফিডার রোডের সূর্যনারায়ণ মুখার্জির বাড়ি থেকে পাওয়া ওঁর পরিবারের মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় দিয়েছিলেন। উকিল সূর্যবাবু ওন্দা থানার সুর্পানগর গ্রাম থেকে ১৮৭২—৭৪ সাল নাগাদ বাঁকুড়া শহরে আসেন।[৭২] বাঁকুড়া কৃষি পঞ্জিকায় (১৩২৫ সাল) তাঁকে জেলার একজন 'পদস্থ ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ১২)।

শহরের প্রথম ছাপাখানা বলতে 'মুখার্জি প্রেস', বাংলা সন ১৩৩৬-এ সুধীর পালিত তিনটি ছাপাখানার কথা বলেছেন—'লক্ষ্মী প্রেস', 'মুখার্জি প্রেস' ও 'তারা প্রেস'।[৭৩] তারা প্রেসের মালিক ছিলেন ভুবনমোহন রক্ষিত, সম্ভবত ১৯২৮ সালে এটি চালু হয়।[৭৪] এখান থেকেই ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কালীকান্ত রায় লিখিত 'বাঁকুড়া জিলা—ভূগোল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ', মূল্য ছিল ৬ আনা।[৭৫] প্রথমদিকে লক্ষ্মী প্রেসের মুদ্রাকর হিসাবে পাচ্ছি আশুতোষ দাসকে। এঁরাও নানা রকম বইপত্র ছাপতেন, যেমন একটা পাচ্ছি কৃত্তিবাস কর্মকারের লেখা 'কৃত্তিবাসী সমস্যা পূরণ', যেখানে লেখক বিভিন্ন পৌরাণিক জ্ঞানের নানা প্রহেলিকাপূর্ণ বিষয়ের সমাধান দিচ্ছেন।[৭৬]

৮-১০-১৯২৩ তারিখে বানোয়ারীলাল, নারাণচন্দ্র ও শশাংকশেখর মুখোপাধ্যায় (সম্ভবত টাইপের ভুলে বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে মুখোপাধ্যায় হয়েছে) ব্যাপারিহাট মহল্লায় তাঁদের মালিকানাধীন 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী প্রেস'-এর কথা জানিয়েছিলেন।[৭৭] ১৯২৫-এর ৩০ জুন ফেলারাম পাইন, রামপদ দাস, মন্দাকিনী দেবী প্রমুখ 'বাসন্তী প্রেস'- এর মালিকানার উল্লেখ করছেন।[৭৮] আবার জনৈক রহমানের বাড়িতে কেরানিবাজারের বিজয়কুমার দে 'সুলভ প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা চালাতেন।[৭৯] আবার 'কমলা প্রেস' নামেও একটি ছাপাখানা ছিল, যার মালিক ছিলেন গোষ্ঠবিহারী দরিপা।[৮০]

রামানুজ কর লিখেছেন, বাঁকুড়া দর্পণে নিলামের সংবাদ থাকে। আগে বাঁকুড়া কলেজ থেকে একটি ইংরেজি সাময়িকপত্র বেরত, তা বন্ধ হয়েছে। 'পোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা মাসিক একটা পত্র বাহির হইতেছে।'[৮১] সম্পাদক ছিলেন প্রমোদকিশোর সরকার, অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সংখ্যায় যদিও বলা হচ্ছে এটি মূলত ডাককর্মীদের স্বার্থ নিয়েই আলোচনা করে[৮২] কিন্তু ১৯২৯-এর এপ্রিল-মে সংখ্যা সম্পর্কে বলা হচ্ছে এর আলোচ্য বিষয় বিবিধ, লক্ষ্মী প্রেস থেকে উকিলবাবু বৈদ্যনাথ মুখার্জির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[৮৩]

১৯২৫ সালে কমলকৃষ্ণ রায় বাঁকুড়ায় এসে 'যুগদীপ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৮৪] ১৯৩১-৩২ খ্রিঃ নাগাদ আরও দুটি পাক্ষিক পত্রিকা পাচ্ছি, সুশীলচন্দ্র পালিত প্রকাশ করতেন 'অভয়শঙ্খ' এবং সনৎ ভট্টাচার্য প্রকাশ করতেন 'উদয়'।[৮৫] বৈদ্যনাথ ঘোষ প্রকাশ করতেন মাসিক অলোক (আলোক ?)।[৮৬] আবার অনিলবরণ সম্পাদনা করতেন 'বাঁকুড়া শঙ্খ' ও 'বাঁকুড়া সেবক' পত্রিকা। আষাঢ় ১৩৪৮ সন তারিখে 'জাগরণ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার উল্লেখ পাচ্ছি। সম্ভবত সেটিই 'প্রথম বর্ষ', 'প্রথম সংখ্যা'। ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকা মূল্য চার আনা, প্রায় ২০০ কপি ছাপা হয়েছিল, সুলতানা বেগম নাম্নী 'তরুণী সংঘ'র এক মহিলার সম্পাদনায়, বিবিধ প্রসঙ্গ এরা ছাপত।[৮৭] ১ শ্রাবণ, ১৩৪৮ তারিখে পাচ্ছি 'সুপ্তা' নামক পাক্ষিক একটি পত্রিকা। ধীরেন রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় 'দেশবন্ধু ফিজিক্যাল স্কুল' থেকে এটি প্রকাশিত হত, ৫০০ কপি ছাপা হত, মূল্য নয় পাই।[৮৮] জেলার বিদ্যালয়গুলিও পিছিয়ে ছিল না। যেমন মালিয়াড়া স্কুল থেকে বেরোত 'বাসন্তী',[৯০] বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজিয়েট স্কুল থেকে গোপাললাল দের সম্পাদনায় বেরোত 'জ্যোৎস্না', ৩৮ পৃষ্ঠার বই, আট আনা দাম, ছাপা হয়েছিল ৫৫০

বাঁকুড়া লক্ষ্মী, ১ম বর্ষ বৈশাখ ও শ্রাবণ ১৩২৯

কপি।[৯১] রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বেরোত 'বাঁকুড়া জেলা স্কুল ম্যাগাজিন' দাম নয় আনা,[৯২] অধ্যাপক আর এস ঘোষ প্রমুখের সম্পাদনায় বেরোত 'বাঁকুড়া কলেজ ম্যাগাজিন'।[৯৩] এগুলির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করত।

'বাঁকুড়া দর্পণ', 'বাঁকুড়া লক্ষ্মী', 'লক্ষ্মী', 'চিকিৎসা দর্পণ' বা 'কৃষি পঞ্জিকা'র যে কটি সংখ্যা আমি পেয়েছি, আর 'Report on Native Papers' (এর পর R. N. P.) এর উপর ভিত্তি করেই আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তাই শুরুতেই তিনটি পত্রিকা সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া যাক। জেলা বিদ্যালয়সমূহের 'ইনপেক্টিং পণ্ডিত' হয়ে ১৮৬০—৭০ সাল নাগাদ জনৈক রামতারক মুখার্জি ভূতসহর থেকে বাঁকুড়া শহরে এসেছিলেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ রামনাথ মুখোপাধ্যায়[৯৪] বাঁকুড়া দর্পণের (এর পর বাঁ. দ. লেখা হবে) প্রথম সম্পাদক ও প্রকাশক। এর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুটাকা ছিল। ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ ও ডাঃ মোহিনীমোহন রায়ের সম্পাদনায় (১৩২৭ বঙ্গাব্দর শ্রাবণ) কোতুলপুর থেকে প্রকাশিত হত 'চিকিৎসা দর্পণ', বার্ষিক মূল্য দুটাকা। শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩২৯

উন্নয়ন, কুলি নিয়োগ, ধর্মীয় বিষয় থেকে পৌরসভার ঔদাসীন্য, স্বদেশি—সব দিকেই যথার্থ গ্রামসীয় সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী হিসাবে নজর ছিল পত্র-পত্রিকাগোষ্ঠীর। অতএব বিষয়বস্তু ধরে আলোচনাই সুবিধাজনক ও সুখপাঠ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শুরু থেকেই জেলার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তিত করেছিল। ১৮৯২ সালে, অর্থাৎ প্রথম বছরেই, ১৫ এপ্রিল দর্পণ জেলার বিভিন্ন জায়গার খাদ্যাভাব, জলাভাবের কথা বলে লিখছে—জেলাশাসক ও জেলা বোর্ডের নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত নয়। বর্ধমান জেলা বোর্ড কুয়ো খনন, পুকুর খননের জন্য যেভাবে টাকা মঞ্জুর করেছে বাঁকুড়া জেলা বোর্ডেরও তা অনুসরণ করা উচিত (R. N. P. ১৮৯২, পৃ ৩৯৭)। দর্পণ বারেবারেই এই খাদ্য সমস্যার সঙ্গে চুরিডাকাতির সম্পর্কের উল্লেখ করেছে, বিশেষত জেলার দক্ষিণাংশে (বাঁ. দঃ, ১৫ জুন R. N. P. ১৮৯২, পৃ, ৬৩৩)। ১ জুলাই তারিখ লিখছে—সাম্প্রতিক একটি ডাকাতির ঘটনায় রায়পুর থানায় আটক ১১ জন জানিয়েছে যে, তারা ৪/৫ দিন অভুক্ত ছিল, একই দিনে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাঁকুড়া সফরকে স্বাগত জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায় গভর্নরকে জেলার দুরবস্থা দূরীকরণের আবেদন জানানো হয়েছে (R. N. P. ১৮৯২, পৃ, ৬৯২, ৯৪)। ১৫ সেপ্টেম্বর আক্ষেপ করে লেখা হয়েছে—এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি (R. N. P. ১৮৯২, পৃ ৯৫৪-৫৫) এবং দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে জেলার সমস্ত প্রান্তেই চুরি-ডাকাতি শুরু হয়ে গিয়েছিল (R. N. P. ১৮৯৩, পৃ, ৫৩০)।

২১ জানুয়ারি 'বঙ্গবাসী' লিখছে, 'লর্ড লিটন বলেছেন, অনাহারে যদি জেলার একজন মানুষও মারা যান, তাহলে সার্বভৌম শাসককে তার জবাব দিতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে লর্ড ল্যান্সডাউন এই মতে বিশ্বাসী নন, কারণ তাহলে দর্পণে এমন সংবাদ ছাপা হত না' (R. N. P. ১৮৯৩, পৃ ৭৪)।

বৈশ্যগন্ধবণিক সমাজে বৈশ্যাচার সম্মত পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন

সনের বৈশাখ মাস থেকে বাঁকুড়া শহরে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' (এরপর বাঁ. ল. লেখা হবে) পত্রিকা। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বীররুদ্র রায়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল সডাক এক টাকা। বিজ্ঞাপন মূল্যও ছিল। এই শশাঙ্কবাবুর সম্পাদনাতেই আবার ১৩৩১ সনের কার্তিক মাস থেকে বাঁকুড়া শহরে 'লক্ষ্মী' নামের একটি পত্রিকা বেরোত। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন রসময় সিংহ, বার্ষিক মূল্য ছিল তিন টাকা। প্রথম বছরের তৃতীয় সংখ্যা ছাপা হয়েছিল[১৫] ৫০০ কপি। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার কৃষিসভা থেকে প্রকাশিত হত 'বাঁকুড়া কৃষি পত্রিকা', প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনুমানিক ১৩২৫ সাল নাগাদ। তবে দর্পণের ঠিক পরেই যে পত্রিকাটি দেখতে পাচ্ছি, সেটি কিন্তু একটি 'জাতিভিত্তিক পত্রিকা' বা 'Caste Journal'। মালিয়াড়ার কাছে ফুলজাম গ্রাম থেকে ফেলারাম মণ্ডল প্রকাশ করতেন 'ক্ষত্রিয় শৌণ্ডিক ও ব্রাত্য ক্ষত্র' নামে একটি পত্রিকা, বাংলা সন ১৩২০-র ১ কার্তিক থেকে। ১২ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ছিল এক টাকা।

প্রতিটি পত্রিকা নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনার পরিবর্তে আমি বিষয় ধরে আলোচনা করব। তাহলেই সামগ্রিক রূপটি ধরা যাবে। আমরা দেখছি—আর্থিক দুরবস্থা, খাদ্যদ্রব্যর মূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক

অবস্থা বিংশ শতকের সূচনাতেও অপরিবর্তিত ছিল। ১৯০৭ খ্রিঃ-র ৮ জুলাই দর্পণ লিখছে—'গৃহস্থের সকল পুঁজি একেবারে ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে। এখন শীঘ্র বাজার নরম না হইলে লোকের দিন চলা ভার হইবে। সেদিন শিখরে পাড়ার অনেকগুলি দরিদ্রলোক কতকগুলি ভদ্রলোকের কাছে গিয়া বলে যে আর তাহাদের দিন চলে না ; এবার উপবাস দিতে হইবে.....' দুঃখের বিষয় কয়েকজন ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রায় সকল সাহেব প্রশাসকই এই দিকটি উপেক্ষা করে 'চুরি ডাকাতি এদের স্বভাব' বলে মন্তব্য করেছে। অথচ যে যে বছরে শস্যহানি হয়েছে ঠিক সেই বছরগুলিতেই জেলায় ডাকাতি বেড়েছে, এ ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার।[১৬]

সরকারি অবহেলার কারণে, জেলার মানুষ নিজেরাই উদ্যোগী হলেন, গড়ে উঠল বেসরকারি সংগঠন। গড়ে উঠেছিল 'বাঁকুড়া দরিদ্রভাণ্ডার' এর মতো সংগঠন (বাঁ. দ. ১৬ জানুয়ারি, ১৯০৫)। এখানেও ছিলেন উকিল কুলদাবাবু, বিনোদবাবু, ডাক্তার রামনাথ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীকান্ত কর্মকার বা মুন্সেফ ভূপালচন্দ্র সেনের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা। ১৯০৫ সালে স্থাপিত হল বাঁকুড়া জেলা কৃষিসভা, বর্ধমান বিভাগ কৃষিসভার শাখা হিসাবে।[১৭] বাড়ির জন্য তাদের

একখণ্ড জমিও দেওয়া হয়েছিল।[৮] এই সভা প্রতি বছরই 'বাঁকুড়া কৃষি পঞ্জিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে ১৯১৮-১৯ সালের একটি রয়েছে। জেলাশাসক জে ভাস, স্কোয়ার ছিলেন সভাপতি, উকিল রায়সাহেব বামাচরণ রায় ছিলেন সম্পাদক। হরিহর মুখোপাধ্যায়, কুলদাবাবু বা রামনাথবাবু ছাড়াও এই সভার সভ্য হিসাবে ছিলেন সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়। সর্বমোট ১০১ জন সভ্য ছিলেন। ওই বইতে জেলার বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তিবর্গের নাম, বাংলার শাসনবিভাগের কর্তাব্যক্তিদের নামও রয়েছে।

'বিজ্ঞাপন' অংশে গোড়াতেই বলা হয়েছে 'কৃষি বিষয়ে জ্ঞান বিস্তার এবং কৃষিজীবিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে ও সহজ কথায় বুঝাইয়া দিবার জন্যই বাঁকুড়া কৃষিসভা হইতে এই পঞ্জিকাখানি প্রকাশ করা হইল।' জমির বিবরণ, সার, বীজ, পত্তনি নিলাম বিষয়ক জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের অষ্টম আইনের জ্ঞাতব্য বিষয়, পশু চিকিৎসা ব্যবস্থা, মৎস্য বিষয়ক প্রবন্ধ, জেলা ও 'লোকাল বোর্ড'-এর আয়ব্যয়ের হিসাব, আবগারিসহ নানা প্রকার আইন বিষয়ক এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ছাপা হয়। এখান থেকেই দেখছি ১৯১৬-১৭ সালে জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড দুর্ভিক্ষ নিবারণে ২০৬০৪ টাকা দাতব্য করেছিল (পৃঃ ১৪-১৩৩)।

এই কৃষি সমিতিই পরবর্তীকালে 'বাঁকুড়া জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সমিতি' নামে পরিবর্তিত হয়। 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (১৩৩০ সাল) থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯০৫ সালে জেলাশাসক রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের চেষ্টায় কৃষিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি প্রদর্শনী হয়, সেখানে জেলার 'বর্তমান দুরবস্থার কারণ সম্যকভাবে আলোচনার পর' কৃষি সমিতির কার্যক্ষেত্র বাড়িয়ে জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সমিতি তৈরি হয়েছে। জেলাশাসক সভাপতি, দুই মহকুমা শাসক সহ-সভাপতি, বামাচরণ রায় সম্পাদক, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগী সম্পাদক, অমরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারি সম্পাদক। প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি ছিলেন এর সদস্য (পৃঃ ২-৩)।

প্রথম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা (বৈশাখ—শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল)-এর সূচনাতেই বলা হয়েছে, 'সমিতির মুখপত্রস্বরূপ একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা' প্রচারিত হবে। এই জেলার বর্তমান অবস্থা, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির উপায় ও কি প্রকারে তা সাধিত হতে পারে, তাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে' (পৃঃ ১)। প্রথম প্রবন্ধ 'জলাভাবই জেলার অবনতির প্রধান কারণ'। এর পরই 'বাঁকুড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণী' যার প্রথম অংশে 'বাঁকুড়া জেলার এত দুর্দশা কেন ? বলা হচ্ছে প্রধানত কৃষিজীবী হলেও এই জেলা শিল্পেও পশ্চাৎপদ নয়, রেশমি বস্ত্র তৈরি হয়, কাঁসাপিতল, জুতা অন্যত্র রপ্তানি হয়। 'তথাপি জেলা এত শ্রীহীন হইতেছে কেন ?' পত্রিকা বলছে, জনসাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে উদাসীন, এছাড়াও আছে ম্যালেরিয়ার মত ব্যাধি। ১৩২২ ও ২৫ সালে সরকার অন্যূন ১৪ লাখ ব্যয় করেছে। এছাড়া সম্মিলনী, রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য করলেও প্রকৃত উন্নতি হয়নি। 'গ্রামের সকলেরই এক অবস্থা—ভিক্ষা দিবে কে ?' ৬ ফেব্রুয়ারি গুরুসদয় দত্তর উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঁকুড়ায় এসে কৃষির ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে দু-চারটি আশ্বাসবাণী দিয়ে গেছেন (পৃঃ ৩—৯, ১৫—২০)। ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় জেলার ৩১টি কৃষি সমিতি ও তাদের সম্পাদকদের নাম রয়েছে। এছাড়া বিষ্ণুপুরের ১৪টি সমিতি ও সম্পাদকের নামও আছে (পৃঃ ৪৮)। প্রতি গ্রামে জল ও অর্থ সরবরাহ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা সংবাদ পাচ্ছি। 'আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের বিখ্যাত সংবাদপত্র লেখক সেন্ট নেহাল সিংহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় এই সমিতির কাজ পরিদর্শন করেন' বলে পত্রিকা লিখেছে (পৃঃ ৮৩—৮৭)। আবার শ্যামদেশীয় যুবরাজও পরিদর্শনে এসেছিলেন (বাঁ. ল, প্রথমবর্ষ-চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ৮৯)। ১৯২২-এ বর্ধমান বিভাগের কমিশনার সমিতিগুলির কাজকর্মের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তা শেষে ছাপা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় দেখছি হরিকিষণ রাঠী, অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ বৈদ্যনাথ ঘটক, উকিলবাবু রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ৬ মাসের জন্য বাঁকুড়া জল সরবরাহ ও অর্থ সরবরাহ ব্যাঙ্কের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন (পৃঃ ৮১)।

দ্বিতীয় বর্ষর প্রথম সংখ্যায় গুরুসদয় দত্তর একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। গুরুসদয়বাবু আত্মসন্তুষ্টির পরিবর্তে আরও কাজের কথা বলেছেন। জঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে বলে তিনি যে আশঙ্কা করেন, ১৮৯৩-র ১ ডিসেম্বর তারিখের দর্পণেও সে ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছিল, এর জন্যই জমির উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমছে (আর এন পি, ১৮৯৩, পৃঃ ১০৪২)। যাই হোক হাড়মাসড়ার প্রবোধ রায়ও গুরুসদয়বাবুর পর বক্তব্য রাখেন। গ্রাম 'ষোল আনা'গুলির পাশাপাশি শিক্ষক, মোক্তার, জমিদারদেরও তিনি এগিয়ে আসতে বলেছেন (পৃঃ ১২—১৭)।

জেলার অনগ্রসরতা নিয়ে 'লক্ষ্মী' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (১৩৩১ সাল) বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার শোচনীয় অবস্থার কারণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করেছেন (পৃঃ ৩৫)। তৃতীয় সংখ্যায় সমালোচিত হয়েছেন বর্ধমানরাজ—'বর্ধমানরাজ বাংলার লাট রোনাল্ডসের বর্ধমান যাত্রা উপলক্ষে ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করতে পারলে তিনি রোগক্লিষ্ট বাঁকুড়ার জন্য ৫০,০০০ও দান করতে পারেন না (পৃঃ ১২২)। দ্বাদশ সংখ্যায় জেলার জল সরবরাহ সমিতির সংখ্যা ৮৪ থেকে ১১২-য় পৌঁছেছে বলে আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে (পৃঃ ৪৯৫)।

এরপর আসব সচেতনতা প্রসঙ্গে। প্রথম থেকেই জেলার সংবাদ সাময়িকপত্র প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ তারিখে বিদ্যালয়ে অনুদান কমানোয় বিদ্যালয়গুলি ধ্বংস হয়ে যাবে বলে দর্পণ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে (আর এন পি ১৮৯২ পৃঃ ২২৮)। আবার একই কারণে জেলার ১,২৩৪টি পাঠশালা বন্ধ হবার আশঙ্কাও দর্পণকে উদ্বিগ্ন করেছে (১৫ সেপ্টেম্বর, আর এন পি ১৮৯২, পৃঃ ৯৪৪)। কুড়ি বছর পরেও দেখছি 'Middle Vernacular' উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে 'Public Examination' তুলে দেবার জন্য দর্পণ দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে, জনগণের মধ্যে এর ফলে বিরাট হতাশা সৃষ্টি হয়েছে
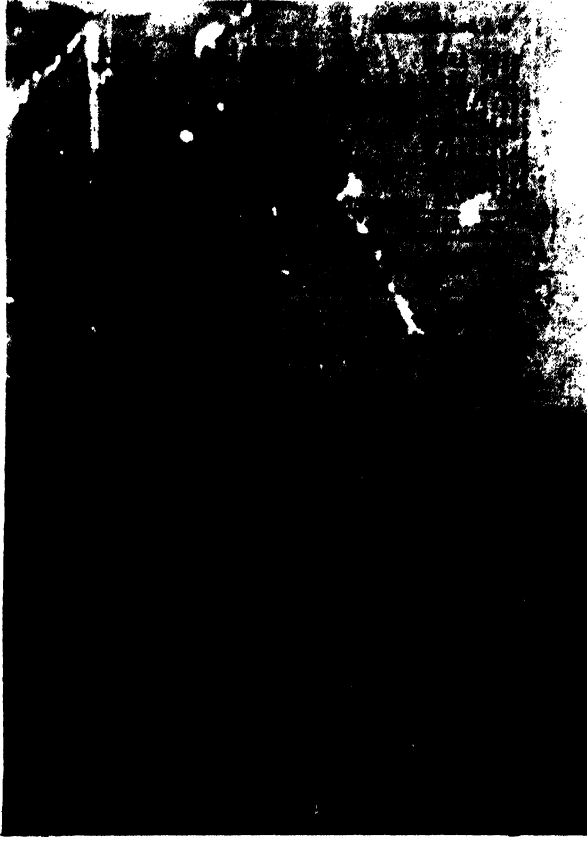
বাঁকুড়া দর্পণ

(বাঁ. দ. Week ending 21st December. R. N. P, ১৯১২ পৃঃ ১৪৬১)।

পরবর্তী সময়ে হিতসাধন সমিতিগুলি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিল বলে বাঁকুড়ালক্ষ্মী লিখেছে। যেমন কোতুলপুর হিতসাধন সমিতির উদ্যোগে নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর রামগোপাল চ্যাটার্জি ক্ষুদ্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন দেখছি (বাঁ. ল. ১ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৯ সাল, পৃঃ ৭৪)। একই সংখ্যায় বায়স্কোপ দ্বারা লোকশিক্ষা দানের কথাও পাচ্ছি (পৃঃ ৮৬)। ধীরে ধীরে ছাত্না, ইঁদপুর, মাকড়কোল, ঘুটগেড়িয়া, সারেঙ্গা ইত্যাদি জায়গাতেও সমিতি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনে তৎপর হয়েছিল (দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩০ সাল, পৃঃ ৪)। এই সমস্ত খবর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' দায়িত্ব সচেতনতারই পরিচয় দিয়েছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিল পত্র-পত্রিকাগুলি। লঘু অপরাধী সাজাপ্রাপ্ত হলেও রহস্যজনক কারণে গুরুতর অপরাধী ছাড়া পাচ্ছে থেকে শুরু করে সরকার বাহাদুর মফস্বল পরিদর্শন করলেও তাঁরা মানুষের অভিযোগ শোনেন না বা বিশ্বাস করেন না, অতএব এই পরিদর্শন অর্থহীন বলে মত প্রকাশ (বাঁ. দ. ১৫ মার্চ ও ১ জুলাই, আর এন পি, ১৮৯২, পৃঃ ২৬৯ ও ৬৯৪), অথবা বাঁকুড়া-রানীগঞ্জ ডাক ব্যবস্থার অনিয়ম বা বিষ্ণুপুর-পানাগড় পথের সমস্যা (বাঁ দ. ১ আগস্ট ও ১ নভেম্বর, আর এন পি ১৮৯৩, পৃঃ ৬৩২ ও ৯৫৭), অন্যদিকে চুরি-ডাকাতির সঙ্গে ঘাটোয়াল পুলিশের অশুভ আঁতাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ (বাঁ. দ. ১ ফেব্রুয়ারি আর এন পি ১৮৯৩ পৃঃ ৯৫), একই সঙ্গে গঙ্গাজলঘাটি থেকে মুন্সেফ চৌকি ওঠানোর ফলে কি অসুবিধা হচ্ছে, বা বিষ্ণুপুর থেকে কোতুলপুর পর্যন্ত টেলিগ্রাফলাইন সম্প্রসারণ করলে কোতুলপুরের মানুষ কতটা উপকৃত হবেন (বাঁ. দ. Week ending ২৫-৩-১৮৯৩ পৃঃ ২৪৭ ও ১২ জানুয়ারি ১৯১২, পৃঃ ২৬, আর এন পি)—সব ব্যাপারেই দর্পণ ছিল ওয়াকিবহাল, সচেতন।

এবার দেখব জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গ। উনিশ শতকের শেষদিকে বা পৌরসভার শুরু থেকেই দেখছি পুরপিতারা তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে শহরে রোগ-ব্যাধির সংক্রামণ বা টিকাকরণ নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৮৯৬-র সরকারি প্রতিবেদন বলছে, পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় শহরে জনস্বাস্থ্য ১৮৯৫ সালে অনেক উন্নত ছিল। পুরপিতারা ২২ বার চিকিৎসালয়টি (Dispensary) পরিদর্শন করেছেন।[১১] তবে ১৮৯২ সালেই স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির প্রতি জেলা বোর্ডের ঔদাসীন্যর সমালোচনা করে দর্পণ লিখেছে এ ব্যাপারে খুব কম অর্থই বাজেটে অনুমোদিত হয়েছে। ১ বছরও হয়নি, জেলায় আবার ম্যালেরিয়া, কলেরা ও অন্যান্য রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। তালডাংরা 'Cattle Pond'-এর অবস্থা শোচনীয় (আর এন পি ১৮৯২, পৃঃ ২৩০)। ১৯০৭ খ্রিঃ ৮ জুলাই বলা হয়েছে সুচিকিৎসক না থাকায় সোনামুখীতে বসন্ত ও বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব দ্বিগুণ হচ্ছে। বিষ্ণুপুরেও একই অবস্থা, একমাত্র ভগবানই রক্ষা করতে পারে—(পৃঃ ৫)। 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' পত্রিকায় আক্ষেপ করে লেখা হয়েছে যে, 'বাঁকুড়া একদা ছিল স্বাস্থ্যনিবাস, তা কি করে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরার আকর হয়ে দাঁড়াল ? এর জন্য দায়ী পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর আচার ব্যবহার।' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঁকুড়ায় এসে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, কলেজ ছাত্রাবাসটি তিনি দেখেছেন, তাঁর মনে হয়েছে সাহেবরাই পরিচ্ছন্নতা বোঝেন, আর আমরা হিন্দুজাতি কেবল মুখে বলে বেড়াই আমরা শুদ্ধ জাতি ; কাজে আমরা ম্লেচ্ছেরও অধম (১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, 'বাঁকুড়ার পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য সমাচার', পৃঃ ২১—২৬)। কৃষি সমিতি ১৯২২ সালে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। শিক্ষার জন্য চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ চিত্র এবং নকশা অঙ্কিত হয়। 'চিত্রবিভাগে কোথাও দেখা যাইতেছে যে মৃত্যু রাক্ষসী তাহার অসংখ্য হস্ত দ্বারা অসংখ্য প্রকারে, বাঁকুড়াবাসী শিশু, বালক, যুবা ও বৃদ্ধকে নিয়তই আপন করাল বদনের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, কোথাও বা অসংখ্য বিষাক্ত জীবাণু সাধারণ লোকচক্ষুর অজ্ঞাতসারে পানীয় বা অন্যরূপে ব্যবহৃত জলের সহিত মানবদেহে প্রবেশ লাভ করিয়া তথায় উৎকৃষ্ট রোগের বিস্তার করিতেছে...' (পৃঃ ৩৯—৪২)। বাঁকুড়া কুষ্ঠরোগ নিবারণী সমিতির সম্পাদক ডাঃ ডেভিসের সাহায্যে সমিতি কোতুলপুর অঞ্চলে কুষ্ঠ নিবারণের চেষ্টা করছে এবং ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ, লক্ষ্মীনারায়ণ পাঠক, নীলমাধব ভদ্র প্রমুখও সচেষ্ট রয়েছেন (১ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৭৪-৭৫)। ছাতনা সমিতির সম্পাদক ডাঃ অলোকনাথ গাঙ্গুলি রেল স্টেশনে থেকে পুরী থেকে প্রত্যাগত কলেরা রোগাক্রান্ত তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা করেছিলেন। আবার ময়নাপুর সমিতি ম্যালেরিয়া দমনের

জন্য তিনটি পুকুরে কেরোসিন ছড়ানো বা জেলা বোর্ডের সাহায্যে গঙ্গাজলঘাটিতে সমিতির একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের উদ্যোগ—সবই 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' সযত্নে প্রকাশ করেছে, (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩০ সাল, পৃঃ ৫-৬)। বাঁকুড়া কৃষি পঞ্জিকাতেও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, রোগ পরিচয়, নিবারণের উপায়, সতর্কতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা ছিল (পৃঃ ৪১—৪৯)।

নগরজীবন ও পৌরসভার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই আজকের মতো সেদিনও কিন্তু পৌরসভার কাজকর্ম মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সেই অসন্তোষ প্রতিফলিত হয়েছে সংবাদ সাময়িকপত্রে। সময় যত এগিয়েছে, সমালোচনাও কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে। ১৮২০ সালের ২৭ মে তারিখের সমাচার দর্পণ পত্রিকাতেও 'কলিকাতার নরদামা' নামক এক দরখাস্তে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সাহেবদের এ বিষয়ে কিছুটা বিবেচনাশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[১০০] ১৭ ডিসেম্বর 'বাঁকুড়া দর্পণ' লিখেছে ১১ ডিসেম্বর যে পৌর নির্বাচন হয়েছে সেখানে করদাতারা অনেকেই অংশগ্রহণ করেননি, তাঁদের ভোট দিতে প্রায় আনাই যায়নি (আর এন পি ১৮৯০, পৃঃ ১০৭৩) 'ভোট বয়কট'-এর একটি প্রাথমিক ইঙ্গিত কি এখানে পাচ্ছি না ? 'Masonry Platform' নর্দমা চালু রাখায় প্রতিবন্ধক হচ্ছে বলে সেগুলি উঠিয়ে দেবার জন্য পৌরসভা বড়বাজার রোডের দোকানদার ও বাড়ি মালিকদের কাছে যে ফতোয়া দেয়, সে ব্যাপারে ১ ডিসেম্বর দর্পণ লিখছে, শহরের অন্যত্র খোলা নর্দমাই যখন পুরপিতারা পরিষ্কার রাখতে পারছেন না, তখন বড়বাজার রোডের নর্দমাগুলির ঢাকনা উঠিয়ে দিতে বলছে কেন ? (আর এন পি ১৮৯৩, পৃঃ ১০৩৪)। ১৯০৭-এর ২৩ জুলাই লোহার মহল্লার ভিতর 'মহাফেচের লেন'টি কি শোচনীয় অবস্থায় আছে—তা নিয়ে দর্পণ লিখছে—'রাস্তা-ঘাট, নর্দমা ইত্যাদির দিকে কর্মচারিদের মনোযোগ না থাকলে 'প্রজার যে স্বাস্থ্যহানি হইবে সে বিষয়ে কি কেহ ভাবিবেন না ?' একই বছরেব আগস্টে (দিনটি পাওয়া যাচ্ছে না—'torn') আবার বিষ্ণুপুর পৌরবাজারের মাছ বিক্রির জায়গায় দুর্গন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

'লক্ষ্মী'তেও পৌরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। এখানে আবার একটি বৈষম্যের ব্যাপারও সম্পাদক উল্লেখ করছেন—'বড়বাজার, নতুনগঞ্জ, ব্যাপারিহাট প্রভৃতি জায়গায় রাস্তাগুলি পৌরসভার পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়। পুরপিতারা নিজেদের বাড়ি ও রাস্তার প্রতিই যত্নবান। স্কুল ডাঙা রামপুরের রাস্তা পরিষ্কার', 'তেলামাথায় তেল দেওয়া কেন' ? (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৬) এমন কি একই বছর পঞ্চম সংখ্যায় পুরপিতাদের সরে দাঁড়াতেও বলা হচ্ছে (পৃঃ ১৯৫)। এর ফলও পাওয়া গেল, ষষ্ঠ সংখ্যায় দেখছি, ৫ নং ওয়ার্ড ছাড়া আগের পুরপিতারা কোথাও জিততে পারেননি (পৃঃ ২৩৮)। কয়েকজন পুরপিতা নির্বাচন বেআইনি বলে দরখাস্তও করেছেন (নবম সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৭১)। দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) লেখা হচ্ছে—ফিডার রোডের দুর্গন্ধ, নতুন খানকল সৃষ্টি হওয়ার অপকার সম্পর্কে 'চেয়ারম্যান' উদাসীন বা কংগ্রেস আসার পর পৌরসভার বিশৃঙ্খলা কেমন বেড়েছে (পৃঃ ৮০)।

বাঁকুড়া কৃষি পঞ্জিকা

পত্র-পত্রিকার এই সমালোচনা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন না। ১৯০১ সালের অক্টোবরে, দর্পণের এই সব সমালোচনা তাঁরা স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে জানিয়েওছিলেন (Week ending ৫ অক্টোবরের ৩১ ও ৩৪ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে আর এন পি ১৯০১)[১০১]। আবার ১৯০৭-এর ১ আগস্ট দর্পণ লিখছে, মহাফেচের গলির দুর্দশা নিয়ে তাদের লেখা সরকার পড়েছেন, তবে হিতে বিপরীত হয়েছে, কারণ নর্দমা ও 'কালভার্ট'-এর সব 'পচা মাটি রাস্তায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে'। আবার বলা সত্ত্বেও শান্‌বান্দা ও ভূতেশ্বরের রাস্তার দুরবস্থার প্রতি স্বরাজি পরিচালিত পৌরসভা ও জেলা বোর্ড উদাসীন হওয়ায় 'লক্ষ্মী' ব্যঙ্গ করে লিখেছে—'জেলা বোর্ড ও পৌরসভা একে অপরকে দেখায়, স্বরাজ লাভের ইহা বেশ পন্থা বটে'। (দ্বাদশ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩২, পৃঃ ৪৯৪)।

আগেই বলেছি, আগাগোড়া দালালির দলিলে বাঙালি ভদ্রলোক নেই। মৃদুস্বরে হলেও সে প্রতিবাদ করেছে। ১৮৯২'র ১৫ জুন, শহরে দেশীয়দের উপর 'ল্যাট্রিন-ট্যাক্স' চাপানোর সমালোচনা করে দর্পণ লিখেছে 'European Quarter' যখন এর আওতার

বাইরে, তাহলে গরিবের উপরই চাপ পড়বে (আর এন পি ১৮৯২ পৃঃ ৬২৪)। লেফটেন্যান্ট গভর্নর আসছে, রাস্তাঘাট সাজছে, বুদ্ধিজীবীরা স্মারকলিপি দিচ্ছে—পৌরসভায় ভালো জলের ব্যবস্থা নেই, 'সার্ভে' বিদ্যালয় স্থাপন জরুরি এবং আরও উল্লেখ করেছে, জনগণকে যদি অনুগত রাখতে হয়, 'তবে তাদের ভালো শিক্ষাও পেতে হয়' (আর এন পি ১৮৯২ পৃঃ ৫৭৭, ৬৩৩, ৬৯৪)। কিন্তু ১৫ জুলাই দর্পণ লিখছে, সবই ব্যর্থ হল। গভর্নর ভালো ভালো কথা বললেও জেলাবাসী কিভাবে দিন কাটাচ্ছে সে খবর তিনি রাখেন না। প্রত্যেকেই চেয়েছে তাঁকে তুষ্ট করতে, তাই প্রশাসকরা তাঁকে কিছুই জানায়নি (আর এন পি ১৮৯২, পৃঃ ৭৩৮)।

জেলা থেকে অবৈধভাবে কুলি সংগ্রহ নিয়ে দর্পণ প্রথম থেকেই সরব। ১৮৯৩-র ফেব্রুয়ারিতেই তারা এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে (Week ending 18th February, R. N. P. ১৮৯৩, পৃঃ ১২৬), যদিও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন ১৮৯৪ সাল থেকে, কিন্তু সেটি ঠিক নয়।[১০২] আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত দর্পণগুলিতে (১৯০৫—৮) দেখছি প্রতি সংখ্যায় 'কুলিবাহিনী-১, কুলিবাহিনী-২'—এইভাবে সংবাদ ছাপা হত। এই কুলি সংগ্রহের প্রবল বিরোধিতা করেছিল দর্পণ—'প্রবল প্রতাপ ইংরাজ রাজত্বেও কি মানুষ্য চুরির কোন প্রতিকার হইবে না ? (বাঁ. দ. ১-১-১৯০৫)।

আবার বাঁকুড়ার মতো দরিদ্র এক জেলায় বিংশ শতকের প্রথমদিক থেকেই মহিলাদের সচেতনতার উল্লেখ পাচ্ছি পত্র-পত্রিকাগুলিতে। ১৩৩০-এর বৈশাখ মাসে 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' লিখছে (দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩—৩৬), গত ৭ শ্রাবণ স্থানীয় উকিল সূর্যলাল দত্তের স্ত্রী স্নিগ্ধবালা দত্তের গৃহে 'অন্তঃপুর মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুসদয় দত্তর স্ত্রী শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত এর কার্যভার গ্রহণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য 'অন্তঃপুরে শিক্ষা প্রসার, চরকা ও গৃহশিল্পের প্রচলন।'। হাসপাতালেও এঁরা সাহায্যের বন্দোবস্ত করেছেন। এই মহিলাসভা দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারেও ৩২৫ টাকা সাহায্য দিয়েছিল (লক্ষ্মী, দশম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪১৪)। 'বাকুড়ালক্ষ্মী' ওই একই সংখ্যায় আরও লিখেছে—ছায়াচিত্রের সাহায্যে সূতিকাগৃহের সংস্কার ও প্রসূতি এবং শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি মহিলা সমিতি বুঝিয়ে দিত। মালিয়াড়ার রানী দুর্গাবতী দেবী ১০০ টাকা, গোপীনাথ দত্তর স্ত্রী ৫০ ও এবং হাইকোর্টের প্রাক্তন জজ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ২৫ টাকা দেন। ১৯৪১ সাল নাগাদ তরুণী সম্ভবর সুলতানা বেগম 'জাগরণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন—তা আগেই বলা হয়েছে। লক্ষ্মী লিখেছে, গান্ধী যেদিন বাঁকুড়া আসেন (৮ জুলাই), সেদিন অপরাহ্নে তিনি দোলতলায় মহিলাসভায় যোগদান করেছিলেন (দশম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪১৪) সরকারি সাহায্যও মহিলা সমিতি অনেক সময় চেয়েছে, শিশুদের মধ্যে দুধ বা ওষুধ ইত্যাদি দেবার জন্য, যেমন চেয়েছিল পৌরসভার কাছে ২২ মার্চ ১৯২৯ তারিখে, ২০ টাকা।[১০৩] অনুরূপ সচেতনতা নিম্নবর্গেও অনুপস্থিত ছিল না। বাংলা ১৩২৮ সালে প্রকাশিত দুটি 'ভাদু সঙ্গীতে' এই ধারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি—

—'করবো ব্যারিষ্টারি জজ ডাক্তারি
পুরুষ বিজয় করবো চল।।'
বা শুনলাম লোকমুখে
বর্মা দেশে মেয়েরা স্বাধীন থাকে।
.....পুরুষেরা বাসন মাজে লো
ঘর ঝাঁটায় গৃহে থেকে।
স্ত্রীলোক করে পুরুষের কাজ,
রোজগারি সুখে দুখে।।[১০৩ক]

দর্পণে বৈদেশিক বা অন্যান্য প্রদেশের খবরও নিয়মিত থাকত। এর মধ্যে 'তাতারে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্কে লোকে গরমে ছটফট্ করিতেছে' থেকে শুরু করে 'বিকানীরের মহারাজা এখন ইংলন্ডে' বা পূর্ববঙ্গে স্বদেশি আন্দোলন বর্ণনা—এমন অজস্র সংবাদ থাকত। বৈদেশিক সংবাদ অবশ্য অন্যত্রও প্রকাশিত হত। যেমন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর 'যুগদীপ'-এ কোরিয়ার বিপ্লবের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল দেখতে পাচ্ছি। এমন উদাহরণ আরও অজস্র দেওয়া যেতে পারে।[১০৩খ]

স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন ১৯০৫ সাল বা তার পরবর্তী সময়ে দর্পণের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আসলে বুদ্ধিজীবীরা চলেছিলেন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। সুতরাং গ্রামসীর ক্রান্তিকালীন বুদ্ধিজীবী হিসাবে এঁরা এবার দায়িত্ব পালন করছেন। তবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ শোনা যায়নি। আসলে সারা ভারতেই তখন সময়টি ছিল নরমপন্থার, 'ভারতেশ্বরের মঙ্গল গীত রচনা করে, ইংরেজ রাজত্বের প্রজাবাৎসল্য প্রচার করে বিষ্ণুপুর রাজভক্ত থিয়েটার কোম্পানির নগর পরিক্রমা'র খবর দর্পণেই পাচ্ছি (২৩ জুলাই, ১৯০৭)। আবার দেখছি ইংরেজ রাজত্বের প্রতি মোহ—'হাকিম হইয়া যিনি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হন, তিনি ইংরাজ রাজত্বের বিচারালয় কলুষিত করিবার জন্য হাকিমী করিতেছেন' (সেপ্টেম্বর ১৯০৬), নৌরজীর 'Poverty and un-British Rule in India'র সঙ্গে কোথায় যেন মিল পাচ্ছি না ?

'স্বদেশি দ্রব্য সংগ্রহ' ও 'কলিকাতায় যুবরাজ ও যুবরাজপত্নী'—একই দিনে (১ জানুয়ারি, ১৯০৬) পাশাপাশি দুটি সংবাদ প্রকাশের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার একটি স্ববিরোধী চরিত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে এ ধরনের স্ব-বিরোধ থাকা অস্বাভাবিক নয়, আর সেভাবে জাতীয়তাবাদ তখন বাঁকুড়ায় প্রসারিত হয়েছিল কিনা তা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তবে দর্পণে স্বদেশি প্রসঙ্গ এত বেশি পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে যে, বুঝতে অসুবিধা হয় না মধ্যবিত্ত শ্রেণী উল্লসিতই বোধ করতেন। যুবরাজ এলে হরতাল করার কথাও[১০৪] বলেছিলেন অনিলবরণ।

১৯০৫ সাল থেকেই জেলায় স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সরকারি প্রতিবেদন বলছে দাঙ্গাহাঙ্গামায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উকিল, মোক্তার, শিক্ষক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ছিল প্রধান। বাঁকুড়া 'সিক্রেট সোসাইটি'র নেতা রামদাস চক্রবর্তী ছিলেন 'কালেক্টরেট'-এর করণিক।[১০৫] ১৯০৬ সালের ৭ আগস্ট বড় বোলো আনায় যে স্বদেশি সভা হয়, ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন তার সভাপতিত্ব করেন। (বাঁ. দ. সেপ্টেম্বর, ১৯০৬)। বিদেশি চিনি ব্যবহারকারীর উপর ১০০ টাকা 'Caste Fine' আরোপ করেছিল ময়রা সম্প্রদায়।[১০৬]

কিন্তু তা সত্ত্বেও মাড়োয়ারিরা বিলাতি লবণ ও চিনি বিক্রি করছে বলে দর্পণ লিখেছে (বাঁ. দ. সেপ্টেম্বর, ১৯০৬)।'

পাশাপাশি স্বদেশি কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর সংবাদ নিয়মিত প্রকাশ করে, উৎসাহ দিয়ে দর্পণ তার যুগোপযোগী চরিত্র বজায় রেখেছিল। ১৯০৫ সালের ৯ জানুয়ারি বাঁকুড়া 'সেন্ট্রাল হলে' জেলা শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। 'কুলদাবাবু ছিলেন সভাপতি, রামনাথ মুখার্জি, নটবর মিত্র, বিনোদবিহারী মণ্ডল, খ্রিস্টধর্ম প্রচারক চন্দ্রকুমার সরকার প্রমুখ কার্যনির্বাহী সভায় নির্বাচিত হন। (বাঁ. দ. ১৬-১-১৯০৫)। দেশীয় কৃষি-শিল্প ইত্যাদির উন্নতিসাধনের জন্য শহরে প্রদর্শনী হত। বলতে গেলে কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই,[১০৭] দর্পণ ঘাঁটলেই তা দেখা যায়। ১৯০৬, ৭, ৯, ১০ ও ১৯১২-র পর ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনী হয় (বাঁ. ল. প্রথম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৩৯—৪৪), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এসেছিলেন উদ্বোধন করতে। গুরুসদয় দত্ত আবার চর্মশিল্প প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন (বাঁ. ল. প্রথম বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ৬০)। এডওয়ার্ড টমসনও লিখেছেন জেলাশাসক মনোরঞ্জন চ্যাটার্জি (কাল্পনিক নাম বলেই মনে হয়) কৃষি প্রদর্শনী অব্যাহত রেখেছিলেন এবং গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক সংস্কারে এঁর বিরাট ভূমিকা ছিল।[১০৮] আবার 'লক্ষ্মী'র বিজ্ঞাপনেও দেখছি (প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা) বাঁকুড়া জেলা 'Co-operative Industrial Union Ltd.'-এর যাবতীয় বস্ত্রই স্বদেশি সুতায় প্রস্তুত হয়, রঙীন সুতাও স্বদেশি।'

ইতিমধ্যে শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রাম। সুবিধাবাদির মতো নীরব থাকলেন না সম্পাদকরা। জেলার 'বন্দেমাতরম্' দলের কার্যপদ্ধতি দর্পণেই পেয়েছি। অনিলবরণের 'বাঁকুড়া শঙ্খ' বা 'বাঁকুড়া সেবক' পত্রিকায় দৈন্যদশার জন্য ইংরেজকে দায়ী করে স্বরাজের কথা বলা হত।[১০৯] আবার কমলকৃষ্ণ রায়ের 'যুগদীপ' ছিল ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনকেও তা এককালে প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে রামকৃষ্ণ দাস লিখেছেন।[১১০]

১৯৩০ সালের ২ এপ্রিল তারিখের 'যুগদীপ' লিখছে, শুধু লবণ আইন অমান্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নয়, এর পর আমরা ইউনিয়ন বোর্ডে কর প্রদান বন্ধ করতে শুরু করব।

পাশাপাশি জেলাবাসীকে উদ্দীপ্ত করতে যুগদীপ আরও লিখল—হে বীর হাম্বিরের জন্মস্থান বাঁকুড়ার অধিবাসীবৃন্দ, মনে রেখ—যদি ভারতবর্ষ বাঁচে তাহলে মরতে ভয় কি? যদি দেশমাতৃকাই মারা যায় তাহলে বেঁচে লাভ কি?[১১০ক]

১৯২৭-এর ১২ সেপ্টেম্বর 'যুগদীপ' লিখল পথের ভিখারির চেয়েও দরিদ্র ভারতবাসী অসহায়। কারণ, এই পীড়নমূলক সরকারকে তার এক হাজার একটি কর দিতে হয়, এর পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লেগ তো প্রতি বছর লেগেই আছে।[১১০খ]

পাশাপাশি ছাপা হত দেশাত্মবোধক কবিতাও। যেমন একই দিনে নরেন্দ্রনাথ কর একটি কবিতা লিখেছিলেন, তার একটু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—'শতাধিক সীতা আজ দানবের হাতে বন্দী........দুর্বলের আশা আজ কোথায়? নারীর ত্রাণকর্তাই বা কোথায়?' এই ক্ষোভ কার প্রতি তা বোধ করি বলা নিষ্প্রয়োজন।[১১০গ]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মহাত্মা গান্ধীর নাম যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, যাকে অমলেশ ত্রিপাঠী বা সুমিত সরকাররা 'ক্যারিশ্মা' বলছেন, বাংলায়ও তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত। ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন 'গান্ধীমহারাজ', তারও আগে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছেন 'মহাত্মা গান্ধীর অষ্টোত্তর শত নাম', ১৩২৯ বঙ্গাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নরেন্দ্র দেবের কবিতা এবং শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ নিয়ে সংকলিত হল 'গান্ধী কীর্তন'।[১১১] এর তিন বছর পরে গান্ধীর বাঁকুড়া আগমন উপলক্ষে ১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসে 'লক্ষ্মী' যে বিশেষ গান্ধী সংখ্যা প্রকাশ করে সেখানে শ্রী শ্রীপতিচরণ দে 'মহাত্মামঙ্গল' নামে একটি নাটক লিখেছেন। সেখানে দেখছি মেথরদের মধ্যে গান্ধীকে নিয়ে এক উন্মাদনা, যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল সতীনাথের ঢোঁড়াই চরিত মানসের তাৎমাটুলিতে। লটু বলছে, 'হামি মনমে উন্‌কে দিনরাত দেখতে পাই লছিয়া...।' আবার নিতাই যেখানে কৃষ্ণদাসকে বলছে—'গান্ধী মহারাজ চলে গেলেইত আর আমি তোমার মত মানচেষ্টারের দোরে ছুটব না' (পৃঃ ৩৫৯—৬১)—তখন মনে পড়ে রামানুজ করের একটি কথা, 'বাঁকুড়া জেলার বিবরণ'-এ তিনি লিখেছেন 'আজ যাহারা স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চিৎকার করিতেছেন তাঁহারাই বিলাতি দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা...' (পৃঃ ৯৪)। এটিই বোধ হয় স্বদেশি আন্দোলনের একটি স্ববিরোধ, 'Paradox'।

সে যাই হোক, এই নাটক থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সেটি হল এই যে, নিচুতলার মানুষের মধ্যেও গান্ধীর আবেদন কত ব্যাপক ছিল। বাংলা সন ১৩২৮-এর একটি ভাদু গানেও অবশ্য এর প্রমাণ পাচ্ছি—

'নান্‌-কো-অপারেসন
দেশে আইছে গান্ধীজির হুজুগ নূতন।।
অপরূপ টাটকা গন্ধ রে
বালক যুবা সুরঞ্জন
(রূপ) মনোহর অগোচর
অঘটন সুখ নটন।।[১১১ক]

> **আসলে সংবাদ সাময়িকপত্র উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্ক যে নিবিড় তা আগে বলেছি। দুটির বিকাশই সমান্তরালে ঘটেছে। এই শ্রেণীই সভা-সমিতি গঠন ও সংবাদপত্র প্রসারের উদ্যোক্তা হিসাবে বা তার মাধ্যমে সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে এসেছিল। বাঁকুড়া জেলাতেও 'বাঁকুড়া জেলা কৃষি ও হিতকরী সমিতি'র মতো সভার উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'বাঁকুড়া লক্ষ্মী' পত্রিকা।**

তাই বলা যায় দুটি ধারাই চলেছিল সমান্তরালভাবে।

এবার অন্য প্রসঙ্গে যাই। উনিশ শতকের ম্যাজিস্ট্রেটরা নিম্নবর্গের মহিলাদের মধ্যে সতীদাহের প্রাদুর্ভাব বেশি লক্ষ করেছেন।[১১২] আসলে সহমরণ যখন ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল, সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত হল তখন তা নিম্ন বর্ণেও সংক্রামিত হয়। একে সামাজিক প্রথার—'Sanskritization' বলা যায়। এক ধরনের একটি পুনরুজ্জীবনবাদী প্রবণতা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতেও দেখছি। ১৯০৭ খ্রিঃ-র আগস্টে ভড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ ধর্মরক্ষিণী সভার অধিবেশন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দর্পণে (পৃঃ ৭)। লক্ষ্মীর কার্তিক, ১৩৩১ সংখ্যায় কোতুলপুরে 'ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্কার সমিতি'র উল্লেখ পাচ্ছি, পাচ্ছি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও সংবাদ—স্বামী হিরানন্দ স্কুলডাঙাতে বাড়ি ভাড়া করে আশ্রমের সূচনা করেছিলেন (প্রথম বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩১ সাল, পঞ্চম সংখ্যা, পৃঃ ১৯৪) 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' প্রথম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টায় বড়জোড়ার বৃন্দাবনপুর ব্রহ্মচারী আশ্রম প্রাঙ্গণে 'বাঁকুড়া হিন্দু সমাজসংস্কার সংসদ'-এর প্রথম অধিবেশনের কার্য সম্পাদিত হয়। সভাপতি ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়। তবে এঁরা যুগোপযোগী হচ্ছিলেন ক্রমশ, কারণ মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁরা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের হল-চালনার কথা বলে বলছেন—'অগ্রে প্রাণরক্ষা তারপর ধর্ম' (পৃঃ ৩২-৩৩)। এর বছর পনের পরেই ৩১-৩-১৯৪১-এ বিধবা বিবাহ বন্ধের জন্য তেলি জাতির ৫০০ জনের এক জনসভার উল্লেখ করেছে জেলা গোয়েন্দা দপ্তর। একে কি তাহলে ওই হিন্দু পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ার পরিণতি বলব ?[১১৩]

আমার সন্ধান পাওয়া আর দুটি পত্রিকার কথা বলে শেষ করব। প্রথমটি চিকিৎসা বিষয়ক—'চিকিৎসা-দর্পণ'। আখ্যাপত্রেই বলা হয়েছে, এটি একটি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচক'। নিবেদন অংশে বলা হয়েছে—বাংলার সাময়িক পত্রিকা জগতে চিকিৎসা দর্পণ'-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হল সরল বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করা'। 'বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবন্ধ, সংকলন, নূতন ভৈষজ্যতত্ত্ব, নূতন সাময়িক প্রয়োগতত্ত্ব, দেশীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ, প্রেরিত পত্র ও ফলপ্রদ ব্যবস্থাপত্র'—এই নটি ভাগে পত্রিকাটি বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হবে বলে বলা হয়েছিল (প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১—৪)। ডাঃ নাগ 'ইনফ্লুয়েঞ্জা ও তাহার চিকিৎসা' এবং সর্দি-কাশি ইত্যাদি নিয়ে ডাঃ রায় একটি প্রবন্ধ লেখেন প্রথম সংখ্যাতেই। বিজ্ঞাপনে ডাঃ নাগ আবিষ্কৃত শান্তিসুধা (জ্বর), বিমলসুধা (বাত), ইত্যাদি বিভিন্ন ওষুধের নাম দেওয়া হয়েছে। সারদা দেবীর স্নেহধন্য[১১৪] সমাজসেবক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ নাগের বাবা সাতকড়ি নাগ হুগলি জেলার গোঘাট থেকে কোতুলপুর[১১৫] এসেছিলেন। তিনি ছিলেন কোতুলপুর হিতসাধনী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (বাঁ. ল. ১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৮) স্বাস্থ্য রক্ষায় এই সমিতির কাজ প্রশংসনীয় (বাঁ. ল. ২য় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৫)। এছাড়া দ্বারকেশ্বরের বন্যায় ত্রাণকার্য, জলসত্র, অগ্নি নির্বাপণ কার্য—সবেতেই সমিতি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিল (বাঁ. ল., প্রথম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৭৩—৭৭)—কোতুলপুর হিতসাধনী সমিতির কার্যনির্বাহক সভার দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণী)। উনিশ শতকের শেষে বা বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাংলার প্রায় প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ মাহাত্ম্য, গৌরব, ইতিহাস প্রচার করে কিছু পত্রিকা প্রকাশ করত। যেমন—যোগী দর্পণ, মোদক হিতৈষিণী, সদগোপ পত্রিকা, বঙ্গীয় তিলি সমাজ পত্রিকা ইত্যাদি। জাতীয়তাবাদী
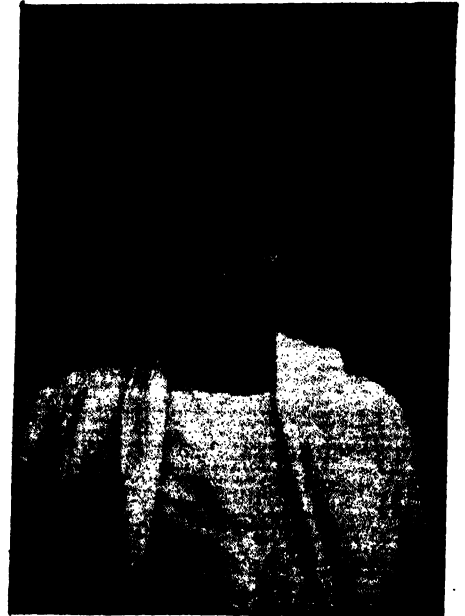
ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ

আন্দোলনের কাছে অনেক সময় এগুলি ছিল একটি 'চ্যালেঞ্জ'-এর মতো। বাঁকুড়াও কিন্তু এই প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিল না। জেলার গন্ধবণিক সমাজে ডাঃ রাখাল নাগ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে কথা আগেই বলেছি। ১৯৩৭ সালে পাত্রসায়ের হাটকৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রদেশিক কৃষক সম্মেলনে তিনি ছিলেন কোতুলপুরের প্রতিনিধি।[১১৬] শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে তিনি গন্ধবণিক সমাজে প্রচলিত একমাস অশৌচ প্রথার পরিবর্তে পনের দিন ধার্য করলেন, বই লিখলেন 'বৈশ্য গন্ধবণিক সমাজে বৈশ্যাচারসম্মত পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন'। 'বৈশ্য গন্ধবণিক জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' রচনাও শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। পাণ্ডুলিপির 'জেরক্স' আমার কাছে রয়েছে। অবিনাশচন্দ্র দাসও একটি বই লিখেছিলেন—'গন্ধবণিক জাতির প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা' নামে, যা বাংলা সন ১৩৩০-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

জাতিভিত্তিক সমিতিও অপরিচিত ছিল না। মোদক ষোলো আনা, কর্মকার ষোল আনা বা কেওট ষোলো আনাগুলির পাশাপাশি লিখিত বিবরণও কিছু পাচ্ছি। 'সুবর্ণবণিক সমাচারে' লেখা হচ্ছে—

ক্ষত্রিয় শৌণ্ডিক

ও

ব্রাত্য ক্ষত্র।

প্রথম খণ্ড।

ক্ষত্রিয় শৌণ্ডিক সমিতি হইতে—

(সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের লেখনী প্রসূত সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধযুক্ত সামাজিক পুস্তক।)

PUBLISHED BY

F. Mandal—Maliara, H. E. School.

Fuljam. P. O. Maliara Dist Bankura

Calcutta

Printed by Ashu Tosh Ghosh, at the—"Uma Press."

No. 11A Raja Naba Krishna's Street.

১৩২০। ১লা কার্ত্তিক

১২ খণ্ডের মূল্য অগ্রিম মূল্য ১৲ এক টাকা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ভিঃ পিঃ তে লইলে আরও ৵০ আনা বেশী।

ক্ষত্রিয় শৌণ্ডিক ১৩২০, ১ কার্তিক

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েটদের তালিকায় বাঁকুড়া জেলা থেকে ১১ জন ছিলেন দেখতে পাচ্ছি এঁদের কেউ শিক্ষক, কেউ বা ব্যবহারজীবী/উকিল। পরে আরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল, প্রশাসনেও এঁরা ঢুকে পড়লেন—বেইলির ভাষায়—'Service Gentry'।[৩০] ১৮৭২-৭৩ সালে বাঁকুড়া জেলায় সর্বমোট ২৫৪ জন শিক্ষক ছিলেন।[৩১] আবার ১৮০৯, ১৫, ১৭, ১৮১৮ বা তারও পরবর্তী সময়ে 'Judicial and Police Establishment'গুলিতে দেখছি কিভাবে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ধীরে ধীরে প্রশাসনে ঢুকে পড়ছিলেন। শহরের ১৪টি মহল্লায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি ১১২।

'বাঁকুড়া সুবর্ণবণিক সমাজ—বিগত ২৫শে চৈত্র শনিবার সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকার সময় বাঁকুড়া চকবাজারস্থ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দে মহাশয়ের ভবনে একটা জাতীয় সভার অধিবেশন হয়...প্রায় চারিশত লোকের সমাগম হইয়াছিল, সূর্যনারায়ণ পাল, আশুতোষ দে, গোপীনাথ দে সহ তেরজনকে নিয়ে এক সমিতি গঠন করা হয়।[১১৭] নিজেদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছিল 'বাঁকুড়া জেলা মল্লভূম বিশ্বকর্মা বংশীয় সূত্রধর সম্মিলনী', এঁদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণটি ছাপাও হয়।[১১৮] ১৩৩৬ সালের ৭ বৈশাখ গড়রাইপুরে বাইশ পরগনাভুক্ত বঙ্গীয় তিলি জাতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১১৯] তবে এঁদের সকলের আগে বাংলা সন ১৩২০-তে মালিয়াড়ার ফুলজাম নিবাসী জনৈক ফেলারাম মণ্ডল 'ক্ষত্রিয় শৌণ্ডিক ও ব্রাত্য ক্ষত্র' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন, বারো খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ছিল এক টাকা।

ফেলারাম মণ্ডলের জন্ম ১৮৭০ সাল নাগাদ। বাবার নাম গণেশ মণ্ডল।[১২০] শাস্ত্র ও পুরাণ উদ্ধৃত করে তিনি শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) জাতির ইতিহাস, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। প্রায় ৮৮ বছর আগে ওয়ারিয়া স্টেশনে পায়ে হেঁটে পৌঁছে পত্রিকা প্রকাশ সহ বঙ্গীয় সাহা সমিতির নানা কাজে তিনি কলকাতা যেতেন।[১২১] ১৩২০-র ১ কার্তিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি নিয়ে অন্যত্র আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে চলেছে। অতএব সংগত কারণেই এর অধিক আমার আর কিছু লেখা সমীচীন নয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সংবাদপত্রে যুগ পরিবর্তনের প্রথম পর্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত দেখতে পাই।' পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস। কারণ, তিনি দেখিয়েছেন, এর সঙ্গে

বুদ্ধিজীবীদেরই যোগাযোগ ছিল।[১২২] বাঁকুড়া জেলাতেও আমরা একরকম তেমনটিই দেখলাম। কিন্তু আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই একসময় সংবাদ সাময়িকপত্রগুলির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটায়। ধনীরা সে আমলে এই ব্যবসায় পুঁজি লগ্নি করেনি, কারণ তারা জমিতে বিনিয়োগ অনেকে নিরাপদ মনে করত।[১২৩] এই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে একসময় মফস্বল পত্রপত্রিকার অনেকগুলিই একদিন হারিয়ে গেল। ১৯০৬-এর ১ সেপ্টেম্বর তারিখের দর্পণে 'মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার' অংশে দেখছি জেলার বাইরে রানীগঞ্জ বা ঝরিয়াতেও পত্রিকাটি নেওয়া হত। কিন্তু ধীরে ধীরে একদিন তাও হারিয়ে গেল। যদিও দর্পণ প্রকাশিত হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এর যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি, কাল সচেতনতা, স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা জাতীয় জীবনে এক দুর্ভাগ্যজনক স্মৃতি হিসাবে রয়ে গেছে, দর্পণে তারও প্রতিফলন স্পষ্ট। ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৬ ডিসেম্বর তারিখের দর্পণে প্রকাশিত একটি কবিতা ও সংবাদ তো বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দপ্তর থেকে এর জন্য সম্পাদককে সতর্কও করা হয়েছিল। কবিতাটির রচয়িতা জনৈক চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নাম 'জাগো', দুটি 'লাইন' কেবল উল্লেখ করছি...

'মোদের রক্তে রচিবে পাপীরা
কাদের 'কোন স্থান'।
ছিঁড়ুক তাদের কল্পনা জাল,
জানাও মরিনি হিন্দু,
মোদের রক্তে উঠুক ভরিয়া তাদের বিষাদ সিন্ধু.....'।

আর সংবাদটির শিরোনাম ছিল—'নারী দলনের প্রস্তুতি' স্বরাষ্ট্র দপ্তর এটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল—'This is likely to promote feelings of hatred and bitterness between the communities. So a written warning may be administered to the editor against the consequence of Publication of such articles in future [Home Deptt. Political (Press) Branch, Proceedings B. April 1948, No. 137, File No. PR21/47, subject: Extract from 'Bankura Darpan' Action taken against for Publication of objectionable articles'—W.B.State Archives] যাই হোক স্বাধীনতার পরেও কয়েক বছর দর্পণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সৌভাগ্যের কথা, তখনও ডাঃ রামরবি মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দর্পণ জেলার সুখদুঃখ, অভাব-অভিযোগ নিয়ে তার ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল (সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ফাল্গুনী, পৌষ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৯৯, বাঁকুড়া)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বুদ্ধদেব কুচলান, অসিত পরামানিক, অধ্যাপক তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া, সুব্রত কর্মকার মালিয়াড়া, সাধন মণ্ডল পুরুলিয়া, রাজীব দাস—দুর্গাপুর, বিকাশরঞ্জন মল্লিক, উমাশঙ্কর মল্লিক কোতুলপুর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার কলকাতা।

পাদটীকা

১। জন ব্রুমফিল্ড Mostly About Bengal, নয়াদিল্লি, ১৯৮২, পৃঃ ২৫০, ২৫৬।

২। ও'ম্যালি, Bengal District Gazetteers; Bankura, কলকাতা, ১৯০৮, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫, পৃঃ ৩৪।

৩। ওয়াল্টার হ্যামিলটন, Geographical, Statistical and Historical Description of Hindoostan and the Adjacent countries, প্রথম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮২০, পৃঃ ১৪২-৪৩।

৪। গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), Awakening in Begal in Early Nineteenth Century, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৫, হরচন্দ্র ঘোষ, 'Topographical and statistical sketch of Bankura', পৃঃ ৬৫ ও ৬৭।

৫। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৫শ বর্ষ, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

৬। এফ ডব্লু রবার্টসন, Final Report on the survey and settlement operations in the District of Bankura, 1917-24, কলকাতা, ১৯২৬, পৃঃ ৭।

৭। ধর্মকুমার (সম্পা) Economic History of India দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৫৭—১৯৭০ ভারতীয় মুদ্রণ, হায়দরাবাদ, ১৯৮৪, 'Regional Economy' (1757-1857), 2/II, Eastern India, পৃঃ ৩০৩।

৮। রামানুজ কর, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, বাঁকুড়া, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

৯। Report of Fact Finding survey on Bankura District, Department of Economic studies, United Bank of India,, কলকাতা, ১৯৭১, 'গ্রন্থভূমিকা'।

১০। নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা)। যদুনাথ সর্বাধিকারী রচিত তাঁহার ভ্রমণের রোজনামচা, কলি, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৪।

১১। জে ই গ্যাস্ট্রেল Statistical and Geographical Report of the District of Bankura, কলকাতা, ১৮৬৩, পৃঃ ১৬ ও ২১।

১২। Financial Department, Industry and Science Branch, B, Proceedings, 28th December, 1874, No. 56/57. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার (এরপর প রা লে)।

১৩। Resolutions of the meetings of the Commissioners, Bankura Municipality, 15-3-1885. (এরপর আর বি এম)।

১৪। নীলমণি চক্রবর্তী, 'আত্মজীবন স্মৃতি', কলকাতা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৩, ৫৪-৫৫।

১৫। কৃষ্ণকুমার মিত্র 'আত্মচরিত', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৪০।

১৬। General Deptt, Ecclesiastical Banch, B. proceedings, ৫—৮ মার্চ, ১৯০২, পঃ রা লে।

১৭। এডওয়ার্ড টমসন, An Indian day, লন্ডন, ১৯২৭, পৃঃ ৩৩।

১৮। Resolution No. 16, Dt. 30.1.1924. R.B.M।

১৯। Report on native papers, (এর পর R.N.P), week ending 18th March, 1893. পৃঃ ২১৪ এবং Week ending 5.10.1912, পৃঃ ১১৭১ প রা লে।

২০। Resolutions of the meetings of Dispensary Committee 31.10.1868, preserved in Bankura Municipality.

২১। General Deptt. Proceedings No. 57-62, পৃঃ ৯৯৫—১০০০, December, 1895.

২২। শরৎ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৯।

২৩। Report on the world social situation, including studies of urbanization in under-developed Areas (U.N.O) নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭, Pt. II, chapter VII, 'Social problems of urbanization in Economically underdeveloped areas'. পৃঃ ১১১—১৪৩।

২৪। সুকুমার সিন্‌হা ও হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা) West Bengal District Records (W.B.D.R.), Bankura District, Letters Issued (1802–69), কলকাতা, ১৯৮৯, পত্র সংখ্যা-৩৯২।

২৫। শ্রীপান্থ, 'কলকাতা', কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩০৭-৮।

২৬। বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৮৯।

২৭। ডব্লু ডব্লু হান্টার, A statistical Account of Bengal, চতুর্থ খণ্ড, লন্ডন, ১৮৭৭, ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৭৩, পৃঃ ২৯৭।

২৮। বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৩-৪।

২৯। প্রদীপ সিন্‌হা, Nineteenth century Bengal, Aspects of social History, কলকাতা, ১৯৬৫, Appendix 'D'—A complete alphabetical list of Graduates of the Calcutta University from 1858–1881—with their Degrees and occupations. পৃঃ ১৬২, ১৬৩, ১৬৮, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০, ১৯১।

৩০। সুমিত সরকার, writing social History, Oxford University Press (O.U.P), ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০০, পৃঃ ১৭২ ও সি এ বেইলি, Rulers, townsmen and Bazaars; North Indian Society in the age of British expansion, 1770–1870, O.U.P নয়াদিল্লি সন ২০০০, পৃঃ ৪৬৭।

৩১। হান্টার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৭।

৩২। W.B.D.R., পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯, ৭৯, ৮৬—৮৮, ৯৫, ১০১।

৩৩। বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪-৭৫, বি বি মিশ্র, The Indian Middle Class, their Growth in Modern times, ভারতীয় সংস্করণ, নয়াদিল্লি, ১৯৮৩, পৃঃ ১৬২—২১০।

৩৪। বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৬-১৭।

৩৪ক। পূর্বোক্ত W.B.D.R, পৃঃ ২৮২, পত্র নং ৩৯২, ও R.B.M ১ মে ১৮৮৫।

৩৪খ। হিন্দুবাণী অষ্টাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঁকুড়া শহরের গোড়ার কথা', পৃঃ ৫-৬।

৩৫। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, আষাঢ়—ভাদ্র, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, শেখর ভৌমিক, 'সরকারি নথিপত্রে উনিশ শতকের বাঁকুড়া', পৃঃ ৮৭।

৩৬। Board of Revenue, Appointments Branch, Proceedings No. 131, 1.12.1858, এবং সাক্ষাৎকার, দীপক চ্যাটার্জি, কান্তিবাবুর গলি, বাঁকুড়া, ১৬-৫-০১।

৩৭। সাক্ষাৎকার গৌরীপদ বিশ্বাস, কায়স্থপাড়া, ইন্দ্র বিশ্বাসের গলি, ৬-৫-০১।

৩৮। বাঁকুড়া দর্পণ, ১৬ জানুয়ারি, ১৯০৫ ও সাক্ষাৎকার শান্তি মিত্র, বড় কালীতলা ৬-৫-০১।

৩৯। প্রদীপ সিন্‌হা, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮৪, ১৬৩ ও ১৯০।

৪০। শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শানবান্দার ইতিবৃত্ত, বাঁকুড়া, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২১।

৪১। ঐ বাঁকুড়া শহরের গোড়ার কথা, হিন্দুবাণী, অষ্টাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৫।

৪২। ঐ সপ্তম সংখ্যা, পৃঃ ৫।

৪৩। বাঁকুড়া কৃষি পত্রিকা, বাঁকুড়া, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪।

৪৪। রাখালচন্দ্র নাগ কর্তৃক সংকলিত, স্বর্গীয় হরিচরণ দাস, কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬।

৪৫। Municipal Deptt., Local Self Branch, proceedings No. 53–66, December, 1886, Appendix-III. প রা লে।

৪৬। ঐ, Proceedings No. 59 and 63.

৪৭। ঐ, Appendix II and III.

৪৮। ঐ

৪৯। Quintin Hoare ও Geoffrey Nowell Smith (সম্পাদিত ও অনূদিত) আন্তোনিও গ্রামসী, Selection from the prison note books, লন্ডন, ১৯৭৬, 'The Intellectuals' অধ্যায়।

৫০। পূর্বোক্ত, R.B.M., 21st (27th ?) January, 1887.

৫১। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সরস্বতীর ইতর সন্তান, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ১৩২—১৩৪।

৫২। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯১০, পৃঃ ৩০৫।

৫৩। কালীকৃষ্ণ ঘোষ, সেকালের চিত্র, কলকাতা, ১৯১৮, পৃঃ ৮৭।

৫৪। R.N.P., ১৮৯২, পৃ ৬৩৩ প রা লে।

৫৫। সুমন্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৪।

৫৬। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ১০।

৫৭। মিলটন সিংগার, When a great tradition moderninzes; An anthropological Approach to Indian Civilization নিউ ইয়র্ক, ১৯৭২, পৃঃ ৭।

৫৮। অমলেশ ত্রিপাঠী, Trade and Finance in Bengal presidency, 1793–1833. New and Revised edition, দিল্লি, কলকাতা, ইত্যাদি, ১৯৭৯, পৃঃ ১৫৫, ১৮১, ২০৫—৭।

৫৯। রমাকান্ত চক্রবর্তী, বিস্মৃত দর্পণ নিধুবাবু / বাবু বাংলা / গীতরত্ন, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১০১।

৬০। শরৎ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩২০।

৬১। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা প্রসঙ্গে : ছড়া-গান-সাহিত্য-কবিতা, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১২১-২২।

৬২। চিত্তব্রত পালিত, বাংলার চালচিত্রে কলকাতা, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ৩৫।

৬৩। মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সংবাদ সাময়িকপত্র, (১৮৪৭—১৯০৫), কলকাতা সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃঃ ১৩৩।

৬৪। চিত্তব্রত, পূর্বোক্ত, পঃ ৩৩।

৬৫। শশাঙ্ক, হিন্দুবাণী, অষ্টাদশ বর্ষ, ১৪ শ সংখ্যা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

৬৬। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ১৯০।

৬৭। R.B.M , ১৬-১-১৮৫।

৬৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪২, ক্রমিক সংখ্যা ৪১২।

৬৯। ঐ পৃঃ ৬৩, ক্রমিক সংখ্যা ৬১৮।

৭০। Agreements of weaver Boards and Declarations, Deed of Gifts, etc. shelf No. 2. SL No. 7. Preserved in the iron safe, only wrapped by a red cloth, Bankura collectorate records room.

৭১। R.N.P. week ending 5.10.1912. প রা লে।

৭২। সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া, ২২-৩-১৯৯৬।

৭৩। সুধীরকুমার পালিত, পালিতের বাঁকুড়ার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত, বাঁকুড়া,

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৪১।

৭৪। পাদটীকা নং ৭০ দ্রষ্টব্য।

৭৫। Appendix to Calcutta Gazette, 5.10.1939, Bengal Library Catalogue of Books, registered in the Presidency of Bengal during the Quarter ending 31st March, ১৯৩৯, ক্রমিক নং ১৬৯, পৃঃ ১৯ (এর পর বি এল সি)।

৭৬। ঐ বি এল সি, 28.8.1930, Quarter ending 31.3.1930. পৃঃ ৩৭, ক্রমিক নং ৪০৪।

৭৭। পাদটীকা নং ৭০, দ্রষ্টব্য।

৭৮। ঐ

৭৯। ঐ

৮০। ঐ

৮১। রামানুজ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৭।

৮২। বি এল সি, 19.11.1925, Quarter ending 30th June 1925, পৃঃ ৭০, ক্রমিক সংখ্যা-৮৯১।

৮৩। ঐ, 2.7.1930, Quarter ending 31.12.1929, পৃঃ ৬৯, ক্রমিক নং ৭৮৮।

৮৪। পাদটীকা নং-৭০ এবং রামকৃষ্ণ দাস, বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বাঁকুড়া ১৯৯৩, পৃঃ ৯।

৮৫। পাদটীকা নং ৭০, ২৫-৮-১৯৩১ ও ১৯-১২-১৯৩২।

৮৬। ঐ, ২-৩-১৯৩৩।

৮৭। হিতেশরঞ্জন সান্যাল, স্বরাজের পথে, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ২২০।

৮৮। বি এল সি. 4-2-1943, Quarter ending 30-9-1941, পৃঃ ৭২, ক্রমিক নং ৭৬২।

৮৯। ঐ পৃঃ ৭৭, ক্রমিক নং ৮২৯।

৯০। ঐ পৃঃ ৮৯, ক্রমিক নং ১০১৮।

৯১। ঐ, 13-8-1942, Quarter ending 30-6-1941, পৃঃ ৯৩, ক্রমিক সংখ্যা-৯৬০।

৯২। ঐ পৃঃ ৯২, ক্রমিক নং ৯৪২।

৯৩। ঐ পৃঃ ৯১ ক্রমিক নং ৯৪১।

৯৪। শশাঙ্ক, পূর্বোক্ত হিন্দুরানী, অষ্টাদশ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা নং অস্পষ্ট।

৯৫। বি এল সি 20-8-1925, Quarter ending 31-3-1925, পৃঃ ৮৩, ক্রমিক সংখ্যা ১০৯৮।

৯৬। শেখর ভৌমিক, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮৫—৮৭ ও অরুণ মুখার্জি, Crime and Public Disorder in colonial Bengal, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৫২।

৯৭। ও'ম্যালি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪-৫।

৯৮। Revenue Deptt., Land Revenue Branch, proceedings No. B. 91-93, October 1906, File , প রা লে।

৯৯। Proceedings of the Municipal Deptt., November 1896, Dispensaries of Bengal, 1893–95,'Notes from Reports of Civil surgeons, Burdwan Division, Appendix-VI, পৃঃ ৭১৮।

১০০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৩১।

১০১। Municipal Deptt., Municipal Branch, proceedings B. 319, December, 1901, File No.-M-35-5-Insanitary conditin of Bankura—Extract from the R.N.P., প রা লে।

১০২। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, Bengal District Gazetteer : Bankura, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৩০।

১০৩। আর বি এম, ২২-৪-১৯২৯, আইটেম নং-১৪।

১০৩ক। রাজেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত ভাদু সঙ্গীত, বিষ্ণুপুর, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪ ও ৯।

১০৩খ। Report on Newspapers and Periodicals in Bengal. July to December. 1927. Report for the week ending Saturday, 24-9-1927. পৃঃ ৫৭০ প রা লে।

১০৪। সমরেশ বসু, দেখি নাই ফিরে, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ১২৬।

১০৫। Swadeshi Fracas at Mymensingh town, Chandernagar, Bankura and Tipperah. Paper No-51. Bundle No. 15, পৃঃ ১৮-১৯, প রা লে।

১০৬। An Account of the Swadeshi Movement in Bengal—1903–7, paper No. 66, Bundle No. 15, পৃঃ ২৮, প রা লে।

১০৭। তারাপদ সাঁতরা,' কীর্তিবাস কলকাতা, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ৯৩—১০০।

১০৮। এডওয়ার্ড টমসন, A Farewell to India,—লন্ডন, ১৯৩১, পৃঃ ৮।

১০৯। হিতেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃঃ ২২০।

১১০। রামকৃষ্ণ দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

১১০ক। Report on Newspapers and Periodicals in Bengal, January to June 1930. Report for the week ending saturday. 19-4-1930, পৃঃ ৩৫৪।

১১০খ। ঐ July to December, 1927. Report for the week ending saturday, 24-9-1927, পৃঃ ৫৬৯।

১১০গ। ঐ পৃঃ ৫৬৯-৭০।

১১১। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ, পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১, 'বাংলা সাহিত্যে গান্ধীজি', পৃঃ ১০৯—১২২।

১১১ক। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কর, পূর্বোক্ত পৃঃ ৪।

১১২। পাদটীকা নং ২৪, ডব্লু বি ডি আর, পত্র নং-১৬৩।

১১৩। Weekly Confidential Report, dated 12-4-1941, D.I.B. Bankura.

১১৪। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, শ্রীশ্রীসারদা দেবী, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৯৮।

১১৫। সাক্ষাৎকার, ভবানীপ্রসাদ মল্লিক, উমাশঙ্কর মল্লিক (ভগিনী কৃষ্ণভামিনীর সন্তান, রামকিঙ্কর মল্লিকের পুত্র) কোতুলপুর ৩-৫-২০০১।

১১৬। লক্ষ্মীকান্ত পাল (সম্পা), 'অনামী' শারদীয়া সংখ্যা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, কোতুলপুর, লক্ষ্মীকান্ত পাল, 'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঁকুড়ার কোতুলপুর' পৃঃ ৬০—৬৯।

১১৭। নৃসিংহপদ দত্ত (সম্পা), সুবর্ণবণিক—সমাচার, প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা—১৩২৩-২৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৮৯—১৯১।

১১৮। বি এল সি, 28-8-1930, Quarter ending 31-3-1930, পৃঃ ৩৩, ক্রমিক সংখ্যা—৩৬৫।

১১৯। ঐ 20-11-1930, Quarter ending 30-6-1930, পৃঃ ৪৬, ক্রমিক সংখ্যা—৫০৬।

১২০। সাধন মণ্ডল, মলয় মণ্ডল, মৃণাল মণ্ডল, 'আমাদের কথা' ১৯৯৩, প্রকাশ স্থান উল্লেখ করা হয়নি, পৃঃ ১।

১২১। সাক্ষাৎকার, সাধন মণ্ডল, পৌত্র বর্তমানে পুরুলিয়ার এস. পি. ২৫-১০-২০০০।

১২২। মুনতাসীর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

১২৩। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সংবাদপত্র ও বাংলার নবজাগরণ', কলকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ৯৮।

লেখক : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ, মেদিনীপুর

বাঁকুড়া জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা

সুদীপা ব্যানার্জি

উনিশ শতকের বা বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাংলার প্রায় প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ মাহাত্ম্য, গৌরব, ইতিহাস প্রচার করে কিছু পত্রিকা প্রকাশ করত। যেমন—যোগী দর্পণ, মোদক হিতৈষিণী, সদগোপ পত্রিকা, বঙ্গীয় তিলি সমাজ পত্রিকা ইত্যাদি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাছে অনেক সময় এগুলি ছিল একটি 'চ্যালেঞ্জ'-এর মতো। বাঁকুড়াও কিন্তু এই প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিল না।

বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পত্রপত্রিকার এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান আছে। নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সমাজ-সাহিত্যের বিস্তীর্ণ পথ পরিক্রমা করে চলেছে বাঁকুড়ার বহুসংখ্যক পত্রপত্রিকা। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ব্যবহারিক দিকগুলিরও পরিবর্তন হতে দেখা যায়। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় পাথরের খোদাই, ভূর্জপত্র, তালপাতা প্রভৃতির মাধ্যমে সাহিত্য রচনা হয়েছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের হাত ধরেই মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার এবং সাহিত্য, পত্র-পত্রিকার পরিধির বিস্তার ঘটতে শুরু করল।

এ কথা উল্লেখ্য যে কোনও পত্র পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এক্ষেত্রে পাঁচটি নিয়মের কথা বলা যেতে পারে—(১) পত্রিকার ব্যবহার, (২) আঞ্চলিক পত্রিকা, (৩) আঞ্চলিক পত্রিকার পাঠক তৈরি, (৪) ক্ষুদ্র পত্রিকার লেখক সৃষ্টি (৫) ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার ক্রমবর্ধমানশীলতা। এছাড়া পত্রিকা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকের ভূমিকা হওয়া প্রয়োজন রুচিশীল ও পরিশীলিত রচনা প্রকাশ, জ্ঞান ও নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিকভাবে প্রকাশ করা, যা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন বিশ্ব বরেণ্য সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সেজন্য বাঁকুড়ার মানুষের মনে আলোড়ন জাগানোর উদ্দেশ্যে জেলার প্রথম পত্রিকা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে 'বাঁকুড়া দর্পণ'-এর জন্ম হয়। বাঁকুড়া শহরের রায়সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সংবাদের পাশাপাশি কবিতা, প্রবন্ধ ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি সুদীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। বিশ শতকের প্রথমে জেলা কালেক্টর এস এস ও ম্যাজিস্ট্রেট জেলা গেজেটিয়ারে এ তথ্য উল্লেখ করেন। এছাড়া জানতে পারা যায় যে, এই পত্রিকা চীন দেশ পর্যন্ত গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ওই পরিবারের ডাঃ রামরবি মুখোপাধ্যায় 'মল্লভূম' নামে একটি পত্রিকা প্রবর্তন ও সম্পাদনা করেন বেশ কিছু দিন ধরে।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম দিক সব থেকে সৃজনশীল সময়। যে কয়েকজন সাহিত্যসেবী এ সময়ে বাঁকুড়াকে সমগ্র বঙ্গে তথা সারা ভারতে পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, আধুনিক সাংবাদিকতার রূপকার সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার পাঠক পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এম. এ পড়ার সময় সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন। কর্মজীবনে এলাহাবাদে অধ্যাপনা করার সময় তাঁর সাংবাদিক জীবনে প্রথম 'প্রদীপ', পরে ১৯০১ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সম্পাদনার নিষ্ঠা ও যত্নে 'প্রবাসী' হয়ে ওঠে শতাব্দীর মাইলস্টোন। ছ-বছর পরে রামানন্দ সম্পাদনা করেন 'মডার্ন রিভিউ'। এর প্রধান আকর্ষণ ছিল সম্পাদকীয় নোটস। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই পত্রিকাটিকে 'আলোকের উৎস' বলে অভিনন্দিত করেন। শিশুদের জন্য 'মুকুল' এবং হিন্দি পত্রিকা 'বিশাল ভারত'—১৮৯২ সালে এই দুটি পত্রিকা, 'দাসী' এবং 'ধর্মবন্ধু' ১৮৯৩ এ। সম্পাদনার কৃতিত্ব রামানন্দের। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগী হিসাবে যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সত্যকিংকর সাহানা, অবিনাশচন্দ্র দাস প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের পরিমণ্ডলে বাঁকুড়ার সাহিত্য ভাবনা একটি উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করেছিল। কোতুলপুরের সন্তান অবিনাশচন্দ্র দাস অধ্যাপনা কর্মে যুক্ত থেকেও স্বদেশ ও ইন্ডিয়ান মিরর নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া থেকে 'উষা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সময় সজনীকান্ত দাস ১৯১৯ সালে "শনিবারের চিঠি" ও সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের সূচনা করে। জাগরণ ও কল্পনা নামের দুটি অল্পস্থায়ী পত্রিকার পর "বাঁকুড়া লক্ষ্মী" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ১৯২২ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। শশাঙ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকাটি পুরোপুরি ছিল সাহিত্য পত্রিকা এবং এর পেছনে মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক তৎকালীন জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত। এই সমস্ত পত্রিকার বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে অভয় পদ, মল্লিকনাথ পালিত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

যখন সমগ্র দেশ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে মুখর সেই আন্দোলনের ডাকে সারা বাঁকুড়া জেলা জাগরিত হয়েছিল! বাঁকুড়ার

"জুমিদ্‌ দাড়ে" সাঁওতালি ভাষার পত্রিকা। শব্দটির অর্থ হল 'একতাই বল'। ১৭ বছর ধরে আদিবাসী সাহিত্য-সংস্কৃতি আর্থ-সামাজিক চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবে আদিবাসী সমাজে এই পত্রিকার পরিচিতি। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন জ্যোতিলাল হাঁসদা। এছাড়া আদিবাসী ও অনুন্নত অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে লোকসংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার নিয়ে রাঢ়ভূমির দেশজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়সমূহের সুসজ্জিত করেন একটি বিশেষ পত্রিকা। সম্পাদক হলেন গৌরাঙ্গসুন্দর সুবুদ্ধি।' 'রাঢ় উন্মেষণা' নামক পত্রিকা।

চিন্তাশীল মানুষদের মনে স্বাধীনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে। ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা লিথোপ্রিন্টে প্রকাশিত হতে লাগল 'বাঁকুড়া শঙ্খ' নামে।

এছাড়া ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জেলার বিভিন্ন থানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বাঁকুড়া কংগ্রেসের প্রচারপত্র, জয়পুর, কোতুলপুর, ইন্দাস প্রভৃতি জায়গা থেকে। এছাড়া ইংরেজি পত্রিকা 'দ্য ট্রাম্পেট' প্রকাশিত হয়।

১৯০৮ সালে ম্যালেরিয়া, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতি কারণে বহু প্রাণহানি ঘটে। তখন ১৯২১ সালে ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ ও ডাঃ মোহিনীমোহন রায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় "চিকিৎসা দর্পণ" প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯২০-তে প্রথম সেটেলমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কীয় তত্ত্বপ্রচার করার কাজে এই চার আনা মূল্যের 'চিকিৎসা দর্পণ' উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। আবার ১৯৩৯ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে 'সমর শঙ্খ' প্রকাশিত হয়। এতে চৌকিদারের জুলুমবাজি বেলে গ্রামের কোনও এক মহিলা ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য যে অত্যাচার হয়েছিল সে কথা লেখা আছে। ১৯৩৯ সালেই 'রণ বিষাণ' (ইন্দাস), বাঁকুড়া প্রকাশিত হয়। তখন মহাত্মা গান্ধী ইংরেজের সুবুদ্ধির উদ্রেক করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের ৩৫ কোটি নরনারীর প্রতিভূ স্বরূপে 'ভারতের দাবী সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন'। এর কয়েক বছর আগে বঙ্কবিহারী রায় ও বরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের উদ্যোগে ও শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "বাঁকুড়া লক্ষ্মী" কৃষি সমিতির মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

পরবর্তীক্ষেত্রে অর্থাৎ ১৯৪০ সাল থেকে কয়েক বছর বাদ দিয়ে নিয়মিতভাবে বিষ্ণুপুর থেকে "অভিযান" সংবাদ সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় এই পত্রিকার নামকরণ করেন। তখন ১৯৫৭-৫৮ সালে গোকুলচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় বিভিন্ন লেখকদের ছোট গল্প প্রকাশিত হত। বর্তমানে সম্পাদনায় আছেন অধ্যাপক কান্তি হাজরা। ১৯৪২ সালে চাঁদ সুলতানার সম্পাদনায় বাঁকুড়া থেকে মহিলাদের পত্রিকা "কল্পনা" নামে প্রকাশিত হত। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা "হিন্দুবাণী" প্রকাশিত হয়েছে সুকুমার নন্দীর সম্পাদনায়। পাত্রসায়ের থেকে "ইচ্ছাশক্তি" নামে পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই সমস্ত পত্রিকাগুলি সার্বিক দিক দিয়ে গুরুত্ব লাভ করে

দ্রষ্টব্য সারনি ৩, ৪, ৫

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাঁকুড়াতে ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়—'ফাল্গুনী' নামে মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে শিক্ষাবিদ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিশুদের পত্রিকা হিসাবে 'পল্লবী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫১-তে কবি অবনী মল্লিক ও সৌরীন্দ্রনাথ বরাট 'পদধ্বনি' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯৫৩ সালে শিক্ষক-সাহিত্যিক মুক্তি দাশগুপ্ত ও কমল চক্রবর্তী 'ইঙ্গিত' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বৈদ্যনাথ ঘোষ 'কল্পনা' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা ৪ বছর চলেছিল। ১৯৫৮ সালে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী', ১৯৬০ সালে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'সুন্দরম' কম সময়ের জন্য প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকালের সংবাদিক কবি শ্যামাপদ চৌধুরি ও রামশংকর চৌধুরির উদ্যোগে পল্লী লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় বাঁকুড়ায়। বিষ্ণুপুরের চারণ কবি বৈদ্যনাথের প্রতিষ্ঠিত কবিতীর্থ হতে প্রথমে ১৯৫৭ সালে 'ফল্গু' পরে পত্রিকা ইস্তাহার 'খড়্গ' প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৬৫ সালে রামপ্রসাদ পাত্র কর্মকার 'পথের সংগ্রহ' ও কবি অবনী নাগ ও অধ্যাপক কবি আনন্দ বাগচীর সম্পাদনায় 'পারাবত' প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালে বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত প্রথমে 'সংস্কৃতিকা' নামে পরে ১৯৭২ সালে 'সুচেতনা' নামে তারাপ্রসাদ সিকদার ও মন্টু দাসের সম্পাদনায় এবং সম্প্রতি দেবদাস মিদ্যার সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। ছয়ের দশকে ছাতনা থেকে 'সুন্দরম', মঞ্জরী, 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি সংখ্যা

Govt. Of India Registration No. W.B.B.E.N.-2001/5159

দক্ষিণবঙ্গের নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদ পাক্ষিক

প্রকাশিত হয়েছিল। গঙ্গাজলঘাটী থেকে উৎপল মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সাম্পান' ও ছাতনা থেকে মৃদুল মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভেলা' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বাঁকুড়া খ্রিশ্চান কলেজের দুজন অধ্যাপক আনন্দ বাগচি ও অধ্যাপক বিবেকজ্যোতি মৈত্র 'বৃশ্চিক' প্রকাশ করেন। কবি অবনী নাগও এতে যুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক লীলাময় মুখোপাধ্যায় 'বাঁকুড়া হিতৈষী' সম্পাদনা করেন। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রবীণ সাংবাদিক শ্যামাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'রাঢ় বাঁকুড়া' রাঢ়ভূমি বাঁকুড়ার প্রাণের কথা বলে এই, রাঢ় বাঁকুড়া পত্রিকাটি। অশ্বিনী মহান্তী সম্পাদিত 'বাঁকুড়া বার্তা' প্রকাশিত হয়।

বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতিকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। লোকায়ত সমাজের সামগ্রিক ক্রিয়াকর্মকে এই পত্রিকাতে তুলে ধরা হয়েছে। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন শৈলেন দাস ও নমিতা মণ্ডল। এছাড়া অচিন্ত্য জানাও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা বের করে থাকেন—বিষ্ণুপুর থেকে 'রাঢ় জন সমাচার'। বাঁকুড়া থেকে কবি অশ্বিনী কর সম্পাদিত 'সৌতি' প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক কবি মিহির রায় সম্পাদিত 'বাঁকুড়া দর্শন' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার বিশেষত্ব হল ভেষজ বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ এবং যোগ্য মানের গল্প কবিতা প্রকাশ হয়। 'খেয়ালী' পত্রিকা বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের কাছে মর্যাদা অর্জন করেছে। বিশেষ করে 'রূপতাপস সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' সংখ্যা, ১৯৯৬ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে দারুণভাবে প্রশংসিত হয়। এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী।

১৮৮২ সাল থেকে সাহিত্য-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক 'তুলসী চন্দন' হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রবর্তিত প্রথম কয়েক বছর সম্পাদনা করেন। পরে তাঁর পুত্র কবি অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। "বঙ্গীয় সম্প্রচার" পত্রিকাটি উত্তম চট্টোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার বিশেষত্ব হল বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ানো। বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা চেতনার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতি দুঃসাহসিকভাবে প্রকাশনা করে থাকেন। 'মমি কৌস্তভ' পত্রিকাটি অদ্বৈত কুণ্ডু সম্পাদনা করে থাকেন। এই পত্রিকাটির বাউল সংখ্যা উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯৯৬ সালে 'সরণ' পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন সিকদার। তাঁর মৃত্যুর পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের জীবনী প্রকাশ পেয়েছিল।

"জুমিদ দাড়ে" সাঁওতালি ভাষার পত্রিকা। শব্দটির অর্থ হল 'একতাই বল'। ১৭ বছর ধরে আদিবাসী সাহিত্য-সংস্কৃতি আর্থ-সামাজিক চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবে আদিবাসী সমাজে এই পত্রিকার পরিচিতি। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন জ্যোতিলাল হাঁসদা। এছাড়া আদিবাসী ও অনুন্নত অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে লোকসংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার নিয়ে রাঢ়ভূমির দেশজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়সমূহের সুসজ্জিত করেন একটি বিশেষ পত্রিকা। সম্পাদক হলেন গৌরাঙ্গসুন্দর সুবুদ্ধি।' 'রাঢ় উন্মেষণা' নামক পত্রিকা।

এছাড়া পরাবর্তক, মলয় চন্দন, ত্রিবেণী, পরশুরামের কুঠার এবং কবি-গল্পকার গৌতম দে সম্পাদিত ইংরেজি ভাষার পত্রিকা Social Search। নন্দদুলাল ঘোষ সম্পাদিত 'ইন্টারন্যাশনাল প্যারট, জনগণ, গ্রামীণ বঙ্গদূত, থিয়েটার ওয়াল, দি মার্চেন্ট, সোপান, পাগলা ঘন্টি, মৌ, কবির চিঠি, দীপ্তি, বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ, আলাপ, আয়ুধ, কবিতা দর্শদিনে প্রভৃতি সাময়িক পত্র উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সত্যনারায়ণ হালদার সম্পাদিত হিন্দি, 'প্রচারিণী' ও প্রভাত গোস্বামী সম্পাদিত বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় 'অরণ্য মর্মর' একসময় প্রকাশিত হয়েছিল।

এছাড়া আর্ষ, ত্রিবেণী, দীপ্তি, অদম্য, উন্মেষ, কবিতা ও কথা, কণ্ঠস্বর, কম্পাস, কাঁসাই সংবাদ, তৃষা, দলমাদল, নব ফাল্গুনী, নিশ্চল জ্যোতি, পরিব্রাজক পুষ্পারণ্য, পেরিস্কোপ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রেমলীলা, পুরুষোত্তম, বঙ্গদূত, বাঁকুড়া সংস্কৃতি, গৈরিক দূত, সোঁদা মাটি, ধামসামাদল, মেঘ রোদ্দুর, লুব্ধক, দক্ষিণ বাঁকুড়া সাফাই, মুক্ত বিহঙ্গ, পাক্ষিক গ্রাম বাংলার মুখ, সাহিত্য তীর্থ, ভিজিলেন্স, বাঁকুড়া সমবায় সংবাদ, ছড়ার পত্রিকা, 'বুদ্ধভূতুম' পত্রিকার জন্ম হয়েছে এবং অনেকগুলিই চলছে। তাছাড়া বাঁকুড়া সাক্ষরতা প্রসার সমিতির পক্ষ থেকেও "রাঙ্গামাটি" নামে একটি পত্রিকা সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলির জন্য প্রকাশিত হচ্ছে।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম দিক সব থেকে সৃজনশীল সময়। যে-কয়েকজন সাহিত্যসেবী এ সময়ে বাঁকুড়াকে সমগ্র বঙ্গে তথা সারা ভারতে পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, আধুনিক সাংবাদিকতার রূপকার সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার পাঠক পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এম. এ পড়ার সময় সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন।

১৮৮৫ সাল থেকে শতাব্দীব্যাপী বাঁকুড়া জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণীর তালিকা দেওয়া হল।

(তালিকা অসম্পূর্ণ থাকতে পারে)

সারণি-১

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা :

১৮৮৫—বাঁকুড়া দর্পণ— প্রথম পত্রিকা।

সারণি-২

১৯১০-২০-র দশকে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলার পত্রপত্রিকা :

শ্রীগৌরাঙ্গ (মাসিক)—১৯১৯, চিকিৎসা দর্পণ—১৯২১। একতা—১৯২২, রাজহাটি তাম্বলি—১৯২৪, লক্ষ্মী সচিত্র মাসিক—১৯২৪, যুগদীপ—১৯২৪।

সারণি-৩

১৯৩০-এর দশকে বাঁকুড়া জেলায় প্রিন্টিং ও লিথো প্রিন্টিং পত্র-পত্রিকা—(স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপত্র)

বাঁকুড়া শঙ্খ, সত্যাগ্রহ সংবাদ, দ্য ট্রাম্পেট (ইংরেজি), সমরশঙ্খ বাঁকুড়া কংগ্রেস প্রচারপত্র, চিচিং ফাঁক, বেতুড় কংগ্রেস প্রচারপত্র, রণভেরী, প্রলয় বিষাণ, সারথী।

সারণি-৪

১৯৪০-৬০-এর দশকে বাঁকুড়া জেলার পত্র-পত্রিকা :

বাঁকুড়া লক্ষ্মী, অভিযান—১৯৪১, হিন্দুবাণী—১৯৪৬, ফাল্গুনী—১৯৪৮, ইংগিত—১৯৪৯, পল্লবী—১৯৪৯, কল্পনা—১৯৫১-৫২, পদধ্বনি—১৯৫১-৫২, জাগরণ, পারাবত উষা, মিলনতীর্থ, পথের সংগ্রহ, কাঁকন, মাটি, মরুদ্যান, প্রান্তিকা, টেরাকোটা, মল্লভূম।

সারণি-৫

১৯৭০-৮০—এর দশকে জেলার পত্র পত্রিকা :

সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা ভাষায়), ভেলা, নিষাদ, অবান্তর, সাম্পান, সোপান, সুচেতনা, ত্রিবেণী, লগ্নউষা, খড়্গ, ইচ্ছাশক্তি, তন্ত্রী, শস্য, সৈনিক, জুঁই, কামিনী, দিবা, কলস্বাস, মেজিয়াশ্রী, ঘাসফুল, পত্রিকা বাসর, কাঁড়বাঁশ, বাঁকুড়া সাম্প্রতিক, বিংশ শতক, সরল, অবানি, পাগলাঘন্টি, রাঢ় পরিবেশ, রানার, কস্তুরি, ইউলিসিবস, নবকাল পুরুষ, ক্রুদ্ধস্বর, সপ্তদীপা, বাঁকুড়া দর্পণ, সবুজ সংকেত, আইন জগৎ, বাঁকুড়া সমাচার।

সাঁওতালী ও বাংলা ভাষায় নির্ভিক, নিরপেক্ষ, পাক্ষিক

লাহান্তি পত্রিকা

★ LAHANTI PATRIKA

সারণি-৬

১৯৯০-এর দশকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা

আত্মেন্দ্রী, ছিন্নপত্র, নিষ্কল জ্যোতি, কুসুম চলনাথ, পরাবর্তক, পরশুরামের কুঠার, ভিজিলেন্স, রাঢ় উন্মেষণা, আড্ডা, পরিব্রাজক, থিয়েটার ওয়ার্ল্ড, উদয়ন সাময়িকী

সারণি-৭

১৯৯৬-৯৭ সালে সরকার অনুমোদিত ও বিজ্ঞাপন তালিকাভুক্ত পত্র-পত্রিকা :

সাপ্তাহিক—বাঁকুড়া বার্তা, অভিযান, ভাইব্রেশন, রাঢ়জন সমাচার, বঙ্গ পরিচিতি।

পাক্ষিক—দক্ষিণ বাঁকুড়া সাফাই, সৌতি, মুক্তবিহঙ্গ, বাঁকুড়া অবতারভাব, বাঁকুড়া দর্পণ, আঞ্চলিক নবজাগরণ, রাঢ় বাঁকুড়া; বাঁকুড়া সংস্কৃতি, গ্রাম বাংলার মুখ, ইচ্ছাশক্তি, রাঢ় লোকমঙ্গল, অদম্য, বিন্দুবিসর্গ, বঙ্গীয় সম্প্রচার, পুষ্পাঞ্জলি, হিন্দুবাণী, কাঁসাই সংবাদ, বাঁকুড়া হিতৈষী।

মাসিক—মণিকৌস্তভ, ধামসা মাদল।

ত্রৈমাসিক—বাঁকুড়া সমবায় সংবাদ, খেয়ালী, অভিযোজন, সুচেতনা, লোকায়ত সংস্কৃতি, আর্য, তুলসীচন্দন, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি সাহিত্য পত্র।

সাঁওতালী পত্রিকা—জুমিদ দাড়ে।

অন্যান্য—সোঁদামাটি, চিন্তাভাবনা, উদয়ন, দীপ্তি, বিড়াই, ক্ষুদে পাখী, দেয়া, কবির চিঠি, পথের সংগ্রহ, শিলাবতী, প্রমিথিউস, বার্ষিক জেলা গ্রন্থাগার।

সারণি-৮

বর্তমানে ২০০০-২০০১ সালের সরকারি বিজ্ঞাপনের জন্য অনুমোদিত পত্র-পত্রিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশ স্থান
১।	ভাইব্রেশন	দৈনিক	বাঁকুড়া
২।	বাঁকুড়া বার্তা	সাপ্তাহিক	বাঁকুড়া
৩।	অভিযান	সাপ্তাহিক	বিষ্ণুপুর
৪।	রাঢ় জনসমাচার	সাপ্তাহিক	বিষ্ণুপুর
৫।	বাঁকুড়া সমীক্ষা	সাপ্তাহিক	বিষ্ণুপুর
৬।	রাঢ় জনসংযোগ	সাপ্তাহিক	বাঁকুড়া
৭।	বঙ্গ পরিচিতি	সাপ্তাহিক	বাঁকুড়া
৮।	কাঁসাই সংবাদ	পাক্ষিক	খাতড়া
৯।	রাঢ় লোকমঙ্গল	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
১০।	বাঁকুড়া সংস্কৃতি	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
১১।	ইচ্ছাশক্তি	পাক্ষিক	পাটিত
১২।	বাঁকুড়া অভজারভার	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
১৩।	বাঁকুড়া হিতৈষী	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
১৪।	দক্ষিণ বাঁকুড়া সাফাই	পাক্ষিক	ভেদুয়াশোল
১৫।	সৌতি	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
১৬।	হিন্দুবাণী	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
১৭।	বঙ্গীয় সম্প্রচার	পাক্ষিক	পুড়ামৌলি
১৮।	মুক্ত বিহঙ্গ	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
১৯।	আঞ্চলিক নব জাগরণ	পাক্ষিক	শুশুকপাহাড়ী
২০।	পাক্ষিক গ্রাম বাংলার মুখ	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
২১।	বাঁকুড়া দর্শন	পাক্ষিক	বিষ্ণুপুর
২২।	পাক্ষিক অদম্য	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
২৩।	পুষ্পাঞ্জলি সাময়িকী	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
২৪।	রাঢ় বাঁকুড়া	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
২৫।	ভিজিলেন্স	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
২৬।	সোপান	পাক্ষিক	বিষ্ণুপুর
২৭।	বিন্দু বিসর্গ	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
২৮।	পরিবেশ পরিস্থিতি	পাক্ষিক	বিক্রমপুর
২৯।	গৈরিক দূত	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
৩০।	বাঁকুড়া ট্রেডার্স এন্ড ট্রেড	পাক্ষিক	বিষ্ণুপুর
৩১।	মমি কৌস্তভ	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
৩২।	নিউজ কমিউন	মাসিক	বিষ্ণুপুর
৩৩।	রাঢ় বাংলার সংবাদ	মাসিক	খাতড়া
৩৪।	তুলসী চন্দন	মাসিক	ছাতনা
৩৫।	লাহান্তি	মাসিক	বাঁকুড়া
৩৬।	বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৩৭।	সুচেতনা	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৩৮।	খুশির খেয়ালী	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৩৯।	আর্য	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৪০।	জুমিদ দাড়ে	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৪১।	সাহিত্য শ্যামলিকা	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৪২।	লোকায়ত পত্রিকা	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৪৩।	বাঁকুড়া সমবায় সংবাদ	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৪৪।	সোঁদা মাটি	ত্রৈমাসিক	শালতোড়া
৪৫।	উদয়ন সাময়িকী	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৪৬।	উল্লাস	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৪৭।	চিন্তাভাবনা	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৪৮।	ক্ষুদে পাখি	ত্রৈমাসিক	খাতড়া
৪৯।	বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ	ত্রৈমাসিক	বাঁকুড়া
৫০।	পেরিস্কোপ	ত্রৈমাসিক	কাশীপুর, পুইপাল

বাঁকুড়া জেলার পত্র পত্রিকার বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশাল সম্ভার যে শুধু মাত্র স্থানীয় লেখক লেখিকাদের অনুশীলন ক্ষেত্র তা নয়। জেলার বাইরের বহু কবি-সাহিত্যিক এবং প্রতিষ্ঠিত লেখক এমন কি ওপার বাংলার লেখকগণও অংশ নিয়ে থাকেন। পত্রিকাগুলিতে যে কেবল স্থানীয় সংবাদ প্রকাশিত হয় তা নয়; সামাজিক সমস্যা, সাহিত্য, রাজনীতি বিষয়েও সুচিন্তিত সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। গ্রামীণ মানব সম্পদ বিকাশ উন্নয়নে পত্রিকাগুলির বিরাট ভূমিকা ছিল। রেলপথ চালু, শোশুনিয়ার আবিষ্কার, বাঁধগোরা আন্দোলন, কংসাবতী জলাধার নির্মাণ প্রভৃতি এমন কি আদিবাসী চিন্তাভাবনা নিয়ে আদিবাসী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাগুলির বিভিন্ন রকমের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শতাধিক পত্র পত্রিকা জন্ম দিয়েছে। শত শত কবি ও সাহিত্যিক পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে এবং এই সবের মধ্যে বাঁকুড়ার ঐতিহ্যকে তুলে ধরে আগামী দিনে ইতিহাস রচিত হবে।

সূত্র :

১। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বাঁকুড়া
২। স্বাধীনতার ইতিহাসে বাঁকুড়া, সংগ্রাম ও সংগ্রামী ভূমিকায় — শৈলেন দাস, নমিতা মণ্ডল, দিব্যেন্দুশেখর চক্রবর্তী।
৩। বাঁকুড়ার ইতিবৃত্ত — হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।
৪। বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি — শৈলেন দাস।
৫। বাঁকুড়া পত্র পত্রিকা সম্বন্ধে — রাজেন্দ্রপ্রসাদ হাজরা।

লেখক কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি,
বাঁকুড়া জিলা পরিষদ

বাঁকুড়া জেলা বইমেলায় বই ও পত্রপত্রিকার উৎসাহী ক্রেতার ভিড়
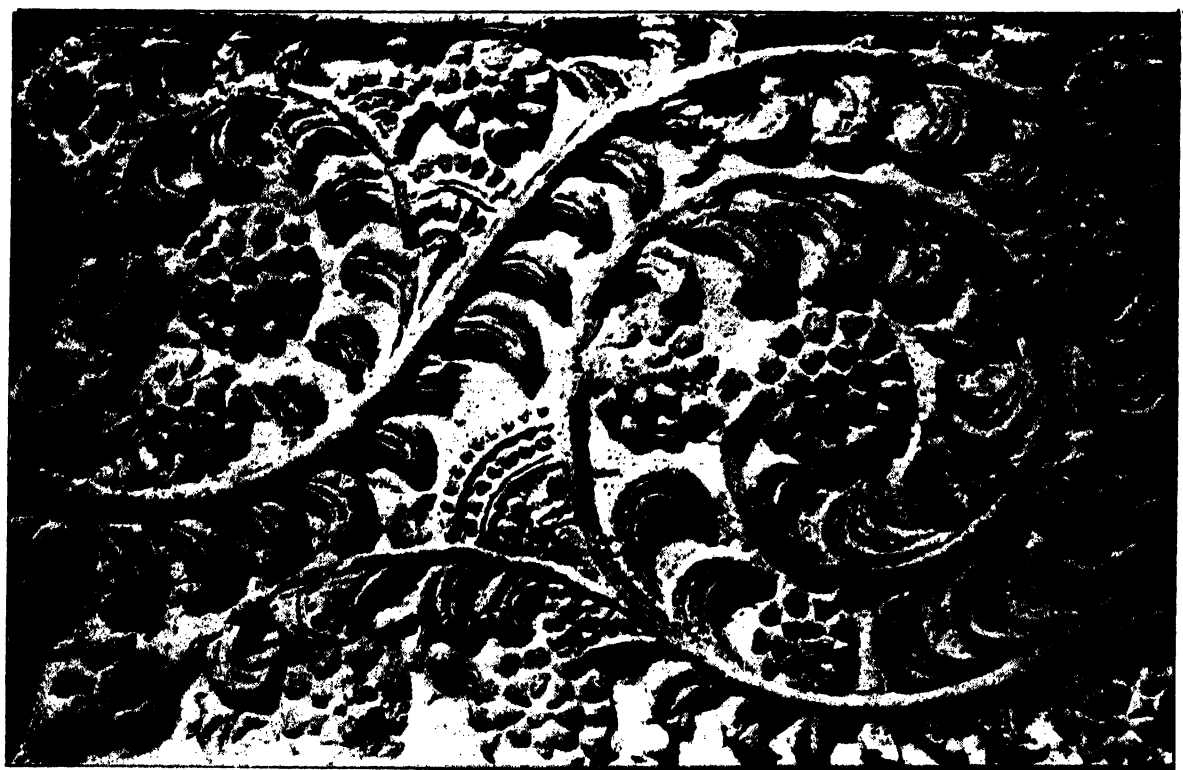
মল্লরাজ পরিবারে রক্ষিত কাঠ খোদাইয়ের নিদর্শন : পোড়ামাটির সজ্জার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়

শ্যাম রায় মন্দিরে পোড়ামাটির ফুলকারি নক্শা : বিষ্ণুপুর

বাঁকুড়া জেলার কাব্যচর্চা

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

জেলায় আদিবাসী কবিতাচর্চারও একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে আছে।
দক্ষিণ বাঁকুড়ায়, বিশেষত খাতড়া-রানীবাঁধ-রাইপুর এলাকায়, এবং
অংশত সিমলাপাল-তালডাংরা-ইন্দপুর এলাকায় সাঁওতালি কাব্য-সংস্কৃতির
প্রভাব লক্ষণীয়। অধুনালুপ্ত সাঁওতালি ভাষার সাহিত্য-পত্রিকা
যথাক্রমে আলহা, জুমিদ দাড়ে, র‍্যালি প্রভৃতির মাধ্যমে
তখন আদিবাসী কবিতার প্রকাশ ঘটেছিল জেলায়।

বাঁকুড়া জেলা কাব্যের ভূমি, কবিতার দেশ। আবহমান পরম্পরায় কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ঐতিহ্য আছে এই মাটির। জেলার জন্ম ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। তার আগে এই ভূমিখণ্ড ছিল জঙ্গল-মহলের অন্তর্গত, তারও আগে মল্লরাজাদের অধীনে। সুতরাং জেলার কাব্যচর্চা সম্পর্কে বলতে গেলে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সীমানাভুক্ত পূর্বতন যেসব ভূখণ্ড, সেই সব এলাকাসমূহের কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। বিশেষত, মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যে উদ্ভব তা পরিলক্ষিত হয়েছিল ময়নাপুর, ছাতনা, পানুয়া, ইন্দাস, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি আরও কিছু এলাকায়, যেসব এলাকা অধুনা বাঁকুড়া জেলার ভূখণ্ডের ভেতরেই।

বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বৌদ্ধ দোঁহার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা পাওয়া যায় বাঁকুড়ার মাটিতেই। পাওয়া যায় ধর্মপূজা-পদ্ধতির পুঁথিও। ধর্মপূজার প্রবর্তক ও ধর্মরাজ-মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন মা-মাটি-মানুষের কবি ময়নাপুরের রামাই পণ্ডিত। তাঁর 'শূন্যপুরাণ' বা ধর্মমঙ্গল কাব্য বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর এই কাব্য রচনার কাল নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। বলা হয়, পাল-বংশের অবসানে, অর্থাৎ দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে তুর্কী আক্রমণের ফলে সেন-বংশ প্রতিষ্ঠাকালে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রায় ক্ষীণ হয়ে পড়ায় বৌদ্ধধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতেই মিশ্র সংস্কৃতির বশবর্তী হয়ে 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেন রামাই পণ্ডিত। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'শূন্যপুরাণ'-এর রচনাকাল একাদশ শতাব্দী। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধির অনুমান, তা ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। আবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যশস্বী অধ্যাপক ডঃ শহীদুল্লাহ্ তার রচনাকাল বলেছেন ১৬০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ। আবার অনেকের মতে 'শূন্যপুরাণ'-এর রচনা চতুর্দশ শতাব্দীর আগে নয় কিছুতেই। সে যা-ই হোক, তথাপি তার উদ্ভব এই বাঁকুড়া থেকেই।

মধ্যযুগীয় কাব্য-সাহিত্যে যাঁর নামটি সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন ছাত্‌নার বড়ু চণ্ডীদাস। সামন্তভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্খ রায়ের পৌত্র, বিখ্যাত নরপতি এবং প্রাচীন বাসলী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উত্তর হামির রায়ের রাজত্বকালে, পঞ্চদশ শতকে, বাসলীর সেবাইত হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হস্তলিখিত যে সকল পুঁথি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথি তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। প্রাচীন হস্তলিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই লিপি ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী নয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধির মতে, পুঁথিটি পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত। পুঁথিটিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শব্দটি কিন্তু লেখা ছিল না কোথাও। কিংবদন্তীর সূত্র ধরে এই কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে পরে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ বেলিয়াতোড়ের বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাংলা ১৩১৬ সালে এই পুঁথিটি উদ্ধার করেন বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামের দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের 'আড়াচ্' থেকে। পরে, ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পুঁথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-ই প্রথম যেখানে বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস-অগ্রজ দেবীদাসের পৌত্র পদ্মলোচন শর্মা কর্তৃক রচিত বাসলীর মাহাত্ম্য বিষয়ক একটি সংস্কৃত ভাষার পুঁথি পাওয়া গেছে ছাতনায়, যার রচনা ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে। তাতে চণ্ডীদাস-সম্পর্কিত কিছু শ্লোকও আছে। এটিও বাঁকুড়ার কাব্যচর্চার একটি অনন্য নিদর্শন।
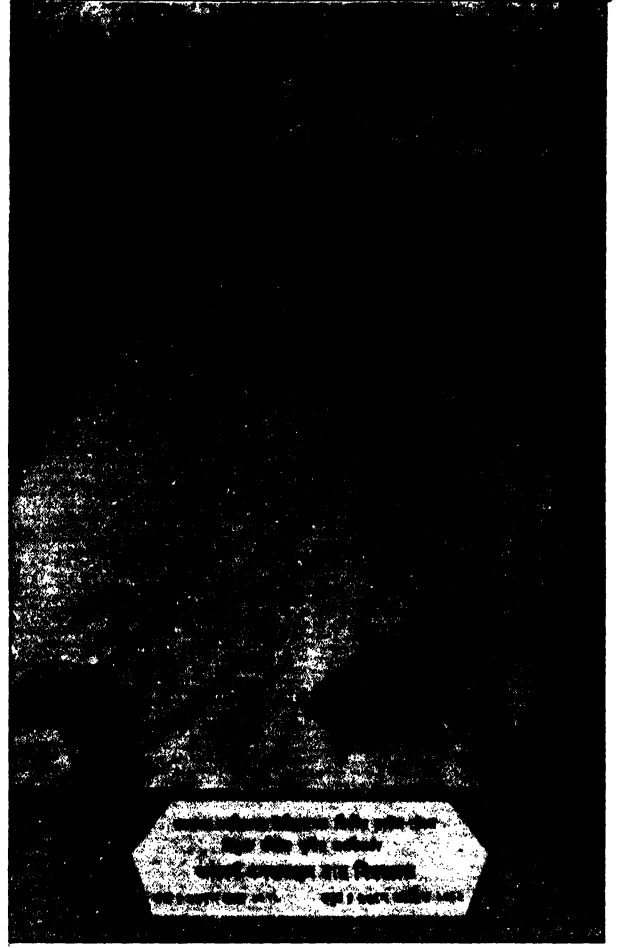
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির আবিষ্কর্তা আচার্য বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

চণ্ডীদাসের উত্তরকালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের মহাপ্রকটের পরে অসংখ্য বৈষ্ণবীয় পদাবলী রচিত হয়। শ্রীজীব গোস্বামীর নির্দেশে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাসঠাকুর, শ্যামানন্দ দাসঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারার্থে বৈষ্ণব গ্রন্থাদি-সহ আগমনকালে মল্লভূমের পথে তাঁদের সমস্ত পুঁথি লুণ্ঠিত হয়। পরে সেগুলি বন-বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। অতঃপর রাজা বীর হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বীর হাম্বির নিজে ছিলেন পদকর্তা। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ভূষিত করেন 'শ্রীচৈতন্য দাস' নামে। মল্লরাজ বিষ্ণুপুরে সেই যুগে যেন বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের জোয়ার বয়ে যায়। সে সময় যে কত কবি বিষ্ণুপুরে পদ ও পুঁথি লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শ্রীনিবাস আচার্য মল্লরাজ বিষ্ণুপুরে সপরিবারে থেকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করে গেছেন। আচার্য শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবীও ছিলেন সুকবি। তাঁর 'মানবী বিলাস' কাব্য বৈষ্ণব সাহিত্যে সবিশেষ
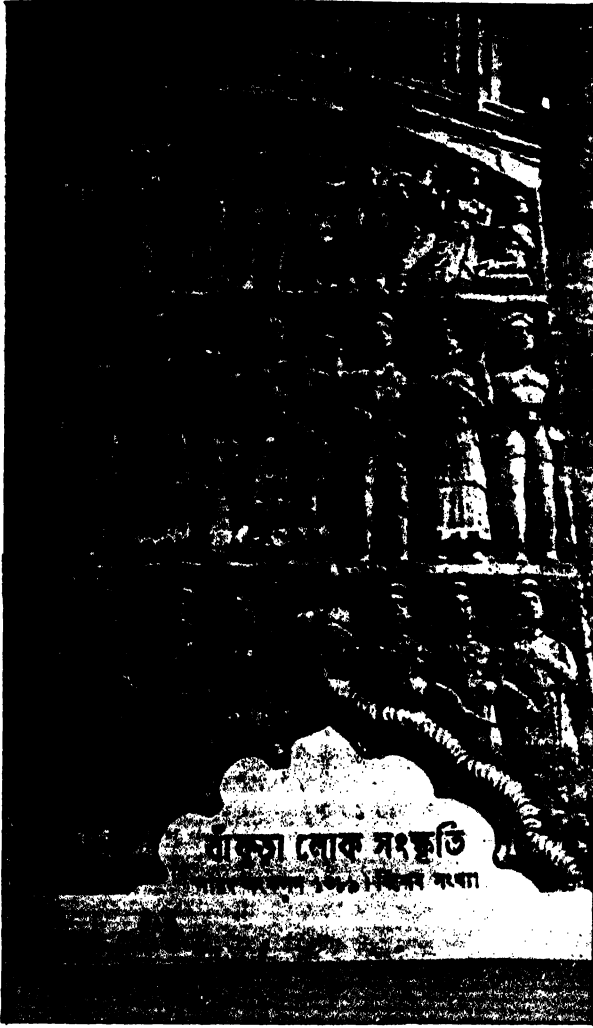
সমাদৃত। হেমলতার প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন দাস কাব্য-সাহিত্যে রেখে গেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান। জন্মসূত্রে বর্ধমানের হলেও তাঁর 'কর্ণানন্দ কাব্য', 'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব কাব্য'-সহ আরও অনেকগুলি অনূদিত কাব্যগ্রন্থ রাজানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। যদুনন্দন দাস ও পদ্মানন্দ দাসের কাব্যে হেমলতার উল্লেখ আছে। গোবিন্দ দাসের 'ললিত বিভাস', নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তি' প্রভৃতি কাব্যগুলি তৎকালীন বাঁকুড়ার কাব্যচর্চায় সফল সংযোজন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের তত্ত্বাবধানে বাংলায় অনূদিত হয়েছিল বহু সংস্কৃত কাব্য, অনুলিখিত হয়েছিল অনেক প্রাচীন পুঁথি ও বৈষ্ণবীয় পদ। অনুবাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : যদুনন্দন দাস (শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত গোবিন্দ লীলামৃত, রূপ গোস্বামী রচিত বিদগ্ধমাধব, লীলাশুকের কর্ণকর্ণামৃত), গোপাল দাস (রায় রামানন্দ রচিত জগন্নাথবল্লভ), ভাগবত দাস (রূপ গোস্বামীর রাগানুগা), নারায়ণ দাস (রঘুনাথ গোস্বামীর মুক্ত চরিত্র), গোপাল পণ্ডিত (জয়দেব রচিত সুরভিমঞ্জরী) প্রমুখ। এই সময়ের আরও যেসব কবি ও পদকর্তাদের নাম অনধিক দুই শতক বর্ষ কাল-বলয়ে পাওয়া যায় তাঁদের কয়েকজন হলেন : জয়কৃষ্ণ দাস, মোহন দাস, রাধাবল্লভ দাস, মথুর দাস, পরমেশ্বর মল্লিক, শ্যাম মল্লিক, মথুরেশ ভট্ট, গৌরমোহন দাস, চৈতন্য সিংহ, শ্যামানন্দ, জগন্নাথ দাস, হরিরাম দাস প্রমুখ। নৃসিংহ দাস (হংসদূত ও উদ্ধব সংবাদ), রামচন্দ্র দাস (সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা ও গুণবর্তিকা), রাজচন্দ্র দাস (উষাহরণ বা অনন্তখণ্ড কাব্য), রাজবল্লভ দাস-সহ আরও অনেক কবির কাব্য বাঁকুড়ার তদানীন্তন কাব্যচর্চা প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সুদীর্ঘ সময়ে বাঁকুড়ার লাল মাটিতে বৈষ্ণবী বা ভাগবতী ধারার যে প্রবাহ বহমান ছিল তা সমগ্র বাংলা কাব্য-সাহিত্যকেই সেই সময় করেছিল প্রভাবিত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঁকুড়া-জাত আর এক সন্তান শঙ্কর কবিচন্দ্র (পানুয়া, বর্তমান কোতুলপুর থানা)। তাঁর মতো অত বেশি কাব্য মধ্যযুগে আর কোনও কবি রচনা করেননি। তাঁর সময়কাল নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামক জনপ্রিয় কাব্যটি তিনি রচনা করেন মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের অনুরোধে। অনেকে বলেন, মল্লরাজ বীর সিংহের রাজত্বকালের (১৬৫৬-১৬৮২) শেষদিকে তাঁর কাব্য-রচনার সূচনা হয় এবং শেষ হয় গোপাল সিংহের আমলে। কবিচন্দ্রের লেখা 'শিবমঙ্গল', 'অনাদিমঙ্গল' ও 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' কাব্যে যথাক্রমে বীর সিংহ, দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ এবং গোপাল সিংহের নাম পাওয়া যায়। অনুমেয় যে, কবিচন্দ্রের জীবৎকাল এই তিন মল্লরাজের রাজত্বকালে বিস্তৃত ছিল এবং তাঁর ওই কাব্যগুলি ওইসব মল্লরাজাদের উৎসাহ ও আনুকূল্যে রচিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন রাজা গোপাল সিংহের সভাকবি (১৭১২-১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ)। শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' উপাধি পান মল্লরাজাদের কাছ থেকেই। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সার সংকলন করে তিনি 'গোবিন্দমঙ্গল' বা 'ভাগবতামৃত' শীর্ষক অনুবাদ কাব্যটিও রচনা করেন। এই কাব্যটি তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টি, যা বৈষ্ণব সমাজে অতি শ্রদ্ধাসহকারে পঠিত হয়। উপরিউক্ত পাঁচটি কাব্যে আছে অনেকগুলি পালা বা আখ্যান। তাঁর নিজের কথাতেই জানা যায়, তাঁর লেখা পালার সংখ্যা ৩৬০। কাব্য-অন্তর্ভুক্ত পালা ছাড়াও তাঁর রচিত কপিলামঙ্গল, জীমূতবাহন উপাখ্যান, মদনমোহন বন্দনা, রাজবল্লবীর বন্দনা প্রভৃতি পালাগুলি অতি বিখ্যাত। তাঁর আরও বহু রচনাই অনাবিষ্কৃত। প্রহ্লাদ চরিত, ধ্রুব চরিত, জড়ভরত, নববিদায়, কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি খণ্ড কাব্যগুলি বিন্যাস-পরম্পরায় পরে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় তাঁর দৌহিত্র বংশধর মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

জেলার মাটিতে রামায়ণ রচনার কৃতিত্বে দ্বিজ রামসুত, সাফল্যরাম, ধনঞ্জয় প্রমুখ কবির নাম উল্লেখ্য। রামচরণ চক্রবর্তীর সাহিত্য-দর্পণের টীকা-সহ কবি জৈমিনি অনুসরণে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচিত হয়েছে তখনকার বাঁকুড়ার মাটিতেই। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় যেমন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভুরাম দাস উল্লেখযোগ্য, তেমনই ধর্মমঙ্গলের কবি হিসেবে উল্লেখনীয় মাণিকরাম গঙ্গোপাধ্যায় (বেলডিহা), সীতারাম দাস (ইন্দাস) প্রমুখ সফল কবিরাও। সীতারাম দাস তো ইন্দাসের পাশাপাশি গ্রামগুলিতে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে-নাচতে মঙ্গল-গান শুনিয়ে বেড়াতেন। এই সময়কালে বিষ্ণুপুর সংগীত-ঘরানার অবদানকেও জেলার কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতায় স্বচ্ছন্দেই যুক্ত করা যায়। বিষ্ণুপুর ধ্রুপদী ঘরানার

জ্যোতিষ্মান ব্যক্তিত্ব অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র তথা ছাত্র রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ'র আগ্রহ ও উৎসাহে রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' গ্রন্থটি। ধ্রুপদী সঙ্গীতের পাশাপাশি কবিগান, যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, লোকসঙ্গীত-সহ ঝুমুর ইত্যাদি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল বিষ্ণুপুর রাজদরবার। নন্দলালের রামায়ণের দল, রামশরণ শর্মার যাত্রার দল, রজনী মাঝি ও কেশবলাল মাঝির তর্জার দল, সরোজিনীর ঝুমুর দল তখনকার দিনে কাব্য-প্রবাহকেও করেছিল সঞ্জীবিত। গাজন, মনসা-মঙ্গল, কীর্তন প্রভৃতির গানও জেলার কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতায় উল্লেখ্য সংযোজন।

জেলার ভৌগোলিক সীমানায় রামায়ণ রচনার ক্ষেত্রে একটি অতি বিখ্যাত নাম জগদ্রাম রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) (ভুলুই গ্রাম, থানা মেজিয়া)। 'দুর্গাপঞ্চরাত্রিকাব্য' বা 'জগদ্রামী রামায়ণ' কবি জগদ্রাম রায় শুরু করলেও ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন তাঁর ছেলে রামপ্রসাদ। তাই ওই রামায়ণ জগদ্রামী-রামপ্রসাদী নামেও পরিচিত। জেলার মাটিতে এই কাব্য-সৃজন বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের বিস্ময়কর সৃষ্টি। বিষ্ণুপুর পুরাকীর্তি সংগ্রহশালায় এই রামায়ণ সংরক্ষিত আছে। অষ্টাদশ শতকে জেলার কাব্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য একটি কাব্য কৃষ্ণপ্রসাদ সেন রচিত 'চণ্ডীদাস-চরিত'। ছাতনার নিকটস্থ লখ্যাশোল গ্রাম থেকে আবিষ্কার করে এটি প্রকাশ করেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। ঐতিহাসিক সত্যাশ্রয়ী এই বৃহৎ কাব্যটিতে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। শুভঙ্কর (ভৃগুরাম দাস)-এর 'আর্যা' বা 'শুভঙ্করের দাঁড়া' গাণিতিক সূত্রাবলী হলেও কাব্যকৃতি অসামান্য, যা জেলার কাব্যচর্চারই নিদর্শনবাহী। বাংলা কাব্য-সাহিত্যেও তা এক অনন্য দলিল। আর্যা-ছন্দের কাব্য-ভণিতায় তিনি শুভঙ্কর রায়, শুভঙ্কর সেন, শুভঙ্কর দাস নামেও অভিহিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে কবির নাম সর্বাগ্রেই মনে আসে তিনি ভরত দাস। তাঁর অসংখ্য পদ-এর মধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক পদের সন্ধান পাওয়া যায়। পদগুলি ১৮৩০-৪০-এর মধ্যে রচিত বলে অনুমান করেন বিশেষজ্ঞরা। এর পরেই নাম পাওয়া যায় সলদা'য় বসবাসকারী কঠোর বৈদান্তিক, অসাধারণ পণ্ডিত ও তার্কিক এবং পদকর্তা পদ্মলোচন (সৃষ্টিধর বটব্যাল)-এর। প্রথম দিকে বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত থাকলেও পরে বিষ্ণুপুর সংলগ্ন সলদা'য় (জন্মস্থান : নারাঙ্গী গ্রাম, পাত্রসায়ের থানা) এসে পদ, গান ও কাব্য রচনা করে গেছেন। তিনি রামায়ণ-গান ছাড়াও দেহতত্ত্ব বিষয়ক ও অন্যান্য গানও লিখেছিলেন অনেক। বিশেষত, তখনকার দিনে বন-বিষ্ণুপুর, সলদা, জয়পুর প্রভৃতি ব্যাপক এলাকায় লোকসংস্কৃতির যে দুর্নিবার সঙ্গীত ও কাব্য-তরঙ্গ উত্থিত হয় তাকে বেশ কিছুটা পুষ্ট করেছিলেন পদ্মলোচনই। পদ্মলোচনের অনেক গানই অন্যের লেখা গান হিসেবে এখন চলে যাচ্ছে বলে জানা যায়। তাঁর লেখা অতি বিখ্যাত গান 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি'—প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী রেকর্ড করেছেন, গীতিকার সেখানে লালন ফকির (দ্রষ্টব্য : লোকসংস্কৃতি ও পদ্মলোচন/ ডাঃ গৌরীপদ দত্ত/শতদল শারদ ১৪০৫/ পৃষ্ঠা নং ২৭)। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রামায়ণ-গান, সহজিয়া আউল-বাউল গানের অন্যতম রচয়িতা পদ্মলোচনের কাব্যকৃতি জেলার সম্পদ হলেও তিনি যে এখন প্রায় বিস্মৃত তা এই সময়ে আর সংশয়ের অবকাশ রাখে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রথম দিকে (১৮৬০-৭০) তিন খণ্ডে সুবৃহৎ ভক্তিমালা গ্রন্থের বঙ্গতর্জমা করেন কবি মোহন পূজারী। এর পরেই জেলায় (জয়রামবাটি) শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে কেন্দ্র করে ব্যাপক কাব্য-জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে কেন্দ্র করে বাংলা-সাহিত্যে যেমন রচিত হয়েছে বহু কীর্তনকাব্য, বাঁকুড়ার শ্রীশ্রীমা'কে কেন্দ্র করেও তেমনই জেলার ভেতরে, এমনকি বাইরেও লিখিত হয়েছে কাব্য, বন্দনা-গান অসংখ্য। জেলারই সন্তান এবং শ্রীশ্রীমা'র অত্যন্ত স্নেহভাজন অক্ষয়কুমার সেন রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' এই নিরিখে অতি উল্লেখযোগ্য এবং অমর সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই সেই কাব্যে এসে গেছেন। জেলার অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য শ্রীশ্রীমা-শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রিক স্তোত্রও রচনা করেছেন। জয়রামবাটি সংলগ্ন সাতবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং সারদামনির অতি প্রিয়পাত্র লালু জেলে (লালমোহন দাস) তাঁর লেখা গান গেয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। স্বামী তেজসানন্দ সংকলিত 'প্রার্থনা ও সংগীত' গ্রন্থটি এখানে উল্লেখ্য হতে পারে। হতে পারে

রত্নেশ্বর ভট্ট'র 'শুভঙ্কর' পুঁথির পাতা, বিষ্ণুপুর

> **জেলার মাটিতে রামায়ণ রচনার কৃতিত্বে দ্বিজ রামসুত, সাফল্যরাম, ধনঞ্জয় প্রমুখ কবির নাম উল্লেখ্য। রামচরণ চক্রবর্তীর সাহিত্য-দর্পণের টীকা-সহ কবি জৈমিনি অনুসরণে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচিত হয়েছে তখনকার বাঁকুড়ার মাটিতেই। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় যেমন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভুরাম দাস উল্লেখযোগ্য, তেমনই ধর্মমঙ্গলের কবি হিসেবে উল্লেখনীয় মাণিকরাম গঙ্গোপাধ্যায় (বেলডিহা), সীতারাম দাস (ইন্দাস) প্রমুখ সফল কবিরাও।**

মণীন্দ্রকুমার সরকারের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালি' কাব্যগ্রন্থটিও। জেলার তৎকালীন কাব্য-সাহিত্যে শ্রীশ্রীমা'র প্রভাব অপরিহার্য ছিল, তা পরবর্তীকালে হয়েছে সুদূরপ্রসারী। কালানুক্রমে আমরা পেয়ে থাকি দেশাত্মবোধক গান, ভক্তিমূলক গান এবং সংগ্রামী-সংগীতও। জেলার (বাঁকুড়া) জন্মের অব্যবহিত আগে এবং পরে এ ধারাটির বহমানতা জেলার ভূসীমানার কাব্যচর্চার পরম্পরার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। টুসু-ভাদু গান, ঝাঁপান্ ও ঘাঁত গান, বিভিন্ন উৎসব ও লোকাচার-আশ্রিত গান কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতাকে পুষ্ট করেছে অনেকখানি।

বাঁকুড়া জেলার জন্মের পরে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই জেলার যে কবির নাম বলতে হয়, তিনি হলেন সত্যকিঙ্কর সাহানা। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হয়। 'কলিকা', 'যূথিকা', 'মালিকা', 'আর্য্যাশতক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলিত হয়েছিল। এর পরেই কবি হিসেবে আবির্ভূত হন গোপাললাল দে। বস্তুত, তখনকার দিনে এমন কোনও বিশিষ্ট পত্রিকা ছিল না যাতে বাঁকুড়ার পল্লীকবি গোপাললাল দের কবিতা প্রকাশিত হয়নি। যথার্থই তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ, নিরালার কবি! সে সময়ের বাঁকুড়ায় তাঁর কবিতা ছিল অন্য অনেকের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। সমসাময়িক বিখ্যাত কবিদের থেকে তাঁর কবিতা আদৌ কোনও অংশে দুর্বল ছিল না। নন্দনতত্ত্বের মানদণ্ডে তাঁর কবিতা ছিল অনেক বেশি গভীর ও মূল্যবান। তিনি কবিতা লিখেছেন সুদীর্ঘ দিন, তথাপি তাঁর কোনও কাব্যগ্রন্থ সম্ভবত তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি। এই সময়কালেই বাঁকুড়ায় 'উষা' এবং 'পারিজাত' নামে দুটি হস্তলিখিত পত্রিকার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। আবির্ভূত হয় 'বাঁকুড়া-দর্পণ', 'অভিযান', 'যুগদীপ' প্রভৃতি সাহিত্য ও সংবাদনির্ভর পত্রিকা এবং 'কল্পনা', 'জাগরণ' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা। এগুলিতে সে সময়ের বাঁকুড়ার কবিদের কবিতা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই এই সব পত্রিকা ঘিরে কাব্যচর্চার এক বাতাবরণও তৈরি হয়েছে। এ সবই বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের মধ্যের ঘটনা। এই সময়ে জেলার আরও যে দুজন বিশিষ্ট কবির আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁরা হলেন মাণিকলাল সিংহ এবং বারীন্দ্রকুমার বিশ্বাস। 'মহুয়া' ছদ্মনামধারী মাণিকলাল সিংহের কবিতার বই 'দীপশিখা', 'শালফুল' যেমন জেলার কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, তেমনই উল্লেখযোগ্য বারীন্দ্রকুমার বিশ্বাসের 'আধুনিকা' কাব্যগ্রন্থটিও। অন্য দিকে সমগ্র উত্তর বাঁকুড়ায় তখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তিলুড়ির গোরাপাগল (বাবুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) রচিত ঝুমুর, ভক্তিগীতি এবং শাক্তসংগীত। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেও গীতকাব্যচর্চার ক্ষেত্রে গোরাপাগল প্রবহমান ধারাটিকেই বেগবতী করার চেষ্টা করে গেছিলেন। পরে তাঁর শিষ্য ও ভক্তরা তাঁর গানের একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। প্রায় সমকালীন কবি বেণু গঙ্গোপাধ্যায় ও বৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত। প্রবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, নবকল্লোল-সহ বিশিষ্ট বহু পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে বহু কবিতা ও ছড়া লিখেছেন বেণু গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ বলতে 'পান্থ পাদপ' ও 'সোহাগ সিন্ধু' এবং ছড়ার বই 'তিতি পায়রা'। বৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্তও লিখেছেন বহু কবিতা ও গান। তাঁর বহু রচনাই অপ্রকাশিত, তবু তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই 'রজনীগন্ধা' এবং গানের বই 'বুকের বাণী' পেয়েছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ প্রশংসা।

১৯৪০-৬০ এই সময়টি জেলার কাব্যসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সেই সময়েই প্রায় একই সঙ্গেই বহু কবির আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রকাশিত হতে থাকে ফাল্গুনী, ইংগিত, উষা প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিকাও। জেলায় যে কাব্য-শিহরণ অনুভূত হয় তাকে উদ্দীপিত করতে কবিকুলকেও উৎসাহিত করে সমকালীন পত্রিকাগুলি। এই সময়কালে যাঁরা কবিতা লিখে জেলার কাব্য-জগৎকে আলোড়িত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ দে, শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, বলাই সরকার, সুখময় চট্টোপাধ্যায়, প্রভাকর মাঝি, অশোকানন্দ বসু, মীরা ভট্টাচার্য, অনিল কর্মকার, অপূর্বকুমার বসু, রাণু গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীকুমার মল্লিক, রানী দেবী, তারাপ্রসাদ শিকদার, ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, মমতা চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ ঘোষ, মহাদেব রায়, সুধাংশু হালদার, বোধেন্দু বিশ্বাস, ননী রায়, অমলা দেবী, সুধাংশু চৌধুরী, নবগোপাল সিংহ, মহাদেব হালদার, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বসু, হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, উমা দেবী, রামশশী কর্মকার, অনিল কর্মকার, ক্ষিতিমোহন সেন, সরোজিনী দেবী, দীপক চৌধুরী, শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ রাহা, বাসুদেব কর্মকার, সুবোধ চৌধুরী, সৌরীন বরাট, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ঘোষ, সুদর্শন সিংহ প্রমুখ আরও অনেক কবি। শহরাঞ্চলে তেমনভাবে তাঁরা সাংগঠনিকভাবে একত্রিত হতে না পারলেও গ্রামাঞ্চলে কাব্যচর্চার ধারায় নেতৃস্থানীয়

ভূমিকা ছিল বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তি দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্যামাপদ চৌধুরী, রামশঙ্কর চৌধুরী, করুণা সেন, ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের। তাঁদের এই সাংগঠনিক কাব্য-ভাবনা পরবর্তীকালে জেলার কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল অনেকখানি। সেই সময়েই শ্যামাপদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় যেমন তিলুড়িতে গড়ে উঠেছিল 'পল্লী-লেখক শিল্পী সংঘ' (১৯৫৩), তেমনই বিষ্ণুপুরেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'কবিতীর্থ' কবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক চেষ্টায়। অবনীকুমার মল্লিক সম্পাদিত 'পদধ্বনি' এবং লীলাময় মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-পত্রিকা 'পূর্বসূরী' জেলার কবিদের কবিতাচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালনে ব্রতী ছিল। এই সময়েই বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি সাড়া জাগানো কবিতা 'জবাব চাই' জনমানসকে করেছিল উদ্বেলিত। তখন থেকেই আমৃত্যু তিনি ছিলেন কবিতা-অন্তঃপ্রাণ। চারণকবি বৈদ্যনাথই জেলার একমাত্র কবি যিনি কবিতার জন্যেই চাকরি ছেড়ে ছিলেন, জেল খেটেছিলেন কবিতা লেখার অপরাধে। প্রতিবাদী কবি হিসেবে তিনি শুধু জেলাতেই নয়, সারা বাংলা-সাহিত্যেই খ্যাতিমান ছিলেন। নারায়ণ চৌধুরী তাঁকে সুকান্ত, নজরুল প্রমুখ প্রতিবাদী কবিদের সমগোত্র বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষেও তিনিই ছিলেন বাঁকুড়ার প্রতিনিধিস্থানীয় সফলতম কবি। তাঁর সম্পাদিত 'খড়্গ' কবিতা-পত্রিকায় তিনি জেলার নবীন-প্রবীণ প্রায় সমস্ত কবিকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে যথাযোগ্য স্থান দিয়ে গেছেন। ১৯৫২-৫৭ সময়ের বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের অংশীদার চারণ কবি বৈদ্যনাথ সে সময় লিখেছিলেন অসংখ্য পোস্টার কবিতা। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলা ও সভা-সমিতিতে সে সময় গেয়েছেন তর্জা ও কবিগান। আয়োজন করেছেন বহু কবিতা-মেলা ও কবি-সম্মেলনের। বহু পত্রিকার আমৃত্যু লেখক ও অনেক কাব্যগ্রন্থের জনক চারণকবি বৈদ্যনাথের কবিতা-কীর্তি জেলার অমূল্য সম্পদ। জেলার ধারাবাহিক কবিতাচর্চায় তাঁর অবদান সংশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

চারণকবি বৈদ্যনাথ

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (চারণকবি) কাব্যগ্রন্থ

বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের মধ্যে জেলায় আরও অনেক কবির কবিতা সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, জেলার ভেতরে এবং বাইরেও। তাঁরা অনেকেই অবশ্য বিগত দশকেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মুক্তি দাশগুপ্ত, করুণা সেন চারের দশক থেকে তখনও বিরাজমান, তেমনই বিরাজমান চারণকবি বৈদ্যনাথ। অশ্বিনী কর, অদ্বৈত কুণ্ডু, রমাপ্রসাদ পাত্রকর্মকার, ভাগবত রায়, অবনী নাগ, ভক্তিবিনোদ পাল, সাধন সেনগুপ্ত, শংকর দাস, লীলাময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেক কবির কবিতা তখন প্রকাশিত হচ্ছে জেলার তৎকালীন বহু পত্রিকায়। এর মধ্যে ১৯৬৬-তে মুক্তি দাশগুপ্ত, করুণা সেন প্রমুখের উদ্যোগে গঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ লেখক সমবায় সংস্থা, তাঁদের সঙ্গে আরও দু-একজন যুক্ত হয়ে তাঁদের যৌথ সম্পাদনায় তিলুড়ি থেকেই প্রকাশিত হল কবিতা সংকলন 'শতাব্দী শেষের কবিতা'র প্রথম খণ্ড (জুলাই ১৯৬৬)। ইতিহাসের দলিল এই কাব্য সংকলনে প্রবীণদের পাশাপাশি দেখা গেল রবি গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার সরকার প্রমুখ নবীন কবিকেও। এই সময়ের জেলার কাব্যধারায় সক্রিয়ভাবে সংপৃক্ত হতে থাকলেন শান্তি সিংহ, শান্তি রায়, হরিদাস আচার্য, নন্দ চৌধুরী, মোহন সিংহ, সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গা চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, মৃদুল মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, মিহির চৌধুরীকামিল্যা, অরুণ বরাট, শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ দে, অজিতকুমার সু, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অশোকতরু সরকার, ননীবালা দে, রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চট্টোপাধ্যায়, অমিয়গোপাল কর্মকার, অজিতকুমার পাত্র, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ কয়াল, কান্তি হাজরা, উৎপল মুখোপাধ্যায়, সমীর কর্মকার, রঞ্জিত চক্রবর্তী, রাজকল্যাণ চেল, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেক কবি। কালানুক্রমে সবার উল্লেখ যথাযথ না হলেও কেউ আগে কেউ পরে লেখা শুরু করেছেন সম্ভবত ছয়ের দশকেই। এঁদের অনেকেই সেই সময় বা তার পরে পত্রিকাও সম্পাদনা করে জেলার কাব্য-প্রয়াসকে চরিতার্থ করতে ব্রতী হয়েছেন। তথাপি পরবর্তীকালে এঁদের সকলেই যে সমানভাবে এগিয়ে যেতে পেরেছেন এমনও নয়। কর্মসূত্রে জেলায় এসে কাব্যধারায় তখনই সামিল হয়ে গেছেন রূপাই সামন্ত, শ্রীমুখী, উৎপল চক্রবর্তী, আরতি পাল প্রমুখ আরও অনেকেই। এরই মধ্যে তিলুড়িতে ফের গঠিত হল 'যাত্রিক কবি গোষ্ঠী' (১৯৬৮) এবং

১৯৪০-৬০ এই সময়টি জেলার কাব্যসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সেই সময়েই প্রায় একই সঙ্গেই বহু কবির আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রকাশিত হতে থাকে ফাল্গুনী, ইংগিত, উষা প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিকাও। জেলায় যে কাব্য-শিহরণ অনুভূত হয় তাকে উদ্দীপিত করতে কবিকুলকেও উৎসাহিত করে সমকালীন পত্রিকাগুলি।

সেখান থেকে করুণা সেন, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সূর্য-প্রণাম' কবিতা সংকলন।

ষষ্ঠ দশকে 'পারাবত' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে জেলায় যে ধারায় কাব্য-প্রবাহ বহমান ছিল, তা সম্ভবত আগে আর দেখা যায়নি। কর্মসূত্রে বাঁকুড়া শহরে এসে কবি আনন্দ বাগচী প্রকাশ শুরু করেন 'পারাবত' পত্রিকার, অবনী নাগ ও বিবেকজ্যোতি মৈত্রকে সঙ্গে নিয়ে। সমকালীন কবিদের অনেকেই যুক্ত হয়ে এই পত্রিকার মাধ্যমে কাব্য-সৃজনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। উক্ত তিনজন যৌথভাবে 'ত্রিশ্চিক' ছদ্মনামে প্রকাশ করতেন 'বৃশ্চিক' পত্রিকাটি। এই পত্রিকায় রম্য-কবিতা ও শ্লেষাত্মক ছড়াও সে সময় প্রকাশিত হয়েছিল অনেক কবি এবং ছড়াকারের। সেই সময়ের পত্রিকা 'প্রান্তিকা', 'পথের সংগ্রহ' প্রভৃতি জেলার কবিতাচর্চার ধারাবাহিকতাকে ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিল সর্বতোভাবেই। জেলা-শহরের বাইরে বিষ্ণুপুর তখন যেমন কবিতার শস্যভূমি ছিল, তেমনই উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছিল জেলার সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নতশীল গ্রামাঞ্চলেও। হাড়মাসড়া, গঙ্গাজলঘাঁটি, পাত্রসায়ের, রামসাগর, ওন্দা, কোতুলপুর, খাতড়া প্রভৃতি এলাকায় পত্রিকা প্রকাশ, কাব্য-সাংগঠনিক উদ্যোগ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে কবিতার একটি স্থায়ী ক্ষেত্র তখন থেকেই যেন প্রস্তুত হচ্ছিল। এই সময়েই ওই দশকের উল্লেখিত কয়েকজন কবির কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়, জেলার পরিধি অতিক্রম করে কেউ কেউ সারা বাংলায় পরিচিতি অর্জনেও সক্ষম হন, কারও কারও কবিতা 'দেশ', 'অমৃত'-সহ বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিতও হতে থাকে।

ছয়ের দশকের কৃতকাম কবিরা সাতের দশকে আরও উজ্জ্বল হলেন। তবে সবাই নয়। এঁদের সঙ্গে এই দশকে সবেগে এসে হাজির হলেন আরও বহু কবি। প্রবীণদের অভিভাবকত্বে যেমন অনেকে শুরু করলেন কাব্যচর্চা, তেমনই আবার তাঁদের তোয়াক্কা না করেই কবিতার রাজ্যে স্বমহিমায় বিরাজমান হতে চাইলেন অনেকে। ফলে এই দশকে জেলার কবিতাচর্চায় দেখা দিল দুর্নিবার উদ্দীপনা যা তার আগে, এমনকি পরেও জেলায় আর লক্ষিত হয়নি। এই সময়ই প্রকাশিত হল 'অবান্তর' কবিতা-পত্রিকা। রূপাই সামন্ত, রবি গঙ্গোপাধ্যায়, নেপাল কর, হরিদাস আচার্য প্রমুখ আরও কয়েকজনের সম্মিলিত ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত 'অবান্তর'কে কেন্দ্র করে জেলার কবিদের সে সময়ের আবেগ ও উদ্দীপনা লক্ষ করার মতো। পরবর্তীকালে 'অবান্তর' ভেঙে (সম্পাদক রূপাই সামন্ত) নতুন আর একটি কবিতার পত্রিকা জন্ম নিল 'নিষাদ' নামে (সম্পাদক রবি গঙ্গোপাধ্যায়, পরে অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়)। 'নিষাদ' পত্রিকায় কবিতা দেখা গেল সে সময় বাঁকুড়ায় অবস্থানকারী আনন্দ বাগচী এবং সুধেন্দু মল্লিকের। এর ঠিক পরে-পরেই কয়েকটি কবিতা-পত্রিকা প্রায় পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করে। 'লুব্ধক' এবং 'স্পন্দন' কবিতা-পত্রিকা দুটি প্রায় একই সঙ্গে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই দশকে জেলায় প্রকাশিত যেসব পত্রিকা কবিতা প্রকাশে সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিল তার মধ্যে ভেলা (ছাতনা), সাম্পান (গঙ্গাজলঘাঁটি), কলস্বাস (বেলবনী), ত্রিবেণী (রামহরিপুর), অনামিকা (তামলিবাঁধ), সোপান (বিষ্ণুপুর), লোকমাতা (রাজগ্রাম), আকাশলীনা (মেজিয়া), বিংশ শতক (বিষ্ণুপুর) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব পত্রিকার সম্পাদকগণ যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনই এই সব পত্রিকাকে আশ্রয় করে উঠে এসেছেন আরও অনেক কবি। শুভ্র সোম (তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেন মুখোপাধ্যায়, হীরেন পাল, সুভাষ মণ্ডল প্রমুখ কবিদের এই দশকেই আত্মপ্রকাশ ঘটল স্ব-সম্পাদিত যথাক্রমে ধ্রুব, সিসৃক্ষা, দিব্য, অপাংক্তেয় প্রভৃতি পত্রিকা সঙ্গে নিয়েই। নীহার সিংহ, গৌরীশঙ্কর গাঙ্গুলী, সত্যসাধন চেল, মোফিদ আলম, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, সুব্রত হোড়, সুব্রত চেল, শিবরাম পণ্ডা, দিলীপ পাত্র, রণবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন মহাপাত্র, বিজয় দাস, শ্যামল চক্রবর্তী, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, দুর্গা দত্ত, অপূর্ব সাঁট, অরূপ রক্ষিত, মুরলী দে, আশিসকুমার রায়, দুর্গা শর্মা, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ কুণ্ডু, তুষার ঘোষাল, তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই নাগ, সমীর ধর, জীবন গোস্বামী, তরুণ চক্রবর্তী, পার্থ গোস্বামী, সোমনাথ বরাট, অসীম মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দপ্রকাশ মহান্তি, বিশ্বজিৎ পাত্র, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল পাল, অশোক মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দরিপা, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র নন্দী, রাজারাম খাঁড়া, প্রদীপ দাস, ত্রিলোচন ভট্টাচার্য, শচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়, পল্লবকান্তি রাজগুরু, কল্লোল সেনগুপ্ত, শাশ্বতী সেন, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ সিংহ, কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়কুমার দাঁ, ভাস্কর সিংহ, হেমাদিত্য রায়চৌধুরী, চন্দন চৌধুরী, বিশ্বনাথ কুণ্ডু, অমিত রায়, মেঘ মুখোপাধ্যায়, সতু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত রক্ষিত প্রমুখ আরও অগণিত কবির আবির্ভাব ঘটল সাতের দশকেরই বিভিন্ন সময়ে। এঁদের কেউ কেউ অবশ্য তারও আগেই কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট হয়েছেন কেউ কেউ, অনেকেই আবার হারিয়েও গেছেন কিছুদিন পরে। সাতের দশকে সারা জেলার প্রায় সর্বত্রই যে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়

সেগুলিতেও আরও বহু কবির কবিতা প্রকাশিত হতে দেখা গেছিল, তাঁরা অজ্ঞাতনামা হলেও জেলার কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানও একদম উপেক্ষণীয় নয়। এ সময়ে জেলায় অবস্থানকারী চারজন বি ডি ও যথাক্রমে নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (ইন্দপুর), অমলেন্দু ভট্টাচার্য (গঙ্গাজলঘাঁটি), প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (ওন্দা), শ্যামল মুখোপাধ্যায় (তালডাংরা) কবিতা লিখেছেন জেলার বিভিন্ন পত্রিকায়। প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বাতীদের এ আকাশ' কাব্যগ্রন্থটি এ সময়েই বেরিয়েছিল লুব্ধক প্রকাশনী থেকে। লুব্ধক প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছিল 'আকাশবাণী'র গীতিকার সাধন সেনগুপ্তর গানের বইও। আবার সাধন সেনগুপ্তই তাঁর সম্পাদিত 'চরৈবেতি' পত্রিকায় জেলার পুরনো দিনের কবিদের নির্বাচিত কবিতার পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। সঞ্জয় গুপ্তের 'ঝুমুর অঞ্জলি' প্রকাশিত হয় এই দশকেই। সুকান্তি রায় এ সময়ই আবির্ভূত হন গান রচনার মাধ্যমে। 'অভিব্যক্তি'র প্রাণপুরুষ উৎপল চক্রবর্তীর আগ্রহ ও উৎসাহে বহু কবি সে সময় উদ্দীপিত হয়েছেন। জেলার কাব্যচর্চা তাঁর সহযোগিতায় জেলার বাইরেও অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে। সাতের দশকে নিয়মিত কবিদের আড্ডা বসেছে বড়জোড়া, মেজিয়া, শালতোড়া, তিলুড়ি, ছাতনা, রামসাগর, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, তালডাংরা, হাড়মাসড়া, অমরকানন, ইন্দপুর, খাতড়া প্রভৃতি স্থানে এবং বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলেও। জেলা-শহরে বিশিষ্ট কবিদের বাসভবনেও বসেছে স্বরচিত কবিতা-পাঠের আসর ও পঠিত কবিতার ওপরে আলোচনা-সভা। 'পুষ্পাঞ্জলি সাময়িকী'র সম্পাদক অমরনাথ দে, প্রবন্ধকার-গবেষক শৈলেন দাস, সাহিত্যিক দুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কবিতা না লিখলেও এ সময় নতুন কবিদের উৎসাহিত করেছেন নানাভাবে। 'কবীর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ নিয়মিত কবিতার আড্ডায় যোগ দিয়েছেন প্রবীণ কবি অবনীকুমার মল্লিক, ছড়াকার শংকর দাস ; সঙ্গে থেকেছেন অমিয়কুমার সেনগুপ্ত ও অমরনাথ দে ; এসেছেন সাধন সেনগুপ্ত, সুকান্তি রায়, গৌরীশঙ্কর গাঙ্গুলী থেকে শুরু করে প্রায় সবাই। সার্বিক, কাঁড়বাঁশ, চালচিত্র, জুঁই, পদক্ষেপ, শুধু কবিতার জন্য, যামিনী, পত্রপল্লব, নীলাভাস, মেঘরোদ্দুর, উন্মেষ, ঋক্-সাম-যজু-অথর্ব, কয়ন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, কবির চিঠি, প্রতিভাস, শিলাবতী, বকুল, রাঢ় পরিবেশ, সপ্তদ্বীপা প্রভৃতি আরও অনেক পত্রিকায় মূলত জেলারই প্রবীণ-নবীন সবাই কবিতা লেখার সুযোগ পেয়ে এসেছিলেন ওই সময়। ঈশ্বর ত্রিপাঠীর 'ইউলিসিস' বা 'সক্রেটিস' জেলারই কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক পত্রিকা হলেও জেলার কবিদের সঙ্গে বিশিষ্টদের কবিতা ও কাব্য আলোচনা প্রকাশিত হত। অন্য দিকে, প্রবীণ কবি বেণু গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীমুলী যুক্ত হয়ে প্রকাশ শুরু করেছিলেন 'পল্লীপল্লব' পত্রিকাটি, যার আয়ু দীর্ঘতর না হলেও জেলার কবিদের সাময়িকভাবে প্রকাশক্ষেত্র হতে পেরেছিল। অমিয়কুমার সেনগুপ্ত/শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মুক্ত কবিতার মুখ' কবিতা-সংকলন (১৯৭৪) এই সময়েরই জেলার কাব্য-চর্চার একটি অতি পরিচ্ছন্ন নিদর্শন। সাতের দশকে মেডিক্যাল ছাত্রদের দুটি পত্রিকা 'শালপাতা' (তৃপ্তেন্দু হোতা) ও 'জ্বালা' (দেবব্রত ঘোষাল) জেলার সমসাময়িক কাব্যধারায় নিজেদের সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। সুবো আচার্য তাঁর সম্পাদিত 'টেরাকোটা' পত্রিকার মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন জেলার কাব্য-চর্চাকে আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে। অমিয়কুমার সেনগুপ্ত/শুভ্র সোম সম্পাদিত কবিতা-পত্র 'বাঁকুড়া-সাম্প্রতিক' বাঁকুড়ার কবিতা-চর্চায় খানিকটা গতি সঞ্চার করতে পারলেও তা আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। এই সময়েই অতি কিশোর কবি জয়ন্ত সাহা কবিতা লিখে সবাইকে যেমন বিস্ময়ান্বিত করে দিয়েছিলেন, তেমনই তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'কস্তুরী'ও সকলের কাছেই প্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। রূপাই সামন্তর সম্পাদনায় এ সময় বেরুল ফুলের কবিতা-সংকলন 'আমি ফুল ভালোবাসি' এবং পরবর্তীকালে নারী-বিষয়ক কবিতা-সংকলন 'কবিতায় নারী'। সেই সময়কালীন জেলার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ নির্বাচিত কবিদের অভিজ্ঞানসহ কবিতা-সংকলন 'সাম্প্রতিক বাঁকুড়ায়' প্রকাশিত হল কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠীর সম্পাদনায় (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ)। এই সংকলন প্রকাশের পরে জেলার কবিরা যেন দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে পেলেন। জেলার তৎকালীন পরিচিত এবং অজ্ঞাত বহু কবির নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেই সময়বৃত্তেই। এই দশকের শেষের দিকেই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে সর্বপ্রথম আর্থিক অনুদান পান রবি গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিয়কুমার সেনগুপ্ত। বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ আনুপূর্বিক সাহিত্য-

সাহিত্যিক সত্যকিঙ্কর সাহানা (পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত ছবি)

চর্চার সাক্ষী হলেও এই সংস্থার কাব্য-প্রেম লক্ষিত হল 'বাংলা আমার বাংলাদেশ' শীর্ষক মনোরম কবিতা-সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

সাতের দশকে আত্মপ্রকাশকারী অনেক কবিই আটের দশকে উজ্জ্বলতর হলেন। এই দশকের গোড়াতেই বাঁকুড়া-বিষয়ক কবিতা-সংকলন 'বাঁকুড়া, আমার বাঁকুড়া' (১৯৮০), 'অভিব্যক্তি' থেকে প্রকাশিত হল 'যামিনী' পত্রিকার সম্পাদক তথা সাতের দশকের প্রতিশ্রুতিময় কবি আশিসকুমার রায়ের সম্পাদনায়। এই দশকের কালবৃন্তে যে সব কবির অভ্যুদয় ঘটল তাঁদের কয়েকজন হলেন : আলোক চন্দ্র, শ্যামাশঙ্কর রায়, গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর চক্রবর্তী, অভিজিৎ চৌধুরী, অশোক মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, দেবদাস রায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীল কোলে, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বস্তুত, সাতের দশকে জেলায় কবিদের সংখ্যার দিক থেকে যে আধিক্য তা এই দশকে তেমনভাবে পরিলক্ষিত হল না। অনেক কবিই এই দশকে কবিতা-চর্চায় হাত দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে মনোনিবেশের অভাবে বা প্রকাশের অন্তরায় হেতু শেষমেশ আড়ালেই থেকে গেছেন। তথাপি যাঁরা সৃজনশীল ছিলেন তাঁদের সকলের অবদান জেলার কবিতার ক্ষেত্রকে উর্বরই করেছে। স্বমহিমায় যেমন বিগত ছয় দশকের বিশিষ্ট কবিরা থেকেছেন, তেমনই সমান সক্রিয় থেকেছেন সাতের দশকেরও কিছু কবি। এই দশকেই জেলা-শহরে ভূমিষ্ঠ হয় 'খেয়ালী' পত্রিকা, যা কবিতা-প্রকাশকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে বরাবর। তিলবাড়ি সহ বিষ্ণুপুর এলাকার কিছু পত্রিকাও কবিতার প্রতি দেখিয়েছিল নিঃশর্ত আনুগত্য। এই দশকেরই সাহিত্য পত্রিকা 'চিন্তা-ভাবনা' যা জেলার কাব্য-চর্চায় সবিশেষ উৎসাহ দেখিয়ে এসেছে। ছোট-বড় সব কবিদের কবিতাই সম্মানের সঙ্গে প্রকাশে আগ্রহী হয়েছে 'চিন্তা-ভাবনা'। জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মন্টু দাস যে ছদ্মনামে একজন সফল কবি তা অনেকের কাছেই অজানা। অবশ্য স্বনামেও তাঁর কবিতা মূলত আটের দশক থেকেই জেলার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তাঁর সম্পাদনায় 'রাঙা মাটির ঢেউ' (১৯৮৫) যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই প্রকাশিত হয়েছে 'বাঁকুড়ার কবি ও কবিতা' (১৯৮৭)। দুটি কবিতা-সংকলনেই মুখ্যত বাঁকুড়ার আপামর কবিদের কবিতাকেই প্রকাশের অগ্রাধিকার দিয়েছেন তিনি। রামকিঙ্করের প্রয়াণের পরে রামকিঙ্করকে নিবেদিত কবিতা-সংকলন 'কবিতায় রামকিঙ্কর' প্রকাশেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখনীয়। কবিতা-চর্চার সহযোগিতায় এই দশকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রিকাগুলির অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

সম্ভবত আটের দশকেই এঁদের অনেকের অভিষেক হয়েছিল। তবু নয়ের দশকে একঝাঁক তরুণ কবিতার জগতে এলেন, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। স্বরাজ মিত্র, প্রদীপ কর, অংশুমান কর, স্বরূপ চন্দ, কৌশিক রাজারী, দীপঙ্কর রায়, ভূদেব কর, গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়ন রায়, অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, প্রলয় মুখোপাধ্যায়, শৈলেন চক্রবর্তী, দীপেন ঢাং, প্রদীপ হালদার, সুমিতকুমার মণ্ডল, রাধাগোবিন্দ কর্মকার, পার্থসারথি রায়, সুব্রত পণ্ডিত, আলোক মণ্ডল, অনিন্দ্য রায়, রামকৃষ্ণ মাজী, প্রভাস পাত্র, সন্দীপ দাস, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, তপন চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপদ কর্মকার, সুমন চট্টোপাধ্যায়, জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার ঘোষ, সঞ্জীপ দরিপা, বিশ্বমঙ্গল গোস্বামী, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ পাল, স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়, তৃষা পাত্র, অসীমকুমার পাত্র, উজ্জ্বল পাঁজা, কান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেক নতুন মুখ দেখা গেল। এই দশকেই কবিতার জগতে দেখা গেল সুপ্রিয়া মল্লিক, পাপিয়া চট্টোপাধ্যায় এবং জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়কেও। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রাতিষ্ঠানিক কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমশ সার্বিক পরিচিতির আলোয় আসছেন। স্বরাজ মিত্র, প্রদীপ কর, অংশুমান কর এই সময়ের জেলার সফলতম কবি। প্রদীপ বা অংশুমান তাঁদের সম্পাদিত কবিতাপত্রগুলির মাধ্যমে কবিতার একটা বাতাবরণ তৈরি করতেও সক্ষম হয়েছেন। এ কালের পত্রিকা 'রামকিঙ্কর' বা 'স্বপ্নাদেশ'ও তেমন চিন্তনে ক্রিয়াশীল। নগর এবং গ্রামকেন্দ্রিক কাব্যচর্চার প্রচ্ছন্ন বিভাজন জেলায় সম্ভবত এই দশকেই অনুভূত হয়। লিটল ম্যাগাজিনের সীমিত পরিধি ভেঙে আগুয়ান হওয়ার প্রয়াসও বোধ হয় এই দশকেই জেলায় চরিতার্থ করার অনুচিন্তন লালিত হয়। বাঁকুড়া-জাত, বর্তমানে কলকাতাবাসী কবি প্রভাত চৌধুরী জেলার নয়ের দশকের কবিদের কবিতা-চর্চার ক্ষেত্রে অনেকখানি উৎসাহ জুগিয়েছেন। 'কবিতা-পাক্ষিক' থেকে কবিতার বইও বেরিয়েছে একাধিক কবির। জেলার মাটিতেই কাব্য-ভাবনাকে কিছুটা মূর্তি দিয়েছেন রাজকল্যাণ চেলও। তাঁদের কবিতা-পত্র 'কবিতা-দশদিনে' তেমনই একটি কাগজ, তথা সংস্থা। 'কবিতা-দশদিনে'র পক্ষ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে জেলারই কয়েকজন কবির কবিতার বই। 'অভিযোজন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তার সম্পাদক রামকৃষ্ণ মাজী গঙ্গাজলঘাটি এলাকায় কবিতার একটি আবহমণ্ডল প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। 'দীপ্তি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অনুরূপ একটি ক্ষেত্র দুর্লভপুর এলাকায় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন ত্রিলোচন ভট্টাচার্য ও দীপেন ঢাং। আর, অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী কবিতার সাম্রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যে কবি, সেই চারণকবি বৈদ্যনাথ এই দশকেও সবাইকেই তাঁর 'খড়্গ' পত্রিকায় একান্নবর্তী পরিবার করে রেখে গেলেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। 'ধামসা-মাদল' (পূর্বতন 'মাদল') সাত-আট দশকের পত্রিকা হলেও নয়ের দশকেও তার প্রভাব অপরিম্লান। এই পত্রিকার পক্ষ থেকেই পত্রিকা-সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য চারণকবি বৈদ্যনাথের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশ করেছিলেন 'বৈদ্যনাথের পদ্য'। নতুন কবিদের সৃজনশীলতাকে স্বীকৃতি দিতে প্রবীণদের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় নবাগতদের কবিতা-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কার্তিক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সারদা' (ইদানীং 'পুনশ্চ সারদা') পত্রিকাটির ভূমিকা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বাঁকুড়া শাখার উদ্যোগে জেলার কাব্য-চর্চাকে মদত দিতে নেওয়া হয়েছে বিবিধ উদ্যোগ। গৌতম দে মূলত গল্পকার হলেও জেলার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কবিতাও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতার বই 'চাকার বন্দনা' প্রকাশিত হয়েছে বিশে শতাব্দীর শেষতম বাঁকুড়া জেলা বইমেলায়। সলদা থেকে প্রকাশিত 'শতদল' পত্রিকার মাধ্যমে যথারীতি কবিতার ক্ষেত্র মজবুত করার চেষ্টা করেছেন শিবদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রদীপ কর প্রকাশ করেছেন 'টেরাকোটা শহরের কবিতা' শীর্ষক অনবদ্য সংকলন। 'আজকের কণ্ঠস্বর', 'এই মুহূর্ত', 'মাটির গন্ধ' প্রভৃতি আরও অনেকগুলি পত্রিকা

জেলায় কবিতা-প্রকাশে সবিশেষ সচেষ্ট হয়েছিল এই দশকেই। এই দশকেই জেলার বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখলেন প্রায় অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ নানা ধরনের প্রবন্ধ ও গল্পের লেখক দুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। চারণকবি বৈদ্যনাথ তাঁর বিষ্ণুপুর-আবাসে প্রতি বছরই আয়োজন করতেন কবিতা উৎসবের। জেলার এবং বাইরের কবিদের সমাবেশে সেখানে চলত কবিতা-পাঠ ও আলোচনা। ত্রিবেণী, দীপ্তি, শতদল, মনিকৌস্তভ, ধামসা-মাদল, রাঢ় বাংলা সংবাদ, সাহিত্য বিতান প্রভৃতি পত্রিকার পক্ষেও কবি-সম্মেলন, কবি-সংবর্ধনা, কবিতা-মেলা তথা কবিতা-পাঠের আয়োজন করা হয়েছে এই দশকেই। বহু কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছে এই দশকের বিভিন্ন সময়ে। বিংশ শতাব্দীর প্রস্থানকালীন মুহূর্তে বিগত চার দশকের অনেক কবিই সক্রিয় ছিলেন। দশক-অনুযায়ী তাঁদের কাল-নির্ণয় করলেও তাঁরা এই শতাব্দীর শেষের জেলার কবি। বিশিষ্টতার মানদণ্ডে বিচার না করেও কালানুক্রমে তাঁদের কয়েকজনের নাম করা যায় : করুণা সেন, অবনী নাগ, রবি গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তি সিংহ, শান্তি রায়, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, মোহন সিংহ, শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর চক্রবর্তী, গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র নন্দী, প্রদীপ কর, অংশুমান কর, স্বরাজ মিত্র। তেলেণ্ডা (মেজিয়া)-র কবি দুর্গাদাস সরকারের যেমন বাঁকুড়ার কাব্য ক্ষেত্রে তেমন কিছু সংযুক্তি ছিল না, তেমনই ছিল না কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়েরও। বাঁকুড়া-জাত এ কালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি দিব্যেন্দু পালিতের ক্ষেত্রেও তাই। বিশিষ্ট ছড়াকার এবং জেলার চল্লিশ-পঞ্চাশের কবি প্রভাকর মাঝি এখন আর জেলায় থাকেন না। প্রখ্যাত ছড়াকার বিমলকুমার ঘোষ (মৌমাছি)-এর জেলার কাব্য-চর্চায় কতটা যোগাযোগ ছিল জানা যায় না। কবিতা না লিখলেও জেলার কবিতা-চর্চাকে এখনও উৎসাহী করে থাকেন বাঁকুড়া-জাত এ কালের সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু। প্রভাত চৌধুরীর কথা আগেই বলা হয়েছে।

কবিতার ক্ষেত্রে সব মিলে অগণনীয় নাম এসে গেলেও ছড়ার ক্ষেত্রে তেমন বিশেষ নাম আসে না। যাঁরা কবিতা লিখে থাকেন তাঁদেরই অনেকে কালেভদ্রে লিখে থাকেন ছড়া। শুধু ছড়ার পত্রিকাও খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি জেলায়। বাঁকি থেকে শিশির ঘোষালের সম্পাদনায় ছোটদের একটি কাগজ 'জোনাকি' একদা প্রকাশিত হয়েছিল। সঘন চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্ষুদে পাখি'কেও দেখা গেছিল খাতড়া থেকে। নবগৌর সিংহ ছড়া লিখতেন, লিখতেন বেণু গঙ্গোপাধ্যায়ও। প্রবীণ ছড়াকার শঙ্কর দাশ এখনও জেলার কাগজে, এমনকী বিশিষ্ট বহু ছোটদের পত্রিকায় অক্লান্তভাবে নানা ধরনের ছড়া লিখে যাচ্ছেন। তাঁর ছড়ার বইও প্রকাশিত হয়েছে একাধিক, আলোচিতও হয়েছে বিভিন্ন কাগজে। নতুনদের মধ্যে যাঁর ছড়া বহু পত্রিকায় চোখে পড়ে তিনি হলেন স্নেহাংশুশেখর মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়। তাঁরও ছড়ার বই আছে। সংগীত রচনার ঐতিহ্যবাহী ধারাবাহিকতায় এই সময়ের সংযোজন লীলাময় মাধব, সুভাষ চক্রবর্তী, সঞ্জয় গুপ্ত, তপনকুমার দে, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, ধর্মদাস দত্ত ও আরও অনেকে। লোকগানের ধারায় আছেন বহু অজ্ঞাত কবি যাঁদের অবদান অবশ্যই স্বীকৃতিযোগ্য।

আঞ্চলিক বাংলা উপভাষায় লেখা কবিতার ইতিহাস জেলায় ধারাবাহিকতা-আশ্রয়ী নয়। তথাপি বিগত কয়েক দশকে আঞ্চলিক কবিতা-রচনার জেলার একটি বিশেষ স্থান আছে। কিরীটীভূষণ পাৎসা জেলায় আঞ্চলিক কবিতার পথিকৃৎ হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকেন। তাঁর আঞ্চলিক কবিতার গ্রন্থ 'ফাগুন' অতি বিখ্যাত, আপামর জনমানসে সাড়া জাগাতে পারঙ্গম। এই কাব্যগ্রন্থটি অতি সম্প্রতি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে জেলার 'রাঢ় আকাদেমি'র ব্যবস্থাপনায়। কিরীটীভূষণ পাৎসার পরবর্তীকালের আঞ্চলিক কবি কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণদুলাল বাঁকুড়ার আঞ্চলিক কবিতাকে প্রায়-বিশ্বের দরবারে পৌছে দিতে পেরেছেন। সারা দেশে, এমনকী বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে, বিদেশে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরেও বিভিন্ন স্থানে বাঁকুড়ার আঞ্চলিক কবিতা পরিবেষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি। কিরীটীভূষণ বা কৃষ্ণদুলাল শুধুমাত্র আঞ্চলিক কবিতা লিখেই বিখ্যাত। তবে অজ্ঞাতনামা আরও
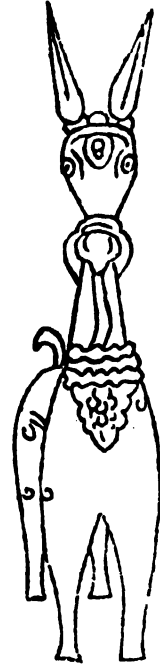
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ

অনেকেই আছেন জেলায়, যাঁদের আঞ্চলিক কবিতাও মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে জেলার কাগজগুলিতে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ও আঞ্চলিক কবিতা লিখেছেন, আঞ্চলিক কবিতার তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থও আছে। অনেকেই আছেন যাঁরা আঞ্চলিক কবিতা লেখেন শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে পাঠ করার জন্যই, পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নয়। বিকাশ চক্রবর্তী তেমনই একজন কবি। তারাশঙ্কর চক্রবর্তী মূলত ছান্দসিক কবি হলেও আঞ্চলিক কবিতা লিখেও সুনাম পেয়েছেন। তাঁর 'তিল্‌কা টুড়ুর কাঁড় বাঁশ-ট'সহ একাধিক আঞ্চলিক কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে। বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, কানাইলাল খাঁ, শান্তি সিংহ, ধর্মদাস দত্ত প্রমুখ সফল কবিদের লেখা আঞ্চলিক কবিতাও পাঠককুল পেয়ে থাকেন বিভিন্ন পত্রিকায়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যাঁরা আঞ্চলিক কবিতা লিখেছেন, তাঁদের কবিতা নিয়ে বাঁকুড়ার আঞ্চলিক কবিতার একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করার কথা ভাবছেন 'আর্য' পত্রিকার সম্পাদক মধুসূদন দরিপা।

জেলায় আদিবাসী কবিতা-চর্চারও একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে আছে। দক্ষিণ বাঁকুড়ায়, বিশেষত খাতড়া-রানিবাঁধ-রাইপুর এলাকায়, এবং অংশত সিমলাপাল-তালডাংরা-ইন্দপুর এলাকায় সাঁওতালি কাব্য-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। অধুনালুপ্ত সাঁওতালি ভাষার সাহিত্য-পত্রিকা যথাক্রমে আল্‌হা, জুমিদ দাড়ে, র‍্যালি প্রভৃতির মাধ্যমে তখন আদিবাসী কবিতার প্রকাশ ঘটেছিল জেলায়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে জেলায় প্রকাশিত হচ্ছে আর একটি পত্রিকা 'সনেগড়' কেন্দুয়াডিহি (বাঁকুড়া) থেকে প্রদীপ সরেন-এর সম্পাদনায়। সমকালীন আদিবাসী কবিদের কবিতাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। আদিবাসী সাহিত্যের জেলার বিশিষ্ট কবি রাজকাটা (রানিবাঁধ)-র যশঃ সাঁওতাল (জলেশ্বর সরেন) এবং মোশলেহা (খাতড়া)-র গুহিরাম হেমব্রম। আদিবাসী সাহিত্যের এ যাবৎ দীর্ঘায়ু পত্রিকা 'লাহান্তি'ই বর্তমানে জেলার বিশিষ্ট কাগজ। গুরুড়বাসা, বারকোনা (শালতোড়া থানা) থেকে স্বপনকুমার পরামাণিকের সম্পাদনায় ১৯৮৯ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে 'লাহান্তি'। এই আদিবাসী পত্রিকাটি সাঁওতালি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সাঁওতালি কবিতাও নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। জেলার প্রতিশ্রুতিবান আদিবাসী কবিরা এই পত্রিকায় কবিতা লেখার সুযোগ পেয়ে থাকেন। জেলার আদিবাসী কবিতা-চর্চার ক্ষেত্রে 'লাহান্তি'র অবদান অপরিসীম। ২২ এপ্রিল ২০০০-এ 'লাহান্তি'র দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও স্বরচিত কবিতা-পাঠের আসর ছিল আদিবাসী কবিদের। আদিবাসী সমাজের উৎসবকেন্দ্রিক গানগুলিও তাঁদের কাব্যপ্রীতির সাক্ষ্যই বহন করে। শালতোড়া থানায় শ্যামাচরণ হাঁসদা (উদয়পুর), সনৎ মুর্মু (শিয়াকুলডোবা) প্রমুখের কবিতা জেলার বাইরে অন্যত্রও প্রকাশিত হয়েছে। কাজলী সরেনের কাব্যগ্রন্থ 'চাচো ডিডি' প্রকাশিত হয়েছিল সাতের দশকে।

বিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাঁকুড়া জেলার কাব্য-চর্চায় আমূল কোনও পরিবর্তন সাধিত না হলেও বিগত শতাব্দীর শেষ চার দশকের কবিদের কাব্য-প্রয়াস অব্যাহত আছে। শুরু হয়েছে নানা ভাবনা-চিন্তা। বাঁকুড়া-বিষয়ক কবিতার একটি অনবদ্য সংকলন 'রুক্ষ মাটির বক্ষে মা তোর' প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। দশক-বিভাজন নির্বিশেষে জেলার কিছু বিশিষ্ট কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের একটি তালিকা সংযুক্ত করতে পারলে বোধহয় ভাল হত। পাছে তাতে তেমন কেউ বাদ পড়ে যান এই আশংকায় তা থেকে বিরত থাকা হল। সত্তরের কবি শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার সরকার, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক কবির তো এ যাবৎ কোনও কাব্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয়নি। আবার, চল্লিশের অতি বিশিষ্ট কবি মুক্তি দাশগুপ্তর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল গত শতাব্দীর শেষ দশকের শেষে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মুক্তি দাশগুপ্তর যৌথ কাব্যগ্রন্থ 'দুই দিগন্ত' বেরিয়েছিল সেই সাতের দশকেই। অনারূপভাবে শান্তি রায় ও শিবদাস চট্টোপাধ্যায়ের যৌথ কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল সম্ভবত সেই সময়ের সামান্য আগে। দুই, তিন, এমনকী চারজন কবির সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আরও অনেক নজির এই জেলায় আছে। জেলার অন্যতম প্রবীণ কবি করুণা সেনের একটি কাব্যগ্রন্থ বেরুল বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ সীমানায়। অথচ কাব্য-চর্চার অনুশীলনপর্বেই বহু তরুণ কবির চটজলদি বেরিয়ে গেল অনেক কবিতার বই। একবিংশ শতাব্দীতে জেলার কাব্য-চর্চায় নতুন মুখ এক্ষুণি দেখা বা বোঝা সম্ভব নয়। তবে সেই সাতের দশক থেকে জেলার বহু কবিতা-পত্রিকার মুদ্রক নয়ন ধর ইদানীং বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখে কবি হিসেবে সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এককালের সাংগঠনিক-কবি শ্যামাপদ চৌধুরীকে এই বয়সেও দেখা যাচ্ছে কবিতায়। দেখা যাচ্ছে লীলাময় মুখোপাধ্যায়কেও। প্রখ্যাত চিকিৎসক সুধীন সেনগুপ্তর কবিতাও দেখা যায় জেলার কাগজে। দেখা যাচ্ছে দুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্টু দাসের কবিতাও। গৌতম দে এখন কবিতা লিখছেন অনেক কাগজে। কবিতা লিখছেন অচিন্ত্য জানাও। কবিতা লেখার পাশাপাশি সাংগঠনিক উদ্যোগও চালু আছে এই জেলায়। রাঢ় আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে আঞ্চলিক কবিতার বই 'ধড়স্যা মাঝির মড়স্যা কথা' (ধর্মদাস দত্ত), বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি থেকে বেরিয়েছে 'তুষের আগুন' (কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি। গ্রামাঞ্চলে 'শিল্পীগোষ্ঠী' (শালুনি, ঝাঁটিপাহাড়ি) প্রভৃতি সংস্থা সক্রিয় কাব্য-চর্চার সাংগঠনিক দৃষ্টান্ত। জেলায় নবজাত কয়েকটি পত্রিকায় কাব্যসাধনার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'সাহিত্য-বিতান' পত্রিকার উদ্যোগে নিয়মিত মাসিক সাহিত্য-সভায় কবিদের স্বরচিত কবিতা-পাঠ এই মুহূর্তেও অব্যাহত আছে। এ সবই জেলায় কাব্য-চর্চার ধারাবাহিকতাকে অম্লান রেখেছে এখনও। তথাপি কাব্য-ভাবনার যেমন সংহতি দরকার, তেমন আবশ্যক কবিদের সৃজনশীলতাকে প্রসারিত করার সম্মিলিত উদ্যোগ। একবিংশ শতাব্দীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বাঁকুড়াবাসী হিসেবে সেই বর্ণোজ্জ্বল দিনের অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।

লেখক : সরকারি চিকিৎসক। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক
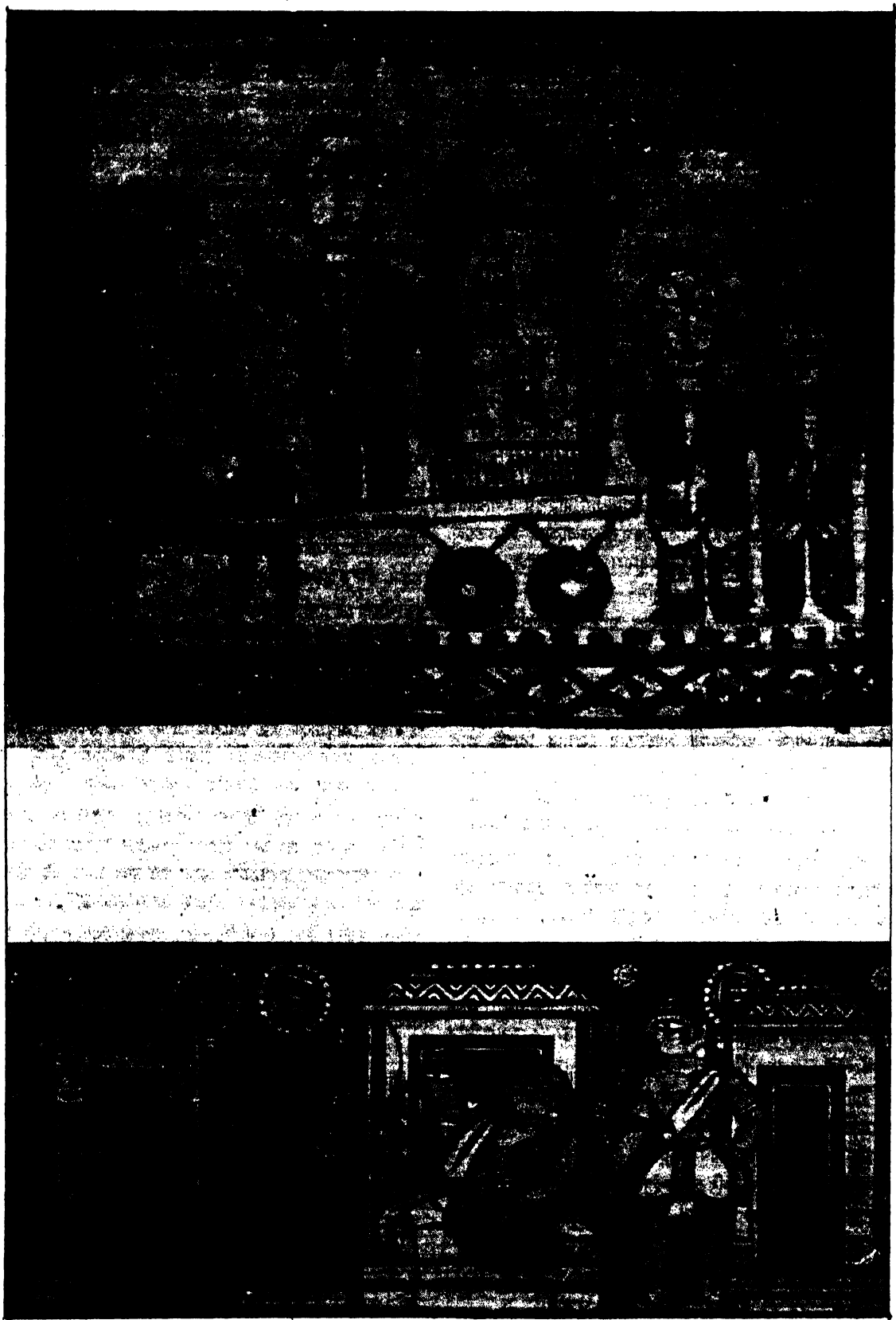
শিল্পী—যামিনী রায়

বাঁকুড়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী ধারা

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

১৯৪২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলা অংশগ্রহণ করে এবং প্রচুর কর্মী কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরেই 'লাঙল যার জমি তার' এবং মজুরির দাবিতে পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, ওন্দা থানায় কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর পুলিশি নির্যাতন চরমে উঠে। ১৯৪৯ সালে বিষ্ণুপুর থানার বাঁধগাবায় দুজন মহিলা সহ ৬ জন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যে তুমুল গণ-জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশি গানের ডালি নিয়ে যে আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন—তার প্রভাব বাংলাদেশের সব প্রান্তেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর বাঁকুড়া জেলাতেও সেই স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছিল। অবশ্য কলকাতার মতো গণ-জাগরণ এখানে সৃষ্টি হয়নি—কিন্তু তরুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের একটা অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, স্বদেশি বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে তখনও সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না—পরবর্তীকালে এই দুটি ধারা পৃথক হয়ে পড়ে। বিপ্লবী সংগ্রামের কর্মীরা তখনও স্বদেশি মঞ্চে একত্রে কাজ করতেন। বিপ্লবী ধারাটি ক্রমে সুস্পষ্ট হয় প্রধানত বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে—ইংরেজ পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে।

বাঁকুড়ায় প্রধানত তিনটি বিপ্লবীদের কেন্দ্র ছিল, যার পরিচয় আমরা বিভিন্ন রচনায় পাই। প্রথমটি বাঁকুড়া শহরে কালীতলায় বিশিষ্ট আইনজীবী হরিহর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। এই ত্রিতল বিশাল বাড়িটির বর্তমান নাম 'বৈপ্লবিক বাড়ি'—কালীতলা বালিকা বিদ্যালয়টির পিছনে অবস্থিত। রামদাস পালোয়ান (চক্রবর্তী) নামে খ্যাত একজন দেশপ্রেমিক ব্যায়ামবীরের একটি 'আখড়া' হরিহরবাবুর আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে সেখানে সযত্নে লালিত হত। বাংলাদেশের অনেক বিশিষ্ট বিপ্লবীর ছিল সেটি গোপন আস্তানা। উক্ত বৈপ্লবিক বাড়ির অনেক তরুণ বিপ্লবী সংগঠনে ও পরে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। শহরের অনেক তরুণ এটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রামদাস ও এই তরুণেরা পুলিশের হাতে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। রামদাস আবার সংযুক্ত ছিলেন অম্বিকানগরের পত্তনিদার রাইচরণ ধবলদেবের সঙ্গে। মানুষ ভালোবেসে তাঁকে 'রাজা' বলে ডাকত। বিপ্লবের জন্য অস্ত্র নির্মাণ ও বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ ছিল তাঁর কাজ। এই কাজে আর্থিকভাবে তিনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজ গোয়েন্দা অফিসার টেগার্ট সাহেব এই আস্তানার সন্ধান পেয়ে একবার বর্ষাকালে পুলিশবাহিনী নিয়ে কুমারী ও কাঁসাই নদীর সঙ্গমস্থলের অপর পারে উপস্থিত হন। পানু রজক নামে এক ব্যক্তি তখন জীবন তুচ্ছ করে ও সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে রাইচরণকে সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলা ও কিছু নদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে টেগার্টের অভিযান ব্যর্থ হয়। রাইচরণ ও রামদাসের সঙ্গে রানীবাঁধ থানার দুর্গম ছেঁদাপাথর অঞ্চলে মেদিনীপুর ও কলকাতার বিপ্লবীদের যে গোপন আস্তানা ছিল তার যোগাযোগ ছিল। রামদাস তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং শারীর শিক্ষার তালিম দিতেন বলেও শোনা যায়। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গেও রামদাস এবং রাইচরণের দেখা-সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ ছিল। এইসব বিপ্লবী তরুণদের অনেকেই পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলায় সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেন।

সেই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ধর্ম জড়িত ছিল। গান্ধীজি যেমন রামায়ণের রামচন্দ্র অনুরাগী ছিলেন এবং নিয়মিত প্রার্থনা ইত্যাদি করতেন, তেমনই বাংলাদেশের কি বিপ্লবী কর্মী, কি জাতীয়তাবাদী অহিংস আন্দোলনের কর্মী, প্রায় সকলেই স্বামীজি এবং রামকৃষ্ণ মঠের উপাসক ছিলেন। গীতাপাঠও ছিল প্রায় সকলেরই নিত্য অভ্যাস। অমরনাথ এবং বাঁকুড়ার আরও কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী সাক্ষাৎ সারদা মায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পঞ্চবিধ বর্জনের মধ্যে শিক্ষা বর্জনের অংশটুকু প্রথমে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু নাগপুর. কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজির মর্মস্পর্শী আবেদনে অভিভূত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত কর্মসূচিই তিনি মেনে নেন। দেশবন্ধু নিজে আদালত বর্জন করেন ও তাঁর আন্তরিক আবেদনে সাড়া দিয়ে ছাত্ররা দলে দলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট করেন—ফলে সাময়িকভাবে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত বাঁকুড়ায় অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা পর্ব একটু বিশদে আলোচনা প্রয়োজন।

একজন হিন্দুস্থানি সন্ন্যাসী এই সময় বাঁকুড়া ধর্মশালাতে এসে কয়েকদিন থাকেন। তিনি তদানীন্তন মাড়োয়ারি সমাজের অন্যতম প্রধান হরিকিষণ রাঠি, লৌহ ব্যবসায়ী গোপীনাথ দত্ত ও গোলক দত্ত এবং যুগল মল্লিক প্রমুখ ব্যবসায়ীদের সাহায্যে দোতলায় একটি জনসভার আয়োজন করেন। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সভায় বিশাল জনসমাগম হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের অধ্যাপক অনিলবরণ রায়। সন্ন্যাসীর তেজোদৃপ্ত হিন্দি বক্তৃতা সভাপতি বাংলায় সুন্দরভাবে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পরের দিন ছাত্রদের বৃহত্তর সমাবেশ করা হবে। সন্ন্যাসী নিজেই ছাত্রদের সমবেত করার দায়িত্ব নেন।

পরের দিন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আগত একজন অসহযোগী ছাত্র খ্রিস্টান কলেজ হলে সভা করেন। উক্ত ছাত্রসভায় কলেজের অধ্যাপক শ্রীকান্ত কর্মকার ও অনিলবরণ রায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় কলেজ বর্জনের ও স্কুলগুলিতে প্রচারের দায়িত্ব কলেজের ছাত্ররা গ্রহণ করেন। পরদিন দোতলার বিরাট ছাত্রসভায় স্কুল-কলেজ ও আদালত বর্জন এবং একটি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যবসায়ী গোপীনাথ দত্ত তাঁর দত্তবাঁধের পাড়ের কারখানা ঘরটি জাতীয় বিদ্যালয়গৃহ হিসাবে

ব্যবহারের অনুমতি দেন। এইভাবে বিদ্যালয়গৃহের সমস্যার সমাধান এবং ছাত্রদের ইংরেজের গোলামখানা বর্জনের আন্দোলন শুরু হল। সভায় যোগদানকারী আইনজীবীরা পরদিন কাছারিতে নিজেদের বিশ্রাম কক্ষে সভা করে আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সভায় অহীন্দ্রনাথ ঘোষ, কানাইলাল দে, নবকুমার সেন, গুণময় দত্ত, গোলোকবিহারী দত্ত, রাজেন্দ্র গোস্বামী, বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি বিশ্বাস, গোবিন্দ মহন্ত প্রমুখ আইনজীবীরা অস্থায়িভাবে আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই অসহযোগী আইনজীবীরাই জাতীয় বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিলেন। শহরের ব্যবসায়ীরা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ধর্মঘটের পরদিনই খ্রিস্টান কলেজ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ১৫ দিনের জন্য কলেজ ও ছাত্রাবাসগুলি বন্ধ করে দেন। আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্ররা আশ্রয়চ্যুত হয়ে এবং অনেকে বাড়ি ফিরতে সঙ্কোচবোধ করায় অসহায়ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তাদের মনোবল রক্ষা করা ও নেতৃত্ব দেবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক রায় তখন নিজেও কলেজের অধ্যাপনার পদে ইস্তফা দেন এবং মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী হরিকিষণ রাঠি মহাশয়ের সাহায্যে নূতনগঞ্জে একটি বড় দোতলা বাড়ি অসহযোগী ছাত্রদের বাস করার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করেন। শহরের ব্যবসায়ীরা আন্দোলনকারী ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

হরিকিষণ রাঠি মহাশয়কে সভাপতি, অধ্যাপক অনিলবরণ রায়কে সম্পাদক, আদালত বর্জনকারী আইনজীবী ও শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি অস্থায়ী জেলা কংগ্রেস কার্য-নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। ৩/৪ মাসের মধ্যেই জেলার প্রতিটি থানা ও বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলিতে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। সারা ভারত কংগ্রেস নেতৃত্ব ওই বছরের মধ্যে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে ৩৮,০০০ টাকা ও ৩৮,০০০ কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহের দায়িত্ব জেলার উপর দেন, কিন্তু ৩/৪ মাসের মধ্যে ৫০,০০০ হাজারেরও বেশি সদস্য সংগৃহীত হয় এবং প্রত্যেক থানা থেকে একজন সদস্য নিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক জেলা কংগ্রেস কমিটি স্থায়িভাবে গঠিত হয় (১৯২২)। এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে গঙ্গাজলঘাটি থানার গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ ও ভাদুলের মণীন্দ্রভূষণ সিংহ। বিশিষ্ট আইনজীবী অহিভূষণ ঘোষ, যিনি ১৯০৪/১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পূর্বে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন—তিনিও এই স্থায়ী কমিটিতে নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক অনিলবরণ রায় ও অহিভূষণ ঘোষ প্রচারের উদ্দেশ্যে এরপর বিষ্ণুপুরে যান, সেখানে আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও চকবাজারে একটি জনসভা করেন। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভূপতি সরকার, হেমচন্দ্র দে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মণ্ডল প্রমুখ কয়েকজন আইনজীবী সাময়িকভাবে আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের আহ্বান জানানো হয়। বিষ্ণুপুরে রামনলিনী চক্রবর্তীকে সভাপতি ও রাধাগোবিন্দ রায়কে সম্পাদক মনোনীত করে একটি অস্থায়ী কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী শিবরাম রাঠি মিশনডাঙ্গার কাছে একটি ছোট পুকুর সহ প্রায় তিন বিঘা জমি এবং সেখানে

গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব (হিন্দু) থাকলেও অস্পৃশ্যতার বিষয়ে গান্ধীজি ছিলেন আপসহীন—এ তথ্য আমরা সকলেই জানি। ১৯২৪ সালেই হরিজন পাঠাগারের সংলগ্ন মাঠে সাড়ম্বরে সার্বজনীন সরস্বতী পূজার আয়োজন হয় এবং হাঁড়ি, বাউরি, মুচি, মেথর প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য ও জল-অচল জাতিনির্বিশেষে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একত্রে পুষ্পাঞ্জলি দেবার কথা ঘোষণা করা হয়।

অবস্থিত কাঁচা ঘরবাড়ি জাতীয় বিদ্যালয়গৃহের জন্য দান করেন। এখানেই বিবেকানন্দের নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করে বিদ্যালয়টির দায়িত্ব রাধাগোবিন্দবাবুর উপর দেওয়া হয়। এইভাবে বিষ্ণুপুরে কাজও শুরু হয়।

কিছু আগে বা পরে এই সময় ইংলন্ডের যুবরাজ বা ক্রাউন প্রিন্স অষ্টম এডোয়ার্ড ভারত ভ্রমণে আসেন। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে তাঁর সংবর্ধনাকে অত্যন্ত সফলভাবে বয়কট করা হয় এবং ১৭ নভেম্বর, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র ভারতে হরতাল পালিত হয়। যুবরাজকে বয়কট করে সর্বত্র কালো পতাকা দেখিয়ে 'ফিরে যাও' ধ্বনি দেবার সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুযায়ী বাঁকুড়ায় ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সচ্চিদানন্দ, মন্মথ ও চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ৩০ জনের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল কলকাতা যান, কিন্তু হাওড়া স্টেশনেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন এবং বিচারের প্রহসনে ৩ সপ্তাহের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কলকাতার আলিপুর ও প্রেসিডেন্সি জেল তখন সত্যাগ্রহীদের ভিড়ে স্থানাভাব—অতএব খিদিরপুর ডকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে তৈরি অস্থায়ী জেলে তাঁদের রাখা হয়। পরে এই উপলক্ষে বাঁকুড়া থেকে আগত ২১ জনের আর একটি দলকেও ২ সপ্তাহের জন্য ওই অস্থায়ী জেলেই আটক রাখা হয়েছিল। যুবরাজ কলকাতা ত্যাগ করার পর সকলকেই মুক্তি দেওয়া হয়। এই দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বিক্ষোভ আন্দোলনের ব্যাপকতা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, অসহযোগ আন্দোলনের চারটি পর্যায় ছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রধানত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। ছাত্ররা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আইনজীবীরা অনেকেই আদালত বর্জন করেন। মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জনের মতো বিখ্যাত আইনজীবীরাও তাঁদের

পেশা পরিত্যাগ করেন। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিলিতি দ্রব্য বয়কট এবং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং ছাত্র-যুবকরা পুলিশের লাঠি ও প্রহারকে উপেক্ষা করে বিলিতি কাপড়ের দোকানে অহিংসভাবে পিকেটিং আরম্ভ করে। 'ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-মহিলা, হিন্দু-মুসলমান, রক্ষণশীল-উদারপন্থীরা সকলেই এই আন্দোলনে শামিল হন।' (বিপানচন্দ্র) আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে গান্ধীজি স্বেচ্ছায় জনসাধারণকে অহিংসভাবে গ্রেপ্তার বরণ করে ইংরেজের জেলখানা ভরে ফেলতে নির্দেশ দেন। গ্রাম-শহর সর্বত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সংগঠন গড়ে তুলে সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানে পিকেটিং ও গণ-সত্যাগ্রহ করার ডাক দেন। তীব্র আন্দোলনের জোয়ারে সারা দেশে প্রায় ২৫ হাজার লোক গ্রেপ্তার বরণ করেন। সরকারি জেলগুলিতে স্থানাভাব হলে সত্যাগ্রহীদের স্কুলে, খোলা মাঠে সাধারণ বেড়া দিয়ে রাখা হত। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায়ে কোনও কোনও অঞ্চলে কৃষকেরা খাজনা বন্ধ করেন। সারা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতেও এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে এর বিস্তারিত বিবরণ মিলবে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গঙ্গাজলঘাঁটি থানা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পূর্বেই উল্লেখিত প্রথম জেলা কংগ্রেস কার্য-নির্বাহী কমিটি স্থায়িভাবে গঠিত হওয়ার পর থেকেই গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ তার সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিছু উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তরুণ সমবেত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ দিন পর্যন্ত 'অমর কানন' হয়ে দাঁড়ায় জেলার সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিকল্প জাতীয় বিদ্যালয় জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থাপিত হতে থাকে। বাঁকুড়া শহর, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, খাতড়া, কোতুলপুর প্রভৃতি স্থানে এবং গঙ্গাজলঘাঁটিতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। গঙ্গাজলঘাঁটির বিদ্যালয়টি নিকটবর্তী একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত উঁচু জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। স্থানীয় ভূস্বামীরা এই ভূখণ্ড দান করেন। ক্রমে বাঁকুড়া-মেজিয়া রাস্তার পূর্ব দিকে রামকৃষ্ণদেবের আশ্রম ও পশ্চিমদিকে বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস তৈরি করার কাজ শুরু হয়। স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যক্তিশ্রমে এই বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস তৈরি করার কাজ শুরু হয়। বিদ্যালয়টিতে কাঠের কাজ ও অন্যান্য হাতের কাজের শিক্ষা দেওয়া হত। চরকা কাটা ও খদ্দর উৎপাদনের পাঠ্যসূচি তো ছিলই। গোবিন্দবাবুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বাঁকুড়ার অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই এই আশ্রম ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী ছিলেন। অর্থ সংগ্রহ ও লাক্ষা চাষ এবং পানের বরজ করে এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংস্থান করার উদ্দেশ্যে সহকর্মীদের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ (অন্যতম অসহযোগী কর্মী) সহ তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে যান এবং কিছুদিন আর্থিক সাহায্য পাঠাবার পর সেখানে আকস্মিকভাবে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বাঁকুড়া গঙ্গাজলঘাঁটির সহকর্মীরা প্রচণ্ড শোকাহত হন এবং জাতীয় বিদ্যালয় সহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি অমরনাথের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ধর্ম জড়িত ছিল। গান্ধীজি যেমন রামায়ণের রামচন্দ্র অনুরাগী ছিলেন এবং নিয়মিত প্রার্থনা ইত্যাদি করতেন, তেমনই বাংলাদেশের কি বিপ্লবী কর্মী, কি জাতীয়তাবাদী অহিংস আন্দোলনের কর্মী, প্রায় সকলেই স্বামীজি এবং রামকৃষ্ণ মঠের উপাসক ছিলেন। গীতাপাঠও ছিল প্রায় সকলেরই নিত্য অভ্যাস। অমরনাথ এবং বাঁকুড়ার আরও কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী সাক্ষাৎ সারদা মায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। অমরকানন আশ্রমে মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেন স্বয়ং গান্ধীজি। গান্ধীজি ছাড়াও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ—এমন কি রবীন্দ্রনাথও শেষ জীবনে অমরকাননে পদার্পণ করেন। জেলার সব জায়গা থেকেই অসহযোগী কর্মীরা অমরকাননে গোবিন্দবাবুর কাছে পরামর্শ নেবার জন্য আসতেন।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে অন্যান্য জায়গার মতো বৃন্দাবনপুরেও একটি স্বদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিদ্যাচর্চা ছাড়াও চরকা কাটা, খদ্দর উৎপাদন ও বিভিন্ন রকম হাতের কাজের শিক্ষা দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সেখানকার কর্মীদের অনেকেই অমরকানন বিদ্যালয় ও আশ্রমের কাজে যোগদান করেন। বৃন্দাবনপুরে ২০/২৫টি তাঁত বসানো হয়েছিল।

সোনামুখী থানার পাঁচালগ্রামেও শিশুরাম মণ্ডল ও সত্যচরণ মিশ্র একটি আশ্রম ও মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় জাতীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়ার কয়েকজন বিপ্লবী, যাঁদের সঙ্গে বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষের যোগাযোগ ছিল—তাঁরাও এসে এখানে যোগ দেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

১৯২৩-২৪ সালে বেতুড়ের সুশীল পালিত ও তাঁর ভাই জগদীশ পালিত বাঁকুড়ায় খদ্দর প্রচার ও হরিজন উন্নয়ন সমিতি এবং একটি পাঠাগার গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কুমিল্লার অভয় আশ্রমের কর্মী হিসেবে তাঁরা বাঁকুড়ায় গঠনমূলক ও খদ্দর প্রচারের কাজে আসেন। বাঁকুড়া শহরে কেরানীবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে (পরে ফেমাস হোটেল) একটি হরিজন পাঠশালা ও দেশাত্মবোধক কিছু বই নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার ও পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। অভয় আশ্রমের খদ্দর বিক্রয়ের জন্য বাজারে একটি দোকানও খোলা হয়।

পালিত ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচালনায় হরিজন বিদ্যালয়টি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রচারও ধীরে ধীরে বিদ্যালয়টির মাধ্যমে হতে থাকে। গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব (হিন্দু) থাকলেও অস্পৃশ্যতার বিষয়ে গান্ধীজি ছিলেন আপসহীন—এ তথ্য আমরা সকলেই জানি। ১৯২৪ সালেই হরিজন পাঠাগারের সংলগ্ন মাঠে সাড়ম্বরে সার্বজনীন সরস্বতী পূজার আয়োজন হয় এবং হাঁড়ি, বাউরি, মুচি, মেথর প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য ও জল-অচল জাতিনির্বিশেষে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একত্রে পুষ্পাঞ্জলি দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। এই পূজায় বাঁকুড়া থেকে পুরোহিত পাওয়া সম্ভব না হওয়ায় খ্রিস্টান কলেজের প্রাক্তন সংস্কৃত

গান্ধী প্রবর্তিত চরকা ও খাদি আন্দোলন বাঁকুড়াতেও সম্প্রসারিত হয়

অধ্যাপক আনন্দমোহন কাব্যতীর্থের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বরিশাল থেকে পৌরোহিত্য করার জন্য আনানো হয়। অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনে বাঁকুড়ায় এটাই সর্বপ্রথম সার্বজনীন পূজার ব্যবস্থা। পর বৎসর বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস একই উদ্দেশ্যে সার্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন করে এবং এবারও বাঁকুড়ায় কোনও পুরোহিত না পাওয়ায় একই পুরোহিতকে বরিশাল থেকে আনানো হয়। পরে অবশ্য শ্রদ্ধেয় গোবিন্দবাবু কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছাত্রকে অমরকানন পুরোহিত হবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে সমস্যার সমাধান করেন। বারোয়ারি পূজার মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রচেষ্টায় পালিত ভ্রাতৃদ্বয় নিঃসন্দেহে বাঁকুড়ায় পথিকৃৎ।

অভয় আশ্রমের পরিচালিত পাঠাগারটিতে স্থানীয় বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং শীঘ্রই সেটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে একটি ব্যায়ামাগারও স্থাপিত হয়। কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার ফলে কেরানী বাজারের ঘরটিতে আর স্থান সংকুলান হল না, স্কুলডাঙ্গায় বর্তমান গান্ধী বিচার পরিষদের বাড়িটির সামনে গোপীনাথ দত্ত মহাশয়ের—যিনি ইতিপূর্বেই লালবাজারে দত্ত বাঁধের পাড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজে তাঁর বাড়ি ও কারখানা বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন—বিস্তীর্ণ উঠোন সহ অপেক্ষাকৃত একটি বড় বাড়িতে স্বল্প ভাড়ায় অভয় আশ্রম স্থানান্তরিত হল। স্কুলডাঙ্গায় আসার পর কাজকর্মের দ্রুত প্রসার হতে থাকে। হরিজন উন্নয়ন, পাঠাগার ও ব্যায়ামাগারের কাজের সঙ্গে তাঁরা জেলায় খদ্দর প্রচারের দিকেও দৃষ্টি দেন। বিহারজুড়িয়ার জয়ন্তীকুমার চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক ছাত্রকর্মীর সাহায্যে সেখানে একটি শাখা স্থাপিত হয়। সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তাঁত ও চরকা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। পরে ইন্দপুর থানার ভেদুয়াশোল ও খাতড়া থানার বহড়ামুড়ি গ্রামে তাঁত ও খদ্দর প্রস্তুতের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মোহনলাল গোয়েঙ্কা নামে জনৈক মাড়োয়াড়ি যুবক ২০,০০০ টাকা লগ্নি করে ইন্দপুরে একটি খদ্দর উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে খদ্দর এনে দোকান মারফত বিক্রয় করতেন। পালিত ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজকর্মের মূল দায়িত্ব এসে পড়েছিল। পালিতদের বেতুড় গ্রামে অভয় আশ্রমের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ওইটি জেলার মূলকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তাঁত, খদ্দর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও সেখানে একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকা জেলায় প্রথমে মালিকান্দা, পরে মনিটোলা, রমনা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় স্থান পরিবর্তন করে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে 'অভয় আশ্রম' নাম দিয়ে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। ১৯২৩ সালে কুমিল্লা শহরে আশ্রমটি স্থানান্তরিত হয়। গান্ধীজি প্রবর্তিত বিবিধ গঠনমূলক কাজ ; যথা—চরকা, তাঁত, কাঠের কাজ প্রভৃতি গ্রামোন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক কাজ এবং চিকিৎসা, শিক্ষাদান ও পল্লী গঠনের কাজ এখানে হত। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অসহযোগী আন্দোলনের নেতারা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন।

প্রথমে বিপিনবিহারী দাস খদ্দর উৎপাদন ও বিক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পরে সেখান থেকে অব্যাহতি পাবার পর তাঁকে ও কালীকিঙ্কর কর্মকার নামে অমরকাননের এক বিশিষ্ট কর্মীকে

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। জন্ম ১৯ নভেম্বর ১৮৮৭, মৃত্যু ১২ অক্টোবর, ১৯৬১

ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতায় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের কাছে পাঠানো হয়। ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির সাহায্যে বক্তৃতায় বিপিনবিহারী বিশেষ পারদর্শী হয়েছিলেন। জেলায় এমন খুব কমই গণ্ডগ্রাম আছে যেখানে তিনি ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা করেননি। তাঁর বক্তৃতায় পল্লীগ্রামের লোক সহজেই আকৃষ্ট হত। ১৯২৮ সালে বাঁকুড়ায় ইউনিয়ন বোর্ড আন্দোলনের সাফল্যের পিছনে বিপিনবিহারীর ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই সব বক্তৃতায় ব্রিটিশ রাজত্বে কুটিরশিল্প—বিশেষভাবে তাঁতিদের উপর অত্যাচার, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক নির্যাতন, সিপাহিদের বিদ্রোহ, জঙ্গল মহালের চুয়াড় বিদ্রোহ, বিশেষভাবে রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গোখলে, তিলক, গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু প্রমুখের কথা আবেগময় ভাষায় জনসাধারণের কাছে বর্ণনার ফলে বিরাট উদ্দীপনা সৃষ্টি হত। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে তাঁকে বীরভূম জেলাতেও প্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯২৫ সালে বাঁকুড়া জেলায় কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, ১৯২৮ সালে খাতরা এবং কোতুলপুরে ১৯২৯ সালে ৫ম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

খাতড়া অঞ্চলে সমাজসেবা ও কংগ্রেসের আন্দোলনে বিরাট সাড়া পড়ে—প্রধানত গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের উদ্যোগে। কাঁকড়াদাঁড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন—অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর প্রচার ও সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রভাবে সমগ্র এলাকায় বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। অম্বিকানগর, আখখুটা, রুদড়া প্রভৃতি খাতড়া ও রানীবাঁধ অঞ্চলের বড় গ্রামগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বাঁকুড়ায় অসহযোগ আন্দোলনের জনক অনিলবরণ রায় কয়েকবার খাতড়া, রাইপুর, সিমলাপাল ও রানীবাঁধ থানায় গিয়ে জনসভা করেন। পাখি চরকা তৈরি করে কর্মীদের শিক্ষা দিয়ে মোটা কাপড় তৈরি করা ও বাঁকুড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। পুরাতন পাঠশালাটি সালিসি আদালত হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং বিবদমান উভয় পক্ষই এই সালিসিতে সন্তুষ্ট হতেন। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি 'কংগ্রেস ডাঙ্গা' নামে পরিচিত হয়।

খাতড়ায় ১৯২৮ সালে জেলা কংগ্রেসের যখন সম্মেলন হয় কংগ্রেসের আন্দোলন তখন স্তিমিতপ্রায়। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মল্লিক মহাশয়। স্বামীজির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে ইউনিয়নবোর্ড বর্জন ও ইউনিয়ন ট্যাক্স বন্ধ করার প্রস্তাব উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়। সে-সময় জেলা বোর্ড কংগ্রেসের অধিকারে থাকায় কাজ কিছুটা সহজ হলেও ইংরেজ সরকার এ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে। অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য পদত্যাগ করলেও খাতড়া, দহলা প্রভৃতি কয়েকটি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সরকার তথা পুলিশের সাহায্য চায়। দহলা বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ির সামনে মল্লিক মহাশয় সাতদিন অনশন সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকেন। প্রেসিডেন্ট মহাশয় পদত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিয়েও গোবিন্দবাবুর বিরুদ্ধে পুলিশের সাহায্যে মামলা করেন। গোড়াবাড়ি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। অবশ্য প্রবল জনমতের চাপে ও সাক্ষীদের জন্য সব মামলাই বানচাল হয়ে যায়—এবং গোবিন্দ মল্লিক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। সারা জেলাতেই এই ইউনিয়নবোর্ড বর্জন ও ইউনিয়ন ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এর পর ১৯৩০ সালের লবণ আইন সত্যাগ্রহে খাতড়া অঞ্চল সত্যাগ্রহীর সংখ্যায় একমাত্র গঙ্গাজলঘাটির পরেই স্থান পেয়েছিল, কিন্তু একক গ্রাম হিসাবে কাঁকড়াদাঁড়ার সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এইভাবে খাতড়া, রানীবাঁধ ও গঙ্গাজলঘাটি থানায় ইউনিয়নবোর্ডের সদস্যগণ জনমতের চাপে পদত্যাগে বাধ্য হন। অবশ্য ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন গঙ্গাজলঘাটি থানায় প্রথম আরম্ভ হয়। তবে ইউনিয়নবোর্ড-বিরোধী আন্দোলন বিষ্ণুপুরে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

সোনামুখী সে সময় কেট্যা ও তসর উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সম্পূর্ণ স্বদেশি দ্রব্য থেকে প্রস্তুত বলে অভয় আশ্রমের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং রেশম খদ্দর প্রস্তুত করবার জন্য তারা এখানে একটি কেন্দ্র স্থাপন করে। কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রর নেতৃত্বে সোনামুখী থানার প্রায় সব ইউনিয়নবোর্ডের সদস্যরা পদত্যাগ করতে রাজি হয়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনে কোতুলপুর থানাও পিছনে পড়ে থাকেনি। পাঠশালার গুরুমশাইয়ের কাছে স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষিত মন্মথবাবুর (মল্লিক) নেতৃত্বে সেখানে বিপ্লবীদের একটি গোপন আস্তানা হয়। সেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা এবং অসহযোগ আন্দোলন সহ চরকা প্রচলন, বিদেশি বস্ত্র, বিলাস দ্রব্য ও সাদা

চিনির মিষ্টান্ন বর্জন, কংগ্রেস সদস্য ও তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ, ইউনিয়নবোর্ড বর্জন ও ইউনিয়ন ট্যাক্স দিতে অস্বীকার, সালিসি আদালত স্থাপন, মাদক দ্রব্য বর্জন—ইত্যাদি কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। ১৯২৯ খ্রিঃ জেলা কংগ্রেসের ৫ম সম্মেলন কোতুলপুরে অনুষ্ঠিত হয়। আগের বছর খাতড়া জেলা সম্মেলনে কোনও প্রাদেশিক নেতা নির্বাচিত হয়েও যোগদান না করায় এবার কোতুলপুর সম্মেলনে জেলার বিশিষ্ট নেতা মণীন্দ্রভূষণ সিংহ সভাপতিত্ব করেন। সুভাষচন্দ্রকে (তখনও নেতাজি হননি) প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

প্রায় দু মাস পরে গঙ্গাজলঘাটিতে একটি থানা সম্মেলনে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন অতিথিরূপে যোগদান করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই সম্মেলনে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, নিবারণ দাশগুপ্ত ও তাঁর কন্যা বাসন্তী দেবী যোগদান করেন। এই সঙ্গে জেলার মহিলা সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির নেত্রী ছিলেন কুমুদকামিনী ভদ্র এবং সভানেত্রীত্ব করেন পালিত পরিবারের পুত্রবধূ সুষমারানী পালিত। সম্মেলনে দশ হাজার কংগ্রেস কর্মী ও পঞ্চাশ হাজার শ্রোতা সমাগম হয়।

ভাদুলের মণীন্দ্রভূষণ সিংহ রাজনীতিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক অনিলবরণ রায়কে জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদকের পদে বরণ করা হয়। স্বরাজ্য পার্টি ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে গঠিত হবার পর—অনিলবাবু আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। স্বরাজ্য পার্টি আইনসভার ভিতরেও লড়াই করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। মণীন্দ্রভূষণ একাই জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তখন তিনি দুটি পদে একসঙ্গে কাজের অসুবিধা বিবেচনা করে জাতীয় বিদ্যালয়টির প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব সংস্কৃত সাহিত্যে এম এ রামশশী কর্মকার মহাশয়ের উপর দেন এবং নিজে সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের কাজেই আত্মনিয়োগ করেন।

স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হবার পর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য গঠিত পৌরসভা ও জেলা বোর্ড কংগ্রেস সদস্য দ্বারা দখল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯২৫ সালে সে সুযোগ আসে। বাঁকুড়া পৌরসভায় আংশিকভাবে নির্বাচনে জয়ী হলেও চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ কংগ্রেস দখল করে। কমলকৃষ্ণ রায় চেয়ারম্যান ও কালীকৃষ্ণ মিত্র ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তখনকার আইনে সমস্ত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্ধেক সদস্য সরকার মনোনীত ছিল। লোক্যাল বোর্ডে প্রতিটি থানায় কংগ্রেস সদস্যরা বিজয়ী হন। লোক্যাল ও জেলা বোর্ডের সব কটি নির্বাচিত আসনই কংগ্রেস পায় এবং কংগ্রেস সদস্যদের ভোটে মণীন্দ্রভূষণ সিংহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন জনহিতকর কাজে মণিবাবুর নেতৃত্বে জেলা বোর্ড উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পৌরসভা ও জেলা বোর্ডের উদ্যোগে 'দেশবন্ধু ব্যায়ামাগার' এই সময়ই স্থাপিত হয়। জেলা বোর্ডের অধীনে সে সময় তিনটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। সেগুলিতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও ইংরেজদের অত্যাচারের

অসহযোগ আন্দোলনে বাঁকুড়ার স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ

কাহিনি প্রচার করা হত। এই সময় জেলায় রাস্তাঘাটেরও বিশেষ উন্নতি হয়। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব তখন লোক্যাল বোর্ডের অধীনে ছিল। সে ক্ষেত্রেও বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাঁকুড়া সদর আইনসভা নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় জয়লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মণিবাবু আইনসভার সদস্য হিসাবে বাঁকুড়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। দুটি পদে একসঙ্গে থাকার অসুবিধার কারণে মণিবাবু জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করেন। মাত্র একবারই কংগ্রেস-বিরোধী মহম্মদ সিদ্দিকি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হন দুজন কংগ্রেসী সদস্যের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগে। পরে কংগ্রেস আবার আসনটি পুনর্দখল করে।

অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদা চৌধুরী প্রমুখ জননেতারা সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দাস প্রভৃতি থানায় সভা-সমিতির মাধ্যমে প্রবল জন-আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং সেখানেও ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই সময় গান্ধীজির আহ্বানে ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয় এবং বাংলাদেশের তথা বাঁকুড়ার নেতৃবৃন্দ উক্ত আন্দোলনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুরের কাঁথি পর্যন্ত পদযাত্রা করে কাঁথিতে লবণ আইন ভঙ্গ করার সংকল্পে কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীসহ ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বাঁকুড়ায় আসেন এবং আসন্ন সত্যাগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, সম্পাদক সুশীলচন্দ্র পালিত। বাঁকুড়ার গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, কমলকৃষ্ণ রায়, মণীন্দ্রভূষণ সিংহ, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্য কিছু নেতাও কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটির প্রচেষ্টায় ডাঃ সুরেশচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলার প্রথম ও ভারতের দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ পদযাত্রা। বাঁকুড়ার পদযাত্রীরা বেলিয়াতোড়, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, বেতুড়, শ্রীরামপুরের পথে বর্ধমান দিয়ে কাঁথি যাবার পথে রাস্তার দু-পাশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে সভা-সমিতি করে যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফলে বিনা অনুরোধে বহু ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন, অনেকে সহযাত্রী হতে

চারণকবি মুকুন্দদাস স্বদেশী যাত্রায় অর্থ সংগ্রহ করে বাঁকুড়ায় দেশবন্ধুর নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তা দান করেন। নামকরণ হয় 'অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয়'।

চেয়েছিলেন। সুশীলচন্দ্রের ভাই জগদীশচন্দ্র এই দলের সহযাত্রী ছিলেন এবং কাঁথিতে লবণ আইন ভঙ্গ করে পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হয়ে আড়াই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আন্দোলন আরম্ভ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, বিপিন দাস, ধীরেন্দ্রনাথ, মণিবাবু, অহিবাবু প্রমুখ বাঁকুড়ার নেতারা গ্রেপ্তার হন। কমলবাবু ও সুশীলবাবুর উপর আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব থাকে। এরপর কমলবাবুও গ্রেপ্তার হলে একা সুশীলবাবু ছাড়া দায়িত্বশীল নেতা আর কেউ জেলের বাইরে রইলেন না। তিনি আত্মগোপন করে পদব্রজে সমগ্র জেলায় ঘুরে কর্মীদের আন্দোলন পরিচালনার বুদ্ধি ও পরামর্শ দিতে থাকলেন। পিকেটিং অর্ডিন্যান্স ভঙ্গ করে প্রায় আট শতাধিক ব্যক্তি কারাবরণ করেন। এই সঙ্গে পাত্রসায়ের, হদল নারায়ণপুর, বেতুড়, শ্রীপুর, রাজগ্রাম, ময়নাপুর, আকুই, ইন্দাস প্রভৃতি স্থানে একসঙ্গে ট্যাক্স বন্ধ হয়েছিল। অবশ্য এই ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে কোতুলপুরের মন্মথ মল্লিক, সোনামুখীর পত্তনিদার রাধিকা ধর, বালসীর ডাঃ ধনপতি পাল ও বিখ্যাত বিজ্ঞানের ছাত্র প্রমথ নন্দীর কৃতিত্বও স্মরণীয়—নতুবা একজন আত্মগোপনকারী নেতার পক্ষে একাকী এত বড় আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব হত না। সুশীলচন্দ্রও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে দুবছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

পালিত ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী শান্তশীলা বাঁকুড়া জেলায় ফিরে আসেন। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন। পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন জোরদার হবার ভয়ে অমরকানন আশ্রমে শান্তশীলার বাসস্থান বাজেয়াপ্ত করা হয়। কারণ, সপরিবারে তিনি ছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রেরণাদাত্রী। সুশীলচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র ছাড়াও তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুধীরচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী সুষমা আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৯ সালে কোতুলপুর জেলা কংগ্রেস সম্মেলনে সুষমারানী জেলা মহিলা সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হন। শান্তশীলার এক কন্যা কনকলতা বেতুড় গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেন। চতুর্থ পুত্র পঞ্চানন মেদিনীপুর থেকে গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং মেদিনীপুরের কুখ্যাত জেলাশাসক পেডি সাহেব লোহার নাল লাগানো বুট জুতো পরে লাথি মেরে তাঁর বুকের পাঁজর ভেঙে দেয় এবং সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বেতুড়ের পালিত পরিবারের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কলকাতায় মহাজাতি সদনে শান্তশীলা ও পঞ্চাননের তৈলচিত্র সংরক্ষিত আছে। ১৯৩৫ সালে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে সকলেই জেল থেকে ছাড়া পান। সুশীলচন্দ্র অভয় আশ্রমের কাজ নিয়ে অতঃপর ব্যস্ত থাকেন এবং জগদীশচন্দ্র কমিউনিস্ট ও কৃষক আন্দোলনে ক্রমশ নিজেকে জড়িত করেন। পরে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অবশ্য শেষোক্ত দু-ভাই গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৫ সালে মুক্তি লাভ করেন। গ্রেপ্তার হবার পূর্বে সুশীলচন্দ্র এবারও আত্মগোপন করে কিছুকাল আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ করেন।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্যের সময় অমরকানন আশ্রমের প্রায় সমস্ত কর্মী গ্রেপ্তার হন এবং ইংরেজ সরকার অমরকানন আশ্রম বাজেয়াপ্ত করে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর আশ্রমের কর্মীরা মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে দেখেন তাঁত, চরকা, বই সবই নষ্ট হয়েছে, কেবলমাত্র কানাইলাল পাঠশালাটি কোনোমতে চলছে। কর্মীরা পুনর্গঠনের কাজের সঙ্গে হরিজন উন্নয়ন ও বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচিও গ্রহণ করেন। কিন্তু পুনর্গঠনের কাজ শুরু হবার পূর্বেই গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় আশ্রম বাজেয়াপ্ত হল। কোঁড়া গ্রামের পাঠশালাটি কোনোমতে টিকে ছিল। কর্মীরা মুক্ত হবার পর আশ্রম ও বিদ্যালয় পৃথক সংগঠন করে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হল।

চারণকবি মুকুন্দদাস স্বদেশি যাত্রাগান করে সারা বাঁকুড়া জেলায় যা অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন একটি অছি পরিষদ গঠন করে সে অর্থ দান করে যান দেশবন্ধুর নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে। আশ্রম কর্মীরা সাগ্রহে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাই বিদ্যালয়টির নামকরণ হয় 'অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয়'।

১৯৩৮ সালে বিষ্ণুপুরে মহাসমারোহে প্রদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র বসু এই সম্মেলনে যোগদান করেন—তখন তিনি প্রদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। রামনলিনী চক্রবর্তীর অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা সম্মেলনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলে।

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করার পর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের অসহযোগিতার কারণে

সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সংগঠন তৈরি করে বাঁকুড়া জেলাতেও তার শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি পৃথক সংগঠন গঠন করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ইংরেজ শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের আঘাত করতে চান। গান্ধীজির নিচু সুরের আন্দোলনে কংগ্রেসের অনেক কর্মীই তখন বিক্ষুব্ধ। সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশের জেলায় জেলায় সংগঠন তৈরি করার উদ্দেশ্যে সফর করতে লাগলেন। অশোকানন্দ বসু (মুকুবাবু) ও ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বাঁকুড়াতেও একটি শাখা গঠিত হয় এবং কর্মী সংগ্রহ চলতে থাকে। পরের বছর রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের পাশে সুভাষচন্দ্র আপস-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন। বাঁকুড়া থেকে অন্তত ২৫ জন এই সম্মেলনে (আপস বিরোধী) যোগ দেন। রামকৃষ্ণ দাস এই জেলা সংগঠনের সভাপতি এবং অশোকবাবু ও ধীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসেবে কাজ চালাতে থাকেন। গান্ধীজির অনুগামী জেলার কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা এবং অপচেষ্টা সত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্রকে বাঁকুড়া, কেঞ্জাকুড়া, ইন্দপুর, ভেদুয়াশোল, খাতড়া, গঙ্গাজলঘাটি, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে বিপুল সংবর্ধনা জানানো সম্ভব হয় ও সর্বত্র বিশাল জনসভা হয়। বাঁকুড়া সেকেন্ড ফিডার রোডে কেশব চৌধুরি মহাশয়ের ধানকলের জনসভা সুভাষবাবুর গ্রেপ্তারের পূর্বের শেষ জনসভা ছিল। (প্রবন্ধকারের বাড়িতে সুভাষচন্দ্র ও ধীরেন্দ্রনাথের সেই সময়কার একটি ছবি আজও আছে—সুভাষচন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়িতে ছবিটি তোলা)। অশোকানন্দ বসু ছিলেন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট আইনজীবী এবং ধীরেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চিরকুমার কংগ্রেসসেবী। তিনি ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর পুনরায় কংগ্রেসেই ফিরে যান। স্বাধীন দেশের প্রথম দুটি সাধারণ নির্বাচনেই তিনি বিধানসভার সদস্য ও জেলা কংগ্রেস সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি মারা যান।

১৯২০ এবং ১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। পূর্বেই বেতুড়ের পালিত পরিবারের জননী, পুত্রবধূ, কন্যাদের কারাবরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রায় একশো মহিলার নামের উল্লেখ বিভিন্ন নথিপত্রে পাওয়া যায় যাঁরা বাঁকুড়া জেলায় অসহযোগ আন্দোলনে নির্যাতন সহ্য করেছেন, আইন অমান্য করে কারাবরণ করেছেন। প্রথম মহিলা রাজবন্দী হিসাবে ইন্দাসের দুই সিন্ধুবালার নাম পাওয়া যায়—দরিদ্র রেলকর্মি নরেন্দ্রনাথ ঘোষের একজন স্ত্রী ও অপরজন ভগ্নী। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর দুই সঙ্গীকে আশ্রয় দেবার অভিযোগে প্রথমে ইন্দাস থানা, পরে বাঁকুড়া বি ডি আর রেল স্টেশন থেকে হাজত পর্যন্ত তাঁদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভগ্নী সিন্ধুবালা ছিলেন আসন্নপ্রসবা। সোনামুখীর সত্যরানী হালদারও বহু সংগ্রামের নায়িকা। বহরমপুর জেলে তিনি দীর্ঘ কারাবাস করেন। পুরুষের ছদ্মবেশে তিনি ১৯৩০ সালের কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহী দলে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের নজর এড়াতে পারেননি—গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। এ ছাড়াও বিশিষ্টদের মধ্যে শৈলবালা দে, উমা দেবী, আকুই গ্রামের ননীবালা গুহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪১ সালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঁকুড়ায় একটি নতুন অধ্যায় যোগ হল। দেশব্যাপী বা রাজ্যব্যাপীও নয়—স্থানীয় খ্রিস্টান কলেজের একটি ঘটনা। যদিও সে আন্দোলনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী ছাত্ররা ছিলেন, কিন্তু আন্দোলনের বিষয় ছিল কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গাইবার অধিকার। কলেজের ইংরেজ সরকারের অনুগত খ্রিস্টান কর্তৃপক্ষ কোনও মতেই অনুমতি দিতে চাননি। ফলে জাতীয়তাবাদী এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হল। দীর্ঘদিন পিকেটিং, ধর্মঘট চলতে লাগল। শহর ও জেলাবাসী সমস্ত মানুষ ছাত্রদের ন্যায্য দাবির পিছনে দাঁড়ালেন। এমন কি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে ছাত্রদের আশীর্বাদ জানালেন। মাসাধিককাল আন্দোলনের ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবি মেনে নিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দুজন ছাত্র নেতা বাঁকুড়ার শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপুরের সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলেজে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করেন।

এই ঘটনার সামান্য আগে যুদ্ধের চাঁদা আদায়ের জন্য (২য় বিশ্বযুদ্ধ) বাংলার লাটসাহেব বাঁকুড়ায় আসেন। তামলিবাঁধ মাঠে তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন করা হয়। কমিউনিস্টরা তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলেই মনে করতেন—সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে এক পয়সাও সাহায্য করা উচিত নয়। 'না এক পাই—না এক ভাই' আওয়াজ তুলে ছাত্রদের এক মিছিল সভাস্থলের কাছে গেলে পুলিশবাহিনী ছাত্রদের মিছিলের ওপর নির্বিচারে লাঠি চালনা করে। 'বন্দেমাতরম্' ছাত্র আন্দোলনের নেতারাই এই প্রতিবাদ মিছিলের উদ্যোক্তা ছিলেন। পুলিশের লাঠিচালনার প্রতিবাদে বাঁকুড়াবাসী হরতাল প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, লাটসাহেবের সংবর্ধনা সভা পণ্ড হয়ে যায়। এই আন্দোলনেরও দুজন ছাত্রনেতা উদয়ভানু ঘোষ ও শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায় স্বল্প মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

এর পরের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে তুমুল আন্দোলন হয়— যার ঢেউ বাঁকুড়াকেও কিছুটা উত্তাল করে সেটি হল ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। ৮ আগস্ট ১৯৪২ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'কুইট ইন্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ৯ আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্য গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস নেতৃত্বের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা বা সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল না এবং বলা যায়, কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ততার ওপরই আন্দোলন ছেড়ে দেওয়া হয়। জয়প্রকাশ, অরুণা আসফ আলি প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। মেদিনীপুরের তমলুকে তো অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ সামন্ত, সুশীল ধাড়া প্রমুখের নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। এই সব জায়গায় ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মদানের কাহিনি লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। রেললাইন তুলে ফেলা, স্টেশন, ডাকঘর, সরকারি কার্যালয় ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকে।

বাঁকুড়াতেও উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস নেতারা সকলে গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস অফিসে যে রাত্রে কর্মীগণের উপর জেলার বিভিন্ন অংশে আন্দোলন সংগঠিত করার দায়িত্ব দিয়ে আত্মগোপন করে কাজ চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়—সেই রাত্রের ভোরে কর্মীরা নিজ নিজ বাড়িতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। কানাইলাল দে সহ মোট সতেরোজন গ্রেপ্তার হন। সুশীল পালিত কিছুকাল আত্মগোপন করে আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু শীঘ্রই ধরা পড়েন। কমলকৃষ্ণ রায়ও অল্পদিন প্রকাশ্যে থাকার পর গ্রেপ্তার হন। ধীরেন্দ্রনাথ ও অশোকানন্দ তো আগস্ট আন্দোলনের কয়েক মাস পূর্বেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে জগদীশ পালিত, ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ইন্দু সাঁই, ছাত্রনেতা নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রবি দত্ত প্রমুখ আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার পর জগদীশ পালিত অবশ্য পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে আসেন। অন্যান্য সকলে রাজনীতি ছেড়ে জীবিকার্জনের পথে যান।

খ্রিস্টান কলেজে কমিউনিস্ট ছাত্রদের বিরোধিতায় (তখন কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাহিনী দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ায় 'সাম্রাজ্যবাদী' যুদ্ধের পরিবর্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে ইংরেজ ও মিত্রপক্ষের সমর্থক) প্রথমদিকে আগস্ট আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্রদের নামানো সম্ভব হয়নি। পরে কালীতলা বালিকা বিদ্যালয়ের ৩০/৩৫ জন ছাত্রী কলেজের মেয়েদের পিকেটিং করে ক্লাসে যেতে বাধা দেয়, তার সঙ্গে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা আদিবাসী খ্রিস্টান ছাত্র অমিয় কিস্কু সহ কয়েকজনের নেতৃত্বে আন্দোলনে যোগ দেয়। ছাত্রদের বিরাট মিছিলে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদেরও যোগদানের ফলে পরপর কয়েক দিন ছাত্র ধর্মঘট ও বিশাল মিছিল শহরের পথে পরিক্রমা করে। এর পরে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হল। তারাপ্রসাদ সিকদার প্রমুখ কয়েকজন আত্মগোপন করে কিছুকাল গ্রাম অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে আন্দোলনের বিস্তার হয়নি এবং একে একে সকলেই ধরা পড়েন। পূর্বেই বলা হয়েছে, অশোকানন্দ বসু ও ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আন্দোলন শুরু হবার আগেই গ্রেপ্তারবরণ করেন। দোলতলায় ১৯৪২ সালের ২৬ জানুয়ারি সরকারি নির্দেশ অমান্য করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় তাঁরা গ্রেপ্তার হন। ৬ মাসের কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হবার পর জেলগেটেই তাঁরা পুনরায় গ্রেপ্তার হন। আগস্ট আন্দোলনের বাঁকুড়ার বন্দীদের তাঁরা মেদিনীপুরে জেল ফটকেই অভ্যর্থনা জানান। ছাত্রনেতা প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও তপোময় চৌধুরী বাঁকুড়া কাছারি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। অমরকানন আশ্রম কর্তৃপক্ষ পুলিশের রোষে অতীতে একাধিকবার আশ্রম বাজেয়াপ্ত হবার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এবার আগস্ট আন্দোলন থেকে আশ্রমকে দূরে রাখেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেকে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। শিশুরাম মণ্ডল আগস্ট আন্দোলনে যোগ না দিয়ে আশ্রম ও বিদ্যালয়টির দেখাশোনার দায়িত্বে থাকেন।

১৯৪৩ সাল বা বাংলার ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের সময় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট কর্মীরা সকলেই প্রায় জেলে বন্দী ছিলেন, সুতরাং মনুষ্যসৃষ্ট এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণ নিরন্ন মানুষের পাশে এসে তাঁরা দাঁড়াতে পারেননি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি নিরন্ন মানুষের ত্রাণ ও সেবাকাজে এগিয়ে আসেন। মহিলা সমিতি এই কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। গ্রামে-শহরে সর্বত্র নিরন্ন মানুষদের জন্য লঙ্গরখানা পরিচালনা করা হয়। অনেক ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ ত্রাণের কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

আগস্ট আন্দোলনের বন্দীরা ১৯৪৫ সালের শেষদিকে মুক্তি পেয়ে ঘরে ফেরেন।

পরাধীন ভারতে বাঁকুড়ায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারির একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতার শপথবাক্য পাঠ করা হয় এবং ওই দিনটিকে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময় থেকে প্রতি বছর দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হতে থাকে।

বাঁকুড়াতেও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটিতে ছাত্র ধর্মঘট, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ছাত্র সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের দশম শ্রেণীর এক কিশোর দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, সেদিন কর্তৃপক্ষের নিষেধ অমান্য করে ছাত্র ধর্মঘট করার চেষ্টা করে এবং স্কুলের মাথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মুসলিম লিগপন্থী গোলাম মোস্তাফা (কবি) ছাত্রটিকে এবং অন্যান্য ছাত্রদের ভীতি প্রদর্শন করেন, বিদ্যালয়ে পুলিশ ডাকেন এবং মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় ছাত্রটিকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করেন।

ফলে পরদিন থেকেই জেলা স্কুল ও শহরের অন্যান্য স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল স্কুলে ধর্মঘট আরম্ভ হয় ছাত্রটির বহিষ্কারের আদেশের প্রতিবাদে। ক্রমে সে আন্দোলন সমগ্র জেলায় বিস্তারলাভ করে, বাজার হরতাল ইত্যাদি পালিত হয়। আন্দোলন পরিচালনার

জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্ত কমিটি গঠিত হয়। প্রায় এক মাস আন্দোলন চলার পর কর্তৃপক্ষ ছাত্রটির বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। সারা দেশই তখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছাত্র-শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভে উত্তাল।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শেষ দুবছর—অর্থাৎ ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ দেশব্যাপী তুমুল ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী আন্দোলন হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের এবং রশিদ আলির মুক্তির দাবি, নৌ-বিদ্রোহ, বোম্বাই, করাচি, কলকাতার রাস্তায় পুলিশের গুলিচালনা, ব্যারিকেড লড়াই ইত্যাদি ঘটনাকে আমরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করতে পারি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার শেষ গণ-অভ্যুত্থান বলতে পারি। পুলিশ, মিলিটারির প্ররোচনায় অবশ্য এই সংগ্রাম সর্বত্র সব সময় অহিংস থাকেনি। বাঁকুড়া শহর এবং জেলাও এই আন্দোলনে পিছিয়ে পড়েনি। হরতাল, ধর্মঘট—বাজারে ও সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং প্রধানত ছাত্রদের মিছিল ও সমাবেশে সমগ্র জেলা উত্তাল হয়ে ওঠে, বিশেষত ছাত্রসমাজই ছিল এই আন্দোলনের প্রথম সারিতে—প্রধানত কমিউনিস্ট ছাত্রদের নেতৃত্বে।

বাঁকুড়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে মোটামুটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের পশ্চাৎপটে বাঁকুড়ায় যে আন্দোলন হয়েছিল তারই পরিচয় খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে। বামপন্থী এবং বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনের পৃথক দুটি ধারা আছে—যার আলোচনা স্বাভাবিক কারণেই এখানে অনুপস্থিত। সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ-তরুণীদের অনেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও অংশ নিয়েছেন, কারাবরণ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন নিজেদের আদর্শগত পার্থক্য বজায় রেখেই, আবার এই সঙ্গে নিজস্ব কর্মসূচিও পালন করেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্বে এবং চল্লিশের দশকে সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ-তরুণীরাও যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সে ঐতিহাসিক তথ্যকেও [illegible] করা হয়েছে।

এঁরা সকলেই আমাদের নমস্য। আরও একটা কথা—পুরনো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিষ্ঠা, সততা, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় মূল্যবোধের রাজনীতি তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, যার অভাব আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনকে অনেকটাই কলুষিত করছে।

এই লেখায় এবং অন্যত্রও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) উল্লেখ আমরা বারবার পেয়েছি। বিপ্লবী আন্দোলনে, অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলনে বাঁকুড়াবাসী তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছে। ১৯৩৭ সালে পাত্রসায়েরে কৃষকসভার প্রথম রাজ্য সম্মেলন থেকে স্বাধীনতাপূর্ব সময় পর্যন্ত মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ হিসেবেও বাঁকুড়াবাসী তাঁকে অনেকবার পেয়েছে। জার্মানিতে গিয়ে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করে বিদেশেই তিনি মার্কসবাদী আদর্শ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে এই প্রবন্ধকারের সৌভাগ্য হয় বাঁকুড়ায় কমিউনিস্টদের একটি ঘরোয়া বৈঠকে তাঁকে

বাঁকুড়া জেলার পালিত প্রদ্যুম্নের জননী শান্তশীলা পালিত আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রেরণাদাত্রী।

ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও তাঁর কথা শোনার। বাঁকুড়া জেলার মানুষের সম্পর্কে তাঁর কি বিশেষ কোনও অনুভূতি ছিল ? জানি না। বাঁকুড়া জেলার সমস্ত ধারার আন্দোলনেই তাঁর বিশেষ অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

এই প্রবন্ধে শুধু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে—স্বাভাবিক কারণেই আন্দোলনের সমস্ত সংগঠক ও কর্মীদের পরিচয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি।

১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঁকুড়ায় হয়েছিল—তীব্রতা, গভীরতা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে তিরিশের দশকের আন্দোলনই নিঃসন্দেহে ছিল বৃহত্তর। এই দুই দশকে এবং '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে কত নরনারী বাঁকুড়া জেলায় পিকেটিং, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন এবং কারাবরণ করেছেন তার সঠিক সংখ্যা আমরা এখনও জানি না। ভবিষ্যতের কোনও গবেষক এই পরিশ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করবেন বলে আমরা আশা রাখি।

—: সূত্র :—

১। রামকৃষ্ণ দাস—বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
২। তারাপ্রসাদ সিকদার সম্পাদিত—স্মরণ বিশেষ সংখ্যা 'ভারত ছাড়ো'
৩। শৈলেন দাস, নমিতা মণ্ডল, গিরীন্দ্রশেখর সম্পাদিত—ফিরে দেখা
৪। ডাঃ অমলেন্দু দে—ভারতের ইতিহাস
৫। প্রভাতাংশু মাইতি—আধুনিক ভারত

লেখক : স্বাধীনতা সংগ্রামী। প্রাক্তন শিক্ষক, বাঁকুড়া মিশন উচ্চ বিদ্যালয়

শিল্পী—রামকিংকর বেজ

বাঁকুড়ার গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবী আন্দোলন

রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী

রানীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর গ্রামেও মেদিনীপুরের যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তখন ছেঁদাপাথর ছিল ঘন অরণ্যানীর অবগুণ্ঠনবতী ও হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল। মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্রের নিশানা স্থির করার শিক্ষা গ্রহণ ও বোমা তৈরির নিরাপদ স্থান হিসেবে এ অঞ্চলটিকে ব্যবহার করতেন।

ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূত্র ধরে বাঁকুড়া জেলায় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির উদ্ভব ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত কখন ও কীভাবে ঘটেছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী ১৯১১ ও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের সরকারি নথি থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এ জেলায় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের স্রোত প্রবেশ করেছিল। এ জেলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধারার অনুপ্রবেশ ঘটাবার পশ্চাতে ছিল বিপ্লবী ননীগোপাল সেনগুপ্তের নেতৃত্ব ও সারথি যুবক মণ্ডলী নামে একটি সংগঠনের ভূমিকা। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে একটি সন্ত্রাসবাদী ডাকাতির ব্যর্থ প্রচেষ্টাও হয়েছিল।[১] এ প্রয়াসের ব্যর্থতার কারণও সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়। যে বাড়িতে এই রাজনৈতিক ডাকাতির কথা ছিল, সেই বাড়িটি চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যে ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল, অত্যন্ত মদ্যপ অবস্থায় থাকায় সে তা পারেনি। তাই এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[১ক] যে গ্রামে এই ডাকাতি হওয়ার কথা ছিল তার নাম হাসাডাঙ্গা (Hasa Danga) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১খ] কারা এই রাজনৈতিক ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন ও এর ব্যর্থতার কথা কীভাবে সরকার জানতে পেরেছিল সে সম্পর্কে কোনও সংবাদ এ রিপোর্টে নেই।

তবে জেলাবাসীর মধ্যে সুপ্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শতাব্দীর গোড়াতেই বাঁকুড়া শহর, খাতড়া থানার অম্বিকানগর ও রানীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর বিপ্লবী যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মতৎপরতার সংস্পর্শে এসেছিল।[২] বাঁকুড়া শহরের বড় কালীতলায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হরিসভার পাশে স্থাপিত হয়েছিল রামদাস (চক্রবর্তী) পালোয়ানের কুস্তির আখড়া। আখড়াটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হরিহর মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বাঁকুড়ার প্রথম সরকারি উকিল ও বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান। যে কোনওভাবেই হোক, রামদাস পালোয়ানের কুস্তির আখড়ার সঙ্গে যুগান্তর দলের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কথিত আছে, বিপ্লবী নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ একবার গোপনে বাঁকুড়ায় এসে হরিহর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে একরাত্রি অতিবাহিত করেছিলেন ও রামদাস পালোয়ানের কুস্তির আখড়ার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আন্দামান ফেরত নদিয়া জেলার যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবী বিভূতিভূষণ সরকার শেষ জীবনে বাঁকুড়ায় অবস্থানকালে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বর্তমান লেখককে বলেছিলেন যে, একবার তিনি বারীন ঘোষের চিঠি নিয়ে রামদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁর কাছে কোনও পিস্তল থাকলে তা তাঁকে দেওয়ার জন্য উক্ত চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু রামদাসের কাছে কোনও পিস্তল ছিল না। মেদিনীপুরের প্রখ্যাত বিপ্লবী সুকুমার সেনগুপ্ত প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সাম্প্রতিককালে গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী এক প্রবন্ধে লিখেছেন[৩] যে হরিহর মুখোপাধ্যায় ও রামদাস চক্রবর্তী মেদিনীপুরে ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বাসগৃহে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। উল্লেখ্য, বাঁকুড়া শহরের এ কুস্তির আখড়াটির সদস্যদের সকলেই ছিলেন যুগান্তর বিপ্লবী দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক।

সত্যেন্দ্রনাথ বোস (১৯০৮)
রানীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর গ্রামে যাতায়াত ছিল

তবে নিঃসন্দেহে এ জেলায় বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ধারা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন বিখ্যাত আলিপুর বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের গোস্বামী এ জেলার অম্বিকানগর পরগনার জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করেছিল। খাতড়া থানার মমিয়াড়া গ্রামে তাদের একটি কাছারিবাড়ি ছিল। জমিদারি দেখাশোনার সূত্রে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মমিয়াড়া গ্রামে যাতায়াত ছিল। নরেন গোঁসাই ছিলেন যুগান্তর নামক বিপ্লবী গোষ্ঠীর কর্মী। তাঁর সঙ্গে অম্বিকানগরের রাইচরণ ধবলদেবের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রাইচরণ অম্বিকানগরের প্রাক্তন রাজপরিবারের বংশধর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আঘাতে এই পরিবারটি জমিদারি বিচ্যুত হওয়ায় রাইচরণ ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। অতএব তিনি নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সংস্পর্শে এসে যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রানীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর গ্রামেও মেদিনীপুরের যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তখন ছেঁদাপাথর ছিল ঘন অরণ্যানীর অবগুণ্ঠনবতী ও হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল। মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্রের নিশানা স্থির করার শিক্ষা গ্রহণ ও বোমা তৈরির নিরাপদ স্থান হিসাবে এ অঞ্চলটিকে ব্যবহার করত। এখানে মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের নন্দ পদবীধারী এক দুর্ধর্ষ উৎকল ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের একটি কাছারি ছিল। গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পথে ছেঁদাপাথরের সঙ্গে হাঁটাপথে মেদিনীপুর জেলার গিধনি রেলস্টশনের যোগাযোগ ছিল। কথিত আছে এ পথ ধরে নন্দ জমিদারদের কর্মচারির ছদ্মবেশে মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা এখানে এসে আশ্রয় নিতেন। পরবর্তীকালে মেদিনীপুর জেলার রামগড় রাজ এস্টেট ও দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সীমানা

সংক্রান্ত মামলায় একজন সাক্ষী বলেছিলেন যে, স্পষ্টতই বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত রুক্মিণী রায় নামক জনৈক নন্দ জমিদারদের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে এখানে চাষাবাদ করতেন এবং ক্ষুদিরাম ও সত্যেন অর্থাৎ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এখানে আসতেন। শোনা যায়, সন্নিকটবর্তী ময়ূর পাহাড়ের জঙ্গলে বিপ্লবীরা পিস্তল থেকে গুলি চালনা শিক্ষা করতেন।

এই তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল কি না ও থেকে থাকলে সে যোগসূত্র কি ধরনের ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। অনেক পরবর্তীকালের রচনায় এই তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে যোগসূত্র ছিল বলে যে কথা বলা হয়েছে তার ভিত্তি জনশ্রুতিমূলক বা স্মৃতিচারণমূলক। এমন কি তথ্যসূত্র নির্দেশ না করে খাতড়ায় ও অম্বিকানগরে বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত ও প্রফুল্ল চাকি—এই তিনজন বিপ্লবীর আগমন ও অবস্থানের কথাও বলা হয়েছে।[৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের সেডিশন কমিটি রিপোর্টে বাঁকুড়া জেলার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার কোনও উল্লেখ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত নেই।

তবে নরেন গোঁসাই এই তিনটি কেন্দ্রের কথা জানতেন। কারণ, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মজফ্ফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির কিংসফোর্ড হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত আলিপুর বোমা মামলায় নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়ে বহু তথ্য প্রকাশ করে দিলে বাঁকুড়া শহরের কয়েক স্থানে খানাতল্লাসি হয় এবং রামদাস চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,[৫] সুরেন মণ্ডল প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। প্রমাণাভাবে মাস তিনেক কারাগারে আটক থাকার পর তাঁরা মুক্তি পান। ছেঁদাপাথরেও তল্লাসি হয়েছিল। কিন্তু আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি। অম্বিকানগরের রাজবাড়ির তল্লাসির জন্য রাঁচি থেকে ছোটনাগপুর থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর একটি দল খাতড়ায় এসে হাজির হয়। তখন কংসাবতী ও কুমারী নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। তাই নৌকায় নদী পারাপার সম্ভব ছিল না। ফলে পুলিশ দলটি খাতড়ায় আটকে পড়ে। অম্বিকানগর রাজপরিবারের আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করে পানু রজক নামে রাইচরণের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্যার প্রবল তাণ্ডব উপেক্ষা করে নদী সাঁতরে রাজবাটির ঘাটে এসে উপস্থিত হন। এভাবে রাইচরণ আগে থেকে সাবধান হওয়ার অবকাশ পান। পরে তাঁর খানাতল্লাসি হলে আপত্তিকর কিছু পাওয়া না গেলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশ্য প্রমাণাভাবে আদালতের বিচারে তিনি মুক্তি পান।[৬]

এরপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর এ জেলায় নতুন করে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা দেখা দেয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তারি পড়ার অজুহাতে বৈপ্লবিক অনুশীলন দলের সদস্য যোগেশচন্দ্র দে নামে এক যুবক সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়ে দল গঠনে তৎপর হন। যোগেশ দে এসেছিলেন চট্টগ্রাম জেলা থেকে। তিনি রাজগ্রামে 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরি' নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে কলকাতার সরস্বতী প্রেস প্রকাশিত ও সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পঠনপাঠন যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঁকুড়ায় ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া ত্যাগের আগে প্রফুল্লকুমার কুণ্ডু, সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও জয়কৃষ্ণ দাসকে নিয়ে এই জেলায় অনুশীলন দলের একটি গোষ্ঠী তৈরি করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৭]

এর কিছুকাল পর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারি গাঙ্গুলিকে নজরদারি হিসাবে বাঁকুড়া শহরের কালীতলায় বর্তমানে অবস্থিত পুলিশ মেস বাড়িটিতে রাখা হয়। তাঁর প্রভাবে সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও জয়কৃষ্ণ দাস যুগান্তর দলে যোগ দেন।[৮] এমন কি গান্ধীবাদী অমরকানন আশ্রমের প্রথম সারির কর্মী শিশুরাম মণ্ডল ও গান্ধীবাদী জেলা কংগ্রেসের খাদি প্রচার কর্মসূচির প্রধান কর্মী বিপিনবিহারি দাসও যুগান্তর দলের সদস্য হন। বাঁকুড়ার অসহযোগী স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ দাস লিখেছেন যে, বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান (বর্তমান খ্রিস্টান) কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অনিল দাসের মাধ্যমে শিশুরাম মণ্ডল বিপিনবিহারি গাঙ্গুলির সঙ্গে যোগাযোগক্রমে যুগান্তর দলের সদস্য হয়েছিলেন।[৯] অন্যদিকে, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের বিপ্লবী নেতা নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনবিহারি দাসের ম্যাজিক লণ্ঠনসহ বক্তৃতা শুনে তাঁকে তাঁর লাভপুর আশ্রম কেন্দ্রে নিয়ে যান। বিপিনবিহারি বীরভূম জেলার একাংশের বিশিষ্ট আন্দোলনকারীরূপে পরিচিত হন। নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিপিনবিহারি গাঙ্গুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এভাবে বিপিনবিহারি দাস যুগান্তর দলের সান্নিধ্যে আসেন।[১০]

যুগান্তর দলের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য শিশুরাম মণ্ডলের অনুরোধে বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি নজরবন্দী দশা থেকে মুক্তি পেয়ে কিছুকাল বাঁকুড়া জেলায় অবস্থান করেছিলেন। আট-নটি আখ পেষাই কল ভাড়া খাটাবার অছিলায় তিনি কিছুকাল রাধানগরে ছিলেন। এই সময়ে তাঁর কাজ ছিল কর্মী সংগ্রহ ও পাঁচালের জঙ্গলে আগ্নেয়াস্ত্র
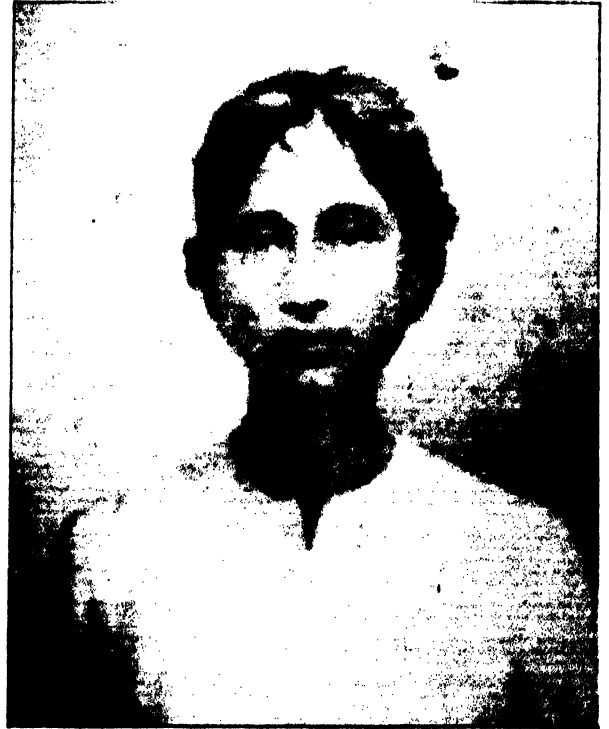
ক্ষুদিরাম বোস (১৯০৮)
ময়ূর পাহাড়ের জঙ্গলে পিস্তল থেকে গুলিচালনা শিখতেন

ব্যবহারের তালিম দান। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের সাধারণ বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ছিল না। এক-একজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর সাহায্যে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই যোগাযোগ রক্ষার কাজে শিশুরাম মণ্ডল কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ দাস বলেছেন, অহিংস কংগ্রেস আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি অমরকানন আশ্রমের কোনও কর্মীর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে এ ধরনের যোগাযোগ পুলিশের গোচরে এলে অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী কর্মীদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হবে। এরূপ আশঙ্কায় এই দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পিত হয়।[১১]

বাঁকুড়ায় প্রথমবার অবস্থানকালে এই জেলার যুগান্তর ও অনুশীলন দল দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিপিনবিহারি গাঙ্গুলির প্রয়াস ফলবতী হয়নি। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এই একই উদ্দেশ্যে তিনি বাঁকুড়ায় এসে শালতোড়ায় অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মীদের মিলনের জন্য একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। প্রফুল্ল কুণ্ডুর চেষ্টায় অনুশীলন দলের প্রাদেশিক স্তরের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলিও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোনও সুফল পাওয়া গেল না। বরং প্রাদেশিক স্তরের নেতাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হাতাহাতির ফলে এই বৈঠক পণ্ড হয়। এভাবে এই জেলার বিপ্লবী গোষ্ঠী দুটিকে সম্মিলিত করার জন্য বিপিন গাঙ্গুলির প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১২]

তাছাড়া ১৯২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দের কয়েকটি ঘটনায় যুগান্তর দলের সংগঠনও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গঙ্গাজলঘাটি থানায় সর্বপ্রথম চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু আন্দোলনের নেতাদের না ঘাঁটিয়ে সাধারণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চৌকিদারি কর আদায় দিতে অস্বীকার করার অপরাধে রামচরণ কুম্ভকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালতের বিচারে তিনি এক মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এ ধরনের কারাদণ্ডের ঘটনায় জনগণ যাতে ভীত না হয় ও এই কারাদণ্ডকে যাতে তারা সম্মানজনক মনে করে এ দণ্ড গ্রহণে আগ্রহী হয়, সেজন্য জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার দিন রামচরণকে পুরোভাগে রেখে বাঁকুড়া শহরে এক বিরাট শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং বিভিন্ন গ্রামে তাঁকে পুষ্পমাল্য ভূষিত করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। গঙ্গাজলঘাটি গ্রামে প্রাদেশিক নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এই জনসভায় বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। এই জনসভায় শিশুরাম মণ্ডল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন তা রাজদ্রোহিতামূলক বিবেচিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সভায় বক্তৃতা দানের অব্যবহিত পরেই শিশুরাম রিভলবার নিয়ে অনুশীলনের জন্য মাতমৌলির জঙ্গলে চলে গেলেও শীঘ্রই তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ও আট মাস মেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।[১৩] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপিনবিহারি দাসকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁকে আড়াই বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। বিপ্লবী সন্দেহে এ জেলার লবণ সত্যাগ্রহীদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই সর্বোচ্চ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।[১৪] শিশুরাম ও বিপিনবিহারি কারারুদ্ধ হওয়ার পর বাইরে ছিলেন জয়কৃষ্ণ দাস। কিন্তু তিনি যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ায় কোনও সক্রিয় ভূমিকা আপাতত তাঁর ছিল না।[১৫] এভাবে এই জেলায় যুগান্তর দলের সংগঠন খুব ধাক্কা খায়।

তবে যুগান্তরগোষ্ঠী শীঘ্রই সাময়িক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে। বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি রাধানগরে থাকাকালীন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন স্থানীয় যুবক শিশুরাম মণ্ডলের প্রভাবে যুগান্তর দলের প্রতি আকৃষ্ট হন ও সক্রিয়ভাবে এই দলে যোগ দেন। তাঁদের যোগাযোগের একটি আস্তানা ছিল বেলিয়াতোড়ের দাশরথি মিত্রের গৃহ। আলোচনার জন্য চট্টগ্রাম থেকে আগত বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে এখানেই পরামর্শ হত।[১৬] এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বিষ্ণুপুর শহরের বিমল সরকার, সিদ্ধেশ্বর সাঁই, ষষ্ঠীদাস সরকার, প্রাক্তন মল্ল রাজপরিবারের সন্তান বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব, জয়পুরের বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী। বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব তখন বাঁকুড়া ওয়েশলিয়ান কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিমল সরকার কলকাতায় পড়তেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি, সিদ্ধেশ্বর সাঁই ওকালতি। বরিশালের বিপ্লবী সুরেন সরখেল, বাঁকুড়ার ষষ্ঠী সরকার, বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে অবস্থিত এক লজেন্সের দোকানে মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে কর্মপন্থা নিয়ে বিপিনবিহারি গাঙ্গুলির সঙ্গে আলোচনা করতেন। একবার এরূপ আলোচনা চলাকালীন পুলিশ এসে হাজির হয়। তবে পেছনের রাস্তা দিয়ে সকলে পালাতে সক্ষম হন। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সাঁই পালাবার সুযোগ না পেয়ে চাকরের ছদ্মবেশ ধারণ করে কোনওরকমে নিষ্কৃতি পান।[১৬]

ষষ্ঠী সরকার ও মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় জয়পুর থানার শ্যামনগর গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রশস্তি ও এই জেলায় অনুরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজন বুঝিয়ে প্রচারপত্র বিলি করতে থাকেন। এই সময়ে বরিশালের কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে পরামর্শ করে গড়বেতার বেঙ্গল কোল কোম্পানির টাকা লুটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কাজে সফলতার পরেই বিষ্ণুপুরের কাছে অবস্থিত একটি ডাক লুণ্ঠনের কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এর কয়েকদিন পরেই মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল সরকার কাঞ্চনপুর মেল ডাকাতি নামে পরিচিত ডাক লুট সম্পন্ন করেন। প্রায় দেড় হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়েছিল। সুব্রত রায় এই ঘটনার তারিখ দিয়েছেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর।[১৭] এরপর জয়পুর মেল ডাকাতির মাধ্যমে লুট হয় প্রায় দু-হাজার টাকা। তাছাড়া এই সময়ে রাইপুরের সার্কেল অফিসারের একটি রিভলবার ও একটি বন্দুক ছিনতাই হয়েছিল। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল।[১৮]

কলকাতার একটি হোটেলে আহার গ্রহণের পর দাম মেটানোর জন্য লুণ্ঠিত টাকা থেকে একশো টাকার কাটা নোট চালাতে গিয়ে সুরেন সরখেল পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তার ভিত্তিতে পুলিশ সুরেন সরখেল, রাজেন্দ্র চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিম চৌধুরীর বিরুদ্ধে বরিশাল কোর্টে আন্তঃবিভাগীয় ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। প্রমাণাভাবে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিম চৌধুরী অব্যাহতি পান।[১৯] সুব্রত রায় লিখেছেন, কাঞ্চনপুর ডাক লুট ঘটনায় সুরেন সরখেল, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। জয়পুর ডাক

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মজফ্ফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির কিংসফোর্ড হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত আলিপুর বোমা মামলায় নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়ে বহু তথ্য প্রকাশ করে দিলে বাঁকুড়া শহরের কয়েক স্থানে খানাতল্লাসি হয় এবং রামদাস চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,[৫] সুরেন মণ্ডল প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। প্রমাণাভাবে মাস তিনেক কারাগারে আটক থাকার পর তাঁরা মুক্তি পান। ছেঁদাপাথরেও তল্লাসি হয়েছিল। কিন্তু আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি।

লুটের মামলাতেও এই তিনজনকেই গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিল।[২০] রামকৃষ্ণ দাস লিখেছেন, বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব বিষ্ণুপুর রাসমঞ্চে একত্রিত বিগ্রহসমূহের গায়ের অলংকার খুলে নেওয়ার পর বিষ্ণুপুরের অন্যান্য অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। এই মামলায় নিম্ন আদালতে তিনটি ধারায় মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদি কারাদণ্ড এবং বিমল সরকার, সিদ্ধেশ্বর সাঁই, ষষ্ঠীদাস সরকার, দিবাকর দত্ত, সুধাংশু দাশগুপ্ত ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেবের চার থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি কারাদণ্ড হয়। আপিলের রায়ে স্থির হয় যে, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচ বছর ও দশ বছরের কারাদণ্ড দুটি একই সঙ্গে চলবে ও দশ বছরের মেয়াদ হবে সাত বছর। বাঁকুড়া জেলায় রাজনৈতিক মামলার এটাই ছিল সর্বোচ্চ দণ্ড।[২১] রামকৃষ্ণ দাস বলেছেন, বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী তাঁতিপুকুড় মেল ডাকাতির পর হয়েছিল কাঞ্চনপুর মেল ডাকাতি।[২২-২৩] অন্যদিকে বীরেশ্বর ঘোষ লিখেছেন, তাঁতিপুকুরের জঙ্গলে মেল ডাকাতি হয়েছিল কাঞ্চনপুর মেল ডাকাতির কয়েক মাস পরে।[২৩] কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত ও বিমল সরকার আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক নেপাল সেনকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবীরা। এই সিদ্ধান্ত ছিল বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি ও শিশুরাম মণ্ডলের। উভয়েই তখন ছিলেন আত্মগোপন অবস্থায়।[২৪] রামকৃষ্ণ দাস নেপাল সেনকে 'কুখ্যাত' বলে অভিহিত করেছেন।[২৫] তাঁর সম্পর্কে বীরেশ্বর ঘোষ লিখেছেন নেপাল সেন আগে খুব সম্ভবত কুমিল্লায় ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন বিপ্লবীদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করতেন বলে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। অতএব তাঁকে বিষ্ণুপুরে বদলি করা হয়। এখানেও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল কঠোর। তাই তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। নেপাল সেনকে হত্যার দায়িত্ব পড়েছিল বিমল সরকার ও বীরেশ্বর ঘোষের উপর। কিন্তু তাঁরা বিষ্ণুপুরের তুর্কির জঙ্গলে রাত্রিকালে একটি স্বয়ংক্রিয় ন-চেম্বারের রিভলবার থেকে গুলি চালনা শিক্ষা করে ঘরে ফেরার সময় একজন চৌকিদার ঘটনাটি টের পায় ও পরদিন বিষ্ণুপুর থানায় তা জানিয়ে দেয়। মনে হয় এজন্য কিছুকাল পরে নেপাল সেনকে হত্যার পরিকল্পনা বাতিল করে কলকাতা থেকে নির্দেশ আসে। ফলে নেপাল সেনের উপর কোনও আক্রমণ হয়নি।[২৬] মিহির রায়ও লিখেছেন, জানাজানি হয়ে যাওয়ায় নেপাল সেন হত্যার পরিকল্পনা বাতিল হয়েছিল।[২৭] কিন্তু বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে অন্য কথা বলা হয়েছে। গেজেটিয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী প্রহরীদের সতর্ক নজরদারি ফলে রাত্রিকালে তাঁর বাংলোতে বিপ্লবীদের প্রবেশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।[২৮] ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তরগোষ্ঠীর বিপ্লবীরা কোতুলপুর থানার মির্জাপুর গ্রামে একটি মেল ডাকাতিতে সফল হয়েছিল।[২৯]

এদিকে শালতোড়া ব্যর্থতার পর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ায় অনুশীলন দলকে সুসংগঠিত করার জন্য দলনেতা চারুবিকাশ দত্তকে এক পত্র লেখেন। চারুবিকাশ দত্ত তখন ছিলেন কলকাতায়। তিনি প্রফুল্ল কুণ্ডুর অনুরোধে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রাম থেকে নীরদবরণ দত্তকে এই উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ায় পাঠান। তিনি মালিয়াড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষকের চাকরি গ্রহণ করে প্রভাকর বিরুণী ও বিজয় তেওয়ারীকে বৈপ্লবিক মতাদর্শে দীক্ষা দেন।[৩০] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নীরদবরণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে মালিয়াড়া বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মালিয়াড়ায় ফিরে এলেও দলের নির্দেশে আকস্মিকভাবে চট্টগ্রামে ফিরে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রভারকর বিরুণী ও বিজয় তেওয়ারি এ অঞ্চলে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পুলিশ প্রভাকর বিরুণীর ঘর তল্লাসি করে একটি রিভলবার পায় ও তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি আদালতের রায়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। শোনা যায়, পুলিশ জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে রিভলবারটি ফেলে দিয়ে তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।[৩১] প্রভাকর বিরুণী আন্দামানে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় অনুশীলন দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারানাথ লাহিড়ি গান্ধীবাদী নেতা ঋষি নিবারণ দাশগুপ্তের পুত্র বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ও বীররাঘব আচারিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্য পুরুলিয়া আসেন। তখন তিনি ছিলেন নজরবন্দী অবস্থায় পলাতক। এ জন্য তখন তাঁর পক্ষে নিরাপদ স্থান হিসাবে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল। তারপর তাঁরা তিনজন বেতুড়ে জগদীশচন্দ্র পালিতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুব্রত রায় লিখেছেন, বেতুড়ের পালিত পরিবারের সদস্যগণ গান্ধীবাদী ও অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেও অন্যান্য গান্ধীবাদীদের চেয়ে তাঁদের প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। তাঁরা জাতীয় আন্দোলনে অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি সশস্ত্র বিপ্লববাদী গোষ্ঠীর কর্মীদের সঙ্গেও সহযোগিতা

করতেন। তাই অন্যান্য অহিংস কর্মীদের সম্বন্ধে পুলিশের উচ্চ মহলের সিদ্ধান্ত প্রায় সঠিক বলে প্রমাণিত হলেও তৎকালীন রাজনীতির এলোমেলো অবস্থায় জগদীশ পালিতের মতো দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু গরমিল পরিলক্ষিত হত।[৩২]

উপরোক্ত পটভূমিকায় নীরদবরণ দত্ত পুনরায় চট্টগ্রাম থেকে বাঁকুড়ায় আসেন। তিনি প্রফুল্ল কুণ্ডুকে সঙ্গে নিয়ে বেতুড়ে গিয়ে তারানাথ, বিভূতিভূষণ ও বীররাঘবের সঙ্গে মিলিত হন। এখানে তাঁরা বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বীররাঘব তারানাথকে একটি চিঠি দিয়ে কটক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক ছাত্রের কাছে পাঠান। ছাত্রটির বাড়ি ছিল বালেশ্বরে। তারানাথ বালেশ্বর যাওয়ার পথে বাঁকুড়া রেল স্টেশনে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। অপর চারজন বেতুড় থেকে পলায়ন করেন। সুতরাং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারল না।[৩৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত দুই পলাতক আসামী সীতানাথ দে ও নিরঞ্জন ঘোষাল গোপনে বেতুড়ে এসে জগদীশ পালিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের বেতুড় আগমনের খবর জানতে পেরে পূর্ব-পরিকল্পনা মতো তাঁদের পাত্রসায়ের রেল স্টেশনে গ্রেপ্তার করে।[৩৪]

১৯৩০-এর দশকের গোড়ার বছরগুলিতে এই জেলায় অনুশীলন দলের বিপ্লবীদের সক্রিয়তাও নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁরা মেদিনীপুর-বাঁকুড়া সীমান্তে একটি মেল ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে গোয়েন্দা পুলিশ মেদিনীপুর-বাঁকুড়া পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্টকে সতর্ক করে দেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অধঃস্তন সহকর্মীদের সতর্ক করে দেন। ফলে অনুশীলন দলের বিপ্লবীরা বুঝতে পারেন যে, তাঁদের গোপন পরিকল্পনা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরাও সতর্ক হয়ে যান এবং যে দু-চারজন অহিংস সংগ্রামীদের খুব বিশ্বাস করতেন, তাঁরা তাঁদের সংস্রব সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন। বছরখানেক নিষ্ক্রিয় থাকার পর তাঁরা আবার আকস্মিকভাবে বাঁকুড়া-দামোদর রেলে একটি মেল ডাকাতি করেন।[৩৫]

এ সময়ে অনুশীলন দলের পক্ষ থেকে বাংলার সব জেলায় একটি গোপন বুলেটিন বিলি করা হয়। বুলেটিনটিতে একটি রিভলবারের ছবি অঙ্কিত ছিল। তাতে ভারত জুড়ে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান ছিল। এই সময়ে মেদিনীপুর জেলার হুমগড়ের ছেলে পার্বতী বসু ছিলেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের ছাত্র। তিনি কলেজ ছাত্রাবাসে থাকতেন। তিনি ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য। বাঁকুড়া শহরের পশ্চিম অংশে, বিশেষ করে মেডিক্যাল স্কুল ও মিশনারি কলেজের প্রাচীর গাত্রে ও বুলেটিন সাঁটানোর দায়িত্ব পড়ে তাঁর উপর। লোকপুর-কেন্দুয়াডিহি-নূতনচার্চ অঞ্চলে এ কাজ সেরে কলেজের কাছে এলে পুলিশ তা বুঝতে পারে। পার্বতী বসু গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য কোনক্রমে হস্টেলে প্রবেশ করেন। ঘটনাটি ঘটেছিল রাত্রিকালে। কলেজের অধ্যক্ষ রেভাঃ এ ই ব্রাউন রাত্রে পুলিশকে হস্টেলে প্রবেশ করতে দেননি। পরদিন তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিচারে তিনি তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। পরে টাইফয়েড জ্বরে তাঁর মৃত্যু ঘটে।[৩৬]

ইতিমধ্যে অনুশীলন দলের কর্মীগণ বাঁকুড়ায় কয়েকটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। এগুলির মধ্যে 'সাহিত্য মন্দির' নামে পরিচিত ও নূতনগঞ্জের পুরনো ব্যায়ামাগারে স্থাপিত গ্রন্থাগারটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নীরদবরণ দত্ত ও মতিপ্রভা দেবী। এ দুজনের প্রধান কাজ ছিল অনুশীলন দলের কর্মী সংগ্রহ। তারানাথ লাহিড়ি যখন পলাতক, পুরুলিয়া থেকে বীররাঘব আচারিয়া ও বিভূতি দাশগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন, তখন তাঁরা নীরদবরণ ও মতিপ্রভার সহায়তায় একটি সাবানের কারখানায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। এই সাবানের কারখানা থেকেই বিপ্লবী চারুবিকাশ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।[৩৭]

এই জেলায় বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের অন্য যেসব ঘটনার কথা জানা যায় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত শচীন্দ্রনাথ সান্যালের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার মামলা। বাঁকুড়ার আদালতে অনুষ্ঠিত এটাই হল প্রথম রাজনৈতিক মামলা। শচীন সান্যাল ছিলেন বারাণসীর বিখ্যাত বিপ্লবী। তিনি ছিলেন অনুশীলন গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি বাঁকুড়ায় এসে ডাকযোগে রাজদ্রোহিতামূলক প্রচারপত্র বিতরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। Bengal Criminal Law Amendment Act, 1925, অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কথিত আছে, তাঁর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের সাক্ষী ছিলেন 'রায়বাহাদুর' খেতাবধারী একজন সরকারি উকিল। বিচারে তাঁর দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।[৩৮]

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে খাতড়া থানার সিমলাবাঁধ গ্রামের রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহতল্লাসি করে পুলিশ একটি একঘড়া রিভলবার পায়। তাঁকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হয়।[৩৯] ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কারখানায় বিপ্লবীদের একটি আগ্নেয়াস্ত্র মেরামত ও কার্তুজ তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগে একজন কর্মকারকে তাঁর কামারশালে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর নাম ভবতোষ কর্মকার। বীরেশ্বর ঘোষের গ্রন্থে তিনি ভব কর্মকার ও মল্লযুগের কর্মকারদের আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ তৈরির কলাকৌশল ও দক্ষতার উত্তরাধিকারি বলে উল্লিখিত। তিনি ছিলেন অনুশীলন দলের সদস্য। তাঁকেও পাঁচ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে চালান দেওয়া হয়।[৪০] ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মীরা মিলিতভাবে বাংলার ছোটলাট জন অ্যান্ডারসনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন বলে জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে।[৪১] অন্য সূত্রে জানা যায়, অ্যান্ডারসন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন।[৪২] যাই হোক, এই পরিকল্পনা কার্যকর হতে পারেনি। এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে চোদ্দজন বিপ্লবী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে পাত্রসায়ের রেল স্টেশনে সীতানাথ দে ও নিরঞ্জন ঘোষালের গ্রেপ্তারের ঘটনার পর পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে খবর পেয়ে সিমলাপালে একটি ছোটখাটো অস্ত্র তৈরির কারখানা আবিষ্কার করে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। কারখানাটিতে বন্দুকের গুলি ও রিভলবারের বুলেট তৈরি হত। এই

জনসাধারণ ছিল সাধারণভাবে অশিক্ষিত। তাই এই জেলায় পুলিশের বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগের, পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকজন রাখা হত না। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনুশীলন, যুগান্তর ইত্যাদি গোষ্ঠীর কর্মীগণ এ জেলাকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নেন। এখানে কোনও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার কোনও উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। সে ধরনের কোনও চেষ্টাও তাঁরা এ জেলায় করেননি। তাঁরা শুধু এখানে বসে বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতেন।

ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকায় নারায়ণচন্দ্র দাস ও রেবতীমোহন দাস নামক দুজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। মামলায় উভয়ের সাত বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড ও তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু দ্বীপান্তরিত হওয়ার আগেই ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারি আদেশে তাঁদের শাস্তি মকুব করা হয়।[৪৫]

সিমলাপালে অস্ত্র তৈরির কারখানা আবিষ্কারের মাসতিনেক পর গঙ্গাজলঘাটি থানার বড়শাল গ্রামের হৃষীকেশ কর্মকারকে বেআইনি অস্ত্র তৈরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। হৃষীকেশ কর্মকারের এক ভাই তখন মালিয়াড়া স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সন্দেহবশে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণাভাবে উভয় ভ্রাতাই মুক্তি পেয়েছিলেন। এরপর তল্লাসির সূত্র ধরে অনুশীলন দলের বিপ্লবী ছাত্র যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়।[৪৬]

খাতড়া থানায় গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর রায় নামে দুই অন্য জেলার দুই বিপ্লবীকে ও রাইপুর থানায় রাসবিহারী চক্রবর্তী নামে আর একজন জেলান্তরের বিপ্লবীকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের চেষ্টায় দক্ষিণ বাঁকুড়ায় যুগান্তর দলের একটি ছোটখাটো ঘাঁটি তৈরি হয়। বহিরাগত এই তিনজন পূর্বপরিচিত ছিলেন। তাঁরা বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলের ক্যাশ লুণ্ঠনের এক পরিকল্পনা করেন। তাঁদের নেতা ছিলেন রমেশচন্দ্র চৌধুরী। তিনিও ছিলেন বহিরাগত ও তালডাংরা থানায় ডেটিন্যু বা নজরবন্দী। গোপালকৃষ্ণ, অমর ও রাসবিহারী তাঁদের পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য রমেশ চৌধুরীর সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর রায়কে হঠাৎ হিজলি জেলে স্থানান্তরিত করায় ক্যাশ লুঠের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।[৪৭]

অমর ও গোপালের জায়গায় নতুন দুজন বহিরাগত নজরবন্দী আসেন। জেলায় আটক বহিরাগত ডেটিন্যুরা বাঁকুড়ার বিপ্লবীদের সহযোগিতায় এখানে তিনটি ব্যায়ামাগার, পাঁচটি ক্লাব ও বহু গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। বাঁকুড়ার বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন রামসত্য মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব, ষষ্ঠীদাস সরকার, বীরেশ্বর ঘোষ, রামকৃষ্ণ দাস। শালতোড়া স্কুলের শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে জয়কৃষ্ণ দাস বাঁকুড়া শহরে বাস করছিলেন। তিনি অনুশীলন দলের বিপ্লবী হলেও যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবী বীরেশ্বর ঘোষের সঙ্গে এই সময়ে তাঁর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল। বীরেশ্বর ঘোষ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেডমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী গ্রেপ্তার হন।[৪৮]

১৯২৪—৩৪ খ্রিস্টাব্দ এক দশককাল সময়ে গোয়েন্দা বিভাগ বিপ্লবী কর্মী বা বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমন সন্দেহে যেসব ছাত্র ও যুবকের উপর বিশেষ নজর রাখত সুব্রত রায় তাঁর গ্রন্থে তাঁদের একটি তালিকা দিয়েছেন।[৪৯] এ তালিকা অনুযায়ী তাঁরা হলেন : (১) বিষ্ণুপুরের দেবব্রত রাহা। বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজ থেকে বি এ পাস করেছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আটক হয়েছিলেন। (২) বিষ্ণুপুরের সিদ্ধেশ্বর সাঁই। তিনিও বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজ থেকে বি এ পাস করেছিলেন। তাঁকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আটক করা হয়েছিল। (৩) বিষ্ণুপুরের পুরনো কিল্লার বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব ছিলেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের ছাত্র। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। (৪) বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি বিশ্বাসপাড়ার রামসত্য মুখোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। (৫) বিষ্ণুপুরের বিমলচন্দ্র সরকার ডাক লুঠের মামলায় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, ছাড়া পান ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। (৬) ওন্দা থানার সাপুর গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ও ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ডাক লুঠের মামলায় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। (৭) বরিশালের সুরেন সরখেল, বিমল সরকার ও মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই মামলায় জড়িত ছিলেন। (৮) বিষ্ণুপুরের হাজরাপাড়ার বিমল আইকতের কাছ থেকে একটি রিভলবার পাওয়া গিয়েছিল। (৯) বাঁকুড়া শহরের বীরেশ্বর ঘোষ ১৯৩৩—৩৫ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে ছিলেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের ছাত্র। পুলিশ তাঁকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আটক করেছিল। (১০) ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থানার অমিয় ভট্টাচার্য বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। (১১) বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত তাতাকুল গ্রামের ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি সব সময় অনুশীলন দলের ডেটিন্যুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। (১২) রানীবাঁধ থানার রাজাকাটা গ্রামের মদনমোহন চৌধুরী বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁরও অনুশীলন দলের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ ছিল। (১৩) চট্টগ্রাম জেলার চীনাবাজারের নারায়ণ

চৌধুরী খুবই অপ্রাপ্ত বয়সে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া বোর্স্টাল ইনস্টিটিউট থেকে মুক্তি পেয়ে কিছুকাল বাঁকুড়া শহরে অবস্থান করেছিলেন। (১৪) চট্টগ্রাম শহরের অপ্রাপ্তবয়স্ক অনিলবন্ধু দাস চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দণ্ডিত হয়ে বাঁকুড়া বোর্স্টাল ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ছাড়া পেয়েছিলেন ও তারপর কিছুকাল বাঁকুড়া শহরে অবস্থান করেছিলেন। (১৫) বিষ্ণুপুরের ছাত্র তারাপদ মুখোপাধ্যায় অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন। (১৬) হাওড়া জেলার আমতা থানার নাড়িত গ্রামের শান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া ওয়েসলিমান কলেজের ছাত্র ও অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল পাওয়া যাওয়ায় তিনি পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। (১৭) অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে মেদিনীপুর জেলা থেকে বহিষ্কৃত ছাত্র শৈলেন্দ্রনাথ সরকার বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজে এসে ভর্তি হয়েছিলেন। (১৮) মেদিনীপুর জেলার রাঙ্গাহাতি গ্রামের সত্যেন্দ্রনাথ দে অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন. (১৯) গড়বেতার শশাঙ্কশেখর দাস যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজে ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। (২০) বর্ধমান জেলার আসানসোল শহরের গোকুলকৃষ্ণ পাল (ছাত্র) বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। (২১) বিষ্ণুপুর শহরের ছাত্র ষষ্ঠীদাস সরকার যুগান্তর দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আটক হন। (২২) জয়পুর থানার কাশীপুর গ্রামের অধিবাসী ও বিষ্ণুপুর শহরের ছাত্র বঙ্কিম চৌধুরী যুগান্তর দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনিও আটক হয়েছিলেন। (২৩) বিষ্ণুপুর স্কুলের ছাত্র দেবীদাস বিশ্বাস বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন ও আটক হয়েছিলেন। (২৪) মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার আনন্দপুর থানার বিজনবিহারি বাগ বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছিলেন। (২৫) বর্ধমান জেলার কালনার শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। (২৬) ঢাকা জেলার ভাটাপাড়া গ্রামের অনিল দাশগুপ্ত ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের ছাত্র ছিলেন। অনুশীলন দলের সক্রিয় কর্মী ও দল গড়ার কাজে বিশেষ পারদর্শী। তিনিও পরে আটক হয়েছিলেন। (২৭) মালিয়াড়া স্কুলের ছাত্র বিমলেশ নন্দী নীরদবরণ দত্তের প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। (২৮) বড়জোড়া থানার নারিচা গ্রামের বিজয়চন্দ্র তেওয়ারি মালিয়াড়া থানার ছাত্র থাকাকালীন নীরদবরণ দত্তের প্রভাবে অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছিলেন। (২৯) নীরদবরণের প্রভাবে মালিয়াড়া গ্রামের দ্বিজপদ ভট্টাচার্যও অনুশীলন দলভুক্ত হয়েছিলেন। (৩০) মালিয়াড়া গ্রামের পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়কে প্রভাকর বিরুনী অনুশীলন দলে টেনেছিলেন। (৩১) বাঁকুড়া শহরের পাঠকপাড়া পল্লীর মদনমোহন ভট্টাচার্য ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলে যোগ দিয়েছিলেন। (৩২) বাঁকুড়া থানার কুমিদ্যা গ্রামের যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। (৩৩) প্রফুল্ল কুণ্ডুর প্রভাবে শালতোড়া থানার তিলুড়ি গ্রামের জয়ন্তকুমার রায় তিলুড়ি স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন

বিষ্ণুপুরের বিমলচন্দ্র সরকার ডাক লুঠের মামলায় পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন

অনুশীলন গোষ্ঠীর সামিল হয়েছিলেন। (৩৪) চট্টগ্রামের আর একজন বিপ্লবী নীরদবরণ রায় মালিয়াড়া স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাঁকুড়া জেলায় অনুশীলন সমিতির অন্যতম সংগঠক। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি দলের নির্দেশে চট্টগ্রামে চলে যান। পরে আবার ফিরে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত রানীগঞ্জ বল্লভপুর কাগজ কারখানার শ্রমিকদের এক সভায় বক্তৃতা করেছিলেন বিনয় সেন ও ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতার ফলে বাঁকুড়া জেলার গোয়েন্দা বিভাগ এক বেসামাল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কারণ ছিল লোকবলের অভাব। তখন জেলার বিভিন্ন থানা এবং অন্যান্য জেলার উনত্রিশজন ডেটিন্যুকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রামের লোক এবং হয় অনুশীলন সমিতি অথবা যুগান্তর দলভুক্ত। ওয়েসলিয়ান কলেজ ও সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলে অন্য জেলা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বেশ কয়েকজন বিপ্লবী ছাত্র হিসাবে পড়াশুনা করছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের জোর হাওয়ায় তখন রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বরিশাল রীতিমতো উত্তাল। বিপ্লবী যুবকগণ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছিলেন। তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম।[৮]

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ ও ২৩ জুন বগুড়ার যতীন্দ্রমোহন রায়ের সভাপতিত্বে বিষ্ণুপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন জেলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ

জুগিয়েছিল। এই রাজনৈতিক সম্মেলনে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনের সময় ২৩ ও ২৪ জুন একটি ছাত্র এবং যুব সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ছাত্র ও যুব সভায় বাংলার সব জেলা থেকে ছাত্র ও যুব প্রতিনিধিগণ যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে বাঁকুড়া জেলার প্রথম সারির গান্ধীবাদী নেতা গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, সুশীলচন্দ্র পালিত প্রমুখের অনুগামীদের কোনও স্থান ছিল না। এই সম্মেলনে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, শ্রীসংঘ ও বামপন্থী (সমাজতন্ত্রবাদী) ছাত্র-যুবদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তেমনই কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলনেও বিপ্লববাদী ও বামপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। তাই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অনুগামীরা যথেষ্ট সংখ্যায় এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকেও সম্মেলনে সুবিধা করতে পারেননি। এই রাজনৈতিক সম্মেলন ও ছাত্র-যুব সম্মেলনের পটভূমিকায় জগদীশচন্দ্র পালিত, রামকৃষ্ণ দাস, হরিগোপাল চৌধুরী, মানিকলাল সিংহ, বীরেশ্বর ঘোষ প্রমুখ বিপ্লববাদীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সভা-সমিতি করেছেন, কৃষক সমিতি গড়েছেন, নৈশ বিদ্যালয় চালিয়েছেন, শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস পেয়েছেন।[৩৯]

পুলিশ বিভাগের ব্যবহারের জন্য ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক সরকারি গোপনীয় গ্রন্থে এই জেলায় সক্রিয় বিপ্লবীদের নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়।[৪০]

(১) মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগান্তর) কাঞ্চনপুর ডাক লুঠের মামলায় ৩০-৮-১৯৩৪ তারিখে বাঁকুড়ার স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (২) অশোকানন্দ বসু (শ্রীসংঘ) ৩০-৯-১৯৩০ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ৯-৯-১৯৩৩ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন। (৩) বাকিরা সদানন্দ ভট্টাচার্য (অনুশীলন) ১৮-৯-১৯৩৩ তারিখে আড়াই বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন ও ৭-৪-১৯৩৫ তারিখে মুক্তি পেয়েছিলেন। (৪) প্রভাকর বিরুনী (অনুশীলন) অস্ত্র রাখার অভিযোগে ২৩-১২-১৯৩৪ তারিখে তিন বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (৫) বিষ্ণুপুরের দেবীদাস বিশ্বাস (অনুশীলন) ২-৫-১৯৩৪ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ৪-৮-১৯৩৭ তারিখে ছাড়া পেয়েছিলেন। (৬) কোতুলপুরের বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী (যুগান্তর) ১-৫-১৯৩৪ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ২৩-২-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ছাড়া পান। (৭) লক্ষ্মীসাগরের নরেশচন্দ্র দাস কার্তুজ রাখার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে ২৩-২-১৯৩৪ তারিখে তিন বছর মেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (৮) রামকৃষ্ণ দাস, রামপুর, বাঁকুড়া (সন্দেহভাজন কমিউনিস্ট)। (৯) সুধাংশু দাশগুপ্ত, দোলতলা, বিষ্ণুপুর (যুগান্তর) ১৯-৪-১৯৩৪ তারিখে পাঁচ বছর মেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ৯-৭-১৯৩৮ তারিখে মুক্তি পেয়েছিলেন। (১০) দেবব্রত দাস রাহা, বিষ্ণুপুর (এ আর জি) ১০-৮-১৯৩৫ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ১৮-১০-১৯৩৭ তারিখে মুক্তি পেয়েছিলেন। (১১) দিবাকর দত্ত (অনুশীলন) ২৯-৮-১৯৩৩ তারিখে চার বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ২-৮-১৯৩৮ তারিখে ছাড়া পান। (১২) রমেন্দ্র দত্ত, বেলিয়াতোড়, (সন্দেহভাজন কমিউনিস্ট)। (১৩) দিনেশচন্দ্র রায়, রসিকগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, (সন্দেহভাজন অনুশীলন)। (১৪) তিনকড়ি গাঙ্গুলি, রাধানগর, (হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি) ২৭-১২-১৯৩২ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ২০-২-১৯৩৩ তারিখে ছাড়া পান। (১৫) বীরেশ্বর ঘোষ (যুগান্তর) ২৫-৫-১৯৩৫ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ৩-৩-১৯৩৮ তারিখে ছাড়া পান। (১৬) ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, কেরানিবাজার, বাঁকুড়া, (শ্রীসংঘ) ১৯-২-১৯৩৭ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ২১-৬-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ছাড়া পান। (১৭) প্রমথনাথ ঘোষ (অনুশীলন) ২৫-৫-১৯৩৫ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ২-৩-১৯৩৮ তারিখে ছাড়া পান। (১৮) ভবতোষ কর্মকার, বিষ্ণুপুর, (যুগান্তর), কার্তুজ রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে ৩-৪-১৯৩৪ তারিখে পাঁচ বছর মেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (১৯) গোবিন্দ কর্মকার, বিষ্ণুপুর, (সন্দেহভাজন যুগান্তর)। (২০) প্রফুল্লচন্দ্র কুণ্ডু (অনুশীলন) ২৩-১০-১৯৩৫ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ২৮-৮-১৯৩৮ তারিখে মুক্তি পান। (২১) গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মুকুটগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, (সন্দেহভাজন কমিউনিস্ট)। (২২) শিশুরাম মণ্ডল (যুগান্তর) ও বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী (যুগান্তর) উভয়েই অন্তরীণ ছিলেন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত। (২৩) নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, কেশিয়াকোল, (যুগান্তর) আটক ছিলেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই পর্যন্ত। (২৪) রামসত্য মুখোপাধ্যায়, বিশ্বাসপাড়া, বিষ্ণুপুর, (অনুশীলন) অন্তরীণ ছিলেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন পর্যন্ত। (২৫) দেবাদিদেব দে, রাইপুর, (যুগান্তর) আটক ছিলেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন পর্যন্ত। (২৬) সিদ্ধেশ্বর সাঁই বিষ্ণুপুর, (যুগান্তর) ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২ মে থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত আটক ছিলেন। (২৭) বিমল সরকার, বিষ্ণুপুর, (যুগান্তর), ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল ডাক লুঠ মামলায় পাঁচ বছর মেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (২৮) দেবেন্দ্রনাথ সরকার, বাঁকুড়া (যুগান্তর), ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আটক ছিলেন। (২৯) যতীদাস সরকার, বিষ্ণুপুর, (যুগান্তর), ২-৫-১৯৩৪ থেকে ১৪-৬-১৯৩৮, পর্যন্ত আটক ছিলেন। (৩০) মানিকলাল সিংহ, জয়কৃষ্ণপুর, (অনুশীলন) ১০-৬-১৯৩৬ থেকে ২৩-১২-১৯৩৭ পর্যন্ত আটক ছিলেন। (৩১) বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব, বিষ্ণুপুর, (যুগান্তর) ২-৩-১৯৩৪ থেকে ১২-৬-১৯৩৮ পর্যন্ত আটক ছিলেন।

এই জেলার সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সুব্রত রায় লিখেছেন[৪১], বিশ শতকের বিশের দশকে বাঁকুড়া জেলার বহু অঞ্চল ছিল ঘন অরণ্যাবৃত। সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। অনেক জায়গাতেই হাঁটাপথে বা অশ্বপৃষ্ঠে যেতে হত বলে পুলিশের পক্ষে চলাফেরা করা ও খোঁজখবর রাখা ছিল কষ্টসাধ্য। বাহ্যত এই জেলায় কোনও আন্দোলন ছিল না। জনসাধারণ ছিল সাধারণভাবে অশিক্ষিত। তাই এই জেলায় পুলিশের বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগের, পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকজন রাখা হত না। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনুশীলন, যুগান্তর ইত্যাদি গোষ্ঠীর কর্মীগণ এ জেলাকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নেন। এখানে কোনও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার কোনও উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। সে ধরনের কোনও চেষ্টাও তাঁরা এ জেলায় করেননি। তাঁরা শুধু এখানে বসে বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন ও

Government of Bengal : Home (Pol) 150/1942

সংখ্যা — ২৮

১১ই অক্টোবর, ১৯৪২

বিপ্লবী ভারত

সংবাদ

বাঁকুড়ায় বিপ্লবীগণের কর্মচাঞ্চল্য

Quit India Movement 1942. A Collection of Documents. Govt. of West Bengal থেকে গৃহীত

কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। রাইপুর, রানীবাঁধের অরণ্যপথে তাঁরা মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ যোগাযোগের মাধ্যমেই তাঁরা এ জেলায় আশ্রয় দিতেন নানা গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের। তাছাড়া কারোর কাছে না গিয়েও বিপ্লবীরা এ জেলায় অতি সামান্য পয়সায় নিজেদের খরচ চালিয়ে নিতে পারতেন। কারণ, বাঁকুড়া ছিল একটি অতি দরিদ্র জেলা। বাঁকুড়া তৎকালীন সামগ্রিক দারিদ্র্যের জন্য বিপ্লবীদের অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই হয়েছিল বেশি।

সরকারের ত্রাস সৃষ্টি ও বিপ্লবীদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এই জেলায় বিপ্লবী আন্দোলন তেমন জোরদার হতে পারেনি। আইন অমান্য আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা এই জেলায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল তার মোকাবিলার জন্য সরকার জনমানসে ত্রাস সৃষ্টির পরিকল্পনা নেয়। ১৯৩০—৩৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে প্রতিবেশী মেদিনীপুর জেলায় পরপর তিনজন ব্রিটিশ জেলাশাসক বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাই ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই জেলার প্রধান প্রধান সড়কে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হত। রুট মার্চ করে সৈন্যরা বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করত। এ কাজে সহযোগিতা করতে হত ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতিদের। তাঁদের করতে হত সৈন্যদের জন্য বিশ্রাম স্থান ও পানীয় জলের ব্যবস্থা।[৫২] এর উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টতই জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ও পরবর্তী বছরগুলিতে রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সরকারের এই দমনমূলক ব্যবস্থার চাপে এই জেলায় বৈপ্লবিক কার্যকলাপ দারুণভাবে ধাক্কা খায়। অনুশীলন দলের পুনর্গঠনের জন্য যোগেশ দে পুনরায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ায় এলেও কোনও ফল হয়নি। কারণ কিছু সংখ্যক লোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনুশীলন দলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। Bengal Criminal Law Amendment Act, 1925, অনুযায়ী প্রফুল্ল কুণ্ডু ও নীরদবরণ দত্তের গ্রেপ্তার, প্রভাকর বিরুনীর আদালতে বিচারে কারাদণ্ড, বহিরাগত বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা নিরঞ্জন ঘোষালের গ্রেপ্তার ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে বোঝা গিয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যেই পুলিশের গুপ্তচর ছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পাত্রসায়েরে বিপ্লবীদের এক গোপন বৈঠকে পবিত্র গুহ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে বিশদ আলোচনা না করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন যে, সেখানে উপস্থিত বিপ্লবীদের মধ্যেই যে পুলিশের গুপ্তচর নেই তা কে বলতে পারে।[৩২] বীরেশ্বর ঘোষ তাঁর গ্রন্থে একজন পুলিশের লোক জেলান্তর থেকে আগত বিপ্লবী বলে পরিচয় দিয়ে বাঁকুড়া শহরে কাজ করত বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩]

বাঁকুড়া জেলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন কোনও অর্থবহ মাত্রা পরিগ্রহ করতে না পারলেও এই আন্দোলনের একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন থেকেই এ জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল। যাঁরা এ জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদি পর্বের সংগঠক ছিলেন তাঁরা ছিলেন হয় অনুশীলন দলের, না হয় যুগান্তর দলের বিপ্লবী। তাঁদের মধ্যে বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত ও প্রভাকর বিরুনী আন্দামানে থাকাকালীন মার্কসবাদী দর্শনে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং দিবাকর দত্ত, হিমাংশু মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব প্রমুখ কারাবাসকালে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাছাড়া জগদীশচন্দ্র পালিত, প্রমথনাথ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতারাও ছিলেন প্রথম পর্বের নেতা।[৩৪]

সূত্রনির্দেশিকা ও টীকা

১ The Extremist Challenge : Amalesh Tripathi, Appendix C, chart I + II, P.221

১ ক Report of the Sedition Committee, 1918, In August of the same year (1907) a projected dacoity at Bankura was abandoned because the man who was to point out the house was too drunk to do so (p.23)

১ খ ibid, p 26.

২। সবিতা মাসিক পত্রিকা, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ , সাপ্তাহিক বসুমতী, স্বাধীনতা সংখ্যা, ৭০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭ শ্রাবণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

৩। স্বাধীনতা ইতিহাসে বাঁকুড়ার সংগ্রাম ও সংগ্রামী ভূমিকায় ফিরে দেখা, পরিবেশক . বাঁকুড়া জেলা পরিষদ, ১৯৯৮, পৃঃ ১২। বাঁকুড়া/জেলার বিবরণ : রামানুজ কর পৃঃ ১৭/৮ ; ইতিহাস-সংস্কৃতি : রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পৃঃ ৪১৭।

৪। তদেব, পৃঃ ১৪।

৫। বাঁকুড়া জেলার বিবরণ : রামানুজ কর, পৃঃ ১৭৮ ; বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি : রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃঃ ৪১৭।

৬। বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি : চৌধুরী, পৃঃ ৪১৭।

৭। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস : সুব্রত রায়, পৃঃ ১

৮। তদেব, পৃঃ ২

৯। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : দাস, পৃঃ ২৯-৩০। রামকৃষ্ণ দাস স্পষ্টতই ভুলক্রমে যুগান্তর দলের পরিবর্তে অনুশীলন পার্টি লিখেছেন।

১০। তদেব, পৃঃ ১০৫। ১১। তদেব, পৃঃ ৩০।

১১। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : সুব্রত রায়, পৃঃ ২-৩।

১২। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : রামকৃষ্ণ দাস, পৃঃ ৩০-৩১।

১৩। তদেব, পৃঃ ১০৫।

১৪। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : রায়, পৃঃ ৬

১৫। চট্টগ্রামে ছিল দাশরথি মিত্রের দিদির বাড়ি। সেখানে যাতায়াতের সূত্রে সঙ্গে চট্টগ্রামের অনেক বিশিষ্ট বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। (স্বাধীনতা ইতিহাসে বাঁকুড়ার সংগ্রাম ও সংগ্রামী ভূমিকায় ফিরে দেখা , বাঁকুড়া জেলা পরিষদ, পৃঃ ৫১))।

১৬। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : দাস, পৃঃ ১১৭।

১৭. বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস : রায়, পৃঃ ৭।

১৮। তদেব, পৃঃ ৭। মিহিরকুমার রায় বলেছেন, বিপ্লবী মেয়েরা রাইপুর থানার পুলিশের সার্কেল ইনস্পেক্টারের বাসা থেকে দুটি রিভলবার সরিয়েছিলেন। (বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা . মিহিরকুমার রায়, পৃঃ ১০)। এই জেলায় মহিলা বিপ্লবীর ভূমিকা কোনও সূত্র থেকেই জানা যায় না। 'বিপ্লবী মেয়েরা' কি পুলিশ কর্তার গৃহে কাজের জন্য নিযুক্ত ছিলেন ?

১৯। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : দাস, পৃঃ ১৭-১৮

২০। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : রায়, পৃঃ ৭।

২১। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : দাস, পৃঃ ১১৮। মিহির রায়ের গ্রন্থেও (বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩২) বার বছরের কারাদণ্ডের কথা বলা আছে। কিন্তু সরকারি Bengal Revolutionaries, 1939, গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় কাঞ্চনপুর মেল ডাকাতির মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

২২। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : দাস, পৃঃ ১১৭।

২৩। চলার পথে : বীরেশ্বর ঘোষ, পৃঃ ১২।

২৪। তদেব, পৃঃ ১৪।

২৫। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : দাস, পৃঃ ১১৬।

২৬। চলার পথে : বীরেশ্বর ঘোষ, পৃঃ ১৭।

২৭। বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা : মিহির রায়, পৃঃ ১০।

২৮। Bankura District Gazetteer, 1968 ; p. 133.

২৯। ibid, p.134.

৩০। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : সুব্রত রায় পৃঃ ৪।

৩১। তদেব, পৃঃ ৪,

৩২। তদেব, পৃঃ ৫

Government of Bengal : Home (Pol) 150/1943

সংখ্যা – ২১ ১২ই অক্টোবর, ১৯৪২

কংগ্রেস প্রচার-পত্র

যুদ্ধ কর – এগিয়ে চল – আরও আরও দূরে –

এগিয়ে চল – রোখে কে?

বিদেশী শাসনের কঠোর নাগপাশে বিক্ষুব্ধ জাতি আজ মুক্তি-পাগল। শাসনের নামে অত্যাচারে দুর্বল, নিরস্ত্র জনগণের উপর বেপরোয়া বোমা ও [illegible], শান্তিরক্ষার নামে বৃটিশ সৈন্যকে লেলিয়ে দিয়ে [illegible] দিনের পর দিন চলেছে। [illegible] এ নির্লজ্জ, জাতির প্রতিনিধিরা অবরুদ্ধ। এ সংবাদ এই কাহারও কাছে পৌঁছে না।

বিহারের পায়ে পায়ে এই নির্মম পাশবিকতা, নির্বিচার [illegible] দৃষ্টান্ত [illegible] ইংরেজরাজ দেখিয়েছেন। আমেরিকার [illegible] দিয়ে যে বোমা ও বিমান জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য তাঁরা আমদানী করেছিলেন, তার [illegible] চলেছে নিরস্ত্র [illegible] পর। শুধু তাই নয়, বিহারের [illegible] দেশের [illegible] নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে [illegible] দিকে এগোচ্ছে। এই [illegible]

সংবাদ

বাঁকুড়ায় বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদ অভিযানের প্রথম –

৭ই অক্টোবর বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত ৩টি মদের দোকান বিপ্লবীগণ অগ্নিসংযোগ করিয়া একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। উক্ত থানার মনোহরপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ঘর [illegible] বিপ্লবীগণ কর্তৃক অগ্নিদগ্ধ হয়। [illegible] চৌকীর [illegible] বিপ্লবীগণ আগুন লাগাইয়া দেয়। ৮ই অক্টোবর বরজোড়া থানার বেলিয়াতোড় ডাকবাংলো এবং ছান্দাইএর মদের দোকান আক্রমণ করিয়া [illegible] জনগণ অগ্নিসংযোগে উহাকেই ভস্মসাৎ করে।

Quit India Movement 1942. A Collection of Documents. Govt of West Bengal থেকে গৃহীত

৩৩। তদেব, পৃঃ ৬

৩৪। তদেব, পৃঃ ২৭। কিন্তু সুব্রত রায় তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র (পৃঃ ৩১) সীতানাথ দের স্থলে জীবনকৃষ্ণ দের নামোল্লেখ করেছেন।

৩৫। তদেব, পৃঃ ৭।

৩৬। চলার পথে : বীরেশ্বর ঘোষ, পৃঃ ২০-২১।

৩৭। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : রায়, পৃঃ ৮।

৩৮। Bankura District Gazetteer, 1968, p.131. শচীন সান্যাল ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য। বাঁকুড়া আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত মামলায় বাঁকুড়ার কয়েকজন উকিল তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা হলেন অহীন্দ্রনাথ ঘোষ, কানাইলাল দে, নবকুমার সেন ও মিহিরকুমার নিয়োগী। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শচীন সান্যালের পক্ষে সাফাই সাক্ষী দিয়েছিলেন। (চলার পথে : বীরেশ্বর ঘোষ, পৃঃ ৭)।

৩৯। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : সুব্রত রায় পৃঃ ৮।

৪০। তদেব, পৃঃ ২৭ ও ৭২। চলার পথে : ঘোষ, পৃঃ ১৮।

৪১। Bankura District Gazetteer, 1968, p. 135.

৪২। Report on Bankura Sammilani & its Institutions, p. 11.

৪৩। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : রায়, পৃঃ ৩১।

৪৪। তদেব, পৃঃ ৩২।

৪৫। তদেব, পৃঃ ৩৩।

৪৬। তদেব, পৃঃ ৩৩-৩৪।

৪৭। তদেব, পৃঃ১৬-২১।

৪৮। তদেব, পৃঃ ৩২।

৪৯। তদেব, পৃঃ ৬০-৬১।

৫০। Bengal Revolutionaries, 1939.

৫১। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : সুব্রত রায়, পৃঃ ২-৩

৫২। প্রয়াত রামকৃষ্ণ দাস ও প্রয়াত সুশীলচন্দ্র পালিত প্রদত্ত তথ্যভিত্তিক।

৫৩। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : সুব্রত রায়, পৃঃ ৫৩-৫৪।

৫৪। চলার পথে : বীরেশ্বর ঘোষ, পৃঃ ২৪-২৫।

৫৫। বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা : মিহিরকুমার রায়, পৃঃ ১১।

লেখক : প্রাক্তন অধ্যাপক বাঁকুড়া খ্রীশ্চান মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী
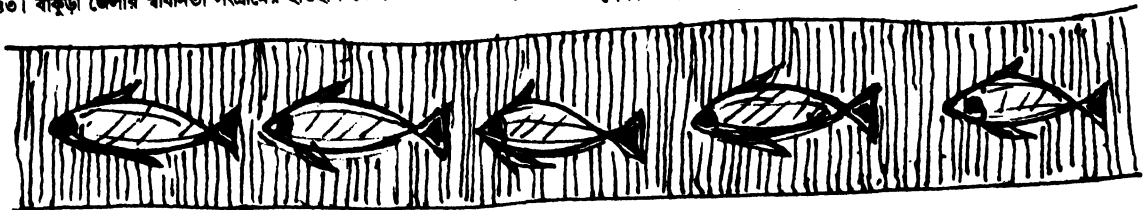
বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্যবাদী ধারা

মিহিরকুমার রায়

জেলাতে একটি মাত্র রেলপথ—বি ডি আর (বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে)। কমিউনিস্ট নেতা প্রমথ ঘোষ এই রেলপথের শ্রমিক-কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের ডাকে ধর্মঘটের প্রস্তুতিপর্বে বাঁকুড়ায় এক জনসভা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিড়ি শ্রমিকরা সৌভ্রাতৃত্ব জানাতে মিছিল করে সভাস্থলে আসেন। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঁকুড়া জেলায় আন্দোলনের ত্রিধারা লক্ষ করা যায়—কংগ্রেসের অহিংস ধারা, সশস্ত্র বিপ্লবীদের ধারা এবং শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সাম্যবাদ প্রভাবিত ধারা। বলা বাহুল্য, এই তিন ধারাই বিংশ শতকে আত্মপ্রকাশ করে। একথা বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে বিংশ শতকের আগে এই জেলায় বৃটিশ-বিরোধী কোনও সংগ্রাম বা বিদ্রোহ হয়নি।

১৭৮৯—৯১ সালের পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, ১৭৯৮-৯৯ সালের চোয়াড় বিদ্রোহ, ১৮৩২ সালের গঙ্গানারায়ণের হাঙ্গামা ইত্যাদির পিছনে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নির্দয় শোষণ যে বড় কারণ ইতিহাস-সচেতন মানুষের কাছে তা অজ্ঞাত নয়। ১৭৬০ সালের দুর্ভিক্ষে যখন বাংলা-বিহারের জনসংখ্যার ৩৫% এবং কৃষকদের ৫০% মারা গিয়েছিল তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কৃষকদের বাঁচাতে রাজস্ব ছাড় তো দেয়নি বরং ১০% রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছিল।[১] ১৭৭১ সালেও কৃষিযোগ্য জমির এক-তৃতীয়াংশ যখন পরিত্যক্ত ('deserted') এবং 'a jungle inhabited only by wild beasts' বলে ডবলু ডবলু হান্টার উল্লেখ করছেন, তখনও বৃটিশ ব্যবসায়ী কোং বাড়তি খাজনার দাবি জানাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[২]

বাঁকুড়াও এই শোষণের শিকার, কারণ বর্তমান বাঁকুড়া জেলা ১৮৮১ সালে প্রশাসনিকভাবে তৈরি হলেও ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত তা ছিল জঙ্গলমহলের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে বাণিজ্য করার ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোং ·বাংলার নবাব মীর কাশিমের কাছ থেকে (১৭৬৫)। এই অধিকার সূত্রে তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা জঙ্গল মহলের ভূমি ব্যবস্থায় আঘাত হানে। পরন্তু ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলাদেশে চালু করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এতে দেশের পুরাতন ভূমি ব্যবস্থা যা নবাবি আমল থেকে চলে আসছিল তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। অত্যধিক রাজস্বের চাপ পড়ে জমিদারদের উপর। কৃষক, কুটিরশিল্পী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষ যাঁরা জমিদারদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা এবং নিষ্কর বা স্বল্প খাজনায় যাঁরা কাজের বিনিময়ে জমি ভোগ করতেন তাঁরা অধিকার হারালেন। পাইক, ঘাটোয়াল, বরকন্দাজরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। জঙ্গলমহল অগ্নিগর্ভ হল। এটাই ইতিহাসে চোয়াড় বিদ্রোহ নামে খ্যাত। ১৮৩২ সালে তার প্রচণ্ড পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং নির্মম দমনে তার পরিসমাপ্তি হয়। এটা গণবিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ ইত্যাদি হয়েছিল চোয়াড় বিদ্রোহকে তার 'ড্রেস রিহার্সাল' বলে আখ্যাত করা যায়। তৎকালে কোনও সুস্পষ্ট রাজনীতি ছিল না, কিন্তু আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিদ্রোহগুলি যে বৃটিশ শাসন-শোষণ-বিরোধী ছিল, এক কথায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। শেষ পর্যন্ত এইসব বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমিত হলেও এগুলি জেলার মুক্তি আন্দোলনের সোপান তৈরি করেছিল।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে (১৮৮৫) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বৃটিশ শাসন সম্পর্কে ক্ষোভ-বিক্ষোভ জানানোর একটা প্ল্যাটফর্ম পান—অবশ্যই অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের উদ্যোগে। ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলে উঠেছিল তা যাতে শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে সংক্রামিত না হতে পারে, তার জন্যে হিউম নাকি বৃটিশ বড়লাট লর্ড ডাফরিনের উপদেশে 'নিরাপত্তা ভাল্‌ভ' হিসাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন বলে একটা প্রচার চালু আছে। সম্প্রতি 'ষড়যন্ত্রতত্ত্ব বিশ্বাসের অযোগ্য' বলে চিহ্নিত হয়েছে।[৪] কিন্তু এ কথা সত্য যে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর অংশ গ্রহণের আগে আন্দোলন সামুদ্রিক গভীরতা পায়নি।

১৯২১ সালে মহাত্মার আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনই সামুদ্রিক গভীরতা এনেছিল যদিও কংগ্রেসের নরম-গরমপন্থীদের কর্মপন্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি করেছিল। বাঁকুড়া জেলাতেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ে। ত্রয়ী বর্জনের ডাকে (স্কুল-কলেজ, খেতাব ও অফিস বর্জন) এই জেলাতেও প্রভাব ফেলে। তৎকালীন ওয়েসলিয়ান কলেজের দর্শনের অধ্যাপক অনিলবরণ রায় যেমন অধ্যাপনা ছাড়েন, তেমনি বহু উকিল-মোক্তার আদালত বর্জন করেন। প্রয়াত কমলকৃষ্ণ রায়ের মতো মেধাবী বহু ছাত্র স্কু-কলেজ বর্জন করেন। জাতীয় বিদ্যালয়ও জেলার বহুস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্যের পর্বেও জেলায় অহিংস আন্দোলনের গভীর প্রভাব অনুভূত হয়। ডাণ্ডি অভিযানের সংগে তাল রেখে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-সোনামুখী-পাত্রসায়ের-ইন্দাস-খাতড়া-গঙ্গাজলঘাটি ইত্যাদি থানা থেকে বহু মানুষ (মহিলাসহ) কাঁথির কাছে লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। প্রয়াত

আন্দামানের বন্দীরা সেখানে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গড়ে ডাঃ নারায়ণ রায়ের কাছে মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। জেলবন্দীরা মার্ক্সের ক্যাপিটাল পড়তেন বা পড়ে শোনানো হত। বুখারিনের হিস্টিরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম, লিয়েনটিয়েভের লেখা পলিটিক্যাল ইকনমি প্রভৃতি বই পড়ে ব্যাখ্যা করা হত। মজার ব্যাপার হল যে অ্যান্ডারসনকে বাংলার গভর্নর করে আনা হয় (আইরিশ বিপ্লবীদের দমনে কুখ্যাতি অর্জন করে) বিপ্লবীদের দমনের জন্য এবং যিনি আন্দামানে বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিরোধী ছিলেন। তিনি আন্দামানের বন্দীদের বিনোদনের জন্য মার্কসবাদী গ্রন্থ পার্শেল করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল সন্ত্রাসবাদীরা মার্ক্সবাদ গ্রহণ করলে সরকার স্বস্তিতে থাকতে পারবে। সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের ভাগ্যের কি পরিহাস ![৩]

গোবিন্দপ্রসাদ সিং, রামনলিনী চক্রবর্তী, রাধাগোবিন্দ রায়, কমলকৃষ্ণ রায়, কৃষ্ণমোহন চন্দ, রাধিকা সর প্রমুখ নেতৃবর্গ প্রায় সহস্রাধিক মানুষকে সুদূর কাঁথিতে পদযাত্রা করিয়ে নিয়ে যান লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেবার জন্যে। বাংলার কংগ্রেস নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই সময়েই (১৯২৮-২৯) ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের ডাক দিলে খাতড়া, রানীবাঁধ, গঙ্গাজলঘাটি, ইন্দাস ইত্যাদি অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন সফল হয়। ইন্দাস থানার বাসনিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের ১১ জন চৌকিদার পদত্যাগ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[৫] মদের দোকানে পিকেটিং তো আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে নিয়ে যায়।

অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি সহিংস বিপ্লবী ধারাও জেলায় সুস্পষ্ট। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কর্মীরা জেলায় সক্রিয় ছিলেন। মালিয়াড়া ছিল তাঁদের প্রধান ঘাঁটি। যুগান্তর গোষ্ঠীতে ছিলেন বিমল সরকার, সুরেন সরখেল, ষষ্ঠী সরকার, সিদ্ধেশ্বর সাঁই, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুশীলন দলে ছিলেন নীরোদ দত্ত, বিজয় তেওয়ারি, চিন্তাহরণ তেওয়ারি, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, প্রভাকর বিরুণী, দিবাকর দত্ত, চারুবিকাশ দত্ত, প্রফুল্ল কুণ্ডু প্রমুখ। যুগান্তর দলের রঞ্জিত ব্যানার্জি জয়পুর থানার গোপালনগরের বাসিন্দা ছিলেন। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির সংগে বিষ্ণুপুরের ওই গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল। বেলিয়াতোড়ের দাশরথি মিত্রের সহযোগিতায় মাস্টারদার দলের অম্বিকা চক্রবর্তী, সুবোধ চৌধুরীর মতো নেতাদের এই জেলায় যোগাযোগ ছিল। ছেন্দাপাথর গুপ্ত সমিতির আর এক ঘাঁটি ছিল। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের কর্মীরা মেল ডাকাতি করেছেন। ১৯৩২ সালে যুগান্তর দলের কর্মীরা বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসককে হত্যার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু প্রশাসন জেনে যাওয়াতে তা ব্যর্থ হয়।[৬]

এইসব বিপ্লবী[৭] পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কেউ বিচারে আন্দামান সেলুলার জেলে, কেউ বা অবিভক্ত বাংলার, বহির্বাংলার বিভিন্ন কারাগারে বন্দিদশা যাপন করেন। এই জেলার যাঁরা আন্দামানে প্রেরিত হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রভাকর বিরুনী, ভবতোষ কর্মকার প্রমুখ। দিবাকর দত্ত, প্রফুল্ল কুণ্ডু, বীরেশ্বর ঘোষ, অশোকানন্দ বসু, বীরেন সিংহদেব প্রমুখ বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে জড়িত থাকায় দেশের বিভিন্ন জেলে আটক থাকেন। আন্দামানের বন্দীরা সেখানে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গড়ে ডাঃ নারায়ণ রায়ের কাছে মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। জেলবন্দীরা মার্ক্সের ক্যাপিটাল পড়তেন বা পড়ে শোনানো হত। বুখারিনের হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম, লিয়েনটিয়েভের লেখা পলিটিক্যাল ইকনমি প্রভৃতি বই পড়ে ব্যাখ্যা করা হত। মজার ব্যাপার হল যে অ্যান্ডারসনকে বাংলার গভর্নর করে আনা হয় (আইরিশ বিপ্লবীদের দমনে কুখ্যাতি অর্জন করে) বিপ্লবীদের দমনের জন্য এবং যিনি আন্দামানে বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিরোধী ছিলেন। তিনি আন্দামানের বন্দীদের বিনোদনের জন্য মার্কসবাদী গ্রন্থ পার্শেল করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল সন্ত্রাসবাদীরা মার্ক্সবাদ গ্রহণ করলে সরকার স্বস্তিতে থাকতে পারবে। সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের ভাগ্যের কি পরিহাস ![৮]

১৯৩৮-৩৯ সালে ওই সব বিপ্লবী মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরতে থাকেন এবং শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে বলাধান করেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রবাদপুরুষ মুজাফফর আহমদ একটি প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে—'নব কমিউনিস্টরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমরা দেখতে পেলাম দার্জিলিং জিলাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে (যুক্ত বাংলায়) সব জিলায় কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছে। এই রকমটা ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে হয়নি। কলকাতায় আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলিও শক্তিশালী হয়েছিল। জিলায় জিলায় আমাদের পার্টি ইউনিটও গড়ে উঠল। এটাও ছিল ভারতবর্ষে একটা অভিনব ব্যাপার। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন হতে আমরা যে অবদান পেলাম তা থেকে বাংলায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ শক্তিশালী হয়েছিল। একদল আত্মোৎসর্গকারী কর্মী পেয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বাংলায় চারদিকে প্রসারিত হতে লাগল।'[৯]

বাঁকুড়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ

বাঁকুড়া জেলায় সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচারে কৃষক-শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন জগদীশ পালিত (প্রথম জীবনে কংগ্রেসের অভয়াশ্রমের কর্মী, পরে জেলে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির কাছে মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হন), বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ ঘোষ, ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, প্রভাকর বিরুনী, দুর্গা হাজরা, নির্মল ব্যানার্জি, দিবাকর

Co.- ① No: 314

THE TRUMPET

NO. II. 2nd. Issue. June 27 1932. Price- Yourself.

Comrades!

I appear in your midst again.

The Generalissimo so commands. Have not you heard the clarion-call? The call to rally under the banner, to mobilize. Heard the bugle to join the firing line. Did not you. Comrades, keep powder dry.

The Gandhi-Irwin Pact has been consigned to the waste-paper basket. Its true Christian spirit has been dishonored. The jugglery of words of the British ultra-Imperialist diplomat could no longer make you a dupe of to morrow wake arise! Wait not anymore. Sleep not. Britain is bleeding India white. This must stop. This system of ceaseless exploitation must end.

This is the opportune moment. Strike now deliver the death-blow, the last remaining shadow will disappear.

Comrades. I go now. But remember, rest not, waste no time. Remember you have to suffer, suffer and suffer Victory will be your. Up! Up! fight and win or all in the active field.

published by the congress Printing works. Joypur (Bankura)

দি ট্রাম্পেট, সাম্যবাদী আন্দোলনের মুখপত্র

দত্ত, ননীরায়, রবি বাউরি, উদয়ভানু ঘোষ, মানিক দত্ত, শিশির মুখার্জি, অশ্বিনী রায়, শ্যামাপদ চৌধুরী, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বাঁকুড়া জেলায় ১৯৩৭ সালে হাটকৃষ্ণ নগর (পাত্রসায়ের থানা) গ্রামে সারা ভারত কৃষক সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই কৃষক সম্মেলনে অবিভক্ত বাংলার ২০টি জেলা থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সৈয়দ আহম্মদ খান, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও নাসিরুদ্দিন আহম্মেদ। মুজফফর আহ্মদ কৃষক সভার রাজনৈতিক সংগঠনিক দলিল পেশ করেন এবং কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও জমিদার-মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেন।[৮] রামকৃষ্ণ দাস বলেছেন যে প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তৎকালীন যুগের অন্যতম মনীষী কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বলে সম্মেলনের কোনও ক্ষতি হয়নি বরং কর্মীদের নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্মেলনটি আশাতীতভাবে সফল হয়।[৯]

১৯৩৮-৩৯ সালে জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক ইউনিট গড়ে উঠলেও কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনি বলে তাঁদের কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করতে হত। জেলার বিপ্লবীরা যাঁরা মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁরা জেলায় এসে কৃষক সমিতি গঠনের উপর জোর দেন। কারণ উপনিবেশগুলির মুক্তি সংগ্রামে কৃষকদের যুক্ত করে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেন লেনিন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের ৬ষ্ঠ কংগ্রেস থেকে। ৭ম কংগ্রেসে (১৯৩৫) জর্জ ডিমিট্রভ ওই নতুন কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করেন এবং ১৯৩৬ সালে বৃটিশ মাহুলিতে রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্রাডলি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণমোর্চার কথা বলেন।[১০] ফলত, ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোসালিস্ট ইত্যাদিদের চাপে ফৈজাবাদ কংগ্রেসে সারা ভারত কৃষক কংগ্রেস গঠিত হয়—যা পরবর্তীকালে সারা ভারত কৃষক সভা নামে পরিচিত। কৃষকদের সম্পর্কে কংগ্রেসের একটা অদ্ভুত মানসিকতা ছিল—ঘুমন্ত সিংহকে পক্ষে টানার নিরন্তর প্রয়াস তাঁদের ছিল, কিন্তু জেগে যাওয়া সিংহ পাছে তাঁদের হাত ফসকে যায় এই ভয় তাঁদের সব সময়ই আতংকিত রেখেছে। চৌরীচৌরার ঘটনায় (১৯২১) আন্দোলনটাই বন্ধ হয়ে গেল। মহাত্মাজি 'হিমালয়তুল্য প্রমাদ' বলে মন্তব্য করলেন। আবার ১৯২৮ সালে বারদৌলীর ঘটনাকেও একই মানসিকতার পুনরাবৃত্তি। ২২% রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে (এই আন্দোলন থেকেই তিনি সর্দার খেতাব পান) কৃষকরা সম্পত্তি ক্রোক করার সরকারি হুমকি অগ্রাহ্য করে আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেও শেষ পর্যন্ত আপস-আলোচনা সাপেক্ষে কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। বোম্বাই সরকার সাংগঠনিক সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত রাজস্ব বৃদ্ধি স্থগিত রাখলেও আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে 'গুজরাটের কৃষি বিত্তবানদের জন্য গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদ অবশ্যই কিছু নগদ লাভ এনে দিয়েছিল।'[১১]

এই প্রেক্ষায় জেলার সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। সংগে সংগে জেলার কৃষকদের অবস্থাটাও একটু পরখ করতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী যে মান্দ্য দেখা দিয়েছিল, বৃটিশের উপনিবেশ ভারত তার থেকে মুক্তি পায়নি—স্বভাবতই বাংলার কৃষকরাও তার শিকার হয়েছিলেন। ১৯২১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ি বাংলাদেশের কৃষকের জোতের পরিমাণ ছিল ৩.১ একর, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে যেখানে ছিল যথাক্রমে ১২.২ এবং ৯.২ একর।[১২] সংকট কাটাতে কৃষককে জোতজমি বিক্রি করে অনেক সময় ভূমিহীন কৃষিমজুরে পরিণত হতে হয়েছে। ১৯১৭—২৪ সালের সেটেলমেন্ট রিপোর্টে জেলার কৃষকের চালচিত্র যা পাওয়া যায় তা আরও করুণ। সাড়ে ৪ জন পোষ্যবিশিষ্ট একটি পরিবার ৩.৭২ একর জমি থেকে যে ধান পায় তা থেকে চাল হয় ২১ মণ ৮ সের। পরিবারের দৈনিক চাল খরচ যদি ২ সের ১৩ ছটাক হয় তাহলে সে সংসার চালাতে অপারগ। এর থেকেই জেলার কৃষকের অবস্থা বুঝতে পারা যাবে।[১৩] আর কৃষি মজুর! জেলায় যখন মোট লোকসংখ্যার (১০,১৯,৯৪১ জন) ২৭% কৃষিমজুর। তাদের বেতন ছিল নগদে বছরে ৩০—৩৬ টাকা। যদি ধরা যায় সারা বছর তাঁরা কাজ পেতেন (অবশ্যই পেতেন না) তাহলে দৈনিক নগদে তাঁদের বেতন ছিল ১ আনা ৪—৭ পাই (১২ পাই = ১ আনা)। তখন (১৯২১) চাল মিলত ১ টাকায় ৫ সের ১০ ছটাক। এতে কত

চাল পাওয়া সম্ভব? Pittance ছাড়া কিছু হবে কি? জেলায় অবশ্য জনমুনিষদের ধান দেওয়ার রীতি ছিল বাঁকড়ী ৪ পাই(কাঠ বা পিতলের এক বিশেষ ধরনের মাপের আধার)—সেটা ধরলেও দাম হয় দৈনিক আট আনা। সুতরাং এই আর্থ-সামাজিক দুর্দশার লাঘব করতে গেলে মহাজন-জমিদার ও তাদের পৃষ্ঠপোষক বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও পথ কি ভাবা যায়? লেনিন তাই মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছিলেন। সাম্যবাদে বিশ্বাসী পার্টিকে তাই স্লোগান দিতে হয়েছিল 'ধর কৃষক ডাণ্ডা, হক চজমিদার ঠাণ্ডা', 'লাঙ্গল যার জমিদার'। স্লোগান দিতে হয়েছিল জমিদারি বিলোপের, বেগার প্রথা বিলোপের, ঋণ ও সুদের হার কমানোর।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধরদের মধ্যে যুদ্ধ। তাই এটাকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে আখ্যাত করা হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধে 'না এক পাই, না এক ভাই' বলে প্রচার শুরু করলেন। এই যুদ্ধের সময়ই বাঁকুড়া জেলায় বাংলার গভর্নর স্যার জন হারবার্ট যুদ্ধ তহবিলে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করতে আসেন। তৎকালীন ওয়েসলিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের ছাত্র দিয়ে 'গার্ড অব অনার' দেওয়াবার একটা পরিকল্পনা করেন। বি পি এস এফ তখন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন—জেলার কলেজে সক্রিয়। তারা অধ্যক্ষের পরিকল্পিত 'গার্ড অব অনার' দিতে রাজি তো নয়ই বরং পার্টির সংগে তারাও 'গভর্নর ফিরে যাও' পোস্টারে পোস্টারে শহরের দেওয়াল ভরিয়ে দিয়েছেন। পুলিশে-ছাত্রে খণ্ডযুদ্ধ। ছাত্রদের নেতৃত্বে ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায়, উদয়ভানু ঘোষ, মানিক দত্ত প্রমুখ। এই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী কিশোর ছাত্র (জেলা স্কুলের) পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।[১৮] ছাত্রনেতাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়—পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বি পি এস এফ জেলার সাম্যবাদী চিন্তা প্রচারে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল এটাই তার বড় প্রমাণ নয়, পরবর্তীকালে জেলার বিভিন্ন গণসংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন ছাত্র আন্দোলন থেকে আসা কমিউনিস্টরাই।

১৯৪০—৪১ সালেই ওই কলেজের সোস্যাল ফাংশনে 'বন্দেমাতরম' গান গাইতে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বি পি এস এফের মধ্যে বিরোধ হয়। তখন ওই গানই জাতীয় সংগীত। সুতরাং ছাত্ররা ধর্মঘট করেন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী মিশনারি কলেজ কর্তৃপক্ষ পিছু হাঁটতে বাধ্য হয়। কিন্তু মানিক দত্ত, শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায়, উদয়ভানু ঘোষ, ভোলানাথ কর্মকার, শিশির মুখার্জি প্রমুখ ছাত্র নেতাদের সংগে প্রায় ৪০০ ছাত্রকে বের করে দেন। পরে অন্যরা কলেজে ফিরলেও নেতাদের নেওয়া হয়নি।[১৯] এই সময় কলেজে নীহার সরকার নামে এক অধ্যাপক আসেন, যিনি সাম্যবাদী ভাবধারায় ছাত্রদের উদ্দীপিত করেন এবং জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ

১৯৪৩-এ জেলায় ফ্যাসিবিরোধী সমাবেশ হয় ওন্দায়। কংগ্রেসিদের বিরোধিতা ও কুৎসা জমিদারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কয়েক হাজার মানুষ ওন্দায় সমবেত হন জ্যোতি বসু ও নিত্যানন্দ চৌধুরীর বক্তৃতা শোনার জন্য। জ্যোতি বসু এই সভায় যুদ্ধ পরিস্থিতি ও জনযুদ্ধের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। বাঁকুড়া থেকে বিড়ি শ্রমিকরা রেড গার্ডের ঢঙয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে ওন্দায় এসেছিলেন।

হানাতে যুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়—যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তা হয় 'জনযুদ্ধ' ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদ রুখতে মিত্রশক্তির সংগে হাত মেলায়। ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে 'ছমাস ধরে দ্বিধা ও আভ্যন্তরীণ বিতর্কের পর সি পি আই শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যান্যদের সংগে এক সারিতে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিবিরোধী জনযুদ্ধে পূর্ণ সমর্থনের ডাক দেয়।'[২০] বৃটিশ সরকার এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে জনযুদ্ধের পক্ষে প্রচারে নামে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট থেকে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের' সূচনা করে। ৯ আগস্ট ভোরে নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলেও এই আন্দোলন বৃটিশ-বিরোধী জঙ্গিপনায় কংগ্রেস পরিচালিত আগের সমস্ত আন্দোলনকে ছাড়িয়ে যায়। বাঁকুড়া জেলাতেও এই আন্দোলনের ঢেউ পড়ে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দিলেও নেতাদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হন। কমিউনিস্ট পার্টি আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করায় তাদের দেশদ্রোহী/পঞ্চমবাহিনী বলে অপপ্রচার চলতে থাকে। শারীরিকভাবে তাদের নিগৃহীত হতে হয়—অনেক স্থানে পার্টি অফিসে (যদিও খুবই কম পার্টি অফিস ছিল) আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আগস্ট আন্দোলনকে নিয়ে জেলায় মতভেদ দেখা দেয়—ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ পালিত, ইন্দুভূষণ সাঁই, হিমাংশু মুখার্জি, ভূদেব মণ্ডল প্রমুখ আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পক্ষে। বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, অজিত সিং ছিলেন পার্টি সিদ্ধান্তের পক্ষে। বিষ্ণুপুরে ওই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি ও অজিত সিং পার্টির জন্যে তহবিল আদায় করতে এলে পার্টির বিরোধীদের হাতে নিগৃহীত হলেও তাঁদের রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসেননি।[২১]

১৯৪৩-এ জেলায় ফ্যাসিবিরোধী সমাবেশ হয় ওন্দায়। কংগ্রেসিদের বিরোধিতা ও কুৎসা জমিদারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কয়েক হাজার মানুষ ওন্দায় সমবেত হন জ্যোতি বসু ও নিত্যানন্দ

বাঁকুড়া জেলার ওন্দায় ফ্যাসিবিরোধী সমাবেশে (১৯৪৩) ভাষণ দেন তরুণ কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু   ছবি : বর্তমান কালের

চৌধুরীর বক্তৃতা শোনার জন্য। জ্যোতি বসু এই সভায় যুদ্ধ পরিস্থিতি ও জনযুদ্ধের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। বাঁকুড়া থেকে বিড়ি শ্রমিকরা রেড গার্ডের ঢঙ্‌য়ে ব্যান্ড বাজিয়ে ওন্দায় এসেছিলেন। মানবতা-বিধ্বংসী ফ্যাসিবাদ বড় শত্রু, না বৃটিশরা বড় শত্রু বিচার আজও শেষ হয়নি—স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও অরুণ শৌরীর মতো সাংবাদিকরা কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী বলে আখ্যাত করতে ছাড়েন না অথচ গোলওয়ালকরের আর এস এস আগস্ট আন্দোলনে যোগ না দিলেও কিংবা তৎকালের হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে সাভারকর সদস্যদের সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে নিষেধ করলেও কিন্তু এঁরা নিন্দাভাজন হননি।[১৮] জনযুদ্ধের পটভূমিতেও কমিউনিস্টরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা যেমন চেয়েছিলেন, তেমনি সমস্ত রাজবন্দী মুক্তি চেয়েছিলেন, ধর্মঘট করার অধিকার থেকে বাধানিষেধ তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। সর্বোপরি জনগণের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জাতীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা দেবার দাবি জানিয়েছিলেন, দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর জন্য খাদ্য বিতরণ, কৃষকদের কর ও ঋণ মকুবের দাবি জানিয়ে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি কানপুরে এ আই টি ইউ সি-র সভায় জনযুদ্ধের পক্ষে সকল মানুষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে দাঁড়াতে আহ্বান জানান।[১৯] এসব সত্ত্বেও শাসকশ্রেণীর জাতিগত দুর্ব্যবহার, পুলিশী জুলুম ও মিত্রশক্তির সৈন্যদের জনযুদ্ধের সৈনিকোচিত ব্যবহারের অভাব (মহিলাদের উপর ধর্ষণের সংখ্যা এতই নির্লজ্জভাবে বাড়ছিল যে কংগ্রেস থেকে বারে বারে প্রতিবাদ করা হয়েছিল) মানুষ চোখের সামনের বৃটিশ-আমেরিকান-অস্ট্রেলিয়ানদের এবং তাদের সমর্থনকারীদের খারাপ চোখে দেখছিল। তাই ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ '৪২-এর আন্দোলনে কমিউনিস্টদের যোগ না দেওয়াকে ত্রুটি বলে মন্তব্য করেছেন।[২০]

এই যুদ্ধের বাজারে জাপান যখন ভারতের দিকে অগ্রসরমান বৃটিশ যখন ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়, তখন পূর্ববঙ্গের মজুত চাল কিছু নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং কালোবাজারির সুযোগে বাংলায় ধান-চাল বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। অবিভক্ত বাংলা দেশে পঞ্চাশের আকাল নেমে আসে। কঙ্কালসার মানুষ কলকাতায় আসতে থাকে খাদ্যের আশায়। '....পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব/ঠিক মানুষের মতো/কিংবা ঠিক নয়/যেন তার ব্যঙ্গ চিত্র বিদ্রূপ বিকৃত।/তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর/জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়/উচ্ছিষ্টের আঁস্তাকুড়ে, বসে বসে ধোঁকে/আর ফ্যান চায়' বাঁকুড়ার পথেঘাটে এই দৃশ্য বিরল ছিল না যেমনটি কবির ভাষায় আমরা দেখলাম। জনযুদ্ধের পাতায় বাঁকুড়ার সংবাদ বের হয়েছে যাতে একমুঠো ভাতের জন্যে কোলের শিশু-বিক্রির সংবাদ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি আড়কাঠিদের পাল্লায় পড়ে যুবতীরা দেহ বিক্রির জন্যে ধরা দিতে বাধ্য হচ্ছে বলে খবর মিলছে।[২১]

এই অবস্থায় জেলায় কমিউনিস্টরা মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। মজুত উদ্ধার করা শুরু হয়। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। এই সময়ই কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শিশির মুখার্জি ওন্দার এক ধানকলে চোরাই চাল পাচার বন্ধ করার প্রতিবাদ করতে গেলে কলমালিক তাঁকে বেঁধে রাখে এবং সংবাদ প্রচারিত হলে শয়ে শয়ে মানুষ এসে তাঁকে উদ্ধার করে এবং চাল পাচার বন্ধ হয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্টদের এই নিষ্ঠা সহকারে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইতিহাস পার্টিকে লুপ্ত গৌরব ফিরে পেতে সাহায্য করেছিল।

তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপের অনুক্রমে বাঁকুড়া জেলাতেও জঙ্গি কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৪৬—৪৯ সালে। সঠিকভাবে একে তেভাগা আন্দোলন বলা না গেলেও বিষ্ণুপুর-জয়পুর-গড়বেতা অঞ্চলে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল সরকার, মানিক দত্ত প্রমুখ গোঁসাইপুর, কামারপুকুর, বেলিয়া মবারকপুর, পানশিউলি, মনসাপাড়া, চৌকান বাসুদেবপুর, বনগেলে, শিবেরডাঙ্গা, বেথরি, চাঁচর, চৌবেটো ইত্যাদি অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন। বৃটিশ সরকার-বিরোধী, জমিদার-মহাজন-বিরোধী এই আন্দোলন থেকে অবশ্যই ফসলের তেভাগা, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, বিনা শুল্কে বনের ঝাঁটি (গাছের ডালপালা) কাটার অধিকার, কাঠকয়লা সংগ্রহের অধিকার ইত্যাদি দাবি জানানো হয়। মন্বন্তর-পরবর্তী পরিস্থিতিতেও জমিদারদের ধানগোলা থেকে ধান চাওয়া হত। কৃষকসভার নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে জমিদার-মহাজনরা পুলিশ লেলিয়ে দিত। স্বাধীনতার পর '৪৮-৪৯ সালে এই জঙ্গি কৃষকরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস পালন করার ডাক দিলে ১৫ আগস্ট ১০ হাজার মানুষের এক মিছিল (সশস্ত্র) বিষ্ণুপুর শহরের উপর দিয়ে যায়। স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকারের পুলিস সেদিন পালিয়ে যায়। কিন্তু ১৮ আগস্ট আচমকা গুলি চালিয়ে ৬জন কৃষক রমণী ও পুরুষকে হত্যা করে। স্থানীয়ভাবে এটা বাঁধগাবা আন্দোলন বলে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের হাতে শাসন ক্ষমতা এলেও জমির প্রশ্নে কংগ্রেস সরকার সাম্রাজ্যবাদের শাসনকালের কৃষকবিরোধী জমিদারদরদী নীতি যে পরিত্যাগ করতে পারেনি—তা তেলেঙ্গানা থেকে কাকদ্বীপ-বাঁধগাবা সর্বত্রই একই অভিজ্ঞতা রেখে গেছে। তাই সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে মন্তব্য

চল্লিশের দশকে প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর [illegible] শ্রমিক-কৃষকের [illegible] ও [illegible] আন্দোলনে যাঁদের নেতৃত্ব চির-উজ্জ্বল হয়ে আছে — মুজফফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জি, পি সি যোশী ও সোমনাথ লাহিড়ী

সমালোচিত হলেও সদ্য স্বাধীন কংগ্রেস সরকারের শুধু নয় স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও ভারতের কৃষকদের সমস্যা অন্তর্হিত হয়নি—একথা অস্বীকার করার কোনও পথ নেই।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাঁকুড়া জেলায় কোনও ভারি শিল্প না থাকায় শ্রমিক বলতে মূলত বিড়ি শ্রমিকদেরই বোঝাত। জেলায় সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রচারে বিড়ি শ্রমিকদের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। বাঁকুড়া জেলায় সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে। '৪০-এর দশকে ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় বিড়ি শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়ে সাম্যবাদী চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ২২২নং বিড়ি কারখানা তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় কারখানা, প্রায় ৬০০ শ্রমিক সেখানে কাজ করতেন। মজুরির হার ছিল Pittance-ই বলা যায়—হাজারে চার আনা—সাড়ে চার আনা—বড়জোর পাঁচ আনা (১৬ আনায় ১ টাকা)। এক পয়সা করে ঈশ্বরবৃত্তি আদায় করা হত শ্রমিকপিছু (ঈশ্বরবৃত্তি মালিকদের শ্রমিক শোষণের একটা কৌশল—যেমন জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করতো মাথট, মাঙ্গন, পার্বণী, নজরানা ইত্যাদি।) খারাপ বিড়ি চেক করার নামে বিনা মজুরিতে হাজারে দেড়শ-দুশো বিড়ি মালিক পেত শ্রমিকদের কাছ থেকে। এর বিরুদ্ধে ক্ষেত্রগোপালবাবুর নেতৃত্বে ধর্মঘট হয়—এটা বিড়ি শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ধর্মঘট। পরবর্তীকালে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তোলেন শ্রমিকরা এবং এই কো-অপারেটিভ কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নানাভাবে সাহায্য করে। ১৯৪৩ সালে ওন্দায় অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবিরোধী সমাবেশে বিড়ি শ্রমিকদের রেড গার্ডের ঢং-য়ে যোগদান স্মরণীয় ঘটনা। বিড়ি ইউনিয়নের অফিসটাই '৪০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল বলে প্রবীণ কমিউনিস্ট সংগঠক একজন তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।[২২] সদ্য স্বাধীন ভারতে (১৯৪৮) কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয় কংগ্রেস সরকারের আমলে। বিড়ি শ্রমিকরা এতই জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলেন যে ওই সময় তাঁরা শোনেন কমরেড দুর্গা হাজরা ও কমরেড নির্মল ব্যানার্জিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। খবরটা শুনে তাঁরা কমরেড দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঁকুড়া রেল স্টেশনে পুলিশের হাত থেকে দুর্গা হাজরাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন। সংগঠন শক্তির জঙ্গিপনার দিক থেকে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য।[২৩]

জেলাতে একটিমাত্র রেলপথ—বি ডি আর (বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে)। কমিউনিস্ট নেতা প্রমথ ঘোষ এই রেলপথের শ্রমিক-কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের ডাকে ধর্মঘটের প্রস্তুতিপর্বে বাঁকুড়ায় এক জনসভা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিড়ি শ্রমিকরা সৌভ্রাতৃত্ব জানাতে মিছিল করে সভাস্থলে আসেন। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু।[২৪]

কমিউনিস্ট পার্টি জেলায় শক্তি সঞ্চয় করার ফলে (কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে) ১৯৪৬-এ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা জেলায় অনেকখানি রুখতে পারা সম্ভব হয়েছিল। বাঁকুড়া শহরের কোটরডাঙ্গায় ও পুনিশোলে পার্টির নেতৃত্বে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবুও দু-একটা অঘটন যে ঘটেনি তা নয়।

সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সমর্থক জমিদার-মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রেণীসচেতনতা সৃষ্টিতে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা

তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপের অনুক্রমে বাঁকুড়া জেলাতেও জঙ্গি কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৪৬—৪৯ সালে। সঠিকভাবে একে তেভাগা আন্দোলন বলা না গেলেও বিষ্ণুপুর-জয়পুর-গড়বেতা অঞ্চলে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল সরকার, মানিক দত্ত প্রমুখ গোঁসাইপুর, কামারপুকুর, বেলিয়া মবারকপুর, পানশিউলি, মনসাপাড়া, চৌকান বাসুদেবপুর, বনগেলে, শিবেরডাঙ্গা, বেথরি, চাঁচর, চৌবেটা ইত্যাদি অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন। বৃটিশ সরকার-বিরোধী, জমিদার-মহাজন-বিরোধী এই আন্দোলন থেকে অবশ্যই ফসলের তেভাগা, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, বিনা শুল্কে বনের ঝাঁটি (গাছের ডালপালা) কাটার অধিকার, কাঠকয়লা সংগ্রহের অধিকার ইত্যাদি দাবি জানানো হয়।

আন্দোলনে এক বিরাট ভূমিকা নিতে পেরেছিল। কমিউনিস্টদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও মানুষের পাশে দাঁড়াবার ইতিহাস স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকাকে গৌরবোজ্জ্বল করেছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হল, কিন্তু ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার দগদগে স্মৃতি নিয়ে দ্বিখণ্ডিত ভারতের বেদনা নিয়ে। বাঁকুড়া শহরেও স্বাধীনতা দিবস পালিত হল—সর্বদলীয় সভার মাধ্যমে।

সূত্র :

(১) The Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter
(২) তদেব
(৩) আধুনিক ভারত—সুমিত সরকার
(৪) W. B. Dist. Gazetteers : Bankura (1968)
(৫) তদেব
(৬) আন্দামান জেল থেকে মুজাফ্ফর আহ্‌মদ্ ভবন—সুধাংশু দাশগুপ্ত
(৭) তদেব
(৮) কৃষক সভার ইতিহাস—আবদুল্লাহ রসুল
(৯) পঃ বঃ প্রাঃ কৃষক সভার রজতজয়ন্তী স্মারক পত্রিকায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ দাসের প্রবন্ধ
(১০) Communists Challange Imperialism from the Dock—Muzaffar Ahmed & আধুনিক ভারত—সুমিত সরকার
(১১) আধুনিক ভারত—সুমিত সরকার
(১২) কৃষক সভার ইতিহাস—আবদুল্লাহ রসুল
(১৩) Final Report on the Survey & Settlement operation in the Dist. of Bankura-1917—24 by F. W. Robertson ICS
(১৪) কমিউনিস্ট আন্দোলনের কয়েক দশক—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়
(১৫) বাঁকুড়া জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা—মিহিরকুমার রায় সম্পাদিত
(১৬) আধুনিক ভারত—সুমিত সরকার
(১৭) বাঁকুড়া জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা
(১৮) আধুনিক ভারত
(১৯) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন—মনোরঞ্জন রায়
(২০) History of Freedom movement in India - E. M. S. Namboodiripad
(২১) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা—সরোজ মুখার্জি
(২২) বাঁকুড়া জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা
(২৩) ঐ
(২৪) কমিউনিস্ট আন্দোলনের কয়েক দশক—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

লেখক : প্রাক্তন অধ্যাপক, বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয়। 'বাঁকুড়া দর্শন' পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক।

বিষ্ণুপুরের পাথর দরজা, ছবি : নিমাই সরকার

বাঁকুড়ায় চুয়াড় বিদ্রোহ

তপন দত্ত

ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাধ কালকেতু নিজের সম্পর্কে বলছে—

'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোক বলে রাঢ়।'

রাঢ়ের চোয়াড় জাতির মতো ডোম জাতিও এর প্রাচীন অধিবাসী। ডোম জাতির বীরত্বের কথা বাংলার ছেলেভুলানো ছড়ায় আজও শুনতে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলার চুয়াড় বিদ্রোহের ইতিহাস অনালোকিত ও অনালোচিতই রয়ে গেছে। ইতিহাসপ্রণেতাগণ এই বিদ্রোহকে উপেক্ষা করে, মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যেই রেখে গেছেন। দেখতে দেখতে এই বিদ্রোহের সময়কাল ২০০ বছর পার হয়ে গেল। গত বছর '৯৯ সাল পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা এই অনালোকিত, অনালোচিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত 'চুয়াড় বিদ্রোহের' ২০০ বছর পূর্তি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে, নেতৃবৃন্দ কিছু লেখা, কিছু তথ্য প্রকাশ করে এই অন্ধকারময় অধ্যায়কে কিছুটা আলোকিত করেছেন। দুর্ধর্ষ ব্রিটিশদের শ্রেণী-শোষণের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের জীবনপণ লড়াই, তাঁদের আত্মত্যাগ, রক্তদান, অনুপ্রেরণার জীবন্ত সম্পদ হিসাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য এই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের অবতারণা।

এই 'চোয়াড়' বা চুয়াড় শব্দটির অর্থ হল দুর্বৃত্ত, নীচ জাতি, অসভ্য, বর্বর, ছোটলোক বা ব্যাধ ইত্যাদি। রাঢ় অঞ্চলের জঙ্গল মহলে ছিল সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, বাগ্‌দি, ডোম, দিগার, কোড়া, মাল, ভূইঞা, তাবেদার, সর্দার, পাইক, নোয়া, গড়াইত, সবর ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বাস। এঁরাই হলেন প্রাক্-আর্য জাতি ও প্রকৃত কৃষক। বাইরে থেকে আসা উচ্চবর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় এঁদেরই 'চোয়াড়' বলে ঘৃণা করতেন।

আর্য জাতি আমাদের দেশে বসতি স্থাপন করলেও গঙ্গানদীর পশ্চিমদিকে রাঢ় অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রাক্-আর্য জাতির বাসভূমি বহুকাল অবধি রয়ে গিয়েছিল। এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাই এর নাম হয় 'জঙ্গলমহল'।

১৭৭৩ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি ওয়ারেন হেস্টিংসকে লেখা এক চিঠিতে বলা হয়েছে যে এই জঙ্গলমহল এলাকা লম্বায় ৮০ মাইল, চওড়ায় ৬০ মাইল। চৌহদ্দি ছিল পূর্বে মেদিনীপুর, পশ্চিমে সিংভূম, উত্তরে ময়ূরভঞ্জ এবং দক্ষিণে পাচেত। এখানের অধিবাসীরা ছিলেন দুর্ধর্ষ। এরা কচিৎ খাজনা বা নজরানা দিতেন, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে বাস করতেন।

এই অরণ্য কি রূপ নিবিড় ছিল তা 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-২ ও বাঁকুড়া' গ্রন্থপ্রণেতা তরুণদেব ভট্টাচার্য লিখেছেন—'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করেছিল তখনও এ অঞ্চলে অরণ্য ছিল নিবিড়। দেওয়ানি লাভের পনের বছর পরে (১৭৮০ সালে) সিপাইদের ছোট একটি দল বনের ভিতর দিয়ে একশো কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করেছিল। শিবির খাটিয়ে দুটো

রাঢ় অঞ্চলের জঙ্গলমহলে ছিল সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, বাগ্‌দি, ডোম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বাস যাদের বহিরাগত সম্প্রদায় 'চোয়াড়' বলে অভিহিত করেছে

প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ় ভূমিতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র একটা সামাজিক জীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষ করিয়া রাঢ়ভূমিরই সম্পদ। সেই জন্য এই কাব্যে চরিত্র সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য বিষয়বস্তুতেও একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়দেশ বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রবল অনার্য জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত। বিহার প্রদেশ হইতে আর্য সভ্যতা সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল, এই উত্তরবঙ্গ পথেই আর্যসভ্যতা য়ুয়ান চুয়ার্ডের সময়েই কামরূপ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সেই জন্য বহুকাল পর্যন্ত রাঢ় প্রদেশের অভ্যন্তর অনার্য জাতিরই বাসভূমি রহিয়া গিয়াছিল।

ব্যাটেলিয়ান থাকার মতো খানিকটা ফাঁকা জায়গাও তারা খুঁজে পায়নি।

ইতিহাসপ্রণেতা ডাঃ গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন তাঁর 'দক্ষিণ-পশ্চিমবাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে যে 'ওদের বাসস্থান ছিল বন ও জঙ্গলে পরিবেষ্টিত, তারা অরণ্যসম্পদের উপরই প্রধানত নির্ভর করে এবং আদিম প্রথায় চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করত সম্পূর্ণ শান্তি ও স্বাধীনতার পরিবেশে, যার উপর মুসলমান শাসকরাও কোনও হস্তক্ষেপ করেননি।'

জঙ্গলে আকীর্ণ, লোহা মেশানো পাথুরে মাটির বুকে চাষাবাদ বহুদিন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না তার। অর্থসম্পদে ঐশ্বর্যশালী না হলেও জীবনধারণের মতো আহার্য সংগ্রহে ঘাটতি পড়ত না। বনে যথেষ্ট পরিমাণে তা সংগৃহীত হতে পারত। তখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার প্রকৃতি ও পরিমাণ ছিল ভিন্ন। পণ্য দিয়েই পণ্যের লেনদেন চলত। ফলে সঞ্চয় ও সম্পদ জমিয়ে বাড়িয়ে তোলার অবকাশ ছিল কম। এ ছাড়া আদিবাসী ও উপজাতি রীতিনীতি ছিল এভাবে ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চিত করার পরিপন্থী।

'বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যা বলেছেন তা এই উপলক্ষে উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল 'বহু প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ় ভূমিতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র একটা সামাজিক জীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষ করিয়া রাঢ়ভূমিরই সম্পদ। সেই জন্য এই কাব্যে চরিত্র সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য বিষয়বস্তুতেও একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়দেশ বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রবল অনার্য জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত। বিহার প্রদেশ হইতে আর্য সভ্যতা সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল, এই উত্তরবঙ্গ পথেই আর্যসভ্যতা য়ুয়ান চুয়ার্ডের সময়েই কামরূপ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সেই জন্য বহুকাল পর্যন্ত রাঢ় প্রদেশের অভ্যন্তর অনার্য জাতিরই বাসভূমি রহিয়া গিয়াছিল। এমন কি খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ব্যাধ কালকেতু নিজের সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিতেছে—

'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।'

তারপর আরও বলিতেছে—'ব্যাধ গোহিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়', রাঢ়ের চোয়াড় জাতির মতো ডোম জাতিও ইহার প্রাচীন অধিবাসী। ডোম জাতির বীরত্বের কথা সারা বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়ার আজিও শুনিতে পাওয়া যায়—যেমন 'আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে' অর্থাৎ অগ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল, বাগ বা পার্শ্বরক্ষক ডোম-সৈন্যদল ও ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এই বীর ডোমজাতির বিজয়গাথা।

ইহা হইতেই জানা যাইবে যে, বাংলার কেন্দ্রীয় যে সভ্যতা তাহার সহিত ওই অনার্য অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীর প্রায় কোনওই যোগ ছিল না। তাহারা দৈব্যশক্তি অপেক্ষা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল বেশি, কারণ কোনও দৈব প্রলোভন তাহাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। রাঢ় চিরদিনই বীরের ভূমি—বীরভূম, মল্লভূম, শুরাভূম— সেই জন্যই তাহার এই নামকরণও সার্থক। ব্যক্তি চরিত্রের এই যে মহান আদর্শ তাহা হইতে স্খলিত করিয়া দুর্বল দেবতার পাদমূলে মানুষকে আনিয়া সেখানে বলি উপহার অর্পণ করা হয় নাই। মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব লইয়া দেবতারও উর্ধ্বে উঠিতে পারে, এই কাব্যগুলিতে তাহারই নির্দেশ রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কালকেতু, ডোমজাতির পুরুষ ও নারীচরিত্রগুলিই রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করিতেছে।

রাঢ় অঞ্চলের একেবারে কেন্দ্রস্থলে ছিল বাঁকুড়া জেলা। ঐতিহাসিক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'উত্তররাঢ় যেমন ছিল অজয় পারের বীরভূম, দক্ষিণরাঢ় যেমন শিলাবতী বহির্ভূ মেদিনীপুর, পশ্চিমরাঢ় যেমন ছোটনাগপুর সন্নিহিত অরণ্য-পর্বত অঞ্চল এবং পূর্বরাঢ় যেমন ভাগীরথী অভিমুখী ক্রমনিম্ন সমভূমি— তেমনই এসব প্রান্তের একেবারে কেন্দ্রে বলে বাঁকুড়া মধ্যরাঢ়।'

প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিকলাল সিংহও বাঁকুড়াকে মধ্যরাঢ় বলেছেন—পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া-সংস্কৃতি ২য় সং ১৯৭৬।

'স্টাডিস ইন দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ওড়িয়া'—গ্রন্থে বিনোদ এম দাশ (কলকাতা ১৯৭৮) লিখেছেন 'প্রকৃতপক্ষে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রোপকূল, বালেশ্বর থেকে অজয় অর্থাৎ ছোটনাগপুরের মালভূমি পূর্ব অরণ্য অঞ্চলের পূর্বান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অংশে বিভক্ত ছিল। অরণ্যসন্তানদের নানা সম্প্রদায় শাসিত এইসব অংশগুলি ছিল তাদের ভূম বা আবাসস্থল। যেমন তুঙ্গভূম, ধলভূম, শিখরভূম, মল্লভূম, ব্রাহ্মণভূম, আদিত্যভূম, সেনভূম, গোপভূম, শূরভূম ইত্যাদি।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন এসেছিলেন বাংলায়। তাঁদের ভ্রমণ বিবরণী থেকে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অরণ্যপ্রদেশে অনেক ছোট ছোট রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মগধের

রাজধানি পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্তে আসতে অরণ্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হত, তার দুদিকে ছোটবড় অনেক রাজ্য ও জনপথ গড়ে উঠেছিল। এই ধরনের পথগুলির ভেতর সবচেয়ে সোজা পথটি ছিল বর্তমান বাঁকুড়া জেলার ভেতর দিয়ে। তাম্রলিপ্ত থেকে বিষ্ণুপুর, বহুলাড়া, সোনাতপল, একেশ্বর, ছাতনা, রঘুনাথপুর, তেলকুপি, ঝরিয়া, রাজৌলি ও রাজগীর হয়ে যে যে জায়গায় নদী ও পাহাড় পার হতে হত, সেখানেই একটি করে জনপথ গড়ে উঠেছিল। যেমন শিলাবতী নদীর তীরে ঘাটাল, দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বহুলাড়া, একেশ্বর, পাহাড়ের কাছে রাজৌলি, রাজগীর ইত্যাদি। ঠিক সেরূপে গৌর, নবদ্বীপ থেকে নীলাচল বা পুরী যাওয়ার প্রধান রাস্তা ছিল বিষ্ণুপুর হয়ে। এই পথের পাশেই বিষ্ণুপুর রাজধানী পড়তো। যুদ্ধ অভিযানে সৈন্য চলাচল ও শ্রেষ্ঠীদের ব্যবসা-বাণিজ্য এই সব পথ ধরেই অনুসৃত হত।

এই জঙ্গলমহলে ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজগোষ্ঠী ছিল বিষ্ণুপুরে মল্লরাজবংশ, মেদিনীপুরে কর্ণগড়, ঘাটশিলার ধলভূম। এ ছাড়া রাইপুর এলাকা নিয়ে তুঙ্গভূম, অম্বিকানগর এলাকা নিয়ে ঘুটুরা ধলভূম, ছাতনা ইত্যাদি এলাকা নিয়ে সামন্তভূম। এরূপ ছিল বরাভূম, মানভূম, ডামপাড়া, কুইলাপাল, ঝাড়গ্রাম, রামগড়, লালগড়, জামবন্দী, ধাদগা, বগড়ি, ছিল পাচেত, কাশীপুর, পাৎকুম, বাগমুণ্ডি ইত্যাদি।

মল্লরাজ্যই বাঁকুড়া জেলার বৃহৎ অংশ জুড়ে এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাঠামোটি গড়ে তুলেছিল। ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের বিবর্তনের ইতিহাসই এই জেলার বৃহত্তর জনজীবনের সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের মূল প্রবাহটি নিয়ন্ত্রিত করেছিল। মল্লরাজ্যের সীমানা ছিল সে সময় সমগ্র বাঁকুড়া, বর্ধমানের একাংশ, গড়বেতা, চন্দ্রকোণা ও পঞ্চকোট পর্যন্ত।

আদিমল্লের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়েছিল ঘাটরক্ষার মাধ্যমে। বনের ভেতর পথগুলি সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখা, অবাঞ্ছিত ব্যবসায়ী, পর্যটক ও অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি নজর রেখে রাজাকে সংবাদ দেওয়া, এমনকি যুদ্ধকালে সশস্ত্র যোগদান করার দায়িত্ব থাকতো ঘাটোয়ালদের উপর। এই ঘাটোয়ালদের জন্য নিষ্কর কৃষিজমি ও বন রাজারা দিতেন, একে বলা হত ঘাটোয়ালি। পথিক ও বণিককে বনে ঢুকতে হলে মুখ্য ঘাটোয়ালদের কাছ থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হত। সেজন্য সামান্য নজরানাও দিতে হত কখনও কখনও। ছাড়পত্র সঙ্গে থাকলে পথিক বা বণিক নির্বিঘ্নে বনাঞ্চল পার হয়ে যেতে পারতো, না থাকলে লুণ্ঠিত হবার আশঙ্কা থাকত পদে পদে। এক ঘাটোয়ালদের এলাকা থেকে অন্য মুখ্য ঘাটোয়ালের এলাকায় ঢুকলে নতুন করে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হত। প্রকৃতপক্ষে মল্লরাজ্যের মেরুদণ্ড ছিল এই ঘাটোয়ালি প্রথা।

এই ঘাটোয়ালদের অধীনে প্রতিরক্ষার জন্য যারা থাকত তারা হল পাইক। এরাও নিষ্কর জমি ভোগ করত। এই জমিকে বলা হত পাইকান জমি। ঘাটোয়ালদের 'সর্দার' বলেও বিবেচনা করা হত।

গ্রামপ্রধান সমাজব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের ভার থাকত গোমস্তাদের উপর। তাদের সাহায্য করত আটপ্রহরী বা পাইক। গ্রামের মুখ্যব্যক্তি থাকতেন মুখিয়া বা মণ্ডল অথবা মোড়ল। মুখিয়া বা
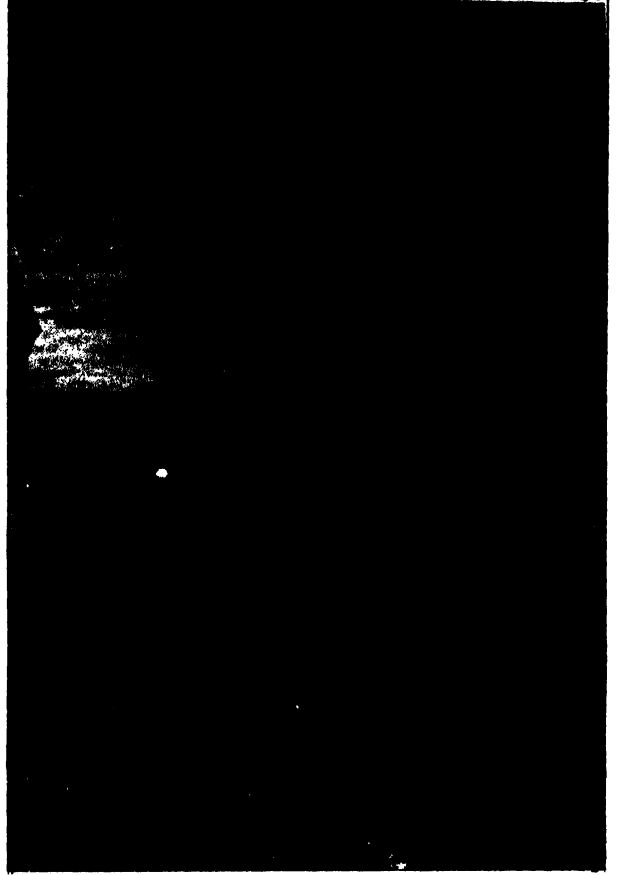
'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।'

মোড়লের দায়িত্ব কম ছিল না। পূজা-পার্বণ থেকে শুরু করে গ্রামের যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা থাকত অভিভাবকের মতো। সবাই তাঁকে মেনে চলত। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি হতেন তিনি। রাজা তাঁদের জমি বণ্টনেরও দায়িত্ব দিতেন। এঁদের অনেক গ্রামে 'মাহাতো' বলা হত। ন্যস্ত জমি তাঁরা ষোল ভাগে ভাগ করে দিতেন।

টাকাকড়ির অপ্রতুলতার জন্য মল্লরাজারা কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান করতেন। এই জমি দুইধরনের পঞ্চকী বা স্বল্প খাজনার আর বেপঞ্চকী বা বিনা খাজনার। ভূমির নামও ছিল নানা ধরনের। নাম শুনেই বোঝা যেত কি কাজের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। সেনাপতিকে যে জমি দেওয়া হত তার নাম 'সেনাপতি মহল', দুর্গরক্ষীদের জন্য জমির নাম ছিল 'মহল বেড়ামহল'। রাজার দেহরক্ষীরা ভোগ করতেন 'ছড়িদারি মহল' ইত্যাদি। রাজা ও সর্দারদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন, পালকিবহন, গৃহের নানাবিধ কাজে আরও অনেক লোক নিয়োজিত ছিল। এদেরও নিষ্কর জমি দেওয়া হত। এই সব জমিকে 'চাকরান' জমি বলা হত। হস্তশিল্পী, কারিগর, বৈদ্য, পণ্ডিত, হিসাবরক্ষক পুরোহিতরাও নিষ্কর জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ করত। নানা ধরনের চাকরান মহল ছাড়াও লাখেরাজ মহলের সংখ্যাও ছিল অজস্র। লাখেরাজ মহল হল সেই সম্পত্তি বা জমি যা সমাজের উচ্চশ্রেণী যথা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, পণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ, আচার্য ইত্যাদি রাজানুগৃহীত ব্যক্তিদের দেওয়া হত। এসব জমিও ছিল নিষ্কর।

> টাকাকড়ির অপ্রতুলতার জন্য মল্লরাজারা কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান করতেন। এই জমি দুইধরনের পঞ্চকী বা স্বল্প খাজনার আর বেপঞ্চকী বা বিনা খাজনার। ভূমির নামও ছিল নানা ধরনের। নাম শুনেই বোঝা যেত কি কাজের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। সেনাপতিকে যে জমি দেওয়া হত তার নাম 'সেনাপতি মহল', দুর্গরক্ষীদের জন্য জমির নাম ছিল 'মহল বেড়ামহল'। রাজার দেহরক্ষীরা ভোগ করতেন 'ছড়িদারি মহল' ইত্যাদি।

রাজ্যরক্ষার জন্য দুইধরনের সৈন্যদল থাকত (১) নিয়মিত বাহিনী, (২) অনিয়মিত বাহিনী বা পাইক। নিয়মিত সৈন্যদলের থেকে পাইকের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। এই পাইকগণও নিষ্কর—পাইকান জমি ভোগ করতেন।

সভ্যতার বিকাশের দিক থেকে অনুন্নত হলেও গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনগুলি নিম্নতম হলেও এই ব্যবস্থাটির মধ্যে আপাত স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা ছিল। দিল্লির শাসনকর্তারা এই আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোতে হস্তক্ষেপ না করে ভৌগোলিক কারণেও তাদের চাহিদার অনুপযোগী বলে এড়িয়ে গেছেন।

১৭৩২—৫২ পর্যন্ত মারাঠা বর্গীরা পাটনা অতিক্রম করে রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, গড়বেতা, চন্দ্রকোনা, মেদিনীপুরে নির্যাতন, হত্যা, লুঠ, সন্ত্রাস চালায় মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে মূলত আলিবর্দির নবাবী আমলে। এ সময় বাংলায় চরম নৈরাজ্য নেমে আসে। ভেঙে যাওয়া বিশাল সৈন্যবাহিনী আয়ের পথ না পেয়ে লুটপাটের জীবিকা গ্রহণ করে, জন্ম হয় 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের'। হান্টার লিখেছেন 'নিজেদের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হিসেবে সংঘবদ্ধ করে পঞ্চাশ হাজারের এক বাহিনী সারা দেশ বিচরণ করতে থাকে।' (দি এনালস অব রুর‍্যাল বেঙ্গল, ১৮৬৮)। জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই বিদ্রোহকে 'হিন্দুস্থানের যাযাবরদের পেশাদারি উপদ্রব, দস্যুতা, ডাকাতি' নামে উল্লেখ করলেও এটা ছিল ইংরেজ শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের কৃষক ও কারিগরদের প্রথম বিদ্রোহ (১৭৬৩)। কারণ, সন্ন্যাসীগণ ছিলেন প্রকৃতই কৃষক। এই কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ বা স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল হয়ে প্রায় চার দশক ধরে প্রজ্জ্বলিত ছিল এবং নানাস্থানে ইংরেজ বাহিনীকে তারা পর্যুদস্ত করতে পেরেছিল।

ইউরোপিয় বণিকগোষ্ঠী দিল্লির বাদশা, স্থানীয় সুবাদার ও ফৌজদারদের কাছ থেকে ব্যবসায়ের সনদ অর্জন করে। তারা উন্নত নৌসজ্জার ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নিয়ে ভারতের অফুরন্ত সম্পদ লুটে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাজির হয়। পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম ও ত্রিবেণীতে, ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায়, ফরাসিরা চন্দননগরে এবং ব্রিটিশরা কাশিমবাজার, কলকাতা ও বালেশ্বরে ঘাঁটি গাড়ে। এই বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের রাজন্যবর্গ, সামন্তশ্রেণী, ব্যবসায়ী ও আমলাদের বিরোধ শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সুকৌশলে লর্ড ক্লাইভ বাংলা-বিহারের ক্ষমতা দখল করে। 'নকল নবাব' বানিয়ে কার্যত লর্ড ক্লাইভই হয়ে যান আসল নবাব। ১৭৬০ সালে ওই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জঙ্গল এলাকাগুলিতে বাণিজ্য করার অধিকার মীর কাশিমের কাছ থেকে লাভ করে। ১৭৬৫ সালে দিল্লির বাদশা শাহ আলমের কাছ থেকে দেওয়ানি আদায়ের সনদ পায়। এইভাবে জঙ্গলমহলে রাজস্ব ও বাণিজ্যের স্বর্ণখনি পেয়ে যায়। ব্রিটিশরা ছিল উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ। তারা বহু ধনরত্ন উৎকোচ গ্রহণ করে এবং বহু জায়গায় লুণ্ঠন চালায়। দেওয়ানি আদায়ের অধিকার পেয়ে কোম্পানি মেদিনীপুরে রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। রেসিডেন্টগণ উচ্চহারে বার্ষিক খাজনা, রাজাদের জবরদস্তি উচ্ছেদ, আটক, নিলাম ইত্যাদি শুরু করে। রাজাদের উপর এদেশিয় দেওয়ান একজন নিয়োগ করে। ঘাটোয়ালদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য দারোগা নিয়োগ করে। ফসলের পরিবর্তে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন করে। সংবাদ চলাচলের জন্য হরকরা ব্যবস্থা এবং নিলামি জমিদারদের সুরক্ষার জন্য পুলিশ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খাজনা আদায়ের জন্য তিনটি ব্যবস্থা কার্যকর করে। প্রথম পর্যায়ে ১৭৬৫—৭২ পর্যন্ত স্থানীয় আদায় ব্যবস্থার মাধ্যমে, ১৭৭৩—৯১ সরকারি বলপ্রয়োগে বর্ধিত খাজনা আদায় করে। এটাই ছিল ১৭৯১ সালে কর্নওয়ালিসের 'দশশালা বন্দোবস্ত'। এইভাবেই দেশিয় অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করে এবং স্থায়ী রাজস্ব আদায়ের নীতি তারা গ্রহণ করে। তৃতীয় পর্যায়ে ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর জমিদার ও পাইকদের সামান্যতম অধিকারও লোপ পায়, পুরো ভূমিব্যবস্থা আমূল বদলে দিয়ে মারাত্মক পরিণাম ডেকে আনে।

বহু যুগ যুগ ধরে এলাকার কৃষক, হস্তশিল্পী, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, তাঁদের নায়ক সর্দার ও রাজারা যেসব স্বাধীনতা ভোগ করতেন, সেইসব স্বাধীনতা তাঁদের কেড়ে নেওয়া হল। নতুন ধরনের জমিদার তৈরি হওয়ায় জন্ম নিল একদল উপস্বত্বভোগীর যথা—তালুকদার, গাঁতিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতির। ব্রিটিশ, জমিদার আর উপস্বত্বভোগীদের শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল। এল কয়েক কোটি মানুষের মৃত্যু পরোয়ানা, ১৭৬৯-৭০ সালে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (বাংলা ১১৭৬) বা মহাদুর্ভিক্ষ। বাংলা, বিহার, ওড়িশার জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ আর কৃষকদের ৫০ শতাংশ এই কৃত্রিম ও সরকারসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মারা যায়।

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' চোয়াড়দের নিষ্কর জমি কেড়ে নিয়ে নতুন জমিদারদের লিজ বা ইজারা দেয়, পুরনো জমিদারদের সমস্ত জমিজমা কোম্পানির হাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। জমিদারদের পাইক রাখা নিষিদ্ধ হয়। এইসব হস্তক্ষেপ ও অধিকার হরণের প্রতিবাদে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ
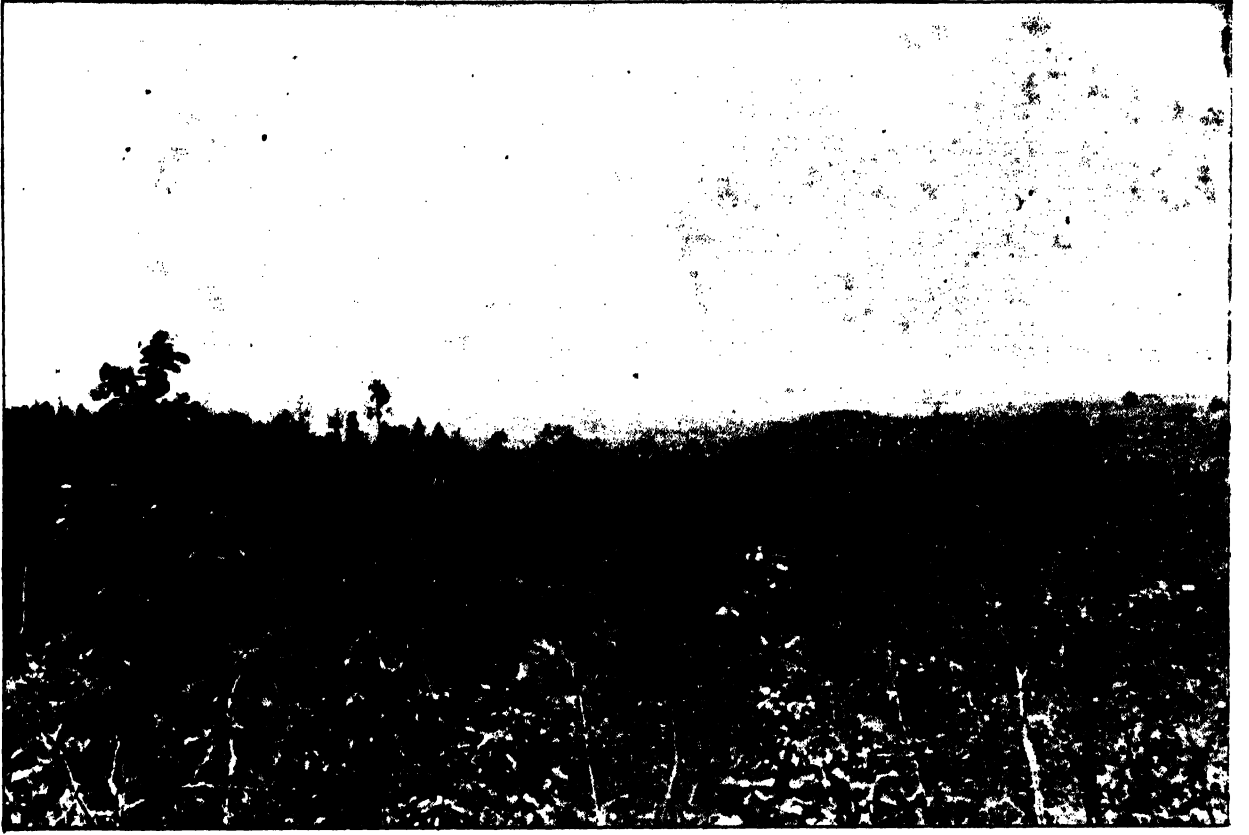
নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে দুর্জন সিং-এর পাইকদল ব্রিটিশ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ছবি : রানীবাঁধের ঝিলিমিলি জঙ্গল।

সশস্ত্র সংগ্রামের ঝাঁপিয়ে পড়েন। চোয়াড়দের উপদ্রব বলে হেয় করার চেষ্টা হলেও তা ছিল বাংলার কৃষকদের দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন।

ব্রিটিশ সৈন্যদলের রসদ আটকে দেওয়া, কর আদায় বন্ধ করে দেওয়া এবং নানাপ্রকার আক্রমণ চালানো, সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে আচমকা দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালানোর কায়দা চোয়াড়গণ অবলম্বন করেছিল। হিন্দু, মুসলমান, উপজাতি সকলকেই একজোট করেছিল, কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি, রাইপুরের রাজা দুর্জন সিং, তাঁর পুত্র ফতে সিং, বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিং, পৌত্র মাধো সিং, ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধল্ল, কুইলাপালের রাজা সুবলা সিং, চেতুয়া বরোদার রাজা শোভা সিং (মেদিনীপুর) বাগদি সম্প্রদায় থেকে আসা গোবর্ধন দিকপতি, এ ছাড়া কেনারাম বক্সী, রহমৎ খাঁ দিকওয়ার প্রমুখ অনেকেই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থে সুপ্রকাশ রায় যথার্থই উল্লেখ করেছেন 'ইংরেজ বণিক শাসনের এই আক্রমণের সম্মুখে সাধারণ কৃষক ও স্বাধীন জমিদারদের স্বার্থ এক হইয়া দাঁড়ায়। জমিদাররা কৃষকদের শত্রু হইলেও ইংরেজ শাসকেরা ছিল প্রবলতর শত্রু এবং মহাপরাক্রমশালী, সেইজন্য কৃষকগণ বহু ক্ষেত্রে জমিদারগণের নেতৃত্বে দলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল।'

বর্তমান বাঁকুড়া জেলার রাইপুরের দুর্জন সিং, এবং তাঁর পুত্র ফতে সিং ব্রিটিশ শাসক ও সৈন্যবাহিনীর কাছে ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৬৭ সালে গ্রাহাম মেদিনীপুরের শাসক হয়ে এসেই রাইপুরের দুর্জন সিংকে পরাস্ত করার এবং জঙ্গলমঙ্গলে আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করেন। এনসাইন জন ফার্গুসনের নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী মেদিনীপুরের পশ্চিমে জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়ে সুপুরে এসে ছাউনি ফেলেন। তিনি এখানে এসে খবর পান যে হাজার হাজার সশস্ত্র মানুষ আক্রমণ চালাচ্ছে। খাজনা দিচ্ছে না। তাদের নিযুক্ত জমিদারদের মেনে নিচ্ছে না। তাদের কাছারিবাড়ি ও দারোগার অফিস আক্রান্ত হচ্ছে।

দুর্জন সিংয়ের জমিদারি ছিল ২৭টি মৌজা নিয়ে। বাহান্ন পুরুষ ধরে বংশ পরম্পরায় তিনি জমিদারি ভোগ করছিলেন। কোম্পানির তরফ থেকে রাজস্ব বিরাট পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫০৯ টাকা করা হল। খাজনা আদায়ের জন্য 'সাজোয়াল' পাঠানো হল। তিনি এতে অপমানিত বোধ করলেন। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কৌশলে বর্ধমান প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলে কিছু সময় চেয়ে নিয়ে পাশাপাশি ভেলাই ডিহা, ফুলকুশমা ইত্যাদি এলাকার জমিদারদের জোট করে, সমস্ত পাইকদের সংগঠিত করে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে ব্রিটিশ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। তাঁদের আক্রমণে কোম্পানির পল্টন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

হান্টার লিখেছেন—'৩১ মার্চ, ১৭৭৩ ওয়ারেন হেস্টিংস স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন যে উপদ্রবকারীদের বিরুদ্ধে চার ব্যাটেলিয়ান সৈন্য সক্রিয়ভাবে নিয়োগ করা হলেও, জমিদারদের

১৭৬৭ সাল থেকে চোয়াড় বিদ্রোহ শুরু হয়ে জোয়ার-ভাটার মতো কখনও উঁচু বা কখনও নীচুতে চলতে থাকে। ১৭৯৮-৯৯ সালে বিদ্রোহ চরমে ওঠে। ১৮১৩-১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এবং ১৮৩২ সালে আবার ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিব্যাপ্তি লাভ করে যার নাম হয় 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা'। আবার এই আঞ্চলিক বিদ্রোহগুলি ক্রমে ক্রমে একত্রিত ও সঞ্চারিত হয়ে ১৮৫৭ সালে সিপাহিদের মহাবিদ্রোহের দাবানলে পরিণত হয়েছিল।

মিলিশিয়া নেওয়া হলেও তাদের সম্মিলিত আক্রমণ নিষ্ফল হয়েছে।'

রাইপুর সম্পর্কে কয়েকটি দলিলপত্র, আর্জি, মহাফেজখানায় সরকারি প্রতিবেদন পড়লে দেখা যায় যে দুর্জন সিং প্রথম দফায় নিরস্ত হয়ে ইংরেজদের নির্ধারিত খাজনা মেনে নিতে বাধ্য হয়। রাইপুরকে নদিয়ার রেসিডেন্টের অধীনে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু পরে খাজনা তো জমা দেনইনি, এমন কি নতুন খাজনাদার হীরালালকে রাইপুরে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। রাইপুরকে সেইজন্য আবার বর্ধমান রেসিডেন্টের অধীনে আনা হয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় ১৮০৫ সালে 'জঙ্গলমহল' জেলা গঠিত হলে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮১২-১৩ সালে ফের উপদ্রব শুরু হলে 'জঙ্গলমহল' জেলা তুলে দিয়ে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রাইপুরের খাজনা বাড়তে-বাড়তে ৩৫০০ টাকায় ওঠে। ১৮১৩-১৪ সনে ফতে সিংয়ের সঙ্গে চুক্তির পর ফের তা ২৫০৯ টাকায় নামানো হয়।

এইভাবেই রাইপুরের বিদ্রোহ ১৭৬৭—৬৯ সন থেকে ১৮৩২-এর 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা' পর্যন্ত কখনও নীচে, কখনও উচ্চে জোয়ার-ভাটার মতো চলছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরকাইভস রেকর্ডসে (৬ ফেব্রুয়ারি : ১৭৯৫) পাওয়া যায় রাজা ফতে সিং ছিলেন দুর্ধর্ষ। তিনি রাইপুরের কাছারিবাড়ি লুণ্ঠন করেন, আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করেন, সাওপ্রসাদ ও অন্যান্য তার কর্মচারিদের নয়াঘরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন। লেঃ হীলের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী ফতে সিংকে খুঁজে বের করার জন্য নয়াঘর, সারাকল, কুইলাপাল থেকে ধাদকা পর্যন্ত অনুসরণ করে। কিন্তু ফল হয় নাই, অবশেষে লেঃ হীল দেখতে পান যে তিনি নিজেই চোয়াড়দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গেছেন।

তরুণদেব ভট্টাচার্য তাঁর 'পশ্চিবঙ্গ দর্শন ও বাঁকুড়া' গ্রন্থে লিখেছেন 'পলাশি যুদ্ধের পরেও মল্লরাজারা স্বাধীন রাজার মতো আচরণ করতেন। আমল দিতেন না নবাবী সৈন্যদের। সোনামুখীর ইংরেজ গোমস্তাদের কাছ থেকে আগের মতো শুল্ক আদায় করা হত, তাতে রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা।

টাকা ছাড়াও মীর কাশিমের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তি ছিল বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম তিনটে চাকলা কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হবে। কোম্পানি ও সৈন্যদের খরচখরচা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের রসদ জোগাবার ব্যয় এদের আয় থেকে নির্বাহিত হবে। লাভ-লোকসান ও দায়দায়িত্বের ভার কোম্পানির।'

এই চাকলাগুলি অধিগ্রহণের পর কোম্পানি ছোট ছোট সব রাজাগুলির উপর খাজনা ধার্য করে। সুপুর পরগনার খাজনা ধার্য হয়েছিল ৫৪ টাকা, অম্বিকানগরে ৩১১ টাকা, ছাতনার ৮৭৯ টাকা ১১ আনা—Letter No. 139, March 6, 1767, দ্রষ্টব্য ১৫।

মল্লভূম রাজার উপর বার্ষিক খাজনা ৩ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। ওই টাকা দিতে রাজা চৈতন্য সিংহকে মুচলেকা দিতে হয়। ওই টাকা দিতে না পারায় বহু জমি বর্ধমান রাজা ও অন্যান্যদের মধ্যে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। জমির বকেয়া খাজনার জন্য রাজাকে কারারুদ্ধ করা হয়। বিষ্ণুপুরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মল্লরাজাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছিল। হান্টারসাহেব লিখেছেন 'বিষ্ণুপুরে বিশৃঙ্খলা অচিরেই বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়। বকেয়া খাজনার জন্য রাজাকে কয়েদ করা হয়। কালেক্টর মিঃ হেসিল রিজের প্রধান করণিককে জমিদারির ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করা হয়। অধিবাসীরা এই কারণেই উপদ্রবকারীদের সঙ্গে সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে।' (পৃঃ ৫৫।। হান্টার।। ঐ।।)

সে সময় বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংয়ের দুই পুত্র চৈতন্য সিং ও দামোদর সিংয়ের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে। দামোদর সিং জানকুড়ির দায়িত্বে থাকলেও ব্রিটিশ সৈন্যদের সহায়তায় বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন। কিন্তু সুরক্ষিত গড়, পরিখা, সংগঠিত সৈন্যসামন্তের কাছে পরাভূত হন। কিছুদিন পরে অতিরিক্ত খাজনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নবাব ও কোম্পানির সৈন্যদের নিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, শহরটি তছনছ করেন। চৈতন্য সিংহ আমাইনগরে (বর্তমান অম্বিকানগরে) পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে রাইপুর, আমাইনগর, তুঙ্গভূম, বরাভূম, সামন্তভূম প্রভৃতি রাজাদের সাহায্য নিয়ে দামোদর সিংকে বিতাড়িত করে কোম্পানিকে ৪ লক্ষ টাকার খাজনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চৈতন্য সিং বিষ্ণুপুরের রাজা হয়ে বসেন। যদিও এত টাকা খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা রাজার ছিল না। চৈতন্য সিং নিজে ছিলেন একজন ইংরেজবিদ্বেষী। ইংরেজরাও তাঁকে বিশ্বাস করত না।

ফোর্ট উইলিয়ামের সদর দপ্তরে তৎকালে যে সব প্রতিবেদন পাঠানো হত তা পড়লে দেখা যাচ্ছে যে (১) ১৭৯৯ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সংগঠিত চুয়াড়রা বিষ্ণুপুর, ওন্দা, সুরুল, সোনামুখী, পাত্রসায়ের প্রভৃতি এলাকা তছনছ করছে, (২) অফিসাররা কলকাতার সদর দপ্তরে ফোর্স পাঠাবার জন্য বারবার কাতর আবেদন জানাচ্ছে। (৩) নিলামে নিযুক্ত জমিদাররা রাজস্ব না দেওয়ার কারণ জানাচ্ছে। (৪) নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ শাসকদের কাছে বারবার আর্জি জানাচ্ছে, কেউ কেউ মিলিটারি গার্ড চাইছে। (৫) তারা অভিযোগ জানাচ্ছে যে, এই ডাকাতি ও লুটতরাজের কোনও

কোনওটিতে নেতৃত্বে রয়েছে এক বালক। মল্লরাজার এক পৌত্র, নাম মাধো সিং।

বিষ্ণুপুর পরগনার (জেলা) কমান্ডার ছিলেন লেঃ আর স্পটিশউড। ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ তারিখে তিনি ওন্দা ক্যাম্প থেকেই বর্ধমানের অ্যাকটিং ম্যাজিস্ট্রেট সি আর ব্লান্টকে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন (পশ্চিমবঙ্গ আরকাইভস রেকর্ড পৃঃ ২১৩ খণ্ড ৪৮) :

স্পটিশউডের প্রতিবেদনের অংশ—

আমাকে জানানো হয়েছে যে, ডামপাড়া জঙ্গলে ওন্দার পশ্চিমদিকে কয়েক ক্রোশ দূরে দুইশতাধিক চুয়াড় সমবেত হয়ে এই জেলায় অভিযান করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকাল হওয়ার পূর্বেই তাদের হতভম্ব করার নিমিত্ত আমি তৎক্ষণাৎ অভিযান করলাম। আমার 'Hircarrah' রাস্তা ভুল করার জন্য সূর্যোদয়ের আগে আমি পৌঁছাতে পারলাম না। পৌঁছে দেখলাম অধিকাংশ চুয়াড় স্থানত্যাগ করেছে। কেবলমাত্র ২৫ বা ৩০ জন সশস্ত্র চুয়াড় আছে। তাদের সঙ্গে একটি বালক আছে। বালকটি হচ্ছে বিষ্ণুপুর রাজার পরিবারের কোনও বংশের একদা ছেলে। ঘোড়া দ্রুত ধাবমান হওয়ায় তাদের সাতজনকে এবং ছেলেটিকে ধরে ফেলতে সফল হলাম। যাদেরকে প্রথমে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়েছি পরে তাদেরকে বর্ধমানে চালান দেওয়া হবে।

আমাকে জ্ঞাত করা হয়েছে যে, এই জেলায় আক্রমণে ডামপাড়া জঙ্গলের চতুর্দিকে একটি ভয়ানক শক্তিশালী দল তৈরি হচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে দেশের এই অংশের রক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত সৈন্যদলের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন আছে। বিষ্ণুপুর রাজার ছেলে মাধব সিংহ নিম্নলিখিত জমিদারদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এই কাজে নিযুক্ত আছে। তারা বর্তমানে দেশলাই কাঠি এবং লৌহের টুকরা বা যন্ত্রাংশ হতে গোলা তৈরি করছে। এগুলি তারা নিকটবর্তী স্থান হতে বহন করে নিয়ে গেছে এই ভেবে যে উপরি-লিখিত মাধো সিংহ দু-দিন পূর্বে বিষ্ণুপুর হতে তার পরিবারকে স্থানান্তরিত করেছে।

আমি হঠাৎ একটি সংবাদ পেলাম যে চুয়াড়গণ আগামীকাল বিষ্ণুপুর লুটপাট করতে মনস্থ করেছে। এই স্থানের নিরাপত্তার জন্য ৪৬ জন সঙ্গীসহ একজন সুবেদার সেখানে রাখলাম। আমি ভোড়ার (ভড়ার) দারোগার সহায়তার নিমিত্ত সঙ্গীদের প্রেরণ করতে সুবেদারকে নির্দেশ দিয়েছি, যেহেতু দারোগা আমাকে জানিয়েছে যে, চুয়াড়গণ উপস্থিত হয়েছে এবং তার কর্মস্থলের নিকট একটি গ্রামকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এইসব আর্জির অনুবাদ ম্যাজিস্ট্রেট সই করে ও অনুমোদন করে সদর দপ্তরে পাঠিয়েছেন। 'বর্ধমানের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের উল্লিখিত পত্রানুযায়ী কমান্ডার-ইন চিফ বোর্ডকে জানান যে মেদিনীপুরের কমান্ডিং অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনতিবিলম্বে এক কোম্পানি সিপাহি বিষ্ণুপুরে লেঃ স্পটিশউডের অধীনে যে বাহিনী আছে সেখানে পাঠাতে হবে।'

বিষ্ণুপুরে বিদ্রোহের গভীরতা কত তীব্র ছিল উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি তার প্রমাণ। পশ্চিমবঙ্গ আরকাইভস রেকর্ডস এবং মহাফেজখানার দলিল ও দরখাস্তগুলি পড়লে এইরূপে তথ্য আরও জানা যাবে।

সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল এভাবে যখন উত্তপ্ত তখন ইংরেজ শাসকদের

ফোর্ট উইলিয়ামের সদর দপ্তরে তৎকালে যে সব প্রতিবেদন পাঠানো হত তা পড়লে দেখা যাচ্ছে যে (১) ১৭৯৯ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সংগঠিত চুয়াড়রা বিষ্ণুপুর, ওন্দা, সুরুল, সোনামুখী, পাত্রসায়ের প্রভৃতি এলাকা তছনছ করছে, (২) অফিসাররা কলকাতার সদর দপ্তরে ফোর্স পাঠাবার জন্য বারবার কাতর আবেদন জানাচ্ছে। (৩) নিলামে নিযুক্ত জমিদাররা রাজস্ব না দেওয়ার কারণ জানাচ্ছে। (৪) নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ শাসকদের কাছে বারবার আর্জি জানাচ্ছে, কেউ কেউ মিলিটারি গার্ড চাইছে। (৫) তারা অভিযোগ জানাচ্ছে যে, এই ডাকাতি ও লুটতরাজের কোনও কোনওটিতে নেতৃত্বে রয়েছে এক বালক। মল্লরাজার এক পৌত্র, নাম মাধো সিং।

কৌশলী-বুদ্ধি কাজ করেছে। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট উইলিয়াম স্ট্রাচি ১৩ এপ্রিল ১৮০০ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ামকে সুপারিশ করেন যে পূর্বতন রাজাদের জমিদারিতে শান্তি আনতে গেলে তাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। পাইকান, চাকরান সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে। ঘাটোয়ালদের পুলিশী অধিকার আংশিক সংরক্ষণ করতে হবে। দারোগাদের যতটা সম্ভব নিরস্ত্র করতে হবে। নবতম জমিদারদের অত্যাচারের প্রতি নজর দিতে হবে।

কৌশলগুলি সদর দপ্তর কাজে লাগায়। তারা রণক্লান্ত সর্দারদের মধ্যে বিভেদ আনতে সমর্থ হয়। ঘাটোয়ালদের সমর্থন পেতে থাকে। বিদ্রোহ অনকটা প্রশমিত হলে মেদিনীপুর, মল্লভূম, বর্ধমান জেলার কিছু অংশকে নিয়ে ১৮০৫ সনে 'জঙ্গলমহল' জেলা গঠন করে। বাঁকুড়া গ্রামটিতে সদর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে।

বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের আর্থিক অবস্থা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাজন্যবর্গের জন্য মাসোহারা নির্ধারিত হয়। আর্জি পড়ে দেখা যায় চৈতন্য সিংয়ের পুত্রগণ ভাতার পরিবর্তে চাষবাস ও ভরণপোষণের জন্য জমি চায়।

জঙ্গলমহলের ম্যাজিস্ট্রেট বিষ্ণুপুর রাজ সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। তিনি বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারবর্গের জন্য খয়রাতির সুপারিশ করেন, কেননা এই পদক্ষেপ পরগনার শৃঙ্খলা ও শান্তির সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে সংযুক্ত হবে। (আরকাইভস খণ্ড ১৫০ পৃঃ ১০৩)

জঙ্গলমহলের নিবিড় বনাঞ্চল ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ও দালালদের অত্যধিক লোভ-লালসার যূপকাষ্ঠে ক্রমশ শেষ হতে থাকে।

বনসম্পদই অরণ্যবাসীদের জীবিকা ও আশ্রয়স্থল ছিল। মূল্যবান কাঠের কারবারে বণিক গোষ্ঠী ও দালালরা ফুলেফেঁপে উঠে। আবাসিক চুয়াড়দের যুগ যুগ ধরে শান্ত শীতল আবাসস্থল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সিং-সর্দারদের ক্রোধজনিত নৈরাজ্যিক কর্মসূচি সর্বোপরি উৎপাদনকারী কৃষক ও হস্তশিল্পীদের ছিন্নভিন্ন অবস্থা বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জগৎটিকে সম্পূর্ণ উলটে দেয়।

সর্দারেরা উৎকল প্রদেশ, উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে কিছু মানুষকে নিজেদের প্রয়োজনে অনুপ্রবেশের ও বসবাসের সুযোগ দেয়। তাঁদের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়বোধ, উচ্চবর্ণের মানসিকতা। তারা চুয়াড় সম্প্রদায়ের অধিপতিদের মধ্যে এই মানসিকতা ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়। পরগনার রাজারা কেউবা বিক্রমাদিত্যের বংশধর, কেউবা উজ্জয়িনীর উত্তরাধিকারি প্রভৃতি বলে আখ্যাত হতে চান। বিষ্ণুপুরের আদিমল্ল হয়ে গেলেন বাগ্দি রাজার বদলে বাগ্দি মায়ের ঘরে পালিত উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় রাজের পরিত্যক্ত সন্তান। অনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৈতা গ্রহণ করে উচ্চবর্ণের মানুষ হয়ে যান।

রাজা বীর হাম্বীরের আমলে রাজ্যে বৈষ্ণবতা প্রবেশ করে। লালবাঈয়ের আবির্ভাবের আগে রাজাদের মধ্যে বিলাস-বৈভব ছিল না। জঙ্গলমহল, তুঙ্গভূম, মানভূম, বরাভূম প্রভৃতি কোথাও সেরূপ বিলাস-বৈভব, আমোদ-প্রমোদপ্রিয়তার নিদর্শন নেই। রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যুগ যুগব্যাপী সম্পর্কের ক্ষেত্রটি ছিল স্বচ্ছ ও স্পষ্ট।

মহামতি কার্ল মার্কস ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করেছেন—জঙ্গলমহল সম্পর্কেও সেই কথা সত্য—

'ইংলন্ডই ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙে দিয়েছে। পুনর্গঠনের কোনও লক্ষণ এখন অদৃশ্য। পুরানো জগতের অপহৃত, অথচ নতুন কোনও জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার উপর একটা বিশেষ রকমের বিপদের আবির্ভাব ঘটেছে ও ব্রিটেন শাসিত হিন্দুস্থান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।' (পৃঃ ৮, ভারতে ব্রিটিশ শাসন : মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন ১ম খণ্ড ২য় অংশ, লন্ডন, ১০ জুন ১৮৫৩)

১৭৬৭ সাল থেকে চোয়াড় বিদ্রোহ শুরু হয়ে জোয়ার-ভাটার মতো কখনও উঁচু বা কখনও নীচুতে চলতে থাকে। ১৭৯৮-৯৯ সালে বিদ্রোহ চরমে ওঠে। ১৮১৩-১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এবং ১৮৩২ সালে আবার ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিব্যাপ্তি লাভ করে যার নাম হয় 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা'। আবার এই আঞ্চলিক বিদ্রোহগুলি ক্রমে ক্রমে একত্রিত ও সঞ্চারিত হয়ে ১৮৫৭ সালে সিপাহিদের মহাবিদ্রোহের দাবানলে পরিণত হয়েছিল।

ঋণ স্বীকার :

১। বাংলার মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
২। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়
৩। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ও বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য
৪। বাঁকুড়া জেলা কৃষক সমিতির ফোল্ডার।

লেখক : *কৃষক আন্দোলনের নেতা। কৃষক সভা, বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য*
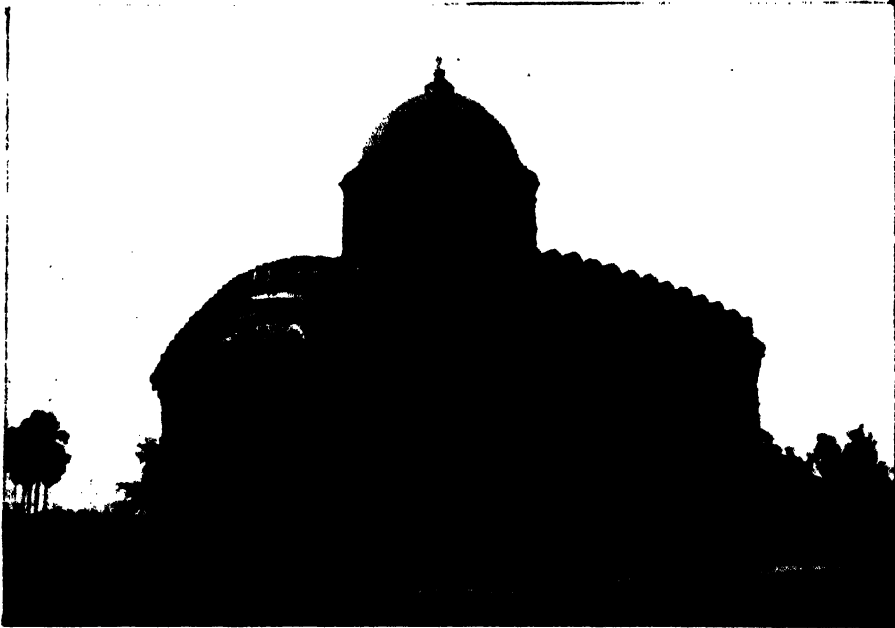
১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ দুর্জন সিং প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন মন্দির, বিষ্ণুপুর
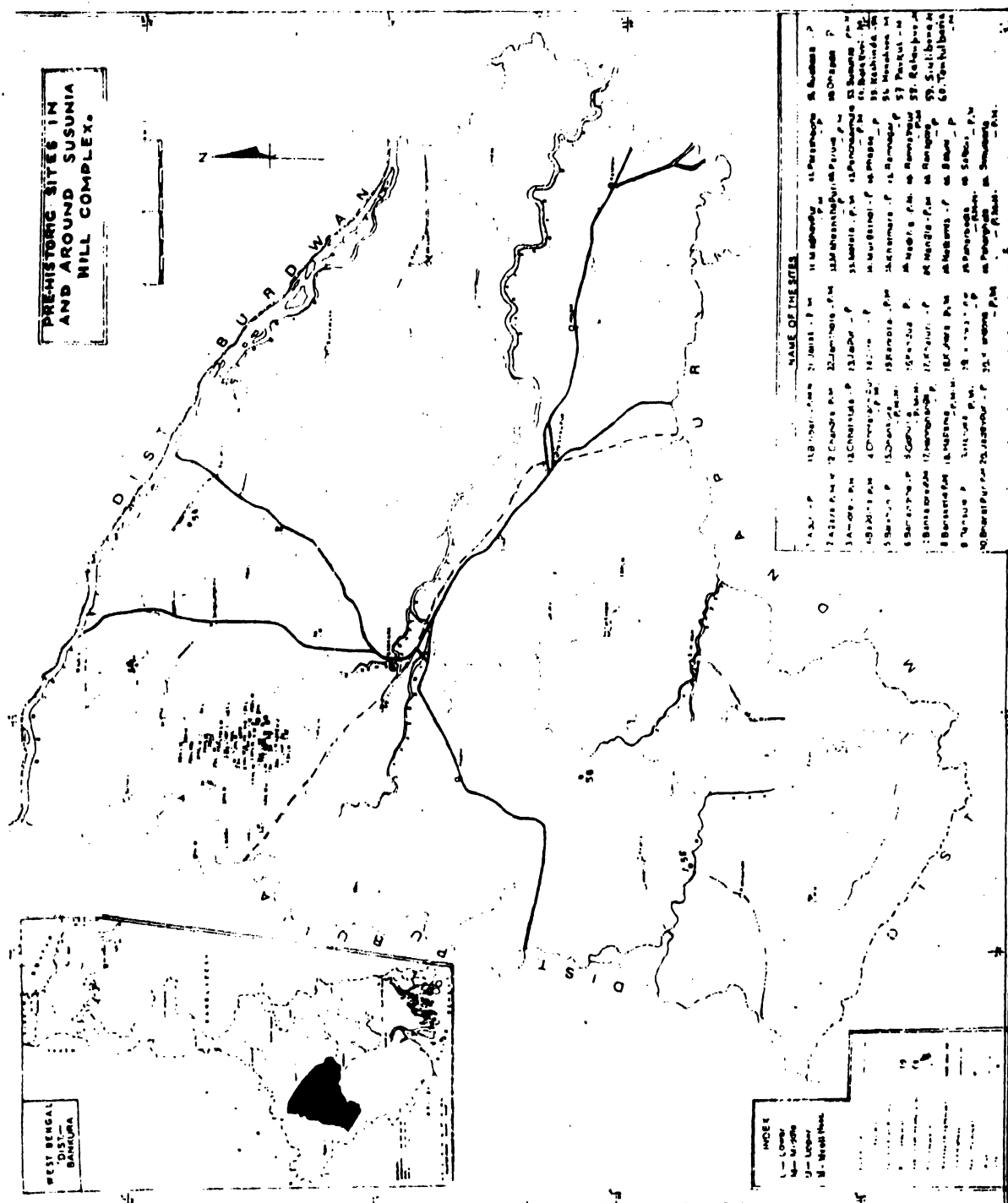
প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল, শুশুনিয়া অঞ্চলের মানচিত্র

কৃষক আন্দোলনে বাঁকুড়ার ইতিহাস

নকুল মাহাত

জঙ্গলমহলের বিদ্রোহ এক চরম মাত্রায় পৌঁছয় ১৭৯৮-৯৯ সালে। ১৮১৩ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এবং ১৮৩২ সালে ভয়াবহ আকার ধারণ করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন গঙ্গানারায়ণ সিং 'গঙ্গা হাঙ্গামা' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনে বহু শহিদের রক্তে মাটি লাল হয়েছিল। এই বিদ্রোহ ছিল স্বাধীনতার বিদ্রোহ বা কৃষক কুটিরশিল্পী ব্যবসায়ী সমস্ত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের রায়ে ক্ষমতায় আসে কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে। নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে বামফ্রন্ট ৩৬ দফা কর্মসূচি হাজির করে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা ও পঞ্চায়েতব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা। এইসব ৩৬ দফা কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই কর্মসূচির ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের অর্ধাংশ গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যয় করা এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ভূমিসংস্কারকে যুক্ত করা, বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, সরকারি খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিনামূল্যে পাট্টা বন্দোবস্ত করা, গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা, সেচ, রাস্তা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজে গ্রামের গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি করা। ফলে যে বাঁকুড়া জেলা খরা, দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলা হিসাবে চিহ্নিত ছিল, সে জেলার মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে এবং পূর্বাঞ্চলে কাজ ও জীবিকার সন্ধানে যেতে বাধ্য হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে গ্রাম বাংলার অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গ্রামে খাদ্যের সংকট কমেছে, এখন মানুষকে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতে হয় না। খাদ্যে আজকের বাঁকুড়া জেলা স্বয়ম্ভর, কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিকাশ জেলায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে নানা ধরনের আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার লাল মাটি পাথরে ভরা, পাহাড়ে ঘেরা শাল, সেগুন, শিশু, পিয়াল, পলাশ, শিমুল, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, আম, জাম, কাঁঠাল গাছের সমারোহ নয়নজুড়ানো কংসাবতী বাঁধে বিদেশি পাখির আনাগোনা আর সৃতানের বনভূমিতে হরিণের মেলা, পাখির কোলাহল, তালেবেড়া বাঁধ, ঝিলিমিলির সৌন্দর্য শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, জয়পুরের শালজঙ্গলে হাতির আনাগোনা এবং সোনামুখী জঙ্গলে ময়ূরের কেহু কেহু ডাক প্রকৃতির ছোট-বড় পাহাড় পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। এর সঙ্গে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির, দলমাদল কামাল, মদনমোহনের মন্দির প্রভৃতি জায়গায় পর্যটকদের আনাগোনা। মল্লরাজের রাজধানী বিষ্ণুপুর ও জয়রামবাটি, মা সারদা দেবীর জন্মস্থান। এই জেলায় বহু মনীষী, কবি, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জ্ঞানী এবং গুণী জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষক আন্দোলনে বাঁকুড়ার ইতিহাস কথাটির মধ্যে কিছু তাৎপর্য বোঝায়। সাধারণভাবে ইতিহাস বলতে বুঝি প্রাচীনকালের রাজাদের লড়াইয়ের কাহিনী, কোন রাজা কাকে পরাজিত করল বা রাজত্ব দখল করল, কার কত সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি। ইতিহাসের কোথাও সেরকমভাবে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষের এবং

খাদ্যে আজকের বাঁকুড়া জেলা স্বয়ম্ভর ছবি : সুবলচন্দ্র হেমব্রম

রাজা জমিদার ও ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের রোষ

সমাজের জীবন, জীবিকা, ভাষা, শিক্ষা, খাদ্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা হয়নি।

১৭৫৭ সালে ইংরেজ কোম্পানি বাংলা, বিহার, ওড়িশার ক্ষমতা দখল করার পর বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমে যে বনাঞ্চল ছিল তাকে দখল করার জন্য ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি পাওয়ার পর সেই জঙ্গল মহলের নিরীহ কৃষক ও কুটিরশিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের উপর নানা ধরনের খাজনা বা ট্যাক্স চাপানোর জন্য নানা ধরনের আইন-কানুন তৈরি করে, যাতে করে নতুন ধরনের জমিদারের জন্ম দেওয়া যায়। সেই কারণে ১৭৭২ সালে পাঁচসালা বন্দোবস্ত ঘোষণা করে, ফলে কৃষকদের বা রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধ হয়। রাজারা তাদের রাজত্বকে শান্তিশৃঙ্খলায় রাখার জন্য ঘাটুয়াল নিযুক্ত করতেন। তারাই ঘাট রক্ষা করত। তার জন্য তাদেরকে নিষ্কর জমি দেওয়া হত। রাজাদের আরও যে সমস্ত বরকন্দাজ বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকত রাজা তাদেরও নিষ্কর জমি দিত। এই স্বত্বের নাম ছিল লাখেরাজ সম্পত্তি। জঙ্গল এলাকায় যে সমস্ত চাষী জমি চাষ করতেন রাজার অনুমতি নিয়ে তাঁরা খাজনা দিতেন ফসলের একাংশ। জমির নাম ছিল 'কোরফা', 'রায়ত'। নামমাত্র খাজনাকে 'পঞ্চকি' বলা হত। গ্রামগুলি ছিল আত্মনির্ভরশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাষীদের দুরকম নাম ছিল। পাঁচসালা বন্দোবস্তের পর ব্রিটিশ কোম্পানী জোর করে খাজনা আদায় করার জন্য জমি থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করে। রাজাদেরও তেমন অবস্থা ছিল না যে খাজনা দিতে পারে। রাজা এবং ঘাটোয়াল ও কৃষকরা মিলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। ১৭৭০ এর দুর্ভিক্ষ বা ৭৬ এর মন্বন্তর ঘটে। বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। এর পরবর্তীকালে ১৭৯২-এর দশসালা বন্দোবস্ত এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে। এই হস্তক্ষেপ ছিল কৃষকের যে জমির অধিকার ছিল সেই অধিকার হরণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের চক্রান্ত।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকরা সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর নেতৃত্বে ছিলেন আমাদের বাঁকুড়া জেলার রাইপুরের দুর্জন সিং ও ফতে সিং। পরে সাহায্যকারী হিসাবে ছিলেন সিংহ, সর্দার, বাগদি, লোহার, বাউরি, মাহাত, লায়েক, কোড়া, সাঁওতাল প্রভৃতি। এদের উচ্চবর্ণের লোকেরা হীন চুয়াড় বলে ঘৃণা করত। ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস রচয়িতারা এদের বিদ্রোহকে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' বলে ছোট করতে চেয়েছেন। এই বিদ্রোহ জমির অধিকারের লড়াই হিসাবে চিহ্নিত এবং স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বিদ্রোহকে জব্দ করার জন্য ১৮০৫ সালে জঙ্গলমহল জেলা ঘোষণা করে, যার প্রধান কার্যালয় ছিল মেদিনীপুর। এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য নানারকম আইন-কানুন আরোপ করেছে এবং ব্রিটিশ ফৌজ বারেবারে আক্রমণ

নবান্নের দীপ্তিতে উজ্জ্বল কৃষক রমণী

করেছে। কিন্তু মানুষ তা মাথা পেতে নেয়নি। ১৭৬৫—১৮৩২ সাল পর্যন্ত বারে বারে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে, প্রাণ দিয়েছে, দুর্জন সিং ও তাঁর পুত্র ফতে সিং ব্রিটিশ শাসক ও সৈন্যবাহিনীর কাজে ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের অসহযোগিতার জন্য ব্রিটিশ শাসক হীরালালকে নিযুক্ত করেছিলেন রায়পুরের জমিদার হিসাবে। কিন্তু হীরালালকে ওই জমিদারিতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এইভাবে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর মুখে দাঁড়াতে না পেরে জঙ্গল মহলের বিদ্রোহ এক চরম মাত্রায় পৌঁছায় ১৭৯৮-৯৯ সনে। ১৮১৩ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এবং ১৮৩২ সালে ভয়াবহ আকার ধারণ করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন গঙ্গানারায়ণ সিং 'গঙ্গা হাঙ্গামা' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনে বহু শহিদের রক্তে মাটি লাল হয়েছিল। এই বিদ্রোহ ছিল স্বাধীনতার বিদ্রোহ বা কৃষক, কুটিরশিল্পী, ব্যবসায়ী সমস্ত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম। এঁরাই ছিলেন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যে এবং আর্থিক উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার থেকে পিছিয়ে থাকলেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম সারির সৈনিক হিসাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে। ১৯৩০ সালে কাঁথিতে যে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন তা এর জ্বলন্ত ইতিহাস। ১৯৩০ সালের এই জেলার বেতুড় গ্রামে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন শান্তশীলা দেবী। ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন করা হয়। তার ফলে রামকৃষ্ণ দাস ও শিশুরাম মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ১ বছর কারাদণ্ড হয়। ফলে জেলার আন্দোলন আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য নানা রকম পুলিশি অত্যাচার শুরু হয়।

বাঁকুড়া জেলা কৃষক আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়েছিল ১৯৩৭ সালে পাত্রসায়ের-হাটকৃষ্ণনগরের সম্মেলনে। এই সম্মেলনের দায়িত্বে জগদীশ পালিত (এঁর মা শান্তশীলা দেবী) ও রামকৃষ্ণ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে কারাগারে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আন্দামান জেলের মধ্যেই কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন থেকে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, প্রভাকর বিরুণী জেল থেকে বেরিয়ে দিবাকর দত্ত, প্রমথ ঘোষ ও বিমল সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জগদীশ পালিতের নেতৃত্বে জেলায় কৃষকসভার কাজে যুক্ত হন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, মহাজনের ঋণের চক্রবৃদ্ধি সুদ মকুব সহ অন্যান্য দাবিতে কৃষকসভার নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৪০-৪১ সালে বড়জোড়া থানায় সেচের দাবিতে কৃষকসভার নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত হয়।

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল। যাকে '৫০-এর মন্বন্তর বলে। তাতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় জেলার কৃষককর্মীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলা অংশগ্রহণ করে এবং প্রচুর কর্মী কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরেই 'লাঙল যার জমি তার' এবং মজুরির দাবিতে পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, ওন্দা থানায় কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর পুলিশি নির্যাতন চরমে উঠে। ১৯৪৯ সালে বিষ্ণুপুর থানার বাঁধগাবায় দুজন মহিলা সহ ৬ জন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। এই সমস্ত আন্দোলনকারী ও আত্মগোপনকারী কৃষককর্মীদের বিশেষ রকম সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন জেলার বিড়ি শ্রমিকগণ।

১৯৪৬ সালে কৃষকসভার নেতৃত্বে 'তেভাগা আন্দোলন' রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়। বাঁকুড়া জেলাও সেই আন্দোলনের শরিক। এই আন্দোলনের ফলেই আমাদের জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করা গিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক আন্দোলন সারা রাজ্যে শুরু হয়। আমাদের জেলার নারী ও পুরুষ আইন অমান্য করে। আন্দোলনের ফলে বাংলা, বিহার সংযুক্তি বন্ধ হয়।

১৯৫৬-৫৭ সালে কংসাবতী জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনায় ১৭৩টি মৌজায় (বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া) জলডুবি হয়। ফলে ৫০ হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়। এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করার ফলে সমস্ত মানুষই আন্দোলন-সংগ্রামে যেতে বাধ্য হয়। ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে কংসাবতী জলাধার প্লাবিত আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি নির্যাতন চলতে থাকায় কমিটি থেকে অন্য রাজনৈতিক
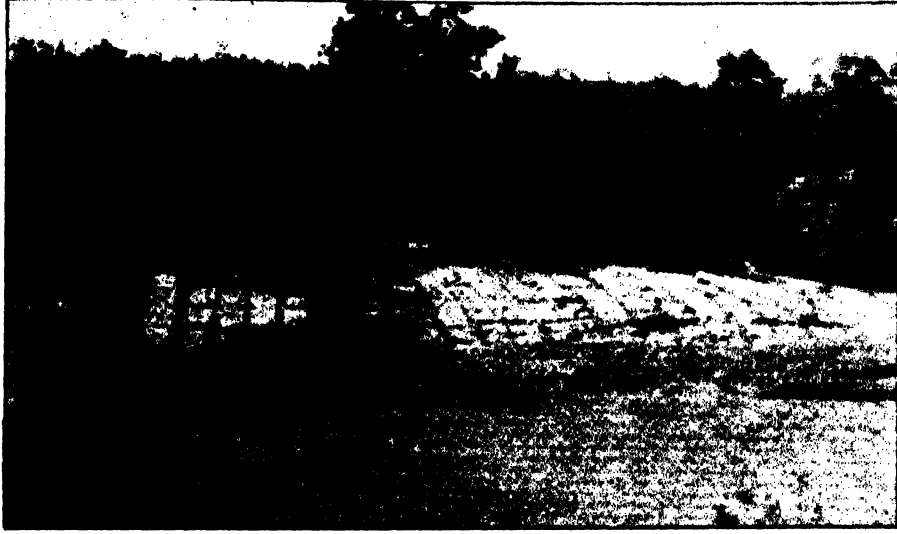
দলের লোকেরা সরে যায়। দীর্ঘদিন ধরে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে আন্দোলন চলার ফলে কংগ্রেস সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এই জয়ের ফলেই দক্ষিণ বাঁকুড়া সহ সারা জেলায় এর প্রভাবে শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে উঠে। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনেও এই জেলায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি গড়ে ওঠে এবং আইন অমান্য করে বহু মানুষ কারাবরণ করে।

এছাড়া ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীরা খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে মিছিল করে, সেই মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। ফলে দুজন ছাত্র নুরুল ইসলাম ও আনন্দ হাইত মারা যায়। বাঁকুড়া শহরে খাদ্যের দাবিতে মিছিল হয়। বাঁকুড়ার প্রহ্লাদ গরাই খাদ্য আন্দোলনে শহিদ হন।

১৯৬৭ সালে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্রতি থানা এলাকায় খাস ও বেনামি জমি দখলের আন্দোলন শুরু হয়। জমিদারদের সঙ্গে অনেক থানায় লড়াই হয়। বহু কৃষক শহিদ হন। জোতদার অনেক ক্ষেত্রেই জমির উপর হাইকোর্টে লড়ে। সেই জমিও দখল নিয়ে চাষ করা হয়। যুক্তফ্রন্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কারমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার। সারা জেলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। খেতমজুর ও গরিব কৃষক মাথা তুলে দাঁড়ান। যুক্তফ্রন্ট সরকার পুলিশকে বলে, আন্দোলন ভাঙা যাবে না। বিনা কারণে কোনো গরীবকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। স্বাধীনতার স্বাদ প্রতিটি মানুষ অনুভব করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙার চক্রান্ত হয় এবং এই চক্রান্ত সফলতা লাভ করে। আই এন ডি এফ সরকার গঠন করে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়। ফলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৬৯ সালে আবার নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে আরও বেশি সংখ্যা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়। আবার অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার জয়ী হয়। জমির আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৭১ সালে পুনরায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সি পি আই (এম) আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সরকার গড়তে দেয়নি। পরে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কারচুপি করে এরপর পুনরায় কংগ্রেস জয়লাভ করে এবং কংগ্রেস দল সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে আধা ফ্যাসিবাদি কায়দায় শাসন শুরু করে বিরোধীদের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। পার্টির নেতা ও কর্মীদের উপর নানা ধরনের নির্যাতন শুরু হয়। ১৯৭০ সালে কৃষক সভার নেতৃত্বে তিন জেলার জঙ্গল এলাকায় সীমান্ত এলাকার কেন্দুপাতা সংগ্রহকারী নিয়ে, কেন্দুপাতা সংগ্রহকারী মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়। মালিকের শোষণব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রমের মূল্য যাতে পাওয়া যায় কৃষকসভা সেই দাবি আদায় করে।

১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় জাল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সি পি আই (এম) সেই মন্ত্রিসভা বয়কট করে। ১৯৭২ থেকে '৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, বাঁকুড়া জেলাও তার বাইরে ছিল না। '৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সারা দেশে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যেমন ধ্বংস করে, অপর দিকে গণআন্দোলনের নেতা কর্মীদের জেলে নিয়ে যায় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে নেয়।

বাঁকুড়া জেলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও গণতান্ত্রিক মানুষ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাজন ও জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন, যার ফলে বাঁকুড়া জেলা কৃষক আন্দোলনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আগামীদিনেও এই আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণ করছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১। সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'।
২। সনৎকুমার ভট্টাচার্যের 'বাংলার বীরাঙ্গনা শম্ভুমীনা দেবী'।
৩। বাঁকুড়া জেলার কৃষক সমিতির প্রকাশিত 'চুয়াড় বিদ্রোহ স্মরণে'।

লেখক *কৃষক নেতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবী*

N
W
E
S
বাঁকুড়া জেলার নদনদীর মানচিত্র
Saltora
Mejhia
Gangajalghati
Barjora
Chhatna
Bankura II
Sonamukhi
Bankura I
Patrasayer
Indpur
Onda
Indus
Hirbandh
Taldangra
Bishnupur
Khatra
Joypur
Kotulpur
Simlapal
Ranibandh
Sarenga
Raipur
River
Block Boundary
Prepd. by NRDMS

বাঁকুড়া জেলায় ভূমিসংস্কার ও বর্গা আন্দোলন

শক্তিরঞ্জন বসু

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত যেখানে মাত্র ৫৪,১৪১ হেক্টর জমি সরকারে ন্যস্ত ও বন্টিত হয়েছিল, সেখানে ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ ছ হাজার তিনশো পঁচিশ দশমিক ছিয়াশি হেক্টরে (১,০৬,৩২৫.৮৬ হেক্টর)। এর ফলে উপকৃত মানুষের সংখ্যাও পঞ্চাশ হাজার নশো পনেরো থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছ লক্ষ একুশ হাজার ষোলো জনে (৬,২১,০১৬ জন)। এটা সম্ভব হয়েছে বিগত কুড়ি-বাইশ বছরে পরপর তিনটি ভূমিসংস্কার আইন পাস ও কার্যকর করার ফলে।
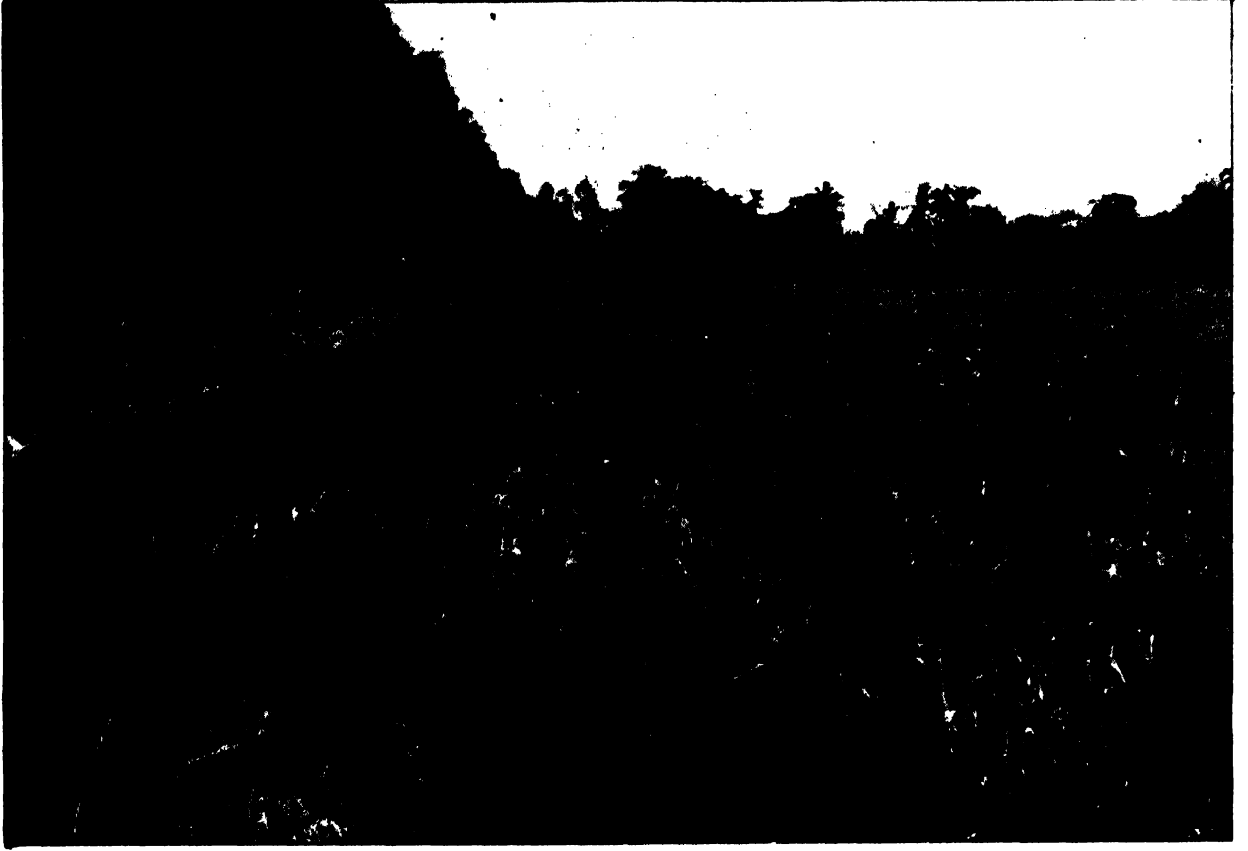
অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, গ্রামীণ জীবনের ভয়াবহ দারিদ্র্য অনেক কমেছে

এই সেদিন পর্যন্ত সারা ভারতে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর জেলা হিসাবে চিহ্নিত ছিল বাঁকুড়া জেলা। পরিচিতি ছিল 'খরা জেলা' হিসাবে। প্রতি বছর 'প্রায়-দুর্ভিক্ষ' অবস্থায় জেলার নানা প্রান্তে খুলতে হত লঙ্গরখানা। ভয়াবহ দারিদ্র্য, অনাহার ও অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যুর হার ছিল অত্যধিক। খাবার তো মিলতই না, অভাব ঘটত পানীয় জলেরও। চৈত্র-বৈশাখের কাঠফাটা রৌদ্রে পাথুরে জমিতে নগণ্য মজুরিতে কাজের নামে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। তা-ও কাজ মিলত না। এই সুযোগে বড় বড় জোত ও জমির মালিকেরা ঋণের নামে গরিব, প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীন কৃষকদের গতর বন্ধক রাখতেন। কাজের সন্ধানে প্রতি বছর শয়ে শয়ে ভূমিহীন কৃষকেরা 'পুবে' (হুগলি, বর্ধমান জেলায়) ছুটতেন অপেক্ষাকৃত বেশি মজুরির প্রত্যাশায়।

লাল কাঁকরের পাথুরে মাটিতে কৃষিজীবী মানুষের শতকরা ৮০/৮৫ অংশ এক দুঃসহ জীবনযাপন করতে বাধ্য হতেন। প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এই শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃতিতে লক্ষ করা যেত এক রুক্ষতা ও আপাত-কর্কশতা। পাথর কেটে ঝরনা বার করার মতোই কষ্টসাধ্য ছিল এই দুঃসহ জীবনের যন্ত্রণার হাত থেকে অন্তত কিছুটা রেহাই পাওয়া। তবু মানুষ চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। সুদূর অতীত থেকেই এই সব জমিহারা, নিঃস্ব, গতরসর্বস্ব মানুষগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে। পরাধীন ভারতের চুয়াড় বিদ্রোহ থেকে ঠিক স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাঁধগাবা আন্দোলন, আরও পরে কংসাবতী প্রকল্পে বাস্তুহারা মানুষের আন্দোলনের মাধ্যমে এই ক্ষোভ বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। অনেকাংশে শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত মানুষের ঐক্য গড়ে উঠলেও মূল সমস্যার তেমন কোনও সুরাহা হয়নি।

বস্তুত, এই সব সমস্যা নিরসনের একমাত্র পথ হল ভূমিসংস্কার। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিতে ক্ষমতাসীন দল ও সরকার এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি, এমন নয়। তাই 'গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক' সংবিধান কার্যকর হবার পাঁচ বছরের মধ্যেই সংবিধান সংশোধন করে 'জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন' পাস করা হল। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে, ১৯৬৪ সালে, বর্গাদারের অধিকারের সপক্ষে পাস হল আইন। কিন্তু সরকারে ক্ষমতাসীন দলের টিকি তো বাঁধা জমিদার শ্রেণীর কাছেই। তাই, এসব আইন রয়ে গেল কাগজে-কলমে। আইন কার্যকর করতে উদ্যোগ নেবার পরিবর্তে গৃহীত হল আবেদন-নিবেদন, হৃদয়-পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহ। মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষ্য বিনোবা ভাবে শুরু করলেন ভূদান আন্দোলন। সংবাদ মাধ্যমে প্রতিদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হতে লাগল হাজার হাজার একর ভূদানের সংবাদ। রাতারাতি জমিদারদের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটে গেল। আর দেখা গেল, সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে তৎকালীন রাজ্য সরকার ভূমিহীন কৃষকদের জমি বণ্টনের পাট্টা বিলি করছেন। বাস্তবে এর পরিণামে

দেখা গেল, গোটাটাই ফাঁকি। যেসব জমিদার জমি 'দান' করেছেন, তাঁরা তা ফেরত নিলেন। বরং পতিত জমি ভূমিহীন কৃষকদের শ্রমের মূল্য না দিয়েই চাষের যোগ্য করিয়ে নিলেন। আর পাট্টা যাঁরা পেলেন, তাঁদের জমি দেখানো হল শ্মশান, গোচর, চাষের অযোগ্য জমিগুলি। জমিদারি প্রথা বিলোপ ও ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টন তথা ভূমিসংস্কারের এই হল পরিণতি। স্বাভাবিকভাবেই, দেশের অন্যান্য অংশের মতোই বাঁকুড়ার ভূমিহীন, প্রান্তিক ও গরিব কৃষকসমাজ রয়ে গেলেন যে তিমিরে, সেই তিমিরেই।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ লগ্ন থেকে। বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে যেটুকু ভূমিসংস্কার করা সম্ভব, তারই বাস্তবায়নের ফলে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে 'ভূমিসংস্কার' কথাটির অর্থ সংক্ষেপে হলেও, বিশ্লেষণ করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে 'ভূমিসংস্কার' বলতে এককথায় বোঝানো হয় ভূমি বা জমির উৎপাদিকা শক্তির উন্নতিবিধান এবং জমির সুষম বণ্টন। দুটি পরস্পর সম্পর্কিত। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের উপকরণ, সেচ, সার ও উচ্চফলনশীল বীজের যেমন প্রয়োজন, ততোধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রয়োজন হল মমত্বের সঙ্গে জমিতে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ। নজরুলের কথায়, 'সন্তানসম পালে যারা জমি', সেই কৃষকের। কিন্তু সে জমি যদি 'মাটিতে যাঁদের ঠেকে না চরণ' এমন মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, সে ক্ষেত্রে জমির উপর শুধুমাত্র অধিকারবোধ থাকে, মমত্ববোধ জন্মায় না। পক্ষান্তরে 'সন্তানসম পালে যারা জমি', মমতাবোধ থেকে তাঁরা জমির পরিচর্যা করে ফসল ফলান। তাঁদের হাতে যদি জমির মালিকানার অধিকার, নিদেনপক্ষে সুনিশ্চিতভাবে চাষের অধিকার এবং ফসলের সিংহভাগ (. অংশ) প্রাপ্তির অধিকার থাকে, স্বাভাবিকভাবে তাঁদের আন্তরিকতার কারণে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন এবং প্রকৃত কৃষকের চাষের অধিকার নথিভুক্ত করা তথা বর্গাদারের নাম নথিভুক্তিকরণ ও ফসলের তিন-চতুর্থাংশ প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ ভূমিসংস্কারের পথে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই পটভূমি থেকে বাঁকুড়া জেলায় ভূমিসংস্কারের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। জেলার মোট জমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ১০০ হেক্টর। এর মধ্যে বনভূমিও অন্তর্ভুক্ত। বনভূমি বাদে মোট কৃষিজমির পরিমাণ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিল ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৭০ হেক্টর। এর মধ্যে অধিকাংশই সেচের সুযোগ-বহির্ভূত ছিল। ব্রিটিশ আমলের দু-চারটি সেচনালা বাদ দিলে ১৯৭০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত কংসাবতী প্রকল্প ছাড়া তেমন কোনও সেচের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পে দু-চারটি গভীর নলকূপ নির্মাণ করা হয়নি, তা নয়। কিন্তু সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য তো বটেই, তা ছাড়াও সেগুলির আরও দুটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যও ছিল। প্রথমত, তৎকালীন গ্রামে প্রভাবশালী জমিদারদের কথামত তাদের জমির সংলগ্ন এলাকায় এগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে, মাঝারি-গরিব-প্রান্তিক কৃষকেরা সেচের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, এগুলির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বছরের পর বছর অকেজো হয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যেত। ফলে কাজে আসেনি। এর নিদর্শন আজও দেখা যেতে পারে বিষ্ণুপুর

১৯৭৭ সালের জুলাই পর্যন্ত তৎকালীন ৭৫ বিঘা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার থাকলেও উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত করে বণ্টনের ব্যাপারে তেমন কোনও উদ্যোগ ছিল না। তথ্য সে কথাই প্রমাণ করে : ওই সময় পর্যন্ত জেলায় সরকারে ন্যস্ত ও বণ্টিত জমির মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৪, ১৪১ হেক্টর, উপকৃত হয়েছিলেন মোট ৫০,৯১৫ জন মানুষ (সূত্র : **Key Statistics of the District of Bankura, 1979**)। অর্থাৎ মোট চাষযোগ্য জমির সিংহভাগই কেন্দ্রীভূত ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদার-জমিদারের হাতে। চাষের অধিকারও নিশ্চিত ছিল না।

থানার অর্জুনপুর বা সোনামুখী থানার রামপুর, বলরামপুরের নিকটস্থ বুড়া আঙ্গারিয়া প্রভৃতি গ্রামে। সেচের জল না থাকলেও জলকর আদায় হত নিয়মিতভাবে। ফলে দু একটি থানার কিছু এলাকা বাদ দিলে প্রায় সর্বত্র ফলন নির্ভর করত প্রকৃতির দয়ার উপর। অথচ জেলার শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ মানুষ (১৯৯৮ সালে) প্রত্যক্ষত কৃষিজীবী ছিলেন। আর জেলার শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ কৃষিজাত উৎপাদনহারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। একইভাবে জমির বণ্টন ব্যবস্থায় বৈষম্যও ছিল ব্যাপক। ১৯৭৭ সালের জুলাই পর্যন্ত তৎকালীন ৭৫ বিঘা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার থাকলেও উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত করে বণ্টনের ব্যাপারে তেমন কোনও উদ্যোগ ছিল না। তথ্য সে কথাই প্রমাণ করে : ওই সময় পর্যন্ত জেলায় সরকারে ন্যস্ত ও বণ্টিত জমির মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৪,১৪১ হেক্টর, উপকৃত হয়েছিলেন মোট ৫০,৯১৫ জন মানুষ (সূত্র : Key Statistics of the District of Bankura, 1979)। অর্থাৎ মোট চাষযোগ্য জমির সিংহভাগই কেন্দ্রীভূত ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদার-জমিদারের হাতে। চাষের অধিকারও নিশ্চিত ছিল না। ১৯৬৪ সালে আইন পাস হলে কি হবে, পরিস্থিতি এমন ছিল যে, বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম অধিকারগুলি পর্যন্ত প্রশাসন এবং গায়ের জোর দেখিয়ে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাই ওই সময় পর্যন্ত বর্গাদার হিসাবে নাম নথিভুক্তিকরণের দাবি করাই ছিল 'অপরাধ'। তবু মানুষ এই অধিকারের দাবিতে লড়তে দ্বিধা করেননি। বিষ্ণুপুর থানার ভড়া গ্রামের ইন্দ্র লোহার ও বড়জোড়া থানার জনৈক বর্গাদার এই সময়ে

গত ১৬ জুলাই ২০০২, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ১৩৯৭টি ভূমিহীন পরিবারের হাতে ১৩৫ একর খাস জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ১১ লক্ষ মানুষকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ইন্দাসে পাট্টা বিলি উপলক্ষে জমায়েত। ছবি : গণশক্তির সৌজন্যে

নিজেদের অধিকারের দাবিতে যে লড়াই করেছিলেন দশকের দশকে, তা সে সময় জেলা থেকে রাজ্য পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তৎকালীন বাঁকুড়ার জেলাশাসক এবং বর্তমানে সাংসদ (তৃণমূল কংগ্রেস দলের) একটি পুস্তিকায় ঘটনা দুটি বিশ্লেষণ করে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার সারমর্ম অনেকটা এরকম : তারা আমাদের কাছে আইন অনুযায়ী বিচার (Justice) চাইতে এসেছিল, কিন্তু আমরা তা দিতে পারিনি।

তাই প্রতি বছর খরার বিরুদ্ধে, লঙ্গরখানা খোলার দাবিতে আর পর্যাপ্ত 'রিলিফ' চাইতে অথবা 'স্টেট রিলিফ'-এ কাজ খোলার দাবিতে হাজার হাজার গরিব, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক 'ডেপুটেশন' দিতেন জেলাশাসকের দপ্তরে। এটা নিয়মিত রুটিনে পরিণত হয়েছিল। অভাবের জ্বালায় অনাহারক্লিষ্ট শিশুসন্তানের কান্নায় থাকতে না পেরে গোটাকয়েক নিজহাতে চাষ করা ধানের আধপাকা শিষ কাটার 'অপরাধে' সারাদিন গ্রামের আটচালায় বেঁধে নির্মম অত্যাচার করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল বিষ্ণুপুর থানার বনমালীপুর গ্রামের জনৈক ভূমিহীন কৃষককে। এমন ঘটনা সেসব দিনগুলিতে ছিল স্বাভাবিক। অভাবগ্রস্ত ভূমিহীন কৃষক বা ভাগচাষী নিজের গতরটুকু বাঁধা রাখতেন, যার ফলে ফসল কাটার মরসুমেও তার অভাব লেগেই থাকত। মাঝারি কৃষকেরা জর্জরিত হয়েছেন ফসলের লাভজনক দামের অভাবে, আবার তার উপর 'লেভি'র জুলুমে। ফলে সর্বস্তরের কৃষক-ঐক্য গড়ে উঠেছে, নিয়মিত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে ভূমিসংস্কারের দাবিতে।

চুয়াড় বিদ্রোহের ঐতিহ্যে লালিত এবং স্বাধীন ভারতে বাঁধভাঙা আন্দোলনে সংহত ও সুশিক্ষিত এই আন্দোলনই বাধ্য করেছে প্রকৃত বামপন্থীদের এই জেলায় ঐক্যবদ্ধ হতে। নিরন্তর ও ধারাবাহিক এই কৃষক আন্দোলন প্রথম সুযোগেই তাই ঘটিয়েছে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন—আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বামপন্থী প্রতিনিধিদের বিপুলভাবে জেলা থেকে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত করার মাধ্যমে। আজও সেই উত্তাল তরঙ্গের আহ্বান কান পাতলে শোনা যায় ; তাই জেলা থেকে কোনও অ-বাম প্রতিনিধি এখনও বিধানসভায় নেই। এই আন্দোলনের পটভূমিকায় সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ক্ষমতাসীন দলগুলিও আন্দোলনের দাবি পূরণে উদ্যোগ নিয়েছে। পেয়েছে এতদিন পর্যন্ত বঞ্চিত, নিপীড়িত কৃষকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। তাই ভূমিসংস্কারের প্রতিটি পদক্ষেপ রূপলাভ করেছে আন্দোলনের। সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রয়াত প্রাক্তন ভূমি ও ভূমিসংস্কারমন্ত্রী বিনয় চৌধুরীর সুযোগ্য নেতৃত্বে একের পর এক কৃষকস্বার্থবাহী আইন পাস ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমেই হয়েছে ভূমিরাজস্বের পরিবর্তন। সেচ এলাকায় চার একর ও অ-সেচ এলাকায় ছয় একর জমির খাজনা বাদ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করে ক্ষুদ্রসেচের প্রসারের কাজে গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। চাষের জমির পরিমাণ ৩,৫৮,২৭০ হেক্টরের সঙ্গে পতিত জমি যোগ করলে মোট কৃষিজমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৮৯,৩১০ হেক্টরে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় গড়ে ওঠা ১৭টি খাল, ২২,২৯৯টি বাঁধ ও পুকুর, ২১২টি নদীপাম্প, ৬২৭টি

গভীর নলকূপ, ২৩,৮৬১টি অগভীর নলকূপ এবং অন্যান্য কিছু কিছু প্রকল্পে এই মোট জমির অধিকাংশ তিন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার চারশো (৩,৫৬,৪০০ হেক্টর) হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা যাতে সেচের সুযোগ আগে পান, সেদিকে নজর রেখে এই সেচ প্রকল্পগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। তা ছাড়া, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পাম্প ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, পাশাপাশি সামাজিক বনসৃজনের ফলে জেলায় বৃষ্টিপাতের অনুপাতও কিছুটা বেড়েছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 'মিনিকিট' সরবরাহ করে উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা ১৯৭৭-র আগে কল্পনা করা যেত না। এ ছাড়াও সমবায় গঠন করে বা ব্যক্তিগতভাবে সরকার 'গ্যারান্টির' থেকে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক উন্নত কৃষি উপকরণ কিনতে পারেন। ফলে সার্বিকভাবে জেলার প্রায় সর্বত্রই সারা বছর চাষ হচ্ছে—কমে গেছে 'পূবে' (হুগলি, বর্ধমান জেলায়) খাটতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা।

কৃষি পরিবেশের ও উপকরণসমূহের এই সব উন্নতিবিধানের থেকেও বড় কথা হল জমির বণ্টন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষায় উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগ্রহণ। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত যেখানে মাত্র ২৮,১৪১ হেক্টর জমি সরকারে ন্যস্ত ও বণ্টিত হয়েছিল, সেখানে ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ ছ হাজার তিনশো পঁচিশ দশমিক ছিয়াশি হেক্টরে (১,০৬,৩২৫.৮৬ হেক্টর)। এর ফলে উপকৃত মানুষের সংখ্যাও পঞ্চাশ হাজার নশো পনেরো থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছ লক্ষ একুশ হাজার ষোলো জনে (৬,২১,০১৬ জন)। এটা সম্ভব হয়েছে বিগত কুড়ি-বাইশ বছরে পরপর তিনটি ভূমিসংস্কার আইন পাস ও কার্যকর করার ফলে। বাগান, পুকুর ও চাষের জমির মধ্যে ভেদাভেদ না রেখে জমির ঊর্ধ্বসীমা নিয়ন্ত্রণ করে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কৃষকসমাজের সংযোগিতার দ্বারাই জমির অন্তত কিছুটা পরিমাণ সুষম বণ্টন সম্ভব হয়েছে। রাজ্য সরকার ফসল কিনে নেবার ফলে দায়ে পড়ে জলের দরে ফসল বিক্রয় (distress sell) বন্ধ হয়েছে। সারা বছর চাষ, ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টন এবং ন্যূনতম মজুরি আইন কার্যকর করার ফলে গ্রামীণ জীবনের ভয়াবহ দারিদ্র্য অনেক কমেছে। এখানে ওখানে পাকা গড়ে উঠছে। এই সব নিঃস্ব, রিক্ত মানুষের হাতে কিছু পয়সা আসায় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে, সন্দেহ নেই। জমির কেন্দ্রীভবনও অনেক কমেছে। ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৪৪টি পরিবার সারা জেলার দশ একরের বেশি জমির মালিক এবং এদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৭৪৫ হেক্টর। অন্যদিকে ওই সময় ৩,১৮,৬৪৭টি প্রান্তিক কৃষক পরিবারের (১ একরের কম জমির মালিক) হাতে জমি ছিল ১,৬৮,৯৬২ হেক্টর। স্বভাবতই নিজেদের জীবিকার স্বার্থে এই প্রান্তিক কৃষকরা নিজেদের জমিতে যত বেশি সম্ভব ফসল ফলাবার চেষ্টা করেছেন। বাড়িয়েছে জমির উৎপাদিকা শক্তি। পাশাপাশি [illegible], বড়জোর সেই বর্গাদারের মতো যে অসংখ্য বর্গাদারদের সুনিশ্চিতভাবে জমিতে চাষ করা ও ফসলের তিন-চতুর্থাংশ পাবার

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পাম্প ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে

আইনসম্মত অধিকারের লড়াইয়ে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছিল, সে অধিকারও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮-৭৯ সালে 'অপারেশন বর্গা'র মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প করে জমি মেপে সরেজমিন তদন্ত করে প্রকৃত বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা হয়, যাতে সে এবং তার উত্তরাধিকারী চাষের জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্গাদারকে এতদিন আদালতে প্রমাণ করতে হত, সে-ই প্রকৃত বর্গাদার। এখন আর বর্গাদারকে নয়, জমির মালিককেই প্রমাণ করতে হবে, এ প্রকৃত বর্গাদার নয়। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কতজন বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু ১৯৯৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,১৬,২১৩ জন এবং এঁদের চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ ২৭,০৫১ হেক্টর (সূত্র : Key Statistics of the District of Bankura, 1998)। বেশি ফলন হলে বেশি ভাগ পাওয়া যাবে—এই মানসিকতা নিঃসন্দেহে জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। তা ছাড়া অতীতে যেখানে জমিদারের কাছারিবাড়িই ছিল জমি সংক্রান্ত যে-কোনও আলোচনার কেন্দ্র, এমনকি সরকারি কর্তৃপক্ষও সেখানে বসতেন, তার পরিবর্তনও কৃষক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ জয়, যা কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ সঞ্চার করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্গা রেকর্ডের বিনিময়ে ব্যাঙ্ক-ঋণের ব্যবস্থা।

এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত, বঞ্চিত বাঁকুড়া জেলার কৃষকসমাজ ভূমিসংস্কার তথা জমিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে আসছিলেন, ১৯৭৭ সাল থেকে তা এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। কিছু দাবি আদায় হয়েছে, কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সংগ্রামের হাতিয়ার এই সরকার অতন্দ্র প্রহরীর মতো সেসব অধিকার রক্ষায় ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু যা আদায় হয়েছে, তা-ই তো সব নয় ; আরও অনেক, অনেক দূরে যেতে হবে। যে চাষ করে

প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকেরা ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে উন্নত কৃষি উপকরণ কিনছেন

না, সে জমির মালিকও থাকবে না—এমন অবস্থায় না পৌঁছালে তো সব সমস্যার সমাধান হবে না। রাজ্য সরকারের তা সাধ্যাতীত। তাই, আইন-শাসন-বিচারের সর্বোচ্চ কেন্দ্রে শ্রমিক কৃষকের স্বার্থবাহী এক হাতিয়ার দরকার। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন লড়াই তো জারি রাখতেই হবে। বাঁকুড়া জেলার কৃষকসমাজ সেই বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করেছে।

• নিবন্ধটিতে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ পঃ বঃ সরকারের Bureau of Applied Economics & Statistics-এর জেলা পরিসংখ্যান আধিকারিকের দপ্তর, ১৯৭৬, ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৯ সালের Key Statistics of the District of Bankura থেকে এবং ওই একই দপ্তর থেকে প্রকাশিত District Statistical Hand Book, 1998 থেকে গৃহীত হয়েছে। উপকরণগুলি অধ্যাপক ড: হিমাংশু ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

লেখক : অধ্যাপক, বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাবন্ধিক

ছৌ-নৃত্যরত রানীবাঁধের শিল্পী কাঞ্চনপুর, বাঁকুড়া ২নং

বাঁকুড়ার কৃষি ও সেচব্যবস্থার রূপরেখা

নেপালচন্দ্র রায়

যেহেতু বাঁকুড়া জেলা খরাপ্রবণ ও পাহাড়ি—সেই জন্য সমস্ত চাষযোগ্য জমির জন্য জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এই রকম অঞ্চল হল—শালতোড়া, রানীবাঁধ, ঝিলিমিলি, বড়জোড়া, খাতড়ার কিছু অংশ। কিছু ব্যয়বহুল scheme করা হলে এইসব জমিতে কিছুটা জল দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
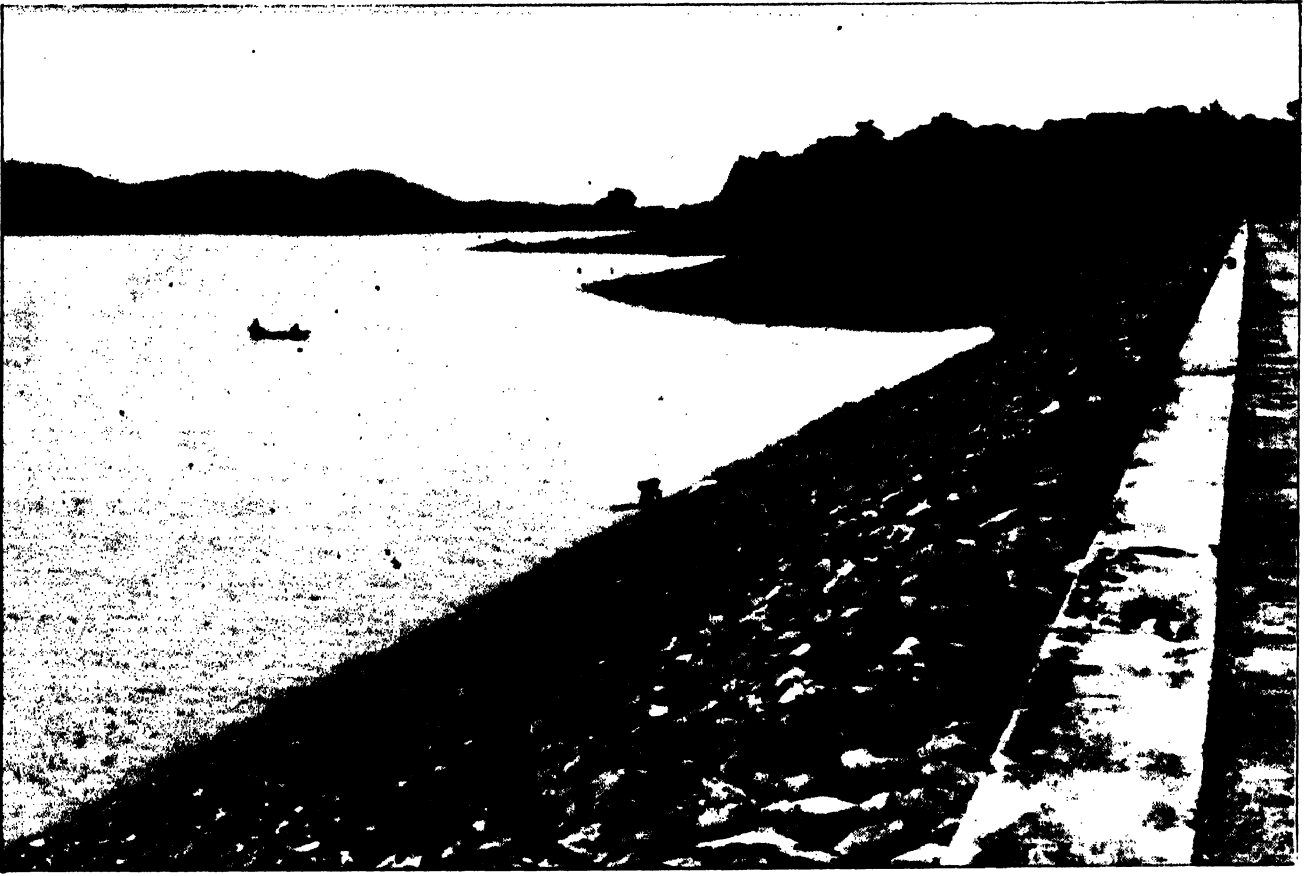
মুকুটমণিপুর জলাধার

প্রকৃতি জীবকুল সৃষ্টি করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাদ্যেরও ব্যবস্থা করেছে। জীবজগতের প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষ তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর ও অন্যান্য প্রাণীজগতের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে।

জীবজগতের বেঁচে থাকার তিনটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হল বাতাস, জল, খাদ্য। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা পর্যাপ্ত বাতাস ও জল পেয়ে থাকি। খাদ্যের জন্য শুধু প্রকৃতির উপরই নির্ভর করলে চলে না। জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে নতুন নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে নিতে হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেয়—যার জন্য প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্যের উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। 'সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে' আজ ভারত খাদ্যের জন্য অন্য কোনো দেশের উপর নির্ভরশীল নয়—বরং খাদ্যের বদলে বিদেশ থেকে অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করে।

চাষের উন্নতির জন্য কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হল—জল, উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধপত্র, উপযুক্ত পরিমাণ জমি। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হল জল। জলবিহীন কোনো কিছু জন্মাতে পারে না। বর্তমান আলোচনায় বাঁকুড়া জেলায় জল ও সেচব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন জলাধার সৃষ্টি করা হয়েছে এর ফলে জলের অনিশ্চয়তা দূর করা গেছে। সাধারণত আমাদের দেশে চাষ করার জন্য মোট-পরিমাণ বৃষ্টি হয়ে থাকে। মোট পরিমাণ বৃষ্টি হলেও ঠিক সময়ে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন চাষের ক্ষতি হয়। অতিবর্ষণ বা বৃষ্টির অভাবে চাষের তথা ফসলের সর্বনাশ হয়। এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য জলাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণত নদীর উপর মাটির বা কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করা হয়। এই বাঁধে সারা বছরে নদীর উপর প্রবাহিত জল ধরে রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত চাষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় জল দেওয়া হয়। এইরূপ জলের নিশ্চয়তার জন্য ওই জায়গায় ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না।

বাঁকুড়া জেলা পশ্চিমবাংলার অন্তর্গত একটি কৃষিভিত্তিক জেলা। এর আয়তন ৬,৮৮,১০৯ হেক্টর, বনজমি ৯৭,২৩৫ হেক্টর, চাষযোগ্য জমি ৪,৩৭,৬১৭ হেক্টর, সেচসেবিত এলাকা ১,৯৮,১৫৮ হেক্টর। বাঁকুড়া জেলা লালমাটির দেশ। কিছু এলাকা বাদে জমি খুবই উঁচু-নিচু। কোতুলপুর ব্লক বাদ দিলে সমস্ত বাঁকুড়া জেলা খরাপ্রবণ। বাঁকুড়া জেলার বুক চিরে দুটি বড় নদী কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর বয়ে চলেছে আর বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে 'দামোদর নদ'। অনেক ছোট ছোট নদী যেমন বিড়াই, শালী, শিলাবতী, তারাফেণী ইত্যাদি আছে, এ ছাড়া বহু ছোট জোড় রয়েছে। এত জলের উৎস থাকা

সবশেষে কয়েকটি কথা না বলে থাকতে পারছি না—তার মধ্যে একটি প্রধান হল কর্মসংস্কৃতি। আজকাল নিম্নে কর্মরত কর্মচারী উপরের কর্মরত কর্মচারীর কথা মানতে চান না। তাঁরা সংগঠনের কথা মেনে চলেন। সংগঠনগুলি রাজনৈতিক চিন্তা মাথায় নিয়ে একপেশে চলেন, স্বচ্ছতা একদম নেই। এটা বন্ধ করা দরকার। মানীর মান দেওয়াটা পঞ্চায়েতের বিশেষ দায়িত্ব বলে মনে করি—এটি না হলে কোনো উন্নয়নমূলক কাজে সাফল্য আসবে না।

সত্ত্বেও সেচসেবিত এলাকা মাত্র ৩০% । প্রায় ৭০% চাষযোগ্য জমি বৃষ্টি তথা প্রকৃতিনির্ভর।

বাঁকুড়া জেলা দুটি বড় সেচ প্রকল্প—কংসাবতী প্রকল্প ও ডিভিসি থেকে জল পেয়ে থাকে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি মাঝারি সেচ প্রকল্প আছে যেমন বিড়াই সেচ প্রকল্প, মহাদেব সিনান স্কিম, শালী স্কিম ইত্যাদি। অনেকগুলি ছোট ছোট জোড়বাঁধ স্কিম রয়েছে। এ ছাড়া অনেক Lift Irrigation Scheme রয়েছে। ঐগুলি সাধারণভাবে নদীর উপর অথবা সেচখালের উপর স্থাপিত। এইভাবে আমরা বাঁকুড়া জেলার চাষযোগ্য জমিতে জল দিয়ে থাকি। যেখানে এরূপ ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না—সেই সমস্ত জায়গায় বড় পুকুর ও কুয়া কেটে জলের সমস্যা কিছুটা মেটানো হয়। যেহেতু বাঁকুড়া জেলা খরাপ্রবণ ও পাহাড়ি—সেই জন্য সমস্ত চাষযোগ্য জমির জন্য জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এই রকম অঞ্চল হল শালতোড়া, রানিবাঁধ, ঝিলিমিলি, বড়জোড়া, খাতড়ার কিছু অংশ। কিছু ব্যয়বহুল scheme করা হলে এইসব জমিতে কিছুটা জল দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

আমরা এ পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় কীভাবে চাষের জল পাওয়া যায় দেখলাম। এই জল পাওয়ার ফলে ৩০% সেচসেবিত এলাকা হয়েছে। বাকি ৭০% অসেচ এলাকার কিছু এলাকাকে সেচসেবিত করার কিছু দিকনির্দেশ করছি।

(ক) নতুন জলাধার নির্মাণ—দ্বারকেশ্বর ও গন্ধেশ্বরী নদীর উপর একটি সেচ প্রকল্প তৈরি করা হলে প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমি সেচসেবিত করা যায়। প্রকল্পটি অনেকদিন আগে তৈরি হয়েছে কিন্তু বাস্তবে রূপায়ণ করা হয়নি—শুধুমাত্র দিল্লির কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার দরুন। আমার মনে হয়, সরকারের সদিচ্ছার অভাবে এটা এখনও কার্যকরী হয়ে উঠেনি। বাঁকুড়া জেলা পরিষদ উদ্যোগ নিলে এতদিনে এটির রূপায়ণ হয়ে যেত।

(খ) কংসাবতী প্রকল্প ও ডিভিসি-র ডানদিকের খালের আধুনিকীকরণ করা—এই আধুনিকীকরণ বলতে সহজ কথায় বলায় যায় জলের অপচয় বন্ধ করা। আর ঘোষিত সেচসেবিত এলাকাতে সহজভাবে সমস্ত জমিতে সময়মত চাষের জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা এই দুটি জিনিস করতে পারলে অনেক চাষ বাড়াতে পারা যায়। জল সাধারণভাবে অপচয় হয় (১) মাটির খালের ভিতর চুঁয়ে যাওয়ার ফলে, (২) Outlet pipeগুলিকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে বসানো হলে, (৩) খালের উপর কপাটগুলির (gate) বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ করা হলে, (৪) ব্যারেজগুলির উপরের দিকে নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে জলাধার সৃষ্টি করা হলে নদী দিয়ে জল বয়ে চলে যাওয়া বন্ধ করা যায়।

যদি আমরা জলের অপচয় বন্ধ করতে পারি তাহলে সেচসেবিত এলাকাকে দুবার বা তিনবার ফসল করতে পারব। রবি ও বোরো চাষ বৃদ্ধি করা গেলে অনেক ফসল উৎপাদন করা যাবে। ব্যারেজগুলির উপর দিকে বাঁধ নির্মাণ করা গেলে নতুন জমি সেচের আওতায় আনা যাবে।

খুবই সংক্ষেপে উপরের বিষয়গুলি একটু আলোচনা করছি। প্রথমত মাটির খালের ভিতর দিয়ে জল বয়ে শাখা প্রশাখার মাধ্যমে outlet pipe-এর ভিতর দিয়ে চাষের জমিতে গিয়ে পড়ে। মাটির খালের মধ্যে যাওয়ার দরুন জল মাটির নিচে চলে যায়। যদি খালগুলিকে বাঁধানো যায় Clay tiles, concrete tiles বা LDP film linning) তাহলে জলে অপচয় বন্ধ হবে। Outlet pipeগুলি অধিকাংশ জায়গায় খুবই বেশি বড় মাপের দেওয়া হয়েছে। এমনকী অনেক সময় পাশাপাশি দুটি তিনটি দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রয়োজন মাত্র একটির। কিন্তু এই সুবিধা বর্তমানে চাষিরা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইবে না। পঞ্চায়েতকে এগিয়ে এসে এগুলি ঠিক করাতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। গেটগুলি নিয়ন্ত্রণ সাধারণভাবে সেচ বিভাগের উপর আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে চলে গিয়েছে। সেচের জল নিচ থেকে উপরের দিকে দিতে হয়। অর্থাৎ প্রথমে জল খালের ভিতর দিয়ে শেষ

নদীজলোত্তোলন সেচব্যবস্থা

বন্ধ্যা ও খরাপ্রবণ কাঁকুরে জমি

প্রান্তে চলে যাবে তারপর সেখানের জমিতে জল দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর উপরের জমিতে দেওয়া হবে। এটি করতে গেলে উপরের দিকের গেটগুলিকে খুলে রাখতে হবে। কিন্তু এটি বাস্তবে কিছুতেই করা যাচ্ছে না। এর ফলে উপরের জমিগুলি জল অনবরত পেতে থাকছে ও নিচের দিকে জল সরবরাহ কম হচ্ছে। বেশি করে জল জলাধার থেকে ছাড়তে হচ্ছে শুধুমাত্র নিচের দিকের জমিগুলিতে জল দেওয়ার জন্য। এই অপচয় সহজেই বন্ধ করা যায় যদি পঞ্চায়েত সহযোগিতা করে।

বাঁকুড়া জেলায় সুষ্ঠু সেচের অন্তরায় হল বনের মধ্যে খালগুলি বয়ে যাওয়ায়। এটি ময়ূরাক্ষী প্রকল্পে বিশেষ দেখা যায় না। বনের মধ্যে যে outletগুলি বেরিয়ে এসেছে সেগুলি অতি অবশ্যই linning দিতে হবে। এক্ষেত্রে precast clay trough ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু এগুলি খুবই কম দামের সেই জন্য সরকারি ইঞ্জিনিয়ার বা ঠিকাদারেরা এগুলি করাতে চান না। বাঁকুড়া জেলায় শালতোড়ায় টালি তৈরি হয়—ওদের মাপ দিলে ওরা তৈরি করে দেবে। আমি চাকুরিরত অবস্থায় এই উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও সফল হতে পারিনি। বিষ্ণুপুর, জয়পুর, তালডাংরা, সিমলাপাল, রতনপুর, রাইপুর ও আরও অনেক জায়গায় গেলে বনেতে কীরূপ জল অপচয় হয় তা দেখা যাবে।

মাঠনালা তৈরি (Field channel) করার জন্য CADA রয়েছে। কিন্তু সরকারি নীতির জন্য progress আশানুরূপ হচ্ছে না। এ ছাড়া মাঠনালাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত হয় না। এর ফলে দূরের জমিতে জল নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর হয় এবং অনেক দিন ধরে জল দিতে হয়। জলের অপচয় রোধ করা যায় না।

বর্তমানে কৃষি বিভাগ যথেষ্ট তৎপর হয়েছে চাষ বৃদ্ধি করার জন্য। উন্নতমানের বীজ সরবরাহ হচ্ছে—কিন্তু সমস্ত চাষীরা এক ধরনের বীজ ব্যবহার না করার দরুন বিভিন্ন সময়ে ফসল পেকে যাচ্ছে—রবি বা বোরো চাষের জন্য জল দেওয়ার অসুবিধা হচ্ছে। চাষিভাইদের এই ব্যাপারে training দিতে হবে।

ছোট ছোট জমি হওয়ার দরুণ যন্ত্র দিতে চাষ করতে অসুবিধা হচ্ছে। Land consolidation করা একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েতকে এই ব্যাপারে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে হবে।

সবশেষে কয়েকটি কথা না বলে থাকতে পারছি না—তার মধ্যে একটি প্রধান হল কর্মসংস্কৃতি। আজকাল নিম্নে কর্মরত কর্মচারী উপরের কর্মরত কর্মচারীর কথা মানতে চান না। তাঁরা সংগঠনের কথা মেনে চলেন। সংগঠনগুলি রাজনৈতিক চিন্তা মাথায় নিয়ে একপেশে চলেন, স্বচ্ছতা একদম নেই। এটা বন্ধ করা দরকার। মানীর মান দেওয়াটা পঞ্চায়েতের বিশেষ দায়িত্ব বলে মনে করি—এটি না হলে কোনো উন্নয়নমূলক কাজে সাফল্য আসবে না।

লেখক : ভূতপূর্ব অধীক্ষক বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ বিভাগ

মৎস্য চাষে বাঁকুড়া

সোমসুন্দর বিশ্বাস

বাঁকুড়া জেলাতে দুটি কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কাজ করছে। কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে মাছ চাষের উপাদান সরবরাহ করে থাকে। কংসাবতী জলাধার বা মুকুটমণিপুর ড্যাম্পে কংসাবতী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তার এগারোটি সদস্য প্রাথমিক সমিতিকে নিয়ে এন সি ডি সি-র সহায়তায় কংসাবতী জলাধার মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণ করেছে।

ক থায় আছে বাঙালির মাছ ছাড়া কি চলে ? সত্যই বাঙালির মাছ ছাড়া চলে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই কমবেশি মাছ পাওয়া যায় এবং মাছের চাষ হয়ে থাকে। কোনও কোনও জেলা সমুদ্রের উপকূলভাগে অবস্থিত হওয়ার জন্য সামুদ্রিক মাছ বা নোনা জলের মাছ পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলা অবস্থানগত দিক থেকে সমুদ্রের উপকূলভাগে অবস্থিত না হওয়ার জন্য এই জেলাতে সামুদ্রিক মাছ বা নোনা জলের মাছ পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঁকুড়া জেলা মাছ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলা। বাঁকুড়া জেলায় বছরে প্রায় ২২,০০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপন্ন হয়। এই জেলায় মাছ চাষের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এই জেলার জলাভূমির পরিমাণ ২২৪২৫ হেক্টর যার মধ্যে ১৪,০০০ হেক্টর জলাশয় এবং জলাভূমিতে মাছ চাষ হয়ে থাকে। বাঁকুড়া জেলায় বেশ কিছু ছোটবড় পুকুর ছাড়াও রয়েছে জলাধার ও বাঁধ। যেমন— কৃষ্ণবাঁধ, লালবাঁধ, পোকাবাঁধ, যমুনা বাঁধ। ঝিলিমিলি যাওয়ার পথে তালবেড়িয়া ড্যাম, রানীবাঁধের জঙ্গল ও পাহাড়ের জলকে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে মহাদেব সিনান, কলাবনী ও বীরকার্ড সেচবাঁধ। শালী নদীর উপর নির্মিত হয়েছে গাংদোয়া ড্যাম্প, শিলাবতী নদীর উপর নির্মিত হয়েছে শিলাবতী জলাধার জোড় বাঁধগুলির মধ্যে মালিয়াড়া জোড়বাঁধ ও দেউলভিড়া জোড়বাঁধ উল্লেখযোগ্য। সিমলাপালের কালিন্দী বাঁধ জয়পুরের সমুদ্র বাঁধ, হিকিম বাঁধ উল্লেখ্য। এছাড়া আরও বাঁধ ও জলাশয় রয়েছে। এই জেলাতে বড় বড় বাঁধ ও জলাধারগুলিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। কিন্তু তৎকালীন যুগে কিছু স্বার্থান্বেষী কর্তাব্যক্তিদের কবলে পড়ে এগুলি উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের সহায়তায় ও তৎপরতায় মৃতপ্রায় মৎস্যজীবী সমিতিগুলির মধ্যে নতুন করে আশার আলো দেখা গেছে এবং এই জেলায় শুরু হয়েছে বাঁধ, জলাধার মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প।

বাঁকুড়া জেলা মৎস্যচাষের অন্যতম উপাদান ডিমপোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। আমাদের এই রাজ্যের মোট উৎপাদিত ডিম পোনার অর্ধেকের বেশি উৎপাদিত হয় এই জেলায়। এই জেলার সিমলাপালের মৎস্যজীবীরা সর্বপ্রথম বাঁধে এবং পুকুরে মাছের ডিম ও তা থেকে চারাপোনা উৎপন্ন করেন। এই পদ্ধতি ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে এই জেলায় ও জেলার বাইরে। এই পদ্ধতি ছিল অনেক সময়সাপেক্ষ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। পরবর্তীকালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবিষ্কৃত হল মাছের প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতি। ওড়িশার কটকের মৎস্য গবেষণাগারে এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ছয়ের দশকের শেষ ভাগে বাঁকুড়া জেলার হীড়ে এটির প্রথম প্রয়োগ হয়। এই পদ্ধতিতে পিটুইটারী হরমোন প্রয়োগে মাছকে প্রণোদিত করা হয়। স্বল্পসংখ্যক মাছকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেখা গেল তা ডিম পাড়ছে। অর্থাৎ পাশ করছে যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ব্রিডিং। তার দেখাদেখি বাকি মাছেরাও ডিম পাড়ছে বা ব্রিড করছে। ফিমেল মাছই একমাত্র ডিম পাড়ে। শুরু হল মৎস্যচাষ বা মাছ চাষের এক নতুন অধ্যায়। ক্রমে ওই পদ্ধতি এই জেলার ওন্দা, পাঁচমুড়া,

বড় বড় বাঁধ ও জলাধারগুলি নিয়ে তৈরি হয়েছে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি

রানীবাঁধ, সুতানের জঙ্গল ও জলাধার

রামসাগর, তালডাংরা, সিমলাপাল বিষ্ণুপুরের কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই জায়গাগুলি হয়ে উঠে ডিমপোনা উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাছ চাষের উন্নতি হল। আটের দশক থেকে শুরু হল ইকো-হ্যাচারির মাধ্যমে ডিমপোনার উৎপাদন। কিন্তু জেলার সব জায়গায় এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ল না। কেবলমাত্র রামসাগরে এই পদ্ধতি প্রসার লাভ করল। বর্তমানে রামসাগরে প্রায় ১৫৬টি ইকো হ্যাচারি আছে এবং জেলার শতকরা ৬০ ভাগ ডিমপোনা এখানে উৎপাদিত হয়। এই জেলায় রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প, সাইপিনাস প্রভৃতি মাছের চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে গলদা চিংড়ি ও মাগুর মাছের চাষ শুরু হয়েছে। গলদা চিংড়ি ও মাগুর মাছের চাষ খুবই লাভজনক। এটি বেকার যুবক-যুবতীদের স্ব-নিযুক্তিতে বিশেষ সহায়ক। বাঁকুড়া জেলা বর্তমানে মোট চাহিদার অর্ধেকের বেশি মাছ উৎপন্ন করতে পারে। এবং ভবিষ্যতে আরও করবে বলেই আশা করা যায়।

রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর তাদের কর্মকাণ্ডকে কেবল মৎস্য উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করেছে, করছে ও করতে চলেছে।

যেমন প্রথমত মৎস্যজীবীদের জন্য বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৫০ জন বৃদ্ধ মৎস্যজীবীকে ৩০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, উপজাতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে প্রায় ৪,৪০,০০০ টাকা ব্যয় করে আদিবাসীদের ২২ হেক্টর পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। এই আর্থিক বছরে প্রায় ৯৮ জন উপকৃত হন। পরবর্তী পদক্ষেপে ১৯৯৯-২০০০ বর্ষে ৩,৫০,০০০ টাকা খরচ করে ১৭.৫০ হেক্টর পুকুরে মাছ চাষ করা হয় এতে প্রায় ৮২ জন আদিবাসী উপকৃত হন। এই সঙ্গে পঞ্চায়েত, প্রতিষ্ঠান ও গ্রাম ষোলোআনার পতিত পুকুরগুলির সদ্ব্যবহার ও ভোজ্য মাছ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রূপায়িত হয়েছে সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্প। এই প্রকল্পে ৯৮-৯৯ সালে ১,২৫,৫৫০ টাকা ব্যয় করে ৪৫ হেক্টর জলাশয়ে মাছ চাষ বা মৎস্যচাষ করা হয়। এতে উপকৃত হন মোট ৩৮২ জন। ৯৯-২০০০ বর্ষে ১.২৬০০ টাকা ব্যয় করে ৪৫ হেক্টর জলায় চাষ করা হয়। এতে উপকৃত হন মোট ২৭৭ জন। এই প্রকল্পে উদ্যোগী মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষীদের মাছের চারা ও চুন সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, মৎস্যজীবীদের জন্য আদর্শ গ্রাম নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বাঁকুড়া ব্লক-২ এর পুরন্দরপুর গ্রামের মৎস্যজীবীদের জন্য ১০০টি বাড়ি ও ৫টি নলকূপ ও ১টি কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নিরশা ৭৮টি ও ছাতারকানালী গ্রামে ৬০টি বাড়ি নির্মীয়মাণ।

চতুর্থত, মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের মৎস্যচাষে উন্নত ও শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ব্লকস্তরে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ ও জেলাস্তরে ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ এবং স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এছাড়া মৎস্যজীবী মহিলাদের জাল বুননের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পঞ্চমত, যে পুকুরে অথবা বাঁধে মৎস্যচাষ করা হয় সেই সব পুকুর ও বাঁধে হাঁস প্রতিপালন করে আয় বাড়াতে সাহায্য করা হয়ে থাকে। ৩০ জন মহিলাকে দশটি করে হাঁসের ছানা দেওয়া হয়েছে, এর সঙ্গে হাঁসের ছানার খাদ্যও দেওয়া হয়েছে। মৎস্যচাষে উৎসাহী এবং সচেতনতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে জলাভূমির সংস্কার সম্প্রসারণ ও মাছ চাষের মাধ্যমে জলাভূমির সদ্ব্যবহার করার জন্য জলাভূমি দিবস
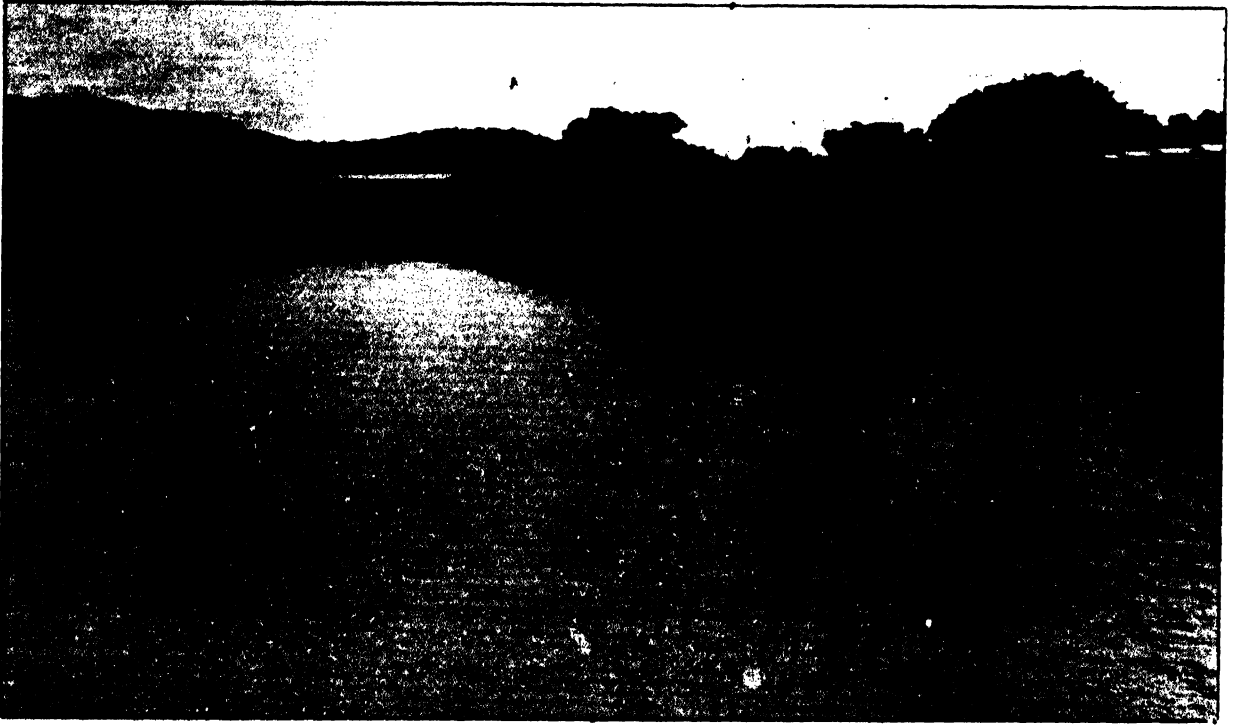
মুকুটমণিপুরের ড্যাম জলাধার

পালন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষ প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া মৎস্যজীবীদের গ্রামে যোগাযোগ ও যাতায়াতের জন্য রাস্তার মেরামত ও উন্নয়নের প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন, খাতড়া ব্লকের ছোটমেটালা ধীবরপল্লী থেকে পিচ রাস্তা, মির্জাপুর ধীবরপল্লী থেকে পিচরাস্তা, ইন্দাস ব্লকের চারিগ্রাম ধীবরপল্লী থেকে পিচরাস্তা ও পুরন্দরপুর আদর্শ ধীবরপল্লীর ভিতরের রাস্তা ও রামসাগর রেলস্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন।

ষষ্ঠত, মৎস্য চাষের নানা পরীক্ষা ও উন্নত গবেষণার জন্য রামসাগরে একটি মৎস্য গবেষণাগার বা ফিশল্যাব স্থাপন করা হয় সাংসদ তহবিলের পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। এছাড়া জল ও মাটি পরীক্ষার কাজ করার জন্য জেলা ল্যাবরেটরিটিকে সাজানো হয়েছে। মৎস্যচাষীরা মৎস্য দপ্তরের জেলা দপ্তরে মাটি ও জলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন।

বাঁকুড়া জেলাতে দুটি কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কাজ করছে। কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে মাছ চাষের উপাদান সরবরাহ করে থাকে। কংসাবতী জলাধার বা মুকুটমণিপুর ড্যাম্পে কংসাবতী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তার এগারোটি সদস্য প্রাথমিক সমিতিকে নিয়ে এন সি ডি সি-র সহায়তায় কংসাবতী জলাধার মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী কিরণময় নন্দ গত ১১ নভেম্বর ১৯৯৯ এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। প্রায় ৬ লক্ষ টাকা খরচ করে ৫ লক্ষ চারাপোনা ছাড়া হয়। এছাড়া এই সমিতিগুলিকে মাছ ধরার জাল ও নৌকা দেওয়া হয়।

এন সি ডি সি-র প্রকল্পে কংসাবতী ছাড়াও বেশ কয়েকটি বড় বাঁধ ও জলাধার এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

যেমন—শালী জলাধার, কাচ্ছোর জলাধার, লালবাঁধ, হিকিম বাঁধ দেউলভিড়া জোড়বাঁধ, মহাদেব সিনান, কল্লাবনী, বীরকার্ড সেচবাঁধ।

মৎস্য চাষে বেকার যুবক-যুবতীদের ও মৎস্যচাষীদের উৎসাহী করার জন্য ও ভোজ্য মাছ উৎপাদনের জন্য বাঁকুড়া মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে চলেছে। এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কঋণ ও সরকারি অনুদান পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত এফ এফ ডি ই সি প্রকল্পে ৫৪৫৫ হেক্টর পুকুরকে বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য চাষ বা মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। যাতে উপকৃত হয়েছেন ৮৮৬৫ জন মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবী।

পরিশেষে বলা যায় বাঁকুড়া জেলা মৎস্য চাষে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে অতীতের থেকে। বর্তমান রাজ্য সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ও তার সার্থক রূপায়ণই একমাত্র সাফল্যের চাবিকাঠি।

অবশ্য জেলার মৎস্যজীবীদের নিরলস প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা যায় না।

সূত্র

জেলা মৎস্য দপ্তর—বাঁকুড়া।
শ্রীমহাদেব মাঝি, সহ অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, বাঁকুড়া
শ্রীনবগোপাল রানা, জেলা-আধিকারিক, মীন দপ্তর, বাঁকুড়া
শ্রীকার্তিক সিন্হা, সহ-জেলা আধিকারিক, মীন দপ্তর, বাঁকুড়া

লেখক : গ্রন্থাগারিক, অশ্বিনীরাজ স্মৃতি পাঠাগার, ফুলডাঙ্গা

বাঁকুড়ার অরণ্যসম্পদ ও তার পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা

অসিতকুমার ভৌমিক

শুধুমাত্র বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বিকল্প অর্থনৈতিক সহায়ক এবং সামাজিক উন্নয়নমুখী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বন এলাকায় জলাশয় ও বাঁধ তৈরি এবং মাছের চাষ, মুরগি পালন, শূকর চাষ, হাঁস চাষ, মৌমাছি পালন, তসর চাষ, লাক্ষা চাষ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলির উদ্যোগ নেওয়া এবং কৃষি সহায়ক যন্ত্রাদি যেমন—চাষের জন্য পাম্পমেশিন, স্প্রে মেশিন, ধান ঝাড়াই-এর মেশিন ইত্যাদি বন সুরক্ষা কমিটির দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে।

মানবসভ্যতার শুরু থেকেই মানুষের সঙ্গে অরণ্যের যোগাযোগ। মানুষ যখন খাদ্য সংগ্রাহকের ভূমিকায় ছিল, তখন সে অরণ্যকেই নিজেদের খাবারের উৎসস্থল এবং আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহার করত। খাদ্য উৎপাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরও মানবসমাজ অরণ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছে।

অরণ্য হল বিভিন্ন বৃক্ষ, বীরুৎ, গুল্মরাজির দ্বারা গঠিত এমন এক আবাস যেখানে নানারকম বন্যপ্রাণীরা, পোকামাকড় এবং পাখিরা বসবাস করে। প্রকৃতিতে উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অরণ্য হল মাতৃসম প্রাকৃতিক এক অমূল্য সম্পদ যার স্নেহজঠরে হাজার হাজার বছর ধরে সযত্নে লালিত হয়ে আসছে জীবজগতের অস্তিত্ব।

বনজ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নানা কারণে হচ্ছে। কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াতে, কল-কারখানা গড়ে তুলতে নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস হয়েছে। শিল্প সভ্যতার সূচনা থেকেই পৃথিবীর বনাঞ্চলের পরিমাণ ক্রমশ কমছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আজ বনভূমি বিপন্ন। পরিসংখ্যানের বিচারে মানুষ কৃষিকাজ আরম্ভ করার সময় থেকেই পৃথিবীর অর্ধেক অরণ্য অবলুপ্ত। আমাদের দেশের মোট আয়তনের প্রায় শতকরা ২২.৮ ভাগ হল বনভূমি যা প্রয়োজনের (অন্তত শতকরা ৩৩ ভাগ) তুলনায় কম। পশ্চিমবঙ্গের গড় বনভূমির পরিমাণ প্রায় শতকরা ১৪ ভাগের মতো।

অরণ্য ধ্বংসের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায়, ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়, মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পায়। বন্যপ্রাণীরা আবাসস্থল হারিয়ে, খাবারের অভাবে ধ্বংস হয়। বনজ সম্পদ ও প্রাণী সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের দেশ থেকে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি ইতিমধ্যেই লুপ্ত হয়েছে।

বর্তমানে অরণ্য সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সবাই চিন্তিত। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে প্রথম বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের পর কয়েকটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অরণ্য ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় পরিবেশ বিজ্ঞানী ও দেশের শাসক সম্প্রদায় উদ্যোগী হয়েছেন। বিভিন্ন দেশে পরিবেশ রক্ষার আইনকানুন তৈরি হয়েছে। আমাদের দেশে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে পরিবেশ দপ্তর ও বনদপ্তরের হাতে অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের এবং পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত।

শাল, পলাশ, মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা লালমাটির দেশ আমাদের এই বাঁকুড়া জেলা। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বদিকের শেষ সীমানা বাঁকুড়া। উঁচু, নিচু, ঢাল, ছোট ছোট পাহাড়, লালকাঁকড় ঢাকা রাঙামাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে তৈরি আমাদের এই বাঁকুড়া জেলা। দক্ষিণ পশ্চিমাংশ লালমাটির অসংখ্য ঢেউ-এর দোলায় দোলায়িত, পশ্চিম থেকে পূর্বে ঢাল। স্বাভাবিক গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৪০০ মি. মি-এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ বৃষ্টি হয় বর্ষাকালে। মাটির জল ধারণ ক্ষমতার স্বল্পতার জন্য মাটি রুক্ষ ও শুষ্ক। দক্ষিণে খাতরা ও রানীবাঁধ অঞ্চলে ছোট ছোট ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পাহাড়, উত্তরে মেজিয়া এবং কাড়ো পাহাড় এবং বড় পাহাড়গুলির মধ্যে শালতোড়া থানার বিহারীনাথ পাহাড় এবং ছাতনা থানার শুশুনিয়া পাহাড় উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে প্লাবিত হলেও জেলার নদীগুলিতে সারা বছর প্রায় জল থাকে না। প্রধান নদীগুলির মধ্যে দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শীলাবতী, কুমারী, কংসাবতী, জয়পাণ্ডা, বোদাই, শালি, ভৈরববাঁকী প্রধান।

বৃক্ষ নিধনের পাশাপাশি সৃজন পর্ব চলছে

এক কালে বনের প্রাচুর্যের জন্য এই অঞ্চলের নাম ছিল 'জঙ্গল মহল'। ১৮০৫ সালে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে জঙ্গল মহল তৈরি হয়। পরে ভূমিজদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য ১৮৩৩ সালে জঙ্গল মহল ভেঙে ফেলে 'মানভূম' জেলা তৈরি হয়। অবশেষে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে বর্তমানের বাঁকুড়া জেলা নিজস্ব রূপ পায় জেলার মোট আয়তন ৬৮৮২ বর্গ কি. মি.।-এর মধ্যে জেলার মোট বনভূমি পরিমাণ ১৪৮২ বর্গ কি. মি.। জেলার ভৌগোলিক আয়তনের ২১.৫৩ ভাগ বনভূমি। বন এলাকার ভিত্তিতে বাঁকুড়া রাজ্যে চতুর্থ। জেলার বন পরিচালন ব্যবস্থা বাঁকুড়া দক্ষিণ, বাঁকুড়া উত্তর ও পাঞ্চেৎ ভূমি সংরক্ষণ (বিষ্ণুপুর)—তিনটি বিভাগের উপর ন্যস্ত। জেলার সমস্ত অরণ্যকে ২৭টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। অঞ্চলগুলি হল—বিষ্ণুপুর, জয়পুর, বাঁকাদহ, ওন্দা, তালডাংরা, সিমলাপাল, পিরারগাড়ী, সারেঙ্গা, মাটগোদা, রানীবাঁধ, ঝিলিমিলি, খাতরা-১, খাতরা-২, ইন্দপুর, কমলপুর, বাঁকুড়া দক্ষিণ সদর, বাঁকুড়া উত্তর সদর, ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, রাধানগর।

বাঁকুড়ার অরণ্য অবক্ষয়িত শাল জঙ্গল। অরণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে জঙ্গলগুলি উষ্ণমণ্ডলীয় পর্ণমোচী অরণ্য ((Tropical De-

ciduous Forest) এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের জেলার জঙ্গলগুলি প্রাকৃতিক জঙ্গল নয়। শুধু আমাদের জেলা নয়, দক্ষিণবঙ্গের বিশেষত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বীরভূম জেলার অরণ্যগুলি পুনর্বনায়ন প্রকৃতির Rehabitation Degraded Forest. ইংরেজ শাসনকালে উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা দক্ষিণবঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকার ফলে দক্ষিণবঙ্গের প্রাকৃতিক জঙ্গল কেটে প্রায় শেষ করে দেওয়া হয়। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত জেলা গেজেট বাঁকুড়া খণ্ডতে উল্লেখ আছে যে, ১৯০২ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে বাঁকুড়ার উপর দিয়ে বিস্তৃত হওয়ার পর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকা জঙ্গলে ব্যাপক বৃক্ষনিধন শুরু হয়। ফলে প্রাকৃতিক বন যা এককালে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে প্রায় সমান ছিল তা দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিনষ্ট হয়ে যায়।

মাটির প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তার জল ও বায়ুধারণ ক্ষমতা এবং খনিজ ও জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর জঙ্গলের প্রকৃতি নির্ভর করে। যে কোনও জঙ্গলে উদ্ভিদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে চারটি স্তর তৈরি হয়। বৃক্ষ সর্বোচ্চ স্তর তৈরি করে। বৃক্ষকে আশ্রয় করে থাকে কিছু লতা এবং পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ। কাস্টল কাণ্ড নিয়ে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ দ্বিতীয় স্তর তৈরি করে। বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ তৃতীয় স্তরের বাসিন্দা। চতুর্থ স্তরে বা সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করে কিছু লতা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। ডঃ মনীন্দ্রনাথ সান্যালের লেখা থেকে জানা যায় যে বাঁকুড়া জেলার বনাঞ্চলে বৃক্ষের প্রজাতি সংখ্যা সাতানব্বই, গুল্ম ও কাস্টল লতার মোট প্রজাতির সংখ্যা বাহান্ন, পাঁচশতর বেশি প্রজাতির বীরুৎ এবং বারো রকমের প্রজাতির পরজীবী উদ্ভিদ দেখা যায়।

বৃক্ষের মধ্যে শাল এবং শালের সাথী গাছ যথা পিয়াশাল, মহুয়া, কেন্দ, ময়না, ধব, তাকোলি, করঞ্জ, গামার দেখতে পাওয়া যায়। পানজন্ ও লোহাকাঠ রানীবাঁধ এলাকায় পাওয়া যায়। এই গাছগুলির সঙ্গে মিশে থাকে পিয়াল, হলুদ, ভুয়াস, নিম, বেল, ভেলাই, কুসুম, হরিতকী, বহরা, মুরমুরিয়া, অর্জুন, জাম, মূলা, পলাশ, শিমূল, পাপারা, কুরচি, শিউলি, বাবলা ইত্যাদি। রাণীবাঁধের জঙ্গলে প্রচুর শিউলি গাছ আছে। ছোটগাছের মধ্যে খয়ের, কুচিলা, সিধা, গুড়কুচলা, আঁকড়, জিয়ল, ইন্দ্রজাউ ইত্যাদি প্রধান। ছাতনা, মেজিয়া, শালতোড়ার সমতল জঙ্গলে পলাশ গাছের আধিক্য উল্লেখযোগ্য। প্রধান গুল্মের মধ্যে বেঁচি, শিয়াকুল, কুল, ময়নাকাটা, বনকরমচা, কুকুরবিছা, বনকাপাস কোথাও কোথাও দুর্ভেদ্য জঙ্গলভূমি সৃষ্টি করে। কয়েকটি গুল্মের বিভিন্ন বর্ণের ফুল বনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। দক্ষিণে রাণীবাঁধ বা ঝিলিমিলি পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলে গুল্মের পরিমাণ কম দেখা যায়।

কাস্টল লতাপ্রজাতিগুলির মধ্যে অনন্তমূল, আটাং, বুড়িলতা, কুমারীলতা, শ্যামালতা, কোকেয়ার প্রধান। রাণীবাঁধ ও সোনামুখীর জঙ্গলে লাদানলতা, লতাপলাশ দেখতে পাওয়া যায়। মহুল নামে বিশাল কাস্টল লতার উপস্থিতি রাণীবাঁধ জঙ্গলের বৈশিষ্ট্য, গুল্মজাতীয় পরজীবী উদ্ভিদের মধ্যে স্বর্ণলতা, মান্দা, বাঁদা ইত্যাদি বিভিন্ন গাছের কাণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে। বাঁকুড়ার বিভিন্ন জঙ্গলে রাস্না ও গজপিপুল পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ প্রজাতি দেখা যায়।

জেলার বনাঞ্চলে ছোট ছোট বীরুৎ এবং মাটিতে শায়িত লতাগুলির মধ্যে ঈশ্বরমূল, লজ্জাবতী, বেরেলা, কুঁচ, দাদমারী, আলকুশি, শতমূলী, জংলী আদা, ভুঁই আকড়া, মাকাল, খেতপাপড়া, খারদুধি, বনহলুদ, কাঁটা-আলু ইত্যাদি প্রধান। ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গলে এদের সংখ্যা কমে আসে। বনের মাঝে ফাঁকা অংশে অথবা বনের প্রান্তভাগে এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।

ষাটের দশকের গোড়ায় ইউক্যালিপ্টাস ভারতে আসে। অবক্ষয়িত বনাঞ্চলে এবং ফাঁকা জমিতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের

সুতান জঙ্গলের দৃশ্য

জাতীয় বর্জ্যপদার্থের আবর্জনা দূষণের কারণ হয়ে উঠছে। জেলার অরণ্য সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করে। শাল, লোহাকাঠ, শিশু, গামার, পিয়াশাল ইত্যাদি গাছ থেকে আসবাবপত্র, জানালা ও দরজা তৈরি হয়। আকাশমনি, ইউক্যালিপ্‌টাস, সুবাবুল ইত্যাদি গাছ থেকে কাগজমণ্ড, শিমুল, ঘোড়ানিম, ছাতিম কাঠ থেকে দেশলাই কাঠি, প্লাইউড ; বাবলা ও ভূয়াস থেকে গরুর গাড়ি চাকা ইত্যাদি তৈরি হয়। বনের উপজাত বস্তুগুলি যেমন—শালপাতা, কেন্দপাতা, মধু, মহুয়া ফুল থেকে দেশি সুরা, কাজু, শালবীজ, লাক্ষা, তসর, রজন, বিভিন্ন ফল, ছাতু ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা করে।

পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ইউক্যালিপ্‌টাসের সঙ্গে আকাশমণি, আমলকি, আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, করঞ্জ, গামার, ঘোড়ানিম, ছাতিম, জারুল, জ্যাকারাণ্ডা, ঝাউ, তেঁতুল, দেবদারু, পাকুড়, বাবলা, বট, মেহগিনি, শিশু, শিরীষ, বেল, সুবাবুল, ছাতিম, সেগুন, ইত্যাদি বৃক্ষ সবুজায়নের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়।

জেলার পূর্ব-উত্তরাংশে জয়পুর, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, বাঁকাদহ, পাত্রসায়ের, রাধানগর, বড়জোড়া বা বাঁকুড়ার সমতলভূমিতে অবস্থিত বনাঞ্চলগুলি দীর্ঘ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। বিশেষত, জয়পুরের জঙ্গল সোনামুখীর রাণির জঙ্গল, ওন্দা থানার রতনপুরের জঙ্গল ঘনসন্নিবিষ্ট। জেলার দক্ষিণাংশে মাটগোদা, ঝিলিমিলি, রাণীবাঁধ, পিরারগাড়ী, খাতরা অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়, এর ঢালগুলি ছোট ছোট শালের জঙ্গলে ঢাকা। বিভিন্ন প্রকার ভেষজ উদ্ভিদের জন্য এই অংশের অরণ্য বিখ্যাত। সিমলাপাল অঞ্চলে কাজুবাদামের চাষ হয়। এই বনাঞ্চল একদিকে বিহারের সিংভূম বনাঞ্চল এবং অন্যদিকে মেদিনীপুর হয়ে ওড়িশার বনাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। জেলার পশ্চিমাংশে মেজিয়া, শালতোড়া এবং ছাতনার বনাঞ্চল প্রধানত বিহারীনাথ পাহাড়, শুশুনিয়া পাহাড় এবং মেজিয়া পাহাড়কে কেন্দ্র করে বিস্তৃত। বিহারীনাথ পাহাড়ে কন্টক জাতীয় গুল্ম ও কাস্টল লতাগুলি দুর্ভেদ্য জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। শুশুনিয়া পাহাড়ের জঙ্গল পূর্বদিকে অবস্থিত। রাজা চন্দ্রবর্মনের ঐতিহাসিক শিলালিপি দেখতে প্রতি বছরই প্রচুর লোক এখানে আসেন।

বনের মধ্যে বনভোজনের স্থানগুলিতে প্রতি বছরই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত এবং জেলার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু লোক আসেন। রাণীবাঁধ জঙ্গলের সুতান, তালডাংরার চেঁচুড়িয়া, বিহারীনাথ এবং শুশুনিয়া পাহাড় প্রধান বনভোজনের স্থান, মাইকের শব্দ অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। স্থানগুলিতে ক্রমান্বয়ে জমতে থাকা প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্যপদার্থের আবর্জনা দূষণের কারণ হয়ে উঠছে।

জেলার অরণ্য সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করে। শাল, লোহাকাঠ, শিশু, গামার, পিয়াশাল ইত্যাদি গাছ থেকে আসবাবপত্র, জানালা ও দরজা তৈরি হয়। আকাশমনি, ইউক্যালিপ্‌টাস, সুবাবুল ইত্যাদি গাছ থেকে কাগজমণ্ড, শিমুল, ঘোড়ানিম, ছাতিম কাঠ থেকে দেশলাই কাঠি, প্লাইউড ; বাবলা ও ভূয়াস থেকে গরুর গাড়ি চাকা ইত্যাদি তৈরি হয়। বনের উপজাত বস্তুগুলি যেমন—শালপাতা, কেন্দপাতা, মধু, মহুয়া ফুল থেকে দেশি সুরা, কাজু, শালবীজ, লাক্ষা, তসর, রজন, বিভিন্ন ফল, ছাতু ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা করে। জেলার জঙ্গলগুলি বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। জেলার জঙ্গল থেকে প্রায় শতাধিক প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শুধু প্রাকৃতিক ভারসাম্য বা সম্পদ জোগান দেওয়া নয় বিভিন্ন ঋতুতে অরণ্যের পরিবর্তিত রূপ আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। বর্ষার পর গাঢ় সবুজ পাতার উপর উজ্জ্বল সূর্যালোক যখন মনকে আবিষ্ট করে, শরতে বিভিন্ন ফুলের সমারোহ এবং সুমিষ্ট গন্ধে আমাদের মন আন্দোলিত হয়। আবার যখন শীতের শেষে গ্রীষ্মের শুরুতে পর্ণমোচী শাল অরণ্যের ঝরে যাওয়া পাতার গন্ধে মন খারাপ হয়ে যায়, তখন পলাশ, শিমুলের লালফুল অরণ্যের মুখে হাসি ফোটায়—আমাদের প্রেরণা দেয় নৈরাশ্যের মধ্যে আশার উৎস সন্ধানে।

বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে এককালে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর বিচরণ-ভূমি ছিল। ১৮৭৭ সালে Willium Hunter এর Bankura Gazette-এ বাঘ, ভালুক, হাতী, হায়েনা, কৃষ্ণসার, চৌশিঙ্গা হরিণের কথা উল্লেখ আছে। ১৯০৮ সালে O'Malley লিখিত "Bankura District Gazetteers"—এ শালতোড়া এবং রাইপুরের জঙ্গলে বাঘের উল্লেখ আছে। খাতড়া বনাঞ্চলে মানুষখেকো বাঘের কথা ওই গেজেটিয়ার্স থেকে জানা যায়। রাইপুরের জঙ্গল ছিল চিতল হরিণের প্রাকৃতিক আবাসস্থল। ঝিলিমিলি বা শুশুনিয়ার জঙ্গলে বয়স্ক আদিবাসীদের মুখে এখনও ভালুকের মহুয়া ফুল খাওয়ার গল্প শোনা যায়। কিন্তু অরণ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বন্যপ্রাণীকে আমরা হারিয়েছি। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাদের কথা গল্পকাহিনী মাত্র।

জয়পুর, বিষ্ণুপুর, বেলিয়াতোড়, সোনামুখীর জঙ্গলে ময়ূর এবং বনমুরগি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বন্য খরগোস, ছুঁচো, গন্ধগোকুল এই সব জঙ্গলে আছে। সরীসৃপদের মধ্যে কেউটে জাতীয় সাপের আধিক্য বেশি। বোড়া জাতীয় সাপের উপস্থিতি কম। ভারতীয় প্রজাতির পাইথন বা ময়াল সাপ বেলিয়াতোড়, সোনামুখী এবং কিছু ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে দেখা যায়। দলমা পাহাড় থেকে আগত প্রায় ৫০-৭০টি পরিযায়ী হাতির দল স্থানীয় প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এই সমস্ত বনাঞ্চলে ১০-১২টি হাতি সব সময়ের জন্য থাকে। মাঝে মাঝে বন সংলগ্ন অঞ্চলে চাষবাসের ক্ষতি করে তা ব্যাপক কিছু নয়। বছরের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর দলমা পাহাড়ের পরিযায়ী হাতিরা ব্যাপক শস্যক্ষতির এবং মাঝে মাঝে প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বনদপ্তরের কর্মীরা স্থানীয় জনগণ এবং প্রশাসন

বাঁকুড়ার জঙ্গলে ময়ূর ও বন্য শুয়োর দেখা যায়

সবাই মিলে পরিস্থিতির সামাল দেন। বাঁকুড়ার প্রায় সব জঙ্গলেই বন্য শুয়োর পাওয়া যায়। বিশেষত বিহারীনাথ পাহাড়ে এদের আধিক্য উল্লেখ করার মতো। শুশুনিয়া এবং শালতোড়ার বনাঞ্চলে শজারুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শুশুনিয়ার জঙ্গলে বহুরূপী বা Chameleon নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বহন করে। হায়না জাতীয় প্রাণীদের উপস্থিতি শুশুনিয়া ও বিহারীনাথ জঙ্গলের এক উল্লেখযোগ্য প্রাণী বৈশিষ্ট্য। কয়েক বছর আগে বিহারীনাথ পাহাড়ে হায়নার আক্রমণে প্রাণহানির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বনরুই বা পিপীলিকাভুকদের এক সময় বাঁকুড়ায় যথেষ্ট দেখা যেত। বর্তমানে প্রায় অবলুপ্ত হলেও বেলিয়াতোড় এবং ছাতনার জঙ্গলে এখনও মাঝে মাঝে এদের দেখা যায়।

দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ঝিলিমিলি, রানিবাঁধের বনাঞ্চলে বনমুরগি, ময়ূর, গন্ধগোকুল, হুড়াল জাতীয় প্রাণীদের আধিক্য বেশি। কখনও কখনও চিতাবাঘের দেখা পাওয়া যায়। এই সব বনাঞ্চলে ৫-৬টি হাতি বসবাস করে। প্রজনন ঋতুতে (November) ৩০-৪০টি পরিযায়ী হাতি এসব অঞ্চলে আসে।

অরণ্যে ৩০টিরও বেশি প্রজাতির পাখি বাস করে। বনমোরগ এবং ময়ূরের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে বালিহাঁস, সরাল বা গেছো হাঁস শীতকালে দেখা যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে বাঁকুড়ার উত্তর সদর বনাঞ্চল এলাকায় বড়চাকা গ্রামে শামুকখোর পাখিরা প্রচুর সংখ্যায় আসে। এদের মুক্তচঞ্চু স্টর্ক বলা হয়। সাধারণত জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ওই অঞ্চলে পুকুরের ধারে গাছের ডালে বাসা বেঁধে থাকে। ১৯৯৫ সালে প্রায় ৫০,০০০-৬০,০০০ পাখি এসেছিল। বর্তমানে বৃষ্টির অভাবে এদের সংখ্যা কমে গেছে। ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে স্থানীয় বাসিন্দারা যে যত্ন নিয়ে পাখিদের রক্ষা করেন তা আমাদের কাছে শিক্ষার বিষয়। পাখিদের বাসা করার সুবিধার জন্য গাছের ডাল পর্যন্ত তাঁরা কাটেন না। দুষ্কৃতিদের হাত থেকে পাখি এবং পাখির বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য এক বৃদ্ধা আদিবাসী রমণীর বাধাদানের অসম সাহসী প্রচেষ্টা আমাদের মুগ্ধ করে।

বনবিভাগের বিশেষ উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে জানুয়ারি মাসে রানীবাঁধের সুতান অরণ্যে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে জয়পুর জঙ্গলে মুক্ত পরিবেশে হরিণ ছাড়া হয়। জয়পুরে ডিয়ারপার্ক এবং বনপুকুরিয়ার ডিয়ারপার্কে বন্দীদশায় হরিণের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে মুক্ত বনে ছাড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বেলিয়াতোড় জঙ্গলেও হরিণ ছাড়া হয়। প্রথম প্রজন্ম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল, কয়েকটি হরিণ কুকুরের আক্রমণে মারা যায়। বর্তমানে এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। জয়পুর জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফসলের ক্ষতি করছে। ২-১টি হরিণ ফসলে দেওয়া কীটনাশকের প্রভাবে মারা গিয়েছে।

ক্রমান্বয়ে অরণ্য এলাকায় সঙ্কোচন এবং নির্বিচারে পশুশিকার বন্যপ্রাণীদের অবলুপ্তির প্রধান কারণ। এ জেলার প্রতি বৎসর ১লা মাঘ 'একেন' উৎসব পশুশিকারের উল্লেখযোগ্য দিন। আদিবাসীরা দলবেঁধে তীরধনুক এবং অন্য অস্ত্রাদি নিয়ে পশু হত্যা করেন। বনসুরক্ষা কমিটিগুলির মধ্যে প্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার এবং বনকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও নির্বিচারে প্রাণীহত্যা নিবারণে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রাণীদের উপযোগিতার অলীক ধারণার ফলেও বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাণী আমরা হারিয়েছি।

স্বাধীনতা লাভের পর বনবিভাগের নিজস্ব জঙ্গল ছাড়াও কিছু কিছু জঙ্গল তখনকার জমিদারদের হাতে ছিল। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর এই সমস্ত জঙ্গল ১৯৫৩ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট-এ সরকারের এক্তিয়ারে আসে। অধিগ্রহণের নোটিশ পাওয়ার সময় দামী এবং প্রাচীন গাছসমূহ কেটে ফেলা হয়।

প্রথমদিকে অধিগ্রহণের পর জঙ্গলের ফাঁকা জায়গাগুলিতে শাল, সেগুন এবং অন্যান্য দামী গাছ বেশ কিছু লাগানো হয়। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ইউক্যালিপটাস আসায় ব্যাপক ইউক্যালিপটাস বন তৈরি হয়। ইউক্যালিপ্টাসের সঙ্গে সঙ্গে আকাশমণিও সুন্দরভাবে উৎপন্ন হয়। সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু তারপর বনাঞ্চলের দ্রুত অবক্ষয় হতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনজ সম্পদের চাহিদা, বনের প্রান্তিক অধিবাসীদের রুজিরোজগারের জন্য বনের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি নানা কারণে বনের উপর অসম্ভব চাপ বাড়তে থাকে। ১৯৮১ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সহায়তায় বনভূমির আওতার বাইরে বৃক্ষরোপণের এক ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। রাস্তার ধারে, খালের পাড়ে, রেল লাইনের ধারে, ব্যক্তিগত জমিতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বনজ সম্পদ সৃষ্টিতে গণউদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে সমাজভিত্তিক বনসৃজনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারি বনের অবক্ষয় রোধ করা গেল না। বনকর্মীদের উপর ১৯৮০ সালের প্রথম থেকেই আক্রমণের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৩-'৮৪ সালে ১১ জন বনকর্মী চোরাচালানকারী এবং চোরাশিকারিদের হাতে প্রাণ হারান। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে জঙ্গল সন্নিহিত মানুষদের নিয়ে বন এবং বন্যপ্রাণী রক্ষার চিন্তা নেওয়া হয়। যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা শুরু হল জঙ্গল সন্নিহিত মানুষদের নিয়ে ১৯৮৯ সালের সরকারি আদেশনামার ফলে। গণ-উদ্যোগে বনরক্ষার কাজ শুরু হল, জঙ্গলের সঙ্গে সাধারণ মানুষের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হল। মেদিনীপুর জেলায় আড়াবাটী রেঞ্জে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম বন সুরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। বনকর্মীরা বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা, সভা ও প্রশিক্ষণ শিবির করেছেন। পঞ্চায়েত ও সমবায় এক্ষেত্রে সহায়তা করেন।

> **১৯৮১ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সহায়তায় বনভূমির আওতার বাইরে বৃক্ষরোপণের এক ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। রাস্তার ধারে, খালের পাড়ে, রেল লাইনের ধারে, ব্যক্তিগত জমিতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বনজ সম্পদ সৃষ্টিতে গণউদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে সমাজভিত্তিক বনসৃজনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারি বনের অবক্ষয় রোধ করা গেল না। বনকর্মীদের উপর ১৯৮০ সালের প্রথম থেকেই আক্রমণের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৩-'৮৪ সালে ১১ জন বনকর্মী চোরাচালানকারী এবং চোরাশিকারিদের হাতে প্রাণ হারান।**

আমাদের জেলায় মোট বন সুরক্ষা কমিটির (F. P. C.) সংখ্যা ১২১৭, মোট সদস্য সংখ্যা ১,১৫,৫৬৩। জেলায় দশ লক্ষেরও বেশি পরিবার পরিজন বন সুরক্ষা কমিটিগুলির সঙ্গে যুক্ত। শুধু মহিলা সদস্য দ্বারা পরিচালিত বন সুরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে ; ২টি প্রতিবন্ধী পরিচালিত বন সুরক্ষা কমিটি আছে। অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা কাজুবাদাম ছাড়া যে কোনও ফল, ছাতু, মধু, ঔষধি গুল্ম, জ্বালানি, শালপাতা, কেন্দপাতা, শালবীজ, আমলকী, বহড়া, হরিতকী, মহুয়া বহু পরিবারের অর্থনৈতিক বিকাশ এনেছে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। বনাঞ্চলের অন্তিম কাটাই ও কাজুবাদামের বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক-চতুর্থাংশ অর্থ পান সংশ্লিষ্ট বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। এছাড়া শুধুমাত্র বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বিকল্প অর্থনৈতিক সহায়ক এবং সামাজিক উন্নয়নমুখী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বন এলাকায় জলাশয় ও বাঁধ তৈরি এবং মাছের চাষ, মুরগি পালন, শূকর চাষ, হাঁস চাষ, মৌমাছি পালন, তসর চাষ, লাক্ষা চাষ, প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলির উদ্যোগ নেওয়া এবং কৃষি সহায়ক যন্ত্রাদি যেমন—চাষের জন্য পাম্পমেশিন, স্প্রে মেশিন, ধান ঝাড়াই-এর মেশিন ইত্যাদি বন সুরক্ষা কমিটির দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। শালপাতার থালা, বাটি তৈরির মেশিন, সেলাই মেশিন, তাঁতের সরঞ্জাম বন সুরক্ষা কমিটিকে দেওয়া ও তৎসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌরশক্তি চুল্লা, ধূমহীন চুল্লা, বনজ্যোতি উনান সরকার থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। গাছের মাঝে গোখাদ্যের চাষ করে উন্নত গোচাষের চিন্তা-ভাবনা নেওয়া হচ্ছে। রাণীবাঁধ অঞ্চলে বাবুই চাষের লভ্যাংশ বন সুরক্ষা কমিটি পুরোটাই পায়। এক কথায় যৌথ বন পরিচালনা ব্যবস্থা সারা জেলাতেই এক গণ-আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে।

এই ব্যবস্থা সমূহের সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। পরিকল্পিতভাবে বনজ সম্পদের ব্যবহার বনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি লুপ্তপ্রায় বনাঞ্চলের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। বাঁকুড়ার জনগণ, বনদপ্তর ও পঞ্চায়েতের যৌথ প্রয়াসে লাল মৃত্তিকার রাঢ় অঞ্চলের অরণ্যের প্রসার ঘটেছে। বন সুরক্ষা কমিটির সহায়তায় প্রায় ৫০০ হেক্টর জবরদখলকৃত বন এলাকা উদ্ধার করে অরণ্য সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতান, জয়পুর, সোনামুখী, বেলিয়াতোড়, বনাঞ্চলে চিতল হরিণের পুনর্বাসন প্রকল্প সাফল্যের পথে। জেলায় স্থায়ী হাতির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেশ কিছু জলাশয় ও হাতির পছন্দের গাছ বনের গভীরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সর্বাত্মক গণ-প্রয়াসকে সামনে রেখে নতুন সহস্রাব্দের গোড়ায় গভীর অরণ্য ও অরণ্য সম্পদের সোনালী ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা আশায় দিন গুনছি।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. Hunter Willium—Bankura District Gazetters, 1877.
২. A. K. Banerjee—West Bengal District Gazetters, Bankura.
৩. হরিমোহন কুণ্ডু— ছোট নাগপুরের প্রান্তিক অরণ্য ও প্রাণী।
৪. ডঃ মনীন্দ্রনাথ সান্যাল—বাঁকুড়া জেলার ভূপ্রকৃতি ও সপুষ্পক বনজ উদ্ভিদ।
৫. তরুণদেব ভট্টাচার্য—পশ্চিমবঙ্গ দর্শন।
৬. তপন মিশ্র—বাংলার বনজঙ্গল।

লেখক : অধ্যাপক, বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়

সবুজায়ন, সামাজিক বনসৃজন ও বাঁকুড়া জেলা

প্রতীপ মুখার্জি

বন আইন সংশোধন করে বামফ্রন্ট সরকার আদিবাসীদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে অরণ্যের অধিকার। তাদের নিয়েই গঠন করা হয়েছে বনসংরক্ষণ কমিটি (Forest Protection Group) যাতে এক শ্রেণীর মানুষের লোভের থাবা হরণ করতে না পারে পুনর্জীবিত বনভূমি।

অতীতে বাঁকুড়া জেলা ছিল জঙ্গলমহলেরই অংশ। জেলার বেশির ভাগ অংশই ছিল জঙ্গলে পরিবৃত। জেলা জুড়ে ছিল অসংখ্য শালের জঙ্গল তার সঙ্গে ছিল সেগুন, পিয়াল, হরীতকী, বহড়া, মহুয়া, পলাশ, আম, জাম, শিমুল ও কেন্দ্ গাছ। আর দেখা মিলত বাঘ, বনশুয়োর, ভালুক, নেকড়ে, খরগোস, প্রায় সব কিছুরই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হয় জঙ্গল ধ্বংসের অভিযান, তা পরিপূর্ণতা লাভ করে চল্লিশের দশকের শেষ থেকে ষাটের দশকে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় সরকার জঙ্গল অধিগ্রহণ আইন চালু করলেও এই ধ্বংসলীলাকে প্রতিরোধ করা যায়নি। সত্তরের দশকের গোড়ায় জঙ্গলগুলি প্রায় মরুভূমির চেহারা নেয়। জেলার জঙ্গলগুলি থেকে প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে জেলার চিরাচরিত গাছের সঙ্গে জীবজন্তুরও।

সমগ্র রাজ্যের মতোই বাঁকুড়া জেলাতেও জঙ্গল বা বনাঞ্চল সংরক্ষণ করা, বনাঞ্চলের হতশ্রী চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে আনা তথা সবুজায়নের প্রচেষ্টা শুরু হয় পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। আর এই প্রচেষ্টার রূপায়ণে এগিয়ে আসেন ত্রিস্তরের পঞ্চায়েতের সদস্যরা। চিরাচরিত বনাঞ্চলকে সংরক্ষণের পাশাপাশি সমগ্র রাজ্যের মতোই বাঁকুড়া জেলাতে ১৯৮১ সাল থেকে গ্রহণ করা হয় সামাজিক বনসৃজনের কর্মসূচি। ১৪-২০ জুলাই থেকে শুরু হয় অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপনের কর্মসূচি। উৎসাহিত করা হয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও। আর সূচনা করা হয় বিনামূল্যে চারাগাছ বিতরণের কর্মসূচির। পঞ্চায়েতের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা (এন জি ও) যুক্ত হন এই কর্মসূচিতে যা এক বিশেষ গতি সঞ্চারিত করে এই কর্মসূচির রূপায়ণে। বিলি করা হয় বিভিন্ন প্রজাতির ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছের চারার পাশাপাশি আম, জাম, পেয়ারা, সেগুন, শিশু ও মেহগিনি গাছের চারাও। যা শুধু সামাজিক বনসৃজনের কর্মসূচিতে নতুন করে হাজার হাজার হেক্টর জমিকে যেমন যুক্ত করে ঠিক তেমনই হাজার হাজার মানুষেরও মেলবন্ধন ঘটায় এই কর্মসূচিতে। শুধুমাত্র জওহর রোজগার যোজনার বরাদ্দকৃত অর্থেই (নিম্নের সারণি দ্রষ্টব্য) সামাজিক বনসৃজনের আওতায় যুক্ত হয় কয়েক হেক্টর জমি :

বনসৃজনে বাঁকুড়া জেলার অগ্রগতি লক্ষণীয়

ক্রমশ জঙ্গল অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বন্য জীবজন্তুও প্রায় অদৃশ্য

আর্থিক বছর	সামাজিক বনসৃজনে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সামাজিক বনসৃজনের আওতাভুক্ত হওয়া জমির পরিমাণ (হেক্টরে)
১৯৮৯-৯০	২২.৯৩	৮৭৫
১৯৯০-৯১	১০৯.৬৬	১১৬৯
১৯৯১-৯২	১০৮.১৪	১৩১০
১৯৯২-৯৩	১৩৮.৪৪	২৫৪৪
১৯৯৩-৯৪	১৬২.৬৭	২৪৩১
১৯৯৫-৯৬	৬৭.৭৫	১১৯৮
১৯৯৬-৯৭	৭১.৩৬	৫০৬
১৯৯৭-৯৮	৯৬.১১	৬৫৯
১৯৯৮-৯৯	৫.৭৩	৫৯
১৯৯৯-২০০০	১.৪৮	১৭

সূত্র : Dist. Report, submitted to the Government of West Bengal yearwise.

বন আইন সংশোধন করে বামফ্রন্ট সরকার আদিবাসীদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে অরণ্যের অধিকার। আবার তাদের নিয়েই গঠন করা হয়েছে বন সংরক্ষণ কমিটি (Forest Protection Group বা F.P.G.) যাতে এক শ্রেণীর মানুষের লোভের থাবা শুষে নিতে না পারে পুনর্জীবিত বনভূমিকে। নবরূপে জেগে ওঠা জয়পুরের বনাঞ্চল থেকে রাণিবাঁধের বনাঞ্চল যেমন সুরক্ষা পেয়েছে এই বন সংরক্ষণ কমিটির রক্ষণাবেক্ষণে, ঠিক তেমনই সামাজিক বনসৃজনের মাধ্যমে সৃষ্ট বৃক্ষরাজিকেও রক্ষণাবেক্ষণ তথা সংরক্ষণের জন্য সংলগ্ন এলাকার আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের নিয়েও গড়া হয়েছে বন সংরক্ষণ কমিটি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনেই ওই বৃক্ষরাজি কেটে বিক্রির মাধ্যমে পাওনা অর্থের ২৫% পাবেন বনরক্ষা কমিটি। এই আইনি রক্ষাকবচ প্রদানের ফলে এই অংশের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে আলাদা উৎসাহ-উদ্দীপনা। জেলার প্রকৃতি ও পরিবেশেও সঞ্চারিত হয়েছে পরিবর্তনের ছোঁওয়া। বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক

বিহারীনাথ পাহাড় সংলগ্ন বনাঞ্চল

আয়তন হচ্ছে ৬৮৮২ বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে নথিভুক্ত বনাঞ্চলের পরিমাণ ১৪২৫ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯৪ সালে খড়গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি .(I.I.T) উপগ্রহ মারফত যে সমীক্ষা চালায় তাতে দেখা যায় যে বনাঞ্চলের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬.৫%, এই পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। তাই তো এই জেলা সমস্ত রুক্ষতা ঝেড়ে ফেলে হয়ে উঠছে ক্রমশ সবুজ। সবুজের সন্ধানে দলমা পাহাড় থেকে শুধু বন্য হাতির দলই ছুটে আসছে না এই জেলায়—দেখা মিলতে শুরু করেছে জেলার জঙ্গল থেকে

দলমা পাহাড় থেকে নেমে আসে বন্য হাতির দল

লুপ্তপ্রায় বনাপ্রাণীরও। মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির হজুকডাঙা গ্রামে '৯৩র ২৪ জুন প্যাঙ্গোলিন বা পিপিলিকাভুকের বা '৯৬-র ২৯ মার্চ বাঁকুড়া শহরের পাটপুরে চিতাবাঘের দেখা মেলাকে ঠিক বিচ্ছিন্নভাবে দেখছেন না পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। প্রায় হারিয়ে যাওয়া নেকড়ে বাঘের পদচিহ্ন মিলেছে জেলারই বিহারীনাথ পাহাড় সংলগ্ন বনাঞ্চলে। হাতির পাশাপাশি জেলার বনাঞ্চলে এখন দেখা মিলছে হরিণ, ভালুক, বনশুয়োর, খরগোস প্রভৃতির। জেলার বিভিন্ন বনাঞ্চল ও জলাভূমিতে আনাগোনা শুরু করেছে দেশি-বিদেশি অতিথি পাখির দল (Migratory Birds). বনজসম্পদ জেলার পিছিয়ে পড়া হাজার হাজার আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিকানির্বাহে যেমন সহায়তার হাত প্রসারিত করেছে ঠিক তেমনই সামাজিক বনসৃজন তথা সবুজায়ন বাঁকুড়া জেলাকে তথা রাজ্যকে এনে দিয়েছে দুর্লভ সম্মান। '৮০র দশকেই বাঁকুড়ায় মিলেছে (একটি বছরে) রাজ্যের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার সামাজিক বনসৃজনে প্রথম পুরস্কার। আর ১৯৯১ সালে সামাজিক বনসৃজনের ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের জন্য রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরের পল গেটি পুরস্কার—যার পেছনে জেলার অবদানও কম নয়। তাই জেলার সমৃদ্ধির স্বার্থেই সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে সামাজিক বনসৃজনের কর্মসূচিকে, সবুজায়নের অভিযানকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে গলা মিলিয়ে বলব—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর

....

....

দাও ফিরে তপোবন, পুণ্যছায়া রাশি,

গ্লানিহীন অতীতের দিনগুলি।"

লেখক : অধ্যাপক, বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়
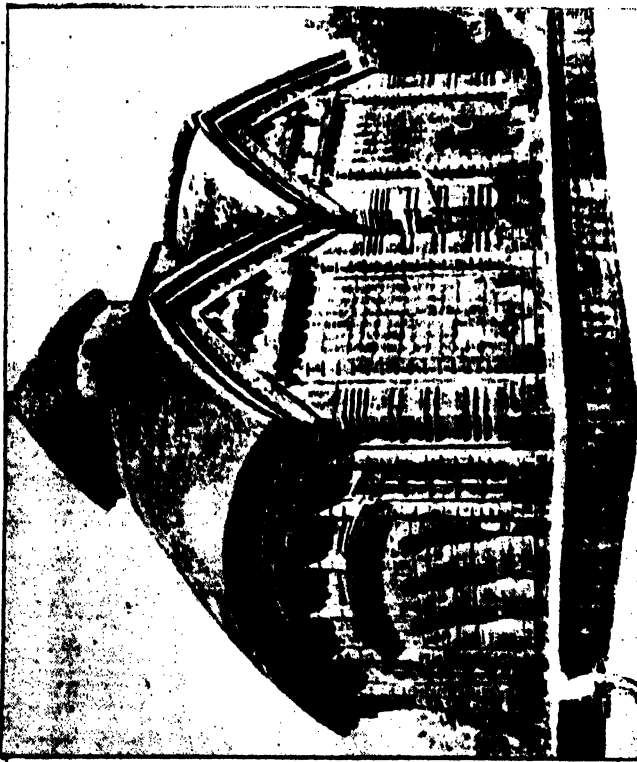
কেষ্ট রায় মন্দির ও টেরাকোটা সজ্জার নমুনা, বিষ্ণুপুর ('বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' থেকে গৃহীত)
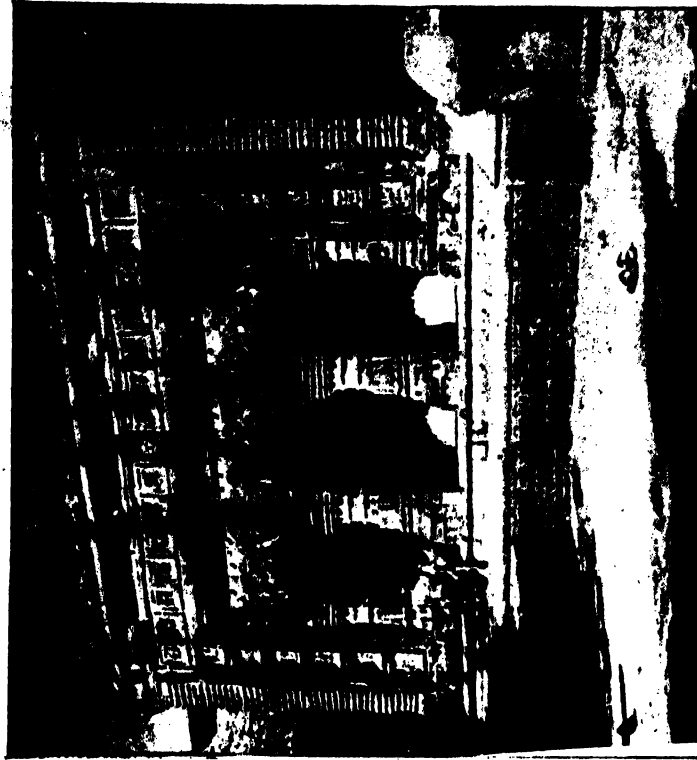
ইটের দালান মন্দির ও পাথরের অলংকরণ ফলক, কোতুলপুর

সামাজিক বনসৃজন ও হরিণ প্রকল্প

তরুবালা বিশ্বাস

বনজসম্পদ জেলার পিছিয়ে পড়া হাজার হাজার আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জীবিকানির্বাহে যেমন সহায়তার সুযোগ প্রসারিত করেছে ঠিক তেমনই সামাজিক বনসৃজন তথা সবুজায়ন জেলা তথা রাজ্যকে এনে দিয়েছে দুর্লভ সম্মান। ৮০'র দশকেই বাঁকুড়া জেলা পেয়েছে সামাজিক বনসৃজনে প্রথম পুরস্কার।

বি

বিশ্বচরাচরে প্রকৃতি নিজের খেয়ালে নয়, যেন পরম যত্নে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে। জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎকে শুধুমাত্র রক্ষা করাই নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে ক্রমবিবর্তনের যাত্রাপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে যেন এই প্রকৃতি বিশাল বিশ্বে সদাই কর্মব্যস্ত। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই উদ্ভিদজগৎ জীবজগতের কল্যাণের জন্য উজাড় করে দিয়েই যাচ্ছে, প্রতিদানে চাইছে না কিছুই। কিন্তু পরম স্বার্থপরের মতো এই স্নেহাতুরা প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করছি আমরা—এই মানবজাতি। তাই বনসম্পদ প্রতিনিয়ত ক্ষয়িষ্ণু থেকে ক্ষয়িষ্ণুতম হয়ে পড়ছে। বন কেটে বসতি, শহর এবং অন্যান্য কাজেও বন ও বনভূমি ব্যবহার করছি। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে পাহাড় এলাকায় ধ্বস, জনবসতি বিপদের অশনিসংকেত পাচ্ছে। ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীর নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং কৃষি জমির উর্বরতার ক্ষতি হচ্ছে। বাতাস দূষিত হচ্ছে। খরা, বন্যা ও জটিল জটিল রোগের প্রকোপ বাড়ছে।

১৯৮০-৮১ সালে পশ্চিমবাংলার বর্তমান সরকার এই ক্ষয়িষ্ণু বনসম্পদ রক্ষা ও বনভূমিকে গোক্ষুরের হাত থেকে রক্ষা করতে অরণ্য সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাস্তার ধারে, রেল লাইনের ধারে, নদী বা খালের দু-ধারে, সরকারিভাবে এই সব গাছ (যা পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উন্নতিকারী) লাগানো হতে থাকল। আবার গ্রামের মানুষদের কাছে আহ্বান জানানো হলো তাঁদের পতিত জায়গাতে গাছ লাগানোর। তাই বিনা পয়সায় চারা বিতরণ এবং গাছে মাটি বা সার দেওয়ার জন্য পয়সা, পরের বছর আবার গাছপিছু পয়সা দেওয়া ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দিকে দিকে শুরু হয়ে গেল সবুজের বিপ্লব। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও পিছিয়ে থাকল না। তারাও শুরু করল। অভাবনীয় সাফল্যলাভ করল বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত। সারা পশ্চিমবাংলায় দেখা গেল সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে গাছ লাগানোর উদ্দীপনা।

আজ সাধারণ মানুষ গাছ বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে, ঘর তৈরি, গাড়ি কেনা থেকে শুরু করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নত করেছে। পঞ্চায়েতগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে স্কুলবাড়ি তৈরি করা, ছাত্রাবাস তৈরি করা, কূপ খনন, বিভিন্ন শিক্ষণ শিবিরের জন্য বাড়ি তৈরি করা ইত্যাদি জনকল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অপরদিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ শতাংশ বনরাজি থাকার ক্ষেত্রে ২৪ শতাংশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে ও পাশাপাশি ক্ষয়িষ্ণু বনকে বন সুরক্ষা কমিটির মাধ্যমে Joint Forest Management-কে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামের মানুষের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি ও আত্মশৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। তাই তো আজ পশ্চিমবঙ্গ সমৃদ্ধ বনোন্নয়নে।

যখন বনোন্নয়ন ঘটছে মানুষের মধ্যে চাহিদা বাড়ছে। বন যখন তৈরি হচ্ছে আমাদের তখন বন্যপ্রাণী থাকবে না কেন ? আমাদের জঙ্গলে হরিণ থাকবে না কেন। সব দেশের জঙ্গলে হরিণ আছে—প্রাকৃতিক শোভা বাড়ছে। তাই তো সাংবাদিকরা লিখেছেন বাঁকুড়া

সুতান ও জয়পুরের সংরক্ষিত জঙ্গলে প্রায় ৮০টি হরিণ ছাড়া হয়েছে

জেলাকে অন্যতম পর্যটনের আওতায় আনা হোক। মানুষের মনে আনন্দ হয়—যখন তাঁরা রাস্তায় যেতে যেতে দেখেন যে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে হরিণের দল পার হচ্ছে তখন তারা মোহিত হয়ে যান। যে দেশ অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ, সেই দেশ তত উন্নয়নশীল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুনরুজ্জীবিত জঙ্গলে ১৯৯৫ সালে বাঁকুড়া জেলার সুতান ও জয়পুরে প্রায় ৮০টি হরিণ পুনর্বাসনের জন্য ছেড়েছে। যার মধ্যে জয়পুরে ছাড়া হয়েছে ২৩টি। এর মধ্যে কয়েকটি রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। গ্রীষ্মকালে বিচ্ছিন্নভাবে ২/১টি গ্রামে চলে গিয়েছে। গৃহপালিত কুকুরে আক্রমণ করেছে। বনসন্নিহিত গ্রামের মানুষ হরিণ ধরে নিকটতম বন দপ্তরে জমা দিয়েছে বা নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিকিৎসা করিয়েছে ও বন কর্মচারীদের সহযোগিতায় জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে। হয়তো কোথাও কোথাও সামান্য ক্ষতি হচ্ছে—তবু মানুষ মেনে নিয়েছে। সুতানে যেখানে হরিণ ছাড়া হয়েছে, সেখানে প্রাকৃতিক শোভা দেখার জন্য পর্যটন কেন্দ্র হয়েছে। মানুষ প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্য সুতানে উপভোগ করেন। পরিকল্পনা আছে জয়পুরেও পর্যটন আবাস তৈরি করার। যত বেশি পর্যটককে আকর্ষণ করা যাবে, ততবেশি স্থানীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। এ সবই করা সম্ভব হয়েছে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায়। যদি আমরা এসব না করতে পারতাম তাহলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে যেত এবং তার ফল হত মারাত্মক।

এই প্রসঙ্গে একজন কবির বাণী স্মরণ করা যায়—

বন্যপ্রাণী করজোড়ে বলে
বনেতে মোদের থাকতে দাও।
বন বলিছে করজোড় করে
বাঁচিলে দেব তোমরা যা চাও॥

লেখক : সভাধিপতি, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ

নগরায়ণের প্রেক্ষাপট : বাঁকুড়া জেলা

হিমাংশু ঘোষ

একদা বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী পৌরএলাকা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ইতিহাস বলে, সিপাহী বিদ্রোহের আমলে এ সমস্ত এলাকা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশম শিল্পে অত্যন্ত উন্নত ছিল। পরে জেলাশহর হিসাবে বাঁকুড়া পৌরসভা বিকশিত হয়। তবে ব্রিটিশদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটার সঙ্গেসঙ্গে বিষ্ণুপুর ও সোনামুখীর উন্নত কুটিরশিল্প সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এই এলাকার মানুষেরা অন্য জীবিকা খুঁজে নেয়।

সু দীর্ঘকাল ধরে সুপরিচিত প্রবাদ 'God made the country, Man made the towns.' বর্তমানে উল্টে গেছে। মানুষ গ্রামে বসবাস করতে নারাজ ; তারা চায় মনুষ্যসৃষ্ট শহরেই বসবাস করতে। সারা বিশ্বে এ ধারা আজ স্পষ্ট। অ্যান্থনি গিডেনসের 'সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে সেজন্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে, "১৯৭৫ সালে পৃথিবীর ৩৯ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করতেন—২০০০ সালে তা ৫৫ শতাংশ অতিক্রম করেছে ; এবং উন্নত দেশগুলিতে এ মাত্রা ৬০ থেকে ৯০ শতাংশে পৌঁছে গেছে।" গ্রাম থেকে নগরে-শহরে পর্যবসিত হওয়ার প্রক্রিয়া তথা নগরায়ণ সর্বদেশে সক্রিয়। ভারতেও এ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান।

ভারতে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শিল্পোন্নত দেশগুলি অপেক্ষা স্বল্প। ১৯৫১ সালে ভারতের শহরগুলিতে মাত্র ১৯.৩ শতাংশ মানুষ বাস করতেন। ১৯৯১ সালে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.৭১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ভারতে সিংহভাগ জনগণ আজও গ্রামে বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে শহর-নগরে বসবাসকারীর সংখ্যা সর্বভারতীয় চিত্র থেকে সামান্য উন্নত। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এর হার ২৭.৫ শতাংশ। অবশ্য স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড এক পরিসংখ্যানে জানিয়েছে যে, ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করবেন। আর এই প্রেক্ষাপটে বাঁকুড়া জেলার নগরায়ণ প্রক্রিয়া আলোচিত হলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে বলে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন।

অরণ্যসমাবৃত বাঁকুড়া জেলা একদা জঙ্গল মহল নামে পরিচিত ছিল। এখানকার আদিম মানুষেরা ছিলেন আদি-অস্ট্রেলীয়দের গোষ্ঠীভুক্ত। শাস্ত্রে এঁদের নিষাদ বলে অভিহিত করেছে। স্বাভাবিকভাবেই অরণ্যসমাবৃত বাঁকুড়ারও নগরায়ণ প্রক্রিয়া ছিল মন্থর এবং এ প্রভাব থেকে আমরা আজও বেরিয়ে আসতে পারিনি। ১৯৯১ সালের জনগণনায় যে পরিসংখ্যান মেলে তদনুসারে বাঁকুড়া জেলায় ২৮ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৩২ হাজার মানুষ শহরগুলিতে বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে গড়ে যেখানে ২৭.৫ শতাংশ মানুষ শহরবাসী সেখানে বাঁকুড়া জেলায় মাত্র ৮.৩১ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করেন। প্রায় একশো বছর আগে ১৯০১ সালে বাঁকুড়া জেলায় ৫ শতাংশ মানুষ শহরে থাকতেন। সুতরাং ১০০ বছরে প্রায় সাড়ে তিন শতাংশ বৃদ্ধি গড় বৃদ্ধির তুলনায় স্বল্প।

বাঁকুড়া জেলায় তিনটি শহর যথাক্রমে—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী শহর ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও প্রকৃত অর্থে শহর বলতে ওই তিনটি শহরকেই বোঝায়। তবে জনগণনা অনুসারে পৌরসভাহীন শহর হিসাবে ১৯২১ সালে পাত্রসায়ের, ১৯৪১ সালে খাতড়া চিহ্নিত হয়। ১৯৯১ সালের জনগণনায় বড়জোড়া ও বেলিয়াতোড় পৌরসভাহীন শহরে (Census Town) পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য নিবন্ধে আমরা বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী পৌরসভার মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে বাঁকুড়া জেলার নগরায়ণ প্রক্রিয়ার একটা রূপরেখা মিলতে পারে।

বাঁকুড়া পৌরসভা : বাঁকুড়া জেলার সদর দপ্তর ও প্রধান শহর হিসাবে বাঁকুড়া শহর ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক স্থান অনুসারে কলকাতা, হাওড়া, দার্জিলিং, চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, তমলুক, মেদিনীপুর ও বর্ধমান শহরের পর বাঁকুড়া শহর পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে স্থান পায়। বস্তুত বারাসাত, বরাহনগর, ভদ্রেশ্বর, ইংলিশবাজার, নবদ্বীপ, ঘাটাল, কালনা, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ শহরের সঙ্গে একই বছর বাঁকুড়া শহর পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে।

বাঁকুড়া শহরের উত্তরে গন্ধেশ্বরী নদী ও দক্ষিণে ধলকিশোর নদী প্রবাহিত যা বর্তমানে দ্বারকেশ্বর নদ নামে খ্যাত। ১৯০১ সালে বাঁকুড়া শহরের আয়তন ছিল মাত্র ৫.৯৬ বর্গমাইল। এই পৌরসভাকে সমৃদ্ধ করতে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ যথা—রামপুর, নতুন চার্চ, কেদুয়াডিহি, লোকপুর, রাজগ্রাম, কানচার্চা, পাটপুর, গোপীনাথপুর, লডিহা, মুরা, কেঠেরডাঙা ও দেসুবারি-গোপীনাথপুরের সংযুক্তি ঘটে বলে ও'ম্যালি তাঁর গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন। ১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা যায় আয়তন সামান্য স্ফীত হয়ে ৭ বর্গমাইল তথা ১৮.১৩ বর্গকিলোমিটার পরিধিতে বিস্তৃতি হয়েছে। এবং সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাঁকুড়া শহরের আয়তন হল ১৯.০৫ বর্গকিলোমিটার।

১৯০১ সালে বাঁকুড়া শহরের জনসংখ্যা ছিল ২০,৭৩৭ জন। তন্মধ্যে জনবিন্যাসগত অবস্থান ছিল ১৯,৫৫৩ জন হিন্দু, ৯৩৩ জন মুসলমান এবং ১৫৮ জন খ্রিস্টান। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই শহরের মোট জনসংখ্যা হল ১,১৪,৮৭৬ জন। কিভাবে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার পরিসংখ্যান সারণি-১-এ দেওয়া হল :

সারণি-১
বাঁকুড়া পৌরসভার জনসংখ্যা

জনগণনার বছর	জনসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৯০১	২০,৭৩৭	
১৯১১	২৩,৪৫৩	+ ১৩.১০
১৯২১	২৫,৪১২	+ ৮.৩৫
১৯৩১	৩১,৭০৩	+ ২৪.৭৬
১৯৪১	৪৬,৬১৭	+ ৪৭.০৪
১৯৫১	৪৯,৩৬৯	+ ৫.৯০
১৯৬১	৬২,৮৩৩	+ ২৭.২৭
১৯৭১	৭৯,১২৯	+ ২৫.৯৪
১৯৮১	৯৪,৯১০	+ ২০.২৫
১৯৯১	১,১৪,৮৭৬	+ ২১.০৫

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ণের গতি অপেক্ষা বাঁকুড়া জেলায় তথা বাঁকুড়া শহরে নগরায়ণের গতি মন্থর।

১৮৬৯ সালে বাঁকুড়া পৌরসভা প্রতিষ্ঠাকালে যে পৌরসংস্থা গড়ে ওঠে তাতে ১২ জন কমিশনার ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৮ জন নির্বাচিত, ১ জন মনোনীত ও ৩ জন পদাধিকারী ছিলেন। বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম ভারতীয় পৌরপ্রধান (মনোনীত) ছিলেন হরিহব মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ওই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীনোত্তরকালে বাঁকুড়া পৌরসভার স্বায়ত্ত শাসন আরও প্রসারিত হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে এ শহরে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল ৬টি বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩টিতে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাঁকুড়া পৌরসভা শুধু স্বয়ম্ভর ছিল না বরং এর প্রতি বছর বাজেটে উদ্বৃত্ত ঘটত। ১৯০১-১৯০২ আর্থিক

বছরে বাঁকুড়া পৌরসভার আয় ছিল ১৩,০০০ টাকা ও ব্যয় ছিল ১২,০০০ টাকা ; বা ১৯০৬-১৯০৭ আর্থিক বছরে সর্বসাকুল্যে আয় ছিল ২২,০০০ টাকা এবং ব্যয় ছিল ২০,৫০০ টাকা। ১৯৫১ সাল থেকে চিত্রটা বদলে গেছে। নিম্নোক্ত সারণি-২-এ এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বোঝা যায় :

সারণি-২

বাঁকুড়া পৌরসভার আয়-ব্যয়
এক দশকের প্রেক্ষাপট
(১৯৪১-১৯৪২—১৯৫০-১৯৫১)

আর্থিক বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্বৃত্ত (টাকা)
১৯৪১-৪২	১,০১,৭৫৮	৯৩,৯৭০	+ ৭৭৮৮
১৯৪২-৪৩	১,০৩,৫১৩	৯৫,২৪৮	+ ৮২৬৫
১৯৪৩-৪৪	১,২২,০৬১	১,১৩,৫৬৯	+ ৮৪৯২
১৯৪৪-৪৫	১,৫০,৯০৩	১,৩১,৭৬১	+ ১৯,১৪২
১৯৪৫-৪৬	১,৯৬,৩১৯	১,৫২,৮৪৯	+ ৪৩,৪৭০
১৯৪৬-৪৭	২,১৩,৫১১	১,৮২,৫৩০	+ ৩০,৯৮১
১৯৪৭-৪৮	২,২৭,৮৩৪	১,৯৬,৩০২	+ ৩১,৫৩২
১৯৪৮-৪৯	২,৪৮,০৮৯	২,২০,৮৮৭	+ ২৭,২০২
১৯৪৯-৫০	২,২৭,৩০৯	২,২২,৫১১	+ ৪,৭৯৮
১৯৫০-৫১	২,৬৬,৯৬৫	২,৬৭,৮৪০	৮৭৫

বাঁকুড়া পৌরসভার আয়ের সিংহভাগ আসত ব্যক্তিমানুষের (Tax on person) থেকে। প্রতিটি মানুষকে তার সম্পদের ১; শতাংশ কর হিসাবে দিতে হত। এছাড়া পণ্য কর, যানবাহন কর, স্বাস্থ্য কর ও পৌরসভার থেকে সংগৃহীত অর্থ ছিল আয়ের অন্যতম উৎস। বর্তমান সরকার কর্তৃক নানা সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও বাঁকুড়া পৌরসভার ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে, ঐতিহাসিকভাবে বাঁকুড়া পৌরসভার বিকাশে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিশেষত ওয়েসলিয়ান (Weslyan) মিশনের কথা স্মরণ করতে হয়। তবে একথাও সমান সত্য যে বাঁকুড়া পৌরসভাকে সমৃদ্ধ করতে গণ-উদ্যোগ কম ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাঁকুড়ায় একটি পৌরবাজার গড়ে তুলতে অযোধ্যার রায় গদাধর ব্যানার্জির সাহায্য ছাড়া জনগণও চাঁদা দিয়ে সহায়তা করেছিলেন।

বিষ্ণুপুর পৌরসভা : বাঁকুড়া অপেক্ষা মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর অধিক সমৃদ্ধ ও পরিচিত হলেও পৌরসভা হিসাবে তার স্বীকৃতি মেলে বাঁকুড়া পৌরসভার পরে, ১৮৭৩ সালে।

বিষ্ণুপুর শহরের উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। ১৯০১ সালের জনগণনা অনুসারে এই শহর ৮ বর্গমাইল বিস্তৃত বলে উল্লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ শহর ২ বর্গমাইলের অধিক ছিল না। বর্তমানে আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে এ শহরের আয়তন বাঁকুড়া পৌরসভার থেকে অধিক তথা ২২.০১ বর্গ কিলোমিটার।
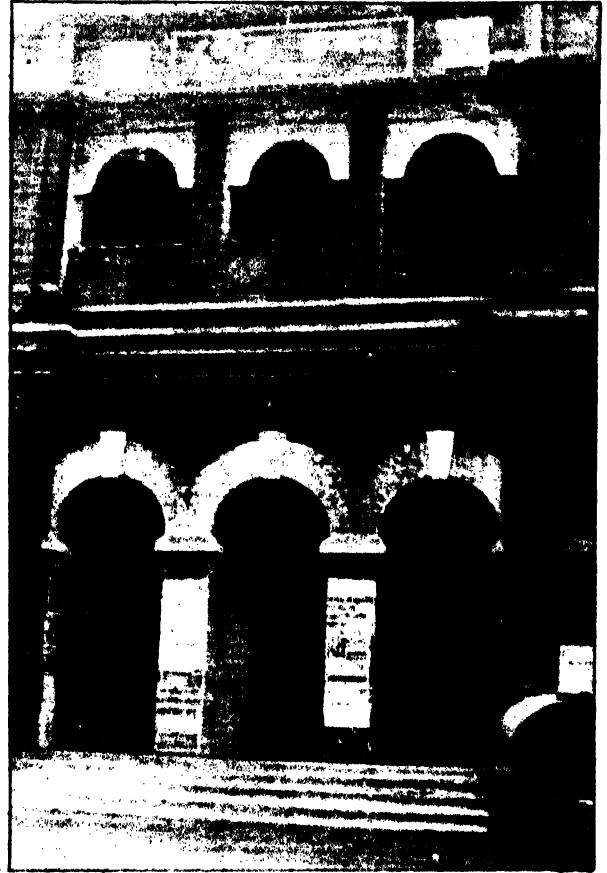
বাঁকুড়া পুরসভা ভবন

১৯০১ সালে বিষ্ণুপুর পৌরসভার জনসংখ্যা বাঁকুড়া পৌরসভার প্রায় সমান ছিল। পরবর্তীতে জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু বাঁকুড়ার তুলনায় তা যথেষ্ট কম। সারণি-৩-এ বিষ্ণুপুর পৌরসভার জনসংখ্যা উল্লেখিত হল।

সারণি-৩

বিষ্ণুপুর পৌরসভার জনসংখ্যা

জনগণনার বছর	জনসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৯০১	১৯,০৯০	
১৯১১	২০,৪৭৮	+ ৭.২৭
১৯২১	১৯,৩৯৮	৫.২৭
১৯৩১	১৯,৩ ৬	+ ১.৫৪
১৯৪১	২৪,৯৬১	+ ২৬.৭৩
১৯৫১	২৩,৯৮১	৩.৯৩
১৯৬১	৩০,৯৫৮	+ ২৯.০৯
১৯৭১	৩৮,১৩৫	+ ২৩.১৮
১৯৮১	৪৭,৪৮২	+ ২৩.৬৮
১৯৯১	৫৬,১২৮	+ ১৯.১৫

বিষ্ণুপুর পৌরসভায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেনি বললেই চলে ; তবে ছয়ের দশক থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ বেশ উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিক বিচারে অবশ্য এ হার নগরায়ণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর লক্ষণ নয়।

১৮৭৩ সালে বিষ্ণুপুরে পৌরসভার দায়িত্বে ছিলেন ১২ জন কমিশনার। এঁদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন নির্বাচিত ও ৪ জন ছিলেন মনোনীত। বিষ্ণুপুর পৌরসভার প্রথম পৌরপ্রধান ছিলেন এম আর ওয়াকার (Walkar)। বর্তমানে বিষ্ণুপুর পৌরসভায় স্বায়ত্তশাসনকে প্রসারিত করতে কমিশনারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ; বর্তমানে এই সংখ্যা ১৯ জন।

বিষ্ণুপুর পৌরসভার গড়পড়তা বার্ষিক আয় (১৯০১-০৫) ছিল ১০,০০০ টাকা এবং ব্যয় ছিল ৯০০০ টাকা। সুতরাং আয়-ব্যয়ের শুরুতে ভারসাম্য ছিল বললে ভুল হবে, বরং বলা যায় এ সময়ে পৌরসভার হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত। আর এই অর্থের অধিকাংশটাই আসত পৌরসভার অধিবাসীদের কাছ থেকে। প্রতিটি করদাতা তার আয়ের ১½ শতাংশ কর হিসাবে পৌরসভাকে জমা দিতেন। পণ্য কর ও পরিবহন কর ছিল পৌরসভার আয়ের অন্যতম উৎস। এখানে দীর্ঘদিন আয়-ব্যয়ের সমতা বজায় ছিল। সারণি-৪-এ তার নিদর্শ তুলে ধরা হল :

সারণি-৪

বিষ্ণুপুর পৌরসভার আয় ও ব্যয়

আর্থিক বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্বৃত্ত (টাকা)
১৯৪১-৪২	২৮,৮১৭	২৮,৬৪৫	+ ১৭২
১৯৪২-৪৩	২৩,৯৪৩	২৩,৭৪৩	+ ২০০
১৯৪৩-৪৪	২৬,৭৮৪	২৬,৪৭২	+ ৩১২
১৯৪৪-৪৫	২৮,৮২০	২৮,২০৯	+ ৬১১
১৯৪৫-৪৬	৩২,৩৪৫	৩১,৭৭১	+ ৫৭৪
১৯৪৬-৪৭	৩৫,৮৭৬	৩৫,০৩৫	+ ৮৪১
১৯৪৭-৪৮	৭৬,৩১৭	৬৮,৮৩১	+ ৭,৪৮৬
১৯৪৮-৪৯	৮১,৮৭৫	৭২,৮৪৬	+ ৯০২৯
১৯৪৯-৫০	৭৭,০৫৩	৮৩,৩৫০	- ৬২৯৭
১৯৫০-৫১	৭২,৯২০	৬২,৫৯০	+ ১০,৩৩০

সাম্প্রতিক বিষ্ণুপুর পৌরসভা বাঁকুড়া পৌরসভা থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। মানুষকে আর আগের মতো আকর্ষণ করতে পারছে না।

সোনামুখী পৌরসভা : প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক এ আর দেশাই বলেন, 'ভারতে তিন ধরনের নগর ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যথা— রাজধানী নগর, ধর্মীয় নগর এবং শিল্প নগর।' সোনামুখী পৌরসভা শেষোক্ত ধারায় ১৮৮৬ সালে বিকশিত হয়। ও'ম্যালির রচনায় সেজন্য উল্লিখিত হয়েছে : "Formerly a large factory of the East India Company was established here (Sonamukhi), and number of weavers were employed in cotton spinning and cloth making.....The introduction of English piecegoods led to the withdrawal of the company from this trade, for local products were not able to compete with imported European articles. Formerly also the town contained an indigo factory....". বিংশ শতকের সূচনায় সোনামুখী পৌরসভায় রেশম শিল্প ও মৃৎশিল্পের যে খ্যাতি বাংলাদেশ অর্জন করে আজও তা অব্যাহত আছে।

সোনামুখী শহরের উত্তরে শালি নদী প্রবহমান। ১৮৮৬ সালে এই শহর আয়তনে প্রকৃত বিষ্ণুপুর পৌরসভা অপেক্ষা বড় ছিল। ৪ বর্গমাইল বিস্তৃত এই শহরে ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তবে এ পৌরসভার আয়তন গত ১১৫ বছরে বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুসারে এ পৌরসভার বিস্তৃতি ১১.৬৫ বর্গকিলোমিটার তথা ৪.৫ বর্গমাইল।

১৯০১ সালের জনগণনা অনুসারে সোনামুখী শহরে ১৩,৪৪৮ জন অধিবাসী ছিলেন। এদের মধ্যে ১৩,২৬১ জন হিন্দু, ১৮৫ জন মুসলমান এবং ২ জন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ বসবাস করতেন। এই শিল্পনগরী ধীরে ধীরে আকর্ষণ যে বাড়াতে পারেনি তার প্রতিফলন জনসংখ্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। সারণি-৫-এ বিগত ১০০ বছরের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি উল্লেখিত হল।

সারণি-৫

সোনামুখী পৌরসভার জনসংখ্যা

জনগণনার বছর	জনসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৯০১	১৩,৪৪৮	
১৯১১	১৩,২৭৫	- ১.২৯
১৯২১	১০,৬৪৪	- ১৯.৮২
১৯৩১	১০,৯৮৯	+ ৩.২৪
১৯৪১	১৪,৬৬৭	+ ৩৩.৪৭
১৯৫১	১২,৩৫২	- ১৫.৭৮
১৯৬১	১৫,০২৭	+ ২১.৬৬
১৯৭১	১৮,৯৭৪	+ ২৬.২৭
১৯৮১	১৯,৮৯৯	+ ৫.২৬
১৯৯১	২৪,৬৪০	+ ২৫.০০

সোনামুখী পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত মন্থর। প্রতি বছর ১ শতাংশও বৃদ্ধি পায়নি।

সোনামুখী পৌরসভার স্বায়ত্ত শাসন প্রকৃত অর্থেই বিলম্বিত হয়। ১৮৮৬ সাল থেকে দীর্ঘকালব্যাপী এই পৌরসভার ৯ জন কমিশনারই ছিলেন সরকার-মনোনীত সদস্য। ১৯৫১ সালে সোনামুখী পৌরসভা চতুর্থ শ্রেণীর শহরে উন্নীত হয়। ১৯৬১ সালে ১২ জন কমিশনার সোনামুখী পৌরসভার স্বায়ত্ত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এঁদের মধ্যে থেকে পৌরপ্রধান ও উপ-পৌরপ্রধান নির্বাচিত হতে থাকেন।

সোনামুখী পৌরসভার আয়-ব্যয়ে প্রথম থেকেই সমতা দেখা যায়। ১৯০১-০৫ পর্যন্ত গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ৫৮৪০ টাকা

এবং ব্যয় ছিল ৫৮২০ টাকা। এ ধারা দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব এ-কথাই প্রমাণ করে। সারণি-৬-এ এই হিসাব তুলে ধরা হল।

সারণি-৬

সোনামুখী পৌরসভার আয়-ব্যয়

আর্থিক বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্বৃত্ত (টাকা)
১৯৪১-৪২	৮১২২	৮০১০	+ ১২
১৯৪২-৪৩	৮৪৪৮	৮০৭৫	+ ৩৭৩
১৯৪৩-৪৪	৮৩২৮	৮০১৯	+ ৩০৯
১৯৪৪-৪৫	৯১২০	৮৫১৮	+ ৬০২
১৯৪৫-৪৬	১৬,৯৪৮	১১,৯৩৬	+ ৫০১২
১৯৪৬-৪৭	১৯,২১৭	১৩,৬২১	+ ৫৫৯৬
১৯৪৭-৪৮	২৩,৮০৪	২০,৪১২	+ ৩,৩৯২
১৯৪৮-৪৯	১৬,১৮৩	১৫,৮০২	+ ৩৮১
১৯৪৯-৫০	১৬,৫৭৮	১৪,৬৭৫	+ ১৯০৩
১৯৫০-৫১	১৭,৮১১	১৮,৫৯৪	+ ৭৮৩

ও'ম্যালির জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে যে সোনামুখী পৌরসভার ১৯০১ সালে মোট জনগণের ১২.৪ শতাংশ মানুষ তথা ১৬৬৮ জন করদাতা ছিলেন। তাঁরাই ছিলেন সোনামুখী পৌরসভায় আয়ের প্রধান উৎস। প্রতিটি করদাতার করের পরিমাণ ছিল ৫ আনা থেকে ৯ আনা (৩১ পয়সা থেকে ৫৬ পয়সা) মাত্র। ১৯০৬ সালে সোনামুখী পৌরসভার মোট ব্যয় ছিল ৬০০০ টাকা। এ টাকার মধ্যে ২৩.৫ শতাংশ ময়লা অপসারণে, ১৩.৮ শতাংশ চিকিৎসা বাবদ ও ১২.২ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয় এবং প্রতিটি পৌরসভার ন্যায় সোনামুখী আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর ছিল।

প্রতিটি জেলার ন্যায় বাঁকুড়া জেলা পৌর উন্নয়ন সংস্থা (District Urban Development Agency) গড়ে উঠেছে। এই সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পৌরসভার সুসংহত উন্নয়ন (IDSMT), সুসংহত স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প (ILCS), পৌরবস্তির পরিবেশ উন্নয়ন (EIVS), স্বরোজগার স্বর্ণজয়ন্তী যোজনা (SYSJ) ও দরিদ্রের জন্য মৌল পৌর পরিষেবার (UBSP) মধ্য দিয়ে নগরায়ণের ধারাকে অব্যাহত রাখার নিরন্তর প্রয়াস চলছে।

সোনামুখী জেলার প্রথম খাটা-পায়খানাহীন শহরে উন্নীত হলেও গ্রামের মানুষকে টেনে আনার দুর্নিবার আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে জেলার অন্যান্য শহরের ন্যায় নগরায়ণ প্রক্রিয়া সোনামুখী পৌরসভায় পরিলক্ষিত হয় না।

তুলামূল্যের বিচারে একদা বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী পৌর এলাকা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ইতিহাস বলে, সিপাহী বিদ্রোহের আমলে এ সমস্ত এলাকা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশম শিল্পে অত্যন্ত উন্নত ছিল। পরে জেলা শহর হিসাবে বাঁকুড়া পৌরসভা বিকশিত হয়। তবে ব্রিটিশদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুর ও

রেশম শিল্পে সোনামুখি বিষ্ণুপুরের খ্যাতি সিপাহী বিদ্রোহের আমল থেকে
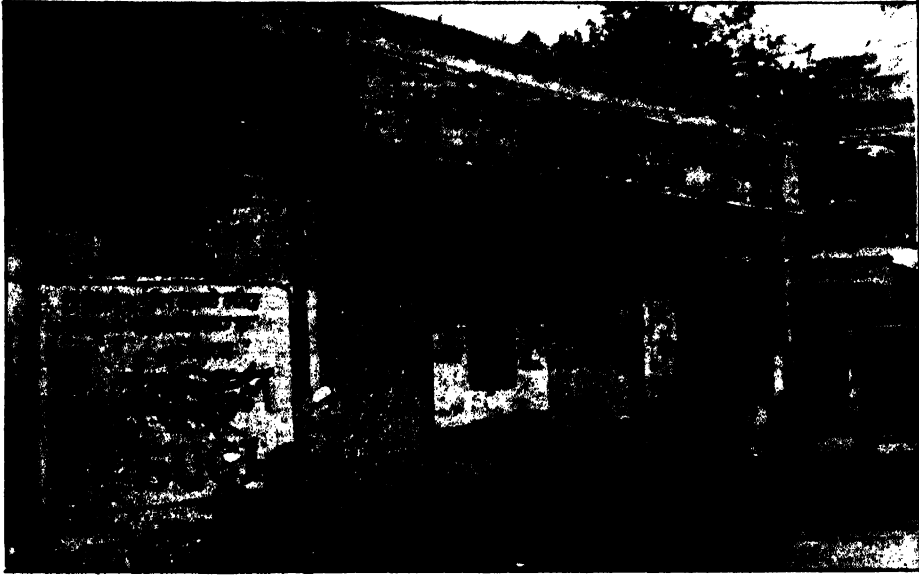
পৌরসভার হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় (১৯২৪) বহুদিন ধরে দরিদ্র সাধারণ মানুষকে সেবা করে আসছে

ছবি : চঞ্চল দাস

সোনামুখীর উন্নত কুটির শিল্প সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এই এলাকার মানুষেরা অন্য জীবিকা খুঁজে নেয়। তাই সর্বশেষ পরিসংখ্যানে (১৯৯১) যে চিত্র মেলে তাতে এই তিন পৌর এলাকায় মানুষের জীবিকায় কিছু সামঞ্জস্য থাকলেও পার্থক্য কিছু কম নয়। বাঁকুড়া পৌর এলাকায় সরকারি কর্মচারী, আধা-সরকারি ও বেসরকারি কর্মী (অধ্যাপক-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার), শিল্পী কারিগর (বিড়ি শ্রমিক), ব্যবসা-বাণিজ্য কর্মী ও দিনমজুরের প্রাধান্য মেলে। বিষ্ণুপুরে মূলত শিল্পী কারিগরদের প্রাধান্য আছে। তবে সরকারি ও বেসরকারি কর্মীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সোনামুখী পৌরসভা এলাকায় শিল্পী-কর্মীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান এবং মিশ্র জীবিকার মানুষের সংখ্যা কম নয়। সোনামুখী শহরে আজও যাঁরা বসবাস করেন তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে কৃষিজমিও আছে। ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সারণি-৭
বাঁকুড়া জেলায় পৌরকর্মী বিন্যাস

কর্মী ও প্রকৃতি	বাঁকুড়া		বিষ্ণুপুর		সোনামুখী	
	১৯৮১	১৯৯১	১৯৮১	১৯৯১	১৯৮১	১৯৯১
কৃষক	০.৩৭	০.২৫	১.০১	০.৮৫	১.৪৬	১.৯৪
কৃষিকর্মী	০.১৯	০.৬২	০.৮৫	১.৪৩	২.৬৮	৩.২০
কুটির শিল্পী ও অন্যান্য						
উৎপাদন কর্মী	২.৮৮	৫.৫৫	৪.৪০	৮.৭০	৩.৪৯	৭.৪২
অন্যান্য কর্মী	২২.৩৪	২১.২১	১৯.২১	১৮.২৭	১৭.২২	১৫.৪৬
মুখ্য কর্মী	২৬.২৮	২৭.৬৩	২৫.৪৭	২৯.২৫	২৫.৮৫	২৮.০২
আংশিক কর্মী	০.৬৮	০.৩১	০.৭৭	০.৫০	০.৮৮	০.৯৮
অকর্মী	৭৩.০৪	৭২.০৬	৭৩.৭৬	৭০.২৫	৭৩.২৭	৭১.০০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

বাঁকুড়া জেলার নগরায়ণের ধারা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা বাঁকুড়া জেলার নগরায়ণের ফলে জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে ; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিষেবামূলক কাজগুলি সমান তালে বৃদ্ধি পায়নি। পৌরসভাগুলির পূর্বে ব্যয় অপেক্ষা আয় ছিল অধিক এবং সে আয়ের উৎস ছিল শহরের করদাতারা স্বয়ং। পূর্বে রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, এমন কি জল নিয়ে রাস্তা ধুয়ে দেবার যে ব্যবস্থা ছিল তা আজ কষ্টকল্পিত। পৌরসভা সরকারের কাছ থেকে এখন ব্যাপক অনুদান পায় ; কিন্তু নিজেদের আয় ঠিকমতো বাড়াতে পারেনি। ফলে স্বায়ত্ত শাসনের যে মূল লক্ষ্য তা থেকে সরে আসতে পৌরসভাগুলি পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে। সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীলতা পৌরসভাগুলির সমৃদ্ধির পথে অন্তরায়। শহরগুলিতে বহু কাঁচা নর্দমা রয়েছে—বর্ষাকালে সেগুলি প্লাবিত হওয়ায় জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। রাস্তাগুলি সময়মতো মেরামত হয় না ; ফলে মেরামতকালে অধিক অর্থের আবশ্যকতা দেখা দেয়। আর পানীয় জলের কথা না বলাই ভাল। কারণ গ্রীষ্মকালে যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক গোলযোগ দেখা দিলে মানুষের মধ্যে পানীয় জলের হাহাকার দেখা দেয়।

তবে আশার আলো এই যে, প্রতিটি জেলার ন্যায় বাঁকুড়া জেলা পৌর উন্নয়ন সংস্থা (District Urban Development Agency) গড়ে উঠেছে। এই সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পৌরসভার সুসংহত উন্নয়ন (IDSMT), সুসংহত স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প (ILCS), পৌরবস্তির পরিবেশ উন্নয়ন (EIVS), স্বরোজগার স্বর্ণজয়ন্তী যোজনা (SYSJ) ও দরিদ্রের জন্য মৌল পৌর পরিষেবার (UBSP) মধ্য দিয়ে নগরায়ণের ধারাকে অব্যাহত রাখার নিরন্তর প্রয়াস চলছে। অদূরভবিষ্যতে পৌরসভাগুলি আরও প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার প্রত্যাশা আজ আর অমূলক নয়।

লেখক : *অধ্যাপক, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ*

বাঁকুড়া জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে

জ্ঞানশঙ্কর মিত্র

বিশেষ করে '৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে রূপান্তর ঘটে গেছে। অগ্রগতি ঘটেছে গ্রামীণ অর্থনীতির, বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে ৫ মেগাওয়াট থেকে ১২০ মেগাওয়াট। জেলাবাসীর স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ১½ কোটি থেকে ৭০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলাবেষ্টিত রাঢ় অঞ্চলের মল্লভূম জঙ্গলমহল দক্ষিণবঙ্গের এই জেলা বাঁকুড়া। সুদূর অতীতে এই জেলা বর্ধমান, মেদিনীপুর, চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে আনুমানিক (১৭৬৫-৯৩) এই জেলা বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর বিষ্ণুপুর জমিদারি নামে অভিহিত হয়। স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩৫-৩৬ সালে। তখন জেলার প্রধান কার্যালয় ছিল বিষ্ণুপুর।

সাঁওতাল পরগনার মালভূমি অঞ্চল থেকে উদ্ভূত উচ্চ ঢালু বিস্তীর্ণ ভূমিবেষ্টিত এই জেলা। মল্লরাজ বাঁকুড়া রায়ের নাম অনুসারে এই জেলার নামকরণ বলে কথিত। দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, শিলাবতী, জয়পণ্ডা, শালী, মিড়াই নদনদীর কলতানে মুখরিত এবং নামী-অনামী বিভিন্ন খাল-নালাবেষ্টিত ও শাল, পলাশ, মহুয়া, পিয়াশাল, সেগুন প্রভৃতি জানা-অজানা ছোটবড় বনভূমি শস্যলিত এই জেলার আয়তন ৬৮৮৪ বর্গ কিমি, জনসংখ্যা প্রায় ২৯ লক্ষ, যার মধ্যে তফসিলি জাতি ৩৮% এবং উপজাতি ৭%, জনবসতির ঘনত্ব ৩৫৬ প্রতি বর্গ কিমিতে। খরাপ্রবণ, দারিদ্র্যপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি অনগ্রসর এবং পশ্চাৎপদ জেলা হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বস্তুজগতের অস্তিত্বের মতোই এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের শ্রমের মধ্য দিয়েই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের কর্মকাণ্ডে এই সমাজ ও তার সভ্যতা গড়ে উঠেছে, বিকশিত হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিক শ্রম নিয়োগ করে মানুষ যেমন প্রতিনিয়ত প্রকৃতি ও জীবজগতের উপর প্রভুত্বের অধিকারে সদর্পে এগিয়ে চলেছে তেমনই নিজের সৃষ্ট সমাজ ও সভ্যতাকে তিলে তিলে বদলে দিয়ে নূতনতর মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। অথচ এই বিশাল বিপুল কর্মযজ্ঞের কারিগর শ্রমদানকারী মানুষের নিজের জীবনে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বাঁচার মতো প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিও নাগালের বাইরে থাকছে, উৎপাদন ব্যবস্থায় গুটিকয়েক পরশ্রমজীবী মানুষের দখল ও নিয়ন্ত্রণের ফলে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই হচ্ছে অমোঘ নিয়ম—ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফার স্বার্থরক্ষা করাই সমগ্র সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। এর বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে মানুষের সমাজ এই সভ্যতাকে প্রতিদিন গড়ে তুলছে সেই শ্রেণী মানুষেরই একমাত্র অধিকার এই সভ্যতার উপর। এখানে ব্যক্তিলোভ ব্যক্তিমালিকানা নয়, নয় ব্যক্তিস্বার্থ, সামাজিক স্বার্থে সমষ্টির ক্রিয়াসমষ্টির স্বার্থে সামাজিক ক্রিয়া। শ্রমদানকারী মানুষের অংশ হিসাবে আমরাও এই সমাজভাবনার শরিক। এই বোধকে সঙ্গী করেই এই ভাবনাকে বুকে নিয়েই আদর্শের লড়াই, আর দাবিকে নিয়েই বাঁচার লড়াই, আকাঙ্ক্ষিত জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতেই আদর্শগত সংগ্রাম। এই ধারাকে বহন করে চলেছে বাঁকুড়া। তাই তো ব্রেটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বাঁকুড়ার জনগণ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এক উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। ১৭৮৯ সালে যখন ফরাসি দেশে বিপ্লবের আগুন দেদীপ্যমান সেই সময় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এলাকায় চলছে কৃষক বিদ্রোহ যা পরবর্তী সময়ে সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এবং চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে নতুন

বাঁকুড়া জেলার দেশাত্মবোধক সংগীত প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করছেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি (প্রাক্তন)

মাত্রা যোগ করে রাজ্যের শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২৮ বছর পরেও জেলাবাসী দারিদ্র্য-পীড়িত অনাহারক্লিষ্ট। সমাজজীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু থেকেই বেশিরভাগ মানুষ বঞ্চিত এবং অবহেলিত। কিন্তু এই বঞ্চনা এবং অবহেলার বিরুদ্ধে জেলার সংগ্রামের ঐতিহাসিক ধারাকে বুকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মানুষের সঙ্গে ছোটবড় নানান সংগ্রামে সামিল হয়েছে জেলাবাসী এবং তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয় এবং এক বছরের মধ্যেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

সময়টা বাঁকুড়াবাসীর কাছে একটা যুগসন্ধিক্ষণ। যেন প্রভাতি সূর্যের রক্তিম ছটায় উদ্ভাসিত হল এই জেলা। এই প্রথম সকলেই চোখ মেলে দেখল নিজেকে, দেখল তার পাশের পরিবেশকে, হাতের কাছের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে নিরীক্ষণ করল। ঠিক করে নিল বাঁচার জন্য কী করতে হবে। নব নব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শুরু হল গ্রামোন্নয়নের কাজ, ভূমিসংস্কারের কাজ। মানুষের এই বিপুল উদ্যমের পাশে থাকল তাদেরই গড়া পঞ্চায়েত সরকার। জমিতে অধিকার কায়েম করল বর্গাদারেরা, পাট্টাদারেরা। ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৪১৯ জন বর্গাদার নথিভুক্ত হল, পাট্টা পেলেন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৭০ জন। মোট কৃষিযোগ্য জমির ৬০ ভাগের মালিক হলেন গ্রামের মাঝারি ও গরিব কৃষক। এতদিন যে মাটি বন্ধ্যা ছিল, সেই কুমারী মাটির বুক চিরে সোনার ফসল ঘরে তুললেন, জমিতে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেল। চালের উৎপাদন হল ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ঘাটতি জেলা খাদ্যে উদ্বৃত্ত জেলায় পরিণত হল। আলু উৎপাদনে সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে গেল। গমের উৎপাদন হল ৩০,০০০ মেট্রিক টন, বাদাম ৪৭৫ মেট্রিক টন, সরিষা ১৭১৮০ মেট্রিক টন, সেচসেবিত জমির পরিমাণ বাড়ল, একফসলী জমি দুফসলী জমিতে

পরিণত হল, সেচের জন্য তৈরি হল বড় বড় জোড়বাঁধ, মালবাঁধ, বড় বড় জলাশয় যেমন তারাপুর বিল, বিলমারি বাঁধ, বীরবাঁধ ক্যানেল, ধান্যখুরি কুলাই ক্যানেল, হরিণমুড়িজোড় ভালাইডিহা বাঁধ, কাঁটাশয় বাঁধ, সরোবাঁধ, কামার বাঁধ, সমুদ্র বাঁধ আরও অসংখ্য ছোটবড় জোড়বাঁধ ও খালবাঁধ। ১৮০টি নদী জলোত্তলন প্রকল্প, ৩২টি গভীর নলকূপ, ১২ হাজারেরও বেশি স্যালো টিউওয়েল সেচের কাজে সাহায্য করল। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ধানঝাড়াই কলের ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে, কৃষিতে বাঁকুড়া এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে জেলার উত্তর প্রান্তে ঘটেছে শিল্পের বিকাশ, তৈরি হয়েছে স্পিনিং মিল, প্যাকেজিং, হুইল অ্যান্ড অ্যাকসেল প্ল্যান্ট, ক্র্যামো, টাফ টিউব প্রভৃতি ছোটবড় কলকারখানা। শিল্প বিকাশের এখনও অনেকটাই সম্ভাবনা রয়েছে। জেলার কেন্দ্র থেকে প্রায় সমদূরত্বে রয়েছে দুটি বৃহৎ শিল্পনগরী, উত্তরে দুর্গাপুর, দক্ষিণ-পশ্চিমে জামশেদপুর। এই শিল্পনগরী থেকে উৎপাদিত সামগ্রী দিয়ে জেলায় নতুন নতুন শিক্ষা গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। চিরাচরিত শিল্পগুলির মধ্যে শ্রমনিবিড় বিড়ি শিল্প, তেলকল, চালকল এবং কিছু বেকারি শিল্প রয়েছে। হস্তশিল্পে জেলার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ছাপদারের কারুশিল্প, শুশুনিয়ার পাথরের কারুকার্য সমন্বিত মূর্তি ও গার্হস্থ্য সামগ্রী, পাঁচমুড়ার মাটির ঘোড়া, বিষ্ণুপুরের বালুচরি শাড়ি, বিকনার কোগরা, হাটগ্রামের শাঁখের কাজ, বিষ্ণুপুরের লণ্ঠন শিল্প ও বেলমালা উল্লেখযোগ্য। বাঁকুড়ার দক্ষিণাংশের অরণ্যভূমি ওখানের মূল প্রাকৃতিক সম্পদ। সারা জেলায় বনায়নের কর্মসূচি চলছে দ্রুতগতিতে। তৈরি হয়েছে ১,৪৮,১৭৯.৪৪ হেক্টর অরণ্যভূমি। বাঁকুড়ার রুক্ষ প্রান্তর আজ সবুজের আস্তরণে আচ্ছাদিত, পথিপার্শ্বের বৃক্ষরাজি দৃষ্টিনন্দন হয়েছে, আর এই দিগন্ত প্রসারিত অরণ্য সম্পদকে রক্ষা করার ভার নিয়েছেন জেলাবাসী নিজেরাই। তৈরি হয়েছে ১০০২টি বনরক্ষা কমিটি। প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের জীবিকার কিছুটা পূরণ হচ্ছে এই অরণ্যসম্পদ থেকেই। মৎস্য ও প্রাণী-পালনের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি যদিও আমাদের জেলায় গবাদি প্রাণীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থানেই রয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত দুগ্ধের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, এ জন্য প্রয়োজন সংকরায়নের। কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে এর সুফল পাওয়া যাবে। ডিমপোনা উৎপাদনে জেলার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এই কাজে জেলায় প্রতি বছরে কয়েক লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি হয়। লাক্ষা চাষে জেলার ১৭ হাজার পরিবার নিযুক্ত রয়েছেন এবং প্রতি বছর ২০০ মেট্রিক টন স্টিক ল্যাক তৈরি হয়। জেলার ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, ইন্দপুর, খাতড়া-১, খাতড়া-২, রানিবাঁধ, রাইপুর এবং বাঁকুড়া ২ নং-এর মধ্যেই লাক্ষা উৎপাদনের কাজ সীমাবদ্ধ। জেলায় হস্তচালিত তাঁত রয়েছে ২২ হাজার, ১ লক্ষ ১০ হাজার মানুষ এই শিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন। বাঁকুড়ার গামছা, বেডকভার ও লুঙ্গি জেলার বাইরে সমাদৃত হচ্ছে। বালুচরি শিল্প ও হস্তশিল্প সারা ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পেরেছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাঁকুড়া পিছিয়ে নেই। দক্ষিণ বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম বনগোপালপুরে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ৭৮টি পরিবারকে বিদ্যুৎ জোগানোর এক যুগান্তকারী অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই জেলা। আরও ৭০টি পরিবারকে সৌরশক্তিচালিত বিদ্যুৎ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে বড়জোড়া ব্লকের স্বর্গবাতি গ্রামে এবং রানিবাঁধ ব্লকের সাতাড়া গ্রামে এই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগিয়ে এসেছে বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট। বাঁকুড়া উন্নয়নীর প্রচেষ্টায় বাঁকুড়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কলেজ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি নবতম সংযোজন। অচিরাচরিত শক্তি ও গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণে ও রক্ষণাবেক্ষণে বাঁকুড়া জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমাদের জেলা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। পরেশনাথ, বিহারীনাথ, শুশুনিয়া, মশক পাহাড়, গোড়াবাড়ি, রানিবাঁধ, ঝিলিমিলি, মুকুটমণিপুর সংলগ্ন গহন বনরাজি, ছোট ছোট পাহাড় ডুরিং ও কংসাবতী জলাধারের বুকচিরে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের মোহাবিষ্ট করে, বারবার আকর্ষণ করে শাল, পলাশ, মহুয়া, পিয়াশালঘেরা রাঙামাটির জেলা বাঁকুড়া। নিবিড় অরণ্য, ছোট ছোট টিলা, ডুংরি, জোড়, নানা শোভিত লাল কাঁকুরে মাটির জেলা বাঁকুড়ায় মানুষের কণ্ঠ-উৎসারিত ঝুমুর গান, টুসু গান, লোকগীতি, কাঠিনাচ, দেহাতি সংগীতের সঙ্গে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম-গ্রামান্তর, বন ও প্রান্তর থেকে রাত্রিতে যখন ধামসা মাদলের গুরুগম্ভীর শব্দলহরীর সঙ্গে তাল রেখে আদিবাসী পুরুষ ও নারীদের বৃন্দগান নৃত্যের শব্দতরঙ্গ বাতাসে ভেসে আসে অথবা মেঠো পথ দিয়ে সন্ধ্যায় যখন গো-শকটের ঘর্ঘর একঘেয়েমি শব্দের সাথে ঘরে ফেরা রাখালিয়া বাঁশির উদাস করা সুর মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত তখন যেন রক্তে লাগে দোলা—বর্ণবৈচিত্র্যের সমারোহে সম্মোহনী সুরে বাঁকুড়ার মাটি যেন পর্যটকদের বারবার ডাকে।

সাহিত্য সংস্কৃতির আঙিনায় বাঁকুড়ার গৌরবদীপ্ত প্রেক্ষাভূমি আজও জেলার কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনে উৎসাহের সঞ্চার

জমিতে অধিকার কায়েম করল বর্গাদারেরা, পাট্টাদারেরা। ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৪১৯ জন বর্গাদার নথিভুক্ত হল, পাট্টা পেলেন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৭০ জন। মোট কৃষিযোগ্য জমির ৬০ ভাগের মালিক হলেন গ্রামের মাঝারি ও গরিব কৃষক। এতদিন যে মাটি বন্ধ্যা ছিল, সেই কুমারী মাটির বুক চিরে সোনার ফসল ঘরে তুললেন, জমিতে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেল। চালের উৎপাদন হল ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ঘাটতি জেলা খাদ্যে উদ্বৃত্ত জেলায় পরিণত হল। আলু উৎপাদনে সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে গেল।

খাতড়া পূর্ণাঙ্গ মহকুমার উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন বাঁকুড়া জেলাশাসক। মঞ্চে উপবিষ্ট প্রয়াত মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী

করে। এই জেলায় জন্মেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী যামিনী রায়, রামকিঙ্কর বেইজ, বিদ্যুৎবল্লভ, বসন্তরঞ্জন রায়, সংগীতশিল্পী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞান গোস্বামী, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দার্শনিক যোগেশ বিদ্যানিধি, শিশুসাহিত্যিক বিমল ঘোষ, শূন্যপুরাণ প্রণেতা রামাই পণ্ডিত। আধুনিক সময়ের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু, অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস প্রমুখ। আমাদের জেলার মর্যাদাকে ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর দরবারে নিয়ে গেছেন বিশ্বজননী সারদামনি। বাঁকুড়ার মাটিতে, জলে, অরণ্যে, জনপদে ছড়িয়ে আছে অতীত ঐতিহ্যের অনেক গৌরবান্বিত স্মৃতিবিজড়িত লোকগাথা।

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও স্থাপত্য শিল্পে এই জেলা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের মন্দিরে মন্দিরে মধ্যযুগীয় টেরাকোটা শিল্পের রত্নসম্ভার ছড়িয়ে আছে শ্যাম রায়ের পাঁচচূড়ার মন্দির, মদনমোহন মন্দির, রাসমঞ্চ। রাসমঞ্চের শিল্পকীর্তি বাংলা, মিশরীয় ও মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের অনবদ্য মিশ্রণ ঘটেছে। এছাড়া রয়েছে মল্লরাজাদের পুরাকীর্তি। বহু স্মৃতিবিজড়িত বিরাট বিরাট পরিখা বা জলাধার লালবাঁধ, পোকা বাঁধ ও যমুনা বাঁধ নামে যা খ্যাত, রয়েছে দলমাদল কামান, রয়েছে বহুলাড়ার মন্দির, সোমাতাপলের মন্দির, এ সবই বাঁকুড়াবাসীকে জীবনসংগ্রামে উৎসাহিত করছে। তাই ২০ বছর পূর্বেও যে জেলা খাদ্যে ঘাটতি জেলা ছিল '৭৭-এর পরবর্তীকালে বামফ্রন্টের আমলে শস্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত এই জেলা। বিশেষ করে '৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণ ও ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে রূপান্তর ঘটে গেছে। অগ্রগতি ঘটেছে গ্রামীণ অর্থনীতির, বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে ৫ মেগাওয়াট থেকে ১২০ মেগাওয়াট। জেলাবাসীর স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ১½ কোটি থেকে ৭০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবর্তন ঘটেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যেরও। তাই গ্রামবাংলার শ্রেণীশত্রুরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আসরে নেমে সমস্ত রকম ঘৃণ্য চক্রান্তের জাল বুনছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস প্রত্যয়সিদ্ধ মানসিকতায় উপরিকাঠামোর উপাদানগুলিকে সন্নিবিষ্ট ও সুরক্ষা করার মহান লক্ষ্যে বহমান গণ-আন্দোলনের শরিক হিসাবে একদিকে যেমন নিজেদের চেতনাকে নিরন্তর শাণিত ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালাবেন এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক, সাংগঠনিক প্রশাসনিক দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে এবং প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় অবিরাম একে প্রায়োগিক পরিসরে প্রতিহত করবেন, অপরদিকে অপেক্ষমান সর্ববৃহৎ অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সর্বাত্মক ঐকান্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে পুনর্বার সংহত শক্তিতে পরিণত করে গণ-আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করবেন।

বাঁকুড়া জেলাবাসীর মনে অনেক আশা ও প্রত্যাশা এবং তাকে কাজে রূপায়িত করার ও অজানাকে জানার জন্য অকৃত্রিম প্রচেষ্টা অবিরত বিদ্যমান।

লেখক : প্রাক্তন সভাধিপতি, বাঁকুড়া জিলা পরিষদ। প্রাক্তন শিক্ষক, বেলিয়াতোড় উচ্চ বিদ্যালয়। বর্তমানে সভাপতি, বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ।

বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির রূপান্তর

তারাপদ ধর

আশির দশকের শেষভাগেও এই জেলাকে 'শিল্পহীন জেলা' রূপে অনেকে বর্ণনা করতেন। 'শিল্পহীন' বলতে তাঁরা বোঝাতেন জেলার অভ্যন্তরে কোনও মাঝারি বা বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগ গড়ে না ওঠার ব্যাপারটিকে। উল্লেখযোগ্য, নব্বুইয়ের দশকে বাঁকুড়া জেলায় মেজিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র সমেত বেশ কয়েকটি নতুন মাঝারি শিল্প স্থাপিত হওয়ার ফলে বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে এই জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে।

ব্রিটিশ আমলে সারা ভারতের মতো বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির মূল চরিত্র ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক। ডব্লু ডব্লু রস্টোকে অনুসরণ করে একে আমরা 'চিরাচরিত সমাজ' আখ্যা দিলেও সাংঘাতিক কিছু ভুল হবে না। আর্থ-সামাজিক অনুন্নতি ছিল এই অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলাতেও খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। উনিশ শতকের শেষ পঁয়ত্রিশ বছরের ভেতরে বাঁকুড়া জেলায় ১৮৬৬ সালে মারাত্মক দুর্ভিক্ষের পর ১৮৭৪ সালে দেখা দিয়েছিল সাধারণ দুর্ভিক্ষ। এরপর ১৮৮৫ সালে খাদ্যাভাব ও ১৮৯৭ সালে আবার মারাত্মক দুর্ভিক্ষ। ১৮৯৭ সালের এই দুর্ভিক্ষে জেলার শতকরা ৪০ ভাগ লোক আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে সরকারি উদাসীনতা ছিল ভয়ংকর। বাঁকুড়া জেলার প্রসঙ্গে O Mally লিখেছেন যে, ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে যখন প্রতিদিন গড়পড়তা ৩৫ জন লোক মারা যাচ্ছিল, তখন ব্যবস্থা নেওয়া হলেও অর্থাভাবে রিলিফের কাজ বন্ধ করতে হয়েছিল। বস্তুত, ওই সময়ে বাঁকুড়া জেলার মুখ্য পরিচয় ছিল কুষ্ঠ ও খরাপীড়িত জেলা হিসাবে। সেচের অভাব যে বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ, একথা মেনে নিয়েও ভারতীয় সেচ কমিশন কিন্তু এই জেলায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য কোনও বিশেষ সেচপ্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করেনি। সমস্ত জেলায় শুধু সরকারি পুকুরের সাহায্যে ২ লক্ষ একর জমি সেচ পায়, এই তথ্যটুকু জেনে ও জানিয়েই তার কর্তব্য শেষ করেছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার আগে অস্বাভাবিক বছরগুলিকে বাদ দিলে সাধারণভাবে বাঁকুড়া জেলার বেশির ভাগ মানুষজন সেকালে সহজ ও সরল জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সীমিত উপকরণগুলি পাওয়ার অধিকারী ছিল। ওই সময় বাঁকুড়া জেলায় একজন শ্রমিক দৈনিক মজুরি পেত ২ আনা এবং তার ব্যবহারযোগ্য চালের দাম ছিল প্রতি সের ২ পয়সা। অন্যদিকে ১৮৭১-৭২ সালে জেলায় কাজের অভাব ছিল না বললেই চলে। সব মিলিয়ে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, ব্রিটিশ আমলে স্বাভাবিক বছরগুলিতে বাঁকুড়া জেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান ও আয় প্রভৃতি গড়পড়তা একজন যে কোনও ভারতীয়ের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। বর্তমান নিবন্ধ লেখক তাঁর 'বাঁকুড়া জেলার আর্থিক ইতিহাস' নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ১৮৭২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ১০০ বছরে বাঁকুড়ার প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল বার্ষিক ০.২৫ শতাংশ হারে। ১৮৭২ সালে সেটি ১৯৬০-৬১ সালের দামস্তরে ছিল ১৮০ টাকা এবং ১৯৭০-৭১ সালে হয়েছিল ২২৪ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা গেছে যে, ১৯৭০-৭১ সালে বাঁকুড়া জেলার মাথাপিছু আয় সর্বভারতীয় গড় থেকে ৩৬ শতাংশ কম দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ বিগত ১০০ বছরে সর্বভারতীয় স্তরে যে হারে আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছিল বাঁকুড়া জেলার মতো প্রান্তিক জেলাগুলিতে তা থেকে কম হারে ঘটেছিল। মাথাপিছু আয়ের ৩৬ শতাংশ হ্রাস প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এর মধ্যে ২০ শতাংশ হ্রাস ঘটেছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী দুই দশকে ভারতের উন্নয়ন

শ্রমের ফসল ঘরে তোলার আয়োজন

বামফ্রন্ট রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার সময় থেকেই এই জেলার অর্থব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে জেলায় মোট চাষযোগ্য এলাকার অনুপাত হিসাবে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ শতকরা একশো ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এখানে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ে তিন গুণের বেশি। অন্যদিকে, ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় পাঁচ গুণ এবং কর্মসংস্থান প্রায় সাত গুণ।

পরিকল্পনায় বাঁকুড়া তথা পশ্চিমবঙ্গকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে।

পঞ্চাশের দশকে বাঁকুড়া জেলায় পরিকল্পনা বলতে ছিল প্রধানত গণ-প্রকল্পগুলি। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পুরনো পুকুর ও বাঁধের সংস্কার সাধন এবং নতুন পুকুর ও বাঁধ তৈরি করে একই সঙ্গে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষজনের জন্য কর্মসংস্থান। পাশাপাশি রাস্তাঘাট তৈরির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এই সব প্রকল্পের রূপায়ণে ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল খুব বেশি। ফলে এদের মাধ্যমে যে ধরনের বাস্তব মূলধন সম্পদ গড়ে উঠবে বলে আশা করা হয়েছিল কার্যত তার ভগ্নাংশমাত্র সম্ভব হয়েছিল। অপরদিকে, বাঁকুড়া জেলায় ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন কৃষি উন্নয়নের যে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল তার প্রভাবও লক্ষণীয় মাত্রায় দেখা যায়নি। তবে পরবর্তীকালে অর্থাৎ ষাটের দশকে গৃহীত নিবিড় কৃষি প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলার মধ্যে বাঁকুড়াও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই সময়েই জেলার পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল যথাক্রমে দুটি বৃহৎ সেচ প্রকল্পের সুফল পেতে শুরু করে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও কংসাবতী সেচ প্রকল্প বাঁকুড়া জেলার কৃষি উন্নয়নে এখন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পাশাপাশি উন্নত কৃষি কৌশল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হলেও কিছু কিছু গৃহীত হয়। বলা যেতে পারে, এই কালপর্বেই বাঁকুড়া জেলার আর্থিক উন্নয়নে রস্টো কথিত উত্তোলনপর্বের প্রাক্‌-শর্তগুলি কিছু কিছু পূরণ হতে থাকে। ষাট দশকের শুরুতে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলে তার সংযোগ-প্রভাব বাঁকুড়া জেলার সন্নিহিত এলাকাগুলিতে জোরালোভাবে এসে পড়ে। এই সব অঞ্চলের জীবিকা কাঠামো বদলায় ও আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ষাট ও সত্তর দশকে পরিকাঠামো ও ব্যবসা-বাণিজ্য মিলিয়ে সেবাক্ষেত্রের সমৃদ্ধি ঘটে।

বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর পূর্বাঞ্চল চিরকালই পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ ছিল। ষাটের দশকে কংসাবতী সেচ প্রকল্প রূপায়িত হওয়ার ফলে দক্ষিণাঞ্চলও ওই সমৃদ্ধির অংশীদার হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭১-৭২ সালে বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে মানুষজনের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১৩৬ টাকা অর্থাৎ মাসে ১১ টাকা ৩৩ পয়সা। এ থেকে বোঝা যায় যে, জেলার সাধারণ মানুষের বেশিরভাগ তখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত।

সত্তরের দশকে বাঁকুড়া জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বার্ষিক ১.৭% হারে। পাশাপাশি তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে বার্ষিক ১.৫% হারে। অন্য একটি হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৯৫২ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ১৯৭৭ সালে বর্ধমান জেলায় যেখানে রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা সংখ্যার সূচক হয় ৪৫৮, বাঁকুড়ায় সেখানে সেটি দাঁড়ায় মাত্র ১৭০ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২২৩। এর অর্থ হল, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের হার ছিল তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু এর পরবর্তীকালে, অর্থাৎ বামফ্রন্ট রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার সময় থেকেই এই জেলার অর্থব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে জেলায় মোট চাষযোগ্য এলাকার অনুপাত হিসাবে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ শতকরা একশো ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এখানে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ে তিন গুণের বেশি। অন্যদিকে, ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় পাঁচ গুণ এবং কর্মসংস্থান প্রায় সাত গুণ। সব মিলিয়ে এইভাবে বলা যেতে পারে যে, আশির দশকের প্রথম ভাগেই বাঁকুড়া জেলার কৃষি অর্থনীতিতে রস্টো কথিত উল্লম্ফন বা উত্তোলন পর্বের

জীবিকার সন্ধানে
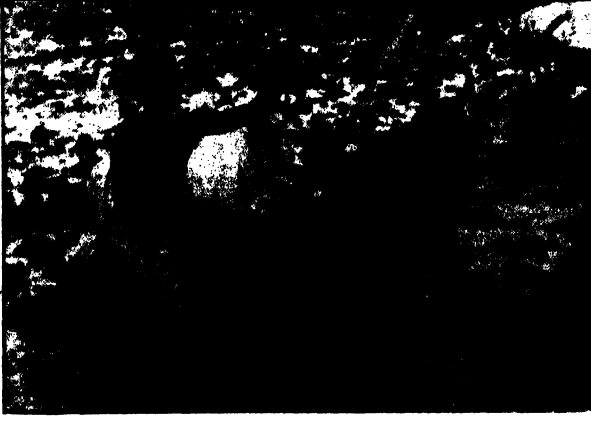
কৃষকের লাঙলে গরুই প্রধান অবলম্বন

(Take-off) মতো একটি দ্রুত উন্নতির পর্যায়ের সূচনা হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করে নিতে হয় যে, ওই সময় অবধি জেলার শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেনি। বস্তুত, আশির দশকের শেষ ভাগেও এই জেলাকে 'শিল্পহীন জেলা' রূপে অনেকে বর্ণনা করতেন। 'শিল্পহীন' বলতে তাঁরা বোঝাতেন জেলার অভ্যন্তরে কোনও মাঝারি বা বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগ গড়ে না ওঠার ব্যাপারটিকে। উল্লেখযোগ্য যে, নব্বইয়ের দশকে বাঁকুড়া জেলায় মেজিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র সমেত বেশ কয়েকটি নতুন মাঝারি শিল্প স্থাপিত হয়েছে। ফলে বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে এই জেলার অর্থনীতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ ইতিমধ্যে বাঁকুড়া জেলাকে আর্থিক উন্নয়নের মাপকাঠির বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের ভেতর একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত জেলা হিসাবে পরিচয় দিচ্ছেন।

নব্বইয়ের দশকে বাঁকুড়া জেলায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির মতো কৃষি উৎপাদনে যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৮০-৮১ সালে এখানে মোট কৃষি উৎপাদনের সূচক ছিল ১১৫.১৪ (১৯৭১-৭২ = ১০০)। ১৯৯০-৯১ সালে সেটি হয়েছিল ১৯২.৭৬ এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে হয়েছে ২৩৯.১৭। এ থেকে বোঝা যায় যে, বামফ্রন্টের আমলে সারা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁকুড়ার মতো সাধারণ ধারণায় অনুন্নত জেলার কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। কুড়ি বছরেরও কম সময়ে জেলার কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি হওয়া, বলা যেতে পারে, বামফ্রন্টের ভূমিসংস্কার ও কৃষিনীতির সার্থকতার বিশেষ পরিচয়বাহী। অবশ্য ১৯৯৮-৯৯ বছরটিতে প্রাথমিক হিসাবে অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলার সঙ্গে বাঁকুড়া জেলারও কৃষি উৎপাদনে ব্যর্থতা দেখা গেছে। কিন্তু এই বছরটিকে অস্বাভাবিক বছর হিসাবে চিহ্নিত করলে আমরা দেখি, খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতায় বর্তমানে বাঁকুড়া জেলা কৃষি-উন্নত বর্ধমান জেলার প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে বর্ধমান জেলায় হেক্টরপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ১৭৮০ কেজি এবং বাঁকুড়া জেলায় ছিল ১৫২৮ কেজি। ১৯৯৭-৯৮ সালে বর্ধমান জেলায় ওই উৎপাদনশীলতা হয়েছে ২৯১৬ কেজি এবং বাঁকুড়া জেলায় ২৭০৪ কেজি।

কৃষি থেকে শিল্পক্ষেত্রের দিকে চোখ ফেরালে আমরা একইভাবে বাঁকুড়া জেলায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা লক্ষ করতে পারি। এই জেলায় ১৯৯১ সালে রেজিস্ট্রিকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৯৯ এবং সেখানে দৈনিক গড় কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ২১৭৬ জন। ১৯৯৮ সালে ওই সংখ্যা দুটি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩৩ ও ৩২৯৪ জন। তবে কারখানার সংখ্যা বিচারে বাঁকুড়া জেলার স্থান আজও অনেকখানি নিচে থেকে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই জেলার নিচে আছে কেবল মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর এবং পুরুলিয়া। কর্মসংস্থানের বিচারে আবার মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়া বাঁকুড়ার থেকে এগিয়ে আছে। উভয়ত, এগিয়ে আছে ২৪-পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, কলকাতা এবং এমন কি দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাও। প্রধানত কৃষিনির্ভর মেদিনীপুর জেলা যে শিল্পায়নের দৌড়ে বাঁকুড়া থেকে অনেকখানি, প্রায় অনতিক্রম্য ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে সেকথা বলাই বাহুল্য। রেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার সংখ্যা ও সেগুলিতে কর্মসংস্থানের নিক্তিতে এখনও বাঁকুড়া জেলা এমন কি মুর্শিদাবাদ থেকেও পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, নব্বইয়ের দশকে জেলায় কৃষি উন্নয়নে আশানুরূপ সাফল্য দেখা গেলেও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি যথেষ্ট নয়। ১৯৮৮ সালে জেলায় ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা ছিল ৯০০৯ যা ১৯৯৯ সালে হয়েছে ১০,৫৮১। অন্যদিকে, ওই শিল্পসংস্থাগুলিতে কর্মসংস্থান ছিল ১৯৮৮ সালে ৫০,৬৯৭ জনের এবং ১৯৯৯ সালে ৫১,৩০৯ জনের।

বামফ্রন্টের আমলে শিল্পায়নের এই স্তিমিত হার অবশ্য শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত নয়। পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতেই উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের নীতির ফলশ্রুতি হিসাবে বিশেষত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মার খাচ্ছে। এর বিপরীতে জেলায় গড়ে ওঠা বা প্রস্তাবিত মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির উন্নয়নমূলক ভূমিকা আমাদের সাবধানতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা জরুরি। প্রসঙ্গত, ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের সম্পাদিত 'বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতি ১ম পর্ব' বইটিতে জেলার শিল্পচিত্র সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল ও আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কিন্তু ওই বইয়ে উল্লেখিত মাঝারি শিল্প প্রকল্পগুলির মধ্যে বর্তমানে কতগুলির ঠিকঠাক বাস্তবায়ন ঘটেছে, কতগুলিই বা পরিত্যক্ত বা অকার্যকর অবস্থায় আছে, এ বিষয়ে ইতিমধ্যে কোনও পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হয়নি। ফলে আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাঁকুড়া জেলায় দ্রুত কৃষি-উন্নয়ন সব ধরনের পরিসংখ্যান দ্বারা সমর্থিত হলেও শিল্পোন্নয়নের ছবিটি এ পর্যন্ত বেশ খানিকটা অপরিচ্ছন্ন বা অস্বচ্ছ অবস্থায় আছে।

সাম্প্রতিককালে বাঁকুড়া জেলার আর্থিক উন্নয়ন কৃষির পাশাপাশি বেশি মাত্রায় সংঘটিত হয়েছে সেবাক্ষেত্রের সমৃদ্ধির মাধ্যমে। জেলায় কৃষি ও শিল্পের পরিকাঠামো উন্নত হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আশির দশকেই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও কাঁচা রাস্তার তুলনায় পাকা রাস্তার অনুপাত লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নব্বইয়ের দশকে ওই রাস্তাগুলির প্রায় প্রতিটির গুণগতমান অনেক উন্নত হয়েছে। বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সুব্যবস্থাও এই দশকে প্রশংসনীয় মাত্রা পেয়েছে। বিগত দু-দশকে বাঁকুড়া জেলায়

সেবাক্ষেত্রের অগ্রগতি জেলার যে কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও চোখে পড়ার মতো। জনগণনার হিসাবে শহরবাসীর অনুপাত প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও জেলার গ্রামাঞ্চলে শহরের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ছোটখাটো দোকান ও নানা ধরনের ব্যবসাবাণিজ্য মিলিয়ে বিগত কুড়ি বছরে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রের (Non-farm Sector) উন্নতি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই জেলাতেও ক্রমাগত ঘটে চলেছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির রূপান্তর সামগ্রিকভাবে যেমন, তেমনই ব্যষ্টি পর্যায়ে যে কোনও একটি বা একাধিক গ্রামের অর্থব্যবস্থার দিকে তাকালেই ধরা পড়ে। উদাহরণ হিসাবে আমরা এখানে দক্ষিণ বাঁকুড়ার সাঁইতড়া নামে একটি ছোট গ্রামের কথা বলতে পারি। পঞ্চাশের দশকে এই গ্রামে ৪০টি পরিবারের ভেতর মাত্র ২টি পরিবারে সারা বছরের অন্নসংস্থান ঘটত। বাকি ৩৮টি পরিবারকেই বছরের একটা সময় সরকারি খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হত। ষাটের দশকে কংসাবতী সেচ প্রকল্প রূপায়িত হলে এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষের সরকারি সাহায্য ছাড়াই জীবনধারণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে এই গ্রামটি একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন এমন একজন ব্যক্তিও এই গ্রামে নেই। শহরাঞ্চলের প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধা এখানে পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যেই চলে ধানভানা মেশিন। কৃষিভিত্তিক জীবিকা থেকে সেবাভিত্তিক জীবিকাই এখানে ইদানিংকালে প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির সমষ্টিগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে জীবিকা কাঠামোর এই ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, এমন আমরা বলতে পারি না। বস্তুত, ভারতীয় অর্থব্যবস্থার সমস্ত অগ্রগতি-লক্ষণের ভেতর 'অনড় জীবিকা কাঠামো' আজও যেমন একটি স্বল্পোন্নয়নের দিকচিহ্ন হয়ে আছে, বাঁকুড়া জেলাতেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কিন্তু সাঁইতড়া গ্রামের মতো ব্যতিক্রমী গ্রাম এই জেলাতেও এমন কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তুলনামূলকভাবে কম উন্নত এলাকাগুলিতে আমরা সহজেই খুঁজে পেতে পারি।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাঁকুড়া জেলায় অর্থনীতির আরও গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তন ঘটেছে তা হল, জেলার সমৃদ্ধ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে কিছুকাল আগেও পিছিয়ে-থাকা পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের ব্যবধান হ্রাস। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাঞ্চলে ছাতনা, শালতোড়া এবং উত্তরাঞ্চলে গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া ও বড়জোড়া কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই সব অঞ্চলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি গড়ে উঠেছে নানা ধরনের শিল্প ও সেবাকেন্দ্রিক কাজকর্মের সুযোগ। পাথর ভাঙা মেশিন, টালি তৈরি ইত্যাদিতে বর্তমানে অসংখ্য মানুষ তাঁদের জীবিকা অর্জনের জন্য নিযুক্ত হতে পারছেন। বড়জোড়া ও মেজিয়া অঞ্চলে কংসাবতী স্পিনিং মিল ও মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রভৃতি জেলায় এই ধরনের অসেচ এলাকায় মানুষজনের রুটিরুজির জোগান দিচ্ছে। বনসৃজন থেকে শুরু করে বর্গা জমির অধিকার বাঁকুড়ার প্রায় ৪০% তফসিলভুক্ত ও আদিবাসী জনগণের জীবনজীবিকায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম সমীক্ষা থেকে এও দেখা গেছে যে,

বাঁকুড়া জেলার শিল্প বিষয়ক একটি কর্মশালা, ১৯৯৮

পার্শ্ববর্তী উচ্চবর্ণের বসবাস যে-সকল গ্রামে সেগুলির তুলনায় বেশ কতগুলি আদিবাসী গ্রামে মাথাপিছু আয় বেশি বা দারিদ্র্যের প্রকোপ কম।

বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির রূপান্তর প্রসঙ্গে শেষ কথা হল, বিগত একশো বছরে এই জেলার অর্থব্যবস্থা চিরাচরিত সমাজের সমান্তরাল স্তর থেকে উন্নীত হয়ে উত্তোলনপর্ব বা স্বয়ংক্রিয় উন্নয়ন পর্বের সমান্তরাল একটি স্তরে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এখানে এখনও তেমন কোনও শিল্পের বা শিল্পসমূহের বিকাশ ঘটেনি। একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে উন্নতির প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল বাধা প্রদানকারী শক্তি কাজ করে বাঁকুড়া জেলায় প্রধানত গত দু-দশকে সেগুলি অনেক দূর পর্যন্ত অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই জেলার অর্থব্যবস্থার আরও সুদূরপ্রসারী রূপান্তর জেলার মধ্যে অবস্থিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলির পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে পারে। সেজন্য যা দরকার তা হল উন্নয়নের পরিপন্থী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে গণতান্ত্রিক উপায়েই পর্যুদস্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলার সামগ্রিক ও অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের জন্য একটি স্বল্পমেয়াদি ও একটি দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবোচিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে আমাদের এগিয়ে চলা।

সহায়ক বই ও পত্রিকা :

১. বাঁকুড়া : তরুণদেব ভট্টাচার্য

২. State Economic Review : Government of West Bengal. 2000-2001

৩. বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতি ১ম ও ২য় পর্ব : অধ্যাপক তারাপদ ধর (সম্পাদিত)

৪. The Economics of under development . Prof T. Dhar

৫. গ্রামবাংলার অর্থনীতি : ঈশ্বর ত্রিপাঠী

লেখক : অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

পাথরের নটরাজ মূর্তি, সেউর্লিভিতা

পাথরের চারচালা সর্বমঙ্গলা মন্দির, মরিচা এবং গর্ভগৃহে রক্ষিত দুর্গা ও গণেশ মূর্তি
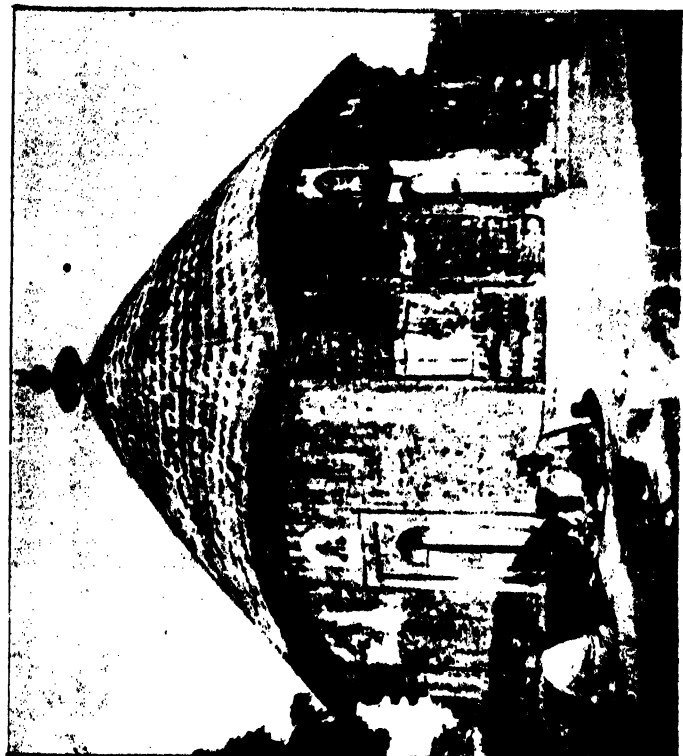
বাঁকুড়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও শিল্প সম্ভাবনা

শ্যামাপদ চৌধুরী

জি এস আই বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়ায় ১৪৩টি জায়গায় বোরিং করেছিল। বোরিং-এর রিপোর্টে জানা যায় শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়াতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্টমানের কয়লা মজুত আছে এবং যার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আছে। পরে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালে মেজিয়া থানার কালিদাসপুর কয়লাখনি চালু করা হয়।

কৃষিপ্রধান এই বাঁকুড়া জেলায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছাড়া কোনো মাঝারি শিল্প বা ভারী শিল্প ছিল না। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার ২৮,০৫,০৬৫ এবং বর্তমানে প্রায় ৩২ লক্ষ জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষকে মূলত কৃষির উপর নির্ভর করতে হয়। কৃষিকে আবার অধিকাংশ স্থানে আকাশের বৃষ্টির উপরই নির্ভর করতে হয়। এই জেলায় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক—১২৭১ মিলিমিটার। সময়মত ও প্রয়োজনমত বৃষ্টি হলে কংসাবতী জলাধার থেকে দক্ষিণ বাঁকুড়ার কয়েকটি ব্লকে ও ডিভিসি-র জলাধার থেকে পূর্ব বাঁকুড়ার কয়েকটি ব্লকের কিছু মৌজায় জল ক্যানেলের মাধ্যমে দেওয়ার ফলে দুটি ফসল হয়। তাও বোরো চাষে কংসাবতী সব সময় জল দিতে পারে না। আর সমগ্র উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়ায় সময়মত ও প্রয়োজনমত বৃষ্টি না হলে একটি ফসলও ভাল করে হয় না। সেজন্য ভারতের দরিদ্রতম জেলাগুলির মধ্যে বাঁকুড়া জেলা অন্যতম বলে গণ্য ছিল। জেলার ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে উত্তর ২৩.৩৮ এবং দক্ষিণ ২২.৩৮ অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ হচ্ছে পূর্ব ৮৭.৪৬ এবং পশ্চিম ৮৬.৩৬। এই জেলার আয়তন হচ্ছে ৬৯৩৫.১৭ বর্গকিলোমিটার। ভূমির বিবরণে ১৯৯১ সালের সমীক্ষামত মোট ভৌগোলিক আয়তন ৬,৮৮,১০১ হেক্টর। চাষযোগ্য জমি ৩,৯৯,৪৭৯ হেক্টর, পতিত জমি ১৫,৭০৩ হেক্টর। জঙ্গল এলাকা ১,৩৩,৬৬৩ হেক্টর, খাস জমি ৬১,৮২৩,৯১ একর।

বাঁকুড়া জেলায় বৃহৎ শিল্প হিসেবে একমাত্র মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রেরই উল্লেখ করা যায়। বৃহদায়তন যন্ত্রপাতি ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে অন্যান্য শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে শিল্পে নির্মিত হয় তাকে ভারী শিল্প বলে—যেমন লৌহ ইস্পাত শিল্প, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, ভারী রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি। স্থায়ী যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ হলে তাকে ক্ষুদ্রশিল্প বলে। ক্ষুদ্রশিল্পের সঙ্গে কুটির শিল্পের পার্থক্য হচ্ছে ক্ষুদ্রশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ও কুটির শিল্পে চিরাচরিত প্রযুক্তি।

পাওয়ার স্টেশন করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জমি—সেই জমি যাতে হোমস্টেট ল্যান্ড বা কালটিভেটেড ল্যান্ড না হয়ে পতিত জমি হয় বা হোমস্টেটেড ল্যান্ড বা কৃষিজমিকে কম ক্ষতিগ্রস্ত করে বেশিরভাগ খাস পতিত জমি পাওয়া যায় তা দেখা দরকার। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে জল, কয়লা কাছাকাছি পেতে হবে। সেই সঙ্গে যোগাযোগ, বণ্টন এবং চাহিদা দেখতে হবে। এইসব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করে দেখা গেল মেজিয়া এলাকায় স্থান নির্বাচন করা যায়। কিন্তু জল, কয়লা, যোগাযোগ, চাহিদা অতি কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও বসতিপূর্ণ এলাকা থাকায় মেজিয়া স্থান পরিবর্তন করে দুর্লভপুরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—কারণ দুর্লভপুরে হোমস্টেট ল্যান্ড কম থাকায় জমি অধিগ্রহণও পুনর্বাসনের কাজ সহজ হয়। পতিত জমি বেশি ছিল। এরপর প্রকল্প নির্মাণের ব্যয়বহন করার প্রতিশ্রুতি ডিভিসি কর্তৃপক্ষ দেওয়াতে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী আব্দুল গনি খান চৌধুরীর চেষ্টায় সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক্যাল অথরিটি (সি ই এ) এবং প্ল্যানিং কমিশন বাঁকুড়া জেলার দুর্লভপুরের লাটিয়াবনী মৌজায় ৩ x ২১০ মেগাওয়াট ইউনিটের মঞ্জুরি কেন্দ্রীয় সরকার দেন। সেইমত মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৮৮ সাল থেকে এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তদানীন্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী বসন্ত শাঠে, রাজ্যের পক্ষ থেকে তদানীন্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। সবথেকে আনন্দের বিষয় দলমতনির্বিশেষে স্থানীয় এবং জেলার নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দের আন্তরিক সর্বপ্রকার সহযোগিতায়, জেলা প্রশাসন এবং ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ও উচ্চপদস্থ কর্মীদের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে দুর্লভপুরে এই ভারী শিল্প গড়ে উঠেছে। ২০০০ কোটি টাকার প্রকল্প ছিল কিন্তু এখন তা বেড়ে যে কত হয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি। ইস্টার্ন রিজিয়নে সেই সময় এতবড় প্রকল্প আর কোথাও ছিল না। ১৯৯৬ সালে প্রথম ইউনিট চালু করে ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। জমির দাম, বাড়ির দাম ছাড়াও ৪০ হাজার করে টাকা প্রত্যেক পরিবারে প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া হয়। পাওয়ার স্টেশন থেকে নির্গত ছাই ফ্লাই
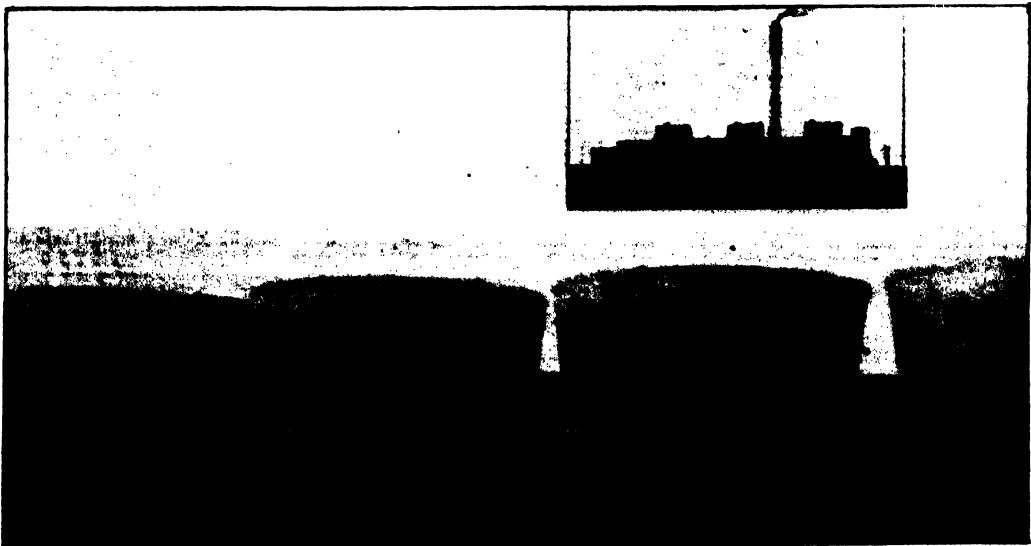
মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প

অ্যাসব্রিক প্ল্যান্ট তৈরি করা যায়—উৎপাদিত ইট বর্তমান ইটের চেয়ে দাম কম হবে, ইটের মান ভালো হবে, মশলা খরচ কম হবে। বাই-প্রোডাক্ট অব কোল ফ্লাই গ্যাস হয়। ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা গেছে যে এখানে আরও ৩টি সমপরিমাণ ইউনিট চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ উক্ত পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আছে। এই পরিকাঠামোতে বহু ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এই শিল্পের উদ্যোগ নিতে গেলে সকলকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। তবেই বাঁকুড়া জেলায় শিল্পে অনগ্রসরতা দূর হবে।

মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রোজেক্ট এরিয়া প্রায় ২৫৬৫ একর। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ১৫ কিমি এবং রাণীগঞ্জের দামোদর নদ থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। জলের উৎস—দুর্গাপুর ব্যারেজ। জলের আনুমানিক প্রয়োজন ৫৪ কিউসেক। উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিটি ২১০ মেগাওয়াট করে তিনটি ইউনিটের (শাখার)। আনুমানিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩.৩৭ বিলিয়ান ইউনিট বছরে। রেলপথের আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৪১ কিমি (মেরি গো রাউন্ড সিস্টেম) জল ধরে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন বাঁধ ১০০০ হাজার একর। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ডায়ামিটার সম্পন্ন লম্বা ১৮ কিমি জল পরিবহণ পাইপ লাইন। রেল কাম রোড ব্রিজ রাণীগঞ্জের নিকটে দামোদর নদের উপরে দৈর্ঘ্য ৭৯৩.৬২ মিটার এবং ১৮টি স্তম্ভের (পিলার) উপর অবস্থিত। কয়লা পাওয়ার উৎস কালিদাসপুর কোলিয়ারি প্রোজেক্ট থেকে ২০ কিমি দূরে অবস্থিত। কয়লা পরিবহণ ক্ষমতা ৩২টি ওয়াগন (ডিটিএইচ) এক একটির ওজন ৫৫ টন। কয়লা প্রয়োজন প্রতি বছরে ২ (দুই) মিলিয়ন টন। নির্গত ছাইয়ের পরিমাণ ০.৮ মিলিয়ন টন প্রতি বছরে। মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সমগ্র কলোনি এলাকা চারদিকে ইটের বৃহৎ প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত। এখন প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) অদক্ষ শ্রমিক কাজ করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় তা তিন হাজার ছাড়িয়ে যায়। নজিরবিহীন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে বর্তমানে ৩টি ইউনিটই চালু আছে।

জেলা শিল্পকেন্দ্র, বাঁকুড়া গত ১৯৮৭ সালে বাঁকুড়া জেলার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্বন্ধে জেলার যে শিল্পচিত্র দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় যে (১) জেলায় আনুমানিক ৭৮৭টি কৃষিনির্ভর শিল্প কোতলপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও সোনামুখীতে আছে যাতে আটা, চাল, সরিষা তেল, ময়দা উৎপাদন হচ্ছে এবং ৪০৪১ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (২) বনজসম্পদনির্ভর শিল্প ২৬১টি সংস্থা আছে জয়পুর, সোনামুখী, বাঁকুড়া ১ নং ব্লক, ও তালডাংরায়, সঙ্গে কাঠচেরাই ও আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে এবং ১১৭৯ জন কর্মী নিযুক্ত আছে (৩) খনিজ সম্পদ শিল্পের ৬০টি সংস্থা আছে সোনামুখী, বাঁকুড়া ১ নং ব্লক ও বড়জোড়ায়, সঙ্গে কোক ব্রিকেট, চুন ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে এবং ৪৯২ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (৪) বস্ত্রশিল্প বাঁকুড়া ১ নং বিষ্ণুপুর, সোনামুখীতে কাপড় ছাপা ও পোশাক তৈরি হচ্ছে এবং ১৬৮৩ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (৫) ইঞ্জিনিয়ারিং ও আনুষঙ্গিক শিল্পের ১৪৪৯টি সংস্থায় বাঁকুড়া ১ নং, সোনামুখী, বড়জোড়া, বিষ্ণুপুরে কাঁসা-পিতল বাসন, সিট মেটালের কাজ ইত্যাদিতে ৬২৩২ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (৬) রসায়ন শিল্পের ১২৮টি সংস্থায় বাঁকুড়া ১ নং, সোনামুখী ও বিষ্ণুপুরে কাপড় কাচা সাবান, কালি, মোমবাতি উৎপাদনে ৫৫৬ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (৭) পশু সম্পদনির্ভর শিল্পের

মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৮৮ সাল থেকে এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তদানীন্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী বসন্ত শাঠে, রাজ্যের পক্ষ থেকে তদানীন্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। সবথেকে আনন্দের বিষয় দলমতনির্বিশেষে স্থানীয় এবং জেলার নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দের আন্তরিক সর্বপ্রকার সহযোগিতায়, জেলা প্রশাসন এবং ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ও উচ্চপদস্থ কর্মীদের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে দুর্লভপুরে এই ভারী শিল্প গড়ে উঠেছে।

১০৬টি সংস্থায় ওন্দা, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী ও বড়জোড়ায় জুতা, চপ্পল, চামড়া প্রসেসিং এর কাজে ৪৫১ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (৮) অন্যান্য শিল্পের ৭৪৪টি সংস্থায় বড়জোড়া, শালতোড়া বাঁকুড়া ১ নং, বিষ্ণুপুর, কোতলপুর, সোনামুখীতে টালি, পাথরকুচি, সিমেন্ট গ্রিল, পাইপ ইত্যাদি উৎপাদনে ৬০৭৯ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। চিরাচরিত প্রাকৃতিক শক্তির উৎস যথা কয়লা, খনিজ তেল, জ্বালানি এগুলো তো অফুরন্ত নয়—২০০০ সালের পর এগুলি দেশের অস্বাভাবিক বাড়ন্ত জনসমষ্টির প্রয়োজন মেটাতে পারবে না বলে বিজ্ঞানীরা সতর্কবাণী দিয়েছেন। বর্তমান বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে অতিদ্রুত উন্নতির যুগে মানুষ শক্তি ছাড়া একপাও চলতে পারে না—সেজন্য সারা বিশ্বে আজ নতুন নতুন শক্তিগুলির সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে—যথা জৈব গ্যাস, সৌরশক্তি ইত্যাদি। বাঁকুড়া জেলায় ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে ২৬৪টি জৈব গ্যাস প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জেলায় ৫০০টি জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন হবে বলে জেলা শিল্পকেন্দ্র সেই সময় জানান। বাঁকুড়া জেলায় ১৯৮৭ সালে কর্মরত শিল্প সমবায় সমিতির যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল তা হচ্ছে—(১) বিকনায় অবস্থিত বাঁকুড়া ডোকরা শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড, (২) বাঁকুড়া শহরে বাঁকুড়া শঙ্খ শিল্প সমবায় সমিতি, (৩) বিষ্ণুপুরে দর্জি শিল্পের বিষ্ণুপুর মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড, (৪) কুস্থলিয়ায় বেলমালা শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড, (৫) পাঁচমুড়া মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড, (৬) কম্বল তৈরির জন্য লোকপুর পশম শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড, (৭) বাসন শিল্প নির্মাণে পাথুরিয়া কর্মকার শিল্প কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (৮) মলিয়ানে বেল মেটাল কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি, (৯) বাঁকাদহ চর্মশিল্প সমবায়

বাঁকুড়ার বিড়িশিল্প

সমিতি, (১০) বাঁকুড়া বিড়ি শিল্প কো অপারেটিভ সোসাইটি, (১১) দেশি লণ্ঠন তৈরির জন্য বিষ্ণুপুর ল্যান্টার্ন মেকার্স কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (১২) পাথর ভাঙার জন্য মেজিয়া শালতোড়া স্টোন কোয়েরি ওয়ার্কার্স কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (১৩) টালি তৈরির জন্য মুবলু কুম্ভকার—টাইলমেকার্স কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (১৪) কাপড় ছাপার জন্য বাঁকুড়া টেক্সটাইল ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং একস ট্রেইনিজ কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (১৫) ইট তৈরির জন্য সোনামুখী থানা তফসিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি (১৬) দর্জি ও উলের কাজের জন্য বাঁকুড়া অগ্রগামী নারী ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (১৭) পোশাক ও খাবার তৈরির জন্য রাপুর, বাঁকুড়ায়, বাঁকুড়া মহিলা সমাজ কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড, (১৮) বিড়ি তৈরির জন্য হরেকৃষ্ণপুর, বাঁকুড়ায় বাঁকুড়া শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড, (১৯) বাঁকুড়া জেলা বিড়ি কারিগর সমবায় সমিতি লিমিটেড (কেরানীবাঁধ)। তাছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনের বাঁকুড়া জেলা শাখা থেকে ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত জেলায় ১৫টি রাইস মিল, ৪টি কোল্ড স্টোরেজ, ৯টি তেলকল, ১২টি স্টোন ক্রাশারকে উন্নত প্রথায় উৎপাদন করার জন্য অর্থসাহায্য করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা লাক্ষা চাষে এবং লাক্ষা উৎপাদনে অন্যতম জেলা। বাঁকুড়া জেলায় বছরে ২০০০ (দুই হাজার) মেট্রিক টন স্টিক ল্যাক (কাঁচামাল) উৎপাদিন হয় এবং গ্রামীণ পরিবারের ১৭০০০ (সতের হাজার) মানুষ (যার বেশিরভাগই আদিবাসী) এই লাক্ষা চাষের কাজে নিযুক্ত আছে। লাক্ষা উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ব্লক হচ্ছে ছাতনা, ইন্দপুর, রাইপুর ১ নং, শালতোড়া, খাতড়া ১ নং, বাঁকুড়া ২ নং, মেজিয়া, খাতড়া ২ নং, গঙ্গাজলঘাটি ও রাণীবাঁধ। জেলায় লাক্ষা চাষের জন্য কুসুম, বের ও পলাশ মোট ১৭ লক্ষ গাছ আছে। জেলায় ১২টি স্টেট লাক্ষা ফার্ম আছে তাতে বছরে ২০০০ শ্রম সংস্থান হয়। এই ১২টি ফার্মের মধ্যে মেজিয়া ব্লকের চুয়াবেড়িয়া, জেমো, যুগীবাগ, বাঁশকুড়ি, আনন্দপুর, গঙ্গাজলঘাটি ব্লকে গোবিন্দধাম, মচা-পারুলিয়া, ইন্দপুর ব্লকে বনকাটা, তরকাজোড়, শালতোড়া ব্লকে তেঁতুলটুকরী ও খাতড়া বজলকে তোপবাড়িতে। এই ১২টি ফার্মে লাক্ষা চাষের অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং গরিব লাক্ষা চাষীদের উৎকৃষ্ট মানের ব্রডল্যাক সরবরাহ করা হয়। জেলায় স্থানীয় বেকার যুবকদের জন্য বিশেষ করে পশ্চাৎপদশ্রেণীর জন্য ২টি ট্রেনিং কাম সার্ভিসিং সেন্টার লাক্ষা চাষের উপর খোলা হয়েছে। এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য এক বছরে লাক্ষার প্রয়োগ এবং লাক্ষাভিত্তিক হস্তশিল্প তৈরি করা। খাতড়া ১ নং ব্লকে ও ছাতনা ব্লকে এই দুটি টি সি এস সি কেন্দ্র প্রতিটিতে এক বছরে ১০ জন করে ২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাড়া ওই দুটি ব্লকে ১টি প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করা হয়েছে এবং ১টি ল্যাক আর্টিজেন কো-অপারেটিভ সোসাইটি ট্রেনিংপ্রাপ্তদের নিয়ে খাতড়া ১ নং ব্লকে তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যবসায় একচেটিয়া পদ্ধতি রদ করার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া জেলায় ভবিষ্যতে লাক্ষাভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্প-টেরাকোটা বাঁকুড়া জেলা পরিষদ এবং সরকারি সি অ্যান্ড এস এস আই বিভাগে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সিরামিক সেন্টারে পাঁচমুড়ার স্থানীয় মৃৎশিল্পীদের বিশেষত টেরাকোটা শিল্পের উন্নয়নের কাজে সহায়তা করে আসছে। সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতার সহায়তায় পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প উন্নতমানের প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ পেয়ে আরও উন্নতি লাভ করেছে। পোড়া মাটির ঘড়া ও বিভিন্ন কাজ ছাড়াও মৃৎশিল্পীরা এখন ক্রকারী উৎপাদনে মনসংযোগ করেছে। স্যানিটারিওয়্যার প্রকল্পে সরকারের সি অ্যান্ড এস এস আই বিভাগ বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মাধ্যমে ১৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। শিল্পোদ্যোগীদের উন্নতমানের চুল্লি এবং কৃষিভিত্তিক যন্ত্রপাতি ও উপাদান তৈরির কাজেও আর আর এল ভুবনেশ্বর জেলা শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে সহায়তা করছে।

রাজ্য সরকারের এগ্রি-মার্কেটিং অফিসে চাঁদমণি ডাঙায় ফুড প্রসেসিং শিল্পের মাধ্যমে জ্যাম, জেলি, সস, স্কোয়াস, কাসুন্দি, টমেটো সস, পটেটো প্রসেসিং ইত্যাদি তৈরির জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে তৈরি করে বিক্রয় করা হচ্ছে। বিষ্ণুপুর শহরের নিকটে ১৭২ একর জায়গা নিয়ে নির্মিত হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার। জেলার ৭টি স্থানে ১৪ কোটি টাকায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাহায্যে শিল্প প্রকল্প নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বড়জোড়ায় হাট-আশুড়িয়ার মোড়ে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কংসাবতী স্পিনিং মিল তৈরি হয়েছে। বাঁকুড়ায় সুতো রঙ করার জন্য একটি রঙ কারখানা তৈরি হয়েছে। ওন্দা থানায় সারদা ফার্টিলাইজার নামে একটি সারকারখানাও তৈরি হয়েছে; বড়জোড়া থানায় ঘটগড়িয়ায় দীর্ঘ বছর ধরে একটি বঁড়শি শিল্প (মাছের কাঁটা তৈরি) তৈরি হয়েছে। তাছাড়া বৃহৎ শিল্প বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে থাকায় নিকটবর্তী বড়জোড়া থানায় অনেক ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে উঠেছে। রাণীবাঁধ থানার ছান্দাপাথরে অত্যন্ত মূল্যবান উৎকৃষ্ট মানের উলফ্রাম শিল্প গড়ে উঠেছিল ও উৎপাদনও হচ্ছিল।

তাছাড়া বাঁকুড়া জেলায় শিল্প সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলা যায় যে ১৯৫১ সালে বিহারের ধানবাদ থেকে প্রকাশিত 'দি নিউ স্কেচ' পত্রিকা (নিখিল ভারত কোলিয়ারি মালিক সমিতির মুখপত্র) তদানীন্তন সম্পাদক জগৎচন্দ্র সরকার লিখেছিলেন যে, বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়ায় ২৫ ফুট থেকে ৫০০ ফুট নিচু পর্যন্ত অতি উচ্চমানের প্রচুর কয়লা আছে যার মাটির নিচে রাণীগঞ্জ বেল্টের সঙ্গে সংযোগ আছে। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯৬২ সালে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন বিধানসভা নির্বাচনে শালতোড়া কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হন তখন দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে শিল্পদাবিকমিটি করে তাঁর হাতে ওই এলাকার যুবকেরা এক স্মারকলিপি দাখিল করে। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয় যে গঙ্গা নদীর দুই ধারে যদি চটকল, পাটকল গড়ে উঠে তবে এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যেখানে চন্দ্রলোকে যাচ্ছে—আমাদের দেশের খনিজ আকর যেখানে জাপান, জার্মানি, চেকোস্লোভেকিয়ায় নিয়ে গিয়ে শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। বিকানীর থেকে খনিজ আকর এনে যখন সিন্ধ্রি ফার্টিলাইজার চলছে, রাউরকেল্লা থেকে খনিজ আকর এনে যেখানে বার্নপুর কারখানা চলছে সেখানে দামোদর নদীর উত্তরতীরে দুর্গাপুর থেকে সিন্ধ্রি পর্যন্ত এক বিশাল শিল্প এলাকা গড়ে উঠেছে এবং শিল্প এলাকা গড়ে তোলার জন্য জল, কয়লা, জলবিদ্যুৎ সবকিছুই আমদানি করা হয়েছে সেখানে দামোদর নদীর ওই উত্তর তীর থেকে রসদ উপকরণ এনে অনায়াসে কলকারখানা গড়ে তোলা যায়। তাছাড়া এই উন্নত বিজ্ঞানের যুগে দামোদরের উত্তর তীর আলোয় ভরে থাকবে আর দক্ষিণ তীর অন্ধকারে ঢেকে থাকবে—এটা বিমাতাসুলভ

ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প

কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষ ও অন্যান্য কারণে এগুলির অধিকাংশই বন্ধ হয়ে আছে।

গত তিন বছরে আবার জেলা শিল্প দপ্তর যে-সব প্রতিষ্ঠিত শিল্পের অনুমোদন দিয়েছে তা হচ্ছে (১) বিস্কুট, লজেন্স, কেক ইত্যাদি তৈরির জন্য কনফেকশনারি-২৫টি, (২) পাথর ভাঙাই (স্টোন ক্রাশার)-৬০টি, (৩) রাসায়নিক শিল্প (সার, নীল)-৪০টি, (৪) ইলেকট্রনিক শিল্প-২০টি, (৫) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প-১০০টি, (৬) আটা কল-১২৫টি, (৭) প্রিন্টিং প্রেস-৪০টি, (৮) সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি-১০টি, (৯) কৃষিভিত্তিক শিল্প-৫০টি, (১০) অটোমোবাইল সার্ভিসিং-১০টি ইউনিট, (১১) বনজ শিল্প-২০টি, (১২) ফুড প্রসেসিং-২১টি, (১৩) প্লাস্টিক শিল্প-৮টি, (১৪) টায়ার ট্রেডিং ৭টি, (১৫) টেরাকোটা শিল্প ৫১টি, (১৬) শঙ্খশিল্প-২১০টি, (১৭) কাঠ খোদাই-২২টি (১৮) প্রস্তর খোদাই ১৫টি, (১৯) বাঁশবেত শিল্প-১৮টি, (২০) ডোকরা শিল্প-১৫টি, (২১) বেলমালা, চিরুনি, নারকেলমালা, স্লেটকার্ভিং-২৫টি, (২২) ইটভাটা-১১০টি, (২৩) সিমেন্ট কারখানা-২টি (১টি বিষ্ণুপুরে ম্যাগাসিটি ও ১টি ঝাঁটি পাহাড়িতে সিলেক্স), (২৪) ফ্লাওয়ার মিল-২টি, (২৫) আল্ট্রামেরিন ব্লু-২টি (বিষ্ণুপুর ও শালতোড়া), (২৬) অ্যালুমিনিয়াম ছিপি-১টি, (২৭) অভোজ্য তেল-১টি, (২৮) রাইসমিল-৫০টি, (২৯) পলিথিন পাইপ-১টি, (৩০) প্লাইউড-১টি, (৩১) ৬৫টি তেলকলের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে, (৩১) ১০০০ (হাজার) কাঁসাবাসন শিল্পের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে।

বাঁকুড়ার প্রবহমান শঙ্খশিল্প

বাঁকুড়ার অন্যতম পাথরশিল্প

মনোভাব। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সেই সময় দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে কেন্দ্রে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে বলে বাঁকুড়া জেলার শেষ প্রান্তে বর্ধমান জেলার সীমান্তে শালতোড়া ও পুরুলিয়া জেলার সাতুড়ি থানার মধ্যখানে পড়াডিহার মাঠে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার একটি ক্যাম্প বানিয়ে বোরিং করিয়েছিলেন। জি এস আই সেই সময় বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়ায় ১৪৩টি জায়গায় বোরিং করেছিলেন। বোরিং-এর রিপোর্টে জানা যায় যে শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়াতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা মজুত আছে এবং যার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আছে। পরে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালে মেজিয়া থানার কালিদাসপুর কয়লাখনি চালু করা হয়। কিন্তু ওই মেজিয়া থানারই কালিকাপুর, বারদুয়ারী, অর্ধগ্রাম, ভুলুই, ভাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে এবং শালতোড়া থানার সাহেবডাঙা, কান্তোড়া, রাঙামাটি, কেন্দনা, ডাহুকা, গোপালনগর, বাঁকুলিয়া, মাঝিট, রাউতোড়া, বামুনতোড়, মহিষারা, চকবগা, তেঁতুলিয়ারাখ প্রভৃতি দামোদর নদীর ধারে প্রচুর গ্রামগুলির ডাঙায় প্রচুর উৎকৃষ্ট মানের কয়লা ৫ ফুট নিচু থেকেই এবং বড়জোড়া থানার গ্রামগুলিতেও সামান্য মাটি কেটে অবৈজ্ঞানিকভাবে এবং ডিনামাইট ফাটিয়ে খাদান করে দীর্ঘ বছর ধরে বেশ কিছু লোক কয়লা তুলে নিয়ে বাইরে চালান দিচ্ছে। নদীর ওপার থেকে এবং এপারেও বেশ কিছু মাফিয়া গোষ্ঠী বেআইনি কয়লা পাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতি রাত্রে প্রচুর ট্রাকে বোঝাই করে কয়লা চালান দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এইসব জায়গাগুলি অধিগ্রহণ করে কালিদাসপুরের মতো কয়লাখনি করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লা উত্তোলন করলে দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরেও শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠত। বহু বেকার মানুষ কাজ পেতো এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে বেআইনি কয়লা উত্তোলন করে গ্রামগুলি ধ্বসে যাওয়ার আতঙ্কে নদীধারের গ্রামের মানুষদের আজ আতঙ্কে দিন কাটাতে হত না। যদিও ১৯৫১ সাল থেকে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন বেঙ্গল কোল কোম্পানির কাছে বন্দোবস্ত নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে মেজিয়া থানার কালিদাসপুর, অর্ধগ্রাম, গোপালপুর, খেড়িয়াতোড় এবং হামিরপুরে খাদান করে কয়লা উত্তোলন করতেন। এই কয়লা খনিগুলি দামোদরের ওপারে রাণীগঞ্জ কোলফিল্ডের সঙ্গে সংযোগ ছিল। শালতোড়া থানার তিলুড়ি অঞ্চলে চকবগা কলিয়ারি—এই এলাকায় সীমাবদ্ধতার মধ্যে ৯২ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত আছে বলে ১৯৬১ সালের জেলা সেন্সাস বইয়ে দেখানো হয়েছে—এই কয়লা একটু নিকৃষ্টমানের। মেজিয়ার ওই কয়লাখাদানগুলি থেকে ১৯৫৭ সালে ৪৪৫৭ টন কয়লা উত্তোলন করা হয়েছিল যার তখনকার মূল্য ৭৫,৮০৩ টাকা বলে সেন্সাস বইয়ে দেখানো হয়েছে। বড়জোড়া ফিল্ডে ১৩ স্কোয়ার মাইল জুড়ে ১১ মিলিয়ন টন কয়লা আছে যে কয়লায় ঘনত্ব ২০ ফুট। যদিও তা উৎকৃষ্টমানের নয়। সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলায় ১৯৬৬ সালে ৫,৮৪৮ টন, ১৯৬৭ সালে ৩,০৭৬ টন, ১৯৬৮ সালে ৩,৩৭৮ টন; এবং ১৯৬৯ সালে ২,৯৯৭ টন কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে। তারপর থেকে ওই কয়লা খনিগুলি প্রায় অচল হয়ে আছে। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব সরকারের নেওয়া একান্ত উচিত। যার বাণিজ্য সম্ভাবনা প্রচুর আছে। নয়তো বেআইনি কয়লা উত্তোলন ও পাচার বন্ধ হবে না আর বেকারদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না।

চায়না ক্লে—বাঁকুড়া জেলার চতুর্দিকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রচুর চায়না ক্লে মজুত আছে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে দেখানো

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা লাক্ষা চাষে এবং লাক্ষা উৎপাদনে অন্যতম জেলা। বাঁকুড়া জেলায় বছরে ২০০০ (দুই হাজার) মেট্রিক টন স্টিক ল্যাক (কাঁচামাল) উৎপাদন হয় এবং গ্রামীণ পরিবারের ১৭০০০ (সতের হাজার) মানুষ (যার বেশিরভাগই আদিবাসী) এই লাক্ষা চাষের কাজে নিযুক্ত আছে। লাক্ষা উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ব্লক হচ্ছে ছাতনা, ইন্দপুর, রাইপুর ১ নং, শালতোড়া, খাতড়া ১ নং, বাঁকুড়া ২ নং, মেজিয়া, খাতড়া ২ নং, গঙ্গাজলঘাটি ও রাণীবাঁধ।

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পী

হয়েছে যে খাতড়া থানার খড়িডুংরিতে ২,৫৪,০০০ টন, শালতোড়া থানার বেড়িয়াথোলে ৩,২১,০০০ টন, গঙ্গাজলঘাটি থানার তিলামুলিতে ৩,৫৪,০০০ টন, তালডাংরা থানার মণিপুরে ইন্দপুর সংলগ্ন স্থানে ৫,৯০,০০০ টন, ওন্দা থানার সিয়ারবাদায় ৫,৯০,০০০ টন, বড়জোড়া থানার ঘুটগড়িয়ায় ৪১,০০০ টন চায়না ক্লে মজুত আছে—এছাড়াও রাইপুর, বাঁকুড়া, মেজিয়া ও বিষ্ণুপুরে চায়না ক্লে মজুত আছে (জি এস আই তার হিসেব দেয়নি)। চায়না ক্লে শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে—এই চায়না ক্লে রাজ্য সরকারের কাছে বন্দোবস্ত (লিজ) নিয়ে কয়েকজন ঠিকাদার ট্রাকে করে বেশ কয়েক বছর ধরে বাইরে চালান দিচ্ছে। রাজ্য সরকার চায়না ক্লে—ওয়াসারি করার পরিকল্পনা নিয়ে এবং শহর সংলগ্ন এক্তেশ্বরের কাছে কারখানা করার কাঠামো তৈরি করেও আর অগ্রসর হয়নি। ১৯৬৫ সালে ৩৭৪ টন, ১৯৬৬ সালে ৯২৬ টন, ১৯৬৭ সালে ১৭৮ টন, ১৯৬৮ সালে ৩৬৩ টন, ১৯৬৯ সালে ৩৮৬ টন চায়না ক্লে উত্তোলন করে বাইরে চালান দেওয়া হয়েছে এবং এখনও উত্তোলন করে বাইরে চালান যাচ্ছে যদিও তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি।

কোয়ার্টজ—ছাতনা থানার শুশুনিয়া পাহাড়ে বহু প্রাচীনকাল থেকে কোয়ার্টজের স্তর মজুত আছে। শালতোড়া থানার বারকনা মৌজায়, খাতড়া থানার কাপাসকেরিয়া, কেসাই, দামোদরপুর, কাদরা, তিরিঙ্গ, সিন্দুরপেটি, ডহলা, ধারগ্রাম, ঝরিয়া, জিয়াকানালি, বানবেদিয়া, মুকুন্দপুর, কাপিলা, সোনামুখী থানার ধানসিমলা, ইন্দপুর থানার বাগডিহা, চূড়ামণিপুর, নুমিয়াবাইদে, রাণীবাঁধ থানার পিউরিটারি, ঝিলিমিলি, ভুরুডাঙায়, গঙ্গাজলঘাটি থানার দেউলি, নিধিরামপুরে বড়জোড়া থানার ধবণী, বানসোল, পাবয়া, এবং ধরমপুরে কোয়ার্টজ মজুত আছে। এই কোয়ার্টজ ফ্লাট এবং চাকায় গ্রাইন্ডিং-এর জন্য উৎকৃষ্টমানের ফ্ল্যাগ স্টোন উৎপন্ন করে উৎকৃষ্টমানের কোয়ার্টজ গ্লাস ফ্যাক্টরি তৈরি করে কাপ-ডিশ তৈরি করা যায় সাধারণ কোয়ার্টজ রোড সারফেসিং-এর কাজে লাগানো হয়।

উলফ্রাম—একটি অতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ যা টাংস্টাইনের চেয়ে অতি উৎকৃষ্টমানের। উলফ্রাম টাংস্টেন কারবাইড উৎপাদনে এবং বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈরি ছাড়াও ইলেকট্রিক ভালভের ফিলামেন্ট তৈরি, বন্দুকের ও রিভলবারের টেগার্টের পয়েন্টে দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সি এস আইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী রানীবাঁধ থানার ১২টি মৌজায় উলফ্রাম প্রচুর মজুত আছে। অতি পুরাতন কপার মাইন যা পরিত্যক্ত ছিল পূর্ণপানিতে। সেখান থেকে এবং সাতনালার পুরনো কোয়ারি থেকে এবং ছান্দাপাথর থেকে ১৯৬৬ সালে ৩,৪৬০ কেজি, ১৯৬৭ সালে ৪,২৩৪ কেজি, ১৯৬৮ সালে ১২,২৭৯ কেজি, ১৯৬৯ সালে ৭,৮৪৩ কেজি উলফ্রাম উত্তোলন করা হয়েছে—তারপরও ছান্দাপাথরে গৌরীপুর ইন্ডাস্ট্রিজ নাম দিয়ে দুজন বাঙালি শিল্পোদ্যোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে উলফ্রাম ফ্যাক্টরি তৈরি করে চালাচ্ছিলেন কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষের জন্য তাঁরা বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। পরে খৈতান কোম্পানি পরীক্ষা করিয়ে এটা অতিমূল্যবান খনিজ সম্পদ জেনে চালাচ্ছিলেন কিন্তু এখন আবার তা বন্ধ হয়ে আছে। অথচ ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের এই বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ থানাতেই এই মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে। সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় এই শিল্পটিকে চালু করতে পারে, সেই সঙ্গে বহু বেকারদের কর্মসংস্থান হয়।

লাইম স্টোন (চুনাপাথর)—জেলার চতুর্দিকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার মধ্যে খাতড়া থানার গুনিয়াদা ও হরিরামপুরে প্রচুর

পরিমাণে মজুত আছে বলে জি এস আইয়ের রিপোর্টে জানা যায় যে, ১.৮৮ মিলিয়ন টন লাইমস্টোন ১৫ মিটার নিচে মজুত আছে। তাছাড়া ওই দুটি এলাকায় এবং শালতোড়া থানার ফতেপুর মৌজা থেকে পুরুলিয়া জেলার বেড়োর পাহাড় পর্যন্ত মাইকা (অভ্র) মজুত আছে যা রুবি টাইপের এবং অতি উৎকৃষ্টমানের—আর বাঁকুড়া থানার খাটাকাঞ্চনপুর ও গোয়াডাঙাতেও নিকৃষ্ট পরিমাণ অভ্র মজুত আছে। এই সব জায়গায় ম্যাগনেটাইট, গ্যালেনা ও কপারও মজুত আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকায় এবং সরকারি উদ্যোগে না থাকায় সরকারি মাইন তৈরি হয়নি। উপরিউক্ত খনিজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে (১) চায়না ক্লে-কে ভিত্তি করে ক্রকারী এবং এল টি ইনসুলেটার, (২) চায়না ক্লে ওয়াসারী, (৩) ফায়ার ব্রিকস এবং ফায়ার ক্লে এবং (৪) উলফ্রাম খনি তৈরি করা যায় তাছাড়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরি করার সম্ভাবনাও আছে। রাণীবাঁধ থানার তামাখুম মৌজায় কপার, খাতড়া থানার আমডিহাতে গেলেনা (লিডওর), বাঁকুড়া থানার সাস্তোড়েও অভ্র মজুত আছে—শালতোড়া থানার পাথরডিহি মৌজায় ম্যাগনেটাইট, বাঁকুড়ার বারমেসার, দামোদরপুর, রাজগ্রাম মৌজায় ও বেলিয়াতোড়ে প্রচুর গ্রাভেল মজুত আছে। জি এস আইয়ের রিপোর্টে আরও জানা যায় যে শালতোড়া থানার বিহারিনাথ পাহাড় থেকে পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট পাহাড় পর্যন্ত প্রচুর আয়রন ওর ম্যাগনেটাইট অর্থাৎ আকরিক লোহা মজুত আছে যাতে ইস্পাত কারখানাও করা যায়। তাছাড়া সারা জেলায় রাস্তার কাজে, রেললাইনের কাজে, ঢালাই ইত্যাদির কাজে যে পাথর লাগে তা জেলার চতুর্দিকেই ছড়িয়ে আছে বিশেষ করে শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটিতে অনেক জায়গায় বিশেষ করে শালতোড়া থানার নেড়াপাহাড়ি, শ্যামপুকুরে প্রচুর কালো পাথর মজুত আছ যাতে কোনো বালির ভাব, অভ্রের ভাব বা লেয়ার নেই এবং তা পাকুড় টাইপের পাথর—একটি স্টোন কোয়ারি কর্পোরেশনে তৈরি করে চীপস্, ব্যালেস্ট, চেলি তৈরি করার ব্যবস্থা করলে এই বাঁকুড়া জেলার দিনমজুর ও খেতমজুরদের আর কাজের সন্ধানে হুগলি ও বর্ধমান জেলায় চলে যেতে হবে না—সারা বছর এখানেই কাজ পাবে। এছাড়াও অ্যাগ্রো অ্যান্ড রুরাল ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য এস এস আই প্রকাশিত সম্ভাব্য তালিকা থেকে জানা যায় যে জেলা (১) ফুড অ্যান্ড অ্যালায়েড প্রোডাক্টস, (২) হোসিয়ারিসহ টেক্সটাইল প্রোডাক্টস (৩) আর্ট সিল্ক, (৪) উড্ অ্যান্ড উড্ প্রোডাক্টস, (৫) পেপার প্রোডাক্টস, (৬) রবার প্রোডাক্টস, (৭) প্লাস্টিক প্রোডাক্টস, (৮) প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয় তৈল, (৯) গ্লাস এবং সিরামিক, (১০) রুফিং টাইলস, ফ্লোরিং টাইলস(১১) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (১২) ইলেকট্রিক্যাল মেশিন (ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স-সহ), (১৩) ট্রান্সপোর্ট এবং ট্রাক বডি বিল্ডিং, (১৪) অটোপার্টস কম্পোনেন্ট এবং গ্যারেজ ইকুইপমেন্ট (১৫) বাই-সাইকেল পার্টস, (১৬) অন্যান্য ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড সার্ভে যন্ত্রপাতি, স্পোর্টস গুডস্, স্টেশনারি আইটেম, ক্লক, ওয়াচ ইত্যাদি সম্ভাব্য শিল্পের তালিকা দিয়েছে। সেই সঙ্গে (১) মডার্ন রাইস মিল, (২) বনস্পতি (৩) টিন ম্যানুফ্যাকচারিং, (৪) লেবেল প্রিন্টিং, (৫) মেকানাইজড বেকারি, (৬) বিস্কুট, (৭) গো-খাদ্য (৮) ইলেকট্রিক ভালভ্স এবং সুইচ (৯) বুকেটের মতো প্লাস্টিং গুড্স, (১০) লণ্ঠন, (১১) ছিপি ও বোতল, (১২) কৃষি যন্ত্রপাতি, (১৩) মডার্ন নার্সিং হোম এবং মেডিক্যাল ডায়াগোনিস্টিক সেন্টার, (১৪) পাওয়ারলুম, (১৫) রেডিমেড পোশাক, (১৬) মিল্ক ডেয়ারি, (১৭)মিনি স্টিল প্ল্যান্ট, (১৮) মিনি সিমেন্ট প্ল্যান্ট, (১৯) ডট্ পেন, এক্সারসাইজ বুকস্, (২০) হাওয়াই চপ্পল, (২১) ওয়াশিং ডিটারজেন্ট অ্যান্ড সোপ্স, (২২) বাটিক ক্লথ, (২৩) সি আই ফ্রিকসন রোলার, কাস্টিং স্যান্ড সোয়িং পাইপ (২৪) কেবল্ টিউব, কোল টিউব কপলিং, ডগবেল, ফিসপ্লেট, কোল টিউব ড্রিল ইত্যাদি ৫৪ রকমের শিল্প গড়ে তোলা যায় বলে জানিয়েছেন। শালতোড়া থানার দিগতোড় বেল্টে যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট মানের গ্রানাইট পাথর আছে তার চাহিদা প্রচুর। রাজ্য সরকার এই বিস্তীর্ণ এলাকার পাথর তোলা ও লিজ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। জেলার তাঁত বস্ত্রসহ বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে আছে। এই শিল্পকে পুঁজি দিয়ে শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করা যায়।

রাজ্য সরকারের এগ্রি-মার্কেটিং অফিসে চাঁদমারি ডাঙায় ফুড প্রসেসিং শিল্পের মাধ্যমে জ্যাম, জেলি, সস, স্কোয়াস, কাসুন্দি, টমেটো সস, পটেটো প্রসেসিং ইত্যাদি তৈরির জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে তৈরি করে বিক্রয় করা হচ্ছে। বিষ্ণুপুর শহরের নিকটে ১৭২ একর জায়গা নিয়ে নির্মিত হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার।

ইতিপূর্বে বাঁকুড়া জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা ধন্ধে বিধায়ক অধ্যাপক পার্থ দে এক নিবন্ধে সঠিকভাবেই লিখেছিলেন যে, বাজারের প্রশ্নে, কাঁচামালের প্রশ্নে, পুঁজি জোগানের প্রশ্নে, কারিগরি ও প্রয়োগ কৌশলের প্রশ্নে, শক্তি বা জ্বালানির প্রশ্নে, পরিকাঠামোর প্রশ্নে, বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রশ্নে যতই কঠিন অবস্থা থাক না কেন সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে কী কী উপাদান পাওয়া যেতে পারে তা খুঁজে দেখা দরকার। ইতিবাচক উপাদানগুলি সমবেত করা এবং মানবিক উদ্ভাবনা শক্তিকে উৎসাহিত ও প্রশিক্ষিত করে একটা বহুব্যাপী প্রয়াস নেওয়া দরকার। বাঁকুড়া জেলায় যে কাঁচামালের সঞ্চয় আছে তা শিল্প প্রসারের উপযোগী, উন্নতমানের ২৩৫.৫১ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত আছে তা কাজে লাগানো দরকার ইত্যাদি।

সেজন্য বাঁকুড়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ছাড়া যে প্রচুর মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তা বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জেলার শিল্পদ্যোগীদের অবিলম্বে এগিয়ে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে শিল্প গড়ে তুললে জেলার ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান হয়।

লেখক সম্পাদক—রাঢ় বাঁকুড়া পত্রিকা, জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক

বাঁকুড়ার কুটিরশিল্প

অচিন্ত্য জানা

চর্মশিল্প, মৌমাছি পালন, মধু ও মধুজাত দ্রব্য, অলংকার, বই বাঁধাই, শোলাশিল্প, পটচিত্র, মিষ্টান্নশিল্প, দড়িশিল্প, বল, তালপাতার পাখা, ঝাঁটা, চাটাই, তালাই প্রভৃতি বাঁকুড়া জেলার এইসব কুটিরশিল্প বহু খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনকাঠি। জেলা জুড়ে বহু মানুষের রুজি-রোজগারের অবলম্বন।

স্বয়োন্নত দেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন হল কৃষি। আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষেরও জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন হল কৃষি। কৃষির পর শিল্পের স্থান। ভারতের অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঁকুড়ার কুটির শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কুটির শিল্পের সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে প্রথমেই যে কথাটা বলা দরকার, তা হল বাঁকুড়া জেলায় যত সংখ্যায় যতরকম শিল্প আছে অন্য কোনও জেলায় তা নাই বলে আমার বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা জানিয়ে রাখি বাঁকুড়া পিছিয়ে পড়া জেলা নয়। বরং তার উল্টোটা স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, কাব্যে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধশালী জেলা বাঁকুড়া। দুর্ভাগ্য যে, অবলোকন করার আমাদের দৃষ্টি নাই।

কুটির শিল্প আংশিক (Part time) বা পূর্ণ (Full time) বৃত্তিমূলক হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ কৃষির মরশুমে কৃষি কাজে পাঁচ-ছয় মাস নিযুক্ত থাকে। বাকি সময়ে মাদুর, চাটাই, বাঁশের ঝুড়ি, বেতের ঝুড়ি পাট শণ প্রভৃতির দড়ি, মাছ ধরার জাল, ঘুনি প্রভৃতি কুটির শিল্প কাজে নিযুক্ত থাকে। অপরদিকে তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, স্যাকরা, ময়রা, ডোকরা, চর্মকার, শংখবণিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা পূর্ণবৃত্তিমূলক কুটির শিল্প কাজে নিযুক্ত থাকে।

রাঢ়ের মধ্যমণি বাঁকুড়া জেলা প্রাচীনত্বের নানা উপাদান, প্রামাণ্য নিদর্শন, সাক্ষ্য, ঐতিহ্য প্রভৃতি বহন করে চলেছে। জীবনজীবিকাকে কেন্দ্র করে মানব সত্তার অভিব্যক্তি বাঁকুড়ার লালমাটির সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে শিল্পে, চারু-কারুকলায়। লোকায়ত জীবনের নান্দনিক সৃষ্টি একাধারে শিল্পীর পেটের ক্ষুধা এবং মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে। বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাস, শূন্য পুরাণ প্রণেতা রামাই পণ্ডিত, গণিতবিদ শুভঙ্কর বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্য রামকিঙ্কর, বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়, বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ এখানে নয়। এখানে বিশ্বজয়কারী বাঁকুড়ার ঘোড়ার কথা, বালুচরি শাড়ির কথা, দশাবতার তাসের কথা, ডোকরা শিল্পের কথা প্রভৃতি। এই সব কারুশিল্প বাঁকুড়ার গ্রামীণ জীবনে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঘাত-প্রতিঘাত, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের চক্রে আবর্ত জনজীবন। বাঁকুড়ার কুটির শিল্পে যে ঐতিহ্য সে শিল্প শিল্পের জন্য নয় ; মানুষের জন্য। বাঁকুড়া কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ একটি শান্তিপ্রিয় জেলা।

এখন আমরা বাঁকুড়া জেলার কুটির শিল্পগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য দুভাগে ভাগ করব। যেসব শিল্প জেলার বাইরে রাজ্যে, সারাদেশে বা বিদেশে চাহিদা সৃষ্টি করে সেই সব শিল্পের আলোচনার গুরুত্ব দেওয়াই শ্রেয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

তাঁতশিল্প :

মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাঁতবস্ত্র শিল্প হল—আদিম ও প্রাচীন। বাঁকুড়া জেলায় গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলিব মধ্যে তাঁতবস্ত্র শিল্পের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁত শিল্প মূলত পূর্ণ বৃত্তিমূলক এবং পারিবারিক শিল্প। বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র প্রত্যন্ত গ্রাম জুড়ে তাঁতিদের বাস। তবে

তাঁতশিল্প বাঁকুড়ার গ্রামীণ ও কুটিরশিল্পগুলির অন্যতম ও প্রাচীন

কেঞ্জাকুড়া, রাজগ্রাম, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, গোপীনাথপুর জামবেদিয়া, রাজার বাগান, মদনমোহনপুর, লক্ষ্মীসাগর প্রভৃতি গ্রামে তন্তুবায়দের বসবাস অধিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে রাজগ্রামে, কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি স্থানে বন্দর ছিল। কৃষিজাত, শিল্পজাত দ্রব্য, পিতল-কাঁসার বাসন, তাঁতবস্ত্র প্রভৃতি নৌকোয় করে ঘাটালে পাঠানো হত। বিনিময়ে আনা হত তুলা, সুতা, মশলা এবং বাসনপত্র ও লোহার সরঞ্জাম তৈরির কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী। ঘাটাল থেকে আবার সে সব মাল তমলুক, কোলাঘাট প্রভৃতি স্থানে পাঠানো হত। শুধু দ্বারকেশ্বর নদীপথে নয় কাঁসাই, শিলাবতী প্রভৃতি নদীপথেও মালপত্র আমদানি-রপ্তানি করা হত।

বর্তমানে বাঁকুড়া জেলায় আংশিক এবং পূর্ণবৃত্তিতে তাঁতশিল্পে নিযুক্ত কারিগরের সংখ্যা ৩৬,১৮৩। মোট তাঁতের সংখ্যা ১৪,৪৭৩। ৩৬,১৮৩ জন তাঁতশিল্পীর মধ্যে ১১,১৭৭ জন তাঁতশিল্পী সমবায় সমিতির অন্তর্গত। এঁদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৯,৯৫৯ জন এবং মহিলার সংখ্যা ১,২১৮ জন। সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৩২। এদের মধ্যে ৪০টি সমবায় সমিতি কাজ করছে। বাকি সব বন্ধ। জেলায় তাঁতবিহীন তন্তুবায় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৫টি। দুটি সমিতি কাজ
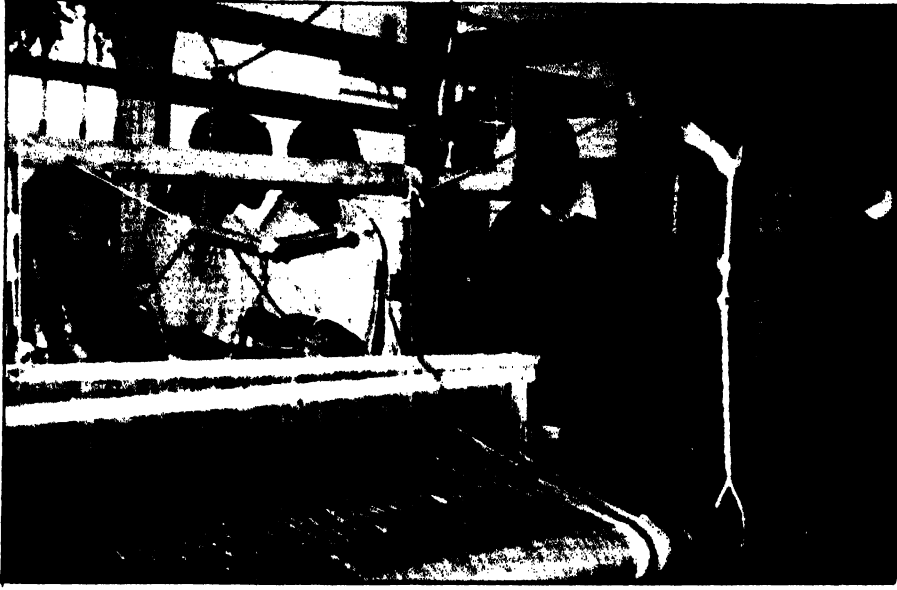
বাঁকুড়ার তাঁতশিল্প স্থানীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করেছে

করছে, রেশম শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা দুই। একটি সোনামুখীতে, অপরটি বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরে বালুচরি শাড়ির ঐতিহ্য বাঁকুড়াকে এক বিশেষ মর্যাদার স্থানে বসিয়েছে। দেশ-বিদেশে বালুচরি শাড়ির খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঁকুড়ার লুঙ্গি, গামছা, বেডসিট, বেডকভার তাঁতবস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। রং বৈচিত্র্য, ডিজাইন, টেকসই প্রভৃতি কারণে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তাঁতবস্ত্র অধিক পছন্দের ছিল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। অপরদিকে মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের অসম প্রতিযোগিতা যন্ত্রদানবের সঙ্গে মানুষ লড়াইয়ে পিছু হঠছে। তারপর আছে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রনীতি। তাঁতিরা বিশেষ করে বাঁকুড়ার তাঁতিরা আধুনিক রুচিসম্মত তাঁতবস্ত্র উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে বাঁকুড়ার তাঁতবস্ত্রের চাহিদা প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাঁতিরা মোটা সুতার লুঙ্গি, গামছা, বেডকভার, বেডসিট ছাড়া অন্য কিছু উৎপাদন করার সাহস পাচ্ছে না নানা কারণে। একথা ঠিক এখনও বাঁকুড়ার গামছার একটি বিশেষ কদর আছে। কিন্তু গামছা থেকে আয় খুবই কম। তাতে তাঁতির পেট ভরে না, সংসার চলে না, বর্তমানে বাঁকুড়ার তাঁতিদের কাছে একটি বিকল্প পথের সন্ধান মিলেছে। তা হল থান বুনে ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি করা। কিন্তু তার পরিমাণ খুবই সীমিত। আর একটি বিকল্প পথ বালুচরি শাড়ি বুনা। কিন্তু বালুচরি শাড়ির চাহিদাও খুবই সীমিত। তবে একটু একটু আশার আলো পাওয়া যাচ্ছে। তা হলো কমপিউটারে ডিজাইন করলে উৎপাদন খরচ কমবে এবং শাড়ির দাম কমবে। চাহিদা বাড়বে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যা বহু তন্তুজীবী তাঁত ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক, ক্ষেতমজুর বা অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাঁতশিল্পে পরিবারের সকল সদস্যকে শ্রম দিতে হয়। কিন্তু তাঁত থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে দুবেলা দুমুঠো পেটভরে অন্ন জোগাড় হয় না। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে চিরকাল বঞ্চিত। তাঁতিরা তাঁতশালে জন্মায়, তাঁতশালে খায়, তাঁতশালে ঘুমায়, তাঁত চালায়, তাঁতশালে মরে। হস্তচালিত তাঁতশিল্প এক বিপর্যয়ের মুখে। এর প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত বস্ত্রনীতি। ইতিমধ্যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বাঁকুড়াসহ পশ্চিমবঙ্গের তাঁতিরা অধিক পরিমাণে শোষিত ও বঞ্চিত। কারণ পশ্চিমবঙ্গে তুলা উৎপাদন হয় না। অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে তুলা এবং সুতা আমদানি করতে হয়। উৎপাদনের পর তুলা হাত ফেরি হতে হতে শেষে বস্ত্র হিসাবে ভোগকারীর হাতে পৌছায়। ভোগকারী যে দাম দেয় তার সিংহভাগ লাভ বা মুনাফা হিসাবে যায় ব্যবসায়ীদের পকেটে। তাঁতি তাদের শ্রমের মূল্য পায় না। ফলে শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য। এই শোষণ সর্বত্র, শুধু তাঁতিদের ক্ষেত্র নয়। গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজের লক্ষ্য ছিল গ্রামের মানুষকে এই শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। গ্রামে কাঁচামাল উৎপাদিত হয়। ব্যবসায়ীরা সেই মাল কম দামে কিনে প্রসেসিং করে খুশিমত চড়াদামে গ্রামের মানুষের কাছে পৌছে দেয়। এইভাবে গ্রামের মানুষ শোষিত হচ্ছে।

রেশম শিল্প :

রেশম ও তসর বস্ত্র একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প। বাঁকুড়ায় রেশম ও তসর শিল্প জেলার গ্রাম উন্নয়নে তথা আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাঁকুড়া জেলায় ৩৭০০ হেক্টর জমিতে এবং ১০০ একর জমিতে রেশমের চাষ হয়। জেলায় তসর ও রেশম উৎপাদনে ৮২৫০ জন চাষী নিযুক্ত রয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় রেশম ও তসর চাষের বিশাল কর্মকাণ্ড চলছে। অদূর ভবিষ্যতে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। বছরে তিনবার তসরের চাষ হয়। প্রায় ১৫ কোটি তসরের গুটি পোকা পাওয়া যায়। প্রথম দুটো ফসল বীজ হিসাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিক্রি করা হয়। এর চাষের গুটিপোকা তসরের সুতা তৈরি করা হয়। সোনামুখী, বিষ্ণুপুর ও
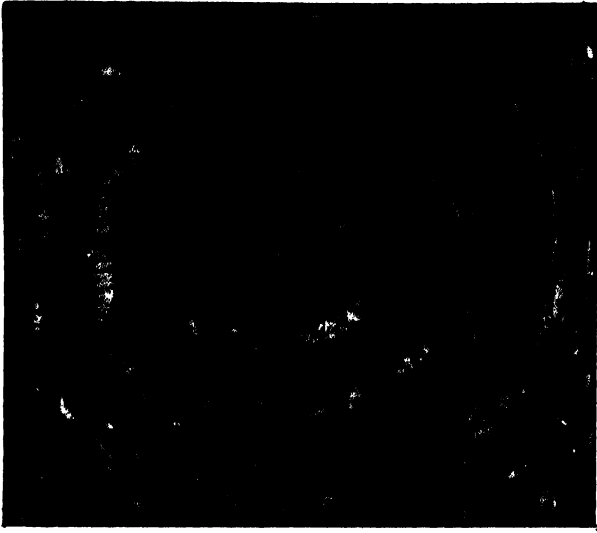
রেশম গুটি থেকে রেশম উৎপাদন প্রক্রিয়া

তালডাংরা ব্লকে সুতা তৈরি করার ব্যবস্থা আছে। মোট ৩০টি স্পিনিং দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১২৫০ জন তাঁতি তসরের থান বুনা কাজে নিযুক্ত আছে। বাঁকুড়া জেলায় তসর ও রেশম শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। ফলে কৃষক শ্রমিক, তাঁতি বেকার যুবক-যুবতী কাজ পাবে এবং আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে।

বালুচরি শাড়ি :

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বালুচরি শাড়ি শুধু ভারতবর্ষে নয় বিশ্বের বাজারেও তার খ্যাতি বিদ্যমান। ঐতিহ্যবাহী এই প্রাচীন শিল্পটি প্রসার এবং ব্যাপকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব তাঁতি বালুচরি শাড়ি বুনতে পারে না। এর জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তাঁতের বেশ জটিলতা রয়েছে। বর্তমানে বালুচরি শাড়ি শুধু বিষ্ণুপুরে নয় পাঁচমুড়া, কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি স্থানেও তৈরি হচ্ছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি বিশ্বের উন্নত দেশে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার বালুচরি শাড়ি রপ্তানি করা হয়।

পশমশিল্প :

বাঁকুড়া শহরে লোকপুরে পশমশিল্প তথা পশমের কম্বল, আসন প্রভৃতি তৈরির কেন্দ্র। কেন্দুয়াডিহি এবং লোকপুরে আড়াই শো ভকতদের বাস। একদা এখানে পঞ্চাশ হাজার ভেড়া পালন করা হত। ভেড়ার লোম থেকে সুতা, সুতা থেকে কম্বল বুনে সংসার চলত। একবার ভেড়ার মড়ক লাগায় বিশ হাজার ভেড়া মারা যায়। এখন ভেড়ার সংখ্যা কমেছে, পশম উৎপাদন কমেছে। তাছাড়া উন্নত প্রযুক্তির অভাবে কম্বলের মান উন্নত না হওয়ায় চাহিদা কমে যাচ্ছে। শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চলছে। শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখতে হলে উন্নত প্রজাতির ভেড়া পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নতমানের ভেড়া থেকে উন্নতমানের লোম পাওয়া যাবে। উন্নতমানের লোম থেকে উৎকৃষ্টমানের কম্বল কার্পেট প্রভৃতি নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। লোকপুর পশম শিল্প সমবায় সমিতিটি দীর্ঘদিন কাজ-কারবার বন্ধ করে বসে আছে। নিজস্ব বিল্ডিং রয়েছে। নিজস্ব জমির উপর রাস্তার ধারে চার-পাঁচটি স্টল ভাড়া দেওয়ার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে। যাই হোক, এই পশম শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জেলার আর্থিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

মৃৎশিল্প :

অন্যান্য জেলার মতো বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে কুম্ভকারদের বাস। হাঁড়ি, কলসি, সরা, প্রদীপ, খুলি প্রভৃতি কৃষক পরিবারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। অপরদিকে জেলার চাহিদা মিটিয়ে জেলার বাইরে রপ্তানি করা হয় এমন টেরাকোটা বা পোড়ামাটির দ্রব্যসামগ্রী বাঁকুড়া
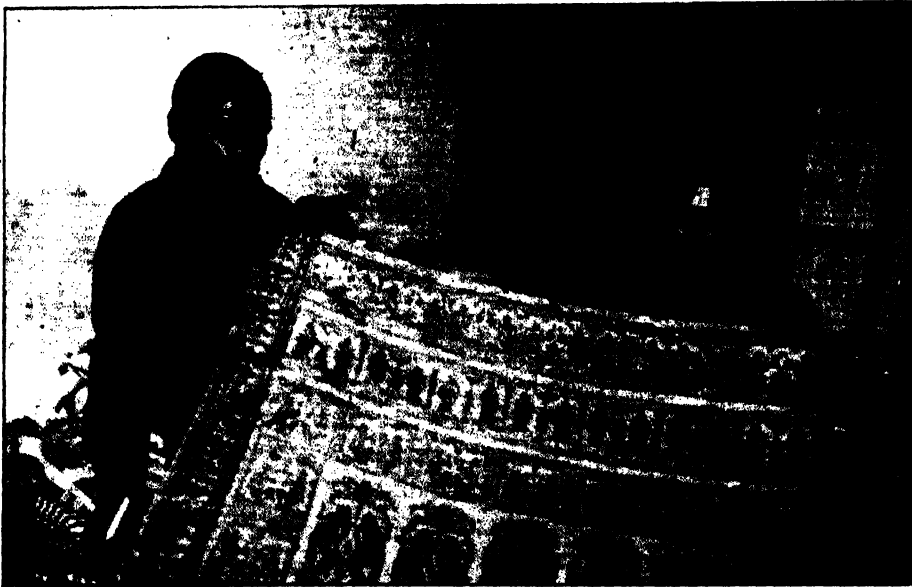
বিষ্ণুপুরের বালুচরি শাড়ি বাঁকুড়াকে দেশে-বিদেশে মর্যাদার স্থানে বসিয়েছে।

কেন্দুয়াডিহি ও লোকপুরে উন্নত প্রজাতির ভেড়াপালনের মাধ্যমে পশম শিল্পের সম্ভাবনা সত্ত্বেও উন্নত প্রযুক্তির অভাবে পশম উৎপাদন কমেছে

জেলার বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয়। সেগুলো হল ঘরের ছাদের টালি, জলনিষ্কাশনের পাইপ বা নল, দেওয়াল বা মন্দির গাত্রে বসানো টেরাকোটার টালি, ঘোড়া, হাতি, মনসার ঝাড় প্রভৃতি। প্রাচীর গাত্রে বা মন্দিরের দেওয়ালে যে সব টালি বসানো হয় সেই সব টালিতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী চিত্রিত থাকে। এই সব রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। ছাদের টালি এবং জলের পাইপ বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার মুরলু গ্রামে উন্নতমানের তৈরি হয়। এই টালি রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যেও রপ্তানি করা হয়। দেশ-বিদেশে বিত্তবান ব্যক্তিদের ঘর সাজানোর টেরাকোটার দ্রব্যসামগ্রী হল— ঘোড়া, হাতি, বাইসন, মনসার ঝাড়, শঙ্খ প্রভৃতি। বাঁকুড়ার ঘোড়া আন্তর্জাতিক বাজারে ছুটে বেড়াচ্ছে। কম গর্বের কথা নয়। পাঁচমুড়ার গণপতি কুম্ভকারের মাটির শাঁখে ফুঁ দিলে স্বাভাবিকভাবে বেজে উঠে। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া, সেন্দরা, রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ঘোড়া, হাতি, মনসার ঝাড় প্রভৃতি টেরাকোটার দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণ করা হয়। একটি আনন্দের খবর হল Central Cottage Industries Corporation বাঁকুড়ার ঘোড়াকে 'লোগো' হিসাবে গ্রহণ করেছে।

চীনা মাটির দ্রব্য :

চীনা মাটির দ্রব্যসামগ্রী কাপ, ডিস, প্লেট, ফুলদানি প্রভৃতি বাঁকুড়া জেলায় পাঁচমুড়া, বড়জোড়া প্রভৃতি স্থানে তৈরি করা হচ্ছে। পাঁচমুড়ায় সিরামিক কারখানা স্থাপিত হওয়ায় কুম্ভকার শিল্পীগণ কাজের সুযোগ পেয়েছে। জেলার চাহিদা মিটিয়ে চীনা মাটির দ্রব্য অন্যত্র রপ্তানি করা হচ্ছে।

ধাতু শিল্প :

মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধাতু তথা—তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ, লৌহ প্রভৃতি আবিষ্কার এক-একটি অগ্রগতির সোপান। বাঁকুড়া জেলায় এইসব ধাতুকে অবলম্বন করে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে কর্মকার সম্প্রদায়ের বাস। প্রাচীনকাল থেকে কর্মকার শ্রেণী বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন জিনিস গড়ে আসছে। বিভিন্ন কাজের উপযোগী লোহার কোদাল, কাস্তে, কাটারি, হাতুড়ি, কুড়ুল, লাঙ্গলের ফলা এখন আবার লোহার লাঙ্গল, লোহার চাকা, বঁড়শি, হেঁসো, টাঙ্গি, দাঁড় কোদাল, খুরপি, রামদা, ক্যাচা, ত্রিশূল, প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী কর্মকার সম্প্রদায় তৈরি করে আসছে।

পিতল :

পিতলের কাজ তিন ধরনের হয়—(১) বিষ্ণুপুর, জি ঘাটি, লক্ষ্মী সাগর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে পিতল ঢালাই করা হয়, (২) বিষ্ণুপুর এবং অন্যান্য স্থানে পিতলের শিট বা চাদর তৈরি করা হয়। শিট বা চাদর থেকে ঘট, ঘোড়া প্রভৃতি তৈরি করা হয়, (৩) ডোকরা শিল্প বাঁকুড়া শহর থেকে ২/৩ কিলোমিটার দূরে বিকনায় ৩০/৩৫টি

বর্তমানে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীরা যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করছেন

টেরাকোটা বা পোড়ামাটির দ্রব্যসামগ্রী বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয়। সেগুলো হল ঘরের ছাদের টালি, জলনিষ্কাশনের পাইপ বা নল, দেওয়াল বা মন্দির গাত্রে বসানো টেরাকোটার টালি, ঘোড়া, হাতি, মনসার ঝাড় প্রভৃতি। প্রাচীর গাত্রে বা মন্দিরের দেওয়ালে যে সব টালি বসানো হয় সেই সব টালিতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী চিত্রিত থাকে। এই সব রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

ডোকরা শিল্পী পরিবারের বাস। সরকারি সাহায্যে এদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিল্প কাজে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। পিতলের হাতি, ঘোড়া, লক্ষ্মী, প্যাঁচা, গণেশ, নারায়ণ, মনসা, ময়ূর প্রভৃতি নানা ধরনের শিল্প গড়ে থাকে। ডোকরা শিল্পসামগ্রীর চাহিদা প্রচুর। রাজ্যে, রাজ্যের বাইরে এবং বিদেশে ডোকরা শিল্প দ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

কাঁসার বাসন :

কাঁসার বাসন বাঁকুড়া জেলার একটি প্রাচীন শিল্প। এক সময় ছিল সারা বাঁকুড়া জেলায় কাঁসার বাসন—থালা, বাটি, ঘটি, কলসি, গ্লাস, হাঁড়ি, কড়া, বালতি প্রভৃতি গৃহস্থালী দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হত। বর্তমানে স্টেনলেস স্টিলের থালা, বাটি, প্রভৃতি বাসনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কাঁসার বাসনের চাহিদা কমে গেছে এবং কাঁসার বাসন শিল্পের অবনতি ঘটেছে। বাঁকুড়া শহরের দোলতলা, লালবাজার, নতুনগঞ্জ, ঘটকপাড়া, কেঞ্জাকুড়া, হেলনা, শুশুনিয়া, মগরা, মানকানালী ওন্দায়—চাবড়া, সাকলাই, চৌতার, বিষ্ণুপুরে মুকুটগঞ্জ, অযোধ্যা, কৃষ্ণগঞ্জ, কাইতিপাড়া, চুয়ামনসা, গোপালগঞ্জ, ইন্দপুরে—গুণনাথ, ছাতনায়—মুর্গা থোল শুশুনিয়া, শিমুলবেড়িয়া, গারুলিয়া, লক্ষ্মণপুর, মরাইবাঁধ, গঙ্গাজলঘাটিতে—দেশুরিয়া, সালবেদিয়া, নিত্যানন্দপুর নতুনগ্রাম, গোপীনাথপুর, বড়জোড়ায়—মালিয়াড়া। কুচকুরা, মনোহার, গদারডিহি, ঘুটগড়িয়া, তাজপুর, বেলিয়াতোড়, শালতোড়ায়—পাবড়া, খাগরা, ইবন, পাত্রসায়েরে—পাত্রসায়ের, সিমলাপাল, পুকুরিয়া, লক্ষ্মীসাগর, খাতড়ায়—বেনা, লালবাজার, শ্যামনগর, মালিয়ান গুইয়ানালা প্রভৃতি। বর্তমানে কয়েকটি স্থানে অ্যালুমিনিয়াম এবং জার্মান সিলভারের বাসন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বিষ্ণুপুরে জার্মান সিলভারের বাসন তৈরি হচ্ছে। বহু শিল্পী কাঁসার বাসনের কাজ ছেড়ে দিয়ে বাধ্য হয়ে অন্য কাজ ধরছে। বাঁকুড়া জেলায় কয়েকটি নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন—মাছ ধরা বঁড়শি, পাথর শিল্প, বাঁশ শিল্প, দারুশিল্প প্রভৃতি। কেঞ্জাকুড়ায় দুটো কাঁসা গলানো কারখানা স্থাপিত হওয়ায় বিশাল এলাকায় বহু বাসন শিল্পীর বেশ সুবিধা হয়েছে। বাঁকুড়ায় বাসন শিল্পীদের আর্থিক সহায়তাদানে জেলা শিল্প দপ্তর সদা তৎপর।

বঁড়শি শিল্প :

বাঁকুড়ায় বঁড়শি শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কাঁসা, পিতল শিল্পের বাসনের চাহিদা কমে যাওয়ায় কর্মকার শিল্পীগণ বঁড়শি শিল্পকে জীবনজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। বঁড়শি শিল্পের মূল কেন্দ্র হল বড়জোড়ার ঘুটগড়িয়া গ্রামে। এই ঘুটগড়িয়াকে কেন্দ্র করে সোনামুখী, জি ঘাটি, মেজিয়া, বাঁকুড়া, ছাতনা প্রভৃতি স্থানে বড়শি তৈরি করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা বঁড়শি উৎপাদনের ১০০ ভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বিনিময়ে অর্জিত হয় বিদেশি মুদ্রা। ১৯২৬ সালের আগে ঘুটগড়িয়ায় ছাতার তারে Tank Fishing Hook তৈরি করা হত পুকুর, দিঘি, বা জলাশয় মাছ ধরার জন্য। জানা যায় কোন ইংরেজ সাহেব ঘুটগড়িয়া দেশি কাঁটার পরিবর্তে টমসন হুক তৈরি করার প্রস্তাব দেন। শিল্পীগণ টমসন হুক তৈরি করতে রাজি হয়ে যায়। তখন টমসন হুকের প্রতি হাজারের মজুরি ছিল ২ টাকা। ২ টাকার মূল্য অনেক। ফলে বহু শিল্পী এই শিল্পকে জীবনজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। বর্তমান ঘুটগড়িয়ায় লৌহ শিল্প সমবায় সমিতির পরিচালনায় বঁড়শি তৈরি হলেও বহু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী এই শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং বিপণনের সুব্যবস্থা করে চলেছে। ফলে, বঁড়শি শিল্পে চার-পাঁচ হাজার শিল্পী তাদের রুজি-রোজগারের সংস্থান করতে সক্ষম হচ্ছে। বঁড়শি শিল্পে উন্নতি সাধনের জন্য বড়জোড়া পঞ্চায়েত সমিতি, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ, জেলা নেতৃত্ব সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া CAPART, NISTADS, CMERI দুর্গাপুর, NISI, CSIR, DRDA, DIC প্রভৃতি সংস্থা বঁড়শি শিল্প তথা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করে আসছে। বঁড়শি শিল্পের প্রসার, প্রচার এবং ব্যাপকতার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

বিষ্ণুপুরের লণ্ঠন :

লণ্ঠন তৈরি হয় টিনের শিট বা চাদর দিয়ে। বিষ্ণুপুরে লণ্ঠন শিল্পে বহু মানুষ নিযুক্ত আছেন। টিনের পাত কেটে বিভিন্ন ধরনের লণ্ঠন তৈরি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যে এই লণ্ঠনের চাহিদা প্রচুর।

কাঠের ঘোড়া :

বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া, সেন্দরা, রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থানের তৈরি টেরাকোটা ঘোড়ার কথা আমরা জানি। কিন্তু ওইসব ঘোড়া পরিবহণ বা স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা। কিন্তু কাঠের ঘোড়ার ক্ষেত্রে সে সব অসুবিধা থাকে না। তাই টেরাকোটা ঘোড়ার অনুকরণে কাঠের ঘোড়ার উদ্ভব ষাটের দশকে। শুধু ঘোড়া নয় হাতি, বাইসন, উট, মানুষ, পশুপক্ষী কাঠের তৈরি করা হচ্ছে। ঘর সাজানো, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিনে উপহার প্রভৃতি দেওয়া রুচিসম্মত। বর্তমানে বাঁকুড়ার বিভিন্ন

চীনামাটি ও সিরামিক শিল্প বাঁকুড়া থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে

স্থানে এইসব কাঠের জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু প্রথম শুরু হয় বাঁকুড়া শহরে রামপুরে, তারপর জগদ্দলা, গোড়াবাড়ি, কমরার মাঠ, বনকাটি, কেঞ্জাকুড়া, খাতড়া, কাটজুড়িডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প তৈরি শুরু হয়। এই শিল্পে বহু শিল্পী নিযুক্ত আছে। শিল্পীদের প্রশিক্ষণ আর্থিক সহায়তাদানে DIC, DRDA এবং জেলা পরিষদ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। এই শিল্পের দ্রব্য সামগ্রীর দিল্লি, বোম্বাই, চেন্নাই প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর চাহিদা, এমনকি বাঁকুড়ার ঘোড়া বিদেশে চালান যাচ্ছে।

বাঁশ শিল্প :

বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা শিল্পসামগ্রী মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার করে আসছে। বাঁশ থেকে ঘরবাড়ি, লাঠি, বাঁশি, ধনুক, আকশি, মই, সিঁড়ি, কপাট, ঝুড়ি, ছিপ, ফুলসাজি, ঘুনি প্রভৃতি নানা দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা হয় এবং সংসারের নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কুটির শিল্পের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং নতুন শিল্প নৈপুণ্য। এখন বাঁশের তৈরি ঘর সাজাবার নানা ধরনের সৌখিন জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। তৈরি করা

বাঁশশিল্প বাঁকুড়া জেলায় ক্রমশ প্রসার লাভ করছে

পার্বনে ও উৎসবে শালপাতার থালাবাটির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান ঘটছে

হচ্ছে বাঁশের ডেট ক্যালেন্ডার, গরুর গাড়ি, পেখম তোলা ময়ূর, ঘোড়া, ফুলঝুড়ি, তালগাছ, পাল্কি, রামসীতা। সারদা, ফুলের টব, আরও কত কি। স্থানীয়ভাবে এসব জিনিসের চাহিদা তো আছেই। এছাড়া ভারতের নানা প্রদেশে বাঁকুড়ার তৈরি দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করা হচ্ছে। প্রথমে ছান্দারের অভিব্যক্তিতে কয়েকজন যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপর কেঞ্জাকুড়া খাতড়া ও বাঁকুড়ার নানা স্থানে এই শিল্পটি প্রসার লাভ করে। বর্তমানে বহু যুবক-যুবতী এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

বেলমালা :

বেলমালা বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী একটি কুটির শিল্প। জেলার প্রতিটি ব্লকে বিভিন্ন গ্রামে বেলমালা তৈরির কাজ হয়। তবে বিষ্ণুপুরের নিকটে দ্বারিকা, লাট বেলিয়াড়া, বামুনবাঁধ, জামডহর, চাপড়া, ইন্দপুর থানার দুটি গ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে বেলমালা তৈরি করা হয়। ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাঁটি, বড়জোড়া, জয়পুর, রাইপুর, পাত্রসায়ের, সোনামুখী প্রভৃতি ব্লকে বেলমালা তৈরির কাজ সারা বছর ধরে চলে। বাঁকুড়া-১ এবং বাঁকুড়া-২ ব্লকে কিছু কিছু বেলমালার কাজ হয়ে থাকে। দ্বারিকা এবং লাট বেড়িয়ালা গ্রামে মুসলিমদের বাসই অধিক। এই দুটি গ্রামে শতকরা ৯০টি পরিবার বেলমালার উপর নির্ভরশীল। উৎপাদিত বেলমালার প্রায় সম্পূর্ণটাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে তীর্থস্থানগুলিতে বিক্রি হয়। কিছু বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। উল্লেখ্য, লক্ষ লক্ষ টাকার এই ব্যবসা পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের কবজায়। গোটা বেল আমদানি এবং বেল থেকে উৎপাদিত মালার বিপণন সবই ব্যবসায়ীদের ব্যবস্থাপনায়।

বাবুই দড়ি :

বাঁকুড়ার রাণীবাঁধ এবং তৎসংলগ্ন এলাকার বাবুই চাষ হয়। অরণ্য বা পাহাড়ি অঞ্চলে বাবুই চাষের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। বাবুই চাষের সঙ্গে বাবুই দড়ি শিল্পের বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। বাবুই দড়ির চাহিদা জেলায় এবং জেলার বাইরে যথেষ্ট রয়েছে। বাবুই দড়ি শিল্পকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারলে জেলার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

শালপাতার থালা-বাটি :

শালপাতার ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। পাঁচ-ছটি শালপাতা গোল করে সাজিয়ে ছোট কাঠি দিয়ে গেঁথে থালা হিসাবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু ইদানিংকালে মেসিনের সাহায্যে প্রেসার দিয়ে থালার চারদিকে গোল করে উঁচু করা হচ্ছে। এইভাবে বাটিও তৈরি করা হচ্ছে। এই ধরনের থালা এবং বাটি দেখতে ভালো, এতে খেতে ভাল, ডাল-ঝোল পাতা থেকে গড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। পূজা-পার্বণ, উৎসবে বিবাহে, ভোজে এই ধরনের থালা ব্যবহার ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে, ফলে শালপাতার থালা-বাটির চাহিদা বেড়ে গেছে। বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ এবং অন্যান্য অরণ্য এলাকায় শালপাতার থালা-বাটি তৈরি করা হচ্ছে। স্বল্প মূলধনে শালপাতার থালা-বাটি তৈরি গ্রামীণ এলাকার কিছু মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানে সহায়ক। বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পের প্রসার ঘটবে।

লাক্ষা শিল্প :

লাক্ষা বাঁকুড়ার কৃষিভিত্তিক একটি শিল্প, খাতড়া-১, হিড়বাঁধ, রাণীবাঁধ ইন্দপুর, ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, জিঘাটি, বাঁকুড়া-১ প্রভৃতি মোট ১০টি ব্লকে লাক্ষা চাষ হয়। সরকারিভাবে ১২টি কেন্দ্রে লাক্ষা উৎপাদন করা হয়। খাতড়া ও ছাতনায় লাক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। প্রতি বৎসর প্রতি কেন্দ্র থেকে দশজন যুবককে লাক্ষা চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাঁকুড়া জেলায় প্রতি বৎসর লাক্ষা উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২০০ মেট্রিক টন। পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বেসরকারিভাবে লাক্ষা চাষীদের আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হয়।

খড় শিল্প :

খড়ের দড়ি, চাটাই, ধান-চাল রাখার পালই, প্রভৃতি শিল্প-সামগ্রীর প্রসার হয়। খড় দিয়ে তৈরি সমতল ভূমির উপর আঁকা হচ্ছে—রামকৃষ্ণ, মা সারদা, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি এবং এই শিল্পের বাজার ও চাহিদা তৈরি হয়েছে। এটিও একটি পারিবারিক শিল্প। খড় শিল্পের চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা বড়জোড়া থানার অন্তর্গত মালিয়াড়া গ্রামে মিশ্র পরিবার। এই শিল্পের প্রসার ঘটছে। বিভিন্ন মেলা, প্রদর্শনীতে ছবি বিক্রি হচ্ছে। এই শিল্পে তৈরি দুর্গা প্রতিমা, রাঁচি, ধানবাদ, টাটা, বোকারো প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা হচ্ছে। এমনকি বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। এই শিল্পের প্রসারের জন্য DRDA-এর পক্ষ থেকে যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র প্রত্যন্ত গ্রাম জুড়ে তাঁতিদের বাস।
তবে কেঞ্জাকুড়া, রাজগ্রাম, বিষ্ণুপুর,
সোনামুখী, গোপীনাথপুর জামবেদিয়া, রাজার বাগান,
মদনমোহনপুর, লক্ষ্মীসাগর প্রভৃতি গ্রামে
তন্তুবায়দের বসবাস অধিক।
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় পর্যন্ত
বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে রাজগ্রামে,
কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি স্থানে বন্দর ছিল।
কৃষিজাত, শিল্পজাত দ্রব্য, পিতল-কাঁসার বাসন,
তাঁতবস্ত্র প্রভৃতি নৌকোয় করে ঘাটালে
পাঠানো হত। বিনিময়ে আনা হত
তুলা, সুতা, মশলা এবং
বাসনপত্র ও লোহার
সরঞ্জাম তৈরির
কাঁচামাল ও অন্যান্য
দ্রব্যসামগ্রী।
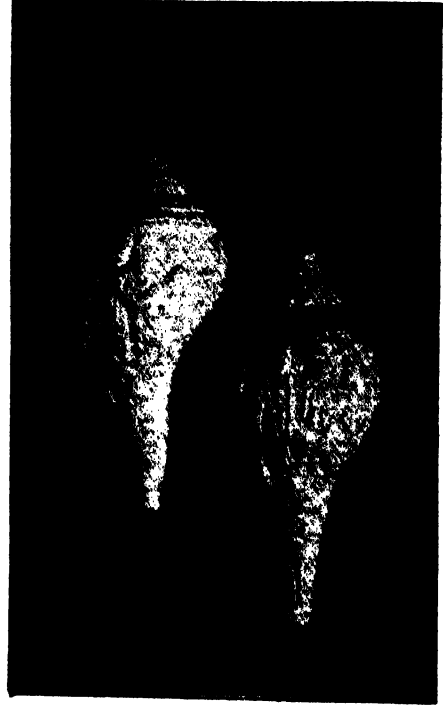
দশাবতার তাস :

দশাবতার তাস তৈরি কুটির শিল্পের অংশ হলেও নামের মধ্যে যতখানি গুরুত্ব রয়েছে আর্থিক ব্যাপারটা ততখানি নয়। দশাবতার তাস বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রাজাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি শিল্প। বাঁকুড়া ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনখানে দশাবতার তাস তৈরি হয় কিনা জানা নেই। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজার আমল থেকে দশাবতার তাসের প্রচলন। দশাবতার তাসের খেলা মল্লরাজগণ মন্ত্রী, পারিষদদের নিয়ে খেলতেন।এই তাসের খেলা খুবই জটিল। বর্তমানে বিষ্ণুপুরে একটি কি দুটি পরিবার আছে ফৌজদার পরিবার। এই ফৌজদার পরিবার দশাবতার তাস তৈরি করতে পারে। দশাবতার তাসের চাহিদা সীমিত। বোম্বাই, দিল্লি, প্রভৃতি শহরে এবং বিদেশে এর চাহিদা। গবেষক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে দশাবতার তাস ভারতবর্ষের এবং এমনকি পৃথিবীর আদিমতম তাস খেলার পদ্ধতি। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কি এই দশাবতারের রূপ বা প্রতীক নিয়ে তাসের শ্রেণী বিভাগ। প্রতি শ্রেণীতে ১২টি করে মোট তাসের সংখ্যা একশত কুড়ি। উল্লেখ্য দশাবতার তাসের খ্যাতির জন্য দেশবিদেশের বহু গবেষক বিষ্ণুপুরে ফৌজদার পরিবারের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে।

শঙ্খ শিল্প :

শঙ্খ থেকে শাঁখা। হিন্দুর ঘরে হাতের শাঁখা হল সধবা রমণীর ভূষণ। বহু প্রাচীনকাল থেকে এই রীতি চলে আসছে। কাজেই শঙ্খ শিল্পটি যে খুবই প্রাচীন তা সহজে অনুমান করা যায়। বাঁকুড়া জেলায়

বাঁকুড়ার শঙ্খশিল্প খুবই প্রাচীন। শাঁখা তৈরি ছাড়া শঙ্খের গায়ে সূক্ষ্ম পৌরাণিক চিত্রাঙ্কণে এর শিল্পমূল্য বহুগুণ বেড়ে যায়

বাঁকুড়া শহরে, বিষ্ণুপুর শহরে এবং ইন্দপুর থানার হাটগ্রামে শঙ্খ শিল্প বা শাঁখারিদের বসবাস, কয়েকশত পরিবার শঙ্খ শিল্পের আয়ের উপর নির্ভরশীল। শঙ্খ থেকে তৈরি করা হয়—শাঁখা, আংটি, গলার হার, চাবির রিং প্রভৃতি। তাছাড়া বহু দক্ষ শিল্পী আছেন, যাঁরা শঙ্খের উপরিভাগে রামরাবণের যুদ্ধ কিংবা কুরু-পাণ্ডবের বা অন্য কোনও পৌরাণিক চিত্র সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে খোদাই করতে পারেন। সময় লাগে এক মাস দু'মাস। শঙ্খের দাম দাঁড়ায় পাঁচ-ছয় হাজার টাকা।

শঙ্খ শিল্পের কাঁচা মাল হল শঙ্খ। শঙ্খ আমদানি করতে হয় তামিলনাড়ু রাজ্য থেকে। রাজ্য সরকার মঞ্জুষার মাধ্যমে শঙ্খ আমদানি ব্যবস্থা করায় শঙ্খ শিল্পীদের কিছুটা সুবিধা হলেও প্রয়োজনমত এবং সময়মত শঙ্খ পাওয়া যায় না। কাজেই শঙ্খ শিল্পীদের ভাগ্য শঙ্খ আমদানির উপর নির্ভর করে। তবে শঙ্খ শিল্পীদের উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা জেলার এবং জেলার বাইরে যথেষ্ট।

পাথর শিল্প :

পাথরের ব্যবহার সেই পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে। বাঁকুড়ায় পুরাতন প্রস্তর যুগের এবং নব্য প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। বর্তমানে বাঁকুড়ায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাথরের নানা ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। সারা জেলায় তিন-চারশো পরিবার পাথরের উপর নির্ভরশীল। শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে কর্মকার শিল্পীদের বসবাস বেশি। আগে এখানে কাঁসা-পিতলের কাজ হত। কাঁসা-পিতলের কাজ এখন প্রায় বন্ধ। কর্মকার শিল্পীগণ কাঁসা-পিতলের পরিবর্তে শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথরকে অবলম্বন করে বেঁচে আছেন। শুধু কর্মকার নয়, রাজপুত, বাউরি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, তাম্বুলি প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষও পাথরের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। বাঁকুড়ার

বস্ত্রশিল্পের জন্য সুতো তৈরির কাজ চলছে

তালডাংরা, রাইপুর, মটগোদা প্রভৃতি স্থানে পাথর শিল্পের কাজ হলেও শুশুনিয়ায় পাথর শিল্পের কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে শুশুনিয়া পাহাড়ে সারা বছর ধরে পর্যটকদের আগমনহেতু শুশুনিয়ায় পাথর শিল্পের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাথরে তৈরি হয় থালা, বাটি, গ্লাস, প্রদীপ, প্রদীপদানি, ধূপদানি, চন্দনপেড়ি, শীল-নোড়া প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। তাছাড়া ঘর সাজানোর জন্য নানা দেবদেবীর মূর্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী, ছিন্নমস্তা, রামকৃষ্ণ, সারদা, বিবেকানন্দ, প্রভৃতি। বিভিন্ন মূর্তি স্থাপনের জন্য ৫/৬ ফুট মাপের মূর্তি তৈরি করা হয়। এক-একটি মূর্তির দাম আট-দশ হাজার টাকা। পাথর শিল্পের চাহিদা সর্বত্র।

গ্লাবস ও খাদি বস্ত্র :

বাঁকুড়া জেলার গ্রামোন্নয়নে গান্ধী বিচার পরিষদ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শহরের গলি এবং প্রত্যন্ত গ্রামের বহু দুঃস্থ মহিলা ও পুরুষ তাদের জীবন-জীবিকায় রুজি-রোজগারের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। গান্ধী বিচার পরিষদের কর্মকাণ্ডে গ্লাবস তৈরি এবং খাদি বস্ত্র উৎপাদন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বছরে কয়েক লক্ষ টাকার গ্লাবস তৈরি করে বেশ কিছু যুবক-যুবতী। গ্লাবস সুতার এবং চামড়ার হয়। উৎপাদিত গ্লাবসের সবটাই জেলার বাইরে দুর্গাপুর, বার্নপুর এবং অন্যান্য কারখানায় সরবরাহ করা হয়। কাঁচামাল কেনা হয় কলকাতা থেকে।

বাঁকুড়ায় গান্ধী বিচার পরিষদ সুতা উৎপাদনসহ খাদির বস্ত্র উৎপাদনে এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। স্কুলডাঙ্গায় ২৫টি স্পিনিং মেসিনে ২১ জন মহিলা সারা বছর ধরে খাদি সুতা উৎপাদন করে চলেছে। কিছু কিছু গ্রামেও মহিলারা এ ধরনের মেসিনে সুতা তৈরি করছে। উৎপাদিত সুতার কিছু অংশ বাইরে পাঠানো হচ্ছে। বাকি সুতা বিভিন্ন গ্রামে তাঁতিদের দিয়ে খাদি বস্ত্র উৎপাদন করা হচ্ছে। দশ-বারোটি গ্রামে ২০/২৫টি তাঁত গান্ধী বিচার পরিষদের পরিচালনায় চলছে। এসব তাঁতে তৈরি হচ্ছে খাদির থান, ধুতি, লুঙ্গি, গামছা, টেবিলক্লথ, পর্দার থান, বেডসিট, বেডকভার, রুমাল প্রভৃতি।

গান্ধী বিচার পরিষদের নিজস্ব টেলারিং সেকসন রয়েছে। খাদি সার্ট, কোর্ট, পাজামা, পাঞ্জাবি প্রভৃতি রেডিমেড পোশাক তৈরি করা হচ্ছে। স্কুলডাঙ্গার খাদির নিজস্ব সেলস এম্পোরিয়াম রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত শিল্পগুলি ছাড়া বাঁকুড়া জেলায় আরও কিছু কুটির শিল্প আছে। সেগুলি হল—চর্মশিল্প, মৌমাছি পালন, মধু ও মধুজাত দ্রব্য, অলংকার, বই বাঁধাই, শোলা শিল্প, পটচিত্র, মিস্টান্ন শিল্প, দড়ি শিল্প, বল, তালপাতার পাখা, ঝাঁটা, চাটাই, তালাই প্রভৃতি। বাঁকুড়া জেলার এইসব কুটির শিল্প বহু খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন কাঠি। জেলাজুড়ে বহু মানুষের রুজি-রোজগারের অবলম্বন। জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে, মানুষের জীবিকা অর্জনে কুটির শিল্পগুলির গুরুত্ব অসীম। বাঁকুড়ার শিল্পজাত দ্রব্য বাঁকুড়ার তথা পশ্চিমবঙ্গের সম্মান দেশবিদেশে তুলে ধরছে। এর জন্য আমরা গর্বিত।

পরিশেষে আর একটি বিষয় না বলে থামতে পারছি না। তা হল বাঁকুড়ার কুটির শিল্পের বহু দক্ষ শিল্পী আছেন, যাঁরা জাতীয়স্তরে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে হলেন—অশ্বিনী নন্দী (বিষ্ণুপুর, শঙ্খের উপর খোদাই), বংশীধর মণ্ডল (হাটগ্রাম শঙ্খের জন্য) রঞ্জিত কর্মকার (বাঁকুড়া শোলার কাজ), সনাতন কর্মকার (শুশুনিয়া পাথর খোদাই), ধ্রুব নন্দী (বিষ্ণুপুর শাঁখের কাজ), রাসবিহারী, কুম্ভকার (পাঁচমুড়া-টেরাকোটা) আরও অনেকে। আরও একটি গর্বের বিষয় ১৯৯৬-৯৭ সালে পশ্চিমবাংলায় ১৫টি কুটির শিল্পে জাতীয় পুরস্কারের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা একাই ছিনিয়ে আনে পাঁচটি। এঁরা হলেন (১) যুদ্ধ কর্মকার (বিকনা—ডোকরা শিল্প), নয়ন কর্মকার (শুশুনিয়া—পাথর খোদাই), সুবোধ দত্ত (শাঁখের কাজ), গোপাল নন্দী (নারিকেল মালার উপর খোদাই) ও কালীপদ কুম্ভকার (সেন্দরা—টেরাকোটা)।

লেখক : সম্পাদক—রাঢ় অ্যাকাদেমি, কাটজুড়িডাঙ্গা ও মুখপত্র লোকায়ত সংস্কৃতি

বাঁকুড়ার তাঁতশিল্প

হরিসাধন চন্দ্র

বাঁকুড়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তসরগুটি উৎপাদন থেকে শুরু করে
তা থেকে তন্তু নিঃসরণ, ওই তন্তুকে বয়নোপযোগী করে আবার
পাক দেওয়া (কাপড়ের মান বা প্রকৃতি অনুযায়ী একাধিক তন্তু একত্রে নিয়ে)
তা থেকে তসর থান তৈরি করা প্রভৃতি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত।
তবে তসরের সুতো প্রস্তুত পর্যন্ত পর্যায়গুলিতেই তাদের
অংশগ্রহণ সর্বাধিক—এমনকি বলা যায় একচেটিয়া।

বাঁকুড়ার কুটিরশিল্পের মধ্যে বয়নশিল্প তথা তন্তুশিল্প, মৃৎশিল্প—বিশেষত ঘোড়া তৈরি, কাঠ ও বাঁশের কাজ—এগুলিই উল্লেখ করা যায়। বেশ কিছু দিন আগে এখানে নানা অঞ্চলে গালার প্রক্রিয়াকরণও হত। এছাড়া কয়েকটি অঞ্চলে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। তবে অন্যতম প্রধান কুটিরশিল্প হিসাবে তাঁতশিল্পের উল্লেখ করা যায়।

বহু বছর ধরেই অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই জেলার তন্তুবায় সম্প্রদায়ের এই বয়নশিল্পভিত্তিক জীবিকা অব্যাহত।

বাঁকুড়ার তাঁতশিল্পকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) রেশম ও তসরশিল্প (খ) পরিধেয় সুতিবস্ত্রশিল্প (গ) গামছাশিল্প।

তবে এ জেলার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক পরিমাণে জীবিকারূপে গৃহীত রেশম ও তসর শিল্প। এই শিল্পটিকেও আমরা দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করতে পারি ঃ (১) তসরশিল্প ও (২) রেশম শিল্প (মালবেরি)। আসলে তসরও একধরনের রেশম—তবে ওটা তুঁতগাছে চাষ করা হয় না। প্রচলিত অর্থে রেশম বলতে মালবেরি রেশম অর্থাৎ তুঁতগাছে চাষ করা রেশমকেই বোঝায়। বাঁকুড়ার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এসবের উপর নির্ভর করে এখানে রেশমগুটির তুলনায় তসরগুটির চাষই অধিকতর বিকাশলাভ করেছে—গুণগত ও পরিমাণগত উভয়দিক থেকেই। আসলে শাল-অর্জুন প্রভৃতি গাছে স্বাভাবিক আরণ্যক পরিবেশে তসরগুটি তৈরি হয়। এই ধরনের আরণ্যক পরিবেশ বলাই বাহুল্য বাঁকুড়ার বহুস্থানেই সুলভ। তবে এই তসরগুটি উৎপাদনের ব্যাপারটি সর্বাপেক্ষা বিকাশলাভ করেছে দক্ষিণ বাঁকুড়ায়—খাতড়া মহকুমার নানা অঞ্চলে। অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল বড়জোড়া, ছাতনা, শালতোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, কোতুলপুর, চাতরা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় মোট ৭৩৫০ একর জমিতে এই তসরের চাষ হয় এবং এই জীবিকায় যুক্ত ৮৯৪৫ জন। তসর-মথ (অ্যান্থেরিয়া মাইলিটা) শাল-অর্জুনের ঘন সবুজের সমারোহে নিরুপদ্রব পরিমণ্ডলে উক্ত গাছের পাতায় বসে ঘুরে ঘুরে ডিম পাড়ে। তা থেকে উৎপন্ন লার্ভা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পাতা খেতে খেতে আকৃতিতে বড় হতে হতে একসময় গুটি নির্মাণ শুরু করে নিজের মুখনিঃসৃত প্রোটিনসমৃদ্ধ লালা দিয়ে। গুটির ভিতরে ঘটে পিউপা দশার নানা পর্যায়। তাদের লালা জমাট বেঁধে বেঁধে সূক্ষ্ম তন্তু আকারে বার বার তাদের নিজেদের দেহের চারদিকে আবৃত হতে হতে এই গুটি সৃষ্টি করে। বাঁকুড়ার শুধু শাল-অর্জুনের জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকাই নয়—এখানকার রুক্ষ ভূপ্রকৃতি, শুষ্ক জলবায়ু (বিশেষত দক্ষিণ বাঁকুড়ায়), তাপমাত্রা প্রভৃতি তসরগুটি উৎপাদন এবং তসর বয়নশিল্প উভয়ের পক্ষেই অনুকূল। বছরে তিনবার এই তসরগুটি তৈরি হয়। জুন থেকে জুলাইয়ের শেষ বা আগস্টের প্রথম, আগস্ট থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি এবং তারপর থেকে ডিসেম্বর। তবে শেষোক্ত সময়েই সবচেয়ে বেশি তন্তু উৎপন্ন হয়।

বাঁকুড়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই তসরগুটি

তসর তন্তু প্রস্তুতি চলছে

তসর বয়নে নিমগ্ন তাঁতশিল্পী

তসর গুটি থেকে তসর তন্তু বের করা হচ্ছে

উৎপাদন থেকে শুরু করে তা থেকে তন্তু নিঃসরণ, ওই তন্তুকে বয়নোপযোগী করে আবার পাক দেওয়া (কাপড়ের মান বা প্রকৃতি অনুযায়ী একাধিক তন্তু একত্রে নিয়ে) তা থেকে তসর থান তৈরি করা প্রভৃতি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। তবে তসরের সুতো প্রস্তুতি পর্যন্ত পর্যায়গুলিতেই তাদের অংশগ্রহণ সর্বাধিক—এমনকি বলা যায় একচেটিয়া। তবে বিষ্ণুপুর, ছাতনা, পাত্রসায়ের প্রভৃতি অঞ্চলেও গুটির পরবর্তী পর্যায়গুলি সীমিত পরিমাণে সম্পাদিত হয়। আর তসরের সুতো থেকে তসরের থান তৈরির ব্যাপারটি সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুরের সন্নিহিত অঞ্চলে যেমন জয়কৃষ্ণপুর, জনতা, লয়ের, চুয়ামসিনা, অযোধ্যা (পুরুলিয়ার অযোধ্যা নয়), ঢ্যাঙাশোল প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকভাবেই হয়।

বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে তসর ও রেশমগুটির প্রক্রিয়াকরণ, তন্তু নিঃসরণ, নিঃসৃত তন্তুকে গোটানো প্রভৃতি ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা হয়েছে সরকারি উদ্যোগে ; যেমন বিষ্ণুপুর, পাত্রসায়ের, বড়জোড়া, শালতোড়া, ঝন্টা, ছাতনা প্রভৃতি। তাছাড়া বাঁকুড়া জেলার সদর শহর বাঁকুড়ায় আছে ডেপুটি ডাইরেক্টর অব সেরিকালচার (তসর)-এর অফিস, এছাড়া বিষ্ণুপুরে আছে বিষ্ণুপুর সেরিকালচার কমপ্লেক্স। এই দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠান জেলার রেশম ও তসরগুটি উৎপাদন ও তার প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে জীবিকাসূত্রে জড়িত মানুষদের প্রশিক্ষণ, উৎসাহপ্রদান, উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থায় সাহায্য করা, কখনও কখনও বা সে ব্যাপারে দায়িত্বগ্রহণ করা প্রভৃতি নানাভাবে সাহায্য করে চলেছে।

বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর সেরিকালচার কমপ্লেক্সের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ বর্তমানে বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ি বাংলা তো বটেই, এমনকি বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের নানা প্রান্তে এমনকি বিদেশেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সেজন্য তসর ও রেশমের বাণিজ্যিক চাহিদা অনুযায়ী গুটির উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সুতো তৈরি প্রভৃতি ব্যাপারে গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, চাহিদার সঙ্গে যোগানের সমীক্ষাভিত্তিক সামঞ্জস্য রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে গবেষণাধর্মী চিন্তা-ভাবনা হয় ও তা বাস্তবায়িত করার জন্য এই জীবিকায় যুক্ত মানুষদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুর সেরিকালচার কমপ্লেক্সের আয়তন ৪৮.৭৯ একর। এখানে তসরগুটির চাষ হয় মাত্র ৬.৫৩ একর অঞ্চলে এবং মালবেরি রেশমগুটির চাষ হয় ২৪.২৯৫ একর অঞ্চলে। এর কারণ হল তসরগুটি হয় স্বাভাবিক আরণ্যক পরিবেশে বড় বড় শালগাছে বা অর্জুন গাছে। কিন্তু ফার্মের মধ্যে তার সুযোগ কম। তাই এখানে অর্জুন গাছ লাগিয়ে উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে অল্প পরিমাণে কেবলমাত্র পরীক্ষামুখী ও প্রশিক্ষণমুখী তসরগুটির চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ হয়। এছাড়াও ব্যক্তিগত প্রয়াসে দক্ষিণ বাঁকুড়া ও অন্যান্য অঞ্চলে তসরগুটির চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ হয়ই।

এখন গুটি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যে সুতো পাওয়া যায় তাকে অবিশ্বাস্য পরিশ্রম, ধৈর্য ও শিল্পনৈপুণ্যে বস্ত্রের রূপদান করা হয়। আর সেটাই হল বাঁকুড়ার তসরবয়ন শিল্পের মূল অধ্যায়।

বাঁকুড়া জেলার তসর ও রেশমশিল্পের (বয়ন) জন্য দুটি স্থান সর্বাধিক বিখ্যাত। —একটি হল বিষ্ণুপুর আর একটি হল সোনামুখী।

বিষ্ণুপুর বিখ্যাত বালুচরী শাড়ির জন্য। আর সোনামুখী বিখ্যাত থানের জন্য। তবে সম্প্রতি সোনামুখীতেও বালুচরী তৈরি হচ্ছে—তবে খুবই অল্প পরিমাণে। সাধারণত বালুচরী মালবেরি রেশমেই হয়। তবে বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে তসরের উপরও বালুচরীর কাজ হচ্ছে। কিন্তু তসরকেন্দ্রিক বয়নশিল্পে মূলত তৈরি হয় থান কাপড়—পাঞ্জাবি, শার্ট, চাদর, প্রিন্ট করার জন্য বা কাঁথার সেলাই বা আরও কিছু কিছু আধুনিক রুচিসম্মত বস্ত্রের জন্য তা প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই শিল্পটি বহুদিন ধরেই প্রসারলাভ করেছে মূলত সোনামুখীতে। তবে এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর এবং বাঁকুড়া জেলার অন্যত্র যেখানে যেখানে রেশম ও তসর বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে—সেখানে সেখানে কেবলমাত্র বাঁকুড়ায় উৎপন্ন গুটি বা কোকুন থেকেই প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া যায় না। কারণ বাঁকুড়ায় উৎপন্ন রেশম বা তসর গুটির পরিমাণ বয়নশিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অল্প। সেজন্য বাঁকুড়ার বাইরে থেকেও রেশম বা তসর তন্তু আমদানি

করতে হয় প্রচুর পরিমাণে। সেটা বেশিরভাগই আসে বিহারের চাঁইবাসা থেকে।

সমগ্র বাঁকুড়া জেলার প্রায় ৩৬,০০০ মানুষ বয়নশিল্পের সঙ্গে জড়িত। তার মধ্যে এই রেশম ও তসর বয়নশিল্পের সঙ্গেই জড়িত মানুষের সংখ্যা বেশি—প্রায় ২০০০। সারা জেলায় তাঁতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার। প্রতিটি তাঁতে মোটামুটি তিনজন শিল্পীকে কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। তাঁতে বসে থাকতে হয় প্রত্যেককে একটানা আট ঘণ্টা করে। এভাবে পালা করে দুজনকে প্রয়োজন হয়, তাছাড়া তাঁতে লাগানোর সুতোকে উপযুক্ত করা ও আনুষঙ্গিক কাজে সাহায্য করার জন্য আরও একজনকে লাগে।

বর্তমানে মানুষের রুচি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তসরের থানের মধ্যে তসরের সুতোর সাহায্যেই নানা ধরনের নকশা করা হচ্ছে—শার্ট বা পাঞ্জাবির উপযোগী করে।

তসরগুটি থেকে খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তন্তু ছাড়াও কিছু নিম্নমানের তন্তু বেরোয়—যাকে স্থানীয় পরিভাষায় বলে লাথা। এর পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। এই লাথার সুতো কোথাও সরু, কোথাও মোটা—খানিকটা খদ্দরের সুতোর মতো। এই দিয়ে শীতের জন্য গায়ের গরম চাদর ও শার্টের কাপড়ও তৈরি হয়। এর দাম সূক্ষ্ম তসরের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কম হয়।

এই তসরবয়নশিল্প সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর ছাড়াও দক্ষিণ বাঁকুড়ার কিছু কিছু স্থানে পাত্রসায়েরে, বড়জোড়া এলাকায় গড়ে উঠেছে বটে, তবে তা তেমন ব্যাপক নয়।

এরপর আসা যাক রেশমশিল্পের প্রসঙ্গে। ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে বাঁকুড়া জেলায় রেশমগুটির চাষ খুব বেশি অঞ্চলে হয় না এখানকার জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির আনুকূল্যের অভাবে। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় মাত্র ৫৬০ একর জমিতে রেশমগুটির চাষ হয়। মালবেরি বা তুঁত গাছের পাতায় বোম্বিক্স মোরি মথ ডিম পাড়ে; তা থেকে উৎপন্ন লার্ভা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে গুটি তৈরি করে। রেশমগুটি বছরে পাঁচবার উৎপন্ন হয়। মোটামুটি ১৮৩০ জন মানুষ এই রেশমগুটি চাষে নিযুক্ত থাকেন। জেলার ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ সেরিকালচার (তসর)-এর অফিস ও অন্যান্য প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে তাঁরা নানা ধরনের সাহায্য ও প্রশিক্ষণ পান (তসর উৎপাদন প্রসঙ্গে আলোচিত)।

তবে বাঁকুড়া জেলার রেশমবয়ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মোট পরিমাণের তুলনায় এই জেলার নিজস্ব রেশমগুটি উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য। এখানকার রেশমগুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মালদহ বা মুর্শিদাবাদে চলে যায় বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য অর্থাৎ ওইগুলি থেকে মথকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয় এবং সেগুলিকে আবার ওখানে ডিম পাড়ার কাজে লাগানো হয় নতুন গুটি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে।

বাঁকুড়ার রেশমবয়ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রেশমতন্তু আসে মূলত মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও ব্যাঙ্গালোর থেকে। এরমধ্যে ব্যাঙ্গালোর সিল্কের মান সবচেয়ে ভাল—দামও অত্যধিক। তাছাড়া বয়নশিল্পীরা রেশম ও তসরের সঙ্গে চায়নাসিল্কও ইদানীং মেশাচ্ছেন; এটি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত।

বালুচরী তৈরিতে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বিষ্ণুপুরের

বাঁকুড়ার গামছা

নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য; যদিও সোনামুখীতেও ইদানীং কিছু কিছু বালুচরী প্রস্তুত হচ্ছে। বালুচরীতে প্রধানত রেশমই ব্যবহৃত হয় এবং এতে পুরাণ বা মহাকাব্যের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র থাকে। তাছাড়া ফুল-লতাপাতা, পশু-পাখির ছবিও থাকে। বয়নশিল্পীরা বিরাট ধৈর্য ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রতিমূর্তিকে রূপ দেন তাঁদের নির্মিত বস্ত্রে কেবলমাত্র রেশমের সুতোর সাহায্যে। বিভিন্ন রঙের সুতোর কাজ থাকে এই বস্ত্রে— এক রঙের মূর্তির মধ্যে অপর রঙের মিনে করাও থাকে। তবে মুসলমান ধর্মাবলম্বী পরিবারে কোনও মানুষ বা প্রাণীর ছবি-সহ কাপড় পরা নিষেধ বলে ইদানিং বিষ্ণুপুর-সোনামুখীর তন্তুবায় সম্প্রদায় মানুষ বা পশু-পাখির ছবি ছাড়াই বালুচরী বুনছেন। সারা ভারতে এমন কি বিদেশেও বালুচরীর কদর আজ বিরাট। সোনামুখীতে বালুচরী তৈরি হলেও এখানে বেশিরভাগ তৈরি হয় রেশম বা তসরের থান। এই থান ছাপা শাড়ি তৈরির কাজে লাগে, পাঞ্জাবি তৈরিতে লাগে, শালোয়ার-কামিজ নির্মাণে লাগে, কাঁথার সেলাই দিয়ে অলঙ্করণের কাজে লাগে আর লাগে একটি বিশেষ কাজে যা অনেকের কাছেই অজানা। আফগানিস্তানের মানুষরা মাথায় যে কাপড় দিয়ে পাগড়ি বাঁধেন তার কাপড় হিসাবেও ব্যবহৃত হয় সোনামুখীর তাঁতীদের তৈরি রেশমথান। সারা

গামছা বোনার তাঁত : রাজগ্রাম
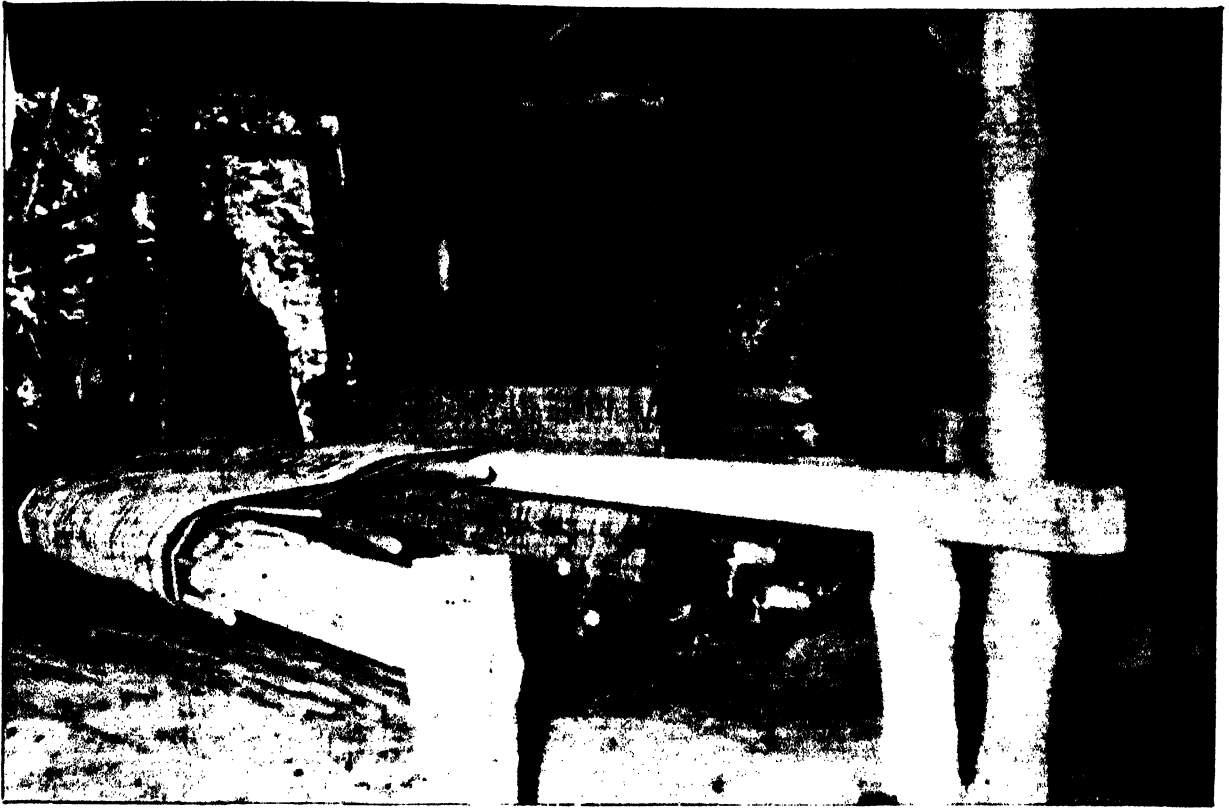
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সোনামুখীর থানের মান সর্বোৎকৃষ্ট। সূক্ষ্ম রেশমতন্তু ছাড়াও একটু নিম্নমানের তন্তু বেরোয় অপেক্ষাকৃত অপুষ্ট বা নিম্নমানের গুটি বা পোকা বেরিয়ে যাওয়া কাটা গুটি থেকে। তা দিয়ে যে কাপড় তৈরি হয় তাকে বলে কেটে।

এর পর আসা যাক বাঁকুড়ার বয়নশিল্পের দ্বিতীয় ভাগটিতে অর্থাৎ পরিধেয় সুতিবস্ত্র বয়নে।

বাঁকুড়ার কিছু কিছু অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে এই সুতিবস্ত্র বয়ন করা হয়। তবে এর পরিমাণ খুবই অল্প। বাঁকুড়ার সদর শহরের নিকটবর্তী রাজগ্রামে, সোনামুখীতে—এই রকম কয়েকটি স্থানে সুতিবস্ত্র বয়ন করা হয়। মোটা শাড়ি বা ধুতি এই সব অঞ্চলে নির্মিত হয়। ধুতির বেশিরভাগই কম বহরের এবং কম দৈর্ঘ্যের।

এছাড়া বিছানার চাদর ও মোটা গায়ের চাদর অল্প অল্প পরিমাণে নির্মিত হচ্ছে বাঁকুড়ার কিছু কিছু অঞ্চলে।

পরিশেষে আসি গামছা বয়নের প্রসঙ্গে।

গামছা তৈরিতে বাঁকুড়া জেলার নাম আছে। পরিধেয় সুতিবস্ত্রের তুলনায় গামছা তৈরির পরিমাণ বরং বেশি। তাছাড়া এখানকার গামছা বেশ খাপি অর্থাৎ ঘন বুনন এবং টেকসই। বলা যায় একপ্রকার দিশি তোয়ালের কাজ করে—বেশ নরম বলে গা মোছাটাও আরামদায়ক।

গামছাও প্রধানত রাজগ্রামেই তৈরি হয়।

বাঁকুড়া জেলার সদর শহর বাঁকুড়ায় আছে হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিস। এখান থেকে বাঁকুড়ার বয়নশিল্পীরা নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম, পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা ও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে আর্থিক সাহায্যও পান।

তবে বাঁকুড়া জেলার নানা অঞ্চলে তন্তুবায় সম্প্রদায় এক একটি কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন। এই সমবায় সমিতিগুলির অন্তর্ভুক্ত বয়নশিল্পীদেরই কেবলমাত্র এই সব সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিসের। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাবে বেশিরভাগ তন্তুবায়ই এই সমবায়ের আওতায় আসতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে আমরা বিষ্ণুপুর বয়নশিল্পী সমবায় সমিতির উল্লেখ করতে পারি। সমগ্র বিষ্ণুপুর ব্লকের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর শহর-সহ নানা গ্রাম—যেমন জয়কৃষ্ণপুর ডাঙা, চুয়ামসিনা, জাগুয়ালোল প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বয়নশিল্পীরা এর আওতায় এসেছেন এবং আসছেন। তবে তন্তুবায়দের মোট জনসংখ্যার সামান্য একটি ভগ্নাংশ মাত্র এই সমবায় সমিতির অধীনে এসেছেন।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে এঁদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া বয়স্ক শিল্পীদের চশমা কেনার জন্য চশমা ভাতা, শিল্পীদের পরিবারে প্রসূতিভাতা, তাঁতের যন্ত্রাংশ কেনার জন্য ভাতা প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া এই শিল্পীদের জন্য একটি বিশেষ প্রকার ভবিষ্যনিধির ব্যবস্থাও আছে। সমবায় সমিতির সদস্য-বয়নশিল্পীর স্বীয় পারিশ্রমিকের ৩%, সমবায় সমিতি কর্তৃক দেয় ৩%, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকের দ্বারা প্রদেয় ৩% —এভাবে মোট ১২% জমা থাকে যা শিল্পীরা প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসাবে পান। তবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে একটি উর্ধসীমা আছে—বছরে

বয়নশিল্পীরা বিরাট ধৈর্য ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রতিমূর্তিকে রূপ দেন তাঁদের নির্মিত বস্ত্রে কেবলমাত্র রেশমের সুতোর সাহায্যে। বিভিন্ন রঙের সুতোর কাজ থাকে এই বস্ত্রে— এক রঙের মূর্তির মধ্যে অপর রঙের মিনে করাও থাকে। তবে মুসলমান ধর্মাবলম্বী পরিবারে কোনও মানুষ বা প্রাণীর ছবি-সহ কাপড় পরা নিষেধ বলে ইদানিং বিষ্ণুপুর-সোনামুখীর তন্তুবায় সম্প্রদায় মানুষ বা পশু-পাখির ছবি ছাড়াই বালুচরী বুনছেন।

সর্বাধিক ৯০ টাকা পর্যন্ত দেবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার—প্রত্যেকে। তবে বয়নশিল্পীরা নিজের ও সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদেয় শতাংশের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।

তাছাড়া তাঁত ও তাঁতের যন্ত্রাংশ কেনার জন্য ঋণও দেওয়া হয় হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের ২/৩ অংশ সুদসহ বয়নশিল্পীকে পরিশোধ করতে হয়, আর ১/৩ অংশ সরকারি ভরতুকি হিসাবে মঞ্জুর করা হয়।

বর্তমানে সারা বাঁকুড়া জেলায় মোট ৩৫টি সমবায় সমিতি আছে। কিছুদিন আগে ছিল মোট ৪০টি—তার মধ্যে ৫টি এখন আর সক্রিয় নেই। এই সমবায়গুলির আওতায় আছেন প্রায় ১৪০০ বয়নশিল্পী।

সারা বাঁকুড়া জেলায় বয়নশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৬,০০০—সেটা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ২০,০০০-এর বেশি মানুষ রেশম-তসর বয়নের সঙ্গে যুক্ত আর বাকিরা সুতি বস্ত্র বয়ন করেন।

রেশম-তসর শিল্পীরা যদি ঠিকমত কাজ পান তা হলে প্রত্যেকে মাসে মোটামুটি ৫০০০ টাকা রোজগার করতে পারেন। কিন্তু সুতিবস্ত্র বা গামছা তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পীদের প্রত্যেকের দৈনিক মজুরি সর্বাধিক ৪০-৫০ টাকা। সেজন্য সুতির বস্ত্র বা গামছা তৈরির প্রবণতা বিশেষত ধুতি-শাড়ি প্রভৃতি বয়নের প্রবণতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবেই বয়নশিল্পীরা সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তার অভাবে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছেন।

এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—সমবায় সমিতির অধীনেই বা বয়নশিল্পীরা ব্যাপকভাবে আসছেন না কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, সমবায় সমিতিগুলি এঁদের পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজ দিয়ে উঠতে পারছে না। তাছাড়া অনেকেরই তাঁত নেই—অথচ তাঁতের মালিকের কাছে কাজ করে তাঁরা সহজেই পারিশ্রমিক পেতে পারেন। আর তন্তুবায়দের তাঁত কেনার জন্য ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও একটা সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতা সমবায়গুলির থাকে। সেই ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে শিল্পীদের সামর্থ্যের প্রশ্ন আসে। এই সব কারণে বেশিরভাগ বয়নশিল্পীই মহাজনদের কাছেই কাজ করেন। তাঁরা দাদন নিয়ে কাপড় বুনে পারিশ্রমিক পান।

তবে হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিস ছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারও (রাজ্য সরকারের একটি উদ্যোগ) বর্তমানে বয়নশিল্পীদের নানাভাবে সাহায্য করছে। তারা প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাঁত বা তাঁতের যন্ত্রাংশের জন্য ঋণ দেয়। এই ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার থেকে সাহায্য বা প্রশিক্ষণ পেতে গেলে—কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হয় না।

যাই হোক, উপরের সামগ্রিক আলোচনাকে এক নজরে আনার জন্য কয়েকটি সারণির সাহায্য দেওয়া হল।
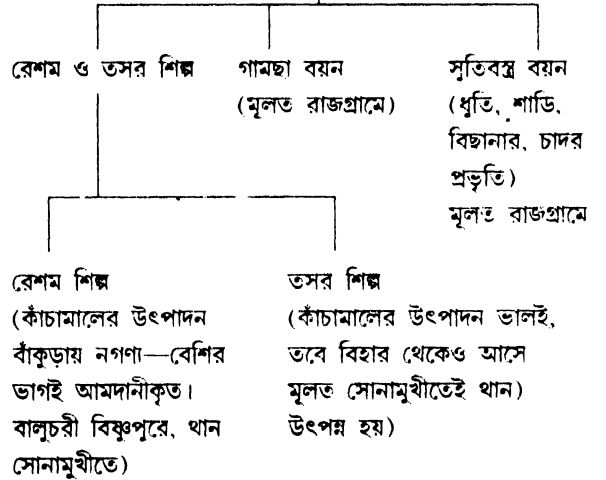
তথ্যসূত্র :

(১) ডঃ স্বপন রুদ্র, রাজ্য সরকারের কর্মী এবং সোনামুখীর অধিবাসী।
(২) ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ সেরিকালচার (তসর), বাঁকুড়া।
(৩) বিষ্ণুপুর সেরিকালচার কমপ্লেক্স।
(৪) হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিস, বাঁকুড়া।
(৫) সুমিত্রা রুদ্র, সোনামুখীর অধিবাসী।
(৬) আরতি সু, সোনামুখীর অধিবাসী।
(৭) বিষ্ণুপুর বয়নশিল্প সমবায় সমিতি।

লেখক পরিচিতি : *স্কুল শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক*

বাঁকুড়ায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি

অজিতকুমার গাঙ্গুলি

গত ৩১.১২.২০০০-এর মধ্যে মোট ১০০৭টি স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। এরা মোট ২৪ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে। প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছে। শতকরা ১০০ ভাগ আদায় দিচ্ছে। এইভাবে জেলার সমস্ত গরিব মহিলাকে এই পরিকল্পনায় যুক্ত করা সম্ভব হবে ও এদের স্বনির্ভর করে সমাজের পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করার কাজে জেলার সমবায় আন্দোলন এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

বাঁকুড়া জেলায় সমবায় আন্দোলন শুরু করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে জেলার কিছু মানুষের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করা থাকলে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাঁকুড়া জেলার সমবায় আন্দোলনের গৌরবজনক ইতিহাস সহজলভ্য হত। তবুও ওই সময়ের কিছু সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা থেকে জেলার সমবায়ের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের আগ্রহে ভারতবর্ষে The Co-op. Credit Socy. Act. 1904, সমবায় ঋণদান আইন পাস হয়। বাঁকুড়ায় ১৯০৭ সালে বাঁকুড়া মিনিস্টারিয়েল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি নামে একটি অকৃষি প্রাথমিক ঋণদান সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ওই সময় বাঁকুড়ায় কোনো প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৯১২ সালে সমবায় সমিতি আইন চালু হওয়ার পর বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি গঠিত হতে থাকে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত রেজিস্ট্রিকৃত ওই ধরনের সমিতির সংখ্যা ছিল ৫৬৪। সমিতিগুলি কর্জ দাদন ও আদায় ছাড়া আর কোনও কাজ করত না এবং কিছু সমিতির কাজকারবার পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায়। কিছু সমিতিকে লিকুইডেশনে দেওয়া হয়। কিছু সমিতিকে লার্জ সাইজ ক্রেডিট সোসাইটি ও সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে রূপান্তরিত করা হয়।

পঞ্চাশের দশকের সময় বাঁকুড়ায় ৩১ রকমের সমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ১১৭৭। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক-২, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন-২, ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক-১, শহরাঞ্চলীয় ব্যাংক-৭, প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি-৫৬৪, তন্তুবায় সমবায় সমিতি-১০১, সেচ সমবায় সমিতি-২৭৮।

ষাটের দশকে বিভিন্ন সরকারি নীতি ও সমিতিগুলির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের ফলে এর সংখ্যা অনেক কমে যায়। ১৯৬৪ সালে বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপিত হয়।

বাঁকুড়া জেলায় সমবায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ভূমিকা পালন করার কথা যে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের, ১৯২২ সালে তৎকালীন জেলা শাসক গুরুসদয় দত্ত, আই সি এস মহাশয়ের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় একটি ও বিষ্ণুপুরে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গঠিত হয়। ১৮-১-১৯৫৯ সালে এই দুটি ব্যাংক বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজে একটি যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলিত হয়ে বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় ব্যাংক লিঃ (The Bankura District Central Co-operative Bank Ltd.) রূপে আত্মপ্রকাশ করে ও সেই থেকে বাঁকুড়ার মূলত কৃষক, কুটিরশিল্পী ও অন্যান্য অংশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে আসছে। বাঁকুড়ার সমবায় আন্দোলনের সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : প্রথম ইংরেজ আমলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রশমন করার জন্য সরকারি উদ্যোগে সমবায় গঠন করার ফলে, সমবায়ে কোনও প্রাণ ছিল না। মহাজনি শোষণের হাত থেকে সাধারণ কৃষক, কুটিরশিল্পীদের রক্ষা করা সম্ভব হয়নি কারণ—সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে মহাজন, রায়বাহাদুর, রায়সাহেব জমিদার, জোতদার ও সমাজে তখনকার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরে স্বাধীনোত্তর যুগে ও বামফ্রন্ট সরকার পূর্ববর্তী সময়ে সমবায় আন্দোলনে কোনও গতিবেগ আসেনি। তার একটাই কারণ—সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি তখনকার সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, সম্পন্ন কৃষক, বিভিন্ন উচ্চবিত্তদের কুক্ষিগত ছিল। সাধারণ মানুষের সভ্য হওয়ার সুযোগ ছিল না ও গরিব খেটে খাওয়া মানুষের সমবায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ একেবারে অসম্ভব ছিল।

বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ১৯৮০-৮১ সাল থেকে সমস্ত পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া জেলায় সমবায় আন্দোলনে প্রাণের স্পন্দন এল। সমবায় আইনের পরিবর্তনের ফলে সাধারণ গরিব মানুষদেরকে সমবায় সমিতিগুলিতে সর্বজনীন সদস্যপদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল এবং ওই সদস্যপদের জন্য নির্দিষ্ট চাঁদা রাজ্য সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলী গঠনের জন্য সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হল। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিকে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীতে পাঠানোর বিধান পরিবর্তিত সমবায় আইনে লিপিবদ্ধ করা হল, বড় বড় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীদের পরিচালকমণ্ডলীতে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। এতদিন ধরে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে কায়েমি স্বার্থের মানুষের হাতে বন্দি
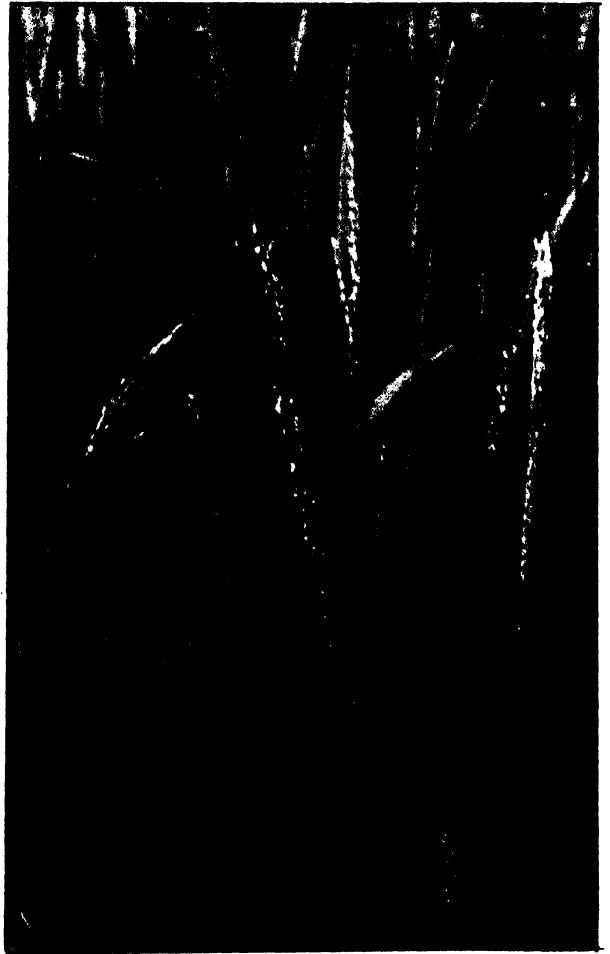
সমবায় কৃষিতে এনেছে সমৃদ্ধি

> **সমবায় আইনের পরিবর্তনের ফলে সাধারণ গরিব মানুষদেরকে সমবায় সমিতিগুলিতে সর্বজনীন সদস্যপদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল এবং ওই সদস্যপদের জন্য নির্দিষ্ট চাঁদা রাজ্য সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলী গঠনের জন্য সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হল। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিকে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীতে পাঠানোর বিধান পরিবর্তিত সমবায় আইনে লিপিবদ্ধ করা হল, বড় বড় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীদের পরিচালকমণ্ডলীতে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল।**

ছিল তার থেকে মুক্তি পেল। ১৯৮০-৮১ সালে আমরা দেখেছিলাম সমস্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি অকেজো অবস্থায় ছিল। জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের পক্ষে কোনও ঋণ দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বাঁকুড়া সমবায় ব্যাংক সরকারের থেকে ৫০ লক্ষ টাকা বিশেষ ঋণ পায় ও কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়।) তখন আদায় মাত্র ৪ শতাংশ, আমানত ৪ কোটি, কার্যকরী মূলধন মাত্র ৮ কোটি। সে সময় আমরা জেলার সমস্ত ব্লকে স্থানীয় পঞ্চায়েত, কৃষক সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে চেষ্টা করলাম প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে চালু করতে। আমরা স্লোগান দিলাম যে, একজন ঋণ শোধ করলে তাকে পুনরায় ঋণ দেওয়া হবে। অনেকে বিশ্বাস করলেন, অনেকে বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু কিছু মানুষ সহযোগিতা করলেন। আদায় ও দাদনের হার ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। এই সময় বামফ্রন্ট সরকার কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করলে সুদ ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আদায়ের শতকরা হার ১৯৮৪-৮৫ সালে ১২.৯ শতাংশ, ৮৫-৮৬ সাল ১৭.৮ শতাংশ, '৮৬-৮৭ সালে ২১.৫ শতাংশ, '৮৭-৮৮ সালে ৩৭.৫ শতাংশ, '৮৮-৮৯ সালে ৪৭.৫ শতাংশ, '৮৯-৯০ সালে ৩৩.১ শতাংশ, '৯০-৯১ সালে ৭০.১ শতাংশ, '৯১-৯২ সালে ৭০.৮ শতাংশ, '৯২-৯৩ সালে ৬৯.৬ শতাংশ, '৯৩-৯৪ সালে ৭৩.৬ শতাংশ, '৯৪-৯৫ সালে ৭৭.৭ শতাংশ, ১৯৯৯-২০০০ সালে ৭৯ শতাংশ। দাদনের হারও আনুপাতিক হারে বাড়তে লাগল। বর্তমানে (৩১-১২-২০০০ পর্যন্ত) ৬৩ কোটি টাকা কৃষি, অকৃষি ও সহায়ক কৃষি ক্ষেত্রে দাদন করা হয়েছে। আমানত ১২৫ কোটি টাকা ও কার্যকরী মূলধন ১৮৫ কোটি টাকা যা আমাদের জেলার মানুষের টাকা। আমাদের জেলার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই এই টাকা বিনিয়োগ করা আমাদের লক্ষ্য। এই জন্য বিভিন্ন প্রাথমিক সমবায় মারফত জেলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার যে পরিকাঠামো আমাদের আছে তাকে কাজে লাগিয়ে এই বিনিয়োগ আমাদের করতে হবে। সে জন্য প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে তার নিজস্ব এলাকায় সকল শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণের চাহিদা পূরণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। প্রতি বৎসর জেলার অনুরূপ চাহিদা পূরণ করার জন্য ব্যাংকের Development Action Plan তৈরি করা হয়েছে ও এক বৎসরের জন্য বিভিন্ন খাতে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এজন্য N.A.D.A.R.D.W.B.S.C.B রাজ্য সরকারের সঙ্গে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। প্রতি তিন মাস অন্তর কৃষি, অকৃষি ও সহায়ক কৃষিক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মূল্যায়ন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি যদি নিজের এলাকার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য এই রকম Development Action Plan তৈরি করে, তবেই জেলার পরিকল্পনা সার্থক হবে ও ব্যাংকের সংগৃহীত পুঁজি জেলার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে। এর জন্য সমস্ত প্রাথমিক সমিতিকে সচল রাখতে হবে। যে সমিতিগুলি অকেজো (deffunct) হয়ে আছে সেগুলিকে চালু করতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতি—৩৯৪টি, ল্যাম্পস—১৭টি, এফ এস সি এস—১০টি মোট ৪২১টি। এর মধ্যে চালু আছে ২৭০টির মতো। বাকি সমিতিগুলিকে চালু করতে হবে। বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির লিকুইডেশনে যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল। ঠিক সময়ে জেলার সমবায় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে সমস্ত বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করে সোসাইটি এখন ভালভাবে চলছে। জেলার ল্যাম্পসগুলি আদিবাসী গরিব মানুষদের দ্বারা কেন্দুপাতা সংগ্রহ ও বিক্রয়ের মতো কর্মসূচিতে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে চলেছে, এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের টি ডি সি সি যুক্ত হয়েছে।

বিষ্ণুপুর তসর ও রেশম তাঁতবস্ত্র শিল্পে সমবায় প্রধান সহায়
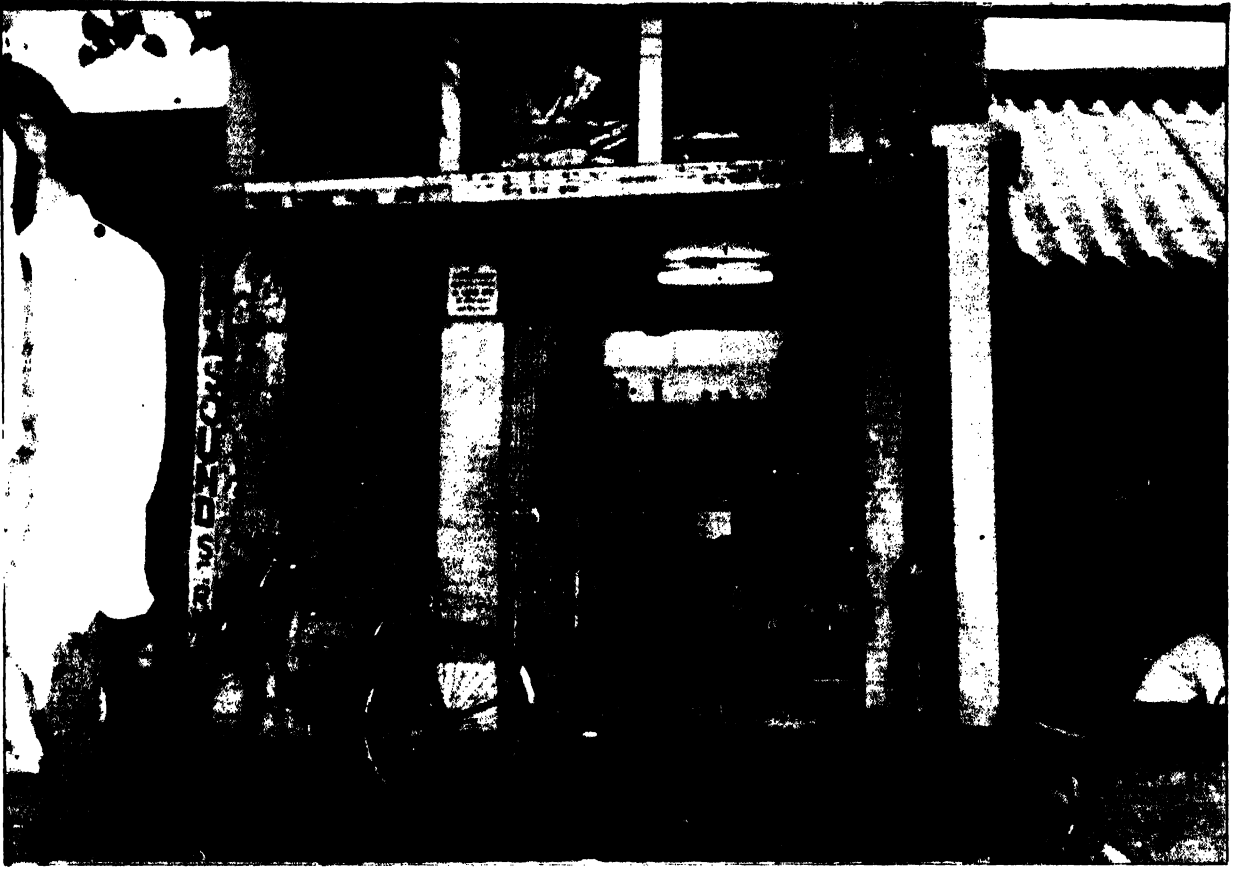
বিষ্ণুপুর বয়নশিল্পী সমবায় সমিতির ভবন

কৃষির পরই জেলায় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তাঁতশিল্পে। প্রায় ৪০টি তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি মারফত, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ন্যাবার্ডের সহযোগিতায় তাঁতশিল্পীদের উৎপাদন ও বিপণনের জন্য সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় মূলধনি ঋণ প্রায় ৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তাঁতশিল্পীদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ সুতো ন্যায্য দামে সরবরাহ করার জন্য এখানে প্রাথমিক তাঁতশিল্প সমবায় সমিতিগুলি, জেলা সমবায় ব্যাংকের উদ্যোগে একটি জেলা কেন্দ্রীয় তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই কেন্দ্রীয় সমিতি মারফত প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলি মিলের দামে সুতো সংগ্রহ করে তাঁতশিল্পীদের সরবরাহ করছিল। কম্পিউটারের সহযোগিতায় বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির রং ও ডিজাইনের বৈচিত্র্য বাড়াবার জন্য জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং N.I.S.T.A.D.-র উদ্যোগে প্রায় ১০০ জন তাঁতশিল্পীকে নিয়ে বিষ্ণুপুর কে জি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে ন্যাবার্ডের সহযোগিতায় কম্পিউটারের ডিজাইনের সাহায্যে বালুচরী শাড়ি বোনার কাজে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের উপর মানুষের আস্থা বাড়াবার জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। জেলার মধ্যে ব্যাংকের ১৬টি শাখা সহ প্রধান কার্যালয়কে নতুন গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এর মধ্যে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী ও ওন্দাতে নিজস্ব গৃহনির্মাণ করা হয়েছে। প্রধান শাখা ও সান্ধ্য শাখা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। প্রধান শাখা ও সান্ধ্য শাখায় কম্পিউটার পরিচালিত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়টির সামনে রঙিন ফোয়ারা সহ নতুন নেতাজি মূর্তি আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল উদ্বোধন করেন ও লিফট সহ নবনির্মিত প্রধান কার্যালয় ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্বোধন করেন ও ব্যাংকের কার্যাকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য শাখার পরিকাঠামো উন্নয়ন করার পর কাজের পরিবেশ ও গ্রাহক পরিষেবার প্রভূত উন্নতি হয়েছে ও বিশ্বায়নের যুগে সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে জেলার মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ব্যাংকের আমানত, কার্যকরী মূলধন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই তুলনায় বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্য প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতির এলাকার সমস্ত কৃষক পরিবারকে পর্যায়ক্রমে সভ্য করে কৃষিঋণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সমিতির ব্যাংকিং শাখা চালু করে এলাকার মানুষের উদ্বৃত্ত সম্পদ আমানত আকারে সংগ্রহ করতে হবে ও এলাকার মানুষের উন্নয়নে বিনিয়োগ করার পর বাকি অংশ ব্যাংকের নিকটবর্তী শাখায় জমা রাখতে হবে। সমিতি এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ করবে। কৃষি সরঞ্জাম, ট্রাক্টর,

হাঁসমুরগি পালনে সমবায় ব্যাঙ্ক সরাসরি অথবা সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে

পাওয়ার টিলার, ট্রেকার, ট্রাক, বাস, পাম্পসেট ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবহণের যানবাহন, ডেয়ারি, পোল্ট্রি, পিগারি, ছোট ছোট শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, হিমঘর, বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্যাশ ক্রেডিট প্রভৃতি সমবায় সমিতি মারফত অথবা সরাসরি জেলা সমবায় ব্যাংক বিনিয়োগ করে চলেছে। জেলার মানুষের আরও বহু চাহিদা পূরণ করতে হবে।

রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় ব্যাংকগুলির সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নিয়ে আমানত ও ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করার বিষয়ে বিনিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছে। ফলে সমবায় ব্যাংকগুলিকে অসম প্রতিযোগিতায় নেমে বেশি সুদ দিয়ে বাজার থেকে আমানত সংগ্রহ করতে হচ্ছে ও কম সুদে ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক ও কুটিরশিল্পীদের ঋণ দিতে হচ্ছে। এই বিষয়ে সমবায় ব্যাংকগুলি রাজ্য সমবায় ব্যাংকের নেতৃত্বে নিজেদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যেও বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গত পাঁচ বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকা লাভ করেছে। গত দশ বৎসর সভা-সমিতিগুলিকে ও রাজ্য সরকারকে লভ্যাংশ বিতরণ করে আসছে। গত ১৯৯৭-৯৮ সালের লাভ থেকে এক কোটি টাকা ১৯৯৮-৯৯ সালের লাভ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মোট দেড় কোটি টাকার একটি Members Benevolent Fund জেলা সমবায় ব্যাংক গঠন করেছে। এই তহবিল জেলার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য খরচ করা যাবে। প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক সমিতি এলাকার সেচ উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের উপর। সেচ পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ টাকা উক্ত তহবিল থেকে অনুদান হিসাবে দেওয়া হবে ও শতকরা ৭৫ ভাগ ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার সমিতি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ও তৃতীয় অগ্রাধিকার সমিতির নিজস্ব পরিকাঠামো উন্নয়নে খরচ করা যাবে।

তাছাড়াও প্রায় ৩০০টি কর্মচারি ঋণদান সমিতি মারফত ১৫ কোটি টাকা জেলার শিক্ষক, কর্মচারিদের মধ্যে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে কম সুদে গৃহনির্মাণ ঋণ ব্যক্তিগতভাবে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত জেলার সমবায় আন্দোলনের সুফল, যাদের কিছু আছে অর্থাৎ জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি, ব্যাংক আমানত, জামিন দেবার লোক, তাদের কাছে পৌঁছোনোর কথা বলা হল।

কিন্তু জেলার সমবায় সমিতি এলাকায় একটি বিরাট অংশের মানুষ গরিব। বিশেষত মহিলাদের আজও আশানুরূপভাবে সমবায় আন্দোলনে শামিল করা যায়নি। এদের কিছু অংশকে সরকারি সাহায্যে সর্বজনীন সদস্য করা গেলেও, যেহেতু তাদের জমি নেই সেই জন্য এরা কোনও সুযোগ-সুবিধা পায়নি। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ মহিলা এবং তাদেরকে স্বনির্ভর করার জন্য ন্যাবার্ড ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সহযোগিতায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করার (Self help Group) একটি পরিকল্পনা বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ নিয়েছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সঙ্গে ক্ষুদ্র ঋণকে যুক্ত করে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের বিশেষত মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা। এই বিষয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যেও কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। আমরা ভাবতাম যে গরিব মহিলারা সংসার চালিয়ে সঞ্চয় করতে পারে না ও এই মহিলাদের ঋণ দিলে এরা কখনই ঋণ শোধ করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের সেই ধারণা বাংলাদেশ ঘুরে এসে বদলে গেছে। ন্যাবার্ডের সহযোগিতায় আমার বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমি বাংলাদেশের ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার গ্রামে ঘুরে গরিব মহিলাদের কিছু গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে, একজন মহিলা ১৫ বৎসর পূর্বে স্বামী ও ২টি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা করত। মহিলা গোষ্ঠীর মধ্যে এসে প্রথমে ২,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে ঋণ বাড়িয়ে এখন ৫৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে এবং নিয়মিত কিস্তি দিয়ে ঋণ শোধ করছে, একদিনের জন্য খেলাপ করেনি। একটু জমি কিনেছে, একটা বাড়ি তৈরি করেছে, নিজের জমিতে স্বামীর সঙ্গে সবজি চাষ

কৃষির পরই জেলায় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তাঁতশিল্পে। প্রায় ৪০টি তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি মারফত, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ন্যাবার্ডের সহযোগিতায় তাঁতশিল্পীদের উৎপাদন ও বিপণনের জন্য সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় মূলধনি ঋণ প্রায় ৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তাঁতশিল্পীদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ সুতো ন্যায্য দামে সরবরাহ করার জন্য এখানে প্রাথমিক তাঁতশিল্প সমবায় সমিতিগুলি, জেলা সমবায় ব্যাংকের উদ্যোগে একটি জেলা কেন্দ্রীয় তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল।

গুটি থেকে রেশমের সুতো বের করা হচ্ছে

করে ছেলেগুলিকে মানুষ করছে। একজন বি কম (অনার্স) পাস করে চাকরি করছে আর একজন টেলারিংয়ের কাজ শিখে ছিটের দোকান করছে। মহিলার সঙ্গে সাপ্তাহিক মিটিংয়ে আমার আলাপ হল। আমি ও হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সভাপতি গিয়ে ওর বাড়ি দেখে, ওর স্বামী, ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের স্থির বিশ্বাস হল যে, গরিব মানুষ বিশেষ করে মহিলারা সঞ্চয় করতে পারে ও ঋণ নিয়ে শোধ করতে পারে। বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংক ওখানের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সঙ্গে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার জন্য গোষ্ঠী গঠনের রূপকার ডঃ মহম্মদ ইউনিসের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম বাংলাদেশে ২৪ লক্ষ পরিবারকে যুক্ত করে ২৪ লক্ষ গোষ্ঠী গঠন করেছেন যার মধ্যে ২৩ লক্ষই মহিলা। ১১,০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন ও শতকরা ৯৮ ভাগ আদায় ডঃ ইউনিসের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে গরিব মহিলাদের মহাজনি শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংকের কর্ণধার হওয়ার গল্পও শুনলাম। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় উৎসাহিত হয়ে আমরা বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে গরিব মহিলাদের নিয়ে ব্যাপকহারে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করার কাজে নেমে পড়ি। আমাদের এখানে ৫ থেকে ২০ জন মহিলা নিয়ে গোষ্ঠী গঠন করা হয়। আমাদের সুপারিশ ৮/১০ জন এক মনের বা মতের, কাছাকাছি মহিলাদের নিয়ে একটি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী বা একটি সমবায়ের মধ্যে সমবায় ব্যাংক গঠন করার কথা বলি। এর জন্য কারও কোনও নিয়ম জানার প্রয়োজন নেই। গোষ্ঠী নিজেরা বসে নিয়ম ঠিক করবেন এবং সেই নিয়মে চলবেন। ৮/১০ জন মহিলাকে নিয়ে একটি স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী গঠন করবেন, গোষ্ঠীর একটি নামকরণ করবেন। একজন গোষ্ঠীর নেত্রী ও একজন সম্পাদিকা নির্বাচন করবেন। ব্যাংকের পুঁজি সংগ্রহের জন্য নিজেরা সাধ্যমতো সঞ্চয় করবেন, উদাহরণ হিসাবে প্রত্যেকদিন ১টি করে টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। আর প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট বারে, নির্দিষ্ট সময়ে পরস্পরের বাড়িতে একবার করে এই ব্যাংক পরিচালনার জন্য সভা করতে হবে। এই সভাতে সাত দিনের সঞ্চয়ের টাকা সভানেত্রী বা সম্পাদিকার হাতে জমা দেওয়া হবে ও সম্পাদিকা ওই টাকা সমিতির ব্যাঙ্কিং শাখায় স্বয়ম্ভরগোষ্ঠীর নামে সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন। এই জমা যতদিন গোষ্ঠী থাকবে বরাবর জমা দিতে থাকবে। কিন্তু ৬ মাসে ওই টাকা জমা পড়ার পর গোষ্ঠী জমা টাকার ৩/৪ গুণ ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে। ঋণ দিয়ে গোষ্ঠীর মহিলারা ঋণের টাকা কিভাবে কাজে লাগাবেন সেই সম্বন্ধে ওই সাপ্তাহিক সভাগুলিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। ১০ জন মহিলা দিনে ১ টাকা করে জমা দিয়ে ৬ মাসে ৭,২০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবে। এইভাবে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই ব্যাংকের পুঁজি প্রায় এক লক্ষ টাকা হয়ে যাবে। ব্যাংকে জমা বাদে ৭২,০০০ টাকা দশজন মহিলা দেওয়া-নেওয়া করতে পারবে। তারও কোন সুপারিশ লাগবে না, কোনও জামিন দিতে হবে না, কোনও মর্টগেজ লাগবে না। খালি হাতে ১০জন মহিলার যাবতীয় চাহিদা ওই ব্যাংক পূরণ করবে। সুদের হার গোষ্ঠীর জন্য শতকরা ১২ টাকা অর্থাৎ শতকরা ১ টাকা। গোষ্ঠী সভারা সুদের হার ঠিক করবে। শোধ করার সময় বা কিস্তি গোষ্ঠীর সভায় ঠিক হবে। জেলার পঞ্চায়েত, সাক্ষরতার প্রেরক, প্রবর্তক, প্রাথমিক সমিতির কর্মকর্তা, ম্যানেজারদের সাহায্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী গঠন হচ্ছে। গত ৩১-১২-২০০০-এর মধ্যে মোট ১০০৭টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। এরা মোট ২৪ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে। প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছে। শতকরা ১০০ ভাগ আদায় দিচ্ছে। এইভাবে জেলার সমস্ত গরিব মহিলাকে এই পরিকল্পনায় যুক্ত করা সম্ভব হবে ও এদেরকে স্বনির্ভর করে সমাজের পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করার কাজে জেলার সমবায় আন্দোলন এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

লেখক : সভাপতি, বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ

গণ-উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা

মনোরঞ্জন বসু

সরকারি সাহায্যের সঙ্গেসঙ্গে গণউদ্যোগকে যুক্ত করে বহু কাজ হয়েছে এবং প্রচুর সম্পদ তৈরি হয়েছে, যা টাকার অঙ্কে হিসেব করলে বিশাল মাপের হবে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা, যে মানুষ পথ হারিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে রাস্তা খুঁজছিল তারা একটা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। সেই জন্য বাঁকুড়া জেলা আজ শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অর্জন করেছে।

সবে মিলি করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।

একটি বহুল প্রচলিত আপ্তবাক্য। আদিম যুগে মানুষকে দলবদ্ধভাবে থাকতে হত। সকলে মিলে সব কাজ করত, পশুশিকার থেকে চাষবাস পর্যন্ত। যা পেত সবাই মিলে ভাগ করে নিত। সুবিধা-অসুবিধা সবই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখনকার দিনে আর দলবদ্ধভাবে থাকার কথা চিন্তা করাও কষ্টকর। বিশেষ করে বর্তমানকালে একটা বড় অংশের মানুষ যেখানে ব্যক্তিস্বার্থকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। সমষ্টিগত, সমাজগত চিন্তাভাবনা যেখানে ক্রমশ ধাক্কা খাচ্ছে, সেখানে সমষ্টি উদ্যোগের কথা চিন্তা করা দুরূহ ব্যাপার।

তবে সমষ্টিগত উদ্যোগ যে নেই একথা বললে ভুল হবে। বিভিন্ন ধরনের পূজাপার্বণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদি প্রায় সবই সমষ্টি উদ্যোগেই হয়ে থাকে। এছাড়া আজকাল প্রায়ই বিভিন্ন এলকায় সমষ্টি উদ্যোগ (!) দেখা যায়। যেমন কোনও ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাস্তায় হাম্প তৈরি করা, সরকারি জায়গা বে-আইনিভাবে দখল করা, এমন কি বাস-লরি আটকে টাকা আদায় করা। এ রকম বহু ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বেশ কিছু মানুষের প্রচ্ছন্ন সমর্থনও থাকে।

একটা সময় ছিল যখন রাজা বা জমিদাররা (যাঁরা দেশ বা এলাকা শাসন করতেন) নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয়, পান্থনিবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি গড়ে তুলতেন। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে একদিকে জোরজুলুম চালাতেন আবার অর্থের সংস্থান করার জন্যও লুটপাট চালাতেন। অত্যাচারী চরিত্রকে কিছুটা আড়াল করার জন্য এইসব জনহিতকর কাজ করে জনসেবক সাজার চেষ্টা করতেন। অবশ্য বেশ কিছু কাজ জনকল্যাণের জনাই এঁরা করে গেছেন।

পরবর্তীকালে এই কাজও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। অগ্রগতির বন্ধ্যাদশা, বেশির ভাগ মানুষের খাবার নেই। কাজ নেই। বেশির ভাগ মানুষেরই দিন আনি দিন খাই অবস্থা। তাদের আবার জনসেবা !

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত হল। মানুষের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এল। মানুষ নড়েচড়ে বসল। নিজেদের উপর আস্থা ফিরে পেল। পঞ্চায়েতকে সামনে রেখেই এগোতে হবে। 'ভাগ্যের দোহাই', 'ভগবানের মার'—এসবকে তুচ্ছ করে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল। পঞ্চায়েতকে সামনে রেখে বহু কাজ মানুষ নিজেরাই করে ফেলেছে। নিজেদের মধ্যে একটা আস্থা, বিশ্বাস, মনোবল ফিরে পেল যে, আমরাও পারি। যার ফলে মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একটা বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একে অবলম্বন করে মানুষ এগিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজতে লাগল।

বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হাওয়া শুরু হল। বাঁকুড়া জেলার লাল রুক্ষমাটি, খরা জেলা, দরিদ্র জেলা—এসব আমরা ছোট থেকেই শুনে আসছি।

কিন্তু ১৯৭৮ সালের পর থেকে এই জেলার ওই মানুষগুলিই রুক্ষ মাটির বুক চিরে জল বার করল। সারা জেলার রুক্ষ জমির সোনালি ফসলে ভরিয়ে দিল। মানুষের মুখে একটু একটু করে হাসি ফুটতে শুরু করল। খরাপীড়িত জেলা, গরিব জেলা এখন খাদ্যে উদ্বৃত্ত।

শুরু হল নতুন কর্মযজ্ঞ। রাস্তা, ব্রিজ, সাঁকো, জোড়বাঁধ করতে হবে। মানুষের প্রয়োজনে করতে হবে। অনেক অনেক টাকা লাগবে। সরকার বা পঞ্চায়েত সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়াল। তাতে কতটুকুই বা হবে। সরকারি সাহায্য যতটুকু পাওয়া তাতে সবটা হবে না। মানুষ দলবদ্ধভাবে উদ্যোগী হল। শুরু হল গণ-উদ্যোগ।

১৯৭৮ সালের আগে বাঁকুড়া জেলায় রাস্তাঘাট খুবই কম ছিল। এই সময়ে কি শহর, কি গ্রাম সর্বত্রই রাস্তার পরিমাণ কতগুণ বেড়েছে তা হিসেব করা কঠিন। এর সবটাই যে সরকারি উদ্যোগে হয়েছে তা

বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কচিরডাঙা জোড়বাঁধ প্রকল্প, নির্মাণকাল ১৯৯০-০২

নয়। গ্রামের রাস্তার জন্য সরকার বা পঞ্চায়েত টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু এই টাকায় ভাল রাস্তা হবে না। পঞ্চায়েতের উদ্যোগ পাড়ায় পাড়ায় সভা হল। সিদ্ধান্ত হল ওই টাকায় শুধু মোরাম কেনা হবে। শ্রম গ্রামের মানুষ নিজেরাই দেবে বিনা পারিশ্রমিকে। একটা নতুন ধরনের উৎসব। সৃষ্টির উৎসব। অভূতপূর্ব নিদর্শন। যাঁরা চিরকাল সমালোচনা করতেন তাঁরাও বাহবা দিতে শুরু করলেন। শুধু কি রাস্তা ! পুকুর, জোড়বাঁধ থেকে শুরু করে যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই মানুষ এগিয়ে এসেছে।

জেলায় অনেকগুলি ছোট-বড় নদী আছে। এই নদীর ওপর ব্রিজ, সাঁকো কমই ছিল, বর্ষাকালে জেলার একটা বড় অংশ শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। বাধা দূর করতে হবে। শুরু হল গণ-উদ্যোগ।

প্রথম নিদর্শন ঝিলিমিলির পথে কংসাবতী নদীর কেচন্দাঘাট। নকুল মাহাতোর নেতৃত্বে চারপাশের এলাকা ঐক্যবদ্ধ হল।

কজওয়ে তৈরি করতে লাগবে সরকারি হিসাবে প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকা। শুরু হল মানুষের উদ্যোগ। কয়েকশো মানুষ পাথর ভাঙছে। কিছু মানুষ বালি জড়ো করছে। বাড়ি বাড়ি সংগ্রহ করা চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্নাও হচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে। বাস-লরি সহ সমস্ত ভারি যানবাহন চলাচল শুরু করল। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বললেন বেশি দিন নয়। কিন্তু তাঁদের কথার তোয়াক্কা না করে বিশ বছর পরেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটা তৈরি করতে সরকারি টাকা কত খরচ হয়েছে, শুনলে অবাক হতে হয়। জেলা পরিষদ দিয়েছে মাত্র ২৪ হাজার ৫৫০ টাকা ও ১৬ কুইন্টাল গম।

একে একে শীলাবতী নদী ও জয়পণ্ডা নদীর উপর কজওয়ে, শালি নদীর উপর ঘোষালপুরে ব্রিজ, জামকুড়ি থেকে বীরসিংহ রাস্তা,
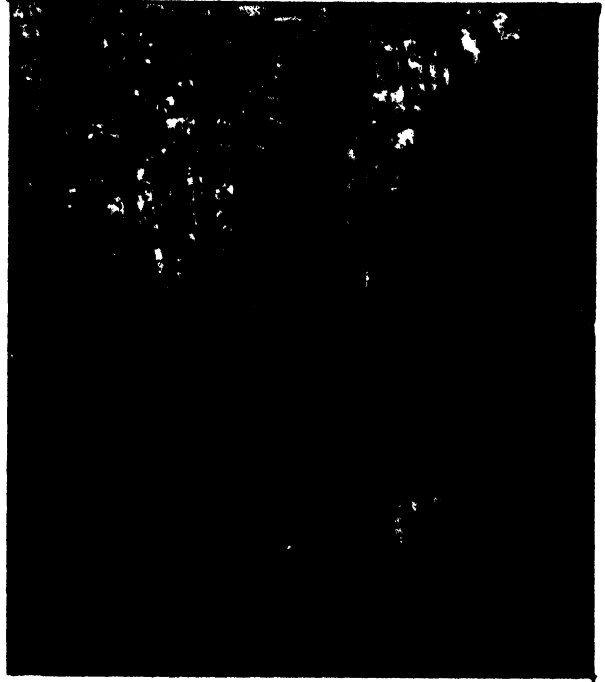
একটি বনসৃজন প্রকল্প

পাঁচাল থেকে কুশদ্বীপ রাস্তা, চামকড়া ঘাট, অসংখ্য জোড়বাঁধ তৈরি হয়েছে গণ-উদ্যোগে। বাঁকুড়া ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় বনগোপালপুরের চাটানিবাইদে যৌথ খামার গড়ে উঠেছে। শুধু গাছ

খাতড়া, বাঁকুড়ায় অরণ্য সপ্তাহ উদযাপনে মিছিল পরিক্রমা

'সাক্ষর জেলা বাঁকুড়া' - এর অনুষ্ঠানে ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী ও রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান

লাগানো হয়েছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার। বর্তমানে এই সম্পদের মূল্য কয়েক কোটি টাকা। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ মানুষ সৃষ্টি করে চলেছে।

জেলার বনাঞ্চল প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছিল। বন রক্ষা করতে হবে। সরকারের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে রক্ষিবাহিনী গড়ে উঠল। দায়িত্ব নিজেরা বুঝে নিল। নতুন করে গাছ লাগাল। শাল, সেগুন, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস সহ ওষধিগাছে চারদিক ভরে গেল। পালা করে পাহারা। পরিবারের সকলে মিলে পাহারা দিচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অন্য বনজসম্পদ থেকে অর্জিত অর্থের একটা ভাগ তার সরকারের থেকে পাচ্ছে। বাঁকুড়া জেলা বনসৃজনে রাজ্যের প্রথম সারিতে চলে এল। জেলার রুক্ষ চেহারাটাও উধাও হয়ে গেল।

বাঁকুড়া জেলায় বিদ্যুতের ব্যবহারও কম ছিল। শিল্পবিহীন জেলার গরিব মানুষ ভাবত বিদ্যুৎ শুধু শহরে অবস্থাপন্নদের জন্যই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অধিকার বুঝে নিতে শিখল। বিদ্যুৎ চাই। সমস্ত গ্রাম দাবি করতে শুরু করল। বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া ব্যয়সাপেক্ষ। শুধু সরকারি উদ্যোগে হবে না। একমাত্র পথ্য গণ-উদ্যোগ।

আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ আনতে কত খরচ হতে পারে ! ৫ লক্ষ টাকা। পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে সকলে মিলিত হয়ে ৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে জেলা পরিষদের কাছে আবেদন সহ জমা দেওয়া হল। দাবি, আমাদের সাধ্যমত দিয়েছি। বাকিটুকু আপনারা দিন। বাঁকুড়া জেলার বহু গ্রামে এইভাবেই বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। এইভাবে তৈরি হয়েছে বহু স্কুল, কলেজ, এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও।

এইভাবে সরকারি সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে গণ-উদ্যোগকে যুক্ত করে বহু কাজ হয়েছে এবং প্রচুর সম্পদ তৈরি হয়েছে, যা টাকার অঙ্কে হিসেব করলে বিশাল মাপের হবে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা, যে মানুষ পথ হারিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে রাস্তা খুঁজছিল তারা একটা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। সেই জন্য বাঁকুড়া জেলা আজ শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অর্জন করেছে। এবারের বিধ্বংসী বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এই জেলার মানুষ বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে ৭৬ লরি ত্রাণসামগ্রী বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঠানো হয়েছে। আরও পাওয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে কয়েক লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে এই জেলার মানুষ, সবাই নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন।

এই জেলার সহজ সরল মানুষ বিশেষ করে আদিবাসীদের বারে বারে প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মানুষের উদ্যোগের কাছে সেই অপচেষ্টা প্রতিবারই পরাজিত হয়েছে।

আজকের দিনে সমষ্টিগত উদ্যোগ যে কতখানি সামাজিকভাবে প্রয়োজন তা প্রতিটি ক্ষেত্রে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেইদিকে বাঁকুড়া জেলা অনেক পরিমাণে এগিয়ে। আশা আগামীদিনে বাঁকুড়া জেলার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে এবং অবশ্যই বাড়বে গণ-উদ্যোগ।

লেখক : সভাপতি, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, বাঁকুড়া

শিউলিবনা গ্রাম ও শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত : একটি সমীক্ষা

ভোলানাথ ঘোষ

গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬১,৩১০টি আসনের মধ্যে সাধারণ মহিলা ১৩,৫৫৩, তফসিলি জাতি ৬,২৫৬, তফসিলি উপজাতি ১,৬৮০, মোট ২১,৪৮৯ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রধান, উপপ্রধান পদগুলোতেও এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ফলে অনেক মহিলা নির্বাচিত হয়ে কাজ করছেন। এই শিউলিবনা গ্রামটি থেকে একজন মহিলা পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আছেন শুধু তাইই নয়, এই পঞ্চায়েতটি মহিলা প্রধান দ্বারা পরিচালিত।

শিউলিবোনা গ্রামে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে

গ্রামের নাম ও সীমানা :

গ্রামের নাম শিউলিবনা, ঠিকানা : ব্লক এবং থানা—ছাতনা, জেলা—বাঁকুড়া। গ্রামটি খুব ছোট এবং শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর কোণে অবস্থিত। শিউলিবনা গ্রামটি শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। আমরা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে পাহাড় ঘেরা এই শিউলিবনা গ্রামে সমীক্ষার কাজে গিয়েছিলাম সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ -এর প্রথম সপ্তাহে।

ছাতনা ব্লকটি শালতোড়ার দক্ষিণে, গঙ্গাজলঘাটির পশ্চিমে, বাঁকুড়া ১ ও ২নং ব্লকের উত্তর-পশ্চিমে এবং ইন্দপুরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ছাতনা ব্লকের অধীন শুশুনিয়া। পাহাড়ের কোলে এই শিউলিবনা গ্রাম। গ্রামটি ছাতনা ব্লকের কেন্দ্র থেকে ১৫ কি মি এবং শুশুনিয়া পাহাড় থেকে ৩ কি মি দূরে অবস্থিত।

ছাতনা ছিল প্রাচীন সামন্তভূমির রাজধানী। অতীতকাল থেকেই ছাতনা বর্ধিষ্ণু নগরী। শিক্ষাদীক্ষায় ছাতনা ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং সেটা আজ লোকশ্রুতির মুখে মুখে ফেরে। আজকের ছাতনার মূল আকর্ষণ—বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। স্বপ্নাদিষ্ট রাজা সমীর উত্তর প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবীর পূজারি ছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস। এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে। পরে মূল দেবী ছাতনা থেকে বীরভূমের দুবরাজপুরে স্থানান্তরিত হয়। পরে ক্ষত্রিয়রাজা সিংদেও উত্তরকালে দেবীর স্বপ্নাদেশে রাজবাড়ির সন্নিকটের মন্দিরে দেবীর বিশালাক্ষীকে স্থানান্তর করান হয়। উক্ত দেবীকে ঘিরে কিংবদন্তী আছে যে, ইনি ভীষণ জাগ্রত। বহু মানুষের মানত ফলে যায়। তাই প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তিনদিন ধরে মধুশুক্লা সপ্তমীতে সাড়ম্বরে দেবীর পূজা পালিত হয়।

এই ছাতনা থেকে ১৫ কি মি উত্তরমুখী যেতে শুশুনিয়া পাহাড়। ৩.২ কি মি ব্যাপ্ত শুশুনিয়া ১৪৪২ ফুট আজ পর্বত অভিযাত্রীদের প্রাথমিক অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে ভীষণ পরিচিতি লাভ করেছে। এই পাহাড়টি হিমালয় থেকেও প্রাচীন। নিচে গন্ধেশ্বরী নদী বয়ে চলেছে। বাংলা হরফের সংস্কৃত ভাষায় আদিরূপে দুটি গুহালিপি প্রত্নতত্ত্বের খোঁজ মিলেছে শুশুনিয়া পাহাড়ে। মন্দিরের গায়ে একটি ঝরনা আছে। ঝরনার বিপরীতে ৫ ফুট উঁচু বীরস্তম্ভ শিলামূর্তি। সিন্দুরে খচিত এই শিলামূর্তি স্থানীয়দের কাছে নৃসিংহদেবরূপে পূজিত হন। চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত তিনদিন দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা বারুণীস্নানে এখানে আসেন। পাহাড়ের পাদদেশের ঝরনার জলে স্নান করে বীরস্তম্ভে নৃসিংহদেবজ্ঞানে পূজা দেন।

গ্রাম তৈরির ইতিহাস :

প্রায় ১০০ বছর আগে ৫-৬টি সাঁওতাল পরিবার এখানে অর্থাৎ জঙ্গলে (আগে ছিল) এসে বসবাস আরম্ভ করেছিল। কিন্তু চোর, ডাকাতের উপদ্রব খুব ছিল। পরে তাই তাঁরা নিরাপত্তার কারণে আরও কিছু পরিবার নিয়ে এসে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করে। বর্তমানে এই গ্রামে ৬২টি পরিবার বাস করে। তারা জোটবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করার পর ১৯৬৭ সালে যখন

এই ছাতনা থেকে ১৫ কি মি উত্তরমুখী যেতে শুশুনিয়া পাহাড়। ৩.২ কি মি ব্যাপ্ত শুশুনিয়া ১৪৪২ ফুট আজ পর্বত অভিযাত্রীদের প্রাথমিক অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে ভীষণ পরিচিতি লাভ করেছে। এই পাহাড়টি হিমালয় থেকেও প্রাচীন। নিচে গন্ধেশ্বরী নদী বয়ে চলেছে। বাংলা হরফের সংস্কৃত ভাষায় আদিরূপে দুটি গুহালিপি প্রত্নতত্ত্বের খোঁজ মিলেছে শুশুনিয়া পাহাড়ে। মন্দিরের গায়ে একটি ঝরনা আছে। ঝরনার বিপরীতে ৫ ফুট উঁচু বীরস্তম্ভ শিলামূর্তি। সিন্দুরে খচিত এই শিলামূর্তি স্থানীয়দের কাছে নৃসিংহদেবরূপে পূজিত হন।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সূচনা হল তখন এই গ্রামটি শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের অধীন শিউলিবনা গ্রাম নামে নথিভুক্ত হয়।

ভূপ্রকৃতি :

শিউলিবনা গ্রামের ভূপ্রকৃতি বলতে গেলে বলতে হয় উঁচু, নিচু অঞ্চল এবং কাঁকুড়ে মাটি সমন্বয়ে অর্থাৎ বন্ধুর ভূপ্রকৃতি। সমতল অঞ্চল নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে পাথরের ছোট-বড় টিলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার মধ্য দিয়েই উঁচু-নীচু লাল কাঁকুড়ে রাস্তা। তবে শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ধাপ কেটে কিছু জায়গা সমতল করে চাষ করা হচ্ছে। এখানে কিছু এঁটেল মাটিও আছে। তাছাড়া গ্রামটিতে লোকালয়ের ভিতরে ও মাঠে মোট ১২টি ছোট-বড় পুকুর আছে। এই পুকুরগুলির মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি পুকুর হতে হস্তচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রামের চাষীরা রবিশস্যের জন্য জল সংগ্রহ করে থাকে। ধান এখানকার কৃষকদের মুখ্য কৃষিজাত দ্রব্য হলেও আলু, কলাই, পেঁয়াজ নানা ধরনের শাকসবজিও এখানে চাষ হয়। বর্ষাকালে আমন ধানের জন্য, জ্যৈষ্ঠের প্রথম থেকে প্রায় আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ট্রাকটার ও পাওয়ার টিলারে জমি চষে ফেলা যায়। অর্থাৎ এখানে চাষবাসের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার হচ্ছে।

গ্রামের লোকের জীবিকা :

শিউলিবনা গ্রামের প্রত্যেক সদস্য পরিশ্রমী। পুরুষ ও নারী উভয়েই কাজকর্ম করেন। শিউলিবনা গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ চাষে কাজ করেন। নিম্নে শিউলিবনা গ্রামের মানুষের জীবিকার একটি তালিকা দেওয়া হল।

১। নিজের জমিতে চাষের কাজ।
২। পরের জমিতে চাষে মজুরি খাটা।
৩। গো-পালন / হাঁস-মুরগি পালন।
৪। পাথর ভাঙার কাজ।
৫। সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী চাকরি (পুলিশ, ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মিলিটারি ইত্যাদি)।
৬। বাড়িতে মেয়েরা কৃষি সংক্রান্ত কাজকর্ম করেন।
৭। ব্যবসা।
৮। কুটিরশিল্প।
৯। পরিবহণ সংস্থায় চাকরি (বেসরকারি)।
১০। শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে যোগদান।

মোট কথা এই গ্রামের মানুষ কোনও না কোনও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকে। তবে বেকারও আছে, তার অংশ সামান্য। উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক লোকসংখ্যার বড় একটা অংশ চাকরি, চাষ ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে যুক্ত থাকেন। তাদের পারিবারিক অবস্থা ভাল। কিন্তু casual labour (ঠিকাশ্রমিক) in agriculture এবং casual labour in non-agriculture তাদের অবস্থা ভাল নয়। কারণ, পরের জমিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা নিয়মিত কাজ পান না এবং যে সব পুরুষ / মহিলা পাথর ভাঙার কাজ করেন তাঁরাও রোজ কাজ পান না। একটি নির্দিষ্ট মাপের পাথর ভাঙতে পারলে মজুরি পান মাত্র ৪০ টাকা। এই কাজে হাড়ভাঙা খাটুনি। প্রায় সারাটা দিনই এই কাজে লেগে যায়।

গ্রামের ভাষা :

শিউলিবনা গ্রামের প্রধান ভাষা হল বাংলা। কিন্তু এরা কথা বলে সাঁওতালি চলিত ভাষায়। এটা বাংলা ও তাদের নিজস্ব ভাষার যোগাযোগ। এদের ভাষা শ্রুতিমধুর। তাই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত এই গ্রামের ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ছাতনা থানার শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তরদিকের গায়ে যে শিলালিপি আছে তা খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের অর্থাৎ গুপ্তযুগের। এটি সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা। শুশুনিয়ার লিপিকে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি বলে মনে করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা :

শিউলিবনা গ্রামের রাস্তাঘাট কাঁকুড়ে লাল মাটির। রাস্তা উঁচু-নিচু হওয়ার কারণে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে। শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে শিউলিবনা গ্রামের রাস্তা এখন তুলনামূলকভাবে ভাল। শিউলিবনা গ্রামে যেতে হলে এখন কোনও অসুবিধা নেই। ছাতনা, বাঁকুড়া বা রাজ্যের যে কোনও জায়গা থেকে এই গ্রামে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অসুবিধা শুধু দূরত্ব। ছাতনা থেকে শিউলিবনা গ্রামের দূরত্ব ১৫ কি মি এবং বাঁকুড়া থেকে দূরত্ব ৪৫ কিমি। এখানের প্রধান যোগাযোগ বলতে বাস, ট্রেকার ইত্যাদি। শুশুনিয়া পাহাড় পর্যন্ত বাস যোগাযোগ এখন গড়ে উঠেছে।

গ্রামের লোকসংখ্যা :

১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী শিউলিবনা গ্রামের লোকসংখ্যা ২৯৩। বর্তমানে এই গ্রামে ৬২টি পরিবার বাস করে। এখানকার লোকসংখ্যা ৩৫০। সকলেই তফসিলি উপজাতির লোক। এরা সকলেই সাঁওতাল উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামের মোট ভোটারের সংখ্যা ১৭৫। পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে, এই গ্রামের লোকসংখ্যা, গ্রামের আয়তন, সম্পদ ও জীবিকার সঙ্গে সমতা বিধান করে চলেছে। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের ফলও এই গ্রামে পাওয়া গেছে।

হরিতকি, নানাবিধ শাক, রকমারি ছাতু (মাশরুম), মহুল তেল, কুসুম তেল, নিম তেল প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

৯। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালনায় অরণ্য।

১০। মোট কথা জঙ্গল না থাকার অর্থ মানুষের কষ্ট, এমন কি মৃত্যুও বলা যায়।

(ক) বৃক্ষরোপণে পুরুষের ভূমিকা :

শিউলিবনা গ্রামের পুরুষরা শিক্ষিত, কর্মঠ ও ক্রিয়াশীল। তারা শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৃক্ষরোপণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই সব প্রকল্প গ্রামসভাগুলিতে স্থির হয়। তাছাড়া স্থানীয় বনবিভাগের পদস্থ অফিসাররা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সাহায্য করেন। পুরুষেরা বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে। বিভিন্ন গ্রামসভাতে পুরুষরা বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে।

(খ) বৃক্ষরোপণে মহিলাদের ভূমিকা :

বৃক্ষরোপণে শুধু পুরুষরা কেন, বর্তমান আধুনিক সমাজের আদর্শে শিউলিবনা গ্রামের মহিলারাও বৃক্ষরোপণে উদ্যোগী হয়েছেন। বৃক্ষরোপণে মহিলাদেরও সমান অধিকার—তা আজ মহিলারা বুঝতে পারেন।

বাঁকুড়ায় মহিলাদের বৃক্ষরোপণ প্রকল্প কিছু কিছু শুরু হয়েছে। তারপর বনবিভাগের কর্মীরা বনসৃজনের কথা যখন বললেন তখন শিউলিবনা গ্রামের মহিলারা জঙ্গল গড়ার তাৎপর্য ও সুফল সম্পর্কে বুঝলেন। এই গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মহিলারা জঙ্গল গড়ার কাজে শুশুনিয়া পঞ্চায়েত ও সাধারণ মানুষের সাহায্য পান। বিভিন্ন গ্রামসভাতে অরণ্য রক্ষায় মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হল। এটা গ্রামের মহিলারা বুঝলেন ও সকলকে বোঝালেন। চোখের সামনে জঙ্গল সাফ হতে দেখলে মহিলারা বাধা দিতেন। সরকারি আলোচনায় মহিলারা বসলেন। বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি থেকে ৫ কি মি দূরে বোড়াপড়া গ্রাম, এই গ্রামের এক মেয়ে রাশি মুদির নেতৃত্বে ১৯৯০ সালে বন রক্ষা কমিটিতে গ্রামের মহিলারা যুক্ত হল এবং ফল হিসাবে ২০০ হেক্টর অরণ্যের ২৫ শতাংশ মালিকানা পেল বোড়াপড়া গ্রামের ৫৬টি পরিবার। ওই রাশি মুদি নামের মহিলাটি শিউলিবনা গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তাদের সবাইকে বোঝান অরণ্য রক্ষায় মেয়েদের অবদানের কথা।

> **আগে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু থাকলেও দীর্ঘকাল পঞ্চায়েতে কোনও নির্বাচন হয়নি এবং ভোটাধিকারও ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পঞ্চায়েতের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার কোনও সুযোগ ছিল না। দীর্ঘ ১৪ বছর পর ১৯৭৮ সালে প্রথম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র অবহেলিত মানুষের মধ্যে এক নতুন চেতনা জাগিয়েছে।**

গ্রামের শিক্ষা ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা :

এই গ্রামের মানুষের মনের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে গেছে অনেকদিন আগেই। শিক্ষা হল মানুষের বেঁচে থাকার উপায় বা অবলম্বন। শিক্ষাই মানুষকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলে। শিউলিবনা গ্রামে শিক্ষিতের শতকরা হার ৭০ শতাংশ। তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত (সাঁওতাল) মানুষের শিক্ষার এই হার যথেষ্ট ভাল এবং আশাব্যঞ্জক। শিক্ষার বিকাশে শুশুনিয়া পঞ্চায়েতেরও ভূমিকা আছে। এই গ্রামে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা পাওয়া গেছে। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষাতেও শিউলিবনা গ্রাম পিছিয়ে নেই। কিন্তু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই এই গ্রামে। বিদ্যালয়ে যেতে হলে ৫ কি মি পথ হেঁটে বা সাইকেলে যেতে হয়। তথাপি অভিভাবকদের অনুপ্রেরণায় উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা এ ক্লেশ স্বীকার করে নেওয়ায় গ্রামের শিক্ষা-চিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

শুশুনিয়া পঞ্চায়েত শিক্ষা বিষয়ক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষানবিশ শিবিরের ব্যবস্থা করে পরোক্ষভাবে শিক্ষার বিস্তারে সাহায্য করে। এখানে পুরুষ ও নারী উভয়েই শিক্ষিত। তবে তুলনায় এই গ্রামে নারী শিক্ষার হার কম। শুধু এই গ্রামই নয়, ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সারা দেশে মেয়েদের সাক্ষরতার শতকরা হার ৩৯। এ গ্রামে কোনও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। এই দুই স্কুলের দূরত্ব ৫ কি মি। তবে শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের গত গ্রাম সংসদে এই দুই বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। বাচ্চাদের জন্য পঞ্চায়েত অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়গুলি শেখানো হচ্ছে। সাক্ষরতার প্রকল্পেও সমান সাড়া পাওয়া গেছে। নব-সাক্ষরদের ধরে হিসাব করলে এই গ্রামে শিক্ষিতের শতকরা হার ভালই। প্রায় ৯০ শতাংশ যে সমস্ত পুরুষ ও নারী নিজের ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে তাদেরই সাক্ষর বলে আমাদের ধরে নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার ব্যাপারে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। অতীতে নারী শিক্ষার ব্যাপারে গ্রামের মানুষের উৎসাহ ছিল না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পর থেকে গ্রামে নারীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হতে দেখা যায় এবং নানা আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই আন্দোলন থেকে শিউলিবনা গ্রাম বাদ যায়নি। সামান্য কিছু পরিবার যাঁরা পাথর ভাঙার কাজ করেন, তাদের কয়েকটি পরিবারে শিক্ষিতের হার কম। এর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক অবস্থান।

এই গ্রাম নিকটবর্তী কলেজ বলতে অমরকানন। এর দূরত্ব শিউলিবনা থেকে প্রায় ২৫ কি মি। তাই স্নাতকস্তরে পড়াশোনা করতে

শিউলিবোনা গ্রামের এক কৃষকের বাড়ি — ছবি লেখক

ছেলেমেয়েদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। এই গ্রামের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি আছে যে নিজে শিক্ষিত হয়ে গ্রাম, জেলা ও দেশের উন্নতিতে সাহায্য করা।

স্বাস্থ্য :

শিউলিবনা গ্রামে সমীক্ষার সময় আমরা প্রত্যেক পরিবারে গিয়েছি। তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবং গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলাম। ২ জন স্বাস্থ্যকর্মী আছেন এই গ্রামটিকে দেখাশোনা করার জন্য। গ্রামের বিশেষত ৬০ বছরের উপর পুরুষ ও মহিলাদের স্বাস্থ্যের মান খারাপ। ১ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের জন্য কোনও উপযুক্ত ডাক্তার নেই এই গ্রামে এবং বাচ্চাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থাও নেই। সর্বোপরি গর্ভবতী মায়েদের বাচ্চা প্রসবের জন্য কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এখান থেকে ৬ কি মি দূরে। বিশেষ অসুবিধা হলে ছাতনা বা বাঁকুড়ার কোনও হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। শিউলিবনা গ্রাম থেকে ছাতনার দূরত্ব ১৫ কি মি ও বাঁকুড়ার দূরত্ব ৪৫ কি মি। শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের পরিচালনায় সারা ভারতবর্ষব্যাপী পাল্‌স পোলিও কর্মসূচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিউলিবনা গ্রামও অতি উৎসাহ নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করেছে। এই গ্রামে গত দুমাসে ৭০ শতাংশ বাড়িতে জ্বর হয়েছিল। তবে তার সবগুলি ম্যালেরিয়া নয়। এর কিছু অংশ ম্যালেরিয়া এবং বেশির ভাগ অবশ্যই সাধারণ জ্বর। তাছাড়া সর্দি, কাশি, ডাইরিয়া ইত্যাদি লেগেই আছে। বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের অর্থাৎ যাদের বয়স ৬০ বছরের উপর তারা প্রধানত চোখের নানা রোগ, বাত, হাঁপানি, হাঁটু ও কোমরের যন্ত্রণা, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ইত্যাদিতে ভুগে থাকেন। এই সব রোগের জন্য এঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে এঁরা প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে যান। বিশেষত যাঁরা পাথর ভাঙার কাজ করেন তাঁদের সংসার চলে কোনওক্রমে। তাঁদের অসুখ হলে তাঁরা Self-medication ব্যবস্থা অর্থাৎ দোকান থেকে অসুখের কথা বলে ওষুধ কিনে খান। আর সামান্য কিছু হলে এঁরা no medical care অর্থাৎ কোনও ব্যবস্থা নেন না। এই গ্রামে একটি আশ্রম আছে। নাম গীতা আশ্রম। এখানে কম খরচে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় এদের অবদান অনেক।

নিম্ন উপার্জনশীল পরিবারের ছেলেমেয়েরা অপুষ্টিতে ভোগে এবং ওই সকল পরিবারে ছেলেদের ২১ বছর এবং মেয়েদের ১৮ বৎসর আগে বিয়ে দেবার রেওয়াজ আছে এবং এর কুফল পড়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে। মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের পরিচালনায় শিউলিবনা গ্রামে ধোঁয়াহীন চুল্লিতে রান্না ও প্লেট বসানো পায়খানা ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়েছে। পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় নারী সমাজের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে চলেছে। অতিরিক্ত সন্তান পরিবারের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে দূষিত করে।

সুস্থ সন্তান প্রসবের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করা, নারী স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া এবং বন্ধ্যাকরণ প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করছেন এই গ্রামের মহিলারা। এ ব্যাপারে তাদের বাড়ির পুরুষরাও বিশেষভাবে সাহায্য করছেন। এই বিষয়গুলো শিউলিবনা গ্রাম ও শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের কাছে গৌরবের বিষয়।

শিউলিবনা গ্রাম ও শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ :

এই গ্রামটি ছোট, কিন্তু এর পরিবেশ, মানুষজন, সবাই বৃহৎ আকারের। পঞ্চায়েতপ্রধান এবং গ্রামসভার সদস্যা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে সন্ধান পেলাম। নিম্নে শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে দেওয়া হল।

১। গ্রামের রাস্তা তৈরি ও মেরামত,
২। বড় পুকুর খনন ও পরিষ্কার।
৩। বৃক্ষরোপণ,
৪। কৃষকদের ঋণদান,
৫। কৃষকদের বীজ / সার সরবরাহ,
৬। নলকূপ নির্মাণ,
৭। শিশুশিক্ষার জন্য অঙ্গনওয়ারি ব্যবস্থার প্রণয়ন,
৮। শিক্ষিত বেকারদের ঋণদান,
৯। ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে এক কামরাবিশিষ্ট ঘর নির্মাণ,
১০। খেলাধুলার জন্য ক্লাব ও বিভিন্ন সংঘকে অনুদান দেওয়া,
১১। কুটিরশিল্পে সাহায্য করা,
১২। মহিলাদের বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণদান :
   (ক) ধান থেকে চাল তৈরি করা
   (খ) মুড়ি ভাজা
   (গ) হাঁস / মুরগি পালন
   (ঘ) ছাগল পালন
১৩। পুরুষদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণদান :
   (ক) মৎস্য চাষ
   (খ) পোলট্রি
   (গ) গো-পালন
   (ঘ) নানা কুটিরশিল্পে ঋণদান
   (ঙ) শাকসবজি বিক্রয়
   (চ) দড়ি তৈরি
   (ছ) চাল বিক্রয়
১৪। সাধারণের ব্যবহার্য পুকুর, গোচারণ ভূমি, শ্মশান ইত্যাদি সংরক্ষণ
১৫। ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা বা অন্য কোনও ছোঁয়াচে রোগ যাতে না ছড়ায় তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া
১৬। সমবায় প্রথায় চাষ
১৭। হাটবাজার সংরক্ষণ, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন
১৮। সাংস্কৃতিক কাজকর্ম এবং খেলাধুলার উন্নতির ব্যবস্থা
১৯। পতিত জমি উদ্ধার, জমি সংরক্ষণ এবং জমির উন্নয়ন।

উপরে বর্ণিত কাজগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই কাজগুলি মূলত তিন ধরনের। কিছু কাজ আছে যার লক্ষ্য গ্রামবাসীদের যৌথ জীবনের স্বার্থে কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। কিছু কাজের উদ্দেশ্য গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি। আবার কিছু কাজ আছে যার লক্ষ্য সামাজিক সুবিধার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য গ্রামীণ প্রশাসনকে উন্নত করা। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে গ্রামটিতে যে শাসনব্যবস্থা ছিল না তা নয়, তা ছিল মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিদের কুক্ষিগত। এই দু-একজন ধনী ব্যক্তি তাঁদের ইচ্ছামত গ্রামের শাসনকাজের দায়িত্ব দিতেন এবং বহু ক্ষেত্রে তাঁরা স্বেচ্ছাচারীর পরিচয় দিয়ে বেশির ভাগ গ্রামবাসীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেন। এই ব্যবস্থায় তা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

অতীতে অর্থের দিক থেকে দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার, আজেবাজে ভাষা ব্যবহার, জুলুমবাজি, মহিলাদের প্রতি অসভ্য আচরণ ইত্যাদি যা হত এখন তা অনেকটা বিলোপের পথে। বর্তমানে এদের ব্যক্তিস্বাধীনতা (চলাফেরা, কথা বলা) যথেষ্ট বেড়েছে।

গত বৎসর গ্রামে বিদ্যুতের আলো জ্বলা শুরু হয়েছে। এর ফলে গ্রামবাসীদের আর অন্ধকারের মধ্যে রাত্রি যাপন করতে হয় না। আলো আসার ফলে গ্রামবাসীগণ প্রয়োজন অনুসারে অধিক রাত পর্যন্ত এ বাড়ি ও বাড়ি চলাফেরা করতে পারেন।

শিউলিবোনা গ্রামে গাছের ডালে সংরক্ষিত গরুর খাদ্য ও ঘরছাউনির কাজে ব্যবহৃত খড়

গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা :

শিউলিবনা গ্রামের প্রত্যেক পরিবার ও শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান, শিউলিবনা গ্রামসভার সদস্য এবং ওই পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এবং সর্বোপরি আমাদের সমীক্ষা অনুযায়ী শিউলিবনা গ্রামটির অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতশীল বলা যায়। সাঁওতাল গোষ্ঠী নিয়ে শিউলিবনা গ্রামটি গঠিত। এদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশি। মাথাপিছু আয় যাদের চারশো টাকার কম তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্ন ও যাদের উচ্চ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল বলা যায়। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর করে। শুশুনিয়া পঞ্চায়েত শিউলিবনা গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে দৈনিক মজুরিতে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করা। এখানে দৈনিক মজুরি ৫৬ টাকা। গ্রামের রাস্তাঘাট উন্নতির জন্য লোকনিয়োগ, কুটিরশিল্পে ঋণদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। শিক্ষার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব পড়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। গ্রামের শিক্ষা, শিল্প, চাষবাস, পঞ্চায়েত পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন—এই সবের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন জড়িত আছে। সাঁওতাল উপজাতির মানুষ দিয়ে গড়া এই গ্রাম, এরা কর্মঠ ও পরিশ্রমী। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহিলাদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৮ সালের হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে মেয়েদের সাক্ষরতার শতকরা হার ৩৯ জন এবং সংগঠিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের স্থান নিম্নমুখী। ১৯৯৩ সালের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এবং বলা হয় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন পঞ্চায়েতে সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। এই গ্রামে একজন পঞ্চায়েত সদস্য আছেন।

তারই উপর অনেকটা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের গ্রাম সংসদে ওই সদস্যাই শিউলিবনা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই এই গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের স্থান আছে। যেসব মহিলা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়ে স্বনির্ভরশীল হন, যেমন মুড়ি ভাজা, হাঁসমুরগি পালন, শালপাতার জিনিস তৈরি, শাকসবজি বিক্রয় বা পাথর ভাঙার কাজ করে নিজেরা স্বনির্ভরশীল হন এবং পরোক্ষভাবে তাঁরা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করেন।

গ্রামের কুটিরশিল্প ও পর্যটনশিল্প :

শিউলিবনা গ্রামে কোনও বৃহৎ বা মাঝারি শিল্প নেই। তবে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নানা কুটিরশিল্প। যেমন শালপাতার কাজ, চাটাই বোনা বা পাথর কাটা ইত্যাদি।

বর্তমানে পর্যটনশিল্পে বাঁকুড়া জেলা পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গাছপালা, লাল মাটির রাস্তা, মাঝে মাঝে ছোটবড় টিলা, ধাপ কেটে চাষ—এসব দৃশ্যও মনোরম। সর্বোপরি যার জন্য পর্যটকরা শিউলিবনা গ্রাম ও আশপাশে আসেন সেটি হল শুশুনিয়া পাহাড় (১৪৪২ ফুট)। তবে শুশুনিয়া পাহাড়টি অবশ্য এই গ্রামে অবস্থিত নয়। তবে খুবই কাছে। গ্রাম থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩ কি মি। শুশুনিয়া ছাত্র-যুব আবাস আছে। যেটি শুশুনিয়া পাহাড় থেকে ৫ কিমি দূরত্ব। তাছাড়া ছাতনা হল চন্ডিদাসের লীলাভূমি। শুশুনিয়া পাহাড়ের কিছু দূর পর্যন্ত বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে।

গ্রামের সাংস্কৃতিক উৎসব :

শিউলিবনা গ্রামের মানুষ সংস্কৃতিপ্রিয়। সুস্থ সংস্কৃতির জন্য শিউলিবনা গ্রামের মানুষ, শুশুনিয়া পঞ্চায়েত, গ্রামসভার সদস্য ও সদস্যারা এবং বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনগুলি যথেষ্ট উদ্যোগী হন। পঞ্চায়েত পরিচালিত বিভিন্ন গ্রামসভায় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করা হয়। গ্রাম সংসদের আসরের শেষে আবৃত্তি, বিতর্ক ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। শিউলিবনা গ্রামে একটি আশ্রম আছে। তার নাম গীতা আশ্রম। প্রতি বছর ১ জানুয়ারি এই আশ্রমে উৎসব হয়। এখানে সাঁওতালি গান ও প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে গান-বাজনা হয়। এদের পার্বণের সময় সমবেতভাবে মাদল সহযোগে সাঁওতালি গান এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য. তাছাড়া খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হয় এই গ্রামে।

এই গ্রামটি মহিলা প্রধান পঞ্চায়েতের অধীন

আমাদের দেশে সামাজিকভাবে মেয়েদের যুগ যুগ ধরে গৃহবন্দী করে রাখার ফলে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু প্রাচীনকালে নারীকে যত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত তা পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রায়শই উচ্চারিত মনুর শ্লোকে প্রকাশিত—'যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতা' অর্থাৎ নারীকে যেখানে পূজা করা হয় সেখানেই দেবতারা বিরাজ করেন। কিন্তু বর্তমানে নারী তো পূজা পায় না—সে চায় পুরুষের সমান অধিকার।

গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নারীদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে লোকসভাতেই সংবিধানের ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধন করে। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। এই আইন পাস হয় ১৯৯২ সালে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা। তারপর ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। এর আগে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু থাকলেও দীর্ঘকাল পঞ্চায়েতে কোনও নির্বাচন হয়নি এবং ভোটাধিকারও ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পঞ্চায়েতের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার কোনও সুযোগ ছিল না। দীর্ঘ ১৪ বছর পর ১৯৭৮ সালে প্রথম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র অবহেলিত মানুষের মধ্যে এক নতুন চেতনা জাগিয়েছে। নিচুতলার দরিদ্র মানুষের এই আত্মবিশ্বাস ও জাগরণ গ্রামীণ জীবন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চায়েত নির্বাচনে (১৯৯৩) রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে পঞ্চায়েতের প্রতি স্তরে আদিবাসী উপজাতির জন্য আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত আসন সংখ্যার (তফসিলি জাতি উপজাতি সমেত) এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। এই সংরক্ষিত আসন আবার ঘুরে-ফিরে হয়। (৪নং ধারা অনুযায়ী)। প্রধান এবং উপপ্রধানের পদ দুটিও তফসিলি জাতি/উপজাতি জনসংখ্যা এবং

আদিবাসী শ্রমজীবীদের মহুয়ার সুরা পান — ছবি : লেখক

সমস্ত জনসংখ্যার অনুপাত বিচার করে সংরক্ষণের অনুপাত স্থির হয়। (১নং ধারা)। আবার যে কোনও তফসিলি জাতি/উপজাতির মানুষ এবং ওই সব ঘরের মহিলারা যাঁরা এই সংরক্ষণের আওতার মধ্যে পড়লেন তাঁরা সংরক্ষিত আসন ছাড়া সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সুতরাং চতুর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে (১৯৯৩) ৩৫,০০০ গ্রামে ৫৬,০০০ প্রতিনির্ধির মধ্যে ২২,০০০ মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। পঞ্চম পঞ্চায়েত নির্বাচনে (১৯৯৮) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ১৮৭৬ জন প্রতিনিধি, তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৫৪২।

গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬১,৩১০টি আসনের মধ্যে সাধারণ মহিলা ১৩,৫৫৩, তফসিলি জাতি ৬,২৫৬, তফসিলি উপজাতি ১,৬৮০, মোট ২১,৪৮৯ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রধান, উপপ্রধান, পদগুলোতেও এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ফলে অনেক মহিলা নির্বাচিত হয়ে কাজ করছেন।

এই শিউলিবনা গ্রামটি থেকে একজন মহিলা পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আছেন শুধু তাইই নয়, এই পঞ্চায়েতটি মহিলা প্রধান দ্বারা পরিচালিত।

জনসাধারণের যে অংশে যেখানে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধির সদম্ভ উপস্থিত, কেবল তথাকথিত সভ্যসমাজকে উপহাস করছে না, ভারতের সার্বিক উন্নতির পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। উপজাতিরা এই হতভাগ্য জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশ।

উপজাতিরা যাতে তাদের আর্থিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারে, সেজন্য পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে, যেমন— খাস জমি বণ্টন এবং সেই জমিতে স্বামী ও স্ত্রীকে যৌথ পাট্টাদান, চাষযোগ্য জমি কিনে দেওয়া, বিভিন্ন ধরনের মধ্যমেয়াদি ঋণ দান, সেচের ব্যবস্থা করা, ডোকরা, ট্রাইসেম ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি।

মহিলারা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সুতরাং তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে কাজকর্মের ধারাকে অব্যাহত রাখতে গিয়ে নিজেদেরকেও স্বনির্ভর হয়ে প্রযুক্তিগতভাবে যাতে উন্নত করা যায় তার জন্য বিভিন্নভাবে কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। কর্মশালার আলোচ্য বিষয় মূলত হয় পঞ্চায়েতে সুযোগ-সুবিধা মহিলারা কিভাবে ব্যবহার করে নিজেদের স্বনির্ভর করা যায় যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে।

এটা তো ঠিক, এখনও আমাদের দেশে সব রকম উন্নয়নের দিক থেকে নারীসমাজ পিছিয়ে। পঞ্চায়েতের প্রকল্পগুলির সাহায্যে এই পিছিয়ে পড়া নারীসমাজকে স্বনির্ভর করার চেষ্টা হচ্ছে।

শিউলিবনা গ্রাম ও শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের আগামী কর্মসূচি :

শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতের বার্ষিক সভায় আগামী দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গত আর্থিক বছরে সব কাজকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এই সব কর্মসূচি গ্রহণ করার সময় পঞ্চায়েতপ্রধান, গ্রামসভার সদস্য, পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যরা এবং গ্রামের বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, মহিলা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিল। এদের সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি আগামী আর্থিক বছরে প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

১। শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। (এখনও গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই)

২। সকলের সমবেত চেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

৩। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বৃদ্ধি করা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা।

৪। পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য আবেদন করা।

৫। কুটিরশিল্পের জন্য ঋণদান।

৬। গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত।

৭। সেচব্যবস্থার জন্য পুকুর ও দীঘি খনন করা।

৮। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনভূমি সংরক্ষণ করা।

৯। গ্রামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

১০। কুয়ো ও নলকূপ নির্মাণ করা এবং তার সঙ্গে কৃষিজমির সেচের জন্য গভীর নলকূপ নির্মাণ।

১১। ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টন করা।

১২। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের ঋণদান, যেমন মুড়িভাজা, গো-পালন, হাঁসমুরগি পালন, চাল তৈরি ইত্যাদি।

১৩। পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানো। সাধারণত নারীর বাহুতে যে শক্তি আছে তাকে আমরা অবহেলা করি, উন্নয়নের কাজে লাগাই না। এতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এর জন্য বিভিন্ন কাজে মহিলাদের যোগদানে উৎসাহ দিতে হবে।

১৪। সার্বিক উন্নয়নের জন্য চাই শিক্ষা। তাই প্রত্যেক পরিবার, গ্রামের সাধারণ মানুষ ও সর্বোপরি পঞ্চায়েতকে দেখতে হবে যাতে গ্রামের সমস্ত বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যায়। যদি না যায় তার কারণ অনুসন্ধান করা।

১৫। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে অস্থায়িভাবে নিয়োগ করে শ্রমের মর্যাদাদান।

১৬। স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তদান, জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বিভিন্ন শিবিরের আয়োজন করা। এই সমস্ত আয়োজনের মাধ্যমে গ্রামের সকল মানুষকে স্বাস্থ্য বিষয়ে উন্নতির পথে শামিল করতে হবে।

১৭। ব্যয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণদানের ব্যবস্থা করা।

১৮। Low cost Latrine প্রকল্পের মাধ্যমে সকল পরিবারকে অল্প খরচে এই ব্যবস্থার সুবিধাদানের সুযোগ করে দিতে হবে।

১৯। ধূমহীন চুল্লির জন্য পরিবারকে উৎসাহ দান। যাতে সকলে এই চুল্লির ব্যবহার করে।

২০। কৃষকদের বীজ, সার সরবরাহ করা এবং সরকারের তরফ থেকে কৃষি-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কৃষকদের চাষাবাদ সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

উপসংহার :

শিউলিবনা গ্রামটি খুবই ছোট। কিন্তু এখানকার মানুষজনের ব্যবহার খুবই মধুর। সব উন্নয়নের মূল কথা মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উন্নয়ন। এই গ্রামের উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে গেলে প্রত্যেক পরিবারকে, পঞ্চায়েত এবং সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা শিউলিবনা গ্রাম ও শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের যে যে তথ্য দিলাম সেগুলোর জন্য আমরা শুশুনিয়া পঞ্চায়েত প্রধান, এই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য / ব্লক আধিকারিক এবং সাধারণ লোকের উপর নির্ভর করেছি। আশা করি, তারা সকলেই সঠিক তথ্য পরিবেষণ করেছেন। শিউলিবনা ছাতনা ব্লকের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত একটি অনুন্নত গ্রাম হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু শিউলিবনা গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কৃষি ও পশুপালনে উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রগতি সুনিশ্চিত করে, গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুফল লাভ করে, মানবসম্পদ বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আর অনুন্নত গ্রাম হিসাবে পরিচিত হতে চায় না। বর্তমানে শিউলিবনা গ্রামের সমস্ত মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গ্রামের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শরিক হয়ে একটি উন্নয়নশীল গ্রাম হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করার নিরন্তর প্রচেষ্টায় রত। শুধু সংবিধান, আইন বা রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করতে পারে না। গণ-সমর্থন ও গণ-উদ্যোগই পঞ্চায়েতের শক্তির উৎস। এই শক্তির প্রকাশ যত ঘটবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ ততটাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। পঞ্চায়েত ততটাই সফল হবে। পঞ্চায়েতের অনেক দায়িত্ব। এদের কাছে প্রত্যাশা অনেক। এই প্রত্যাশাগুলি পূরণ করে পঞ্চায়েত কতখানি স্থানীয় স্তরের গণতান্ত্রিক সরকার হিসাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে তার উপর নির্ভর করবে গণতান্ত্রিক শক্তির সংহতি ও বিকাশ এবং গ্রামের উন্নতি।

সহায়ক রচনা :

১। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত মহিলাদের যোগদান : সক্ষমতার পথে : ভোলানাথ ঘোষ, অর্থনীতি রাজনীতি। পৃষ্ঠা : ২০-২৫, ১৯৯৯, কলিকাতা।

২। চল যাই গ্রাম সংসদে : দিলীপ মণ্ডল, গণশক্তি, ২৬.০৫.৯৯।

৩। মেয়েরা সেই তিমিরেই : মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার, ৮.৯.৯৯।

৪। 'বাঁকুড়া' প্রবন্ধ : ভজনকুমার দত্ত (পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র যুব উৎসব, ১৯৯৮)।

৫। পঞ্চায়েত : গ্রামবাংলার রূপান্তর ও মহিলাদের অংশগ্রহণ : ভোলানাথ ঘোষ, অর্থনীতি রাজনীতি, তৃতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা : ২৯-৩২।

লেখক : অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট সমাজবিদ্যা গবেষণা বিভাগ।

রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে পাথরের রথ, বিষ্ণুপুর
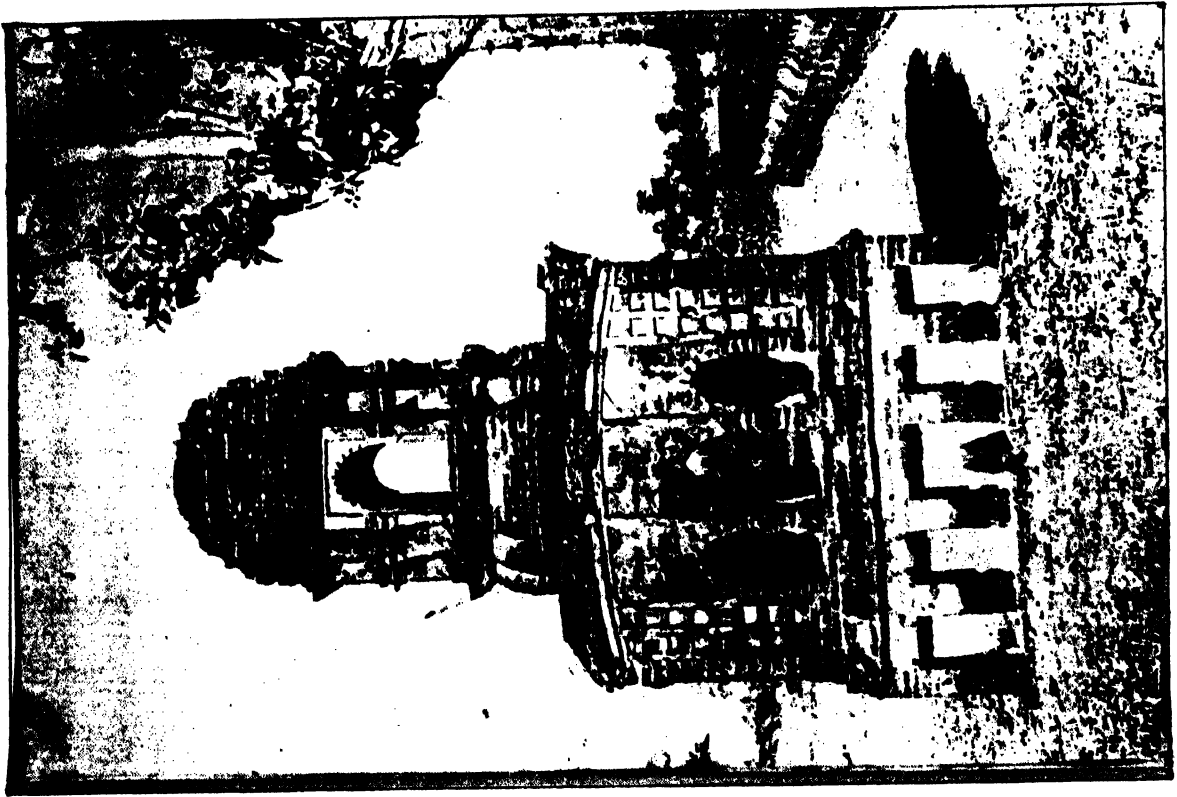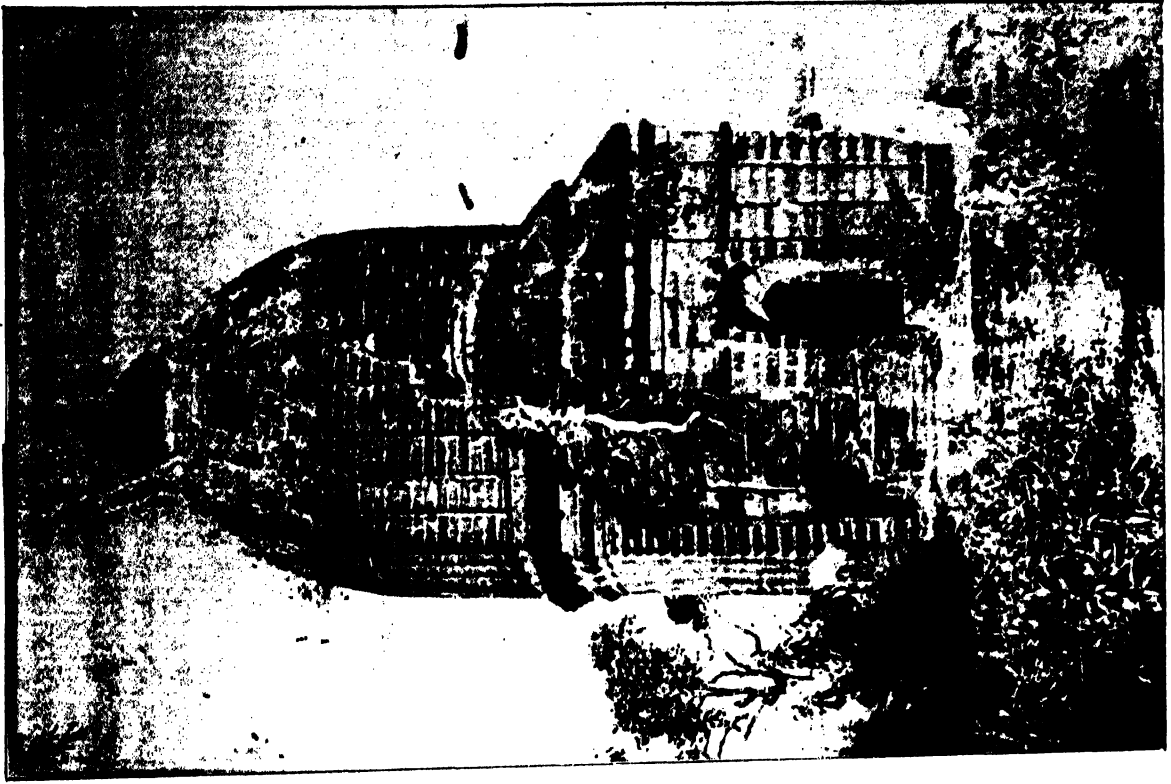
জগমোহন সমেত ওড়িশা রীতির পাথরের দেউল, বিষ্ণুপুর

শিশুশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় বাঁকুড়া জেলা

অনিলবরণ বিশ্বাস

বর্তমানে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে আবেগ সূচিত করছে। এর প্রতিফলন অনিবার্যভাবে পড়েছে জেলার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে। প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। নতুন প্রজন্ম বিদ্যালয়ে আসায় প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাবনা আর সমস্যা দুইই দেখা দেয়। জেলার শিক্ষা পরিকাঠামোকে আরও সমৃদ্ধ করা জরুরি।

জেলার অবস্থান

ত্রিভুজাকৃতি বাঁকুড়া জেলার প্রতিবেশী জেলাগুলি হল মেদিনীপুর, হুগলি, পুরুলিয়া ও বর্ধমান। জেলার ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। পাহাড়, নদী, লাল কাঁকুরে মাটি, জেলার প্রাকৃতিক বৈভব আর বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখেছে। প্রধান কৃষি ফসল হল ধান আর প্রধান জীবিকা হল কৃষি। ভূপৃষ্ঠের অবস্থান অনুসারে জেলার পূর্ব ও দক্ষিণমুখী ঢাল থাকায়, বৃষ্টির জল ধরে রাখার সুবিধে নেই। তাই মাটির নিচের জলকে ঘিরেই যত নড়াচড়া। জেলার বড় বড় বাঁধ, পুষ্করিণী সেচ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। কংসোবতীর দাক্ষিণ্য আছে বলে কৃষিক্ষেত্র সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

জেলার আয়তন	: ৬৯৩৫.১৭	বর্গ কিলোমিটার
লোকসংখ্যা	: ২৮,০৫,০৬৫	(১৯৯১ জনগণনা)
স্ত্রী	: ১৩,৬৭,৫৫০	”
পুরুষ	: ১৪,৩৭,৫১৫	”
তফসিলি	: ৮,৭৯,৯৩১	”
আদিবাসী	: ২,৮৯,৯০৬	”
অন্যান্য	: ১৬,৩৫,২২৮	”

উন্নয়নের প্রাঙ্গণে বাঁকুড়া :

উপরের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জেলা ছিল পিছিয়ে পড়ার সারিতে। হতদরিদ্র এই জেলার একটি বড় অংকের জনসংখ্যা অস্তিত্বের সঙ্কটে দিনাতিপাত করতো। সরকারি ত্রাণ খয়রাতি সাহায্য ছিল এইসব মানুষের কাছে প্রধান অবলম্বন। ভিক্ষাবৃত্তি ছিল পরিচিত পেশা! বিগত ২০-২২ বছর এই অঙ্গরাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকেন্দ্রিত গণতন্ত্রধর্মী এক গণমুখী কার্যক্রম জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনেছে এক নীরব বিপ্লব। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পকে ঘিরে নতুন আশার আলো দেখা দেয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আসে নতুন সমাজজীবনের প্রত্যাশা। জীবনের আনাচে-কানাচে ভরে ওঠে সম্ভবনায়, সচেতন মানুষ চায় সক্ষম হতে—চায় নিরক্ষরতা হতে মুক্তি।

সাক্ষরতার আন্দোলন শুরু হয়। বাঁকুড়া জেলার ৭ লক্ষাধিক নিরক্ষর মানুষকে ঘিরে সাক্ষরতা অভিযান সফলতা লাভ করে। বাঁকুড়া জেলা অতঃপর সাক্ষর জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রাপ্ত সম্মানবোধকে ঘিরে বাঁকুড়া জেলার শিক্ষা আন্দোলন সাক্ষরোত্তর

অঙ্গনওয়াড়ির শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা

পর্যায়ে কাজ শুরু করে একটু বিলম্বিত লয়ে। বর্তমানে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে আবেগ সূচিত করছে। এর প্রতিফলন অনিবার্যভাবে পড়েছে জেলার প্রাথমিক শিক্ষক্ষেত্রে। প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রথম প্রজন্ম বিদ্যালয়ে আসায়—প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাবনা আর সমস্যা দুইই দেখা দেয়। জেলার শিক্ষা পরিকাঠামোকে আরও সমৃদ্ধ করা জরুরি।

প্রাথমিক স্তরে ছাত্রভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে

পিছিয়ে-পড়া এলাকায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র

জেলার শিক্ষা স্বার্থবাহী পরিকাঠামো চিত্র :

মহকুমা সংখ্যা	৩	মেডিকেল কলেজ	১
পঞ্চায়েত সমিতি	২২	জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজ	৩
প্রাথমিক শিক্ষা		সংগীত মহাবিদ্যালয়	১
প্রশাসনিকচক্র	৪৫	জুনিয়ার হাই	১৩১
গ্রাম, ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি	২৪৮৩	জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা	৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৬২	মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	২১৯
ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	৩,৭০,০০০	উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯২
শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা	৮,১০০	মহাবিদ্যালয়	১৪
যে শূন্য শিক্ষক পদে		শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	০
নিয়োগ হতে চলেছে	২,০০০	ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা	১
শিশুশিক্ষা কেন্দ্র	২৩০	আই টি আই	১
আই সি ডি এস	২৮১৯	ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১
		সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা	১
		গ্রামীণ গ্রন্থাগার	১৩১
		জনগ্রন্থাগার	২২

সংসদের নতুন ভবন (৪ তলা) নির্মাণের কাজ সমাপ্তির মুখে।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি জরুরি হয়ে পড়ায় এবং প্রত্যন্ত এলাকায় পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য শিশুশিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ৪০ উর্ধ্ব মাধ্যমিক পাস ২ জন শিক্ষিকা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে মোট ২০০ কেন্দ্র চালাচ্ছেন। পড়ুয়া ও এলাকার মানুষের সদিচ্ছা ও উৎসাহ প্রতিভাত হচ্ছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। পোশাক ও বই দেওয়া হচ্ছে।

কেন শিশুশিক্ষা জরুরি :

মানবজীবনের প্রথম ১০টি বছরের শৈশব অধ্যায় সৃষ্টিশীল মননশীলতার অনুকরণ ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে লালিত হয় তার কিশোর ও পরবর্তী জীবনের গণমুখী ভিত্তি। তাই যে সমাজব্যবস্থা শিশুসম্পদের বৃদ্ধি ও বিকাশে যত্নশীল হয়—সে সমাজব্যবস্থাতেই সমৃদ্ধ হয় মানবসম্পদ। সুস্থ প্রাণবন্ত শিশুই হল জাতীয় জীবনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

শিশুদের খুশি পড়ুয়া করে তোলা :

সুস্থ শিশু বলতে বোঝায় শিশুটি দেহ-মনে সুস্থ। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আন্দোলন একমুখী হওয়া জরুরি। সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেছে ডি পি ই পি কার্যক্রমকে। সকল ৫—৯ বছরের শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ধরে রাখা এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জেলার কার্যক্রমে নতুন গতি এসেছে। কন্যাশিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কাছেও এই কার্যক্রম পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। ভাঙাচোরা স্কুলবাড়ি সংস্কার—নতুন স্কুলবাড়ি নির্মাণ—এই কার্যক্রমের অন্তর্গত।

জেলা ডি পি এস সি ও জেলা ডি পি ই পি :

শ্রেণীপঠনকে আনন্দমুখর এবং সহজে গ্রহণযোগ্য এক কথায় আকর্ষণীয় করার জন্য জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ এবং ডি পি ই পি—একযোগে কাজ করে চলেছে। বিদ্যালয় ছুট বন্ধ করার লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে। ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে এই পর্যায়ে আরও উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঘিরে গ্রাম/ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। সদস্যাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। কন্যাশিশুদের ঘিরে, মহিলাদের/মায়েদের আরও উদ্যোগী করার জন্য জেলার কোতলপুর ও রানীবাঁধ দুটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বিশেষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জাম ব্যবহার আবশ্যিক করা হয়েছে। জেলাভিত্তিক সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ওপরে দাঁড়িয়ে ২০০১ সাল জুড়ে কার্যক্ষেত্রে নতুন মাত্রা পাবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে কয়েকটি উদ্যোগ কার্যকরী ভূমিকায় রয়েছে—

স্বাস্থ্য / ক্রীড়া অভ্যাস ও অনুশীলন :

স্বাস্থ্যমুখী কর্মসূচি : প্রতিটি শিশুকে (বিদ্যালয়ভিত্তিক) স্বাস্থ্যকার্ড দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ ও সহায়তা থাকছে সূচনাপূর্বে। কিন্তু বিষয়টি যাতে শিক্ষকরা বুঝে নিতে পারেন—তার উদ্যোগপর্ব চলছে।

'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের জন্মগত অধিকার' —স্লোগানের মিছিলেও শোনা যায় সেই আওয়াজ

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে শৌচাগারের সুষ্ঠ ব্যবস্থা থাকে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের আর্থিক ক্ষমতায় এটা করা বোধহয় সম্ভব হবে না। জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির কাছে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হবে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশুর স্বাস্থ্য অভ্যাস অনুশীলন : যেমন হাত ধুয়ে খাদ্যগ্রহণ/আঢাকা খাবার না খাওয়া—পরিষ্কার পানীয় জল ব্যবহার—নখ কাটা/দাঁত মাজা/চুল আচড়ান ইত্যাদি।

আই সি ডি এস কেন্দ্র :

খেলাধুলার চর্চা ও সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ। এ জন্য জেলায় সম্প্রতি ১০০ জনকে বিশেষ ক্রীড়া প্রশিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকরা উৎসাহের সঙ্গে এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যালয়পিছু ১ জন শিক্ষককে এই ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। জেলাভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরও প্রাধান্য পাবে।

শিক্ষার মানোন্নয়ন :

জেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষের শুরুতে (দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী একটি বহির্মূল্যায়ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে গত ২ বছর। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ পাঠদান কর্মসূচি গৃহীত হচ্ছে। প্রাথমিকে ইংরেজি বিষয় শিক্ষাদানকে যথাযথ ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রতি বিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষককে বিশেষভাবে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়েছে।

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য আকর্ষণীয় পুস্তক ভান্ডার রাখার উদ্যোগ নিয়েছে ডি পি ই পি।

জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সামনে যে জরুরি কাজ রয়েছে :

(১) এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক দেওয়া।
(২) প্রতিটি বিদ্যালয়ের বর্ষভিত্তিক ২০০০.০০ টাকার উন্নয়ন তহবিল এবং পঠন-পাঠন উপযোগী শিক্ষাসহায়ক সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য শিক্ষকপিছু ৫০০.০০ টাকার (প্রতি বছরে) যথার্থ সদ্ব্যবহারে সাহায্য করা।
(৩) প্রতি ছাত্র-ছাত্রীকে স্বাস্থ্যকার্ড দেওয়া এবং তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ। (শিক্ষককে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে)
(৪) প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে ১ জন শিক্ষককে ক্রীড়াশিক্ষায় প্রশিক্ষণ দান। (ডি পি ই পি-র অর্থানুকূল্যে)
(৫) প্রতিটি বিদ্যালয়ে শৌচাগার করার উদ্যোগ নেওয়া এবং জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
(৬) বহির্মূল্যায়নের নিরিখে নির্ধারিত পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সহায়ক পাঠদান কর্মসূচি অনুসরণ। (রাজ্য পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিক্রমে)
(৭) নতুন ৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ (ডি পি ই পি'র অর্থানুকূল্যে অবশ্যই শৌচাগার সহ)
(৮) নতুন শিক্ষক নিয়োগের কাজকে দ্রুত শেষ করা। (নিয়োগজনিত কাজ তৎপরতার সঙ্গে চলছে)
(৯) সংসদের নতুন ভবনের উদ্বোধন।
(১০) বিদ্যালয় পরিদর্শন কাজকে নিয়মিত করা।

উপসংহার—

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির মানকে যথাযথ স্থানে নিয়ে যাবার জন্য চাই সমন্বিত উদ্যোগ। আই সি ডি এস/সাক্ষরতাকেন্দ্র শিশুশিক্ষাকেন্দ্র/প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সকলের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগের/পঞ্চায়েত/পৌরসভা/কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য।

জেলার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে সব শিশুকে আনা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিদ্যালয় ছুট বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ। শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ছাড়ার, বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়াদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের সময় নির্ধারণ।

কৃষি মরসুমে জেলান্তরে (সেই পরিবারে শিশুপড়ুয়া সহ) চলে যাওয়ার জন্য বিদ্যালয় ছুটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর জন্য ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয় করার কথাও ভাবতে হবে। ভাবতে হবে শিশুশ্রমিক হিসেবে যারা বাধ্য হয়ে নিয়োজিত আছে তাদের পড়ার ব্যবস্থা করার। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ ও ডি পি ই পি কার্যকরীভাবে উদ্যোগী থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। শিক্ষাদরদী সকল মানুষের সদিচ্ছা আর সহযোগিতা পূরণ করবে আমাদের গৃহীত অঙ্গীকারকে।

লেখক : সভাপতি বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

উচ্চশিক্ষা ও ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশন

সুধনকুমার মিত্র

বাঁকুড়া শহরের অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডস্থিত মেথডিস্ট মিশন কর্তৃপক্ষ হাইস্কুলের সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট কলাস্তরের পঠন-পাঠনের অনুমতি দান করে। এইভাবে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই এই জেলার প্রথম কলেজ, ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রেভাঃ জন মিচেল।

জেলার সদর শহর বাঁকুড়া। এর প্রধান সড়ক পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। তার ধার ঘেঁষে বরাবর নিচু পাঁচিল ঘেরা, গাছগাছালি সমাকীর্ণ এক বিশাল এলাকা। যার দুদিকে প্রশস্ত খেলার মাঠ, মাঝামাঝি বিশাল বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে দোতলা কলেজ ভবন। মনে হয় যেন কোনও কালে প্রায় নিখুঁত ছকে আঁকা--দুপাশের মাঠ ঘেঁষে দুটি ছাত্রাবাস, মাঝখানে বিশাল দীঘি, আর তার চারপাশ ঘিরে মোরামের রাস্তা, কিছু গাছগাছালি। প্রায় ১১৯ বিঘে জমির ওপর কলেজের ক্যাম্পাস, কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ অভাবে কিছুটা হতশ্রী। কলেজটি এ জেলার প্রাচীনতম ঐতিহ্যমণ্ডিত অতীতের ওয়েসলিয়ান কলেজ, যা আজ বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজ নামে সুপরিচিত।

(ক) ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশন ও শিক্ষার সূচনা :

'ওয়েসলিয়ান' নামের তাৎপর্য হয়তো আজ অনেকের কাছে অজানা, কিন্তু এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা খ্রিশ্চিয়ান মিশনারি সংস্থার অতীত ইতিহাস। অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সমকালীন ধর্মসংস্কার আন্দোলন 'মেথডিস্ট মুভমেন্ট' নামে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন এক নগণ্য অখ্যাত যাজক জন ওয়েসলি, যাঁকে মদত জুগিয়েছেন তাঁরই ভাই চার্লস ওয়েসলি। বলা বাহুল্য 'ওয়েসলিয়ান' কথাটি এঁদের নামের সূত্রে পাওয়া। তবে নাম ছাড়া আরও বিশেষ কিছু তদানীন্তন ইংল্যান্ডের সমাজ এঁদের কাছ থেকে লাভ করেছিল।

তখন পশ্চিম ইউরোপ 'পায়েটিসম্' দ্বারা এবং সমকালীন ইংল্যান্ড 'এভ্যানজেলিকালিসম্' দ্বারা উদ্বেলিত। আবার এই দুই স্রোতের সংমিশ্রণ ঘটেছে যা 'মেথডিস্ট' সংস্কারবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। একই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাচ্যে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলশ্রুতি ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন এবং কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলোপ ও ভারতে বিদেশি খ্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের অবাধ প্রবেশ ও ধর্মপ্রচারের সুযোগ লাভ। এ সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই সময় ইংল্যান্ডে একাধিক মিশনারি সংস্থা গড়ে ওঠে, যাদের মধ্যে মেথডিস্ট মিশনারি সোসাইটি অন্যতম। ওই সংস্থা থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারত তথা বাংলাদেশে মিশনারিরা এসেছেন।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে সর্বপ্রথম সরকারিভাবে ভারতীয়দের শিক্ষাদানের বিষয় এবং ওই খাতে অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয়। কিন্তু কার্যত বেসরকারি ও খ্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের উদ্যোগে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ভারত তথা বাংলাদেশে চালু হয়।

মিশনারিরা সাধারণত ধর্মপ্রচারের সঙ্গে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করেন, কারণ এভ্যানজেলিক্যালপন্থীরা এই ধারণা পোষণ করতেন যে তাঁদের ধর্মতত্ত্বের অনুধাবন ও অনুশীলন শিক্ষা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তাই নিজ দেশে যারা নামমাত্র খ্রিশ্চিয়ান বলে পরিচিত ছিল তাদের ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে এঁরা প্রেরণা লাভ করেন বিদেশে মিশনারি কাজে ব্রতী হবার। এঁদের ধারণায় আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্ব মানবসমাজ যেন দ্বিধা বিভক্ত ছিল—একদিকে এভ্যানজেলিক্যালপন্থী খ্রিশ্চিয়ান, অন্যদিকে অবশিষ্ট যারা এবং যাদের মুক্তির জন্য এঁরা উদগ্রীব ছিলেন। এ ক্ষেত্রে মিশনারিরা অনেকাংশে মানবতাবোধের দ্বারা চালিত হয়ে পারলৌকিকের সঙ্গে ইহলৌকিক হিতের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। ধর্মের সঙ্গে যেমন কর্মের যোগ, তেমনি শিক্ষাকেও তাঁরা মিশনের ব্রতে আঙ্গিক করে নিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে, বিশেষত অনগ্রসর বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষার অবস্থা যে কতখানি শোচনীয় ছিল তা জে ই গেস্ট্রিলের রিপোর্ট থেকে জানা যায়। তাঁর কথায়—সাধারণভাবে ও বিশেষত নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহের অভাব দেখা যায় এবং খুব কম লোকই লিখতে ও পড়তে জানে। ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারি সংস্থার বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্টয়ের কর্মকর্তারা তাঁদের মিশনারি কর্মীকে কলকাতার বাইরে এদেশিয় লোকদের মধ্যে কাজ করার পরামর্শ দেন। সম্ভবত এই কারণে যে মফস্বল শহরে কাজ করা কলকাতা অপেক্ষা কম ব্যয়সাপেক্ষ ছিল এবং ইতিমধ্যে কলকাতায় অন্যান্য মিশনারি সংস্থা কাজ শুরু করেছিল ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি মেথডিস্ট রেভাঃ পি পার্সিভাল ও টি হডসন কলকাতায় আসেন। এঁদের মধ্যে পার্সিভাল বাঁকুড়া পরিদর্শন করে স্থানটিকে মিশন কাজের উপযুক্ত বলে উর্ধ্বতন মিশন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়, কারণ অসুস্থ সহধর্মিণীকে নিয়ে পার্সিভালকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এর পর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা-ব্যারাকপুর অঞ্চলে সেনাদের মধ্যে কাজের জন্য আগত মিশনারিদের মধ্যে রেভাঃ জেনকিন্স, পার্সিভালের ন্যায় বাংলাদেশে বাঁকুড়াকে মেথডিস্ট মিশনের প্রধান কর্মস্থল করার জন্য সুপারিশ করেন। তবে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মিশন স্টেশনের তালিকায় বাঁকুড়ার উল্লেখ নেই, যদিও ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে একজন করে অধস্তন ভারতীয় মিশনকর্মী যাঁদের ক্যাটিকিস্ট্ বলা হত, তাঁদের প্রেরণ করা হয় অর্থাৎ ওই দুই স্থানে মিশনের কাজের সূচনা হয় বলা চলে।

বাঁকুড়া সম্পর্কে মেথডিস্ট মিশনারিদের আগ্রহের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ধমানে অবস্থানরত চার্চ মিশনারি সোসাইটির মিশনারি, রেভাঃ ভাইটব্রেক্টের কথা উল্লেখ করতে হয়। ইনি প্রায়ই বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া শহরে আসতেন এবং ১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে এখানে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর ফলে পরবর্তী মেথডিস্ট মিশনারিদের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে বাঁকুড়া শহরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। চার্চ মিশনারি সংস্থার অর্থানুকূল্যে বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হত এবং যোগ্যতর ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভিন্ন বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হত। কিন্তু যোগ্য শিক্ষকের অভাবের কারণে মিশন কমিটি ১৮৩৬-এ এখানকার কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে মোট সাতটি বিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং বাকি চারটি স্থানীয় সরকারি কর্মচারীদের সহায়তায় পরিচালিত হয়। ভাইটব্রেক্টের স্থাপিত প্রধান বিদ্যালয়টি সরকার পরবর্তীকালে অধিগ্রহণ করে এবং এটা বর্তমানের বাঁকুড়া জেলা স্কুলে পরিণত হয়। জে ই গেস্ট্রিলের দেওয়া তথ্যানুসারে এই জেলায় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দশটি অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল বেসরকারিভাবে স্থানীয় সরকারি কর্মচারীদের প্রচেষ্টায় পরিচালিত হত, যদিও ছাত্রদের উপস্থিতির হার ছিল নগণ্য।

বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান চ্যাপেল

(খ) শিক্ষার প্রসার সদর শহর ও অন্যত্র :

এ কথা অনস্বীকার্য যে এ জেলায় আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারিদের আগমনের পর। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এই মিশন সংস্থার রেভাঃ জন রিচার্ডস্ বাঁকুড়া শহরের কুচকুচিয়া নামক স্থানে একটি মিডল ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে রেভাঃ স্পিনক্ এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি হাইস্কুল শাখা যুক্ত করেন। বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান উঁচু থাকায় ও এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশের হার বেশি থাকায় ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয় বর্তমান বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজের ক্যাম্পাসের পূর্বদিকে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজিয়েট হাইস্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বিদ্যালয়টি এ শহর ও জেলার একটা প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মিশনারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে, গতানুগতিক পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচির বাইরেও তাঁরা শিক্ষাকে অর্থবহ করে তোলার দিকে নজর দেন যাতে শিক্ষাকর্মীরা স্বনির্ভর ও জীবিকার্জনের সুযোগ পায়। এই উদ্দেশ্যে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া মিশনের সদর কেন্দ্রে একটি মিডল ভার্নাকুলার স্কুল পরিচালিত হত যার সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা যথা কাঠের, বেতের ও বাঁশের কাজ এবং জুতা তৈরি করা প্রভৃতি হাতের কাজের শিক্ষা দেওয়া হত। এই বিদ্যালয় ওয়েসলিয়ান মিডল ভার্নাকুলার টেকনিক্যাল স্কুল নামে পরিচিত ছিল। তবে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি কারণ তদানীন্তন হিন্দু সমাজ কিছুটা রক্ষণশীল ছিল এবং সম্পূর্ণভাবে বর্ণসংস্কারমুক্ত হয়নি ফলে এই ধরনের হাতের কাজ সম্পর্কে আগ্রহের অভাব ছিল।

সদর শহর বাঁকুড়াকে কেন্দ্র করে মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস অব্যাহত থাকলেও জেলার অন্যত্র শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা উদ্যোগ নেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রেভাঃ জে আর ব্রডহেড বিষ্ণুপুরে ওয়েসলিয়ান মিডল ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন যা পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর মিশন হাইস্কুলে পরিণত হয়। তাছাড়া ওন্দা, মেজিয়া ও ছাতনায় মিডল ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে তা স্থানীয় লোকদের পরিচালনাধীনে চলে যায়। তবে বাঁকুড়ার বাইরে মেথডিস্ট মিশনের উল্লেখযোগ্য কাজ জেলার উত্তরে সাঁওতাল আদিবাসী অধ্যুষিত অরণ্যানী সমাকীর্ণ সারেঙ্গা অঞ্চলে কেন্দ্রিত হয়। এ প্রসঙ্গে এম সি ম্যাকআলপিন তাঁর রিপোর্টে রেভাঃ জি ই উডফোর্ডের দেওয়া বিবৃতির উল্লেখ করেছেন। উডফোর্ড ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সারেঙ্গায় যান এবং মিশনের ও শিক্ষার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তবে বাঁকুড়া মিশন-সার্কিট থেকে মিশনারি জে আর ব্রডহেড প্রথম সারেঙ্গায় কাজ শুরু করেন। অবশ্য মিশনারি উডফোর্ড উল্লেখ করেছেন যে, মেদিনীপুরের আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন আগে থেকে এ অঞ্চলে একাধিক গ্রামীণ বিদ্যালয় পরিচালনা করত এবং যথেষ্ট সরকারি আর্থিক সাহায্য পেত, ফলে ওই এলাকার সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। ইতিপূর্বে প্রায় ত্রিশ বছর আগে বিষ্ণুপুরে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার উদ্যোগ নেয় মিশন এবং সাঁওতাল ছেলেদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে এটা বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত হয় ও সাঁওতালদের ট্রেনিং স্কুলে পরিণত হয়। পরে যখন সারেঙ্গায় মিশন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ট্রেনিং স্কুলটি সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। সারেঙ্গা প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং স্কুল পরে জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজে উন্নীত হয়। এখানে মিডল ভার্নাকুলার স্কুলটি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয় এবং বেশ কয়েক বছর ধরে এখানের ছাত্ররা বৃত্তি লাভ করে। ছাত্রদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন ভবিষ্যতে শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করে। এই মিশনের সঙ্গে প্রায় বারটি গ্রামীণ বিদ্যালয় যুক্ত ছিল এবং এর প্রত্যেকটিতে গড়ে কুড়িজন ছাত্র ছিল, যদিও এদের মধ্যে সকলে সাঁওতাল ছিল না। এই সকল বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন সাঁওতাল ছাত্র জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় পরিচালনা করত বলে মিশনারি উডফোর্ড উল্লেখ করেছেন। তিনি সাঁওতাল ছাত্রদের সাফল্যের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কৃতি ছাত্ররা বাঁকুড়া শহরে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য যেত এবং এদের মধ্যে একজন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও দেয়।

সারেঙ্গা মিশন শুধু সাঁওতাল ছেলেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা সাঁওতাল মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটা মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং উচ্চ প্রাইমারি পর্যন্ত পাঠক্রম চালু করা হয়। বিদ্যালয়ের সব ছাত্রীই কিন্তু খ্রিস্টান ছিল না। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ছাড়াও সেলাই এবং সূচির কাজ শেখানো হত।

একদিকে সারেঙ্গা মিশনের আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রয়াস, অপর দিকে শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা উভয়ত যার উদ্দেশ্য ছিল এদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং চরিত্রগতভাবে এদের মিতব্যয়ী, পরিচ্ছন্ন ও শান্ত প্রকৃতির কৃষিজীবীতে পরিণত করা। সাঁওতাল খ্রিস্টানদের বসতির জন্য সারেঙ্গায় জমি কেনার ও সাধারণ গৃহনির্মাণের উদ্যোগ নেয় মিশন। তাছাড়া মিশন স্কুলে পড়াশুনার উৎসাহদান ও চাষাবাদের কাজের ক্ষতিপূরণ বাবদ ছাত্রদের অভিভাবকদের কিছু পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে খ্রিস্টান সাঁওতালরা ক্রমশ মিশনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে মিশন কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে। মিশনারি উডফোর্ডও এই প্রসঙ্গে বলেছে যে গ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা

বেশি দূর পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ পেত না। কারণ, অভিভাবকদের কাজকর্মে সাহায্য করার প্রয়োজনে লেখাপড়া ত্যাগ করতে বাধ্য হত। অবশ্য আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন আবাসিক ছাত্র থাকত এবং ওই সমস্ত বিদ্যালয়ে নিয়মমাফিক পড়াশুনা চলত।

এই অঞ্চলে সাঁওতালদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ ও এ বিষয়ে মিশনারিদের আগ্রহ সম্পর্কে উডফোর্ডের বক্তব্য উল্লেখনীয়। তিনি জেলার শিক্ষা বিভাগের অধীনে প্রতি এলাকার জন্য একজন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করেন। তবে তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল এরা সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া গ্রামের বিদ্যালয়গুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সে জন্য তিনি কয়েকটি সুপারিশ করেন যথা : (১) চাষের মরসুমে বিদ্যালয়গুলি ছুটি দেওয়া ; (২) বিদ্যালয়গুলিকে অবৈতনিক করা ; (৩) বিদ্যালয়গুলিতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিয়োগ করা : (৪) সাঁওতাল ছাত্রের বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রের উপস্থিতি অনভিপ্রেত। প্রচলিত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সাঁওতালদের মধ্যে কি প্রকার ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল সে প্রসঙ্গে উডফোর্ড মন্তব্য করেছেন যে, এরা জানতো মিডল ভার্নাকুলার শিক্ষা সমাপ্ত করলেও তাদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয় এবং প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে তাদের জীবিকার্জন করতে হবে। এদের ধারণায় মিডল ভার্নাকুলার পাঠ গ্রহণ করে তারা বিরাট আত্মত্যাগ করেছে এবং এর ফল তাদের পক্ষে আদৌ লাভজনক হয়নি। সম্ভবত চাকুরি ও বিভিন্ন পেশার জন্য উচ্চশিক্ষার অভাবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের সম্প্রদায় থেকে তারা পশ্চাৎপদ থাকায় এই প্রকার মানসিকতার সৃষ্টি হয়।

মেথডিস্ট মিশনের উদ্যোগে রাইপুর, রাধা, সামাড়ি, পলাশবাড়ি, বাগডুবি অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশটি বিদ্যালয় শুরু হয়। সারেঙ্গা অঞ্চলে গাদরা, খয়ের পাহাড়ি, গোবিন্দপুর, কুলডিহি প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পরে সরকার অধিগ্রহণ করে। সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার প্রসঙ্গে এম মিত্র ও কে, জ্যাকারিয়া (১৯৩৩) এবং এ কে চন্দ (১৯৬৯) মন্তব্য করেন যে, এই কাজে মেদিনীপুরের আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন এবং বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

(গ) নারীশিক্ষার প্রসার

এ জেলায় নারীশিক্ষার অবস্থা প্রসঙ্গে হান্টারের প্রদত্ত বিবরণ (১৮৭২) থেকে জানা যায় যে, এ জেলায় তিনটি বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠরতা একশো দুজন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র পঁচিশজন নিজ মাতৃভাষায় লিখতে ও পড়তে পারত এবং বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক ছিল।

এ জেলায় নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তদানীন্তন বাঁকুড়া মিশন কেন্দ্রে খ্রিস্টান বালিকাদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে মিডল ভার্নাকুলার পাঠক্রম চালু ছিল। অনাবাসিক হিন্দু ছাত্রীদেরও এই বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ ছিল। ওয়েসলিয়ান মিশনারি সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বালিকা বিদ্যালয়টি শুরু হয় এবং নিকটবর্তী এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে প্রায় পঞ্চান্ন জন বালিকা এই বিদ্যালয়ে পাঠরতা ছিল।

মিশনারি এডওয়ার্ড টমসনের জীবনীকার ই পি টমসনের লেখা থেকে জানা যায় যে, মিশনারি টমসন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা করতে গিয়ে তদানীন্তন 'নেটিভ' বাঙালিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে শ্বেতকায় সরকারি পদস্থ মহল থেকে সমাজচ্যুত হন। হয়তো সব মিশনারি, টমসনের ন্যায় উদারচেতা ছিলেন না এবং ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁদের আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। এই সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ও বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ওয়েসলিয়ান মিশনারিরা এই জেলার অগ্রগতির পথকে সুগম করেন। তাই এঁদের অবদান আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

পরে ছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায় সম্ভবত খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক শিক্ষাদানের কারণে। তথাপি পঁয়ত্রিশজন ছাত্রী নিয়মিতভাবে ওই বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকত। স্থানীয় ইউরোপিয় সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের পরিচালনার সব ব্যয় বহন করত। মিশনারি সোসাইটির ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ওই সময়ে মিশন বালিকা বিদ্যালয়ে চল্লিশজন ছাত্রী ছিল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা দুটি স্কলারশিপ লাভ করে। কিন্তু তদানীন্তন সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার কারণে মেধাবী ছাত্রীরা বেশি দূর পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। ছাত্রীরা বারো বছরে পদার্পণ করার আগেই সাধারণত তাদের বিবাহ দেওয়া হত এবং এ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাব্রতী ওয়েসলিয়ান মিশনারিরাও আক্ষেপ করেছেন। এ সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের সাফল্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ বিদ্যালয় কতিপয় ইউরোপিয় মহিলা ও স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রজন প্রদত্ত মাসিক চাঁদা ও যৎসামান্য সরকারি অনুদানের সাহায্যে পরিচালিত হত।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রামপুর, পাটপুর ও লালবাজার এলাকার প্রাইমারি স্কুলগুলি বন্ধ করে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বর্তমান মিশন গার্লস স্কুল ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেন মহিলা মিশনারি জে এম জুয়েল ও ডি হপকিন্স্। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল বাঁকুড়া শহরে একটি পূর্ণাঙ্গ গার্লস হাই স্কুল স্থাপন করা। এ কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেন রেভাঃ বি জি বন্ধু রেভাঃ সি সি পাণ্ডে এবং হৃদয়ভূষণ মিশ্র। এঁরা মেথডিস্ট ট্রাস্ট সোসাইটি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে এ বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালান। ১৯৫০ সাল নাগাদ নবম শ্রেণী চালু হয়। ১৯৫২ সালে প্রথম এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রাইভেট প্রার্থিরূপে দেয়, কারণ ন্যূনতম ছাত্রী সংখ্যার অভাবে তখনও বিদ্যালয়টি শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভ করেনি। এর পর ছাত্রী সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়টি হাইস্কুলের অনুমোদন লাভ করে শিক্ষা বিভাগ থেকে জানুয়ারি, ১৯৫৩ সালে। জানুয়ারি, ১৯৬৩ সালে

বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজ (কলেজ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে)

বিদ্যালয়টি হিউম্যানিটিজে এবং জানুয়ারি, ১৯৬৪ সালে বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পঠন-পাঠনের অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি মিশন গার্লস হাইস্কুল নামে পরিচিত এবং বাঁকুড়া শহর তথা জেলার একটা অন্যতম প্রথম সারির বালিকা বিদ্যালয়। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রীনিবাসটি সারেঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়। অতীতে বাঁকুড়া শহরের বাইরে ওন্দাতে একটি এবং বিষ্ণুপুরে পাঁচটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় মিশন কর্তৃক পরিচালিত হত। বাঁকুড়া শহর ও এ জেলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনের অবদান অনস্বীকার্য।

(ঘ) ওয়েসলিয়ান কলেজ ও উচ্চশিক্ষার বিস্তার

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মেথডিস্ট মিশন রেভাঃ জন মিচেলকে এই জেলার বাঁকুড়া শহরে কুচকুচিয়া নামক স্থানে অবস্থিত হাইস্কুলের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে। মিশনারিরা বেশ কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি কলেজ স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা মনে করেন যে এই কেন্দ্র থেকে শিক্ষাদানের সঙ্গে তাঁরা সহজে খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব উচ্চবর্ণের হিন্দু শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচার করতে পারবেন, তাছাড়া মেধাবী খ্রিস্টান ছাত্রদেরও যথাযথ শিক্ষাদান সম্ভব হবে। বাঁকুড়া শহরের অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডস্থিত মেথডিস্ট মিশন কর্তৃপক্ষ হাইস্কুলের সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট কলা স্তরের পঠন-পাঠনের অনুমতি দান করে। এইভাবে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই এই জেলার প্রথম কলেজ, ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ স্থাপিত হয় এবং এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন রেভাঃ জন মিচেল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে আই এ এবং বি এ পাঠক্রম পঠন-পাঠনের এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ছাত্ররা এফ এ পরীক্ষাদানের অনুমতি পায়। প্রথম থেকেই কলেজটি শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে এবং আই এ স্তরে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা ও গণিত এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আই এস-সি গণিত পাস ও অনার্স বিষয়গুলি চালু হয়। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের কাজের জন্য অনুমোদন লাভ করতে চার বৎসর অতিক্রান্ত হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের পাসের হার বেশ উঁচু ছিল এবং একষট্টি জন ছাত্র ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কলেজের অপ্রত্যাশিত সাফল্যে বাঁকুড়া শহরে জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং কলেজটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

শুরুতে ইন্টার মিডিয়েট কলা বিভাগের ক্লাসগুলি হাইস্কুলের কাঁচাগৃহে হত, কিন্তু স্থানাভাব দেখা দিলে অসুবিধা সত্ত্বেও ক্লাসগুলি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত সেন্ট্রাল হলে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী একটি পৃথক কলেজ ভবন ও অন্যান্য গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কলেজে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য 'হিল হাউস' নির্বাচিত হয়, কিন্তু যখন জেলা কর্তৃপক্ষ 'হিল হাউস' ও সংলগ্ন জমি জেলা শাসকের আবাসের জন্য অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন বিকল্প স্থান হিসাবে নিকটবর্তী 'এন্ডারসন বাগান' এলাকাটি জেলা প্রশাসন মিশন কলেজের জন্য অধিগ্রহণ করে। জানা যায় যে সরকারি উকিল কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইতিপূর্বে বাগানটি ক্রয় করেছিলেন এবং ওই এলাকাটি ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু সরকারের হস্তক্ষেপ এবং শহরের নাগরিকদের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি সরকারের নিকট পেশ করা হলে, মিশন কলেজ নির্মাণের জন্য বাগানটি পায়। জেলা প্রশাসন ১১৯ বিঘা বা প্রায় ৪০ একর আয়তনের এন্ডারসন বাগানটি অধিগ্রহণ করে। ২৭ নভেম্বর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার এবং ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারি ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে চুক্তি হয় যে কলেজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে অধিগৃহীত জায়গাটি ব্যবহার হবে। সরকার কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অতঃপর রেভাঃ মিচেলের উদ্যোগে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে নতুন কলেজ ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস ও অপরটি খ্রিস্টান ছাত্রদের জন্য নির্মিত হলেও, ধর্মভিত্তিকভাবে ছাত্র আবাসিক নেওয়া হয়নি।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে নতুন কলেজ ভবনে ক্লাস শুরু হয় এবং কলেজটি ওই বছর ডিগ্রি স্তরে পঠন-পাঠনের সুযোগ লাভ করে। ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজে সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন এবং কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলোপ ও ভারতে বিদেশি খ্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের অবাধ প্রবেশ ও ধর্মপ্রচারের সুযোগ লাভ। এ সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই সময় ইংল্যান্ডে একাধিক মিশনারি সংস্থা গড়ে ওঠে, যাদের মধ্যে মেথডিস্ট মিশনারি সোসাইটি অন্যতম। ওই সংস্থা থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারত তথা বাংলাদেশে মিশনারিরা এসেছেন।

মৃদুভাষিণী সিংহ ছিলেন এই কলেজের প্রথম ছাত্রী, যিনি এখান থেকে বি এ পাস করেন। ইনি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ছিলেন। সম্ভবত মফস্বলে এটি প্রথম কলেজ যেখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে পরিণত হয়। এই কলেজে অধ্যয়নের জন্য পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি যথা—মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, মানভূম এবং ধানবাদ কয়লাখনি অঞ্চল ও জামশেদপুর শিল্পাঞ্চল থেকে বহু ছাত্ররা আসত, কারণ তখন ওই সমস্ত স্থানে কোনও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল না। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি অর্জনের জন্য ইংরেজি ভাষার জ্ঞান ও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন সাধারণভাবে অনুভব করা হয়। তবে মুখ্যত রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবারের সন্তানেরা এই কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ গ্রহণ করে। তবে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তদানীন্তন বাংলার সমাজ তখনও যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিল এবং বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে অতি নগণ্য সংখ্যক ছাত্রী কলেজে প্রবেশ করত। এদের অধিকাংশ ছিল খ্রিস্টান ধর্মের ছাত্রী বা পদস্থ সরকারি কর্মচারী পরিবারের কন্যা। এ সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ওয়েসলিয়ান কলেজের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ১৯২১ সালে এই কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট কলা ও বিজ্ঞান শাখায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৪ এবং ২৩ ও পাশের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩ ও ১৪। ওই বছর বি এ পরীক্ষা দেয় ৪৭ জন এবং ২৮ জন পাস করে। অবশ্য তখনও কোনও শিক্ষার্থী বি এস-সি পরীক্ষা দেয়নি। ১৯৩০ সালে ৩০ জন বি এ এবং ১৭ জন বি এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী বছর বি এ ও বি এস-সি পরীক্ষায় যথাক্রমে ২৮ জন ও ১৮ জন পাস করে। এ কথা স্মর্তব্য যে তখন এই জেলায় আর কোনও ডিগ্রি কলেজ ছিল না। অনেক বছর পর ১৯৪৫ সালে বিষ্ণুপুরে রামানন্দ কলেজ এবং ১৯৪৮ সালে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব ওয়েসলিয়ান কলেজ ও মিশনারিদের এই জেলার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই কলেজের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের পশ্চাতে যাঁদের বিশেষ অবদান ছিল, তাঁরা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মিশনারি, যাঁরা এখানে অধ্যাপনা করেছেন এবং এই কলেজের বহু কৃতি ছাত্র। এঁদের মধ্যে স্মরণীয় এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ রেভাঃ জন মিচেল এবং পরবর্তী অধ্যক্ষ রেভাঃ এ ই ব্রাউন। রেভাঃ ব্রাউন বাঁকুড়া শহরের পৌরসভার চেয়ারম্যানরূপে শহরের বহু উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলের বিকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। অপর মিশনারি ই জে টমসন যিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন, তিনিও নানা কারণে স্মরণীয়। ইনি শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে আসেন এবং তাঁর একাধিক রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, বিশেষত কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কলেজের বিশিষ্ট বাঙালি অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন ডঃ শিশির মিত্র, অবলাকান্ত চৌধুরী, রামশরণ ঘোষ, অনিলবরণ রায় প্রমুখ। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য গুণিজন—সুকুমার সেন, সজনীকান্ত দাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম দাস, সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাধিকামোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ, যাঁরা পরবর্তীকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ওয়েসলিয়ান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সাফল্য ছিল নগণ্য। ১৯০১ সালে বাঁকুড়া শহরের জনসংখ্যা ছিল ২০,৭৩৭ এবং ধর্মীয় মতানুসারে ১৯,৫৫৩ জন হিন্দু, ৯৯৩ জন মুসলমান এবং ১৫৮ জন খ্রিস্টান। ওই সময় জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ১১,১৬,৪১১। ১৯৮১ সালে জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ২৩,৭৪,৮১৫ এবং খ্রিস্টানদের সংখ্যা মাত্র ৩,১৯৭ অর্থাৎ জেলার মোট জনসংখ্যার ০.১৩%। অতএব মিশনারিরা ধর্মপ্রচারকের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ জেলার শিক্ষাব্রতী, মানবদরদী সমাজসেবীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ধর্মউৎসারিত মানবকল্যাণবোধ এঁদের অনুপ্রেরণা দান করেছিল। এ প্রসঙ্গে মিশনারি এডওয়ার্ড টমসনের জীবনীকার ই পি টমসনের লেখা থেকে জানা যায় যে, মিশনারি টমসন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা করতে গিয়ে তদানীন্তন 'নেটিভ' বাঙালিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে শ্বেতকায় সরকারি পদস্থ মহল থেকে সমাজচ্যুত হন। হয়তো সব মিশনারি, টমসনের ন্যায় উদারচেতা ছিলেন না এবং ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁদের আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। এই সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ও বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ওয়েসলিয়ান মিশনারিরা এই জেলার অগ্রগতির পথকে সুগম করেন। তাই এঁদের অবদান আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১। ও'মালি এল এস এস — বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, বাঁকুড়া।
২। ব্যানার্জি এ কে — ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, বাঁকুড়া।
৩। হান্টার, ডব্লু, ডব্লু — স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, ৪র্থ খণ্ড।
৪। ক্রশ এফ এল এবং লিভিংস্টোন ই এ (সম্পাদিত) — দি অক্সফোর্ড ডিক্সনারি অফ দি ক্রিশ্চিয়ান চার্চ।
৫। ওভারটন জে এইচ — এভ্যানজেলিকান মুভমেন্ট।
৬। টাউনসেন্ড ও ওয়ার্কম্যান — এ নিউ হিস্ট্রি অফ মেথডিসম।
৭। স্টোক ই — দি হিস্ট্রি অফ দি চার্চ মিশনারি সোসাইটি, ৩য় খণ্ড।
৮। ফিনডলে ও হোলডসওয়ার্থ — ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারি সোসাইটি, ৫ম খণ্ড।
৯। ম্যাক্ আলপিন এম সি — রিপোর্ট অন দি কন্ডিশান অফ দি সনথালস্ ইন দি ডিস্ট্রিক্টস অফ বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও নর্থ বালাসোর।
১০। চৌধুরী, র, ম — বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি।
১১। রিপোর্ট অফ দি ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারি সোসাইটি, ১৮৮০, ১৮৮৩, ১৮৯২, ১৯০৯ (প্রাসঙ্গিক অংশ) : গৌতম দের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
১২। সি এম এস (এম এস) 'অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দি বার্ডওয়ান মিশন', ১৫ এপ্রিল, ১৮৩৪।
১৩। বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি (শৈ. দাস ও ন. মণ্ডল সম্পাদিত) ১৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি)।
১৪। সেনসাস রিপোর্ট : ১৯৮১, ১৯৯১ (বাঁকুড়া জেলা)।

লেখক পরিচিতি : প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া ক্রীশ্চান মহাবিদ্যালয়

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিদর্শক কমিটি বাঁকুড়ায় আসেন এবং পরিদর্শন করে রিপোর্ট দাখিল করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩.৬.৫৬ তারিখে সিন্ডিকেট মিটিংয়ে তা অনুমোদিত হয় ও ভাইসচ্যান্সেলার ফার্স্ট এম বি বি এস পড়ানোর অনুমতি দেন। সেইমত ১৯৫৬ সালের ৬ আগস্ট ৫০ জন ছাত্র নিয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ তার যাত্রা শুরু করে।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার বাইরে প্রথম মেডিকেল কলেজ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করে 'বাঁকুড়া সম্মিলনী' নামে একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত অরাজনৈতিক সমাজসেবী সংস্থা।

এই কলেজ তার যাত্রা শুরু করে ১৯৫৬ সালের ৬ আগস্ট। এই মহতী যাত্রার পিছনে এত নিঃস্বার্থ মানুষের অবদান, এত ত্যাগ, নিরলস আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে যে সেই সমস্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণ একটি পত্রিকার একটিমাত্র প্রবন্ধের মাধ্যমে বর্ণনা করা একটি দুরূহ কাজ। এর বিশদ বিবরণ লিখতে গেলে তা একমাত্র একটি গ্রন্থের মাধ্যমেই লেখা সম্ভব। তথাপি সংক্ষেপে সারাংশটুকু লিখতে গেলে কিছু অপূর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে, তার জন্য বর্তমান লেখক পাঠকবর্গের নিকট আগাম ক্ষমাপ্রার্থী।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর প্রতিষ্ঠা করেছিল তার সম্বন্ধে কিছু লিখতেই হয়, নইলে তা হবে অকৃতজ্ঞতার নামান্তর !

'বাঁকুড়া সম্মিলনী' নামক অরাজনৈতিক সমাজসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা নিবাসী বাঁকুড়ার কতিপয় সুসন্তান। এই প্রতিষ্ঠান ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন ১৮৬০ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হয় ১৯১৯ সালে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সহ-সভাপতি ছিলেন তখনকার বিখ্যাত 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার রাহা, বামাচরণ মুখোপাধ্যায় সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। প্রথম সম্পাদক ছিলেন ঋষিন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়, কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র রায়, ভূতনাথ কোলে, কে সি নিয়োগী, মতিলাল রাহা, চৌধুরী মহম্মদ ঈশা, প্রমথনাথ পালিত প্রমুখ। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল—

(১) বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষার প্রসার
(২) স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিসাধন
(৩) পারস্পরিক সৌহার্দ্য বর্ধন
(৪) খরা, বন্যা, মহামারী, ত্রাণ ইত্যাদি
(৫) দুর্যোগের সময় সমাজসেবামূলক কাজ করা এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

এই ধরনের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করতে গিয়ে তৎকালীন বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ লক্ষ করেন যে, বাঁকুড়া জেলায় চিকিৎসা পরিষেবা অত্যন্ত অবহেলিত এবং শিক্ষিত চিকিৎসক সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এই কারণে তাঁরা স্থির করেন বাঁকুড়ায় একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপন করবেন। এরপর মাত্র ৫০ জন ছাত্র নিয়ে ১৯২২ সালে তাঁরা মেডিকেল স্কুল শুরু করেন যার নাম রাখা হয় **'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল'**। এই স্কুলের জন্য তৎকালীন বাঁকুড়া সম্মিলনীর সহ-সভাপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোকপুরে 'নীলাম্বর ভবন' নামে বৃহৎ অট্টালিকা সহ ৮০ বিঘা জায়গা দান করেন। কিছুদিন পর এই দানবীর গোবিন্দনগর যাওয়ার প্রধান রাস্তার বাম পার্শ্বে আরও ৮ বিঘা জায়গা দান করেন, যেখানে এখন 'বাঁকুড়া সম্মিলনী অন্ধ বিদ্যালয়' চালু হয়েছে।

প্রারম্ভিক অবস্থায় একটি ভাড়া বাড়িতে মেডিকেল স্কুলের ক্লাস শুরু হয়। কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্সের ক্লাস বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজের সহযোগিতায় সেখানে পড়ানো হত।

মেডিকেল স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হওয়ার পর তৃতীয় বর্ষে ছাত্রদের হাসপাতাল প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হওয়ায় একটি হাসপাতাল স্থাপন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এই প্রয়োজনের সময় কলকাতা নিবাসী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ত্রিকমদাস কুবেরজি মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে একটি বহির্বিভাগ তৈরি হয় এবং মাত্র ১৪টি বেড নিয়ে ও ৪ জন মেডিকেল অফিসার নিয়ে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ চালু করা হয়।

শ্রীমতী মঙ্গলাদাসী ও তৎকালীন মহিলা সমিতির সাহায্যে স্ত্রীরোগ বিভাগ ও রায়বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দানে অপরাপর বিভাগের অপারেশন থিয়েটার নির্মিত হয়। তখনকার বাঁকুড়া সদর হাসপাতালের ১৫০ শয্যাও শিক্ষাদান কার্যে ব্যবহৃত হত। এইরূপে ১৯২৭ সালে মেডিকেল ফ্যাকালটি শর্তসাপেক্ষে সাময়িক অনুমোদন দেন।

ইতিমধ্যে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার কেন্দুয়াডিহিতে অবস্থিত সেটেলমেন্ট বিল্ডিং (যেখানে এখন বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ অবস্থিত) ও কেন্দুয়াডিহি হরিতকীবাগানে অনেকখানি জায়গা দান করে। উক্ত বিল্ডিংয়ে তৎপরবর্তী সময়ে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, মেটারনিটি, মেটিরিয়া মেডিকা, মেডিসিন, শল্য ও স্ত্রীরোগ বিভাগের ক্লাসসমূহ অনুষ্ঠিত হত।

হরিতকীবাগানে অ্যানাটমি প্র্যাকটিকাল ভবন ও টিন আচ্ছাদিত হস্টেল ভবন নির্মিত হয়। (বর্তমানে এই স্থানে ফার্মেসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চলছে) ছাত্রদের খেলার মাঠও ওখানে নির্মিত হয়।

এর কিছুদিন পরে কলকাতা নিবাসী বাঁকুড়ার বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারের ভূতনাথ কোলে ও সুরেন্দ্রনাথ কোলে মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে 'কোলে বিল্ডিং' নামে একটি দ্বিতল বাড়ি তৈরি হয়, যার উপর তলায় মেডিসিন অন্তর্বিভাগ ও নিচের তলায় ছিল শল্য অন্তর্বিভাগ।

জনসাধারণের দানে ২৪টি কটেজও নির্মিত হয়। এইভাবে ১৯৩০ সালে পাকাপাকিভাবে মেডিকেল স্কুল মেডিকেল ফ্যাকাল্টির অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়।

বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলে প্রথম দিকে যাঁরা চিকিৎসা শিক্ষাদানে রত ছিলেন যত দূর জানা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডাঃ অনাথবন্ধু রায়, ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, যথাক্রমে শল্য, মেডিসিন ও স্ত্রীরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিভাগে ডাঃ হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, ডাঃ হর্ষগোপাল কুণ্ডু, ডাঃ কালী মিত্র, ডাঃ ফণিভূষণ দে, ডাঃ এস সিন্‌হা প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলেন। এর পরবর্তীকালে ডাঃ ক্ষুদিরাম দে, ডাঃ নিস্তারণ রায়, ডাঃ রামহরি মুখোপাধ্যায়, ডাঃ প্রভাস

বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করতে গিয়ে তৎকালীন বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ লক্ষ করেন যে, বাঁকুড়া জেলায় চিকিৎসা পরিষেবা অত্যন্ত অবহেলিত এবং শিক্ষিত চিকিৎসক সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এই কারণে তাঁরা স্থির করেন বাঁকুড়ায় একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপন করবেন। এরপর মাত্র ৫০ জন ছাত্র নিয়ে ১৯২২ সালে তাঁরা মেডিকেল স্কুল শুরু করেন যার নাম রাখা হয় 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল'। এই স্কুলের জন্য তৎকালীন বাঁকুড়া সম্মিলনীর সহ-সভাপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোকপুরে 'নীলাম্বর ভবন' নামে বৃহৎ অট্টালিকা সহ ৮০ বিঘা জায়গা দান করেন।

মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কল্যাণীপ্রসাদ গুপ্ত ও ডাঃ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ অন্যতম শিক্ষাব্রতী ছিলেন। (পুরাতন সমস্ত তথ্য না পাওয়ায় কারও কারও নাম বাদ পড়ে থাকতে পারে বলে বর্তমান লেখক ক্ষমাপ্রার্থী)

এর পরে একটি এক্স-রে মেসিন ও একটি অ্যাম্বুলেন্সেরও ব্যবস্থা হয়।

১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একইরূপ মেডিকেল শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করে এবং ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতবর্ষের সমস্ত মেডিকেল স্কুলগুলিতে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দেয়।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল থেকে ১২০০ চিকিৎসক পাস করে বাঁকুড়া ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ এমন কি পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের শহরে ও প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসাকার্যে রত হন। বাঁকুড়া শহরেও অনেক স্বনামধন্য চিকিৎসক বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল থেকে পাস করে প্র্যাকটিস করে গেছেন এবং এখনও করছেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রয়াত হয়েছেন। সুখের কথা এঁদের সমসাময়িক ডাঃ লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখনও অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে চিকিৎসাকার্যে ব্রতী আছেন এবং রোগীদের নিরাময় করে চলেছেন।

১৯৪৮ সালে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি বন্ধ হওয়ার পর থেকেই তৎকালীন বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ বাঁকুড়ায় ১টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ পূর্বে উল্লিখিত কেন্দুয়াডিহির পূর্বতন সেটেলমেন্ট বিভাগের বাড়িটিতে বায়োলজি সহ একটি ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স কলেজ স্থাপন করেন ১১০ জন ছাত্র সহ। বর্তমানে এই কলেজ প্রায় ২০০০ ছাত্রছাত্রী সহ সমস্ত রকমের বিভাগ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহ ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়া সম্মিলনীর কর্মকাণ্ড অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ১৯৮০ সালে বাঁকুড়া সম্মিলনীর হেড অফিস বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত হয় ও বর্তমান কর্তৃপক্ষ ১৯৯৪ সালে সেখানে মাত্র ৫জন ছাত্র নিয়ে বাঁকুড়া অন্ধ বিদ্যায়তন স্থাপন করেছেন, যেখানে বর্তমানে ৩০ জন আবাসিক বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করছে।

১৯৯৬ সালে বাঁকুড়া সম্মিলনীর "প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব' পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে মহাশয় ও কোতুলপুরের বিধায়ক ডাঃ গৌরীপদ দত্তর সহযোগিতায় উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডি মহাশয়কে উদ্বোধকরূপে আনা সম্ভব হয় এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় অন্ধ বিদ্যায়তনের একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠান পালন বর্ষে 'পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী সম্মিলনী' ও 'লুই ব্রেল মেমোরিয়াল স্কুল ফর সাইটলেস' সহযোগিতায় ও বাঁকুড়া সম্মিলনীর ব্যবস্থাপনায় বাঁকুড়ায় সর্বপ্রথম নিখিল ভারত দৃষ্টিহীনদের দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কোনওরূপ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান বাঁকুড়ায় এই প্রথম বলে উল্লেখ থাকবে।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

পূর্বে উল্লিখিত বাড়িগুলি ছাড়াও সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ লোকপুরে একটি ত্রিতল বাড়ির কাজ আরম্ভ করেন এবং একটি নতুন বহির্বিভাগ নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন। মেডিকেল কলেজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টাও শুরু করেন। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করে ১৯৫০ সালের ১৭ জুন বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য আবেদন জানান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৫১ সালের২০ মে তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরিদর্শক কমিটি বাঁকুড়ায় আসেন এবং যথাসম্ভব পরিদর্শন করে আরও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন বিভাগের বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ করতে বলেন।

এই নির্দেশ পাওয়ার পর ১৯৫৩ সালের জুন মাসের মধ্যেই কেন্দুয়াডিহির হরিতকী বাগানে একটি দ্বিতল অ্যানাটমি বিল্ডিং, লেকচার হল, ১৬টি মৃতদেহ রাখার মতো একটি মর্চারি কুলার ও গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন ল্যাবরেটরি এবং অন্যান্য বিভাগও গঠিত হয়।

লোকপুরে বটতলায় অবস্থিত ত্রিতল বাড়িটির নিচের তলায় উত্তর ও পূর্বদিকে প্যাথলজি বিভাগ, উত্তরদিকে সিঁড়ির ডান পার্শ্বে কেমিস্ট্রি ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ, পশ্চিমদিকে ২টি ক্লাসরুম, দ্বিতলে সিঁড়ির বামপাশে উত্তর ও পূর্বদিকে ফিজিওলজি বিভাগ ও ডান পার্শ্বে ফার্মাকোলজি বিভাগ, পশ্চিমদিকে ফরেনসিক ও প্রিভেনটিভ এবং সোস্যাল মেডিসিন বিভাগ এবং ত্রিতলে একটি পরীক্ষার হলঘর

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের নতুন ভবন, জেলার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতিফলন ছবি : পাপান ঘোষ

ও লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়। আরও সরঞ্জামাদি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনে সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ এই সময় বাঁকুড়া সম্মিলনীর কার্যকরী সমিতির সদস্য, সম্মিলনী কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রকার কাজের সঙ্গে জড়িত বাঁকুড়াবাসী ও কাতরাস কোলিয়ারিতে কয়লাখনি ব্যবসারত ও তখনকার দিনের একমাত্র ভারতীয় এরিয়েল রোপওয়ে নির্মাণ সংস্থার মালিক শশাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উপস্থিত হন এবং সেখানে ২/৩ দিন থেকে শশাঙ্কবাবু ও ঝরিয়ার ডাঃ ঘটকের সহায়তায় প্রায় ৪/৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। শোনা যায়, তখনকার দিনে কোলিয়ারি অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী পরিবার কেওড়া কোম্পানি ১০ লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল এক শর্তে যে তাদের নামে মেডিকেল কলেজ করতে হবে। কিন্তু সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ এই শর্ত প্রত্যাখ্যান করেন।

বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ও আরও গৃহ নির্মাণ শুরু করে ১৯৫৩ সালের ৯ জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবার অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিদর্শক কমিটি আবার বাঁকুড়ায় আসেন এবং পরিদর্শন করে ৯ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩.৬.৫৬ তারিখের সিন্ডিকেট মিটিংয়ে তা অনুমোদিত হয় ও ভাইস-চ্যান্সেলার ফার্স্ট এম বি বি এস পড়ানোর অনুমতি দেন। সেইমত ১৯৫৬ সালের ৬ আগস্ট ৫০ জন ছাত্র নিয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ তার যাত্রা শুরু করে।

এইভাবেই বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তৃপক্ষের বাঁকুড়ায় একটি মেডিকেল কলেজ করার স্বপ্ন বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বাস্তবে রূপায়িত হয়। এই সময় অর্থাভাবের জন্য বেশিরভাগ ছাত্র ভর্তি হত ডোনেশন দিয়ে এবং ৫০ শতাংশ ছাত্র ভর্তি হত কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কাশ্মীর, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে, বাকিরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান ও বাঁকুড়া থেকে।

দুঃখের বিষয় যাঁদের নিরলস, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, ত্যাগ ও আন্তরিক অবদানের ফলে 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ' স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে কেউই আর আমাদের মধ্যে নেই।

এঁদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় তিনি ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়, যাঁর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি এবং যাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিকতা অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকে ও অন্যান্যদের উৎসাহ দিয়ে সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ করার ব্যাপারে অবিচল ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল বি এন হাজরা, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনী মণ্ডল, ডাঃ এন বি মণ্ডল, কালিদাস রায়, ডাঃ চিন্ময় ঘোষ, ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, ডাঃ অনাথবন্ধু রায়, ডাঃ ক্ষুদিরাম দে, ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, কানাইলাল দে ও শশাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ-অধীক্ষক ছিলেন লেঃ কর্নেল ডাঃ বি এন হাজরা।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিদর্শন কমিটি আবার বাঁকুড়ায় আসেন এবং পরিদর্শন করে ৯ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩.৬.৫৬ তারিখের সিন্ডিকেট মিটিংয়ে তা অনুমোদিত হয় ও ভাইস-চ্যান্সেলার ফার্স্ট এম বি বি এস পড়ানোর অনুমতি দেন। সেইমত ১৯৫৬ সালের ৬ আগস্ট ৫০ জন ছাত্র নিয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ তার যাত্রা শুরু করে।

এই সময়ে বিভিন্ন বিভাগের অবস্থানের বিষয়ে কিছু বলতেই হয়। তখনকার অধ্যক্ষ-অধীক্ষকের ঘর ছিল নীলাম্বর ভবনের উত্তরদিকে একটি ৮ ফুট বাই ৮ ফুট ঘর। পাশেই একটি ছোট ঘরে ছিল অফিস এবং মাত্র তিনজন অফিস স্টাফ নিয়ে। মধ্যে একটি বিরাট হলঘরের একপাশে ছিল মেডিসিন বহির্বিভাগ ও অপর দিকে শল্য বহির্বিভাগ। এখানে উল্লেখ্য যে এখানে মেডিসিন সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগের চিকিৎসা মেডিসিন বহির্বিভাগে ও শল্য বিভাগে শল্য, অস্থি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গলা বিভাগ একত্রে চলত। আরও পরে নতুন বহির্বিভাগ তৈরি হওয়ার পর শল্য বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি সেখানে স্থানান্তরিত হয় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হিসাবে। (যেখানে এখন বাঁকুড়া সম্মিলনী জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগ চলছে)। স্ত্রীরোগ বিভাগের বহির্বিভাগ ছিল কিছুদিন পূর্বেও যেখানে লোকপুর স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রবেশপথ ছিল তার পাশে। তার পাশেই ছিল লেবার রুম। সমস্ত স্ত্রীরোগ অন্তর্বিভাগ (শল্য ও প্রসূতি) ছিল কিছুদিন পূর্বে যেখানে স্ত্রীরোগ বিভাগের অপারেশন থিয়েটার ছিল। মেডিসিন ও শিশুবিভাগ ছিল পাশেই একটি দালানে যার অস্তিত্ব এখন নেই। মেডিসিন (স্ত্রী) বিভাগে ছিল ২০টি শয্যা ও শিশু অন্তর্বিভাগে ছিল ১০টি শয্যা। শল্য ও স্ত্রীরোগ প্রসূতি অন্তর্বিভাগে ছিল সব মিলিয়ে ৪৮টি শয্যা। কোলে বিল্ডিং-এর দ্বিতলে ছিল মেডিসিন পুরুষ অন্তর্বিভাগের ৩৬টি শয্যা ও নিচের তলায় শল্য পুরুষ বিভাগে ছিল ৩৬টি শয্যা। এছাড়া মেডিসিন বিভাগের একপাশে ছিল ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি বিভাগ যা পরে কোলে বিল্ডিংয়ের পাশে একটি বাড়ি নির্মাণ করে স্থানান্তরিত করা হয়। মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্যদের ঘর ছিল কোলে বিল্ডিংয়ের দ্বিতলে ৮ ফুট বাই ৮ ফুট মাপের ঘর। কোলে বিল্ডিংয়ের পাশেই ছিল সেই পুরনো অপারেশন থিয়েটার যেখানে সব বিভাগের অপারেশন হত। এখন যেখানে লোকপুর ওয়ার্ড মাস্টারের অফিস তার পাশেই ছিল একমাত্র রেসিডেন্ট ফার্মাসিস্ট ও রেসিডেন্ট ও টি অ্যাসিসটেন্টের ঘর। এই ঘর পরে ভেঙে একটি বড় হলঘর নির্মাণ করে মেডিসিন (স্ত্রী) বিভাগ ও শিশু বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। পরে মেডিসিন বিভাগ গোবিন্দনগরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেটি স্ত্রীরোগ বিভাগের সেপ্টিক ওয়ার্ড হয়। নীলাম্বর ভবনের পশ্চিমদিকে ছিল আর এম ও'র কোয়ার্টার্স ও নীলাম্বর ভবনের দ্বিতলে ছিল জুনিয়র ডাক্তারদের আবাসস্থল। প্রথম এম বি বি এস-এর বিভিন্ন বিভাগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আরও পরে নীলাম্বর ভবন ও কোলে বিল্ডিংয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করে সেখানে এমার্জেন্সি বিভাগ ও রেডিওলজি বিভাগ শুরু করা হয়। পরে এমারজেন্সি বিভাগ গোবিন্দনগরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর উক্ত স্থানে ডিস্ট্রিক্ট টি বি সেন্টার চলতে থাকে।

বর্তমান লেখক ১৯৫৬ সালে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাস করে ও শিক্ষানবিশি (হাউস স্টাফ) শিক্ষা শেষ করে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারির শেষে মেডিকেল অফিসার হিসাবে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগে যোগদান করেন। এই সময়ে বর্তমান লেখক যাঁদের দেখেছিলেন তাঁদের নাম যথাসম্ভব উল্লেখ করা হচ্ছে। (এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয় যে কারও কারও নাম বাদ পড়ে গেলে তা অনিচ্ছাকৃত ও স্মরণে না আসার জন্য, তাই লেখক এ বিষয়ে আগাম ক্ষমাপ্রার্থী)

অ্যানাটমি বিভাগে ছিলেন ডাঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ধরণী সেন, ফিজিওলজি বিভাগে ছিলেন ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, ডাঃ কল্যাণীপ্রসাদ গুপ্ত, ডাঃ নিরঞ্জন ভদ্র, ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, ফার্মাকোলজি বিভাগে ছিলেন ডাঃ নির্মল দাশগুপ্ত ও ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, কেমিস্ট্রি ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে ছিলেন ডাঃ দিলীপ রায় চৌধুরী ও ডাঃ বিশ্বরঞ্জন রায়, প্যাথলজি বিভাগে ছিলেন ডাঃ সনৎ মিত্র, শল্য বিভাগে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ক্ষুদিরাম দে, ডাঃ নারায়ণ রায়, স্ত্রীরোগ বিভাগে ছিলেন ডাঃ পার্বতীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, চক্ষু বিভাগে ছিলেন ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমুখ বিশাল ব্যক্তিত্ব। মেডিসিন বিভাগে অ্যাসিসস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ পীযূষ দাস ও ভিজিটিং ফিজিসিয়ান হিসাবে ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, জুনিয়র ডাঃ ছিলেন ডাঃ শচীন দরিপা যিনি বর্তমান লেখক যোগদানের পরই অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যান। আর এম ও ছিলেন কাজপাগল মানুষ ডাঃ বারিদবরণ ভট্টাচার্য। বৈতল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এমন কাজের মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। স্ত্রীরোগ এবং শল্য চিকিৎসা ছাড়াও উনি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও অ্যানাসথেসিয়া বিভাগের দেখাশোনা করতেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টাই কাটাতেন হাসপাতালে, বিশেষ করে শল্য এবং স্ত্রীরোগ বিষয়ে ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা, হাসপাতালের

বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ ও হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবন

ছবি স্বপন ঘোষ

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজও তাঁকেই দেখতে হত। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকে ডাঃ বারিদবরণ ভট্টাচার্য বর্তমান লেখকের পরিচিত ছিলেন। সদ্য কলকাতা থেকে ফিরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের দৈন্যদশা দেখে বর্তমান লেখক প্রথমে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তখন এই কর্মযোগী ডাঃ বারিদ ভট্টাচার্য এগিয়ে এসে উৎসাহ দিয়ে হতাশা কাটাবার জন্য বলেছিলেন, 'দেখ ভূদেব যে কলেজ থেকে পাস করে এসেছিস সেই ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ যার শুরু ১৯৪৮ সালে প্রাথমিক অবস্থায় কি নিদারুণ কঠিন অবস্থা থেকে আজকের সাফল্যের মাথায় উঠে এসেছে, এসবই আমাদের জানা আছে। আর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ আমাদের নিজেদের দেশের কলেজ, একে তো আমাদেরই গড়ে তুলতে হবে। গড়ার আনন্দ অসীম আর কাজ করতে করতে সব হতাশা কেটে যাবে এবং মনে একটা পরিতৃপ্তি আসবে।' এসব কথা ভুলে যাওয়ার নয়। কাজের তুলনায় কর্মী কম বলে সকলকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত, খুব কষ্টকর জীবনযাত্রা ছিল। কিন্তু জীবনের পশ্চিমে এসে মনে এক অপার আনন্দ হয় যে, আজকের 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ' যার শৈশব এবং কঠিন অবস্থার অবসান হয়েছে এবং অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এর গড়ে তোলার পিছনে বর্তমান লেখকেরও ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালির মতো কিছু অবদান ছিল। সত্যিই গড়ে তোলার আনন্দের কোনও সীমা নেই। বারিদদার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। বারিদদা যে সব কথা শিখিয়ে গিয়েছিলেন তা ভোলা যায় না এবং আজও তা ভুলিনি।

সেই প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় নগণ্য ছিল, কিন্তু কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে সকল শ্রেণীর কর্মচারিকে সমস্ত কাজ ভাগ করে নিয়ে নিজেদেরই করতে হত এবং তা ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রমসাপেক্ষ। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সেই সময় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজনও পাস করা নার্সিং স্টাফ ছিল না। কাজেই রোগীকে ঠিকমত দেখাশোনা এবং নার্সিংয়ের অন্যান্য কাজও চিকিৎসকদের করতে হত। অন্তর্বিভাগে কাজ করে আবার বহির্বিভাগ এবং এমারজেন্সি বিভাগ পরিচালনা করতে হত। তখনকার দিনে খুব কমসংখ্যক আয়া এবং ওয়ার্ড বয় ছিল যাদের শিখিয়ে নিয়ে কাজ করাতে হত।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের যখন দ্বিতীয় বর্ষ প্রায় শেষ হয়ে এল এবং রোগীর সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে তখন আর এত কম সংখ্যক শিক্ষক চিকিৎসক এবং অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীর দ্বারা কলেজ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে চিকিৎসক শিক্ষক এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর কর্মচারী বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করতে হয়।

১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হয়ে এলেন ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শল্য বিভাগের অধ্যাপক হয়ে এলেন ডাঃ অসীম মুখোপাধ্যায়, আরও পরে স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের অধ্যাপক হয়ে এলেন ডাঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা শুরু হয়।

কাজের তুলনায় কর্মী কম বলে সকলকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত, খুব কষ্টকর জীবনযাত্রা ছিল। কিন্তু জীবনের পশ্চিমে এসে মনে এক অপার আনন্দ হয় যে, আজকের 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ' যার শৈশব এবং কঠিন অবস্থার অবসান হয়েছে এবং অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এর গড়ে তোলার পিছনে বর্তমান লেখকেরও ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালির মতো কিছু অবদান ছিল। সত্যিই গড়ে তোলার আনন্দের কোনও সীমা নেই।

অধ্যক্ষ-অধীক্ষক লেঃ কর্নেল বি এন হাজরা মহাশয়ের কথামত বর্তমান লেখকের কিছু সহপাঠী যেমন ডাঃ সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য, ডাঃ মনোরঞ্জন মাইতিকে মেডিসিন বিভাগে, ডাঃ সত্যনারায়ণ রাজগুরুকে শল্যবিভাগে, ডাঃ কমল মুখার্জিকে স্ত্রীরোগ বিভাগে নিয়ে আসা হয় জুনিয়র ডাক্তার হিসাবে। এই সময় অন্তর্বিভাগগুলিরও সম্প্রসারণ হতে থাকে। এই সময় স্ত্রীরোগ বিভাগের ওয়ার্ড তৈরি হয়। এর কিছুদিন পর ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে প্রফেসর সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর চেষ্টায় ডাঃ সুবিমল রায় মেডিসিন বিভাগে ও ডাঃ মহাদেব বরাট শল্য বিভাগের রেজিস্ট্রার হয়ে আসেন। এই দুজন ডাক্তারই বর্তমান লেখকের সহপাঠী ছিলেন। স্ত্রীরোগ বিভাগে আসেন ডাঃ জহর বোস, রেসিডেন্ট সার্জেন হিসাবে। শল্য বিভাগে জুনিয়র ডাক্তার হিসাবে আসেন ডাঃ মিহির এবং ডাঃ চিন্ময় (পদবি মনে নেই), অ্যানাসথেসিয়া বিভাগে যোগদান করেন ডাঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়। কোনও পাস করা শিক্ষিত নার্স না থাকায় উপরোক্ত ডাক্তাররা এসে পড়ায় হাসপাতালের কাজ কিছুটা সহজ হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যাও বাড়তে শুরু করে। ইতিমধ্যে ডাঃ অসীম মুখার্জির চেষ্টায় ৫ জন জি এন এম ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্সিং স্টাফ এসে যোগদান করেন। প্রথম প্রথম এই নার্সিং স্টাফেরা নিয়মমত ঘন্টা ধরে কাজ করতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবার ঐকান্তিক চেষ্টা ও আন্তরিক সেবাপরায়ণতা দেখে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে সকাল-সন্ধ্যা দুবেলাই ডিউটি দিতে শুরু করেন। এঁরা একাকী এক-একটা বিভাগের দায়িত্ব সামলাতেন: একজন মেডিকেল ওয়ার্ড, একজন সার্জিকাল ওয়ার্ড, একজন অপারেশন থিয়েটার, একজন সমস্ত কটেজ ও একজন স্ত্রীরোগ বিভাগ দেখতেন। আজকের দিনে এমন কাজের নিষ্ঠা ভাবা যায় না।

অপারেশন থিয়েটার অ্যাসিসট্যান্ট রাখহরিবাবু, প্রায়বৃদ্ধ ফার্মাসিস্ট সতীশবাবু, লেবার রুমের সরস্বতী দিদি, যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লেবার রুমের যাবতীয় কাজ সামলে নিতেন। এঁদের ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা ভোলা যায় না। ওয়ার্ড বয় আনন্দ, হাবু, সুইপার দুর্গা, দেবু, দুর্গা সুইপারের বাবা দুর্গারই মতো নিষ্ঠাবান ডমন সহিস। এঁদের ভালবেসে কাজ করার ইচ্ছা এবং ঘণ্টা-মিনিট ভুলে গিয়ে কাজ করা এখনকার কর্মচারীদের গল্পকথা মনে হতে পারে, এঁরা দরিদ্র ছিলেন কিন্তু সবার শিক্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী 'কলবুক' বিষয়টা এঁরা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। দিনে রাতে যখনই প্রয়োজন হত এঁরা 'হুজুরে হাজির' হতেন। কি করে ভোলা যায় বিভূতির কথা, যিনি নীলাম্বর ভবনের সামনের ইঁদারা থেকে জল তুলে বাঁকে করে সমস্ত হাসপাতালের জলের প্রয়োজন মেটাতেন ড্রেসারের কাজ অতি দক্ষতার সঙ্গে করতেন অনিলবাবু ও বরাটবাবু। অফিস সমস্ত কাজ সামলাতেন বড়বাবু হিসাবে অহিভূষণ সেনগুপ্ত এবং মৃত্যুঞ্জয়বাবু। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বাদল ও নিতাই কি দারুণ পরিশ্রম করে সব কাজ নির্বাহ করতেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এরকমই আর এক কর্মচারি ছিলেন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার কন্দর্প। এঁরা সকলে মিলে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণ কাজ করে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত গড়ে দিয়ে গেছেন। সম্মিলনী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চিকিৎসক থেকে সুইপার পর্যন্ত কারোরই কর্তৃপক্ষ-কর্মচারি সম্পর্ক ছিল না। সকলেই এক পরিবারভুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থাৎ মেডিকেল কলেজটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করে যেতেন।

ইতিমধ্যে ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আর পি হয়ে এলেন ডাঃ বিজয় মাঝি এবং ডাঃ সুবিমল রায় অন্যত্র চলে যাওয়ায় বর্তমান লেখক হলেন মেডিসিনের রেজিস্ট্রার।

লোকপুরে নতুন বহির্বিভাগ সম্পূর্ণ হওয়ায় সার্জিকাল, চর্ম, কর্ণ-নাসিকা-গলা, অ্যান্টি-নেটাল ও স্ত্রীরোগ বিভাগের আউটডোর ওখানে চলে যায়। মেডিকেল আউটডোর বিভাগ তখনও নীলাম্বর ভবনেই ছিল।

১৯৫৯ সালে চক্ষু বিভাগে ডাঃ সোমেশ মুখার্জি, নাক-কান-গলা বিভাগে ডাঃ পি কে বসু, মেডিসিন বিভাগে ডাঃ পি কে ঘোষ এসে যোগদান করেন। এই সময় ডাঃ অমিয় মুখোপাধ্যায় অ্যানাসথেসিয়া বিভাগ থেকে চলে যাওয়ায় ডাঃ পশুপতি চক্রবর্তী আসেন। ডাঃ সুরেশ সিংহ অ্যানাটমি ও সার্জারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়ে আসেন। এই সময় ডাঃ অসীম মুখার্জি এখান থেকে অন্যত্র চলে যান। বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় হাসপাতালের কাজ এগিয়ে চলছিল। ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মেডিসিন বিভাগে ই সি জি মেসিন আনান ও বর্তমান লেখক সহ জুনিয়র ডাক্তারদের ই সি জি মেশিন ব্যবহার করতে শিখিয়ে দেন। কারণ, তখন কোনও ই সি জি টেকনিসিয়ান ছিল না।

১৯৬১ সালের মাঝামাঝি সময়ে রেডিওলজি বিভাগে আসেন ডাঃ শক্তিপ্রসাদ সরকার ও শিশু মেডিসিন বিভাগে আসেন ডাঃ জয়ন্ত দত্ত।

বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের প্রবেশমুখ

ছবি : পাপান ঘোষ

এইভাবে হাসপাতালের পরিষেবা চলতে থাকে। সকল শ্রেণীর কর্মচারিদের মধ্যে আন্তরিকতা থাকায় রোগীদের সেবায় কিছু ত্রুটি হলেও তাঁদের মধ্যে কোনও ক্ষোভ ছিল না। কোনও রোগীকে আর বাঁচানো যাবে না জেনেও চিকিৎসকগণ শেষ সময় পর্যন্ত রোগীর পাশে থেকে যতদূর সম্ভব চিকিৎসা চালিয়ে যেতেন বলে রোগীর মৃত্যু হলেও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কোনও ক্ষোভের সঞ্চার হত না। বরং তখনকার দিনে রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা চিকিৎসকদের চেষ্টার প্রশংসা করে কিছুটা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে শান্ত মনে বিদায় নিতেন। বর্তমান সময়ে উভয়পক্ষের ব্যবহারেই এত মালিন্য এসেছে যে এইসব সোনার দিনগুলি মনে এসে মনকে দুঃখিত করে তোলে।

এরপরে চিকিৎসকের অপ্রতুলতা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবের জন্য মেডিকেল ছাত্ররা প্রথমে ধর্মঘট এবং পরে অনশন ধর্মঘট শুরু করায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তার জন্য ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অধিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এইভাবে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ সরকারি মেডিকেল কলেজের রূপ পেল। তখন বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিকেল কলেজের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা। কিন্তু সরকার অধিগ্রহণ করলেও বাঁকুড়া সম্মিলনী প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব কমে যায় না। কোনও রকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬১-র অক্টোবর পর্যন্ত বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ এই কলেজ হাসপাতাল যতদূর সম্ভব জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করে চালিয়ে যান এটা উপেক্ষা করার কথা নয়।

ইতিমধ্যে লোকপুর থেকে আরও পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলা হাসপাতালের নতুন ভবন নির্মাণ শুরু হয় ও ১৯৬৩ সালে নির্মাণকার্য শেষ হয়। এরপর এখানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য অধিবেশন হয়। সেই সময় ওই স্থানটি বাঁকুড়ার গান্ধী নামে পরিচিত—কংগ্রেস নেতা শ্রদ্ধেয় গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের নামে 'গোবিন্দনগর' নামকরণ করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোবিন্দনগর হাসপাতালটি লোকপুর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত করে ও নামকরণ হয় 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ সদর হাসপাতাল অ্যানেক্সি।'

১৯৬৪-৬৫ সালে সার্জিক্যাল ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গলা অন্তর্বিভাগ, ব্লাড ব্যাঙ্ক ও অপারেশন থিয়েটার গোবিন্দনগরে স্থানান্তরিত করা হয়। ছেড়ে যাওয়া ওয়ার্ডগুলিতে মেডিসিন বিভাগের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করার স্থান করে দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে সরকার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অধিগ্রহণ করার পর অস্থায়িভাবে তখনকার মুখ্য আধিকারিক ডাঃ অর্ধেন্দুশেখর নন্দী মহাশয় ও পরে ডাঃ ডি এন মুখার্জি মহাশয় কিছুদিন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে আসীন ছিলেন। এর পরবর্তী সময়ে ১৯৬২ সালে ডাঃ দেবব্রত রায় মহাশয় অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে আসেন এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে হাসপাতালের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই শ্রদ্ধেয়, সৎ, নির্ভীক প্রশাসক যোগ্য কর্মীকে সমাদর করতেন, অপরপক্ষে অযোগ্য, অসৎ কর্মচারিকে শাসন করতে বিন্দুমাত্র পিছু হটতেন না। ডাঃ দেবব্রত রায় মহাশয়ের কার্যকালকে বলা যায় বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বর্ণযুগ।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬০ বেডে। এই সময় সমস্ত বিভাগেই সুষ্ঠুভাবে কাজ হত। ডাঃ রায় মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ১৯৬৩ সালে নীলাম্বর ভবনের

১৯৬২ সালে ডাঃ দেবব্রত রায় মহাশয় অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে আসেন এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে হাসপাতালের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই শ্রদ্ধেয়, সৎ, নির্ভীক প্রশাসক যোগ্য কর্মীকে সমাদর করতেন, অপরপক্ষে অযোগ্য, অসৎ কর্মচারিকে শাসন করতে বিন্দুমাত্র পিছু হটতেন না। ডাঃ দেবব্রত রায় মহাশয়ের কার্যকালকে বলা যায় বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বর্ণযুগ।

পশ্চিমদিকে ব্লাড ব্যাঙ্ক শুরু হয়। ইতিমধ্যে গোবিন্দনগরে হাসপাতাল সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে মেডিসিন ও স্ত্রীরোগ ছাড়া অন্য বহির্বিভাগগুলিও গোবিন্দনগরে স্থানান্তরিত হয়। মেডিকেল ছাত্রদের জন্য ২টি এবং মেডিকেল ছাত্রীদের জন্য ১টি হস্টেল, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার্স, নার্সিং হোস্টেল, নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণকার্য শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন সময় যাঁরা অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে আসীন ছিলেন তাঁদের নাম যথাক্রমে ডাঃ এন্ এস উপাধ্যায়, ডাঃ কে পি সেনগুপ্ত, ডাঃ নলীনাক্ষ গোস্বামী, ডাঃ জনার্দন দাস, ডাঃ কে কে ভট্টচার্য। মধ্যে অস্থায়িভাবে অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে ছিলেন ডাঃ নির্মলকুমার দাশগুপ্ত, ডাঃ কালীময় ভট্টাচার্য। ১৯৭৯ সালে অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদ ২টি আলাদা করা হয় প্রশাসনের সুবিধার জন্য। প্রথম অধীক্ষক হয়ে আসেন ডাঃ এম কে আলি মহাশয়। এর পর অধ্যক্ষ হয়ে আসেন ডাঃ মধুসূদন দে, ডাঃ এন সি পাল, ডাঃ সি সি সাহানা, ডাঃ কমল গুহ রায়, ডাঃ পি পাঠক, ডাঃ এস কে বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ আর আর সমাদ্দার, ডাঃ জে দে ও বর্তমান অধ্যক্ষ ডাঃ ভি আমেদ। মধ্যবর্তী সময়ে অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদে ছিলেন ডাঃ প্রশান্ত দত্ত। সরকার অধিগ্রহণ করার পর থেকেই বহু নামি-দামি চিকিৎসক বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে কাজ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শল্য বিভাগে ডাঃ ভবানী ভট্টাচার্য, ডাঃ প্রণব মুখার্জি, ডাঃ রাজীবলোচন চ্যাটার্জি, ডাঃ সলিল মুখার্জি, ডাঃ অজয় চন্দ, ডাঃ সুশীলা শ্রীপাদ, ডাঃ অজয় পোদ্দার, ডাঃ জয়ন্ত সেন, ডাঃ দীপক ঘোষ, ডাঃ দেবব্রত দে, ডাঃ শিশির সামন্ত, ডাঃ হেমেন দেব, ডাঃ ক্ষিতীশ চৌধুরী প্রমুখ, চক্ষু বিভাগে ডাঃ এস সেন, ডাঃ জ্যোতির্ময় মুখার্জি, ডাঃ অমল মিত্র, নাক-কান-গলা বিভাগে ডাঃ শম্ভু মুখার্জি, ডাঃ আবীরলাল মুখার্জি, ডাঃ আর আর সমাদ্দার প্রমুখ। স্ত্রীরোগ বিভাগে ডাঃ সুনীল চৌধুরী, ডাঃ ভবেশ লাহিড়ী, ডাঃ কে সি গুইন, ডাঃ চারু মিত্র, ডাঃ প্রভাত চৌধুরী, ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। স্ত্রীরোগ বিভাগে স্মরণীয় উন্নতি হয় ডাঃ চারুচন্দ্র মিত্র বিভাগীয় প্রধান থাকার সময়। এখনও ডাঃ মিত্র'র প্রশংসা করে পুরাতন কর্মচারীরা আনন্দ পান। ডাঃ মিত্র স্ত্রীরোগ বিভাগের ভোল পাল্টে দিয়েছিলেন। এই জন্যে তিনি নিজে প্রচুর পরিশ্রম করতেন এবং অনুগত কর্মচারিদের দিয়েও অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। মেডিসিন বিভাগে ডাঃ নীহার বোস, ডাঃ এস এন মোয়ার, ডাঃ রথীন ঘোষ, ডাঃ সমীর ভট্টাচার্য, ডাঃ সুকুমার মুখার্জি, ডাঃ নির্মল মজুমদার, ডাঃ সুনীল গুপ্ত, ডাঃ সুভাষ দে, ডাঃ অরবিন্দ ভট্টাচার্য, ডাঃ শশাঙ্কতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেমিস্ট্রি ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে আসেন ডাঃ ডি নাগ।

খুবই দুঃখের বিষয় যে, ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকেই একমাত্র মেডিসিন বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সব বিভাগের চিকিৎসকগণের সপ্তাহে ৩/৪ দিন থাকার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে রোগীদের ভোগান্তি বাড়ে এবং চিকিৎসা পরিষেবার ও শিক্ষার অবনতি হয়। কিন্তু মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ব্যক্তিত্ব, সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য এই একমাত্র বিভাগ যেখানে কোনও বিশৃঙ্খলা ছিল না এবং সপ্তাহে ৩/৪ দিন থেকে চলে যাওয়ার প্রবণতাও ছিল না। কিন্তু ১৯৮০ সালে ডাঃ সেনগুপ্ত অবসর নেওয়ার পর থেকে মেডিসিন বিভাগেও এই দুষ্ট ক্ষত সংক্রামিত হয়ে কাজে ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়া শুরু হয়। এই অন্যায় এবং আত্মমর্যাদাহানিকর প্রবণতার অবসান আজও হয়নি। এর ফলে অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যেও কর্মবিমুখতা এসে পড়ে।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বেড়ে ৮৮০ হয়।

১৯৮০ সালে স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগ ও ডিস্ট্রিক্ট টি বি সেন্টার ছাড়া হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগ গোবিন্দনগরে স্থানান্তরিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে হাসপাতালের পশ্চিমে একটি বৃহৎ অট্টালিকাতে লোকপুরে অবস্থিত প্যারা ক্লিনিক বিভাগগুলি যথা প্যাথলজি, প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোসাল মেডিসিন, ফরেনসিক, লাইব্রেরি, ফার্মাকোলজি বিভাগ স্থানান্তরিত হয়। এই অট্টালিকায় একটি বৃহৎ অডিটোরিয়ামও আছে।

১৯৭৯ সালে অধ্যক্ষ ও অধীক্ষক পদ দুটি আলাদা করা হয়। প্রথম অধীক্ষক হয়ে আসেন ডাঃ এম কে আলি, পরে ১৯৮৩ সালের প্রথমদিকে উনি চলে যাওয়ার পর ডাঃ জগন্নাথ গাঙ্গুলি অধীক্ষক হন, কিন্তু প্রথম দিনেই ঘেরাও ও চাপের মুখে পড়ে তার পরদিনই ছুটিতে চলে যান। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে বর্তমান লেখক ডাঃ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীক্ষকের পদে যোগদান করেন ও লক্ষ করেন যে শিক্ষক-চিকিৎসক যাঁদের মধ্যে ইচ্ছামত আসা-যাওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি তাঁরা অধীক্ষককে বিশেষ আমল দিতে চাইছেন না। এই কারণে বাধ্য হয়ে অধীক্ষক মহাশয় রাইটার্স বিল্ডিং থেকে আদেশনামা বার করিয়ে আনেন যে শিক্ষক-চিকিৎসকগণ হাসপাতালের কাজের জন্য অধীক্ষকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন এবং কেউ ছুটিতে গেলে কাকে তাঁর হাসপাতাল সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন তা জানাতে হবে। অধীক্ষকের অধীনে যে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন চিকিৎসক সমেত তাঁদের কাছে প্রথমে আবেদন করে ও পরে প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কঠোরতা

অবলম্বন করায় কিছুটা কর্মসংস্কৃতি ফিরে আসে। ১৯৮৪ সালে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়, যেখানে ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিভাগের স্থান নির্ধারণ করা হয় ও ভবিষ্যতে ১৫০০ বেডের হাসপাতাল করার সংস্থান রাখা হয়।

১৯৭৮ সালে একটি বৃহৎ আউটডোর বিল্ডিং তৈরি করা শুরু হয়, কিন্তু মাঝপথে তার কাজ থেমে যায়, এই থেমে থাকা কাজ শেষ করার জোর প্রচেষ্টা হয় ও ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে সম্পূর্ণ হওয়ায় সমস্ত আউটডোর বিভাগ ও স্টোর সেখানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই নবনির্মিত আউটডোরে জনসংযোগের জন্য একটি অনুসন্ধান বিভাগ খোলা হয়।

নাক-কান-গলা বিভাগের বিল্ডিং শেষ হওয়ায় সেখানে উক্ত বিভাগের অন্তর্বিভাগ ও অপারেশন থিয়েটারও ১৯৮৬ সালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২টি নতুন অ্যাম্বুলেন্সও আনা সম্ভব হয়। এমারজেন্সি বিভাগে এমারজেন্সি অবজারভেসন বিভাগ চালু করা হয়। সপ্তাহে একদিন করে ডায়াবেটিক ক্লিনিক চালু করা হয়। ২টি ভেন্টিলেটর আনিয়ে ও কার্ডিয়াক মনিটার ও ডিফ্রিবিলেটর মেসিন যা মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আনিয়ে নিয়েছিলেন তা দিয়ে ৪ বেডের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খোলা হয়। বহির্বিভাগে কার্ডিওলজি বিভাগ পুনরায় চালু করা হয়। ২টি নতুন এক্স-রে মেসিন আনা হয় যার মধ্যে একটি বহির্বিভাগের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৮৮ সালের প্রথমদিকেই বর্তমান লেখক যিনি এই সময়ের অধীক্ষক ছিলেন তিনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বদলি হয়ে যান এবং নতুনভাবে চালু করা ওইসব বিভাগগুলি একে একে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে ডাঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রাইটার্স বিল্ডিং চলে যাওয়ার পর ডাঃ ডি বরাট অস্থায়িভাবে অধীক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও পরে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ দুর্গাদাস চ্যাটার্জি, ডাঃ মঙ্গল বিশ্বাস, ডাঃ শ্যামল রুদ্র ও বর্তমানে ডাঃ নিখিল সেন ক্রমে ক্রমে অধীক্ষক হন। ১৯৮৬ সালে ক্যানসার বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হয় ও ১৯৮৯ সালে তা চালু হয়। ইতিমধ্যে ১৯৯৯ সালে স্ত্রী এবং প্রসূতি বিভাগও গোবিন্দনগরে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। বহুদিন থেকেই অনুমোদিত শয্যাসংখ্যা থেকে অনেক বেশি রোগী অন্তর্বিভাগে থাকে। ১২০০/১২৫০ রোগী সদাসর্বদা অন্তর্বিভাগে থাকে ও সমস্ত আউটডোর মিলে প্রতিদিন রোগী সংখ্যা প্রায় ১৭০০/১৮০০-র কাছাকাছি হয়, যদিও বর্তমানে পূর্বের তুলনায় চিকিৎসক ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারী সংখ্যা অনেক বেড়েছে তবুও হাসপাতালে পরিষেবার ও শিক্ষার মানের অনেক অবনতি হয়েছে। এর প্রধান কারণ ব্যতিক্রমী কিছু সংখ্যক চিকিৎসক ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারি ছাড়া বাকিদের কর্মবিমুখতা এবং রোগীদের প্রতি আন্তরিক দরদের অভাব। হাসপাতালে এখন আধুনিক যন্ত্রপাতির তেমন অভাব নেই। এমন কি আলট্রাসোনোগ্রাফি মেসিনও আছে। কিন্তু এই মেসিন বেশিরভাগ সময়ই অকেজো থাকে বলে শোনা যায়।

এখন হাসপাতালে গাড়িরও কোনও অভাব নেই। অধ্যক্ষ, অধীক্ষক এবং নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের নিজস্ব গাড়ি আছে। মেডিকেল ছাত্রদের বাস আছে। ৩/৪টি অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য কাজের জন্য যেমন চক্ষু বিভাগের মোবাইল ভ্যানগাড়ির ব্যবস্থা আছে, ব্লাড ব্যাঙ্কেরও নিজস্ব গাড়ি আছে। তবে রোগী এবং সেবার কাজে কতটা ব্যবহার হয় তা বিচার্য বিষয়।

হাসপাতালের সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের সংগঠন আছে, কিন্তু রোগীদের কোনও সংগঠন নেই, তাই তাদের এত দুরবস্থা। তবুও বলতে হয় এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু রোগীরা পরিষেবা পাচ্ছে, তবে তা উন্নতির আরও সুযোগ আছে। বর্তমানে হাসপাতালের অনুমোদিত শয্যাসংখ্যা ৯৪০।

চিকিৎসা, শিক্ষা ও হাসপাতাল পরিষেবার অবনতির প্রধান কারণ প্রশাসনিক অবহেলা। সকল শ্রেণীর প্রশাসকদের মধ্যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রকট হয়ে রয়েছে। হাসপাতাল প্রশাসক বলতে শুধুমাত্র অধ্যক্ষ ও অধীক্ষক নন, বিভাগীয় প্রধান, আর এম ও, ওয়ার্ড মাস্টার, নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট ও ওয়ার্ড ইনচার্জরা পড়েন।

প্রশাসনে ৮ বৎসর কাটিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সরকার যে টাকা দেয় তা যদি যথাযথভাবে খরচ করা হয় ও শক্ত হাতে হাল ধরা যায় তবে ওষুধ ও যন্ত্রপাতির কোনও অভাব হওয়ার কথা নয়। প্রয়োজনে প্রশাসনকে যথেষ্ট শক্ত হতে হবে। অনিয়মিতভাবে হাসপাতালে যাতায়াতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য চিকিৎসকরা যেহেতু হাসপাতালের মূল স্তম্ভ, তাই তাঁদের অনিয়মের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে ব্যবস্থা নিতে হবে। এখন যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে ব্যতিক্রমী কিছু চিকিৎসক ছাড়া বাকিরা হাসপাতালের কাজ ছেড়ে বিভিন্ন নার্সিং হোম ও নিজেদের প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, যদিও মেডিকেল কলেজগুলিতে সমস্ত চিকিৎসকরাই নন-প্র্যাকটিসিং, সর্বশ্রেণীর কর্মচারির ব্যবহারের পরিবর্তন আনতে হবে। রোগীদের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। হাসপাতালে বহু রকমের দুর্নীতি হয় তা বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সমস্ত বহির্বিভাগগুলি নতুন বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত হওয়ায় যে সমস্ত জায়গাগুলি খালি হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার করলে বিভিন্ন অন্তর্বিভাগে মাটিতে শয্যা অনেক কমানো যাবে।

আশা করা যায় যে আবার সেই পূর্ব কর্মসংস্কৃতি ফিরে আসবে ও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের যে সুনাম অতীতে ছিল তা আবার স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সর্বশেষে 'বাঁকুড়া সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠানের সেইসব স্বনামধন্য মহাপুরুষদের, যাঁরা বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের জানাই আমার অন্তরের বিনম্র সশ্রদ্ধ প্রণতি।

সংকলন : *বাঁকুড়া সম্মিলনীর শুরু থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালের ঘটনাবলী বাঁকুড়া সম্মিলনীর পুরনো নথিপত্র থেকে সংগৃহীত ও মেডিকেল স্কুলের আমলের শিক্ষক চিকিৎসকদের নামগুলি ডাঃ লালমোহন গাঙ্গুলির সৌজন্যে প্রাপ্ত, সে জন্য তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ১৯৫৬ সালের পর থেকে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী লেখক নিজে।*

লেখক : প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী

বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন : অতীত ও বর্তমান

স্বপন ঘোষ

গ্রন্থাগার আইন পাস হওয়ার পর জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৪০ থেকে পৌঁছে গেল ১৩০-এ। প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারের ঝক্‌ঝকে নতুন বাড়ি। সমস্ত খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি। প্রায় সব গ্রন্থাগারে পেশায় দক্ষ কর্মী। তাঁদের জন্য সম্মানজনক আর্থিক নিরাপত্তা। ফলে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের সংখ্যা এ জেলায় কমার খবর আপাতত নেই।

মাত্র মাস তিনেক আগেকার ঘটনা ; ইদানীংকালে 'আন্তর্জাতিক' হয়ে ওঠা কলকাতার এক বনেদী বাঙালি ব্যক্তিত্বের নিকট-আত্মীয়া প্রসঙ্গক্রমে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, কলকাতা থেকে ট্রেনে করে বাঁকুড়া যেতে হলে ফারাক্কা ব্যারেজ আগে পড়ে, নাকি পরে ! আসলে global map-এ উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টিকে গেঁথে দেওয়া এইসব শ্রদ্ধেয় 'অ-বাঁকুড়ি'-দের পক্ষে বিশ্বমানচিত্রে ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো বাঁকুড়ার অবস্থানের বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবু এই সব মানুষদের জন্য আমি মাত্র পাঁচ ছ লাইন নিবেদন করেই ক্ষান্ত দেব না, কেননা এই সংখ্যাতেই, আমার আশা, বাঁকুড়ার ভূগোল-ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য লেখাগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

বিশ্বের ভৌগোলিক মানচিত্রে যাই হোক না কেন, বিশ্ব-সভ্যতার মানচিত্রে জেলা বাঁকুড়ার ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি আজকাল টেরাকোটার ঘোড়া হয়ে টগবগ করে ছুটছে বলেই তো খবর। জেলার মাটির নিচের সম্পদ, মাটির ওপরের সম্পদ এবং এমন কি মানবসম্পদও—শুধুমাত্র কাগুজে বিবৃতিতে নয়—প্রামাণিক দস্তাবেজেও প্রতিষ্ঠিত। এই সংখ্যাতেই সেই সব দলিল উন্মোচিত হবে অন্য সব লেখায় ; আমি তাই ক্রমশ প্রসঙ্গে এগোই, গ্রন্থাগারে প্রবেশ করি।

পশ্চিম বাংলার জেলাগুলির মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম জেলা বাঁকুড়ার ৬৮৮২ বর্গকিমি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতো মানচিত্রে ৩টি মহকুমা, ৩টি পৌরসভা, ২০টি থানা, ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৩৮২৫টি মৌজায় ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে ২৮,০৫,০৬৫ জন মানুষের বাস।

এঁদের মধ্যে পঁচিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস করেন বাঁকুড়ার গ্রামগুলোতে, আর দুলক্ষেরও কিছু বেশি মানুষ বাস করেন শহরে। এই পঁচিশ লক্ষের জন্য সরকার-পোষিত ১২২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং দুলক্ষের জন্য ৭টি শহর গ্রন্থাগার ও ১টি জেলা গ্রন্থাগার ; অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১৩০টি সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার। লক্ষ করার বিষয় হল যে, ১৯০-এর মধ্যে ৭৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনও সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার নেই। অতি সম্প্রতি ওই ৭৪টির মধ্যে ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সারা জেলায় ১২টি ডিগ্রি কলেজে গ্রন্থাগার আছে। ৬৬টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতেই একটি করে গ্রন্থাগার থাকার কথা।

এই লেখা এখানেই শেষ হয়ে গেলে মন্দ হত না। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকানো, তেমনি জেলার হালফিল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আগেও একটা ইতিহাস আছে, একটা অতীত আছে। এবং কোনও অতীতই ফেলে দেওয়ার নয়, ফেলনা নয়। আর তাই ছোট্ট একটা ফ্ল্যাশব্যাক !
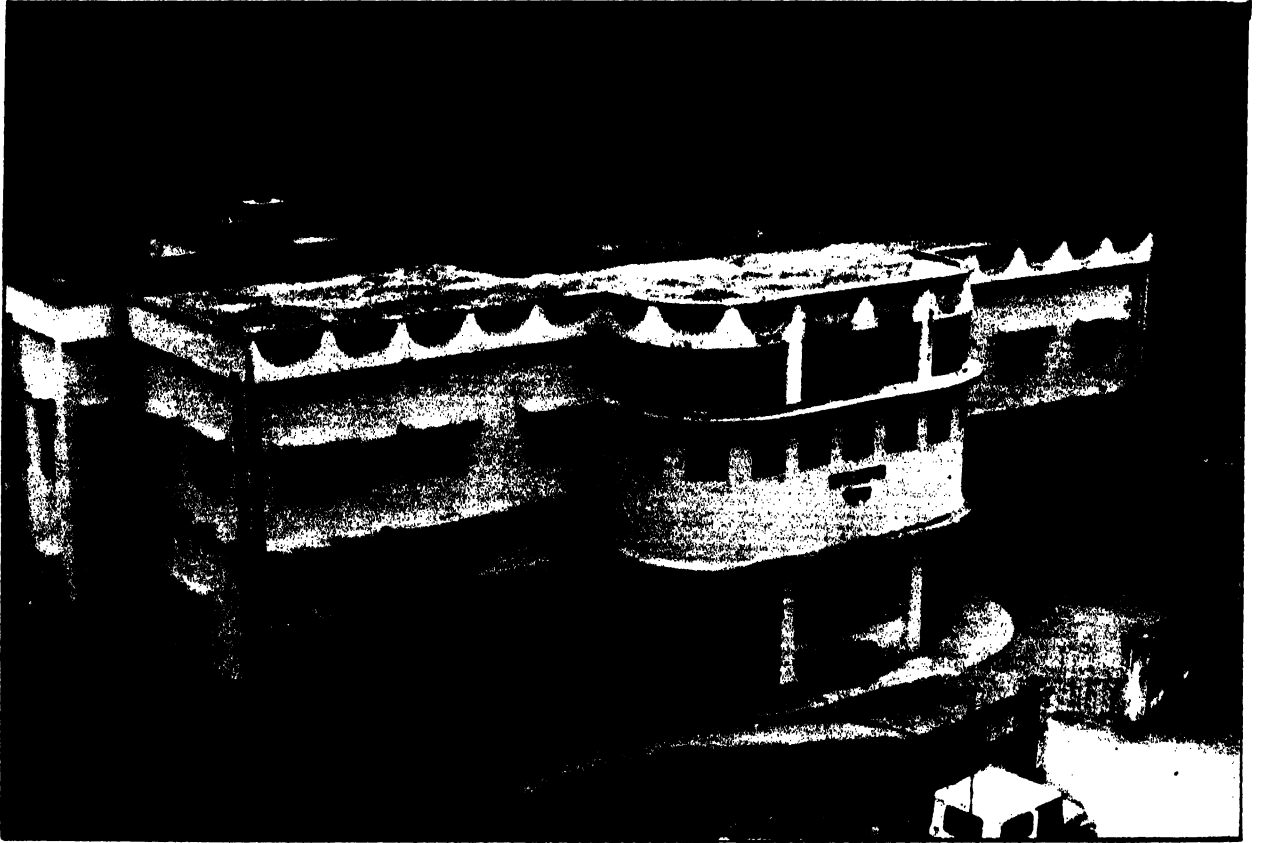
প্রাকৃতিক পটভূমিতে বাঁকুড়ার জেলা গ্রন্থাগার।

বস্তুত বাঁকুড়াবাসীর জীবনে গ্রন্থাগার হল ব্রিটিশ শাসনের অবদান। ইংরেজ আমলে পেশাগত প্রয়োজনেই ইংরেজি ভাষাশিক্ষা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ; এবং সেই সূত্রেই কোথাও ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কোথাও বা রাজানুগ্রহে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ও মধ্যবর্তী সময়ে বাঁকুড়ায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না।

দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখবন্ধে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যনীতি স্থির হয়েছিল 'Reduction of Poverty, Reduction of Inequality' ইত্যাদি। সেখানে Total Removal-এর কোনও স্বপ্নই ছিল না। ফলে বাস্তব চেহারাটা যা দাঁড়িয়েছে, তা আর কহতব্য নয়। ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নয়নের আজকের রূপরেখাটা একটা পিরামিডের মতো। ওপরতলায় ৫—১০ শতাংশ মানুষ বাস করছেন 'সব পেয়েছি'-র দেশে, মাঝের ২০—২৫ শতাংশ মানুষ উর্ধ্ব ও নিম্নচাপে 'স্যান্ডউইচ' হয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত আর সবার নিচে সত্তর শতাংশ 'হাড় হা-ভাতের'-র দল। 'রোটি-কাপড়া-মকান' নয়, শুধুমাত্র ভোটাধিকারের নিরিখে এরাও ভারতবাসী। হ্যাঁ, এতগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরেও এই হল আমাদের মহান এই দেশ—এই কাল—এই সমাজের 'মুখশ্রী' !

এই যেখানে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সেখানে দেশের গ্রন্থাগারগুলোর 'হাল-হকিকৎ' কী হতে পারে—তা বুঝতে বেশি বুদ্ধি খাটানোর দরকার নেই। যেখানে জাতীয় স্তরে শিক্ষাখাতে ১০ শতাংশ ব্যয়বরাদ্দের দাবিতে মাথা কুটে মরেও ২ শতাংশের ওপরে এক ইঞ্চিও নড়ানো যায়নি, সেখানে গ্রন্থাগারগুলোর কপালে কী লেখা আছে—তার জন্য 'কিরো'-র দ্বারস্থ হওয়ার দরকার নেই।

সারা দেশ, সারা রাজ্যের সঙ্গে জেলার গ্রন্থাগারগুলোও চলছিল ধুঁকে ধুঁকে। যাকে বলে 'নাম কা ওয়াস্তে'।

যদিও দেশের অন্য কয়েকটি রাজ্যে বহু আগে গ্রন্থাগার আইন পাস হয়ে গেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলার সেই কলঙ্কমোচন হতে স্বাধীনতার পরে ২৭/২৮টা বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। 'শবরী-বেচারি' রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় কষ্ট করে মরল, আর লোকে বলে নাকি 'সবুরে মেওয়া ফলে' ! মেওয়া ফলল ১৯৭৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের স্বপ্ন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি সহ পশ্চিম বাংলার অসংখ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হয় এই রাজ্যে। প্রবর্তিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার আইন (১৯৭৯)। বাস, এক লহমায় রাজ্যের গ্রন্থাগারের মানচিত্রে অন্য এক জেল্লা দেখা দিল। সংখ্যায় তো বটেই, গুণমানের নিরিখেও।

সে সব অনেক কথা, বহু উপকথা ; জায়গা কম, তাই মানে মানে নিজের জেলায় ফিরে আসি।

১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ছিল মাত্র ৪০টি গ্রন্থাগার। তাদের মধ্যে গুটিকয়েক ছাড়া বাকি সবই ছিল হরি ঘোষের গোয়াল। গ্রন্থাগার ছিল তো ভাল ভাল বাড়ি ছিল না, বাড়ি ছিল তো পর্যাপ্ত বই ছিল না, বই ছিল তো দরকারি তথা শিক্ষিত কর্মী ছিল না, কর্মী ছিল তো তাদের বেতন ছিল না। যেন 'না'-এর ক্যারাভ্যান ! ১৯৭৯ সালের আগে এই ছিল জেলা বাঁকুড়ায় গ্রন্থাগারের চালচিত্র।

যাই হোক, গ্রন্থাগার আইন পাস হওয়ার পর জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৪০ থেকে পৌঁছে গেল ১৩০-এ। প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারের ঝকঝকে নতুন বাড়ি। সমস্ত খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি। প্রায় সব গ্রন্থাগারে পেশায় দক্ষ কর্মী। তাঁদের জন্য সম্মানজনক আর্থিক নিরাপত্তা। ফলে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের সংখ্যা এ জেলায় কমার খবর আপাতত নেই। এমন কি যেসব গ্রন্থাগারে সম্প্রতি 'বৃত্তি সহায়ক বিভাগ' খোলা হয়েছে, সেখানে তো শিক্ষিত যুবক-যুবতী সদস্য-সদস্যাদের সংখ্যা দেড় দু গুণ বেড়েছে—এটাই এই মুহূর্তের সবচেয়ে জবর খবর।

বলা বাহুল্য, এইসব হল অতিসাম্প্রতিক অতীতের সাত-সতেরো। এর আগেও আছে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসা একটি ধূসর অতীত। যথাযোগ্য মর্যাদা জানিয়ে সবিনয়ে একটি নিবেদন রাখছি যে, সেই ধূসর অতীতকে আরও বেশি ধূসরিত করেছে গেজেটিয়ার সংকলক শ্রদ্ধেয় অমিয় বন্দোপাধ্যায়ের একটি পরিসংখ্যান। West Bengal District Gazeteer, Bankura, by Amiya Kumar Bandyopadhyay (Page 458) এ দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬৫ সালে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বাঁকুড়া জেলায় পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা ১০০০, লাইব্রেরি সেন্টার (?) ৮৬৬টি, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৫০৪টি, এরিয়া লাইব্রেরি ২৫টি আর জেলা গ্রন্থাগার ১৮টি।

১৯৬৫ সালে বাঁকুড়া জেলায় জেলা গ্রন্থাগার ১৮টি ? এ যে গল্পের গরু গাছে না চড়ে, গল্পের গাছই গরুর পিঠে সওয়ারি হয়ে বসেছে !

তবে অতিসম্প্রতি জেলার গ্রন্থাগার নিয়ে জেলার ভেতরেই গুরুত্বপূর্ণ দুটি 'কাগজাত' তৈরি হয়েছে। যাঁরা এই প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন, তাঁদের একজন পেশায় অধ্যাপক, অন্যজন ডাক্তার। প্রথমজন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, দ্বিতীয়জন ভাই-বন্ধু। এই দুজনের হাত ধরে আমি চেষ্টা করব বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগারের সেই ধূসর অতীতে পা রাখতে, সুদূর অতীতের গ্রন্থাগার সংবাদকে আলোকিত করতে। এটা ঘটনা যে, পুরনো ক্যানবন্দী ফিল্মের মতো হেজে-মজে যাওয়া তথ্যাবলী—স্বভাবতই কল্পনার পারদ কম-বেশি ওঠা-নামা করবে—ভবিষ্যতের গবেষকরা সেই ফাঁক পূরণ করে নেবেন,
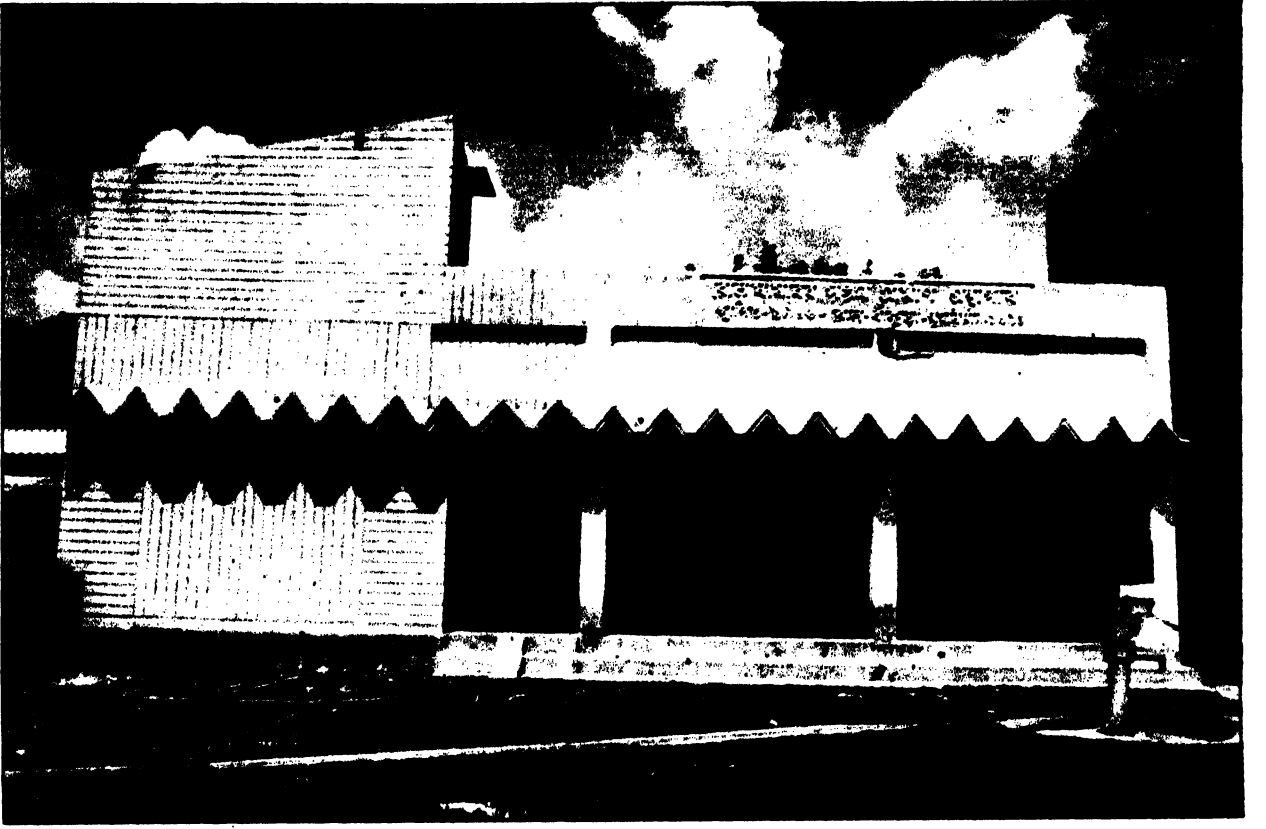
রোল যাযাবর সংঘ, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ইন্দাস ব্লক

শুদ্ধিকরণ করবেন—সেই আশাতেই আমার পরবর্তী কয়েকটি ছত্র সংযোজন।

বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে মল্লযুগ এক আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়। সেই মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর ছিল শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান। ফলত বিষ্ণুপুর তথা লাগোয়া অঞ্চলে যথা পাত্রবাখরা, জয়কৃষ্ণপুর, অযোধ্যা, অবন্তিকা, কাকিল্যা, কুচিয়াকোল, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দপুরের দেউলভিড়া, মালিয়াড়া, পাঁচাল, হদলনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় যুগোত্তীর্ণ চর্চার ইতিহাস আছে ; রাজবদান্যতায় বিভিন্ন স্থানে উদ্ভূত মধ্যবিত্তদের তৈরি টোল চতুষ্পাঠী, মক্তব, মাদ্রাসার অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল বলেও মনে হয়। কিন্তু সে সব স্রেফ মনে হওয়া। বিশ্বাসযোগ্য কোনও স্মারক সে যুগ থেকে এ যুগে এসে পৌঁছায়নি, অন্তত এই দীনের দৃষ্টিতে।

বস্তুত বাঁকুড়াবাসীর জীবনে গ্রন্থাগার হল ব্রিটিশ শাসনের অবদান। ইংরেজ আমলে পেশাগত প্রয়োজনেই ইংরেজি ভাষাশিক্ষা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ; এবং সেই সূত্রেই কোথাও ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কোথাও বা রাজানুগ্রহে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ও মধ্যবর্তী সময়ে বাঁকুড়ায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। যেমন, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৭০-এ ওয়েসলিয়ান মিশন, ১৯১৭-য় রামকৃষ্ণ মিশন, ১৯২৫-এ অমরকানন রামকৃষ্ণ মিশন, ১৯২৮-এ সারস্বত সমাজ, ১৯২৪-এ বাঁকুড়া সম্মিলনী, ১৯৪৬-এ ভারত সেবাশ্রম সংঘ ইত্যাদি সংগঠন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-বড় গ্রন্থাগার গড়ে তোলে।

তবে জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল পটভূমি তৈরি করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য চাহিদা। ব্রিটিশ অপশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অখণ্ড বাংলার যুব সম্প্রদায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল বিভিন্ন গ্রন্থাগার। জেলা বাঁকুড়াও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বিশেষত সশস্ত্র বিপ্লবীরা যে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর বা আত্মোন্নতি সমিতি তৈরি করেছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলেছিল একটি করে গ্রন্থাগার। দেশাত্মবোধকে সংহত করার জন্য সে সব গ্রন্থাগারে পঠন-পাঠন, আলোচনা ও মত-বিনিময় চলতো ; অন্তরালে চলতো চূড়ান্ত প্রস্তুতি।

যাই হোক, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে তৈরি হওয়া ওইসব গ্রন্থাগারের অধিকাংশই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সামান্য কিছু গ্রন্থাগার প্রায় স্বনামে বর্তমানে ১৩০টি সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারে শামিল হয়ে গেছে। কিছু কিছু গ্রন্থাগার সামান্য নামান্তর ঘটিয়ে ওই ১৩০-এ ভিড়ে গেছে। যাই হোক, জেলার গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রথম দিক থেকে আমি সামান্য 'বুড়ি-ছোঁওয়া' করে একেবারে হাল আমলের ১৩০-এ পৌঁছবার চেষ্টা করছি।

১৮৭৩ সালে জয়পুর থানার কুচিয়াকোলের স্থানীয় শাসনকর্তা রাধাবল্লভ সিংহদেবের পৌত্র, বহুভাষাবিদ ও সঙ্গীত-বিশারদ যুবরাজ বসন্তকুমার একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাত্র ৩২ বছর

বয়সে **বসন্তকুমার** লোকান্তরিত হলে ওই গ্রন্থাগারটিরই নামকরণ হয় **'বসন্ত লাইব্রেরি'**। এটিকেই বাঁকুড়া জেলার প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার বলে প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন।

ও. ম্যালি সেই সময় এই জেলায় মাত্র দুটি সাধারণ গ্রন্থাগারের সন্ধান পেয়েছিলেন। একটিমাত্র পাত্রসায়েরের সন্নিকটে কাকাটিয়ায়, অন্যটি বিষ্ণুপুরে। কেউ কেউ বলেন যে, **১৮৯৮** সালে তৈরি হওয়া **কাকাটিয়ার গ্রন্থাগারটিই** জেলার দ্বিতীয় সাধারণ পাঠাগার। এর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন (মাননীয় প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ দে'র পিতামহ) কেনারাম দে।

১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল **বিষ্ণুপুর পাবলিক লাইব্রেরি**।

১৯০৯ সালে যুগান্তর দলের উদ্যোগে বাঁকুড়া শহরের **কালীতলায়** একটি **গ্রন্থাগার** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বাঁকুড়ার প্রথম পৌরপ্রধান **হরিহর মুখোপাধ্যায়ের** অর্থানুকূল্যে।

১৯১০ সালে বিশ্ববন্দিত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় তাঁর সহপাঠী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় গঙ্গাজলঘাটির বিশিণ্ডায় **'রামকৃষ্ণ পাঠাগার'** স্থাপন করেছিলেন।

ওই বছরেই বাঁকুড়া শহর লাগোয়া সানবান্দায় তৈরি হয়েছিল **'সানবান্দা অরুণোদয় গ্রন্থাগার'**।

মেথডিস্ট মিশনারি সোসাইটির নির্দেশে ইংরেজি শিক্ষা ও খৃস্টধর্ম প্রসারের লক্ষে এডওয়ার্ড টমসন **১৯১৫ সালে** বাঁকুড়া শহরের নতুনচটিতে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে যেটি বর্তমান বাঁকুড়া পৌরভবন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা দপ্তরের মধ্যবর্তী **এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে** উঠে আসে। **১৯৫৬-৫৭ সালে** এই গ্রন্থাগারের সমস্ত বই ও অন্যান্য নথিপত্র সংশ্লিষ্ট আসবাবপত্র সহ সন্নিকটের **বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারে** প্রদত্ত হয় ; এবং আশ্চর্যজনক কারণে সেইসব মূল্যবান গ্রন্থ (প্রবাসী পত্রিকা সহ) এতদিন যাবৎ বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের মহিলা পাঠকক্ষের মধ্যে 'আনটাচড় ভার্জিনের' মতো পর্দানসীন ছিল। মাস কয়েক হল বর্তমান গ্রন্থাগারিক সেই সব বইয়ের গা থেকে ৪০-৪৫ বছরের ধুলো ময়লা, পোকামাকড় ঝাড়পোঁছ করেছেন মাত্র। নথিকরণের কাজ চলছে।

১৯১৫ সালে গন্ধেশ্বরী নদী তীরবর্তী বাঁকুড়া শহরের দোলতলার কাছে **রামকৃষ্ণ মিশন** একটি বিদ্যালয়, **গ্রন্থাগার** ও দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়টি আজও টিকে আছে।

১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে কিশোর স্বদেশিকর্মী মন্মথ মল্লিক কোতুলপুরের রামজীবনপুরে একটি **গ্রন্থাগার** গড়ে তুলেছিলেন ; যে গ্রন্থাগারের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত বিপ্লবী সখারাম গণেশ দেউসকরের গভীর সম্পর্ক ছিল বলে শোনা যায়।

১৯২০-২১ সালে বাঁকুড়া শহরে হরিকিষণ রাঠী ও আরও কয়েকজন মিলে স্টেশন মোড় সংলগ্ন এলাকায় **'বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরি'** তৈরি করেছিলেন।

১৯২২-২৩ সালে শিবদাস রাঠীর অর্থানুকূল্যে **বিষ্ণুপুর বিবেকানন্দ লাইব্রেরি** তৈরি হয়েছিল। শোনা যায়, বিষ্ণুপুর **কমিউনিস্ট পার্টির শাখা-প্রশাখা এই গ্রন্থাগারকে ভিত্তি করেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।**

১৯২৩-২৬ সালে বাঁকুড়া শহরের কাছাকাছি দ্বারকেশ্বর নদের তীরে **রাজগ্রামে বিবেকানন্দ লাইব্রেরি** গড়ে ওঠার কথা জানা যায়। যেটা নাকি ১৯২৩ সালে চট্টগ্রাম থেকে মেডিকাল স্কুলে পড়তে আসা যোগেশ দে নামক এক যুবক গোপনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংঘটিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গান্ধীজির নির্দেশে **১৯২৩ সালে** কুমিল্লার অভয় আশ্রম থেকে সুশীল পালিত ও জগদীশ পালিত বাঁকুড়ায় আসেন। তাঁরা লালবাজারের দশুবাঁধ অঞ্চলে **'হরিজন বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার'** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শোনা যায়, একজন উৎকৃষ্ট সংগঠক ও গ্রন্থাগারিক হিসেবে জগদীশ পালিত এই গ্রন্থাগারটিকে মর্যাদাসম্পন্ন ও উদ্দেশ্যমুখী করে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সনৎ ভট্টাচার্য তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, 'জগদীশ পালিতই বাঁকুড়া জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তক। বাঁকুড়া জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি এই বিষয়টিতে আলাদাভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন।

১৯২৪-২৫ সালে কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র স্থানীয় অভয় আশ্রমের আনুকূল্য নিয়ে সোনামুখী শহরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে ওই পাঠাগারটিই **সোনামুখী টাউন ক্লাব লাইব্রেরিতে** রূপান্তরিত হয়। বলা বাহুল্য, বর্তমানে অস্তিত্বহীন টাউন ক্লাব লাইব্রেরির সঙ্গে সরকার-পোষিত সোনামুখী টাউন লাইব্রেরির কোনও সম্পর্ক নেই।

একটি তথ্যসূত্র বলছে, ১৯২৯ সালে বিভূতিকুমার ঘটক বাঁকুড়া শহরের **স্কুলডাঙায়** কংগ্রেস কার্যালয়ে বসুমতী পত্রিকার সার্বিক সহযোগিতায় একটি গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন।

অন্য একটি তথ্যসূত্র বলছে যে, ওই **১৯২৯ সালেই** বিভূতিকুমার ঘটক বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সুলভ বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে জয়পুর থানার **মির্জাপুরে** একটি গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন।

কোনটি সঠিক তথ্য কিংবা একই সঙ্গে দুটি ঘটনাই সত্য কিনা তা আল্লা জানেন ! অতএব, জল ঘোলা না করে বাকি সব তথ্য কালানুক্রমিকভাবে খাড়া করে দিচ্ছি :

১৯৩১ সালে হাড়মাসড়া গ্রামে **'বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরি'** এবং বাঁকুড়া শহরের নতুনগঞ্জে **'খাণ্ডেলওয়াল লাইব্রেরি'** (রূপান্তরিত নাম **'শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরি'**)

১৯৩২ সালে মালিয়াড়ার **'বিবেকানন্দ লাইব্রেরি'**। বারুইপাড়ায় **'শক্তিশংকর লাইব্রেরি'। তরুণ লাইব্রেরি। গঙ্গাধর স্মৃতি লাইব্রেরি।**

১৯৩৩ : বাঁকুড়া শহরের নতুনগঞ্জ ব্যায়ামাগারে **সাহিত্য মন্দির গ্রন্থাগার।**

১৯৩৪ : জামজুড়ি পাবলিক লাইব্রেরি।

১৯৩৮ : গেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার।

১৯৪০ : বৃন্দাবনপুরের ক্ষেত্রগোপাল স্মৃতি পাঠাগার (ভিন্ন নামে)।

১৯৪০ : অম্বিকানগর কালাচাঁদ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি।

১৯৪১ : রাইপুরের আজাদ হিন্দ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

১৯৪৬ : গোড়াবাড়িতে 'গোড়াবাড়ী পাবলিক লাইব্রেরি'।

১৯৪৭ : অযোধ্যায় বিবেকানন্দ পাঠাগার।

১৯৪৮ : বিদ্যাধরপুরে বাণীশ্রী ক্লাব লাইব্রেরি।
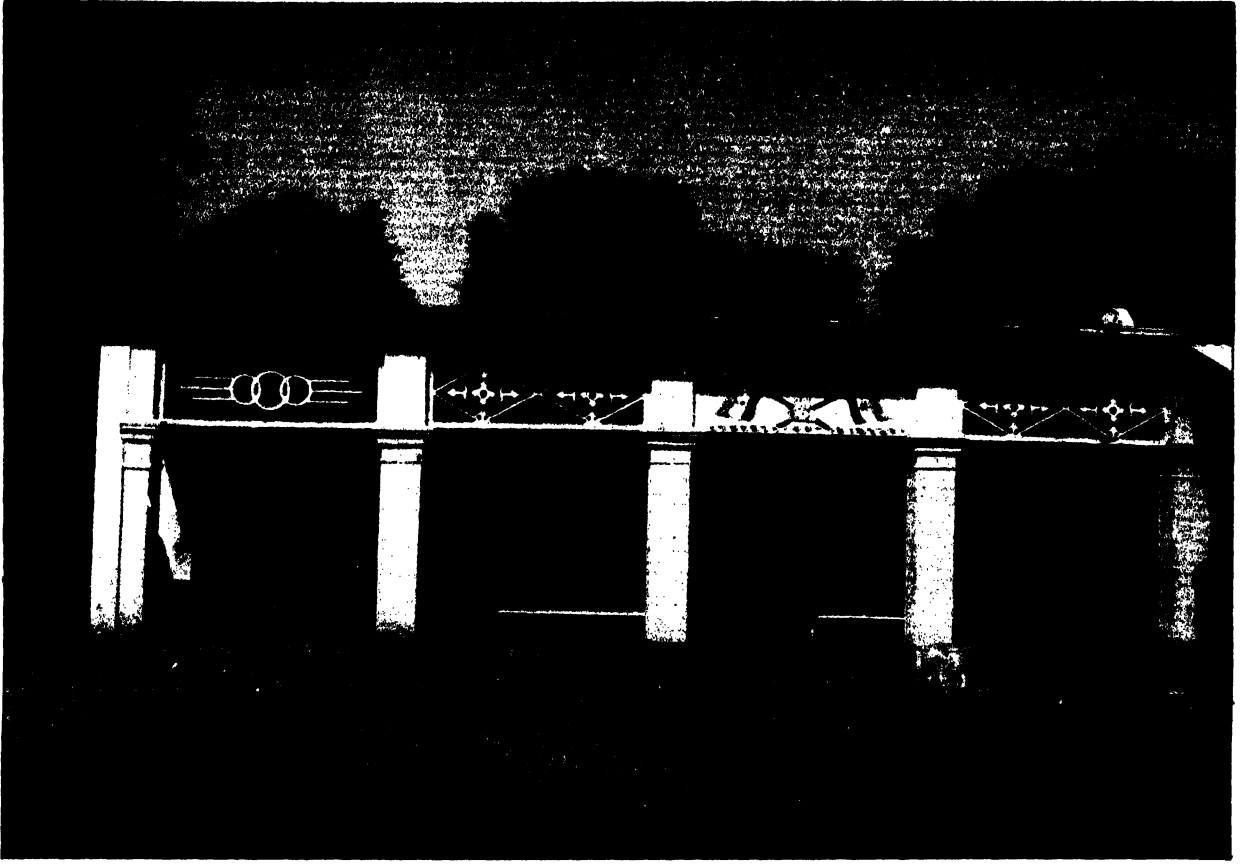
রাধানগর অগ্রদূত ক্লাব পাঠাগার, পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া

১৯৪৮ : মণ্ডলকুলিতে 'বাণী গ্রন্থাগার'।

১৯৫০ : বড়জোড়ার বান্ধব সমিতি গ্রন্থাগার, মলিয়ানে ভবানী পাঠাগার, বালসীর ধ্রুব সংহতি পাঠাগার।

১৯৫১ : পখন্নার বাণী মন্দির। তাজপুরের পল্লীমঙ্গল পাঠাগার।

১৯৫১ সালের ২৯ জানুয়ারি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সূচনা। ১৯৫৩-৫৪ সালে এর নাম হয় 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন ও সংগ্রহশালা।

১৯৫২ : দেশুড়্যা পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরি। সারেঙ্গায় শরৎ স্মৃতি লাইব্রেরি।

১৯৫৩ : গোপালনগর পাবলিক লাইব্রেরি। সিমলাপাল রবীন্দ্র লাইব্রেরি।

১৯৫৪ : কাঁটাগড়ে জ্ঞানোদয় লাইব্রেরি। ইন্দাসে নবারুণ সংঘ লাইব্রেরি, দারাপুরে বিবেকানন্দ লাইব্রেরি।

১৯৫৫ : রাণিবাঁধ ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রণব গ্রন্থ মন্দির। হলুদকানালীর আশুতোষ মিলনী সংঘ গ্রন্থাগার। সোনামুখীর বাসুদেব গ্রন্থাগার। রাউতোড়ার সারদা ইনস্টিটিউশন। রায়বাঘিনীর সুভাষ লাইব্রেরি।

১৯৫৬ সাল। বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি বিশেষ বছর। বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের সূচনা হয় স্কুলডাঙ্গায়। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনও গঠিত হয় ওই একই সময়ে। ঠিক পরের বছর বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয় জেলা শহরের দশের বাঁধ অঞ্চলের (অধুনা জেলা প্রশাসনিক ভবনের প্রায় পূর্বদিকে) একটি ভবনে। তখনকার দিনে প্রায় ৭৮,০০০ টাকা খরচ করে তৈরি করা বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের একতলা ভবনটির একটি ইতিহাস জানা গেছে। সংক্ষেপে সেই ইতিকথা একটু সেরে নেওয়া যাক।

বাঁকুড়ার তৎকালীন জেলাশাসক রঞ্জিত ঘোষের অনুরোধক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা তাঁর কানাডা সফরকালে একটি ওই দেশীয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নকশা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। ওই নকশা ধরেই কংসাবতী প্রকল্পের বাস্তুকারেরা জেলা গ্রন্থাগার ভবনের একতলাটি নির্মাণ করেছিলেন। 'ভদ্রলোকের চুক্তি'মতো ওই একই নকশায় কানকাটায় কংসাবতী প্রকল্পের দপ্তরটিও নির্মিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাঁকুড়া শহরে সর্বপ্রথম স্টিলের জানালা ব্যবহৃত হয় বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে।

তারপর দীর্ঘদিন অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় বিবর্ণ চেহারা নিয়ে জেলা গ্রন্থাগার ভবন দিনাতিপাত করছিল। কিন্তু ১৯৯৯ সালের পর থেকে বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের দ্বিতল ভবনটি ঝকঝকে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে এলাকার অন্যতম দৃষ্টিনন্দন ভবন হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে। পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০। প্রতিদিন গড় বই ইস্যু ১৮০। বৃত্তি সহায়ক বিভাগ থাকায় যুবক-যুবতী সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

এরপর আমি বাঁকুড়া জেলার সরকার-পোষিত ১৩০টি গ্রন্থাগারের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে চলেছি। তার আগে সরকার-পোষিত নয়, কিন্তু গুণমানে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন দ্বিশতাধিক Non govt.-Non Sponsord-এর গ্রন্থাগার থেকে গুটি কয়েক গ্রন্থাগারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস নিচ্ছি :

(১) অনন্ত স্মৃতি পাঠাগার, বোলতলা, বিষ্ণুপুর।
(২) খিচ্‌কা শহিদ পাঠাগার, তালডাংরা।
(৩) কুচিয়াকোল রামকৃষ্ণ পাঠাগার।
(৪) তাজপুর সুকান্ত পাঠাগার।
(৫) হাজামডিহি গিরিধারী ক্লাব ও লাইব্রেরি, খাতড়া।
(৬) লোকসংস্কৃতি অকাদেমি, দোলতলা, বাঁকুড়া।
(৭) রাঢ় একাদেমি, কাটজুড়িডাঙ্গা, বাঁকুড়া।
(৮) উরিয়ামা-পাথরাবাইদ যুবক মণ্ডল ও গ্রন্থাগার।
(৯) আকুই যুবক সংঘ, ইন্দাস।
(১০) ভড়া ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা সাধারণ পাঠাগার।
(১১) ছাগুলিয়া সম্মিলনী পাঠাগার, ওন্দা।
(১২) বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া।
(১৩) অশ্বিনী রাজ স্মৃতি পাঠাগার, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।
(১৪) প্লেয়ার্স কর্নার ক্লাব গ্রন্থাগার, পাটপুর, বাঁকুড়া।
(১৫) চাঁদমারিডাঙ্গা বয়েজ ক্লাব পাঠাগার, চাঁদমারিডাঙ্গা, বাঁকুড়া।
(১৬) কল্যাণপুর নেতাজি সংঘ পাঠাগার, সোনামুখী।

সবশেষে, বাঁকুড়া জেলার সরকার পোষিত ১৩০টি গ্রন্থাগারের তালিকা পেশ করছি :

***সরকারি নির্দেশনামা ১৪২৩ ই ডি এন ও ১৪২৪ ই ডি এন তারিখ ৯.২.১৯৫৬ এবং ৭১৪৭ ই ডি এন তারিখ ১০/১১-৭-১৯৫৭ অনুসারে ১৯৫৫ সাল থেকে বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারকে অনুমোদন দেওয়া হয়।**

(১) স্বপন ঘোষ (২) নরহরি মণ্ডল (৩) মুক্তাপদ বিশ্বাস, (৪) গীতা বোস (৫) জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (৬) ভক্তিভূষণ বাঙ্গাল (৭) শিবশংকর সাহা, (৮) অভিজিৎ মল্লিক (৯) শ্রীদাম চৌধুরী।

*বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগার অনুমোদন পায় **২৪৭ ই ডি এন (এস ই) তাং ২৫.৩.১৯৭৫, ২০১৪(৫০) এস সি/পি তাং ১৪.৫.১৯৭৫ ও জেলা সমাজ শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশ ৭৮৭ তারিখ ৩১.১২.১৯৭৫।**

(১) সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২) দীপাল দাস (৩) হিমাদ্রি ব্যানার্জি (৪) রবিলোচন লাহা।

***খাতড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারটি শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয় ৮৭ ই ডি এন (এস ই) তাং ২৩.২.১৯৮২ এবং জেলা সমাজ শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশ ৬৭৫ এস ই বি তারিখ ২৫.৩.১৯৮২।**

(১) স্ফটিকচন্দ্র গোস্বামী (২) অরূপরতন দে (৩) তারাপদ গাঙ্গুলি (৪) মীর শাহআলম।

***সোনামুখী শহর গ্রন্থাগার অনুমোদন পায় ৩৭ ই ডি এন (এস ই) তাং ২১.১.১৯৮০ ও জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তরের আদেশ ৬৭৪ এস ই বি তাং ২৯.৩.১৯৮০।**

(১) হরিদাস দে (২) চৌধুরী আম্মারা ফুলইসলাম (৩) ধনপতি পাল (৪) মধুসূদন মণ্ডল।

***সরকারি নির্দেশনামা ৪৬২ ই ডি এন (এস ই) তাং ২৮.৭.১৯৮৬, গ্রন্থাগার অধিকর্তা।**

স্মারকপত্র ৬৪/এল. এস তাং ২.২.১৯৮৭ এবং জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে ৭৪(৪) এস ই বি তাং ১৮.২.১৯৮৭ অনুসারে নিম্নলিখিত চার গ্রন্থাগার শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয়। যথা :

(ক) ছাত্‌না চণ্ডীদাস গ্রন্থাগার (খ) তালডাংরা শহর গ্রন্থাগার (গ) লাপুড় বীণাপাণি গ্রন্থাগার ও (ঘ) সিমলাপাল রবীন্দ্র পাঠচক্র।

(৫) ছাত্‌না চণ্ডীদাস গ্রন্থাগার (ছাত্‌না) : উজ্জ্বলকুমার সাহা, নিতাইচন্দ্র দাস, মধুসূদন রায়, বিজয় বাউরী।

(৬) তালডাংরা শহর গ্রন্থাগার : অর্ধেন্দু ব্যানার্জি, অশোক বিশ্বাস।

(৭) লাপুড় বীণাপাণি গ্রন্থাগার (শহর) : করুণাকেতন ভট্টাচার্য, মথুরচন্দ্র ধীবর, তিলক মালাকার।

(৮) সিমলাপাল রবীন্দ্র পাঠচক্র (শহর) : বাণীনাথ দে, মনোহর সিংহ।

২৯৫(১০) তাং ২.৭.৫৭ অনুসারে যে দশটি গ্রন্থাগার সরকারি অনুমোদন পায় তার বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

(৯) অমরকানন রামকৃষ্ণ পাঠাগার (অমরকানন) : নীরেন্দ্রনাথ সিনহা, স্বপন চ্যাটার্জি।

(১০) ওন্দা গ্রামীণ গ্রন্থাগার (ওন্দা) : অমিয়কুমার গোস্বামী, দুঃখভঞ্জন মল্ল।

(১১) কোতুলপুর হিতসাধন পাঠাগার (কোতুলপুর) : সুদেষ্ণা রায়, শ্যামসুন্দর হালদার।

(১২) গড়গড়িয়া উদয়ন সংঘ লাইব্রেরি (গড়গড়িয়া) : দেবাশিস দুলে, গীতা অধিকারী।

(১৩) গোলিয়া জাতীয় গ্রন্থাগার (গোলিয়া) : চন্দনকুমার মুখার্জি, কান্তি মুখার্জি।

(১৪) ঝাটিপাহাড়ি গ্রামীণ গ্রন্থাগার (ঝাটিপাহাড়ি) : গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, ভীম সেন মণ্ডল।

(১৫) পাত্রসায়ের সজ্জদয় নেতাজি পাঠাগার (পাত্রসায়ের) : সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলি, মঙ্গল ঠাকুর।

(১৬) ভেদুয়াশোল গ্রামীণ পাঠাগার (ভেদুয়াশোল) : বংশীধর ঘোষাল সুভাষ ত্রিবেদী।

(১৭) শীতলা পল্লী পাঠাগার (শীতলা) : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

(১৮) হাড়মাসড়াবাণী গ্রন্থাগার (হাড়মাসড়া) : তারিণীপদ দিয়াসী, সুদেবচন্দ্র দাস।

১০৯০ (৮) তাং ২২.৭.৫৮ অনুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারগুলি অনুমোদন পায়।

(১৯) ইন্দাস গ্রামীণ গ্রন্থাগার (ইন্দাস) : বুদ্ধদেব দে, শান্তিনাথ চক্রবর্তী।

(২০) তিলুড়ী গ্রামীণ পাঠাগার (তিলুড়ী) : সুভাষচন্দ্র শর্মা, সুশান্ত মণ্ডল।
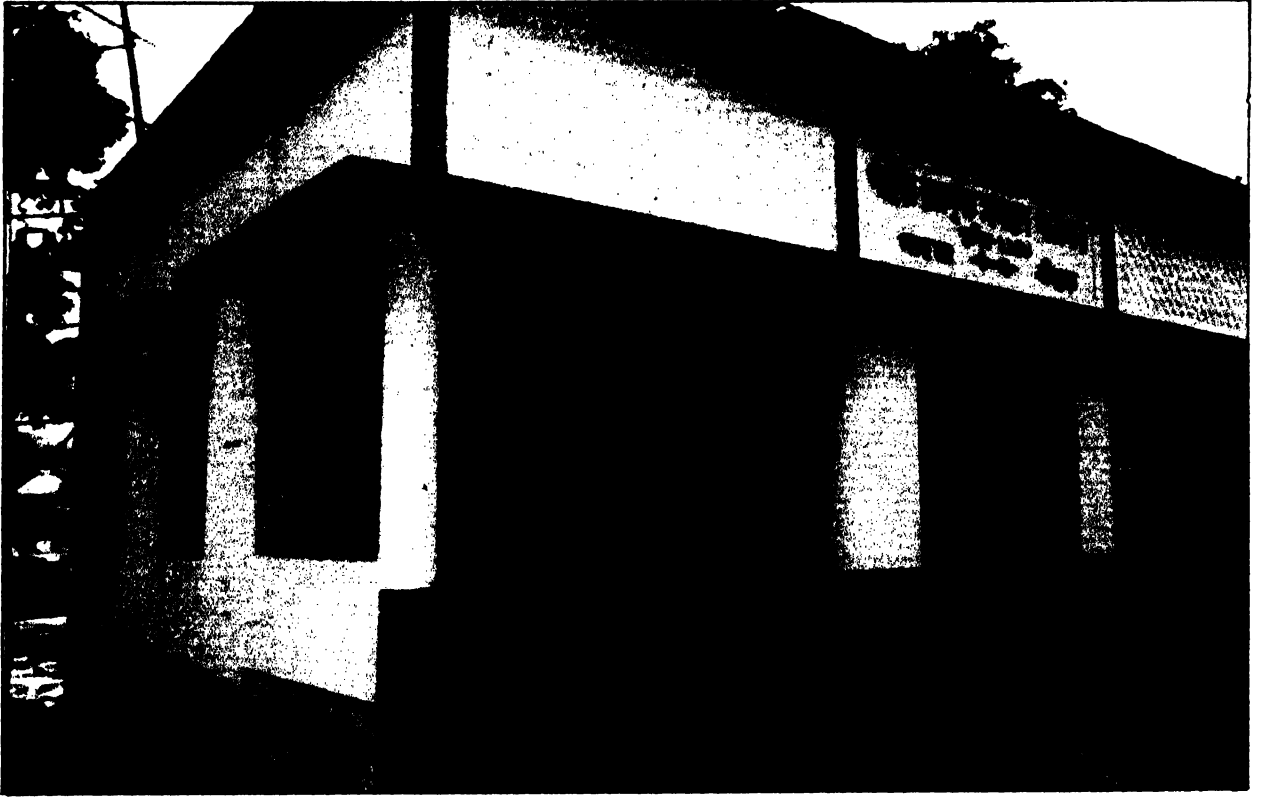
পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার

(২১) নড়রা পল্লী পাঠাগার (নড়রা) : দিলীপ চ্যাটার্জি, অর্চনা সামন্ত।

(২২) বিদ্যাধরপুর বাণীশ্রী গ্রন্থাগার (গোপীকান্তপুর) : অশোককুমার পাল।

(২৩) মালিয়াড়া শ্রীদিবদাস পাঠাগার (মালিয়াড়া) : সমরেন্দ্রনাথ মিশ্র, পঞ্চানন মিশ্র।

(২৪) মেঝিয়া গ্রামীণ পাঠাগার (মেঝিয়া) : নীহাররঞ্জন কর্মকার, মনোজগোপাল চৌধুরী।

(২৫) রাইপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার (রাইপুর) : শান্তিময় মণ্ডল।

(২৬) রানীবাঁধ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (রানীবাঁধ) : অসীমকুমার লাহা

সরকারি নির্দেশনামা ৬৬২(৬) তাং ১৫.৬.৫৯ অনুসারে নিম্নোক্ত ছটি গ্রন্থাগার অনুমোদন পায়।

(২৭) পাঞ্চাল গ্রামীণ গ্রন্থাগার (পাঞ্চাল) : ফেলারাম দে, ভবতারণ শীট।

(২৮) মলিয়ান ভবানী পাঠাগার (মলিয়ান) : ফণিভূষণ সেনগুপ্ত, আনন্দপ্রসাদ চন্দ।

(২৯) মাদারবনী বিবেকানন্দ লাইব্রেরি (মাদারবনী) : শিবদাস চক্রবর্তী, স্বরূপকুমার দে।

(৩০) রাধানগর গ্রামীণ গ্রন্থাগার (বনরাধানগর) : অশোক চ্যাটার্জি, অজিতকুমার ব্যানার্জি।

(৩১) শালতোড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার (শালতোড়া) : শ্যামাপদ মণ্ডল, সুভাষ ভট্টাচার্য।

(৩২) হটগ্রাম রবীন্দ্র লাইব্রেরি (হটগ্রাম) : অজিতকুমার চ্যাটার্জি, সুবলচন্দ্র মুখার্জি।

উপরোক্ত গ্রন্থাগার ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারগুলি **প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অনুমোদন পায় (বর্ণানুক্রমিক তালিকা)**

(৩৩) ছান্দার গৌরীশংকর বুক ব্যাঙ্ক (ছান্দার) : জ্যোৎস্না ঘাটি (ব্যানার্জি), রবিলোচন তুং।

(৩৪) দেশড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার (দেশড়া) : অসিত ব্যানার্জি, রাধাশ্যাম পণ্ডিত।

(৩৫) বাঁকাদহ রবীন্দ্র লাইব্রেরি (বাঁকাদহ) : বিদ্যুৎকুমার প্রতিহার, গদাধর মিশ্র।

(৩৬) বাঁকীশোল গ্রামীণ গ্রন্থাগার (বাঁকীশোল) : গোলকবিহারী বাউড়ি।

(৩৭) মণ্ডলকুলি বাণী গ্রন্থাগার (মণ্ডলকুলি) : ফণিভূষণ দে, বিপদতারণ ঘোষাল।

(৩৮) শক্তিসংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (গোগড়া) : গদাধর চ্যাটার্জি, তাপস মুখার্জি।

(৩৯) এরিয়া লাইব্রেরি (ঝিলিমিলি) **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৩৬২/৯ এফ-১৩১ তাং ২৭.৩.৫৭ নির্দেশবলে অনুমোদন পায়** : অনন্তকুমার সিংহমহামাত্র।

সরকারি নির্দেশ ৫০৭ ই ডি এন (এস ই) তারিখ ৪.৯.১৯৭৬

এবং জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশনামা ৩৮৫(৭) এস ই বি তারিখ ২৭.১২.১৯৭৬ অনুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার দুটি অনুমোদন পায়।

(৪০) অযোধ্যা বিবেকানন্দ পাঠাগার (অযোধ্যা) : বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক), কাঞ্চন মাণ্ডী (সাইকেল পিওন)।

(৪১) জালানপুর পূর্বাচল সংঘ লাইব্রেরি (মালিয়াড়া) : কার্তিক সরকার, শক্তিপদ বাজপেয়ী।

সরকারি নির্দেশ ৪৫৭ ই ডি এন (এস ই) তাং ২৮.৬.১৯৭৯ এবং জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে নিম্নোক্ত গ্রন্থাগারগুলি অনুমোদন পায়।

(৪২) কুমিদ্যা রামকৃষ্ণ পাঠাগার (কুমিদ্যা) : সন্দীপ দত্ত, মনোরঞ্জন চৌধুরী।

(৪৩) রোল যাযাবর সংঘ লাইব্রেরি (রোল) : দীনবন্ধু দে, গৌরীশংকর দত্ত।

(৪৪) লোহামেড়া প্রগতি সংঘ লাইব্রেরি (সোনাগাড়া) : লক্ষ্মীকান্ত হেমব্রম।

সরকারি নির্দেশনামা ৩৭ ই ডি এন (এই ই) তাং ২১.১.১৯৮০ এবং জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তরের ৬৬৪(৫০) এই ই বি তাং ২৬.৩.১৯৮০ অনুসারে নিম্নলিখিত ৫০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও সোনামুখী শহর গ্রন্থাগার অনুমোদন পায়। (বর্ণানুক্রমিক তালিকা)

(৪৫) আনন্দ লাইব্রেরি (হাট-আসুরিয়া) : রাধাশ্যাম ঘোষাল, চন্দ্রশেখর আচার্য।

(৪৬) ইন্দপুর বিদার্থী সংঘ পাঠাগার (ইন্দপুর) : অজিত গাঙ্গুলি, নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল।

(৪৭) কাঁকড়াদাঁড়া মিলনী সংঘ লাইব্রেরি (কাকড়াদাড়া) : শঙ্করচন্দ্র পাণ্ডা, শ্যামসুন্দর মল্লিক।

(৪৮) কাঞ্চনপুর তরুণ সংঘ লাইব্রেরি (কাঞ্চনপুর) : রসিকচন্দ্র দে, গোপালচন্দ্র মিশ্র।

(৪৯) কালাচাঁদ মেমোরিয়াল (অম্বিকানগর) : অচিন্ত্যকুমার মোদক, বারিদবরণ গোস্বামী।

(৫০) কেঞ্জেপুড়া মাতৃশ্রী গ্রন্থাগার (কেঞ্জাকুড়া) : মধুমঙ্গল চ্যাটার্জি, শ্যামাপদ চন্দ।

(৫১) কোষ্টিয়া সাধারণ পাঠাগার (কোষ্টিয়া) : জনপ্রিয় বাগ, সুপ্রিয়া শীট।

(৫২) গঙ্গাজলঘাটি নীরদস্মৃতি পাঠাগার (গঙ্গাজলঘাটি) : দিলীপ সিনহা, হিমাংশু চক্রবর্তী।

(৫৩) গাড়রা প্রভাতী সংঘ (বড়গাড়রা) : আশিস হাজরা, সুশান্ত পাত্র।

(৫৪) গোড়াবাড়ি বীণাপাণি গ্রন্থাগার (গোড়াবাড়ি) : প্রভাতকুমার মহান্তি, প্রদীপকুমার সাহু।

(৫৫) গোড়াশোল পাবলিক লাইব্রেরি (গোড়াশোল) : কৃপাময় গোস্বামী, শ্রীদামচন্দ্র গোস্বামী।

(৫৬) জগদল্লা পাবলিক লাইব্রেরি (জগদল্লা) : মির্জা সামসুলহোদা, স্বপনকুমার চ্যাটার্জি।

(৫৭) জয়রামপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার (চুয়ামসিনা) : জন্মেজয় নন্দী, শশাঙ্কশেখর ডাঙ্গর।

(৫৮) জামবনী উদয়তীর্থ সংঘ (জামবনী) : আনন্দময় চক্রবর্তী, তুষারকান্তি পরামাণিক।

(৫৯) তেতুলিয়া ফাল্গুনী সংঘ (ব্রজরাজপুর) : অপূর্বকুমার পাত্র, শিবদাস লায়েক।

(৬০) দক্ষিণ ছাতনা সার্বজনীন গ্রন্থাগার (মুনতুমড়া) : কালোবরণ কবিরাজ, মহাদেব দাস।

(৬১) দিঘলগ্রাম বাণীশ্রী (দিঘলগ্রাম) : তপনকুমার দাস, কমলকৃষ্ণ মুখার্জি।

(৬২) দুবরাজপুর সুকান্ত স্মৃতি পাঠাগার (বন দুবরাজপুর) : মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার দাস।

(৬৩) ধানাড়া বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার (ধানাড়া) : শ্রবণকুমার পাত্র, সত্যকিংকর মাহাতো।

(৬৪) নবাসন সুকান্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (নবাসন) : সুনীত পাঁজা, রামদাস রায়।

(৬৫) নিত্যানন্দপুর সুভাষ লাইব্রেরি (নিত্যানন্দপুর) : কল্যাণকুমার চেল, সুবোধচন্দ্র অধিকারী।

(৬৬) নুন্দরী গ্রামীণ গ্রন্থাগার (নুন্দরী) : শিশিরকুমার পাল, তারাপদ ব্যানার্জি।

(৬৭) পখন্না বাণী মন্দির (পখন্না) : নিমাইচন্দ্র নন্দী, সত্যব্রত রায়।

(৬৮) পাবড়া শ্রীদুর্গা পাঠাগার (পাবড়া) : রামপ্রসাদ চ্যাটার্জি, অশোককুমার অধিকারী।

(৬৯) পার্শ্বলা সুকান্ত পাঠাগার (পার্শ্বলা) : প্রণবকুমার মহান্তী, ঘনশ্যাম মাহাতো।

(৭০) বড়জোড়া বান্ধব লাইব্রেরি (বড়জোড়া) : সনৎ সিংহঠাকুর, পথিককুমার মিত্র।

(৭১) বাকুলিয়া চিত্তরঞ্জন গ্রন্থসদন ও সাধারণ গ্রন্থাগার (বাকুলিয়া) : অসিতকুমার দাশগুপ্ত।

(৭২) বালসী ধ্রুবসংহতি (বালসী) : অসীমকুমার পূজারি, দীনবন্ধু মহাতো।

(৭৩) বাসুদেবপুর বান্ধব ক্লাব লাইব্রেরি (মড়ার) : নিমাইচন্দ্র চরণ, অভিমন্যু টিকাদার।

(৭৪) বেলুট বীণাপাণি রুরাল লাইব্রেরি (বেলুট) : সুধাংশুকুমার রায়।

(৭৫) মটগোদা নবারুণ সংঘ লাইব্রেরি (মটগোদা) : দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার পাণ্ডা।

(৭৬) মদনমোহনপুর পাবলিক লাইব্রেরি (মদনমোহনপুর) : শ্যামসুন্দর শর্মা, সুজিত গুপ্ত।

(৭৭) ময়নাপুর বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার (ময়নাপুর) : রঞ্জিত কাপড়ি, সুশীলকুমার ভট্টাচার্য।

(৭৮) মশিয়াড়া সুভাষ মিলন পাঠাগার (মশিয়াড়া) : সুধাংশুশেখর পতি, জগন্নাথ রায়।

(৭৯) মাগুরা রাধানাথ স্মৃতি পাঠাগার (মাগুরা) : উত্তম রায়, মানিক রায়।

(৮০) মানিকবাজার বিবেকানন্দ লাইব্রেরি (মানিকবাজার) : কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস, সমীরকুমার চিনা।
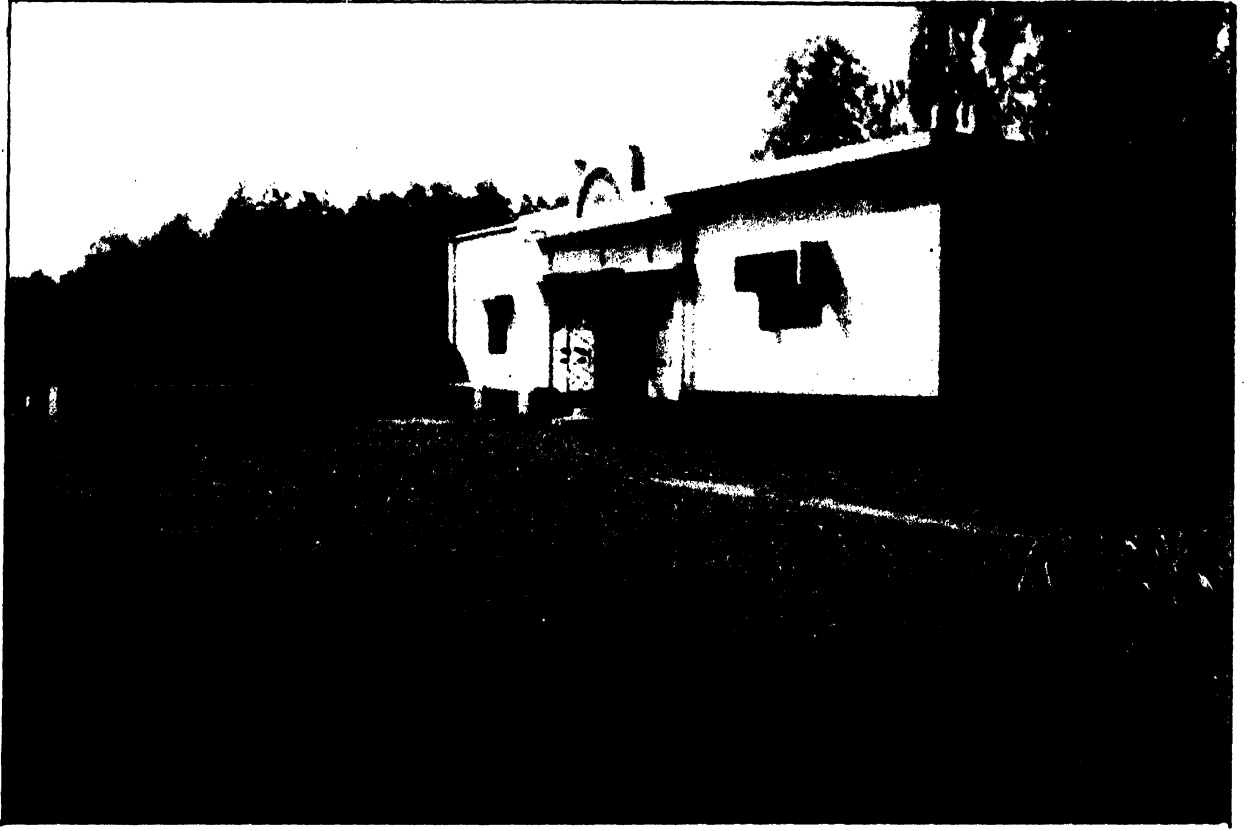
বিবড়দা জাগৃতি সংঘ পাঠাগার, বাঁকুড়া

(৮১) মৌলাশোল তরুণ সংঘ লাইব্রেরি (মৌলাশোল) : চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

(৮২) রাধানগর অগ্রদূত ক্লাব ও পাঠাগার (পাঁচমুড়া) : ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গৌরচন্দ্র পরামানিক।

(৮৩) রামচন্দ্রপুর তরুণ সমিতি লাইব্রেরি (ঠাকুরবাড়ি রামচন্দ্রপুর) : মধুসূদন কবিরাজ, সুধীরকুমার নায়েক।

(৮৪) রামলালপুর রামকৃষ্ণ স্মৃতি সঞ্চয়ন (পায়রাশোল) : সজলকুমার চ্যাটার্জি, অখিলকুমার রায়।

(৮৫) লক্ষ্মীসাগর পঞ্চায়েত পাঠাগার (লক্ষ্মীসাগর) : বিমলকুমার পাত্র, গোবর্ধন দুলে।

(৮৬) লোদনা অঞ্চল সার্বজনীন পাঠাগার (লোদনা) : হারাধন গোস্বামী, অজিতকুমার গোস্বামী।

(৮৭) শালবনী মাতৃশ্রী পাঠাগার (শালবনী) : শক্তিনাথ ব্যানার্জি, সত্যপদ আটা।

(৮৮) শুশুনিয়া অঞ্চল সার্বজনীন গ্রন্থাগার (পাহাড় শুশুনিয়া) : অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, হলধর কর্মকার।

(৮৯) সৎসঙ্গ পাঠাগার (তলঝিটকা কেশিয়াড়া) : সত্যবান মণ্ডল, মলয় সিংহ।

(৯০) সাবড়াকোন সুকান্ত স্মৃতি পাঠাগার (সাবড়াকোন) : সৌরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, রণজিৎকুমার পাত্র।

(৯১) সারেঙ্গা মিলনী পাঠাগার (সারেঙ্গা) : নিমাই হালদার।

(৯২) সিহড় সুকান্ত পাঠাগার (সিহড়) : শম্ভুনাথ ভদ্র, সুনীলকুমার নন্দী।

(৯৩) হিড়বাঁধ কল্যাণ সমিতি (হিড়বাঁধ) : সুজয়কুমার পাইন।

(৯৪) হেতিয়া ভারতী পাঠাগার (হেতিয়া) : ধনঞ্জয় চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সিংহ।

সরকারি নির্দেশনামা ৩৫২ ই ডি এন (এই ই) তাং ৩০.৪.১৯৮১ এবং জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশনামা ৬৬০ এস ই বি তাং ১৯.৩.১৯৮২ অনুসারে নিম্নলিখিত ত্রিশটি গ্রন্থাগার অনুমোদন পায় (বর্ণানুক্রমিক তালিকা)।

(৯৫) অনির্বাণ লাইব্রেরি মঙ্গলপুর (মঙ্গলপুর) : অশোককুমার সাহানা, উৎপলকান্তি সরকার।

(৯৬) গিরিধারীপুর মজফ্‌ফর আহামদ গ্রামীণ পাঠাগার (পিয়ারডোবা) : নিখিলকুমার কর্মকার, আবদুল রহমান।

(৯৭) গোয়ালডাঙ্গা পল্লীসেবক সংঘ সুকান্ত স্মৃতি পাঠাগার (সুখাডালি) : মানিকরতন হাজরা, সজলকুমার দত্ত।

(৯৮) ছিলিমপুর নেতাজি পাঠাগার উলিয়াড়া : সমীরকুমার রায়, খেলনলাল দাস।

(৯৯) জয়পুর গ্রামীণ পাঠাগার (জয়পুর) : জগন্নাথ বটব্যাল, তাপসকুমার দত্ত।

(১০০) তিলাবনী উদয়ন ক্লাব পাঠাগার (বাউরিডিহা) : অশোককুমার মহান্তি, পশুপতি বাউরি।

(১০১) তেওয়ারিডাঙ্গা পল্লী পাঠাগার (মেঝিয়া) : সহদেব লাহা, আলোকনাথ ভুঁই।

১৮৭৩ সালে জয়পুর থানার কুচিয়াকোলের স্থানীয় শাসনকর্তা রাধাবল্লভ সিংহদেবের পৌত্র, বহুভাষাবিদ ও সঙ্গীত-বিশারদ যুবরাজ বসন্তকুমার একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে বসন্তকুমার লোকান্তরিত হলে ওই গ্রন্থাগারটিরই নামকরণ হয় 'বসন্ত লাইব্রেরি'। এটিকেই বাঁকুড়া জেলার প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার বলে প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন।

(১০২) ধবন বাণী পাঠাগার (ধবন) : ভানুপদ কোলে, স্বপনকুমার মণ্ডল।

(১০৩) ন্যাশনাল লাইব্রেরি (কাটানধার-বিষ্ণুপুর) : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অধীরকুমার খাঁ।

(১০৪) পাটিট কৃষক সংঘ লাইব্রেরি (পাটিট) : প্রদীপকুমার কারক, নীহারকুমার মণ্ডল।

(১০৫) পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার (পানুয়া) : তপনকুমার রায়, পঙ্কজকুমার মণ্ডল।

(১০৬) পৌরকর্তা লাইব্রেরি (বাঁকুড়া) : পার্থসারথি ঘোষ, দীপবন্ধু লোহার।

(১০৭) বরিচা দীনেশ স্মৃতি পাঠাগার (বরিচা) : গুনাকর পাল, ধনপতি গোস্বামী।

(১০৮) বিবড়দা জাগৃতি সংঘ পাঠাগার (বিবড়দা) : সুব্রত মুখোপাধ্যায়, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১০৯) বিহারজুড়িয়া উত্তরায়ণ সংঘ ও লাইব্রেরি (বিহারজুড়িয়া) : মানস কাপড়ি, অনাদিনাথ কর্মকার।

(১১০) বীরচন্দ্রপুর নবোদয় পাঠাগার (গোপীকান্তপুর) : মধুসূদন লাহা, দিলীপকুমার দাস।

(১১১) বীরসিংহা গ্রামীণ গ্রন্থাগার (বনবীরসিংহা) : নিতাইচন্দ্র দিবাপতি, মৃত্যুঞ্জয় লোহার।

(১১২) বেলিয়াতোড় সাধারণ পাঠাগার (বেলিয়াতোড়) : দীপককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ দে।

(১১৩) ভোলাহীরাপুর অমূল্যরতন পাঠাগার (হীরাপুর) : গৌতম মুখোপাধ্যায়, মদনচন্দ্র ঘোষ।

(১১৪) মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ পাঠাগার (মানকানালি) : আশিস পত্র, ধীরেন্দ্রনাথ কাপড়ি।

(১১৫) মুড়াগ্রাম নবারুণ সংঘ লাইব্রেরি : অশোকুমার পাত্র, মথুরানাথ মাহাতো।

(১১৬) রবীন্দ্র লাইব্রেরি (ঘোলগড়িয়া) : আনন্দময় চ্যাটার্জি, স্বপনকুমার দাস।

(১১৭) রাজগ্রাম মিলনী সংঘ লাইব্রেরি (রাজগ্রাম) : প্রশান্তকুমার দে, স্বপনকুমার কুণ্ডু।

(১১৮) রামপুর রাধানাথ পাঠাগার (হামিরহাটি) : শিখা মণ্ডল, ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ।

(১১৯) লক্ষ্মণপুর সুকান্ত পাঠাগার (লক্ষ্মণপুর) : দুর্গাদাস লায়েক, অবনী রুইদাস।

(১২০) শহিদ পাঠাগার (বারিকুল) : ধর্মদাস সরেন।

(১২১) শ্যামসুন্দর জ্যোতির্ময় বোস মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (শ্যামসুন্দরপুর) . অজিতকুমার লাহা।

(১২২) সানাবাঁধ পাবলিক লাইব্রেরি (সানাবাঁধ) : শঙ্করলাল চন্দ, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়।

(১২৩) সুকান্ত পাঠাগার, জীবনপুর (হাতিরামপুর) : অশোক মিত্র, মনোরঞ্জন মণ্ডল।

(১২৪) হরেকৃষ্ণ কোনার স্মৃতি পাঠাগার, বেলুট নাথেরডাঙ্গা : নবীনচন্দ্র নাথ, দানেশচন্দ্র নাথ।

সরকারি নির্দেশনামা জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের স্মারক নং ৯৮ এই ই বি তাং ১৬.৩.১৯৮৩ অনুসারে খাতড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হবার পর উক্ত বরাদ্দে ১২৫ পুনিশোল আজমিরা গ্রামীণ গ্রন্থাগার (পোঃ পুনিশোল) অনুমোদন পায়।

সরকারি নির্দেশ ২০০ ই ডি এন (এস ই) তাং ১১.৩.১৯৮৬ জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশনামা ১৬৪(৫) এস ই বি তাং ১২.৫.১৯৮৭ অনুসারে নিম্নোক্ত পাঁচটি গ্রন্থাগারকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

(১২৬) খড়বনা আদিবাসী গ্রামীণ গ্রন্থাগার : সমীরকুমার গোস্বামী।

(১২৭) চাকা গ্রামীণ গ্রন্থাগার (চাকা) নিখিলকুমার মহান্তি।

(১২৮) ধাড়া সারদাদেবী পাঠাগার (ধাড়া) : দুর্গাদাস ব্যানার্জি, সমীর কয়রা।

(১২৯) বামিরা বিবেকানন্দ পাঠাগার (বামিরা) . লবকুমার চক্রবর্তী।

(১৩০) হেলনা শুশুনিয়া অমৃতাক্ষ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (হেলনা শুশুনিয়া) : উত্তমকুমার সিংহমহাপাত্র, প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

সহায়ক গ্রন্থ :
(১) বিষয় সাধারণের গ্রন্থাগার। সম্পা নির্মলচন্দ্র চৌধুরী ও আনন্দ ভট্টাচার্য।
(২) W.B District Gazetteers, Bankura, Amiya Kumar Bandyopadhyay।
(৩) District Gazetteer, O' Mally ।
(৪) বাঁকুড়া জনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী।
(৫) গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও বাঁকুড়া। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী।
(৬) বাঁকুড়া জেলা ষোড়শ বইমেলা : স্মরণিকা।

সহায়ক প্রতিষ্ঠান :
বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার।
সহায়ক ব্যক্তি :
নরহরি মণ্ডল, রাজীব হাজরা, রূপা সিংহঠাকুর ও অরিন্দম ঘোষ, নমিতা সরকার, উৎসব ঘোষ।

লেখক : জেলা গ্রন্থাগারিক, বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার
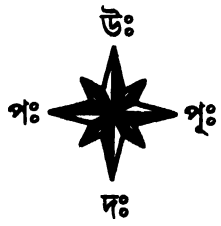
উঃ
পঃ
পূঃ
দঃ
বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার
জেলা গ্রন্থাগার : ১
শহর গ্রন্থাগার : ৭
গ্রামীণ গ্রন্থাগার : ১২২
ব্লক চৌহদ্দি—১৩০
এন আর ডি এম এস কর্তৃক প্রস্তুত
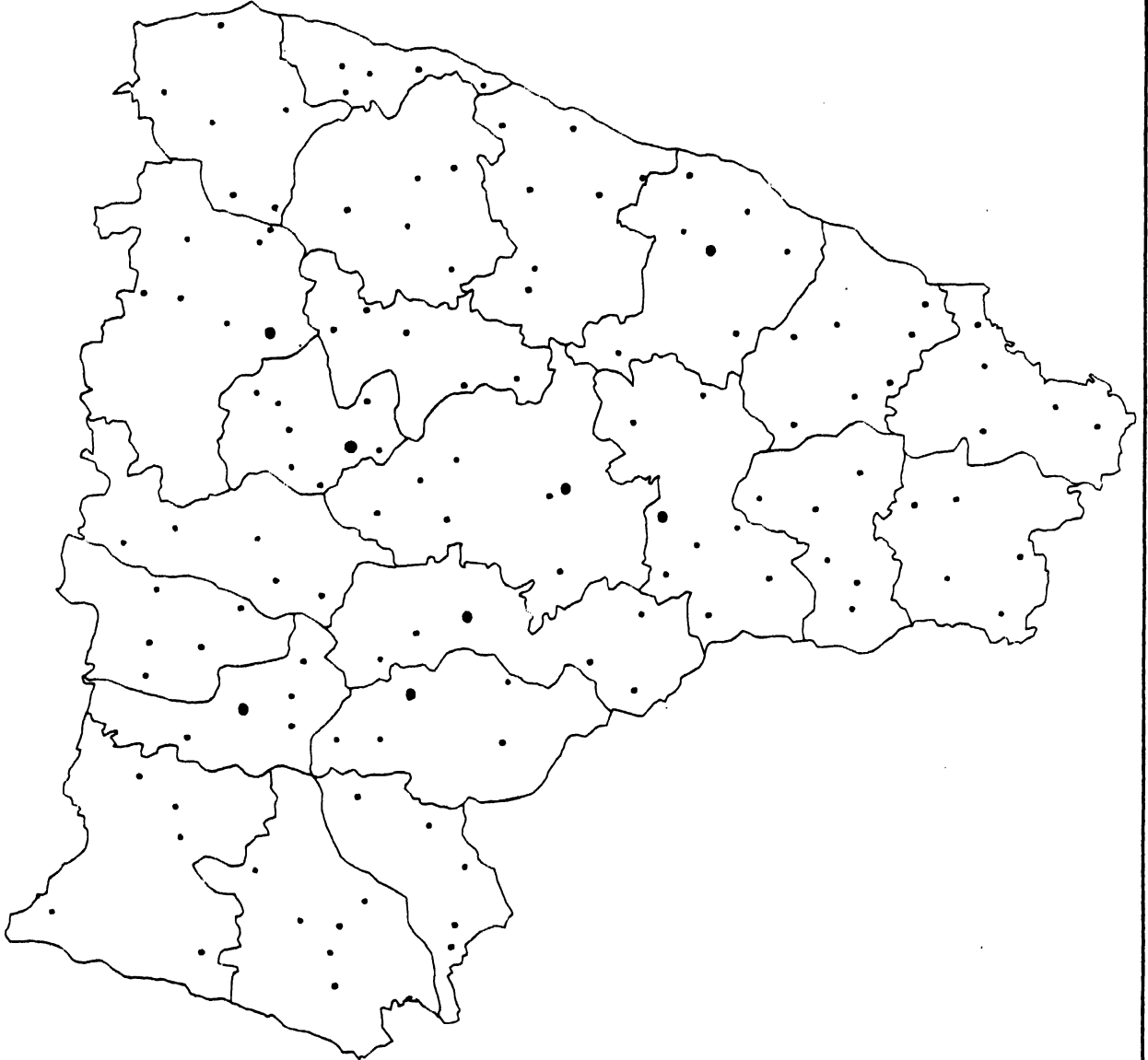
চলো যাই ডাকে ওই মনোমোহিনী বাঁকুড়া

উপেন কিসকু

বিষ্ণুপুরে এসে আপনাকে মোহিত করবে এলাকার মল্লরাজাদের বিখ্যাত কীর্তিগুলি। প্রধান আকর্ষণ টেরাকোটার মন্দির, দলমাদল কামান, জোড় বাংলা মদনমোহন মন্দির, ছিন্নমস্তার মন্দির, রাসমঞ্চ। পোকাবাঁধ, লালবাঁধ, যমুনাবাঁধ শোনাবে আপনাকে ভোগবিলাসী লালবাঈ-এর প্রেমে পাগল রাজার কাহিনী। কান থাকলে শুনতে পাবেন রানীর অন্দরমহলের কান্না। কিংবা সংগীতবোদ্ধা হলে ডুবে যেতে পারেন বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ঘরানার সমুদ্রে।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু............

কবি ঠিক কোন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মন উদাস করা উপরোক্ত লাইন কটি লিখেছেন এটা জানা না থাকলেও বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে কথা কটি যে খুবই প্রাসঙ্গিক এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর মধ্য দিয়ে কবি যেন ভ্রমণ প্রিয় বাঙালি, যাঁরা অনুসন্ধানী মন নিয়ে বা মানসিক শান্তি, পরিবর্তন বা অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়ান এবং অনেক কিছু দেখেছেন বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁদের আত্মতৃপ্তির মাঝে আলপিনের খোঁচা মেরেছেন। কবির ওই আত্মবিলাপে বাঙালি বিবেকে যদি সামান্যতম নাড়া দিতে পারে তা হলেই সকলের উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

আমি এমন একটি জেলার কথা বলব যার অবস্থান ধানবাদ-দুর্গাপুর-বর্ধমান জামশেদপুর-ঝাড়গ্রাম-খড়্গপুর বা পুরুলিয়া থেকে খুব সহজে যাওয়া যায়। এ জেলার চারিদিকে খুব নিকটেই আছে পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নেওয়া বোলপুর-শান্তিনিকেতন অদূরে পুরুলিয়া জেলার ছৌ-খ্যাত বাগমুণ্ডী-অযোধ্যা পাহাড়। কিছুটা এগিয়ে গেলেই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি ও ঘাটশিলা। মুকুটমণিপুরের অদূরে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কাঁকড়াঝোড়। আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র দিয়ে ঘেরা অবগুণ্ঠিত বাঁকুড়া, আজকে মেলে ধরতে চায় নিজেকে আপনজনকে শোনাতে চায় নিজ মর্ম ব্যথা। বাঁকুড়ার বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে কন্দরে, নদীর তীরে লুকানো আছে কত কথা, কত ব্যথা, কত বীরত্ব গাথা। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে বাঁকুড়ার অবদান জানতে শুধু বই পড়ে হবে না। চলে আসুন। চর্মচক্ষে অবলোকন করুন। আমি হলফ করে বলতে পারি লাল কাঁকুড়ে মনোহারিণী বাঁকুড়ার প্রেমডোরে আপনি বাঁধা পড়বেনই। বৎসরান্তে ছুটে আপনাকে আসতে হবেই।

আপনি তাচ্ছিল্যভরে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, মশাই আপনি যে এতো বকর বকর করছেন কি আছে ওখানে ? বাঁকুড়া সম্পর্কে কাগজের কোনও লেখা পড়ে থাকলে বা উন্নাসিক কোনও পর্যটক বন্ধুর কথা শোনা থাকলে আমাকে শুনিয়ে দেবেন—গরিব বাঁকুড়া, রুক্ষমাটি, খানাখন্দে ভরা রাস্তাঘাট, থাকার কোনও ভালো জায়গা নেই, এমনকি খাবার ভালো হোটেল পর্যন্ত নেই। আমি বলতে চাই ধীরে বন্ধু ধীরে, রজনী এখনও বাকি। আমি আপনাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি—কি নেই বাঁকুড়ায় ? জানতে হলে চলে আসুন। সপ্তাহান্তে ২ দিন বা ছুটিতে ৩ থেকে ৫ দিন। ভালোই লাগবে।

মুকুটবিহীন মুকুটমণিপুরে—২ দিন

আপনি যদি প্রকৃতি প্রেমিক হন তাহলে চলে আসুন মুকুটমণিপুর। এখানেই দেখতে পাবেন এশিয়ার বৃহত্তম বা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ। সবুজ পাহাড় ঘেরা কাঁসাই কুমারীর নীল জলরাশি, সোনাঝুরির জঙ্গল, সূর্যোদয়ের পূর্বে পাখির কূজন আপনার চিত্তকে উদাসী করে তুলবেই তুলবে। ক্লান্তিময় এক ঘেঁয়েমির জীবন থেকে মুক্তি পেতে ৫-৭ দিন যখন পেরিয়ে যাবে বুঝতেই পারবেন না।
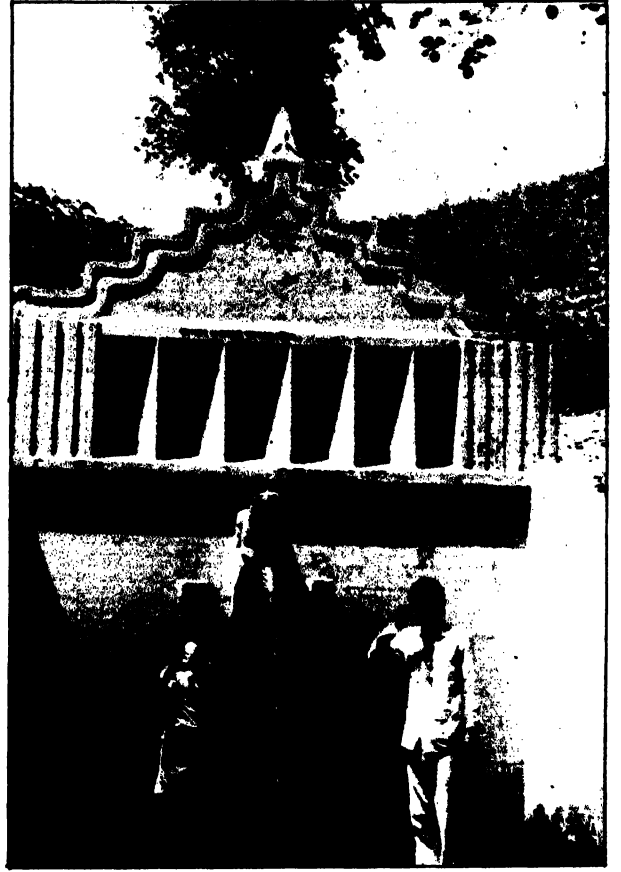
শুশুনিয়া পাহাড়ের এই জলধারা বারো মাস পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

সারস-মাছরাঙা পানকৌড়ি প্রভৃতি দেশি পাখির পাশাপাশি লক্ষাধিক পরিযায়ী পাখির সমাবেশ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পর্যটনের মরসুম শুধু নয় মুকুটমণিপুরের প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আপনাকে আসতে হবে ভরা বর্ষায়। মেঘের গর্জন থেকে থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি আর নীল ও ধূসর রঙের জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মনে হবে কোনও সমুদ্রতীরের জলোচ্ছাসের শব্দ শুনছি। থেকে থেকে ঘুঘু কিংবা নাম না জানা পাখির ডাক আপনাকে অচিন দেশে নিয়ে যাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধের পাড়ে বসতে পারেন। কিংবা একা, কোনও অজানা আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হলে সস্তায় যুব আবাসের বারান্দা কিংবা সেচ বিভাগের পরিদর্শন বাংলা বা বন নিগমের সোনাঝুরির ব্যালকনিতে বসেও এ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। পকেটে রেস্ত থাকলে ঠাণ্ডাঘরযুক্ত ট্যুরিজম বাংলো, আম্রপালি বা পিয়ারলেস হোটেলেও আশ্রয় নিতে পারেন। বর্ষার জ্যোৎস্নালোকের মুকুটমণিপুর আকাশ পরিষ্কার থাকলে ইন্দ্রের নন্দন কাননকেও হার মানতে হবে। মুকুটমণিপুরেই দেখতে পাবেন ১ জানুয়ারির পর্যটন উৎসব ও মেলা। ১৪ জানুয়ারি বাউল মেলা। এছাড়া পর্যটন মরসুমে সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনগুলোতে উপভোগ করতে পারেন আদিবাসীসহ বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের নৃত্য। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র এর উদ্যোক্তা। ২-১ বছরের মধ্যে লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণাগার আপনার মনের তৃষ্ণা মেটাবে। পরখ করে দেখতে পারেন। বাড়তি পাওনা লক্ষে

বর্ষার জ্যোৎস্নালোকের মুকুটমণিপুর আকাশ পরিষ্কার থাকলে ইন্দ্রের নন্দন কাননকেও হার মানতে হবে। মুকুটমণিপুরেই দেখতে পাবেন ১ জানুয়ারির পর্যটন উৎসব ও মেলা। ১৪ জানুয়ারি বাউল মেলা। এছাড়া পর্যটন মরসুমে সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনগুলোতে উপভোগ করতে পারেন আদিবাসীসহ বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের নৃত্য। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র এর উদ্যোক্তা।

চড়ে অভিযাত্রী সেজে বনগোপালপুরের হরিণ উদ্যান। ২-১ ঘণ্টা অল্প সময় বলেই মনে হবে।

অনুসন্ধিৎসা থাকলে যেতে পারেন খাতড়ার নিকটে মশক পাহাড়ের গুহা। অত্যাচারী রাজাদের হাত থেকে বনবাসীদের আত্মগোপনের ডেরা। পরবর্তীতে যা ডাকাত গুহা নামে পরিচিত। এগিয়ে গেলে বিশাল পাথরের একটি চাঁই সিঁদুরপেটির সোনামণি পাথর আপনার বিস্ময় বাড়াবে। মানসিক প্রশান্তির জন্য অল্প সময় কাটিয়ে আসতে পারেন গোপালপুরের কংসাবতী তীরবর্তী মনোরম পরিবেশে অবস্থিত কেল্যাতি আশ্রমে।

ইতিহাসের ছাত্র হলে ২ কিমি দূরে জৈন সংস্কৃতির কেন্দ্র অম্বিকানগর রাজবাড়ি বা অম্বিকা দেবীর মূর্তি আপনি দেখে নিতে পারেন। কাঁসাই কুমারীর সঙ্গমস্থলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ। এখানেই শুনতে পাবেন স্বাধীনচেতা জমিদার পরিবারভুক্ত বিপ্লবী রাইচরণ ধবলদেবের ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের কাহিনী। বিপ্লবীদের আনাগোনা। ব্রিটিশ বাহিনীর কম্যান্ডারের নাজেহাল অবস্থা। বিপ্লবী রাইচরণকে গ্রেপ্তার করতে আসা সৈন্যদল নদীতীরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয় তুচ্ছ করে ভরা কংসাবতীর তুফান বন্যা সাঁতরে পেরিয়ে বিপ্লবী রাইচরণকে খবর দেওয়া পানু রজকের কাহিনী। নদীর তীরে জৈন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজও ছড়িয়ে আছে। আপনি যদি নৃতত্ত্বের ছাত্র হন তাহলে নিশ্চিতভাবেই অর্ধ কিমি দূরে ১২১ বছরের প্রয়াত জেলভাঙা আদিম আদিবাসী বিরল জনগোষ্ঠীভুক্ত জনদরদী মোহন শবরের সম্পর্কে জানতে আপনার মন উসখুস করবেই। পাহাড়ের কোল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার অজানা শিল্পীর বাঁশি কিংবা ঝুমুরের সুর অথবা জ্যোৎস্না রাতে সাঁওতালপল্লীর মাদলের ধিতাং বোল, নস্টালজিয়ায় আবিষ্ট না হয়ে থাকতে পারবেন না। হাতে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন প্রকৃতির অকৃপণ সাজে সজ্জিত ঝিলিমিলি। ডে-সেন্টার ছাড়াও নির্মীয়মাণ রিমিল গেস্ট হাউসে থাকতে পারবেন। ফিরে এলে থাকতে পারবেন। রানীবাঁধ বন বাংলা বা জেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে। ইচ্ছা করলে ঘুরে আসতে পারেন ১৫ কিমি দূরের বিপ্লবী ক্ষুদিরামের স্মৃতি বিজড়িত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের গোপন কেন্দ্রস্থল ছেঁদা পাথর গ্রামে। ওখানে বিপ্লবীরা গভীর জঙ্গলের কোন কুয়োতে বোমা পরীক্ষা করে ও আদিবাসী কোন যুবক তাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গী ছিল অনুসন্ধিৎসু ইতিহাসের গবেষকদের অনুসন্ধিৎসাই বাড়াবে। যে গাছতলায় দুপুর বেলায় ক্ষুদিরামের সঙ্গী সাথীরা বিশ্রাম নিত সে গাছ আজও বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরামের কথা শোনাবে। বন বিভাগের ছোট বাংলা ছাড়াও ছুটির দিনে ছেঁদা পাথরের শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়েও ঠাঁই পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে হালকা বিছানা নিয়ে যেতে হবে। কলকাতা থেকে সরাসরি সি এস টি সি বাসে যাওয়া যায়। ২ কিমি দূরের বীরকাঁড় বাঁধ পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট হিসেবে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিংবা কাছেই জাঁতাডুমুর ড্যাম। ছেঁদা পাথর নিকটবর্তী বড়গ্রামে ব্রিটিশ আমলে তামা উত্তোলন হত। মূল্যবান চিংস্টোন খনিগুলোও এখানেই অবস্থিত।

ছেঁদা পাথর থেকে মুকুটমণিপুর বা রাইপুর ট্রেকিং রুট হিসাবে খুবই আকর্ষণীয় হবে। সেক্ষেত্রে বৈরী পাল ড্যামের তীরে কদমাগড় কলাবনীতে ডে-সেন্টারের রুটের জনপ্রিয়তা বাড়াবে। ঝিলিমিলি থেকে ট্রেকিং করতে চাইলে তালেবেড়া হয়ে 'সুতান'-এর ড্যাম গহন অরণ্য বন্ধুর পাহাড়ি পথ আপনাকে মিরিকের কথাই মনে করিয়ে দেবে। এখানে সুতান কটেজে আপনি থাকতে পারেন। নৌকো বিহার করতে পারেন। কিংবা ওয়াচ টাওয়ারে উঠে প্রকৃতির শোভা দর্শন করতে পারেন। মনে হবে কম্বোডিয়ার প্রকৃতির শোভা ঢেউ খেলানো পাহাড় ও সবুজ অরণ্যানী আমাজনের গল্প পড়া গভীর অরণ্যের কথাই আপনাকে মনে করিয়ে দেবে। দেখা পেয়ে যাবেন বন্য হরিণ, শুয়োর বা তিতির ও বন মোরগ। দেখা মিলে যেতে পারে বন্য হাতিরও কেননা এটা এখন হাতির স্থায়ী আবাসস্থল। সরল সাঁওতাল আদিবাসী সুঠাম দেহের অধিকারী পাচকদের হাতের তৈরি চা বা রান্না খাবার আপনার মনে থাকবে। সদা হাস্যময় সাঁওতাল যুবকদের প্রকৃত বাংলায় অশুদ্ধ উচ্চারণ আপনার স্মৃতিতে চির জাগরুক হয়ে থাকবে। চৈত্রের দাবদাহে পথশ্রম ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য শাল, মহুয়া ফুলের মনমাতানো গন্ধ, লাল পলাশ ও শিমুলের সৌন্দর্য কখনও আপনাকে রানীবাঁধ বা মুকুটমণিপুর পৌঁছে দিয়েছে বুঝতেই পারবেন না। বাড়তি
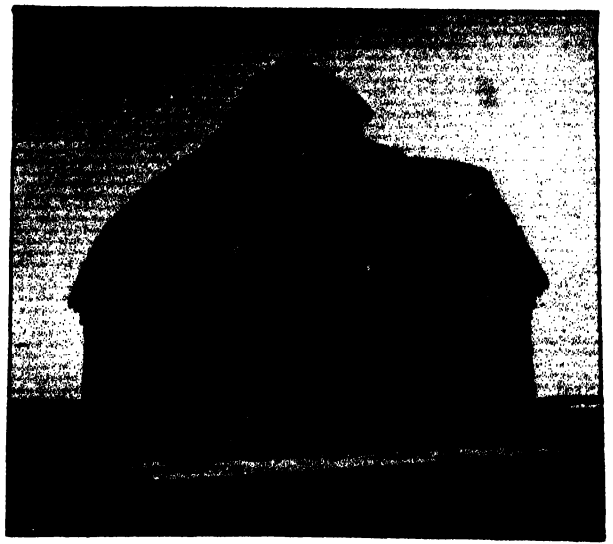
বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা, মন্দির স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।
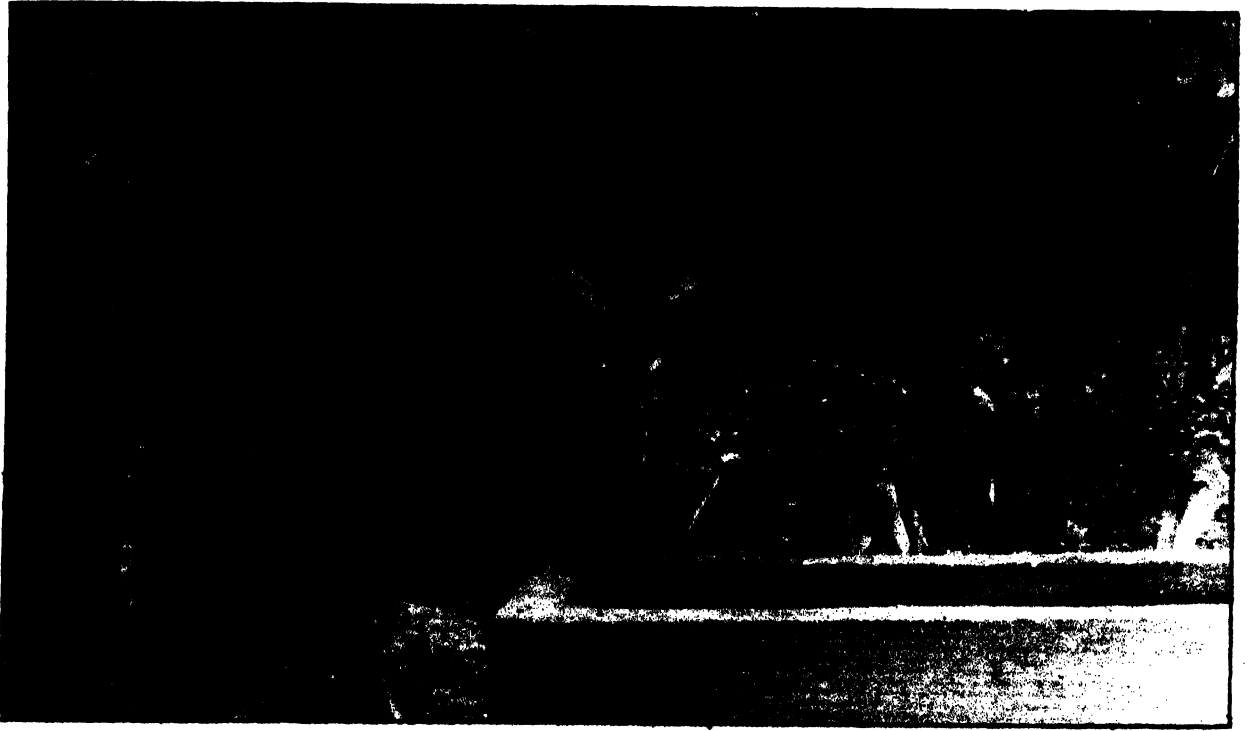
ইকো পার্ক, তালডাংরা ব্লক। হরিণের স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র।

একদিন সময় থাকলে চলে আসতে পারেন মটগোদা গ্রামে। এখানে আছে ধর্মরাজের মন্দির। মাঘ মাসের শেষ শনিবারে শুরু হয়ে ৭ দিনের শনিমেলার শরিক হতে পারেন। ৫ কিমি দূরে রাইপুরের চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক দুর্জন সিং-এর মর্মর মূর্তি দর্শন করতে পারেন। শিখর রাজার ধ্বংসাবশেষ চর্মচক্ষে না দেখা গেলেও শিখর সায়েরের পাড়ে বসে কিছুক্ষণ ডুব দিতে পারেন অতীত ইতিহাসের অতলে। কিংবা ফেরার পথে যেতে পারেন চাতরি কালাপাথর লালবাঁধ ও সন্নিকটে অবস্থিত বিশালাকার একটি কালো পাথরের 'কালো পাহাড়'-এ। ইন্দ্রঝোর মধুপুর বড়দি-কালা পাথর-শিড়লিগড়। প্রস্তাবিত পর্যটন কেন্দ্র রাইপুর-সারেঙ্গা ব্লকের মাঝখানে কংসাবতী নদীর অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ বনানী, সারা বছর ছোট ছোট পাহাড়ি টিলা থেকে কুলু কুলু ঝরনা, প্রাকৃতিক ঢেউ খেলানো পরিবেশ, মহুয়া ফুলের মাতাল করা গন্ধ, লাল পলাশের মোহময়ী রূপ আপনাকে আকর্ষণ করবেই। মধ্যখানে ২.৫ কিমি বিস্তৃত বিশাল নদীর নীল গভীর জলরাশি সারা বছরব্যাপী পর্যটকদের নৌকো বিহারের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। তাছাড়া নতুন গজানো শালপাতা ও লাল পলাশ শোভিত খাড়া কালো পাথরের ১০০-২০০ ফুট নিচে চৈত্রের বৈকালিক নৌকো বিহার আপনাকে মোহিত করবেই। প্রকৃতি প্রসন্ন থাকলে দেখা পেয়ে যেতে পারেন বিরল প্রজাতির প্রাণী পেঙ্গোলিনের। রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে এখনও স্থান না পেলেও ধীরে ধীরে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ২/১টি গেস্ট হাউস গড়ে উঠলে সপ্তাহান্তের ছুটি উপভোগ সার্থক হবে। বর্তমানে পিকনিক স্পট হিসেবে এটা ক্রমাগত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বৈশাখ মাসের নির্দিষ্ট দিনে সাঁওতালদের শিকার উৎসব এখানেই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে—২ দিন

মুকুটমণিপুর থেকে সরাসরি বিষ্ণুপুর আসার পথে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতে পারেন শালপলাশের জঙ্গলঘেঁষা চেঁচুড়িয়া ইকো পার্কে। ইচ্ছা করলে নৌকো বিহার করতে পারেন। কবি বা সাহিত্যিক হলে একদিন কাটিয়েও যেতে পারেন।

বিষ্ণুপুর যাওয়ার পথেই ২০ কিমি ঘুরপথের কষ্ট স্বীকার করতে চাইলে চর্মচক্ষে দেখতে পারেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারত সরকারের লোগোখ্যাত পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির শিল্পীদের নিপুণ হাতের কারিকুরি। মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর আপনাকে উজ্জীবিত করে বর্গী হামলার বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম গাথাগুলি। বিষ্ণুপুরে এসে আপনাকে মোহিত করবে এলাকার মল্লরাজাদের বিখ্যাত কীর্তিগুলি। প্রধান আকর্ষণ টেরাকোটার মন্দির, দলমাদল কামান, জোড় বাংলো মদনমোহন মন্দির, ছিন্নমস্তার মন্দির, রাসমঞ্চ। পোকা বাঁধ, লাল বাঁধ, যমুনা বাঁধ শোনাবে আপনাকে ভোগবিলাসী লাল-বাই-এর প্রেমে পাগল রাজার কাহিনী। কান থাকলে শুনতে পাবেন রানীর অন্দর মহলের কান্না। কিংবা সঙ্গীত বোদ্ধা হলে ডুবে যেতে পারেন বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ঘরানার সমুদ্রে। যদুভট্ট থেকে শুরু করে গোপেশ্বর ব্যানার্জি পর্যন্ত বহু বিখ্যাত সঙ্গীত প্রতিভা উপহার দিয়েছে এই বিষ্ণুপুর। ক'জনই বা রাখে সে খবর। বিখ্যাত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এখানেই অবস্থিত। অজস্র হোটেল ও টুরিস্ট লজ ২/৩ দিন কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিষ্ণুপুর মেলা আজকে জাতীয় মেলায় স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। এখানেই পাবেন বিষ্ণুপুর ঘরানা থেকে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির অপূর্ব

মিলন। সুযোগ হলে কলকাতা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন নামী দামি শিল্পীরাও অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এতদিন পর্যন্ত জেলার স্থান সঙ্কুলান সহ থাকার বিভিন্ন অসুবিধা থাকলেও রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদ মিলিতভাবে বিষ্ণুপুর মেলা ও শহরকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে।

এখান থেকে ফিরে আসতে পারেন জয়পুরের ময়ূরের ধ্বনি শুনতে। কিংবা হরিণের ছোটাছুটি দেখে। বন বাংলোতে থেকেও যেতে পারেন। নিকটেই আছে পঞ্চায়েতের তৈরি বাহারি গোলাপবাগান কিংবা সমুদ্রবাঁধ। প্রাক্তন মহারাজ প্রদুৎম্নের আবাস জয়পুর সংলগ্ন প্রদুৎম্নপুরে ঐতিহাসিক স্থান গড় প্রদুৎম্নপুর বর্তমানে পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে। কলকাতায় গাড়িতে ফিরতে চাইলে পথে পড়বে সারদা দেবীর জন্মস্থান বাঁকুড়ার শেষ প্রান্তের জয়রামবাটি। ফেরার পথে রামকৃষ্ণদেবের কামারপুকুর মঠ।

বাঁকুড়াতে—১ দিন

বাঁকুড়া পর্যটনের আর একটি প্রধান কেন্দ্র বাঁকুড়া শহর। এখানে যুব আবাসে পর্যাপ্ত আসন অথবা সরকারি নানান আবাস পেয়েও যেতে পারেন। তাছাড়া আছে সপ্তর্ষিসহ আরও বেশ কিছু হোটেল ও লজ। সপ্তর্ষির মালিক দত্তবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে এলে আপনার সুবিধেই হবে। বাঁকুড়াতে নিজস্ব ট্যাক্সি সার্ভিসের মাধ্যমে ওরাই আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবে। আলাদা গাইড নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। কলকাতা থেকে কিছু সংস্থা হোটেল সপ্তর্ষির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পর্যটকদের পাঠিয়ে থাকেন। এখানেই দেখতে পাবেন বিখ্যাত ভাস্কর শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ-এর বসতবাটি। এখানে থেকেই ঘুরে আসতে পারেন শুশুনিয়া, বিহারীনাথ বা কোড়ো পাহাড়। পথে পড়বে ছাতনায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। ১০ কিমি এগোলেই দেখতে পাবেন শুশুনিয়া পাহাড়। চন্দ্রবর্মার শিলালিপি এখনও জ্বলজ্বল করছে। পাহাড়ে চড়তেও পারেন। শুশুনিয়া ধারার জলধারা আপনার তৃষ্ণার্ত হৃদয় শীতল করবে। বহু পর্যটক টিনভর্তি করে শুশুনিয়া ধারার জল বাড়ি নিয়ে যান। লোক বিশ্বাস—এই জল ক্ষুধা বর্ধক ও পেটের রোগ নিরাময় করে। চৈত্রের ধারা উৎসব বিশাল মেলার রূপ নেয়। শালী নদীর গাংদুয়া জলাধার আপনার কয়েক ঘণ্টা ভালোই লাগবে। সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন শালতোড়া সাঁতুড়ি থানার সীমান্তে পাহাড় কোলে সুশোভিত ছোট জলাধার ও বিনোদপুরের মৃগ উদ্যান। কিংবা গণউদ্যোগে সদ্য গড়ে ওঠা লিয়াদা সেচ প্রকল্পকে ঘিরে পার্ক। প্রাচীন শহর সোনামুখীও একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। ছোট রেল তুলে দিলেও বাস যোগাযোগ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই আছে। রেশম শিল্পে বিখ্যাত কেন্দ্র সোনামুখী কার্তিক পূজা ও বিখ্যাত বাউল শিল্পীদের বাউলের আখড়া আপনার বাড়তি পাওনা। এখানেই মিলিত হতে পারেন খয়েরবনি গ্রামের বিখ্যাত বাউল শিল্পী সনাতন দাসের সঙ্গে। আসা-যাওয়ার পথে ছান্দারের অভিব্যক্তির উৎপল চক্রবর্তীর সদা হাস্যময় অভ্যর্থনা আপনার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাঁকুড়ায় সৃজনশীল শিল্পকর্মের নতুন রূপ আপনাকে মুগ্ধ করবেই। নইলে ঘরের শোভা বৃদ্ধির জন্য ২-১ পিস সংগ্রহ করতেও পারেন। বেলিয়াতোড়-এ পরিদর্শন করতে পারেন বিখ্যাত চিত্রকর যামিনী রায়ের বসতবাটি ও সংগ্রহশালা।

এ রকম বহু দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় স্থান ছড়িয়ে আছে বাঁকুড়ার বিভিন্ন আনাচে কানাচে। এ যাবৎ শিল্পের বিকাশে যথাযথ গুরুত্ব পেলে
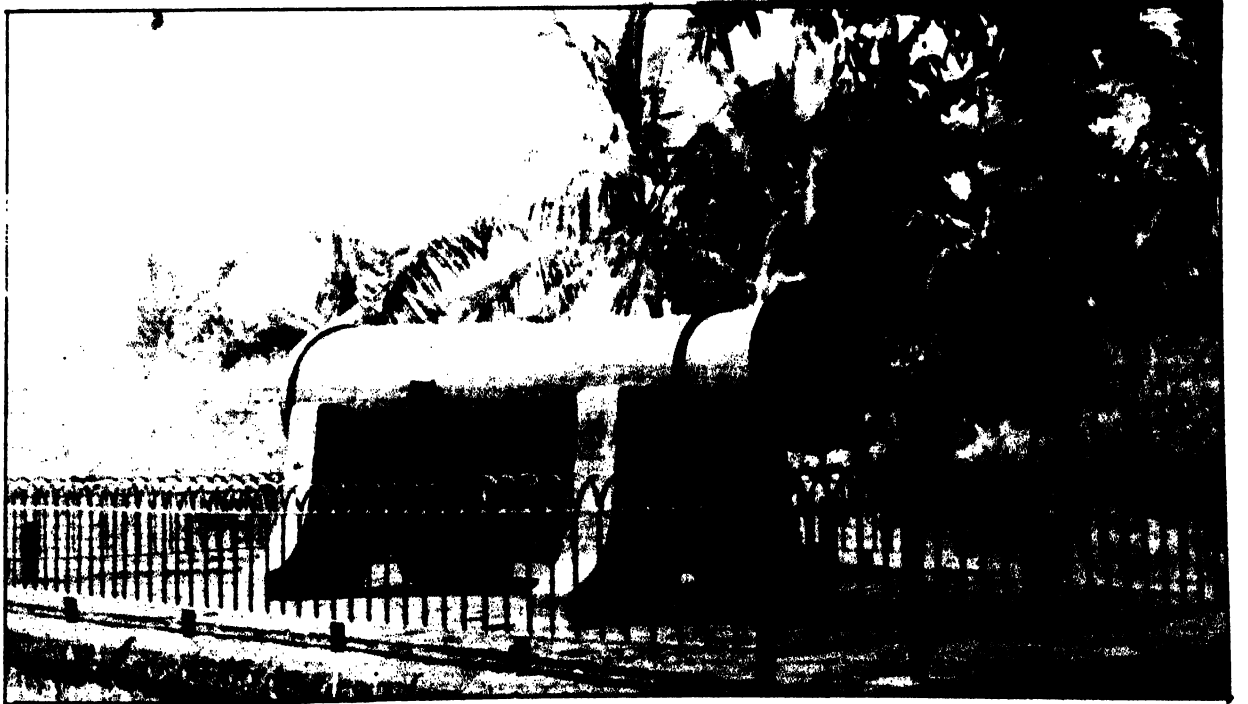
বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দলমাদল কামান

গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের কোড়ো পাহাড়।

বাঁকুড়া জেলা হতে পারত ভারতবর্ষের পর্যটকদের তীর্থক্ষেত্র। মন্দির থেকে টেরাকোটা, পাহাড় থেকে জলাধার, স্রোতস্বিনী নদী থেকে গহন অরণ্য কোলেরিয়ান জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলিম সংস্কৃতি মিলন ক্ষেত্র এই বাঁকুড়া। সাম্প্রদায়িক ভেদ কিছু কিছু থাকলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখানে সংঘটিত হয়নি। আদিম আদিবাসী শবর থেকে শুরু করে সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহালী, কোড়া, ভূমিজ প্রভৃতি জনজাতির সাংস্কৃতিক উপহার নিয়ে আজও সমুজ্জ্বল এই জেলা। চুয়াড় বিদ্রোহের বীরত্ব গাথা থেকে শুরু করে লায়েক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, গঙ্গানারায়ণ বিদ্রোহ এবং বর্গী হাঙ্গামা প্রতিহত করার বীরত্ব গাথা আজও এখানের মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে উন্মাদনা সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বন বাংলো ও জেলা পরিষদ বিশ্রামাগার সমস্ত জায়গাতেই রয়েছে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে থাকার ব্যবস্থাসহ হোটেল, লজ ও রেস্টুরেন্ট। যোগাযোগের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেষ্ট এক্সপ্রেস বাস ছাড়াও জেলার যে কোনও প্রান্ত থেকে যে কোনও জায়গায় যাওয়ার জন্য আছে ট্রেকার ও ট্যাক্সি সার্ভিস। স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থান ছাড়াও পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে যা যথেষ্টই। আগামী দিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সি সার্ভিস চালু হতে যাচ্ছে। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়াতে সরাসরি আসা যায় সাউথ ইস্টার্ন রেল গাড়িতে চড়ে। বাঁকুড়ার যে কোনও প্রান্তে আসার জন্য ইস্টার্ন রেলের দুর্গাপুর স্টেশন এখান থেকে ৪২ কিমি বাঁকুড়া শহর। কিংবা সাউথ ইস্টার্ন রেলের রোড চন্দ্রকোনা ও ঝাড়গ্রাম থেকে মুকুটমণিপুর ৮৫ কিমি। খড়গপুর থেকে ১০০ কিমি মুকুটমণিপুর। সরকারি, বেসরকারি এক্সপ্রেস বাসে কলকাতা, শিলিগুড়ি ছাড়াও যে কোনও শহর থেকে সরাসরি বাঁকুড়ার যে কোনও প্রান্তে আপনি পৌঁছে যেতে পারেন। রাস্তাঘাট এখন অনেক উন্নত। পর্যটন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিজাত ফসল, সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের বাজার তৈরি হবে। বাজার খুঁজে পাবে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কুটির শিল্প। পাবেন স্থানীয় দরিদ্র শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ার তৈরি বেলমালা, বাঁশের শিল্প। আদিবাসী শিল্পীদের হাতে তৈরি বাঁশ, বেত, কাঠের কারুকার্য খচিত বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য আপনার গৃহ শোভা বৃদ্ধিসহ গৌরব বৃদ্ধি করবে। ইচ্ছা করলে শহর শিল্পীদের তৈরি দুধিলতা বা বেত বাঁশের শিল্পও পাবেন। মুকুটমণিপুর কেঞ্জাকুড়ার বাঁশের শিল্প বা শুশুনিয়ার পাথরের তৈরি শৌখিন দ্রব্যসম্ভার যে কোনও কেন্দ্রেই পাওয়া যায়। শিং-এর তৈরি শিল্পও মুকুটমণিপুরেই পাবেন। ভগড়া কল্যাণ সায়ের ও মটগোদার আদিবাসী শিল্পীদের পাথরের প্রদীপ থেকে থালা বাটি, শিলনোড়া তাও সংগ্রহ করতে পারেন। রাজগ্রাম কেঞ্জাকুড়ার গামছা, চাদর নিয়ে যেতে আপনার মন চাইবেই। পকেটের জোর থাকলে স্ত্রী বা কন্যার মানভঞ্জনের জন্য আছে বিষ্ণুপুরের জগৎ বিখ্যাত বালুচরী শাড়ি।

নিজস্ব আত্মতৃপ্তি ও মনোরঞ্জন অথবা অবসর বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া জেলা অসংখ্য নামী অনামী শিল্পী ও কুটির শিল্পীদের মুখে হাসি ফোটাবে। নিশ্চয় আপনিও তাই চান। তাই দেরি না করে চলে আসুন বাঁকুড়ায়।

লেখক : মন্ত্রী, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
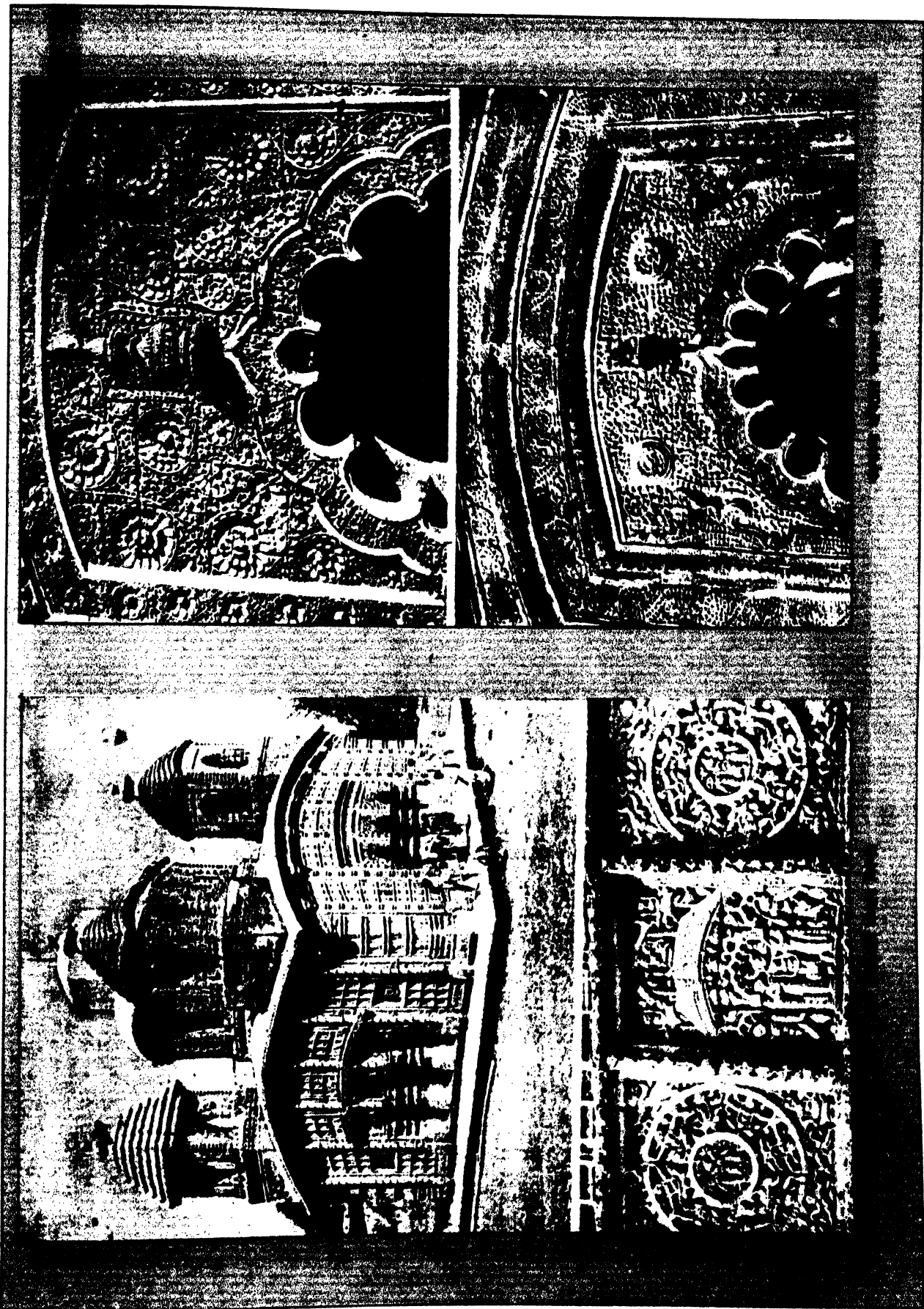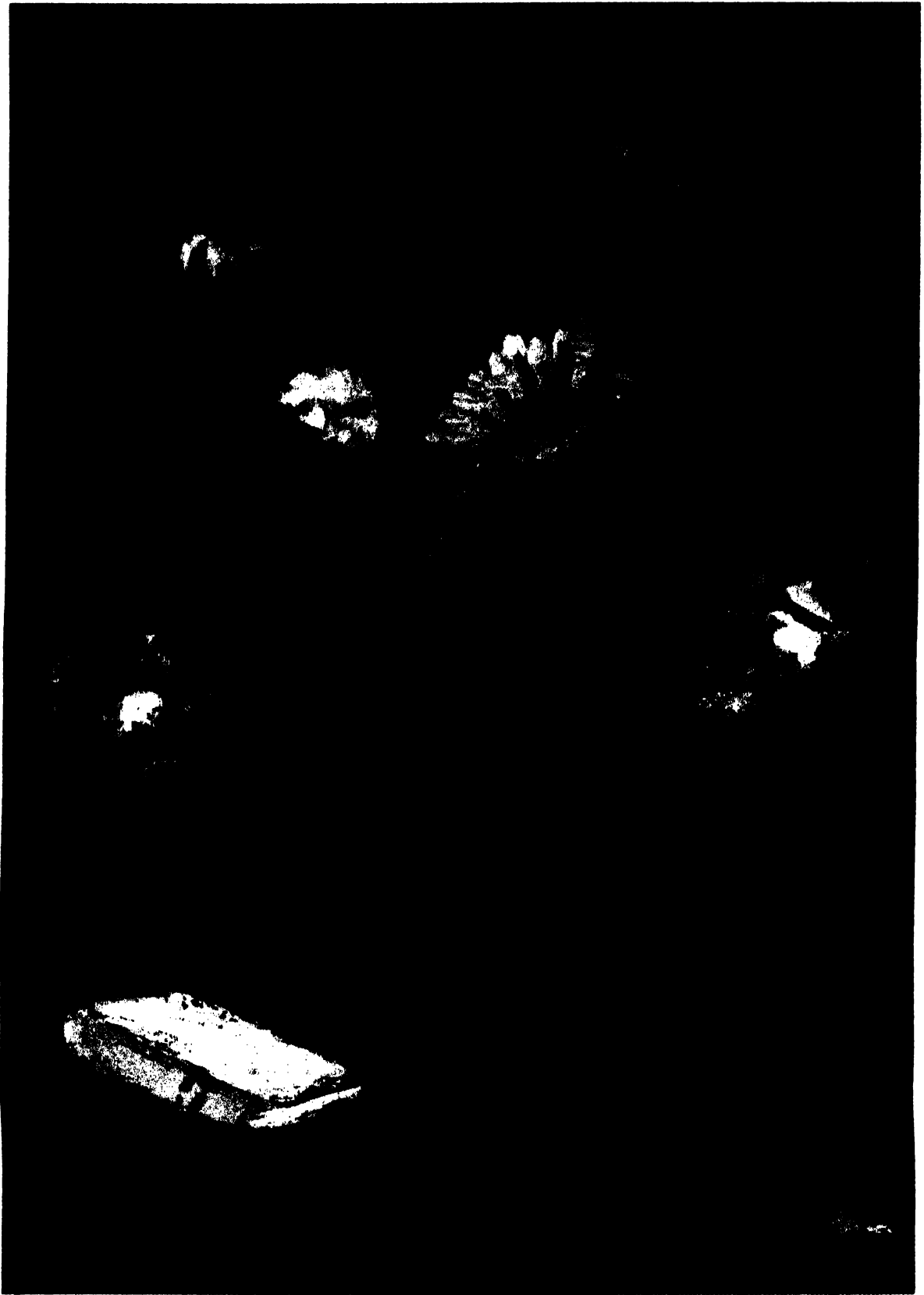
শিল্পী—যামিনী রায়

পর্যটন মানচিত্রে—বাঁকুড়া

সুনীলকুমার ঘটক

রানীবাঁধ ঝিলিমিলির পথটা স্বপ্নের। এখানে সাতটি ভিউপয়েন্ট থেকে নিসর্গ চিত্র দেখা সত্যিই দার্জিলিংকে স্মরণ করায়। ঝিলিমিলি থেকে তিন কিমি. উত্তরে তালবেড়িয়ার বাঁধ। তিন পাহাড়ের মাঝে এক জলাধার। যার মুখ বেঁধে পাহাড়ি এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

মুকুটমণিপুর, কংসাবতী ড্যাম

মানুষ ভ্রমণে যায় অজানার টানে। প্রাচীনকাল থেকে যে তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছে তার মধ্যে ধর্মের টানের সঙ্গে ভ্রমণের টানও অনেকখানি মিশে আছেই। সে কারণেই দুর্গম স্থানের তীর্থস্থানগুলি চিরকালই জনপ্রিয়। বর্তমানকালে তীর্থস্থানের সঙ্গে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ সমন্বিত স্থানগুলিও সাধারণ মানুষের ভ্রমণ তালিকায় স্বচ্ছন্দে স্থান করে নিয়েছে। আজকের পর্যটন মানচিত্রে পাহাড় সমুদ্র নদী অরণ্য প্রথম সারিতে এসেছে। পৃথিবীজুড়ে কোলাহলক্লান্ত মানুষ দৈনন্দিন ব্যস্ততা থেকে মুক্তি পেতে খুঁজে বেড়াচ্ছে দু-দণ্ডের শান্তি, নির্জনতা।

বাঁকুড়া জেলার লালমাটি, টিলা, ডুংরি, শাল, পলাশ মহুয়ার জঙ্গল, মালভূমির নৃত্যরতা নদী আপন রূপের আঁচল মেলে ক্লান্ত নাগরিকের জন্য প্রশান্তির আসন পেতে রেখেছে। ছোটনাগপুর মালভূমির সঙ্গে গাঙ্গেয় সমভূমির মিলনভূমি এই বাঁকুড়া ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। এই বৈচিত্র্যময় জেলা প্রাচীনত্বের ঐতিহ্যে যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি বর্ণময় নান্দনিক-প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে মানুষের হস্তাবলেপে যে মনোরম রূপ ফুটে উঠেছে তা আজ দেশ-বিদেশের মানুষকে টেনে আনছে বাঁকুড়ার দুয়ারে।

বাঁকুড়া জেলার পূর্বপ্রান্তে জয়রামবাটি পর্যটন মানচিত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মা সারদামণির জন্মস্থান জয়রামবাটি মাতৃভূমি হিসাবে বন্দিত। বেশ কয়েকটি রেস্ট হাউস, হোটেল পর্যটকদের খানিকটা স্বস্তি এনে দিতে পেরেছে। নরনারায়ণ মঠের আতুরজনের সেবা মাতৃভূমিকে নতুন মর্যাদা দিয়েছে। এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে কামারপুকুর, যার আন্তর্জাতিক পরিচিতি সুবিদিত।

বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে আলোচিত পর্যটনক্ষেত্র মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর। পণ্ডিতেরা বলেন, পূর্বভারতের কাশী। দলমাদল কামান, রাসমঞ্চ, জোড়বাংলা, শ্যাম রায়, মদনমোহন, লালজির মন্দির, গড়দরজা, গুমগড়, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ প্রভৃতি মল্লরাজাদের অবিস্মরণীয় কীর্তি আজও বহন করে চলেছে। সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে টেরাকোটার অজস্র শিল্পসম্ভার। যদিও সময়ের পাকে ও পুরাবস্তুর চোরাকারবারিদের লালসায় কিছু কিছু ক্ষয় ও অদৃশ্য হয়েছে। তবুও সাতটি বাঁধে ঘেরা অগণিত মন্দির বুকে করে বিষ্ণুপুর রাঢ় বাঙলার এক অনন্য ইতিহাস ধরে রেখেছে। সে ইতিহাসের সংগ্রহশালা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখা, বিষ্ণুপুরের শুধু নয় বাঙলার গৌরব বলে আজ বিবেচিত।

বিষ্ণুপুরের সংগীত ঘরানা, বালুচরী শাড়ি, শাঁখের শিল্পকার্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ও তার উত্তরণ উল্লেখযোগ্য। আধুনিকীকরণের ধাক্কা সামলিয়ে কাঁসাপিতল শিল্প নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে। আসলে বিষ্ণুপর নিয়ে কিছু বলা মানেই চর্বিতচর্বণ। তবুও বলা উচিত বিজয়া দশমীর দিন রাবণকাটা নাচ, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ঝাঁপান উৎসব ভ্রমণ-পিপাসুদের যথেষ্ট তৃপ্তি দেয়। এছাড়া ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিষ্ণুপুর উৎসব' বিষ্ণুপুর দর্শনার্থীদের বাড়তি পাওনা। বিষ্ণুপুর আজ পর্যটন ক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মুকুটমণিপুর। কুমারী-কংসাবতী নদীর সংযোগস্থলকে বেঁধে ৮০ বর্গকিলোমিটার দৈর্ঘ্যের জলাধার বাঁকুড়া জেলার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র। এ খ্যাতি রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যেও প্রসারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য পরিকাঠামোয় সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থা যথেষ্ট। সাম্প্রতিক স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক এর অঙ্গে নতুন সংযোজন। এখান থেকে অম্বিকানগর খুব কাছে।

জয়রামবাটি, বিষ্ণুপুর, মুকুটমণিপুর নিয়ে বিশেষ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এদের পরিচিতি ভ্রমণপিপাসুদের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট—সুবিদিত। বহু কথিতও বটে। স্বভাবতই আমরা আলোচনার গতিমুখকে সেই দিকে নির্দেশিত করতে চাই—যাদের অবস্থান যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক, অথচ পাদপ্রদীপের আলোয় তেমন করে আলোকিত হয়নি।

কলকাতা থেকে সড়ক পথে জয়রামবাটি হয়ে বিষ্ণুপুর ঢোকার প্রবেশদ্বারে অপূর্ব এক সৌন্দর্যের ডালা নিয়ে বসে আছে জয়পুর। মল্লরাজদের প্রাচীন রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর (পদুমপুর) জয়পুরেরই অঙ্গ। শালপিয়ালের সবুজ অরণ্যের ঘাঘরা পরে সমুদ্র বাঁধ আজ প্রতিষ্ঠিত পিকনিক স্পট। এখানের অরণ্যে মুক্ত হরিণের বিচরণ পর্যটকদের খুব একটা হতাশ করে না। দু-দণ্ড বসার জন্য জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতি নির্মিত ফুল-ফলের বাগান আদর্শ জায়গা। এই জয়পুরের এক কিলোমিটার উত্তরে 'গড়'। মল্লরাজাদের গড়ের চিহ্ন আজও ধরে রেখেছে। জয়পুরের অদূরেই পূর্বে বাঁকুড়া জেলার বৃহত্তম মন্দির গোকুলচাঁদ। ল্যাটারাইট পাথরের এই মন্দির সত্যিই বিস্ময়ের। এর পাশেই বরাহমূর্তি, সদ্য আবিষ্কৃত বারাহীমূর্তি সহ অজস্র জৈন বৌদ্ধ শৈব্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছড়িয়ে থাকার নিদর্শনভূমি সলদা-গোকুলনগরকে পণ্ডিতেরা 'আশ্চর্য প্রত্নশালা' বলেছেন। এই এলাকা দর্শন বিষ্ণুপুর দেখার উপক্রমণিকা বলা যেতেই পারে। এখানে রাত কাটানোর মতো তিন-চারটি আস্তানাও রয়েছে। বড় ডরমেটারি সহ সর্বাধুনিক ব্যবস্থা নির্মাণ হচ্ছে জেলা পরিষদ থেকে।

জয়পুর থেকে বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘণ্টাখানেকের পথ পাঁচমুড়া। একটি গ্রাম। বর্তমানে গঞ্জের আকার নিলেও পাঁচমুড়া এখনও গ্রামই। অন্যান্য নানান সম্প্রদায়ের সঙ্গে শতাধিক কুম্ভকার পরিবার এখানে বাস করে। এই কুম্ভকারেরা পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি তৈরি করে বিশ্বজোড়া নাম কিনেছে। পোড়ামাটির নানান মূর্তি, ফুলের টব, প্লেট, শাঁখ (সামুদ্রিক শাঁখের মতো বাজানো যায়) তৈরি করে চরম সৃজনশীল উৎকর্ষতার পরিচয় তুলে ধরেছে। লাল কাঁকুরে মাটির পাঁচমুড়ায় এই কুম্ভকারদের কর্মশালা শিল্পরসিকদের কাছে আকর্ষণীয় তো বটেই—স্মারক সংগ্রহে উৎকৃষ্ট স্থানও।

পাঁচমুড়া থেকে আরেকটু পশ্চিমে চলে যান—চেঁচুড়িয়ার প্রকৃতি পার্কে। অরণ্যের রূপ অবিকৃত রেখে শাল-পিয়ালমহুলের সঙ্গে আম কাঁঠাল পেয়ারা নারকেল সহ ফুলের বাগান এ পার্ককে মোহনীয় করে তুলেছে। বাঁধে কাম্বেল হাঁসের সঙ্গে নৌকো বিহার করা যায়। ছজনের রাত কাটানোর ব্যবস্থা অনেককে টেনে আনছে। তাছাড়া পিকনিকের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করায় একদিনের ভ্রমণ যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক নিশ্চয়। এখানে একরাত কাটিয়ে আরও পশ্চিমে হাটগ্রাম-পায়রাচালিতে একটা দিন দিব্যি কাটে। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শঙ্খশিল্পীদের শাঁখের কাজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে উপরি পাওনা কিছু মন্দির। এখান থেকে মুকুটমণিপুর খুব দূরে নয়। মুকুটমণিপুর থেকে রানীবাঁধ ১৮-১৯ কিমি দক্ষিণে। রানীবাঁধে টিলার উপরে তৈরি বনবিভাগের রেস্টহাউসে জ্যোৎস্নারাত স্বপ্নময়। এখান থেকে খুব সহজেই দক্ষিণবঙ্গের দার্জিলিং ঝিলিমিলি দেখে নেওয়া যেতে পারে। রানীবাঁধ ঝিলিমিলি পথটা স্বপ্নের। এখানের সাতটি ভিউ পয়েন্ট থেকে নিসর্গ চিত্র দেখা সত্যিই দার্জিলিংকে স্মরণ করায়। এই ঝিলিমিলি থেকে তিন কিমি উত্তরে তালবেড়িয়ার বাঁধ। তিন পাহাড়ের মাঝে এক জলাধার। যার মুখ বেঁধে পাহাড়ি এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। পিকনিক

রানীবাঁধের সুতান জঙ্গল

স্পট হিসেবে এখন খুবই জনপ্রিয়। এই তালবেড়িয়ার বাঁধ হয়েও যাওয়া যায়—অন্য পথও আছে ১৫ কিমি পূর্বে 'সুতান' যাবার। গভীর পাহাড়ি জঙ্গলের মাঝে হরিণবীথি লেক, নির্জনতাপিয়াসীদের আদর্শস্থান এই সুতান। এখানে এক উঁচু ওয়াচ টাওয়ার থেকে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা আনন্দময়। ছোটগাড়িতে রোমহর্ষক পথ অতিক্রম স্মরণে থাকবে। এখানে বনবিভাগের এক ডরমেটোরি আছে। এরই দক্ষিণ প্রান্তে ছেঁদা পাথর উলফ্রাম খনি হিসেবে খ্যাত হলেও বিপ্লবী ক্ষুদিরামদের বোমা তৈরির কেন্দ্র হিসাবেও স্মরণীয়।

রানীবাঁধ-রাইপুর খাতড়ার মাঝে কংসাবতী নদীর তীরে পোরকুল। পৌষ সংক্রান্তির তুষু মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়। এ মেলাকে 'গানের মেলা' বলা যায় অনায়াসেই। এ মেলা না দেখলে দক্ষিণ বাঁকুড়াকে সম্পূর্ণ চেনা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

দক্ষিণ বাঁকুড়ার এই কেন্দ্রগুলি মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পলাশের রঙে যেভাবে রঞ্জিত হয়, তা বিশেষত নগরবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হবে।

দক্ষিণ বাঁকুড়া থেকে ফেরার পথে হীড়বাঁধে চাটুনি বাঁধ দেখে নেওয়া যেতে পারে। চাটুনি বাঁধ, চন্দন বাগান বিশেষভাবে মানুষকে টানে। এখানের বনবাংলোয় থাকবার ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে উত্তরে ছাতনা। বড়ু চণ্ডীদাসখ্যাত বাসুলী মন্দির দেখে শুশুনিয়ায় ডেরা নেওয়া যায় সহজেই। হাতির হাঁটুমুড়ে বসে থাকার রূপে শুশুনিয়া অনেক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী।

রাজা চন্দ্রবর্মার শিলালিপি, ছোট ঝরনা, পায়ে পায়ে পাহাড়ের মাথায় ওঠার রোমাঞ্চ হাজারো মানুষকে টেনে আনে। বাড়তি আকর্ষণ পাহাড়ে চড়ার শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে সরকারি-বেসরকারি আবাসনবিলাসী পর্যটকদের নিশ্চিন্ততা দিতেই পারে। এখানে পাথরের তৈরি নানান মূর্তি, বাসনপত্র স্মারক হিসাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই শুশুনিয়া থেকে পূর্বে কয়েক কিলোমিটার নেমে এলেই শালীনদীকে বেঁধে গাংদোয়ায় যে ব্যারেজ হয়েছে তা জেলায় ছোট মুকুটমণিপুর নামে খ্যাত। এখান থেকে তিন কিমি পূর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ প্রসাদের জন্মভূমি অমরকানন। এখানের 'করো' পাহাড় দেখে নেওয়া কঠিন নয়। এখানের বনবিভাগের রেস্টহাউস যথেষ্ট অভিজাত। অমরকানন থেকে আরও পর্বে বেলিয়াতোড়। যামিনী রায়ের জন্মস্থান। এখানে কাঠ ও বাঁশের ঘোড়া সহ নানান কারুশিল্প বিখ্যাত। বেলিয়াতোড় থেকে সোনামুখী রোড ধরে তিন কিলোমিটার গেলেই ছান্দার। এখানের অভিব্যক্তি শিল্পকেন্দ্র সব মানুষকে তৃপ্তি দেবেই। বিশেষত এর প্রাণপুরুষ উৎপল চক্রবর্তীর আলাপি মেজাজ দর্শনার্থীদের কাছে স্মৃতিময়।

বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে বিকনা। ডোকরাশিল্পীদের গ্রাম। বিশেষত নানান দেবদেবীর মূর্তি, লক্ষ্মীর সাজ বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ সহায়তায় বিকনা ডোকরা গ্রাম হিসাবে পরিচিত হয়েছে। বাঁকুড়া শহরের পূর্ব গায়ে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে এক্তেশ্বর। এক্তেশ্বর শিবের 'গাজনমেলা' বিখ্যাত। মন্দির তো দর্শনীয়ই। এখান থেকে ১৫ কিমি পূর্বে ওন্দা। ওন্দার ৫ কিমি উত্তরে বহুলাড়ার মন্দির। যা জৈন সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন বলে পণ্ডিতেরা বলেন।

আরও পূর্বে বিষ্ণুপুরের উত্তরে বাঁড়েশ্বর। দ্বারকেশ্বর নদের গর্ভে দ্বীপের মতো স্থানে বাঁড়েশ্বর শিবের মন্দির। অদ্ভুত প্রাকৃতিক

শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্ণা

পরিবেশে অবস্থিত মন্দিরটি দেখবার মতো। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে বিস্ময়। এখানের গাজনমেলা বিখ্যাত।

সোনামুখী তসরবস্ত্র, পিতল-কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত হলেও মনোহরতলা ও সেখানের মহোৎসব যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ইন্দাসের একেবারে উত্তরপ্রান্তে দামোদর-শালী নদীর মিলন স্থলে সোমসার। সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' ছবির শুটিংয়ের জন্য আলোচিত হলেও চাঁদপাল (যাঁর নামে নাকি কলকাতার গঙ্গায় চাঁদপাল ঘাট)-এর বাসভূমি। এই পালদের বিশাল বাড়ি আজও বর্তমান যদিও বাস করার লোক প্রায় নেই। এই সোমসারে শালী দামোদরের মিলনস্থলেই নদীতীরের বটগাছটি শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযানে বর্ণিত বটগাছটির কথা মনে করিয়ে দেয়। সোমসার পিকনিক স্পট হিসেবে আদর্শস্থানের স্বীকৃতি পেয়েছে।

স্বল্প পরিসরে বাঁকুড়ার দর্শনীয় স্থানগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া কঠিন। তবুও ইতিমধ্যে পরিচিত ও সম্ভাবনাময় স্থানগুলির একটা সাধারণ রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। বাঁকুড়া শহরকে কেন্দ্র করে এগুলি সহজেই দেখে নেওয়া যেতে পারে। শহরের কৃতি সন্তান রামকিঙ্কর বেইজের নামাঙ্কিত রামকিঙ্কর যুব আবাস ছাড়া সদর শহরে যাবতীয় দপ্তরের বাংলো ও বেসরকারি ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত। এছাড়া বিষ্ণুপুর সহ যেসব পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তারও সংক্ষিপ্ত উল্লেখে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। তবে গাইড বুক করার চেষ্টা হয়নি, এটা স্বীকার করে নিয়েই লালমাটি-রাঙা বাঁকুড়াকে নতুন করে দেখার আমন্ত্রণ রইল।
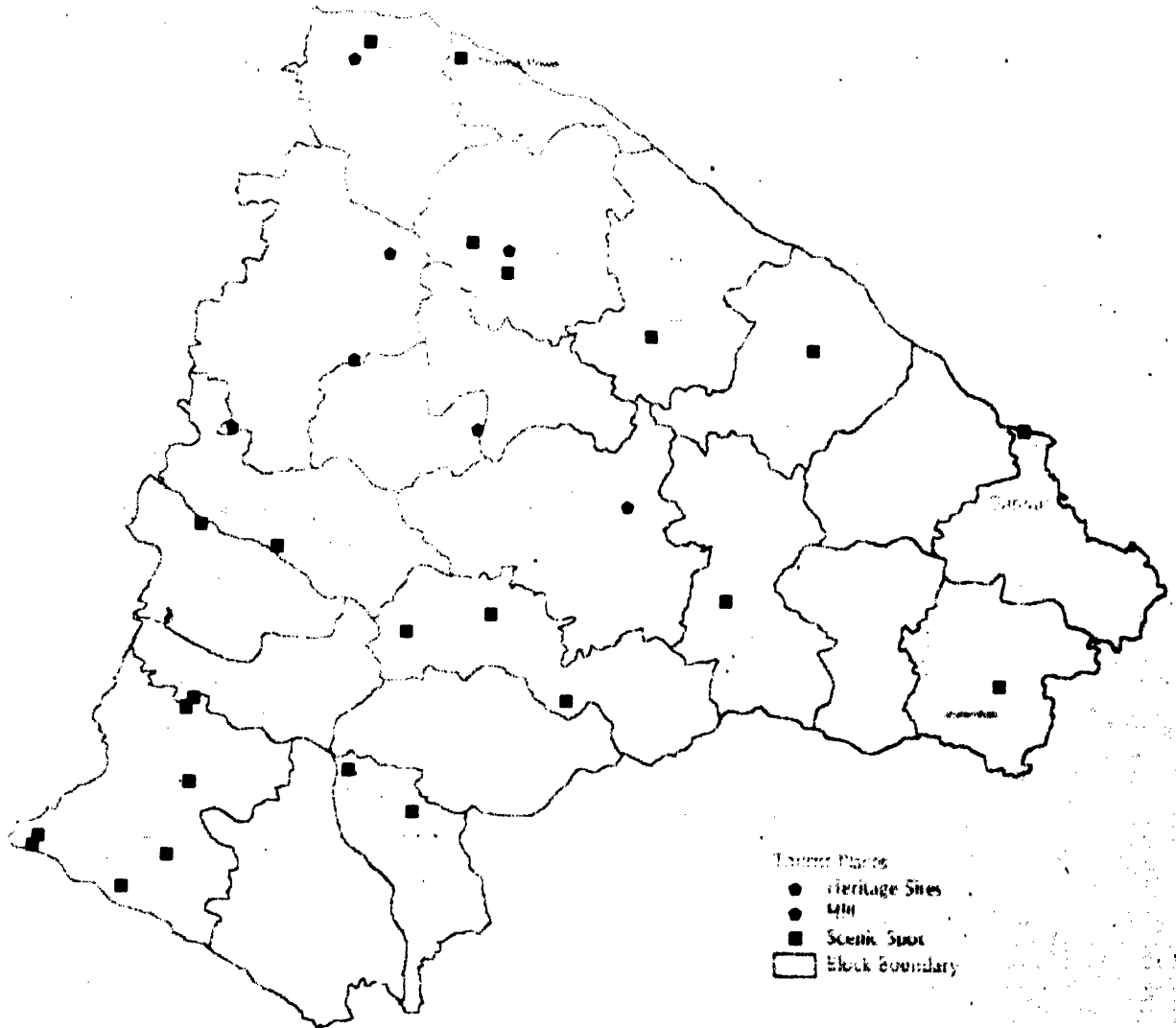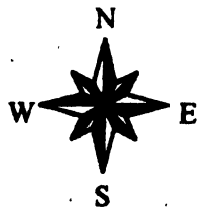
বাঁকুড়া জেলার পর্যটন মানচিত্র
N
W
E
S
Scenic Spot
10 0 10 20 Kilometers
Prepd. By: NRDMS
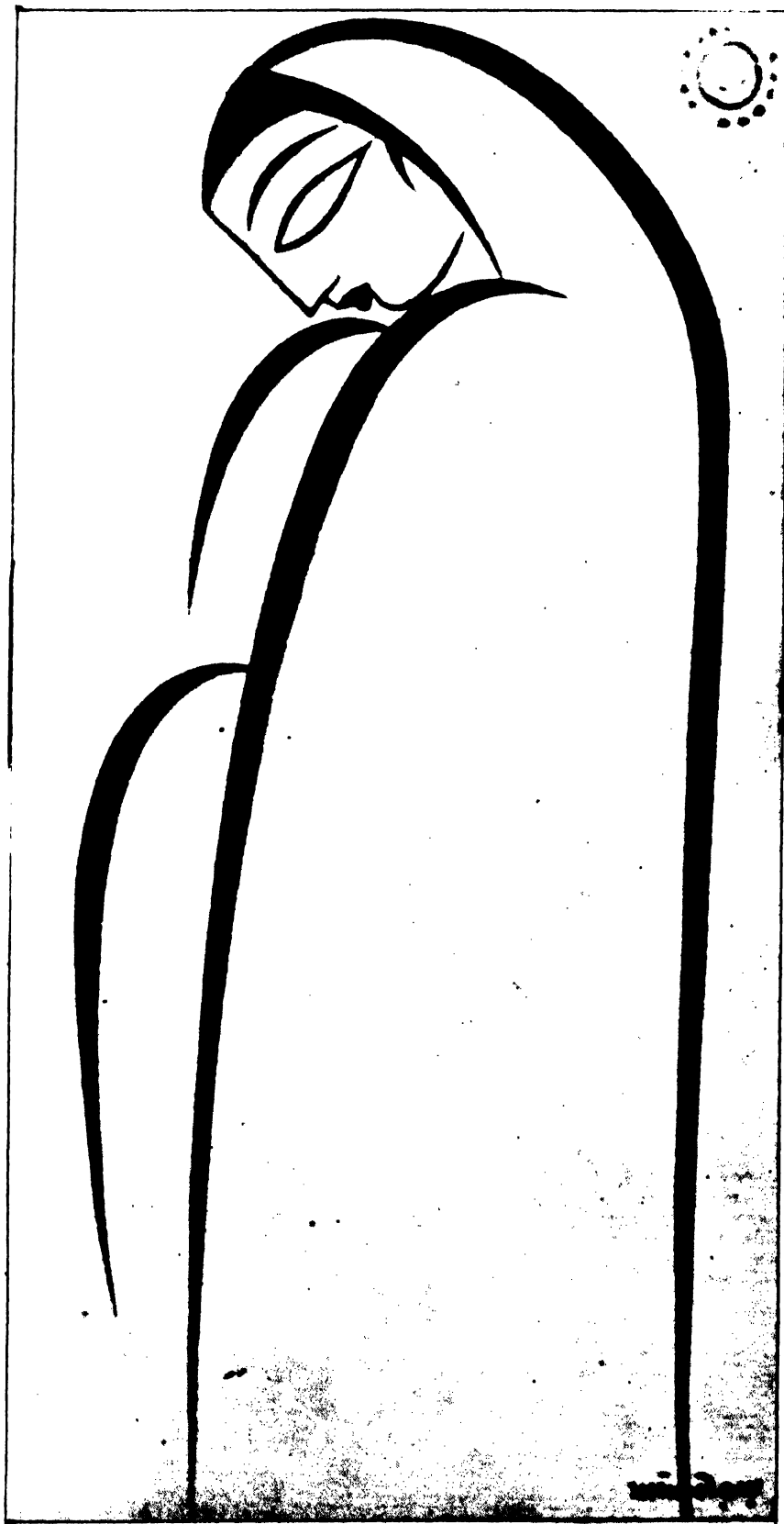
শিল্পী—যামিনী রায়

বাঁকুড়া জেলার উদ্ভব ও বিবর্তন এবং গ্রন্থপঞ্জি

সুবর্ণ দাস

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই সুবা বাংলাকে অর্থাৎ বাংলা বিহার ওড়িশা অঞ্চলকে ব্রিটিশ-শাসনাধীন প্রশাসনিক জেলা এককে খণ্ডিতকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সাতচল্লিশটি জেলা। বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। কালক্রমিক দিক থেকে বাঁকুড়া জেলার স্থান সাঁইত্রিশতম।

'বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণি-পূর্ণ খনি !

... ...

কোন পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে
দোলাইব মাতৃ-ভাষা-কম কলেবরে'—

—নবীনচন্দ্র সেন

বাঁকুড়া জেলা বর্তমানে ভৌগোলিক দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। সংস্কৃত ভূগোল অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলে বাঁকুড়ার প্রশাসনিক ক্ষেত্র হল রাঢ় নামে অভিহিত অঞ্চল বিভাগের অঙ্গ। গবেষকদের মতে, আবুল ফজল যখন আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তখন অধুনা বাঁকুড়া জেলা নামে পরিচিত অঞ্চল ছিল কিছুটা সরকার-ই-মদারন নামক প্রশাসনিক বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত ও অংশত স্বাধীন বিষ্ণুপুররাজের নিয়ন্ত্রণাধীন। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল রচয়িতা মানিকরাম গাঙ্গুলি তাঁর কাব্যে 'বাঁকুড়া রায়' ধর্মঠাকুরের পরিচয় দিয়েছেন।

'বেলডিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি একমনে
অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে।
ফুল্লরের ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়
শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়।
সিয়াসের কালাচাঁদ ঞিদাসের বাঁকুড়া রায়
বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়।'

মধ্যযুগের আর একজন ধর্মমঙ্গল প্রণেতা রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলেছেন যে, ধর্মঠাকুর তাঁর পরিচয় দিলেন 'আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।' কোনও কোনও আঞ্চলিক গবেষক মনে করেন বঙ্কু রায় নামে সামন্ত নৃ-পতির নামানুসারে বাঁকুড়া। মল্লরাজ বীর হাম্বীরের পুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন বীর বাঁকুড়া রায়। এই বঙ্কু রায় আর বাঁকুড়া রায় একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। মতান্তরে স্থানীয় পাঁচটি কুণ্ড অর্থাৎ জলাশয় থাকায় এখানকার নাম হয় বানকুণ্ডা—'বান' কথাটির 'পঞ্চবান'-এর পাঁচ সংখ্যা নির্দেশক। এই বানকুণ্ডা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে 'বানকুড়া'—বাঁকুড়া কথায় দাঁড়ায়।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই সুবা বাংলাকে অর্থাৎ বর্তমান বাংলা, বিহার, ওড়িশা অঞ্চলকে ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রশাসনিক জেলা এককে খণ্ডিতকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সাতচল্লিশটি জেলা। বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। কালক্রমিক দিক থেকে বাঁকুড়া জেলার স্থান হলো সপ্তত্রিংশতিতম।

সরকার প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে বাঁকুড়া জেলা গঠনের সূচনা সংক্রান্ত বক্তব্যে পার্থক্য চোখে পড়ে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে ও'ম্যালি বলেছেন যে, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান চাকলার অবশিষ্টাংশ সহ বাঁকুড়া ব্রিটিশ শাসনাধিকারে এসেছিল। আবার ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে যে, একটি প্রশাসনিক একক হিসাবে বাঁকুড়া জেলার উৎপত্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের বৎসর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ঘটেনি। বস্তুত বাঁকুড়া জেলান্তর্গত অঞ্চলসমূহ দুই কিস্তিতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন হয়েছিল। এ জেলার কিছু অঞ্চল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলা দুটির সঙ্গে এবং অবশিষ্টাংশ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম জেলার সঙ্গে ইংরেজদের হাতে এসেছিল।

বাঁকুড়া জেলান্তর্গত অঞ্চলগুলি ইংরেজ কোম্পানির হাতে আসার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। ওই বছর ২৭ সেপ্টেম্বর কোম্পানির সিলেক্ট কমিটি মীর কাশিমের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিতে কোম্পানি মীর কাশিমকে নবাব পদ প্রদানে রাজি হয় এবং বিনিময়ে মীর কাশিম কোম্পানিকে সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কোম্পানির ফোর্ট ইউলিয়াম কুঠির গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন ও মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে মীর কাশিমকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসান। সিংহাহনপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মীর কাশিম নবাবের রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য ইউরোপীয় ও দেশীয় সেনাদলের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে কোম্পানিকে পরগনা বর্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর ও থানা ইসলামবাদ (চট্টগ্রাম) প্রদান করে সনদ জারি করেন। সনদগুলির তারিখ ১ কার্তিক, ১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৩ অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে।

এভাবে প্রথম দফায় বাঁকুড়া জেলান্তর্গত কিছু জমি ইংরেজদের দখলে আসে। এ অঞ্চলগুলি ছিল পরগনা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত রাইপুর থানা অঞ্চল এবং চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত অম্বিকানগর ও ছাতনা জঙ্গল মহালদ্বয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মীর কাশিম প্রদত্ত সনদে রাজা তিলকচাঁদের জমিদারি বর্ধমান পরগনা বাংলা সুবান্তর্গত জেলাসমূহে, মেদিনীপুর চাকলা ওড়িশা সুবান্তর্গত জেলাসমূহে ও থানা ইসলামবাদ (চট্টগ্রাম) বাংলা সুবান্তর্গত জেলাসমূহে অবস্থিত বলে উল্লিখিত। মীর কাশিম যখন এসব অঞ্চল ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেন তখন (১) বর্ধমান জমিদারির অন্তর্গত ছিল আধুনিককালের বর্ধমান জেলা (সাতসিক্কা বাদে) হুগলি ও হাওড়া জেলা (সরস্বতী নদীর পূর্ব দিগন্ত নদীবিধৌত অঞ্চল বাদে) মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা ও সদর মহকুমার গড়বেতা থানা ও শালবনী এবং কেশপুর থানার উত্তরাংশ, বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানা এবং বীরভূম জেলার অজয় নদউত্তরবর্তী কিছু অঞ্চল, (২) বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ধমান পরগনা বা জমিদারি, বিষ্ণুপুর জমিদারি ও পাচেত জমিদারি ; এবং (৩) ৬১০২ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল আধুনিককালের মেদিনীপুর জেলা (হুগলির অন্তর্গত হিজলি, মহিষাদল ও তমলুক ; মারাঠা শাসনাধীন পটাশপুর, কামারডিবৌ ও ভোগরাই ; বর্ধমান চাকলাভুক্ত ঘাটাল মহকুমা, গড়বেতা থানা ও শালবনী ও কেশপুর থানার উত্তরাঞ্চলীয় অংশবিশেষ বাদে), সিংহভূমের ধবলভূম মহকুমা, বরাভূম ও মানভূম, মানভূমের জঙ্গল মহাল এবং বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ও অম্বিকানগর জঙ্গল মহাল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কংসাবতী নদী ছিল বর্ধমান চাকলা ও মেদিনীপুর চাকলার বিভাজক সীমারেখা। কংসাবতী নদীর দক্ষিণবর্তী অঞ্চলসমূহ ছিল মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্গত, আর উত্তরবর্তী
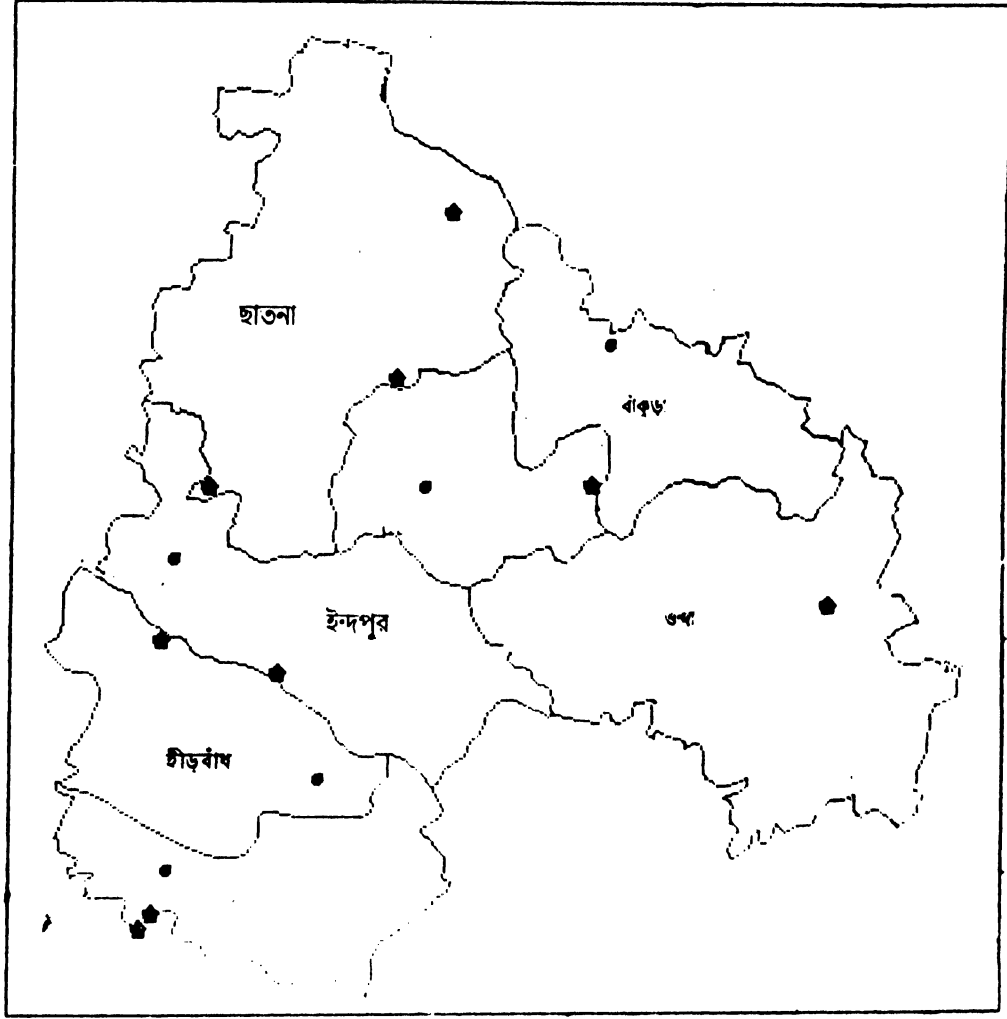
অঞ্চলসমূহ নিয়ে ছিল বর্ধমান চাকলা গঠিত। যেহেতু ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে শুধু বর্ধমান পরগনা ইংরেজদের হাতে এসেছিল সেহেতু স্পষ্টতই বিষ্ণুপুর ও পাচেত ছিল তখন কোম্পানির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানির পক্ষে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি গ্রহণ করেন। এটি ছিল বাংলার ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সম্রাট প্রদত্ত সম্পদ অনুযায়ী ১১৭২ বঙ্গাব্দের (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের) ফসল রবির সূচনা থেকে কোম্পানি 'free gift and attamagha' হিসাবে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করেছিল। দেওয়ানি লাভের বিনিময়ে কোম্পানি বাংলার নবাব প্রেরিত রাজস্ব হিসাবে দিল্লির কোষাগারে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা আদায় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাদশাহি ফরমানের তারিখ হল ২৪ সফর। ৬ জালুস বা ১২ আগস্ট ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ। সম্রাটের আর একটি কাজ ছিল কোম্পানিকে ইতিপূর্বে মীর জাফর ও মীর কাশিমের যথাক্রমে যে ২৪ পরগনা জেলার জমিদারি এবং যথেচ্ছভাবে চাকলা নামে অভিহিত বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম জেলাত্রয় কোম্পানিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তা স্বীকার করে নেওয়া। এ স্বীকৃতিও কার্যকর হয় ফসল রবি, ১১৭২ বঙ্গাব্দ (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নবাব জাফর খান ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর চাকলা নামে কোনও চাকলা গঠন করেননি। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে ওড়িশা সুবা গঠিত হলে মেদিনীপুরকে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয় ও ১৭০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর বাংলা সুবার এক্তিয়ারভুক্ত হয়ে হিজলী চাকলার অংশে পরিণত হয়। যাহোক, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা সম্পর্কে বাদশাহি সিদ্ধান্তের ফলে দ্বিতীয় দফায় বাঁকুড়া জেলার অঞ্চল হিসাবে মল্ল রাজবংশশাসিত বিষ্ণুপুর পরগনা ইংরেজের দখলে আসে।

ব্রিটিশ লেখক গ্রান্টের মতে, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে যখন নবাব কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন তখনই বিষ্ণুপুর ও পাচেত রাজ্য কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত ছিল। কিন্তু কোম্পানি প্রতারিত হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গ্রান্টের অভিমত ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নবাব কোম্পানিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন পরগনা বর্ধমান, চাকলা বর্ধমান নয়। সুতরাং যথাযথ কারণেই মীরকাশিম বিষ্ণুপুর ও পাচেতের নিয়ন্ত্রণ কোম্পানিকে দেননি। অতএব দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, ওড়িশার

সরকার প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে বাঁকুড়া জেলা গঠনের সূচনা সংক্রান্ত বক্তব্যে পার্থক্য চোখে পড়ে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে ও'ম্যালি বলেছেন যে, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান চাকলার অবশিষ্টাংশ সহ বাঁকুড়া ব্রিটিশ শাসনাধিকারে এসেছিল। আবার ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে যে, একটি প্রশাসনিক একক হিসাবে বাঁকুড়া জেলার উৎপত্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের বৎসর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ঘটেনি।

দেওয়ানি লাভের ফলশ্রুতি হিসাবেই ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুররাজের অধীনস্থ ভূখণ্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছিল।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি স্বত্ব হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের কাজ হতে নেয়। বর্ধমান পরগনা ও মেদিনীপুর চাকলা যথাক্রমে কোম্পানির কুঠিসমূহের রেসিডেন্টদের তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হয়। তাঁরা নিলাম ডাকের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা পূর্বতন জমিদার ও তালুকদারদের দাবি বিবেচনা করেননি। এ ব্যবস্থা রায়তের পক্ষে অত্যন্ত বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য ছিল। কারণ, সরকারকে দেয় ২,২২,৯৫৮ টাকা পরিমাণ রাজস্বের স্থলে প্রথম নিলাম ডাকে দব উঠেছিল ৭,৬৫,৭০০ টাকা। রায়তকে যথাসম্ভব শোষণ করে রাজস্ব আদায়ের এই ব্যবস্থা বিনা বাধায় এক দশকের অধিককাল ধরে চলে। ১৭৬১ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান হিসেবে ভেরেলস্ট রাজস্ব আদায়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের সুপারভাইজার ও ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল এ জেলা দুটির রাজস্ব আদায়ের কাজ নিয়ন্ত্রিত করা।

কিন্তু রায়তের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে গৃহীত রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত ১১৭৬ বঙ্গাব্দের বা ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে প্রকাশ পেলে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনায় বাধ্য হয়। ফলে কোম্পানি দেওয়ানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে ও কমিটি অব রেভিনিউ নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। রাজস্ব সংগ্রহের কাজ তদারকি করার জন্য গভর্নরের কাউন্সিলের সব সদস্যদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৩অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর এর শেষ অধিবেশন বসেছিল। কমিটির চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৯টি কালেক্টরশিপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। অন্যতম ছিল বিষ্ণুপুর ও পাচেতসহ বীরভূম কালেক্টরশিপ। তবে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি এক আদেশবলে বিষ্ণুপুর ও পাচেতের জন্য পৃথক পৃথক কালেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে তারিখের আর একটি আদেশ বলে তাঁদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ও কলিকাতার কর্তৃপক্ষের কাছে রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য পুনরায় নিলাম ডাকের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এখন থেকে রাজস্ব আদায়ের কাজ দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত ইউরোপীয় কর্মচারীদের অভিধা হয় সুপারভাইজারের পরিবর্তে কালেক্টর, রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ তদারকির জন্য তাঁদের সাহায্যকারী হিসাবে 'দেওয়ান' অভিধাকারী দেশিয় কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহের বিষয়টি বিচার করে রাজস্ব কমিটি কর্তৃক প্রবর্তিত নিলাম ডাক ও কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা অসন্তোষজনক প্রমাণিত হওয়ায় ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে কাউন্সিল রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই নতুন নীতি অনুযায়ী ইউরোপীয় কালেক্টর নিয়োগের নীতি বর্জন করা হয় এবং প্রতিটি জেলায় দেওয়ান বা আমীল নামধেয় দেশিয় কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অবশ্য যে জেলা সম্পূর্ণভাবে জমিদারকে বা নিলাম ডাকের মাধ্যমে ইজারা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে জেলায় দেওয়ান বা আমীল নিয়োগের নীতি কার্যকর করা হয়নি। আমীলদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাকে পাঁচটি বৃহৎ বিভাগে ভাগ করা হয় ও প্রতিটি বিভাগের জন্য প্রভিনসিয়াল কাউন্সিল অব রেভিনিউ গঠন করা হয়। দ্বিতীয় বিভাগটির সদর দপ্তর ছিল বর্ধমান। এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ধমান, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), পাচেত, বীরভূম (ক্যাপটেন ক্যামাকের অধীনস্থ রামগড় ইত্যাদি জেলাসহ)।

কিন্তু রাজস্ব কমিটির কাজের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় উপরোক্ত ব্যবস্থার কার্যকারিতা ব্যাহত হতে থাকে। অতএব কাউন্সিল ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল এক চিঠিতে কোম্পানির প্রশাসন কৃত্যকের কর্মচারীদের হজুরী মহালের সর্বত্র কালেক্টর পদে নিয়োগের পরামর্শ দেয়। কাউন্সিলের বক্তব্য ছিল যে, বাংলা প্রেসিডেন্সিতে যে পরিস্থিতি চলছিল তার বিচারে কোনও রকম স্থানীয় এজেন্সী ছাড়া কমিটির পক্ষে নিয়মিত রাজস্ব আদায় করা ও সুপারভাইজার ভূস্বামীদের অত্যাচার ও অতিরিক্ত আদায়ের উপদ্রব থেকে রায়ত ও ক্ষুদ্র রায়তদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং কাউন্সিল কমিটিকে হজুরী মহালগুলিকে কালেক্টরশিপে বিভক্ত করার নির্দেশ দেয়। সে সঙ্গে এ নির্দেশও ছিল যে, কোনও জমিদারি বিভাজনের প্রশ্ন দেখা না দিলে কালেক্টর শিল্পগুলিকে যেন এমনভাবে গঠন করা হয় যাতে কোনও কালেক্টরশিপের জমা আট লক্ষ টাকার অতিরিক্ত না হয়। কাউন্সিলের এ নির্দেশ মোতাবেক কমিটি ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল হজুরী মহলগুলিকে বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, দিনাজপুর, বাবরবন্দ সহ ইদ্রাপুর কালক্টর শিল্প বিভক্ত করে ও মেদিনীপুর জেলার হজুরী মহালগুলিকে এ জেলার কালেক্টরশিপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

এরপর ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে কোম্পানির ডিরেক্টর সভার ১২ এপ্রিল ১৭৮৬ তারিখের এক পত্র গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের হাতে আসে। এ পত্রে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কোচের

অনুর্বর কাঁকুরে জমি উর্বর করে তুলছেন শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ

নির্দেশ ছিল। অতএব কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ রাজস্ব বোর্ডের সভায় অনুমোদিত এ পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজস্ব সংগ্রহের বিভিন্ন সংস্থার সংখ্যা ৩৬ থেকে ২৪-এ নামিয়ে আনে। ফলে বিষ্ণুপুর আবার বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত হয়।

দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তনের আগে সংগৃহীত তথ্য প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েকটি কালেক্টরশিপের আয়তনের বিশালতার জন্য দক্ষ কাজকর্ম ছিল কষ্টসাধ্য, তাই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তারিখের এক সরকারি আদেশ বলে বিষ্ণুপুরকে বীরভূম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাছাড়া প্রশাসনিক দক্ষতার প্রয়োজনে গর্ভনর জেনারেল প্রদত্ত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর এক নির্দেশ বলে বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অঙ্গীভূত রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, খুরশাল, ফুলকুসুমা, সিমলাপাল ও ভ্যালাইডিহা এ ছটি জঙ্গল মহাল মেদিনীপুর জেলায় স্থানান্তরিত হয়।

এদিকে বাংলা রাজ্য স্থাপনের সময় থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থাপনের সময় পর্যন্ত মুসলমান আমলের বিচার ব্যবস্থা সংশোধনের জন্যও কোম্পানি সরকার কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের জন্য কতগুলি সাধারণ বিধি (General Regulations) পাশ হয়েছিল। এ সাধারণ বিধি মোতাবেক জেলাস্তরে সব রকম ফৌজদারী মামলা বিচারের ক্ষমতা কাজী ও মুফতির উপর ন্যস্ত হয়। তাঁরা দুজনে মৌলবীর সহায়তায় ফৌজদারী বিচার পরিচালনা করার ক্ষমতা পান পরবর্তীকালে কাজী 'দারোগা' নামে অভিহিত হন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ২৭ জুন বীরভূম ও বিষ্ণুপুর জেলাসহ চোদ্দটি জেলার একটি করে দারোগাসহ ফৌজদারী আদালত স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল তারিখের বিধিবলে বাংলায় তেরটি 'Courts of Civil Judicature' নামে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়েছিল। এ আদালতগুলির একটি স্থাপিত হয়েছিল বর্তমানে পুরুলিয়া জেলান্তর্গত রঘুনাথপুরে। বিষ্ণুপুর ও পাচেত ছিল এ বিচারালয়টি এক্তিয়ারের অধীন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সংযুক্তি ও মেদিনীপুর জেলার এক্তিয়ারে ছটি জঙ্গল মহালের স্থানান্তরের ফলে বাস্তবত বাঁকুড়া জেলার অস্তিত্ব লোপ পায়। দীর্ঘ এক যুগ পরে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের চুয়াড় বিদ্রোহের অভিঘাতজাত অস্থিরতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা পুনরায় নিজ সত্তায় ফিরে আসে। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নং রেগুলেশনবলে গঠিত হয় জঙ্গল মহাল জেলা। এ নতুন জেলার অন্তর্ভুক্ত ২৬টি জেলার মধ্যে ১৬টি নেওয়া হয়েছিল বীরভূম জেলা থেকে। এগুলি ছিল পাচেত, বাগমুণ্ডি, বোগানফুদ্রি, তরফ বাহাদুর, কাতলাম, হাবিলা, ঝালদা, ঝরিয়া, জয়পুর, মুকুন্দপুর, কিসমৎ নওয়াগড়, কিসমৎ চার্ওৎ লি, টাওরং, টং, নগরকিয়ারি ও পাতকুম। সাতটি নেওয়া হয়েছিল মেদিনীপুর জেলা থেকে। যথা, ছাতনা, বরাভূম, মানভূম, শ্রীপুর (সুপুর), অম্বিকানগর, সিমলাপাল ও ভ্যালাইডিহা। তিনটি নেওয়া হয়ছিল বর্ধমান জেলা থেকে। যথা, সেনপাহাড়ি, শেরগড় এবং কোতুলপুর থানা ও বালসি পরগনা বাদে বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়াকে সদর দপ্তর করে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নং রেগুলেশন অনুযায়ী জঙ্গল মহাল জেলা গঠনের কারণ ছিল চুয়াড় বিদ্রোহের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চলে আদিবাসীদের লুঠতরাজ। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর সরকারি আদেশবলে মহাল পারা জঙ্গল মহাল জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এরও কারণ ছিল এই অঞ্চলের অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা। জঙ্গল মহালের রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয়-সংকোচনের ও সুবিধার জন্য ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারির এক আদেশবলে বীরভূমের কালেক্টরশিপ তুলে দেওয়া হয় এবং এই দায়িত্ব বর্ধমান কালেক্টরশিপের উপর ন্যস্ত করে বিষ্ণুপুর

> **বাঁকুড়া জেলার সীমানা বিন্যাস সব সময়ে যে প্রশাসনিক সুবিধা বা জনস্বার্থের তাগিদে ঘটেছে তা নয়, কখনো কখনো এর পশ্চাতে কায়েমি স্বার্থের চাপও কাজ করেছে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের পরিবর্তনের সময় ছাতনা পরগনা মানভূম জেলার অন্তর্গত রয়ে যায়। অথচ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সদর কেন্দ্র বাঁকুড়া থেকে ছাতনার দূরত্ব ৮ মাইল, অন্যদিকে মানভূম জেলার সদর কেন্দ্র পুরুলিয়া থেকে ৪২ মাইল।**

ও জঙ্গল মহালের রাজস্ব আদায়ের জন্য বাঁকুড়ায় একজন সহকারি কালেক্টর মোতায়েন করা হয়। এই একই উদ্দেশ্যে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারির আরেকটি আদেশবলে জঙ্গল মহালের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলা কর্তৃপক্ষের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে বর্ধমান জেলা কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ বাঁকুড়ায় নিযুক্ত একজন সহকারি কালেক্টরের হাতে দেওয়া হয়। এরপর ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামানামক আদিবাসী অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের জঙ্গল মহাল জেলা ভেঙে দিয়ে পরগনা সেনপাহাড়ি, শেরগড় ও বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ অঞ্চল বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

জঙ্গল মহাল জেলার ভাঙনের ফলে কয়েকটি বিচার বিষয়ক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন, জঙ্গল মহালের দেওয়ানি আদালত তুলে দেওয়া হয় ; সেনপাহাড়ি, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর এস্টেট বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং পূর্বতন জঙ্গল মহালের অবশিষ্টাংশও মেদিনীপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধলভূম এস্টেট নিয়ে মানভূম জেলা গঠন করা হয়। জেলাটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানভূম জেলায় নিয়মিত প্রশাসন ব্যবস্থা বিলোপ করা হয় ও জেলাটিকে সাউথ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত করে "প্রিন্সিপ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট টু দি এজেন্ট টু দি গভর্নর জেনারেল ফর দি সাউথ-ওয়েস্ট এজেন্সি নামক একজন কর্মচারীর শাসনাধীনে স্থাপন করা হয়। এই পুনর্বিন্যাসের নিট ফল হিসাবে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সমগ্র পশ্চিমাংশ মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের একটি মানচিত্রে দেখা যায় যে, নবগঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সির পূর্ব সীমান্ত বাঁকুড়া শহর পর্যন্ত প্রসারিত। ১৮৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অবশিষ্টাংশ নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান নামক আরেকটি জেলা গঠিত হয়। এই জেলার সদর দপ্তর ছিল বাঁকুড়া ও পূর্ব সীমানা কোতুলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। ছাতনা, সুপুর ও অম্বিকানগর পরগনা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সির অন্তর্গত।

অত্যধিক কাজের চাপের যুক্তিতে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখের এক সরকারি আদেশক্রমে বাঁকুড়া শহরটিকে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সির থেকে বর্ধমান জেলায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং বিষ্ণুপুরের দায়িত্বে একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। তাঁর সদর দপ্তর ছিল বাঁকুড়া। একই যুক্তিতে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাইয়ের এক সরকারি আদেশের দ্বারা বাঁকুড়াকে বর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তিতেই পরবর্তীকালীন ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হয়েছিল। যেমন (১) ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারির সরকারি আদেশে বাঁকুড়া (পশ্চিম বর্ধমান) জেলার সঙ্গে ছাতনার সংযুক্তিসাধন ; (২) ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট তারিখের আদেশবলে বাঁকুড়া বা পশ্চিম বর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আউসগ্রাম, পাথসিয়া ও ইন্দাস থানার পূর্ব বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংযুক্তিসাধন ; (৩) ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের আদেশবলে বাঁকুড়া জেলা থেকে ইন্দাস থানার বর্ধমান জেলায় স্থানান্তর বাতিল ; অর্থাৎ ইন্দাস থানা পুনরায় পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে পশ্চিম বর্ধমান বা বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত হয় ; (৪) ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে তারিখের আদেশে বাঁকুড়া জেলা থেকে বুদবুদ মহাকুমার বর্ধমান জেলায় স্থানান্তর। সিপাহি বিদ্রোহের সময় অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছিল বর্তমান বাঁকুড়া জেলার পূর্বদিকের অর্ধেকাংশ। বাঁকুড়া শহর ছিল জেলার পশ্চিমতম প্রান্ত। বাঁকুড়া-রানীগঞ্জ সড়ক ও বাঁকুড়া-খাতড়া সড়কের পশ্চিমবর্তী প্রায় সব ভূখণ্ড ছিল মানভূমের অন্তর্গত। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বর্ধমান অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলার জন্য একজন কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাঁকুড়া জেলার বিবর্তনে পরবর্তী পরিবর্তন ছিল রানীগঞ্জ মহকুমার রঘুনাথপুর ও গৌরাঙ্গি অঞ্চল বাঁকুড়া মহাকুমায় স্থানান্তর। এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ আগস্ট তারিখের এক সরকারি আদেশবলে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখের এক সরকারি আদেশবলে মানভূম, বর্ধমান ও বীরভূম জেলা সহ বাঁকুড়া জেলার দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব বিষয়ক এক্তিয়ারের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন তারিখের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি ও বীরভূম জেলার মতো বাঁকুড়া জেলারও দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব বিষয়ক এক্তিয়ারের রদবদল করা হয়।

অসংখ্য সীমানা সংক্রান্ত পরিবর্তন এবং রাজস্ব বিষয়ক, বিচার বিষয়ক ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে বহু দিনের নানা অসংগতি দীর্ঘকাল ধরে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিল। অতএব বাঁকুড়া জেলার বিবর্তন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌছায়। এই বছর ১৭ জুন তারিখের এক আদেশবলে কোতুলপুর, ইন্দাস ও সোনামুখী বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানে স্থানান্তরিত হয় ; ১৭ সেপ্টেম্বরের এক আদেশবলে বর্ধমান জেলার বুদবুদ মহকুমা অবলুপ্ত হয় ও কোতুলপুর এবং সোনামুখী থানা সহ ইন্দাস থানা বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত হয় বাঁকুড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়, মানভূমের ছাতনা থানা। তাছাড়া যুক্ত হয়েছিল রানীগঞ্জ ও কাঁকসা থানা। এছাড়া কয়েকটি ছোটোখাটো পরিবর্তনও সাধিত হয়। যেমন, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফ্রেব্রুয়ারি এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বন নগর ও বাসুদেবপুর পল্লী সহ ডোলমা গ্রাম

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার ফৌজদারি এক্তিয়ারে বাইরে নিয়ে গিয়ে বর্ধমান জেলার সোনামুখী থানার অধীন করা হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারির আরেকটি আদেশবলে বর্ধমান জেলা থেকে ৯টি গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে সমীক্ষাকৃত চর বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত হয়। আদেশ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়। বহু বছর ধরে এসব পরিবর্তনের ফলে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে যখন হাণ্টারের 'Statistical Account of Bengal Vol. IV' প্রকাশিত হয় তখন বাঁকুড়া জেলার আয়তন ছিল মাত্র ১৩৪৬ বর্গমাইল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলার আয়তন ছিল ১৩৪৮.৯৯ বর্গমাইল (৬৩০ বর্গমাইল পরিমিত জমি আবাদি, ৫৪০ বর্গমাইল জমি আবাদযোগ্য পতিত ও ১৮০ বর্গমাইল আবাদযোগ্য নয়) যা হোক, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারির এক আদেশবলে জেলার ও জেলান্তর্গত থানাগুলির সীমানার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল।

বাঁকুড়া জেলার বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায় ছিল ১৮৭৯—৮১ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। (ক) প্রশাসনিক সুবিধার বিষয় বিবেচনা করে ২৭ সেপ্টেম্বরের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিবলে কোতুলপুর, ইন্দাস ও সোনামুখী থানা পুনরায় বর্ধমান জেলা থেকে বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়। (খ) প্রশাসনিক ও জনগণের সুবিধার অজুহাতে সরকার মানভূম থেকে সিমলাপাল ফাঁড়ি সহ খাতড়া ও রাইপুর থানা বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরের জন্য ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ১৯ নং আইন পাস করে। (গ) ২৫ এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলা মহকুমার ও থানাগুলির সীমানার পরিবর্তন এবং বাঁকুড়া, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, মানভূম, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের মুন্সেফী ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনা হয়, (ঘ) ৩০ ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞপ্তিবলে মানভূম ও মেদিনীপুর এবং মানভূম ও বাঁকুড়ার সীমানা পুনর্নির্ধারিত হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের উপরোক্ত পরিবর্তনসমূহের সমষ্টিগত ফলশ্রুতি ছিল খাতড়া, রাইপুর ও সিমলাপাল থানা অর্থাৎ সুপুর, অম্বিকানগর, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসুমা, সিমলাপাল ও ভেলাইডিহা পরগনা মানভূম জেলা থেকে এবং কোতুলপুর, ইন্দাস ও সোনামুখী থানা বর্ধমান জেলা থেকে বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত হয়। এ বছর বিষ্ণুপুর মহাকুমাও সৃষ্টি করা হয়। এভাবে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা আয়তনের দিক থেকে বর্তমান আকার নেয়। ব্যয় সঙ্কোচের যুক্তিতে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারির এক আদেশবলে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জজের পদ পূর্ব বর্ধমান জেলার জজের পদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চের এক বিজ্ঞপ্তিবলে প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তিতে 'বাঁকুড়া' নামক জেলার সঙ্গে পুনরায় জেলা জজের পদ যুক্ত করা হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে ব্রজেন্দ্রকুমার শীলকে বাঁকুড়া জেলার জজ পদে ও বর্ধমান জেলার সেসনস্ বিভাগের সহকারি সেসন জজ পদে নিয়োগ করা হয়। এভাবে বাঁকুড়া একটি পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়। তবে এই জেলার সীমানার সঙ্কোচন এর পরেও ঘটেছে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে তারিখের এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বড় হাজারি, খরিজা বিষ্ণুপুর ও বিষ্ণুপুর পরগনা থেকে চোদ্দটি গ্রাম বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। এই সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল বিষ্ণুপুর মহকুমা। পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদম সুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলার আয়তন দাঁড়ায় ২৬২১ বর্গমাইল।

অত্যধিক কাজের চাপের যুক্তিতে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখের এক সরকারি আদেশক্রমে বাঁকুড়া শহরটিকে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সির থেকে বর্ধমান জেলায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং বিষ্ণুপুরের দায়িত্বে একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগ করা হয়।

বাঁকুড়া জেলার সীমানা বিন্যাস সব সময়ে যে প্রশাসনিক সুবিধা বা জনস্বার্থের তাগিদে ঘটেছে তা নয়, কখনো কখনো এর পশ্চাতে কায়েমি স্বার্থের চাপও কাজ করেছে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের পরিবর্তনের সময় ছাতনা পরগনা মানভূম জেলার অন্তর্গত রয়ে যায়। অথচ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সদর কেন্দ্র বাঁকুড়া থেকে ছাতনার দূরত্ব ৮ মাইল, অন্যদিকে মানভূম জেলার সদর কেন্দ্র পুরুলিয়া থেকে ৪২ মাইল। তাই ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ছাতনা পরগনা ও মহিষাড়া পরগনার ফৌজদারি এক্তিয়ার বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হলেও ছাতনারাজের বিরোধিতার চাপে দেওয়ানি ও রাজস্ব এক্তিয়ার পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়নি। কারণ, পশ্চিম বর্ধমান অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলা ছিল একটি 'রেগুলেশন' জেলা, পক্ষান্তরে মানভূম ছিল 'নন-রেগুলেশন' জেলা। ছাতনা জমিদারি ছিল দরিদ্র। সুতরাং ছাতনার রাজা নন-রেগুলেশন জেলার পক্ষে প্রযোজ্য ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নং রেগুলেশন বিশেষ রক্ষাকবচবলে খাজনা আদায় দিতে না পারা সত্ত্বেও জমিদারি নিলামের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। তাই ছাতনার উপর দেওয়ানি ও রাজস্ব এক্তিয়ার একটি নন-রেগুলেশন জেলা থেকে একটি রেগুলেশন জেলায় স্থানান্তরিত হলে ছাতনারাজের ধ্বংস ছিল নিশ্চিত। অবশ্য ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ছাতনার দেওয়ানী ও রাজস্ব এক্তিয়ার পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

আবার ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মেসার্স গিসবর্ন অ্যান্ড কোম্পানির চাপেই মানভূম জেলা থেকে সুপুর, রাইপুর, ফুলকুসুমা, অম্বিকানগর, শ্যামসুন্দরপুর, সিমলা পাল ও ভেলাইডিহা পরগনাগুলিকে বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কারণ, এসব পরগনায় গিসবর্ন কোম্পানির বিস্তৃত ইজারাদারি ছিল। তাই এই কোম্পানির অভিযোগ ছিল, মামলা-মোকদ্দমার জন্য এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের পুরুলিয়া ও রাঁচি যাতায়াত করতে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। বাঁকুড়া জেলার শাসনকেন্দ্রের নামও বাঁকুড়া। অন্য কথায় জেলার সদরকেন্দ্র 'বাঁকুড়া' নামেই অভিহিত। বস্তুত জেলা কেন্দ্রের নামানুসারেই জেলাটিরও নামকরণ হয়েছে বাঁকুড়া।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রামাণ্য গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন ইংরেজি বাংলা গ্রন্থে বাঁকুড়া জেলা প্রসঙ্গে কমবেশি নানান তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় ছড়িয়ে রয়েছে। বাঁকুড়া জেলা সম্পর্কে ন্যূনতম আলোকপাত যে যে গ্রন্থে আছে, তেমন গ্রন্থপঞ্জির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

বাংলা গ্রন্থ

১। **অমলেন্দু মিত্র।**
রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর। কলিকাতা। কে এল মুখোপাধ্যায়। ১৯৭২ (রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত। ১৯৭৩) ২৮৪ পৃঃ। ১৫ টাকা।

২। **অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।**
ছড়ায় স্থান বিবরণ। কলিকাতা। জি এ ই পাবলিশার্স। ১৯৮৬। ১৪৪ পৃঃ। ২৫ টাকা।

৩। **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।**
বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি। কলিকাতা। শ্রীভূমি পাবলিশার্স। ১৯৭৫।

৪। **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।**
বাঁকুড়ার মন্দির। কলিকাতা। শ্রীভূমি পাবলিশার্স। ১৯৭১।

৫। **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।**
বাঁকুড়া মন্দির। কলিকাতা। সাহিত্য সংসদ। ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। ২০৫ পৃষ্ঠা। ১৫ টাকা।

৬। **অরিন্দম নিলয়।**
সচিত্র বিষ্ণুপুর প্রদর্শক। বিষ্ণুপুর। অরিন্দম নিলয়। ১৯৯৮। ১৭ পৃষ্ঠা। ৬ টাকা।

৭। **অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।**
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম পর্ব। কলিকাতা। মডার্ন বুক এজেন্সি। ১৯৯৯।

৮। **অতুল সুর।**
বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। কলিকাতা। সাহিত্য মন্দির। ১৯৯৪।

৯। **অতুল সুর।**
বাংলার সামাজিক ইতিহাস। কলিকাতা। সাহিত্য মন্দির। ১৯৯১।

১০। **অরুণ ভট্টাচার্য।**
বিষ্ণুপুর নাট্যান্দোলন। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

১১। **আশুতোষ ভট্টাচার্য।**
বাংলার লোকসংস্কৃতি। নিউদিল্লি। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। ১৯৮৬। ১৬৫ পৃষ্ঠা। ১৫ টাকা।

১২। **কমলা দাশগুপ্ত।**
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী। কলিকাতা। বসুধারা প্রকাশনী। ১৯৬৩। ৩০০ পৃষ্ঠা। ১০ টাকা।

১৩। **কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।**
দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। কলিকাতা। কে পি বাগচী। ১৯৮৭। ১৫৮ পৃষ্ঠা। ১৫ টাকা।

১৪। **গজাগোবিন্দ রায়।**
মল্লভূম কাহিনী। বাঁকুড়া। মনোমোহন রায়। ১৯৫৫। ৭৫ পৃষ্ঠা। ১২ টাকা।

১৫। **গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী।**
গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও বাঁকুড়া। বাঁকুড়া। ১৯৮৮।

১৬। **গোপাল বসাক।**
পর্যটকের দৃষ্টিতে এই বাংলা। কলিকাতা। ডি এম লাইব্রেরি। ১৯৮৩। ১৬০ পৃষ্ঠা। ১২ টাকা।

১৭। **গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।**
বাংলার লৌকিক দেবতা। কলিকাতা। দে'জ। ১৯৬৬। ২২৬ পৃষ্ঠা। ১২ টাকা।

১৮। **ঘনশ্যাম চৌধুরী।**
মল্লভূমে বিষ্ণুপুরে। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ শারদীয়া খণ্ড (?)

১৯। **চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।**
বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা। কলিকাতা। এস এম প্রকাশন। ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

২০। **তরুণদেব ভট্টাচার্য।**
মেদিনীপুর। কলিকাতা। কার্মা কে এল এম। ১৯৭৯।

২১। **তরুণদেব ভট্টাচার্য।**
বাঁকুড়া। কলিকাতা। কার্মা কে এল এম্ প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮২। ৪৩৭ পৃষ্ঠা। ৫০ টাকা।

২২। **দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।**
বিষ্ণুপুর ঘরানা। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৮২।

২৩। **দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।**
ভারতের নদনদী। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৩৪। ১৮৩ পৃষ্ঠা। ১৩ টাকা।

২৪। **দীনেশচন্দ্র সেন।**
বৃহৎ বঙ্গ (১—২১)। কলিকাতা। দে'জ। ১৯৯৩। ৫০০ টাকা। প্রবন্ধ।

২৫। **দুঃখরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।**
বাঁকুড়া জেলার তফসিলী জাতি ও উপজাতি। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৮০।

২৬। **দেবদাস চট্টোপাধ্যায়।**
রাঢ় বঙ্গের উৎসর্গ শিল্প। কলিকাতা। পুস্তক বিপণি। ১৯৯৪। ১৬৪ পৃ। ৪০ টাকা।

২৭। **ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।**
সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস। ৩য় সংস্করণ। কলিকাতা। পাল পাবলিশার্স। ১৯৮২। ১৪৩ পৃষ্ঠা। ১৬ টাকা।

২৮। **নমিতা মণ্ডল।**
বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাগে। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা। পুস্তক বিপণি। ১৯৮৯। ২৪৮ পৃষ্ঠা। ৫০ টাকা।

২৯। **নিখিলরঞ্জন রায়।**
দেব-দেউলের দেশে। কলিকাতা। পুঁথি। ১৯৮৬। ১২৬ পৃষ্ঠা। ২০ টাকা।

৩০। **নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।**
বিষয় বাঁকুড়া। কলিকাতা। উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির। ১৯৯৪।

৩১। **নীহাররঞ্জন রায়।**
বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)। কলিকাতা। দে'জ। ১৯৯৩। ৭৮৮ পৃষ্ঠা। ২৬০ টাকা। ইতিহাস।

৩২। **প্রণব রায়।**
বাংলার মন্দির : স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। কলিকাতা। সাহিত্যলোক। ১৯৯৮। ৬০ পৃষ্ঠা। ১২ টাকা।

৩৩। **প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।**
বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ। কলিকাতা। এস এন পাবলিশার্স। ১৯৭৬।

৩৪। **ফকিরনারায়ণ কর্মকার।**
বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনি। কলিকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৭৯। ১৭৬ পৃষ্ঠা। ১৫ টাকা।

৩৫। **বসন্তরঞ্জন রায়বিদ্বদ্বল্লভ** (সম্পাদিত)
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কলিকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

৩৬। **বিনয় ঘোষ।**
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। প্রথম খণ্ড। কলিকাতা। প্রকাশ ভবন। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ। ৪৫৯ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা।

৩৭। **বিভূতিভূষণ ঘটক।**
চিত্রে ও শিল্পে বিষ্ণুপুর। কলিকাতা। অরুণ প্রকাশনী। ১৯৮০।

৩৮। **বুদ্ধদেব রায়।**
বাংলার লোককথা। কলিকাতা। জ্ঞান প্রকাশন। ১৫ টাকা।

৩৯। **ভব রায়।**
রাঢ় বাংলার মাটি মানুষ ও সংস্কৃতি। কলিকাতা। মডার্ন কলাম। ১৯৯৪। ৪০ টাকা। প্রবন্ধ।

৪০। **ভূপতিরঞ্জন দাস।**
পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন। কলিকাতা। শরৎ পাবলিশিং হাউস। ১৯৭৯। ২২ টাকা।

৪১। **মন্মথ রায়।**
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নাটক ও নাট্যশালা। কলিকাতা। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

৪২। **মানিকলাল সিংহ।**
পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংকৃতি। বিষ্ণুপুর। (বাঁকুড়া)। চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ। ৩৫০ পৃষ্ঠা। ২৭ টাকা।

৪৩। **মানিকলাল সিংহ।**
রাঢ়ের মন্ত্রযান। কলিকাতা। ঠাকুরদাস লাইব্রেরি। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

৪৪। **মিহিরকুমার রায়।**
বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা। শ্যাম রায়ের বাজার (বিষ্ণুপুর)। জেলামন্ত্রী পাঠচক্র। ১৯৮৭। ১০৬ পৃষ্ঠা। ৮.৫০ টাকা।

৪৫। **মিহির রায়।**
বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

৪৬। **মিহির চৌধুরী কামিল্যা।**
রাঢ়ের গ্রামদেবতা। বর্ধমান। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯। ২৯৪ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা। লোকসংস্কৃতি।

৪৭। **মিহির চৌধুরী কামিল্যা।**
রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা। কলিকাতা। ভোলানাথ পাবলিশার্স। ১৯৯২। ১০২ পৃষ্ঠা। ২২ টাকা।

৪৮। **যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।**
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স। ১৯৮২। ৫৯১ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা।

৪৯। **যোগেশচন্দ্র বাগল।**
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী। কলিকাতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৯৫৪।

৫০। **রঞ্জন বাচস্পতি।**
পশ্চিমবাংলার ইতিহাস। রাজনৈতিক পর্ব (১৯৪৭—১৯৭২)। কলিকাতা। ইস্টার ন্যাশনাল বুকস্। ১৯৮৬। ২৩২ পৃষ্ঠা। ২১ সেমি। ৩০ টাকা।

৫১। **রবি দত্ত।**
বাঁকুড়ায় রবীন্দ্রনাথ। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

৫২। **রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী।**
বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি। কলিকাতা। বেস্ট বুকস। ২০০০। ৫৪২ পৃষ্ঠা। ২৫০ টাকা। (সমাজ-ইতিহাস)।

৫৩। **রবীন্দ্রনাথ সামন্ত।**
শিলারূপময় বাঁকুড়া। কলিকাতা। শ্রীভূমি পাবলিশার্স। ১৯৭৮।

৫৪। **রবীন্দ্রনাথ সামন্ত।**
বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা। কলিকাতা। পুস্তক বিপণি। ১৯৮১। ১৩৬ পৃষ্ঠা। ১৫ টাকা।

৫৫। **রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।**
বিষ্ণুপুর। কলিকাতা। এস এন পাবলিশার্স। ১৯৪১।

৫৬। **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।**
বাংলার ইতিহাস। কলিকাতা। মনোমোহন প্রকাশনী। ১৯৮৫।

৫৭। **রাখহরি চট্টোপাধ্যায়।**
বাঁকুড়া জিলা হিন্দু মহাসভার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

৫৮। **রাধামোহন ভট্টাচার্য।**
বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্য। পারিবারিক থিয়েটার ও আধুনিক শিক্ষা। বাঁকুড়া। ১৯৮৪।

৫৯। **রামকৃষ্ণ দাস।**
বাঁকুড়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। বাঁকুড়া। ১৯৮৭।

৬০। **রামরঞ্জন দাস।**
পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি। কলিকাতা। ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮০। ২৭২ পৃষ্ঠা। ২০ টাকা।

৬১। **শিবদাস ভট্টাচার্য।**
মল্লভূমি বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর। ১৯১৬।

৬২। **শিবনাথ শাস্ত্রী।**
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। কলিকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৮৩। ২৯৪ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা।
৬৩। **শৈলেন দাস ও ধনপতি সামন্ত।**
বাঁকুড়ার মাটি, মানুষ, গান। কলিকাতা। জ্ঞান প্রকাশন। ১৯৭৮।
৬৪। **শৈলেন দাস ও ধনপতি সামন্ত।**
বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি। কলিকাতা। রূপা পাবলিশার্স। ১৯৭৬।
৬৫। **শৈলেন দাস ও ধনপতি সামন্ত।**
লোকসংস্কৃতি ও আমরা। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৭৬।
৬৬। **সুকুমার সেন।**
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড। কলিকাতা। আনন্দ। ১৯৯৪।
৬৭। **সুধীরকুমার পালিত।**
পালিতের বাঁকুড়া ভূগোল ও ইতিবৃত্ত। বাঁকুড়া। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।
৬৮। **সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পাদিত)।**
সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান। কলিকাতা। সাহিত্য সংসদ। ১৯৭৬।
৬৯। **সুব্রত রায়।**
বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (১৯২৩—১৯৪৭) বাঁকুড়া। মহামায়া বুক ডিপো। (পরিবেশক)। [ ]। ২০,২৪৯ পৃষ্ঠা। ১৯ সেমি। ২০ টাকা।
৭০। **সুপ্রকাশ রায়**
ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। ডি এন বি এ ব্রাদার্স। ১৯৭২। ৪৩২ পৃষ্ঠা। ২৫ টাকা।
৭১। **সুব্রত রায়।**
বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (১৯২৩—১৯৪৭) বাঁকুড়া। ১৯৮৪।
৭২। **সোমনাথ চক্রবর্তী**
মল্লভূমি। কলিকাতা। বুক ল্যান্ড। ১৯৯৭। ৯২ পৃষ্ঠা। ৩৫ টাকা। প্রবন্ধ।
৭৩। **হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য**
হিন্দুদের দেব-দেবী। উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। তৃতীয় খণ্ড। কলিকাতা। ফার্মা কে এল এম। ১৯৭৮।
৭৪। **হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।**
ছাতনার কথা। কলিকাতা। ১৯৮৭।
৭৫। **হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।**
বাঁকুড়ার ইতিহাস। কলিকাতা। জ্ঞান প্রকাশনী। ১৯৯৯। ২০০ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা। ইতিহাস।

ইংরেজী গ্রন্থ

1. **A.B. Chatterjee & others. ed.**
West Bengal. 1970.
2. **Abhay Pada Mallik.**
A History of Bishnupur Raj. Calcutta.
3. **Abinash Chandra Das.**
Rigvedic culture. 1925.
4. **A. K. Bandyopadhyay. ed.**
Bankura District Gazetteer. 1968.
5. **Amalesh Tripathi.**
The Extremist Challenge. Calcutta.
6. **A. Mitra..ed.**
The Tribes and castes of West Bengal. Calcutta.
7. **A. Mitra. ed.**
West Bengal District census Hand Book, 1961. Calcutta.
8. **Anil Seal.**
The Energence of Indian Nationalism. Calcutta.
9. **Anthony Giddens.**
Sociology. Calcutta. 1993.
10. **A. P. Mallick.**
History of Bishnupur Raj. Calcutta.
11. **Arun Kumar Singh.**
Govinda Prasad Singha—An unassuming Personality. Calcutta.
12. **Asok Mitra.**
An Account of the land Management of Bengal, 1870—1950. Calcutta.
13. **Bankura District Gazeteer.**
Statistics 1900-01 & 1910-11. Calcutta.
14. **Bankura District Gazeteer.**
Statistics 1901-02.
15. **Bankura, A Resume of development and other works**—Bankura (Monograph). D.M. 1979.
16. **Bengal District Records.**
Midnapore, Vol I—IV. Calcutta.
17 **Bengal Judicial Records.**
Calcutta.
18. **Bengal Legislative Council papers, vol-IV.**
Calcutta.
19. **Berrie M. Morrison.**
Political centres and cultural Regions of Early Bengal. Calcutta.1980.
20. **Binod S. Das.**
Studies in the Economic History of Orissa. Calcutta. 1978.
21. **Blair B. Kling.**
The Blue Mutiny. 1977.
22. **B. Roy. ed.**
West Bengal District census hand book, 1961. Calcutta.
23. **C. E. Buckland.**
Bengal under the lieutenant Governors, Vol. I & II. Calcutta. 1902.
24. **Census of India 1981.**
Series 23, West Bengal, Paper-I of 1981. Calcutta.
25. **C. stewart.**
History of Bengal. Calcutta. 1813.

26. **Charles Tegart.**
Terrorism in India. Calcutta. 1932.
27. **A Conspectus of development works in Bankura.**
Bankura (Monograph). D. M. 1980.
28. **C. Stewart.**
History of Bengal. Calcutta. 1813
29. **Dadabhai Naoroji.**
Poverty and un-British Rule in India. Calcutta.
30. **David Mc. Cutchion.**
Temples of Bankura District. Calcutta. 1964.
31. **David. M. Laushey**
Bengal Terrorism and Marxist Left. Calcutta.
32. **D. D. Kosambi.**
An introduction to the Indian Culture and Civilisation in historical outlines. Calcutta.
33. **Debabrata Singhathakur.**
Devadasi in Indian Ancient poems, literature. Puranas, Music and the temples.
34. **Devendra Bijay Mitra.**
The cotton weavers of Bengal. Calcutta.
35. **Dimmock & P. C. Gupta ed.**
Maharastra purana. Calcutta.
36. **District Statistical Hand Book.**
Bankura. Bureau of Applied Economics and Statistics. 1971-72 combined, 1975.
37. **E. T. Dalton.**
Descriptive Ethnology of Bengal. Calcutta.
38. **Fredrich Engels and Karl Marx.**
The first war of Indian Independence. Calcutta.
39. **F. H. Skrine.**
Life of Sir Wilson Hunter.
40. **General population Tables.**
Series 22, West Bengal. Part IIA of 1973. West Bengal.
41. **G. D. Oversteel & M. Windmiller.**
Communism in India. Calcutta. 1960
42. **Harachandra Ghosh.**
A Topographical and statistical sketch of Bankoorah. (Essay). Calcutta. 1838.
43. **H. Benerige.**
The Akbarnama, Vol-III. Calcutta. 1973.
44. **H. Coupland.**
Bengal District Gazetters, Manbhum. Calcutta.
45. **H. H. Risley.**
The tribes and castes of Bengal. Calcutta. 1891.
46. **History of Bengal.**
Dacca. University of Dacca. Vol-I & II.
47. **H. K. Roychoudhury.**
God in Indian Religion. Calcutta. 1969.
48. **J. C. Price.**
The chuar Rebellion. Calcutta. 1874.
49. **J. D. Beglar.**
Report of a Tour through the Bengal provinces etc. in 1872-73. Calcutta. 1878.
50. **J. E. Gastrell.**
Statistical and Geographical report of the district of Bankurah. Calcutta. 1863.
51. **J. H. Broomfield.**
Elite conflict in a plural society. Calcutta. 1968.
52. **J. H. Hutton.**
Caste in India.
53. **J. Long Rev.**
Selections from unpublished records of Government 1748—68.
54. **J. Long Rev.**
Selections from unpublished records. Calcutta. 1973.
55. **John Nance.**
The gentle Tasaday. Calcutta. 1975.
56. **J. N. Sarkar ed.**
History of Bengal, Vol.-II Dacca. Dacca university.
57. **J. W. Mc. Crindle.**
Ancient India as described by Megasthenis and Arrian. London. 1877.
58. **K. C. Misra.**
The cult of Jagannath temple in the 13th century. Calcutta. 1977.
59. **Leonard A. Gordon.**
Portrait of a Bengal Revolutionary.
60. **L. S. S. O'Malley.**
Bengal District Gazetteers. Bankura. Calcutta.
61. **Manomohan Chakrabarti.**
A summary of changes of jurisdictions of districts in Bengal 1767—1916. Calcutta. 1916.
62. **M. C. Mc. Alpin Rev.**
Report of the condition of the sonthals in the districts of Birbhum, Bankura, Midnapur and North Balasore. Calcutta.. 1981.
63. **Maulavi Abdus Salam tr.**
Riyazu-s-Salatin. Calcutta. 1904.
64. **M. V. A. Sastry.**
Report of Fossil man in West Bengal Calcutta. 1978. (unpublished).
65. **Nemai Sadhan Bose.**
Indian Awakening and Bengal. Calcutta.
66. **Nemai Sadhan Bose.**
Ramananda Chatterjee. Calcutta. 1974.
67. **N. G. Majumdar.**
Inscriptions of Bengal, Vol-III. Calcutta.
68. **Nirod C. Choudhury.**
The clive of India. Calcutta. 1975.
69. **Niranjan Ghosh.**
Role of Women in the Freedom Movement in Bengal. Calcutta.
70. **N. K. Sinha.**
Economic History of Bengal, Vol-I-II. Calcutta.
71. **P. Mukherjee.**
History of Jagannath temple in the 13th century. Calcutta. 1977.

72. **Puruliya District Gazetteer,** 1985.
Calcutta.
73. **Radha Gobinda Basak.**
History of North Eastern India. Calcutta. 1964.
74. **R. C. Majumdar. ed.**
History of Bengal, vol.-I. Dacca. Dacca University.
75. **R. C. Majumdar.**
History of Mediaeval Bengal.
76. **R. C. Majumdar. ed.**
Struggle for freedom. Bharatiya Vidya Bhavan.
77. **R. C. Majumdar.**
History of ancient Bengal. 1974.
78. **R. D. Banerjee. Rep.**
History of Orrissa. vol.-I. 1980.
79. **(The) Report of West Bengal Flood Enquiry Committee.** Calcutta.
80. **R. M. Maciner & Charles. H. Page.**
Society–An introductory Analysis.
81. **Rowland N. L. Chandra.**
A summary of changes of Jurisdictions of districts in Bengal, 1767—1916. Calcutta. 1916.
82. **Rowlatt Report. 1918.**
Calcutta.
83. **Sankar Ghosh.**
Naxalite Movement. Calcutta. 1975.
84. **S. R. Das.**
Stone Tools. History and origins. Calcutta. 1968.
85. **S. K. Maity & R. R. Mukherjee.**
Corpus of Bengal Inscriptions.
86. **Sukumar Sinha. ed.**
Village Survey Monograph on Raibaghini. Calcutta. 1966.
87. **S. K. Chatterjee.**
The Origin and Development of Bengali Languag
Vol.-I, II & III. Calcutta. 1975.
88. **S. Beal.**
The life of Hiuen Tsang. Calcutta. 1973.
89. **Surendranath Banerjee.**
A Nation in making. Calcutta. 1963.
90. **V. A. Smith.**
Early History of India. Calcutta. 1914.
91. **W. W. Hunters.**
The Annals of Rural Bengal. Calcutta. 1868.
92. **West Bengal Forests, Centenary commemorati volume.** Calcutta. Forest Directorate, Govt. of We Bengal. 1964.
93. **W. L. Voorduin.**
The unified Development of the Damodar Riv Calcutta. 1945.
94. **Zulekha Haque.**
Terracota Decorations of Late Medieval Beng Portrayal of Society. Calcutta. 1980.

লেখক : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক।

বাঁকুড়া জেলায় সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি